

শারদীয়া ১৪৩০

আনন্দরাজার পত্রিকা





K's

Books & Magazines





K's

Books & Magazines



আনন্দবাজার পত্রিকা

শারদীয়া ১৪৩০



সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ১৪



উপন্যাস

অসমাপ্ত শেষ উপন্যাস

সমরেশ মজুমদার ২৪

কুসুমবীজ

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ৫২

সিউডো ইউডো

সুপ্রিয় চৌধুরী ৯৮

কে ভাসালে নৌকাখানি

অভিনন্দন সরকার ১৫৮

অবশ্যস্তাবী

অজিতেশ নাগ ২৩৮



প্রবন্ধ

রমণীর ভাষা
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী ১৫

লোকসমাজের কাছে ফেরার যুক্তসাধনা
অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ৩৫

কোপেনহেগেন
পথিক গুহ ৪৫

তাঁহাদের কথা
দেবাশিস ভট্টাচার্য ৮৯

মায়া রহিয়া গেল
ঈশানী দত্ত রায় ১৩৭

মণিপুরের মণিকোঠায়
গৌতম চক্রবর্তী ১৪৫

সুভাষের ধর্ম
সেমন্তী ঘোষ ২৩৩

আমার ঝিলম, তোমার বিতস্তা
প্রেমাংশু চৌধুরী ২৭৮



গল্প

শেষটুকু শুধু কাল্পনিক
সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ৩১

পরিচয়
স্মরণজিৎ চক্রবর্তী ৪০

মা ও খুকি
উল্লাস মল্লিক ৮৬

আভারটেকার ও রূপকথা
ইন্দ্রনীল সান্যাল ৯৪

সিলিং ফ্যান
সায়ন্তনী পূততুণ্ড ১৪১

নিষ্কণ্টক
জয় সেনগুপ্ত ১৫২

জয়ভারা
অল্লানকুসুম চক্রবর্তী ২৮৪

ভ্রমণ

কফির দেশে ম্যারাথনের শহরে
অগ্নি রায় ২৭১



কবিতা

গ্রন্থ

জয় গোস্বামী ২০৩

মিথ্যা বলি আদালতে, সত্য বলি পানশালায়

সুবোধ সরকার ২০৩

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

রণজিৎ দাশ ২০৪

ঈশ্বর মানুষ হয়ে জন্মাতে চাইছেন

পঙ্কজ সাহা ২০৪

জীবন-সঙ্গীত

কৃষ্ণ বসু ২০৫

পথ ও পথিক

রূপক চক্রবর্তী ২০৫

পুতুলদি

রানা সরকার ২০৬

আমি, রতনলাল

বিকাশ সরকার ২০৭

ছায়া মিউজিয়ম

প্রবালকুমার বসু ২০৮

প্রণয়কথা

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস ২০৮



কবিতা

মেহেন্দি আকাশ
সুমন মহান্তি ২০৯

অরণ্যের গভীরে
সনৎ সেন ২০৯

কবিতার একপাতা
শঙ্খশুভ্র পাত্র ২১০

ঝোরা
সেখ রমজান ২১০

উপোসি বাংলার কবিতা: আটত্রিশ
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় ২১১

মহড়া
সুস্মেলী দত্ত ২১১

চুক্তিপত্র
সায়ন্তনী নাগ ২১২

পলাশকথা
জয়ন্ত সরকার ২১২

প্রস্তাব
দুলালেন্দু সরকার ২১৩

শুভ বিজয়া
স্নেহাশিস পাল ২১৩



কবিতা

চৈত্রের দুপুর

শ্যামলজিৎ সাহা ২১৪

নিষিদ্ধ রাস্তার মেয়ে

অভিজিৎ রায় ২১৪

মার্জনা

শ্যামশ্রী রায় কর্মকার ২১৫

অন্ন

পার্থজিৎ চন্দ ২১৫

সেই চোখ

সোহরাব পাশা ২১৬

ভাস্কো দা গামা

এস মনিরউদ্দিন ২১৬

প্রেম

পার্থপ্রতিম আচার্য ২১৭

প্রথম সম্পর্কের রক্ত

অর্ণব পণ্ডা ২১৭

ইলিন

সুদীপ বসু ২১৮

ফিনকি দিয়ে ওঠা ক্ষতমুখ

সৌমিত বসু ২১৮



কবিতা

আদিম অভ্যাস
সুদীপ চক্রবর্তী ২১৯

আন্তর্জাল
শর্মিষ্ঠা ২১৯

পরিযায়ী
সীমা জানা ২২০

অবশিষ্ট সমুদ্রবন্দর এবং একটি গাঙচিল
দীপা পান ২২০

প্রস্তুতি
সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২১

চেনা পথ, অচেনা মানুষ
অসীমকুমার মুখোপাধ্যায় ২২১

অভিমান
রাজকুমার রায়চৌধুরী ২২২

খেলা হবে
সুজিত দাস ২২২

সফরনামা
কামরুজ্জামান ২২৩

দেবী দুর্গার দশ হাত
তুষার ভট্টাচার্য ২২৩



কবিতা

দুর্গাপূজার নিয়মাবলি
রত্নদীপা দে ঘোষ ২২৪

ধ্যান
রামকৃষ্ণ মহাপাত্র ২২৪

বধ্যভূমির দিন
অনিন্দিতা গুপ্ত রায় ২২৫

অশরীরীরা ফিরে আসে দুর্গাদালানে
মলয় ঘোষ ২২৫

বাহার
সঙ্ঘমিত্রা হালদার ২২৬

সন্তান
বেবী সাউ ২২৬

জোনাকি
অর্পণ গুপ্ত ২২৭

অক্ষোভ
ঋতব্রত মিত্র ২২৭

আমি
দেবব্রত দত্ত ২২৮

কাপাসসুতো
ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় ২২৮



কবিতা

ফিলহারমোনিক
তন্ময় চক্রবর্তী ২২৯

চোখ
দেবগুরু বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৯

ওয়েস্টল্যান্ডের শহরে
দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায় ২৩০

একটি বাক্যে একটি আঙুল
স্বাগতা দাশগুপ্ত ২৩০

আকাশজলা
অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় ২৩১

কবি
অরুণাভ রাহারায় ২৩১

ধুলোপুরাণ
কমলেশ কুমার ২৩১

শব্দ
তমোয় মুখোপাধ্যায় ২৩২

উপশম
রাজদীপ রায় ২৩২

এ পরবাসে
স্রোতস্বিনী চট্টোপাধ্যায় ২৩২



প্রচ্ছদ

অমিতাভ চন্দ্র

বহুবর্ণ চিত্র

শ্রীশ্রীদুর্গা: বিদেশি আঙ্গিকে নির্মিত পোসেলিন মূর্তি
দ্য লিটল বোট: মুকুল দে

অলঙ্করণ

সুব্রত চৌধুরী, অমিতাভ চন্দ্র
তারকনাথ মুখোপাধ্যায়, কুনাল বর্মণ
পিয়ালী বালা, রৌদ্র মিত্র, প্রসেনজিৎ নাথ
মহেশ্বর মণ্ডল, সৌমেন দাস
বৈশালী সরকার, সায়ন চক্রবর্তী



সম্পাদক: ঈশানী দত্ত রায়

এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে প্রদীপ্ত বিশ্বাস কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল
সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ
অফসেট প্রাঃ লিমিটেড সিপি-৪, সেক্টর ৫, সল্ট লেক সিটি,
কলকাতা ৭০০০৯১ থেকে মুদ্রিত।

Edited by Ishani Dutta Roy and printed and published by Pradipta Biswas
on behalf of ABP Pvt. Ltd. 6, Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700001.
Printed at Ananda offset Pvt. Ltd., CP-4, Sector V Salt Lake City, Kolkata-700091

RNI Regd No. 2511/57

প্রকাশিত কোনও লেখা বা ছবি, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে,
সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা নিয়মবিরুদ্ধ।



সম্পাদকীয়

শিউলি পড়বে টুপটাপ, তার এক ঝলক গন্ধ আনমনা করে দেবে রাত্রিকে, আকাশ সাদা মেঘে উত্তাল হবে, কাশফুল নিঃশেষ করে দেবে নিজেকে। এই পথেই সে আসে। চৌকাঠটি পেরিয়ে ঘরে এসে দাঁড়ায়। মানুষ ত্রিনয়নে প্রতিষ্ঠা করে দেবীর।

বছরে এক বার যে মেয়েটি মা-বাবার কাছে আসে চার সন্তান নিয়ে, সে তো চায় না রক্তপাত। তাই মানুষের তৈরি দেবীও রক্ত চান না। অথচ হিংসা, রক্তপাত, দ্বেষ, অসততার আবহে এ বার তাঁর আবাহন। শরতের আকাশের মতো মন নিয়ে তাঁকে ঘরে আনার কথা। কিন্তু মন অসুস্থ। হিংসা এবং অসততার জীবাণু সংক্রমণ করোনার মতোই স্থায়ী, কখনও সে অবদমিত, কখনও প্রকট। অশুভকে দমন করার শক্তিকে পূজা করা হয়। অথচ ধর্মের দোহাই দিয়ে তা কখনও পশুবলিতে পর্যবসিত হয়। মানুষকে হত্যা চলে রাজনীতির নামে। প্রতিবেশীকেও আমরা চিনি না, তাই আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিবেশীকে চেনা ও আপন করার পাঠ দিতে হয়।

হৃদয়ের মিলন ঘটানো এবং আত্মশুদ্ধির যে উৎসব সমাগত, সেই সময় এই ক্ষুদ্রত্বের, অপরাধের, কলুষতার সাধনা থেকে নিজেদের মুক্ত করার উপযুক্ত ক্ষণ। ‘আমার এ ঘর বহু যতন ক’রে ধুতে হবে মুছতে হবে মোরে। আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে...’

লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু সে তো শুধু এক জ্যোৎস্নারাতের প্রতীক্ষা নয়, সারা জীবনের অপেক্ষা, সারা জীবনের সাধনা। উৎসবের ঋতুতেই তা শুরু হোক। নতুন করে ভালবাসতে শিখি আমরা। এই আশারঞ্জিত পথে রইল আমাদের সাহিত্য-নিবেদন।



রমণীর ভাষা

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ওগো যদি নিশিশেষে আসে হেসে হেসে
মোর হাসি আর রবে কি!
এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন
আমারে হেরিয়া কবে কী!

প্রগতির যজ্ঞধূমে যাঁদের চক্ষু আকুলিত হয়ে আছে, তাঁরা অকুটিল-কুটিল হওয়ার আগেই অন্তত এক বার আমি আমার সংস্কৃত কবিতার জগতে প্রবেশ করতে চাই যে! আমার সংস্কৃত কবিতার জগৎ এক-একটি কবিতা আমি যদি কবিতার মতো করে কবিতার ভাষাতেই ব্যাখ্যা করতে পারতাম, তা হলে এই পৃথিবী আমার সঙ্গে সামগান গাইত, তা হলে সূর্যের সহস্র রশ্মি মুক্তোর মতো ফুটে উঠত টগর-ফুলের ডালে ডালে। কানে কানে কথা বলার ছলনায় যে লজ্জাকর চূষন, যাতে চক্ষু দু'টি আত্মারাম যোগীর মতো অধনিমীলিত হয়ে ওঠে ক্ষণেকের তরে, যদি কবিতা-ব্যাখ্যার ভাষা সেই নিমীলিত অন্ধকার থেকে নেমে আসত, তা হলেই চাঁদের জ্যোৎস্না টুইয়ে পড়ত আমার বর্ণাঙ্কর-পদ-বাক্যে।

For given the full psychological material of any poem, every spiritual recoil, every sense-contact therein implicated, every derivation of form and emotion, there would still remain something completely unexplained— the poem itself.

—William Blake

ঠিক এই জন্যই আমি অন্তত রবীন্দ্রনাথ, কালিদাস কিংবা ভাগবত পুরাণের ‘ভ্রমরগীত’ ব্যাখ্যা করতে পারি না, ব্যাখ্যা করতে পারি না চৈতন্য মহাপ্রভুর রাধাভাব। কবিতাটা শোনাই তবু— বিনোদিনী রাইকিশোরী তাঁর প্রিয়সখীকে কৃষ্ণের খবর আনতে পাঠিয়েছেন। তিনি খবর নিয়ে ফিরেছেন বটে, কিন্তু তাঁর চেহারাটা কেমন বিধ্বস্ত লাগছে। রাইকিশোরী প্রণয়ের পর প্রশ্ন করে বললেন— চন্দন-কুমকুমের পত্রলেখায় ঢাকা ছিল তোমার বক্ষোদেশ, তা সব ধুয়ে-মুছে গেল কী করে? চোখের কাজল! সে-ও কেমন লেপটে গেছে মুখে। কে করল এমনটা? তোমার অধরে কিশলয়ের লালিমা অঙ্কিত ছিল, সেই লালিমা

এমন করে নষ্ট করে দিল কে? আর তোমার বেণীবদ্ধ কেশে যে ফুলের মালাটি জড়ানো ছিল, সেও তো খসে গেছে। এটাই বা কে করল?

অপরা রমণী, রাইকিশোরীর সখী উত্তর দিল— সবটাই ওই নীল কমলের রঙের দোষ, অনন্ত পার্শ্বব জনের পাপ যিনি হরণ করেন, অথচ যাঁর নিজের রংটি কালো, সেই কালো রঙের আভাসই এই বিধ্বস্ত অবস্থা করেছে আমার। রাধা নিশ্চিত সংশয়ে বললেন— তা হলে এটা সেই কৃষ্ণেরই কাজ? সখী বলল—কী বলছ তুমি? সবটাই করেছে যমুনা-নদীর কালো জল। নীল যমুনার জলে স্নান করতে গিয়েই আমার এমন ধোয়া-পোঁছা চেহারা হয়েছে। আর কৃষ্ণের কথা বলছ? তাঁকে তো তুমি শুধু একাই ভালবাসো, সখী? কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ? সে একান্তই তোমার—

তেনাশেষ-জনৌষ-কন্ধ্য-মুখা নীলাজ্জভাসা সখি,

কিং কৃষ্ণেন, ন যামুনেন পয়সা কৃষ্ণানুরাগন্তব।।

এই যে একটা কথা— কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ-ভালবাসা, সে তো শুধু তোমার একারই অধিকার, আমরা কে সেখানে? আমি তো শুধু সেখানে তার খবর আনতে গিয়েছিলাম, তাও তোমারই কথামতো, এই কথার মধ্যে যে শ্লেষ আছে, তাতেই বিপ্রতীপ ভাবে স্ত্রীলোকের যৌন অনুভূতিগুলি অদ্ভুত কাব্যময়তায় ব্যঞ্জিত হয়ে ওঠে— যেটা মন্মথ তাঁর কাব্যপ্রকাশে রসধ্বনির প্রকট উদাহরণ বলে মনে করেছেন অনুরূপ একটি শ্লোকে— ‘নিঃশেষ চ্যুতচন্দনং স্তনতটম্’ ইত্যাদিতে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, মন্মথের ধৃত এই শ্লোকটি রাধা-কৃষ্ণের কোনও প্রেম-বৈচিত্র্যও শোনায না, এমনকি এই শ্লোক কোনও প্রথিত কাব্য-মহাকাব্য থেকেও সংকলিত হয়নি। অথচ শ্লোকটি যিনিই লিখে থাকুন, এটি অসামান্য একটি কাব্য-শ্লোক এবং রসশাস্ত্রকারেরা এখানে এক বিদগ্ধা রমণীর অভীষ্টতম নায়কের বহুগামিতার চরিত্র প্রকট করার সঙ্গে-সঙ্গে অন্যতরা এক রমণীর যৌনতার পরিপূর্ণ আশ্বাদনের কথাও উদ্ঘাটন করেছেন।

তবে বলি, এই শ্লোকটিও সম্ভবত কোনও রমণী-কবির লেখা নয়, কিন্তু পুরুষের লেখা এই শ্লোকটির মধ্যেও সারাক্ষণ পাশে থাকা এক সখী যখন দেখে যে, তারই সামনে এক যুগল-প্রেমের স্রোত বয়ে চলেছে অহরহ, অথচ তার জীবন কাটছে শুধুই দূতীর ভূমিকায় অনোর শারীরিক আর মানসিক মিলনের সহায়তা করে, তখন তারও এক সময় ইচ্ছে হয় নিজের যৌবন সার্থক করতে। এই রমণী এত দিন শুধু তার সখীর যৌবন সার্থক করার কাজেই তার সময় ব্যয়িত করেছে অক্লান্ত নিষ্ঠায়, কিন্তু এত দিনে সে বুঝেছে যে, তার সখী যার প্রেমে মত্ত হয়ে আছে, সেই মানুষটি যতই ভাল হোন, তার চরিত্রের মধ্যে একনিষ্ঠার অভাব আছে। আর আজ নিজেকে দিয়েই সে তার প্রমাণ পেল। সখীর প্রেমিকের গুদাসীন্দ্যের খবর নিতে এসে সে তার নিজের প্রতিই সেই পুরুষের ওৎসুক দেখতে পেল। এই অবস্থায় দুই নারী-পুরুষের কাছাকাছি হতে সময় লাগেনি।

কিন্তু তার পর তো সেই সখীর কাছে ফিরে আসা ব্রজপদে। কিন্তু প্রেমিকা রমণী বুঝেছে সব, অথচ সে-কথা এক বারের তরেও সে প্রথমে জানাল না। তার পর যে মুহূর্তে সখী বলল— ‘আমি তো এত করে তোমার প্রেমিককে সাধলাম তোমার কাছে একবারটি আসার জন্য, তবু তিনি এলেন না’— অমনি প্রেমিকার কথার ভোল বদল হয়ে গেল। সে আর সখী-সম্বোধন করল না, এক অসীম প্রতারণার বোধ নিয়ে প্রেমিকা বলল—আর কত মিথ্যে কথা বলবি রে? তুই তো সেই অধম, বাজে লোকটার কাছে যাসইনি। আমি তোকে দূতী করে পাঠিয়েছিলাম তাঁর কাছে, আর তুই কী করলি? তুই এত ক্ষণ ধরে পুরুষিণীর জলে স্নান করে ফিরে এলি নিশ্চয়ই। সত্যিই তুই যাসনি তাঁর কাছে, তা না হলে এই অবস্থা কী করে হয় তোর—‘বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ন পুনস্তস্যধমস্যাস্তিকম্’।

এই শ্লোকে ওই একটা শব্দই সমস্ত ঘটনার বিচ্ছুরণ তৈরি করে দেয়। তুই সেই ‘অধম’ লোকটার কাছে যাসনি, আমি নিশ্চিত। অর্থাৎ প্রেমিকা তার প্রেমিক পুরুষের চারিত্রিক শৈথিল্যের কথা জানে, হয়তো বা এটাও জানে যে, দিনের পর দিন এক নিয়মিত প্রেমের মধ্যে বসবাস করত-

করতে এক দিকে যেমন সেই পুরুষের অন্তঃশায়িনী বহুগামিতার অধম বৃত্তিটুকু প্রকট হয়ে উঠতে পারে, তেমনই তার এই সখী— সেও তো দিনের পর দিন এক যুগল নারী-পুরুষের গাঢ় প্রেমলীলা দেখছে, এক জন প্রেমিকার মান-অভিমান, বিরহ-মিলনের মধ্যে নিরন্তর অংশগ্রহণ করছে সে— তা হলে তার মনের মধ্যে এই সত্যত প্রস্ফুটমান প্রেমের কোনও প্রতিক্রিয়া থাকবে না? অতএব সেই চরম ঘটনাটা ঘটেই গেছে আজ।

চিরকালই আমাদের শাস্ত্র এবং কাব্য-নাটকে সখী-দুতীদের আত্মত্যাগের কথাই আমরা শুনেছি। বিশেষত কৃষ্ণলীলায় একান্ত শাস্ত্রসম্মত ভাবে সখীদের ক্ষেত্রে ‘অখিলরসামৃতমূর্তি’ কৃষ্ণের ভোগ্যভাব স্বীকৃত হয়ে থাকলেও রাধারাণীর সখীরা তাঁদের প্রিয়সখীর রাধার প্রিয়েষণায় কৃষ্ণের ভোগ-স্বভাব পরিহার করেছেন। চৈতন্য-চরিতামৃত্তে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।

কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন।।

কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়।

নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি সুখ পায়।।

রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ-প্রেমকল্পলতা।

সখীগণ হয় তাঁর পল্লব পুষ্প পাতা।।

কৃষ্ণলীলামৃত্তে যদি লতাকে সিঞ্চয়।

নিজ-সেবা হইতে পল্লবদ্যের কোটি সুখ হয়।।

কৃষ্ণলীলার ক্ষেত্রে নায়িকা-সহায়িনী রাধার সখীরা একটা শাস্ত্রীয় তত্ত্ব-বিশেষ, কিন্তু অন্যান্য কাব্য-নাট্যে যাঁরা সখীর ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরা তো কেউ আর তত্ত্বগত ভাবে নায়কের ভোগ্য নারী নন, তাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবে নায়িকার প্রেমে সহায়িনী হন। আমাদের দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক ‘অভিজ্ঞানশকুন্তলম্’-এ নায়িকা শকুন্তলার দুই সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাকে দেখুন। নাটকের তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত শকুন্তলার মুখে তো প্রায় কোনও কথাই নেই, নায়কের সঙ্গে সংলাপ তো দূরের কথা। মাঝে-মাঝে সারা অঙ্কে ‘শৃঙ্গার-লজ্জা’-র আবেশ প্রকট করা ছাড়া শকুন্তলা কথা বললেন কোথায়? অথচ দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রেম ঘটিয়ে দিলেন এই দুই সখী— অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা। তাঁরাই রাজা দুষ্যন্তের সঙ্গে যত কথা বলেছেন, প্রিয়সখী শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্যন্তের শারীরিক মিলন ঘটিয়েছেন সতর্ক প্রহরায়, চতুর্থ অঙ্কে ক্ষিপ্ত দুর্বাসার অভিশাপও সামলেছেন সেই অনসূয়া-প্রিয়ংবদাই। তাঁরাই কিন্তু শাপমুক্তি অভিজ্ঞান দুষ্যন্তের আংটিটি বেঁধে দিয়েছিলেন শকুন্তলার আঁচলে।

কিন্তু শকুন্তলা বোধহয় পতিগৃহে যাত্রার সময়েও আশা করেছিলেন যে, অনসূয়া-প্রিয়ংবদা তাঁর যাত্রাসঙ্গিনী হবেন। পিতা কাশ্যপ কণ্ঠের কাছে তিনি বলেওছিলেন যে, ‘আমার এই দুই সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদা কি এখান থেকেই চলে যাবে ফিরে?’ কণ্ঠমুনি দুই সখীর ভবিষ্যৎ-স্থিতি শুনিয়ে বলেছিলেন শকুন্তলাকে — ‘বাছা! এদেরও তো বিয়ে দিতে হবে। তাই তোমার স্বস্তরবাড়িতে গিয়ে সেখানে এদের থাকাটা শোভা পায় না। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে তো বন্ধা গৌতমী যাচ্ছেন—বৎসে ইমে অপি প্রদেয়ে। ন যুক্তম্ অনয়োস্তত্র গন্তুম্। দ্বয়া সহ গৌতমী যাস্যতি।’

কোথায় আর্ঘ্য গৌতমী? আর কোথায় অনসূয়া-প্রিয়ংবদা? ভবিষ্যতে যখন শকুন্তলা রাজার আংটি হারিয়ে শাপ-বিশ্মৃত রাজার কথায় অপদস্থ, বিপর্যস্ত হচ্ছেন, তখন গৌতমী বিপন্ন শকুন্তলাকে কতটুকু সুরক্ষা দিয়েছেন? সেখানে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা থাকলে রাজনামাক্তি অঙ্গুরিটিই হারাত না। আংটির দায়িত্ব তাঁরাই বহন করতেন। সাথে কী আর শকুন্তলা কণ্ঠমুনির কাছে এই অনুনয়-প্রস্তাব করেছিলেন যে, ‘আমার সখীরা কি এখান থেকেই ফিরে যাবে? তারা যাবে না আমার সঙ্গে?’

কণ্ঠমুনি এই দুই সখীর বিয়ে কবে দিয়েছিলেন, সে খবর কালিদাস আর দেননি, কিন্তু অহোরাত্রি এক যুগলের প্রেম চালনা-করা এই দুই সখীর নিঃস্বার্থ অন্তরের মধ্যে কবে কখন একটুখানি পাওয়ার মতো বিকার তৈরি করেছিল কি না, সেটা রূক্ষ-শুদ্ধ মুনির চিতে ধরা পড়েনি।

রবীন্দ্রনাথ, শকুন্তলার এই দুই সখীর মনের কথা বুঝেছিলেন। তিনি নিরন্তর এই সখীভাবের তাৎপর্য উদ্ঘাটন করে লিখেছেন—“শকুন্তলার সুখসৌন্দর্য গৌরবগরিমা বৃদ্ধি করিবার জন্যই এই দু’টি লাভাণ্যপ্রতিমা নিজের সমস্ত দিয়া তাহাকে বেঁধে রাখিয়াছিল। তিনটি সখী যখন জলের ঘট লইয়া অকালবিকশিত নবমালতীর তলে আসিয়া দাঁড়াইল তখন দুয়ন্তু কি একা শকুন্তলাকে ভালবাসিয়াছিলেন? তখন হাস্যে কৌতুকে নবযৌবনের বিলোলমাধুর্যে কাহার শকুন্তলাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিল? এই দুইটি তাপসী সখী। একা শকুন্তলা শকুন্তলার এক-তৃতীয়াংশ। শকুন্তলার অধিকাংশই অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, শকুন্তলাই সর্বাপেক্ষা অল্প। বারো-আনা প্রেমমালাপ তো তাহারই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিল। তৃতীয় অঙ্কে যেখানে একাকিনী শকুন্তলার সহিত দুয়ন্তুর প্রেমাকুলতা বর্ণিত আছে সেখানে কবি অনেকটা হীনবল হইয়াছিলেন— কোনওমতে অচিরে গৌতমীকে আনিয়া তিনি রক্ষা পাইলেন— কারণ, শকুন্তলাকে যাহারা আবৃত করিয়া সম্পূর্ণ করিয়াছিল তাহারা সেখানে ছিল না। বৃত্তচ্যুত ফুলের উপর দিবসের সমস্ত প্রখর আলোক সহ্য হয় না— বৃত্তের বন্ধন এবং পল্লবের ঈষৎ অন্তরাল ব্যতীত সে আলোক তাহার উপর তেমন কমণীয় কোমলভাবে পড়ে না। নাটকের ওই ক’টি পত্রে সখীবিবাহিতা শকুন্তলা এতই সুস্পষ্টরূপে অসহায় অসম্পূর্ণ অনাবৃত ভাবে চোখে পড়ে যে তাহার দিকে যেন ভাল করিয়া চাহিতে সংকোচ বোধ হয়— মাঝখানে আর্ধ্য গৌতমীর আকস্মিক আবির্ভাবে পাঠকমাত্রেরই মনে মনে আরাম লাভ করে।

আমি তো মনে করি, রাজসভায় দুয়ন্তু শকুন্তলাকে যে চিনিতে পারেন নাই তাহার প্রধান কারণ, সঙ্গে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা ছিল না। একে তপোবনের বাহিরে, তাহাতে খণ্ডিতা শকুন্তলা, চেনা কঠিন হইতে পারে।

শকুন্তলা বিদায় লইলেন, তাহার পর সখীরা যখন শূন্য তপোবনে ফিরিয়া আসিল তখন কি তাহাদের শৈশবসহচরীর বিরহই তাহাদের একমাত্র দুঃখ? শকুন্তলার অভাব ছাড়া ইতিমধ্যে তপোবনের আর কি কোনও পরিবর্তন হয় নাই? হয়, তাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, যাহা জানিত না তাহা জানিয়াছে। কাব্যের কাল্পনিক নায়িকার বিবরণ পড়িয়া নহে, তাহাদের প্রিয়তমা সখীর বিদীর্ণ হৃদয়ের মধ্যে অবতরণ করিয়া। এখন হইতে অপরাহ্নে আলবালে জলসেচন করিতে কি তাহারা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইবে না? এখন কি তাহারা মাঝে মাঝে পত্রমর্মরে সচকিত হইয়া অশোক-তরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোনও আগন্তকের আশঙ্কা করিবে না? মুগশিশু আর কি তাহাদের পরিপূর্ণ আদর পাইবে?

এখন সেই সখীভাবনির্মুক্ত স্বতন্ত্রা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাকে মমরিত তপোবনে তাহাদের নিজের জীবনকাহিনীসূত্রে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি। তাহারা তো ছায়া নহে; শকুন্তলার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এক দিগন্ত হিতে অন্য দিগন্তে অন্ত যায় নাই তো। তাহারা জীবন্ত, মূর্তিমতী। রচিত কাব্যের বহির্দেশ, অনভিনীত নাট্যের নেপথ্যে এখন তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে— অতিপিন্ধ বন্ধলে এখন তাহাদের যৌবনকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না— এখন তাহাদের কলহাস্যের উপর অন্তর্ঘন ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম মেঘমালায় মতো অশ্রুগম্ভীর ছায়া ফেলিয়াছে। এখন এক-এক দিন সেই অন্যমনস্কদের উজ্জ্বলপ্রাঙ্গণ হইতে অতিথি আসিয়া ফিরিয়া যায়। আমরাও ফিরিয়া আসিলাম।”

রবীন্দ্রনাথও অনসূয়া-প্রিয়ংবদার সখিত্ব-ভাবনার মধ্যে ভাবরাজ্যের অনন্ত সম্ভাবনার কথা ফুটিয়ে তুলেছেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে এক রমণীর মন কী ভাবে যমুনার জলে গা ভাসাতে পারে, অথবা সেই ‘অধমে’-র অন্বেষণে গিয়ে এক অভীষ্ট পুরুষগীতে ডুব দিয়ে আসতে পারে, সে কথাটা কালিদাস-রবীন্দ্রনাথের মতো ভব্য কবি তেমন করে বুঝবেন না। কিন্তু বাস্তবে এমনটা অনেক হয় এবং সে কথা পুরুষ কবিরাও যেমন বোঝেন, তেমনই বোঝেন রমণীরা।

এই প্রবাদ তো বার বার শুনেছি যে, পুরুষ-মানুষের তৈরি করা ভাষায় মেয়েদের মনের কথা নাকি প্রকাশিতই হয় না পুরোপুরি। তা এই যে পুরুষ-মানুষ কবিটির যা বক্তব্য, সেখানে এক সখী-ভাব-এক্স

রমণীর আত্মবিষয়িনী রমণীয় ইচ্ছা, সুখ, বিলাস এবং যন্ত্রণা কি প্রকট হয়ে ওঠেনি? আমার তো অবাক লাগে এই কথা ভেবে যে, স্ত্রী-পুরুষের অনন্ত বিভেদের পশ্চিমী মন্ত্র পড়তে-পড়তে আজকে আমাদের দেশের বড় বড় গবেষকও ভাষার মূলে আঘাত করে বসলেন। ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল টমাস হার্ডির-র একটা ‘ইমোশন্যাল এক্সপ্রেশন’ থেকে। হ্যাঁ, হার্ডি-ই এ কথা বলেছিলেন যে, ‘It is difficult for a woman to define her feelings in language which is chiefly made by men to express theirs.’

কিন্তু বিশাল-হৃদয় এই ঔপন্যাসিকের অত্যন্ত সংবেদনশীল এই মন্তব্যটি পরবর্তী কালে নারীবাদিনীরা মোটেই এক রমণীর ভাবাবেগ হিসেবে গ্রহণ করেননি। বিশেষত, তিন জন স্ত্রী-ভাষা-বিশেষজ্ঞ, রবিন ল্যাকফ, ডেল স্পেন্ডার এবং ডেবোরা ট্যানেন ভাষা-সৃষ্টির ক্ষেত্রে পৌরুষেয় প্রাধান্যের অনন্ত তিরস্কার রচনার পরেও স্ত্রীলোকের নিজস্ব ভাষায় কী ভাবে কাব্য, উপন্যাস, নাটক লিখতে হবে, তার সামান্য দিগ্दर्শনও ঘটাতে পারেননি। ১৯৭৫ সালে ল্যাকফ তাঁর ভাষাবিষয়িনী প্রবন্ধটি লেখেন— ‘Language and woman’s place’. তার পর ১৯৮০-তে ডেল স্পেন্ডার-এর বই ‘Man made language’. অবশেষে ডেবোরা ট্যানেন বেশ বিশদে বলেন ১৯৯০-তে — ‘You just don’t understand: Women and Men in conversation’.

এই তিনটি বিখ্যাত বই পড়ার পরেও আমার বার-বার মনে হয় যে, এই মান্য লেখিকাদের মননের গভীরতা ভারতবর্ষীয় প্রাচীনাদের মতোও নয়। ল্যাকফ-এর লেখায় তো শুধু সংশোধনীর ইস্তাহার। এই একটা শব্দ— যেমন ‘woman’ শব্দটা পুরুষেরা কতটা যৌনতার ইঙ্গিতে ব্যবহার করেন এবং ওই শব্দটা ব্যবহার না করে ‘Lady’ শব্দটা ব্যবহার করলেই কতটা সম্মানজনক হত — এই রকম সব সংশোধনীর ইস্তাহার— কথাগুলি প্রতিবাদী ভাবনায় শুধুই এক সংশোধনী-মাত্র। মেয়েদের সাংস্কৃতিক নিজস্বতার প্রয়োজন নতুন ভাষা-সৃষ্টি এখানে সুদূর ভাবেই পরাহত। ধরা যাক, ল্যাকফ লিখছেন—

Perhaps the way in which lady functions as a euphemism for woman is that it does not contain the sexual implications present in woman: it is not ‘embarrassing’ in that way. If this is so, we may expect that, in the future, lady will replace woman as the primary word for the human female, since woman will have become too blatantly sexual. That this distinction is already made in some contexts at least is shown in the following examples :

(a) She’s only twelve, but she’s already woman. *lady

(b) After ten years in jail, Harry wanted to find a woman. *lady

(c) She’s my woman, see, so don’t mess around with her. *lady

আমার ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসা, এই ভাষাটা কি মেয়েদের ভাষা হল? নাকি এটা পৌরুষেয় ভাষার সংশোধনী হল, কিন্তু সে সংশোধনীও এল তথাকথিত ভাবে পুরুষের তৈরি ভাষা থেকেই। আমার আরও আশ্চর্য লাগে এই কথা ভেবে যে, যখনই পুরুষের তুলনায় নারীকে হেয় করা হয়, যখনই উচ্চবর্ণের তুলনায় নিম্নবর্ণের মানুষকে হেয় করা হয়, তখনই সমাধান হিসেবে সেই উদারতম শব্দটার উদাহরণ দিয়ে বলি— আপনারা একটা মেয়ে বলে এই অপমানটা করছেন কেন? শূদ্র-দলিত বলে এই অসভ্যতাটা করছেন কেন? একটা মেয়েকে আগে মানুষ বলে ভাবুন। এক জন দলিত-জনকে আগে মানুষ বলে ভাবুন। আমরা শুধু বলি, অপমান এবং বিপন্নতার সময়ে যখন বার-বার ভেদবাদীরা অভেদাঙ্গী মানুষের কথা বলেন, তখন ভাষাটাকে মানুষই তৈরি করেছে, সেটা বলতে অসুবিধে কোথায়?

দ্বিতীয়ত বলি, ইংরেজি ভাষায় তাৎপর্যময় শব্দের সংখ্যাও বড় কম।



তার মধ্যে আবার শব্দটা যদি blatantly এমন সূচনা দেয়— যেখানে পৌরুষেয় কামনার ‘অবজেক্টিফিকেশন’ তৈরি হয়, ‘পজেসিভনেস’ তৈরি হয়, তা হলে ধরেই নিতে হবে যে, একটি যুবতী মেয়ের মধ্যে কামিতা হওয়ার কোনও বৃত্তি থাকবে না, তার ‘পজেসিভ’ হওয়ারও কোনও ইচ্ছে থাকবে না। অথচ এই দ্বৈতবাদী আধুনিকরাই আবার আক্ষিপ্ত হয়ে বলবেন— মেয়েরা কেন মেয়েদের চাহিদার কথা বলতে পারবে না, তার যৌনতা, যৌন-ইচ্ছার কথা বলতে পারবে না? মেয়েরা নিজের মুখে নিজের কথা প্রকাশ করতে পারবে না কেন? ঠিক এইখানে একটা শব্দই যদি সেই কামনার তাৎপর্য বহন করে, সেখানে সেই শব্দটাই পৌরুষেয় সম্পাদনায় তৈরি হয়েছে— এমনতর ভাবনাটাই আমার কাছে খুব বোকা-বোকা লাগে।

তা ছাড়া শব্দ তো পুরুষ-রমণীর ঐক্যাংশিক ভাবনা নিয়ে তৈরি হয় না। শব্দ সব সময় ব্যক্তি বা বস্তুর সামগ্রিক তাৎপর্য, অথবা তার প্রধান বৃত্তির প্রাধান্যে লোকমুখে তৈরি হয়। তার পর সেই শব্দের মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং প্রজ্ঞার আলোকপাত ঘটলে সেই শব্দের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ঘটতে থাকে। তাতে একই শব্দ অন্য রূপ পরিগ্রহ করে, অথবা তা নতুন, নতুনতর শব্দের সৃষ্টি ঘটায় মানুষের প্রয়োজন-বোধে। অন্তত ভারতবর্ষে শব্দ-সৃষ্টির পরম্পরা এই রকমই। বিশেষত সংস্কৃতে অনন্ত শব্দ ক্রিয়াপদ বা ধাতু থেকে তৈরি হয় বলেই শব্দ আরও গভীর অর্থ বহন করে এবং শব্দের সংখ্যাও তাতে অনেক বেড়ে যায়। আর ঠিক এই কারণেই ইংরেজি শব্দভান্ডারের দৈন্য আমাদের ব্যথিত করে, বিদ্ধ করে।

সবচেয়ে বড় কথা হল— সামাজিক এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনে সৃষ্ট মানুষের ভাষার মধ্যে কোন শব্দটা এক রমণীর যৌনতাবাহিতার সূচনা তৈরি করে, আর কোন শব্দটা তার সামাজিক মর্যাদাবাহিতার ইঙ্গিত দেয়, এই শব্দ-শুচিতা অথবা শুচি-বাতিকও ভারতবর্ষীয় কোনও ভাষায় নেই। তবু আজকাল যাঁরা আমাদের ভাষার মধ্যেও পৌরুষেয়তার আবেশ দেখতে পাচ্ছেন, তাঁরা হয় আমাদের ভাষার শব্দ-গভীরতার কথা জানেন না, নয়তো তাঁরা ওই বিদেশি পশ্চিমী সভ্যতার বিভেদকামী সংস্কৃতির

ধ্বজাধারী যান্ত্রিক মানুষ। মনে রাখতে হবে যে, ভারতের জন-জাতি এক বহু-প্রাচীন সভ্যতার পরম্পরা বহন করে জীবন বাহিত করে। হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে সামাজিক ভেদাভেদ ছিল না, এমনটা কখনওই নয়, স্ত্রী-পুরুষের কর্মগ্যতার বিভেদে পৌরুষেয়তারও প্রাধান্যও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু তাই বলে এটাও নয় যে, মেয়েরা মেয়েদের কথা বলতে পারেনি কখনও, অথবা ব্যক্ত করতে পারেনি তাদের অন্তর্ভেদী যন্ত্রণার কথা। আর প্রতিবাদ? প্রতিবাদ যে কতটা হয়েছে, সেটা আমরা হয়তো জানাবও কিছু কিছু। এমনকি জানাব মেয়েদের মুখে তাদের অন্তর্গত যৌনতার অন্বেষণও।

কিন্তু সবার আগে আমার মানস-কথা জানিয়ে বলি— মেয়েদের কথা বলার জন্য মেয়েদের নতুন একটা ভাষা তৈরির প্রয়োজনে ল্যাকফ, স্পেন্ডার এবং ট্যানেন-এর মতো বিদূষীরা যে বিচিত্র সংশোধনী দিয়েছেন, সেগুলি দিয়ে খানিক ভাষা-সৃষ্টির অকর্মণ্য দাঙ্গিকতা দেখানো যেতে পারে, কিন্তু সেগুলি দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা যাবে না, সাংস্কৃতিক মধুরতা তো দূরের কথা। তবু এ দেশের সভ্যতার সৌভাগ্য এটা যে, ১৯৭০ সাল থেকে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন আমাদের দেশে ভাল ভাবে আছড়ে পড়লেও মেয়েদের স্বাধিকার এবং নিরাপত্তার ব্যাপারটা সাংবিধানিক এবং আইনি পথেই সমাহিত হয়েছে। এটা অবশ্যই আন্দোলনের সুফল।

কিন্তু আমাদের দেশে পশ্চিমী অনুকরণের প্রবৃত্তি এবং অনুবৃত্তি এত বেশি যে, অনেকাণেক বিশ্ববিদ্যালয়ে জেভার স্টাডিজ, উইমেন স্টাডিজ-এর বিভাগ তৈরি হয়ে গেল, লাইব্রেরিতে বিদেশি বই ভরে গেল। কিন্তু গবেষণার কাজের সময়ে দেখলাম— যেমনটা আমাদের কমিউনিস্টরা বিদেশি শ্রমিক-কৃষকের যন্ত্রণা, তাঁদের ক্ষুধা, সামাজিক অবিচার আমাদের দেশের শ্রমিক-কৃষক এবং গরিব মানুষদের ওপরে সমারোপ করে নানা আন্দোলন গড়ে তুললেন, তেমনিই অভিজাত নারীবাদীরা কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিদ্বৎসভায় মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রাদ্ধ করে রামায়ণ-মহাভারতের সীতার কষ্ট, দ্রৌপদীর কষ্ট, সমগ্র ভারতবর্ষের বিবাহিত এবং অবিবাহিত রমণীদের নানা যন্ত্রণার কথা

তুলে ধরতে আরম্ভ করলেন— পশ্চিম আদলে, বিশেষত আমেরিকার সত্যত বিভেদকামী অযৌক্তিক অত্যাধুনিকতার আদলে। তাঁরা যে সর্বত্র ভুল অভিযোগ তুললেন, তাও নয়। আবার সব সময় যে নির্ভুল বললেন, তাও কিন্তু নয়। সমস্যাটা তাঁদের পড়াশোনার বহর নিয়ে এবং অবধারিত ভাবে এই কথাটাও বলতে ইচ্ছে করে যে, এখনকার সমাজ-সংশোধনের জন্য, এখনকার পুরুষদের বিরুদ্ধে প্যাট্রিয়ার্কি-র দুয়ো দেওয়ার জন্য রামায়ণ-মহাভারতের উদাহরণ টেনে আনবেন না। কারণ, ওগুলি আপনারা তেমন ভাল বোঝেন না, আর বুঝলেও বেশ ভুল বোঝেন। সবচেয়ে বড় কথা, সমস্ত সমাজের তৎকালীন প্রয়োজনীয়তা থেকেই সামাজিক আইন এবং প্রথা তৈরি হয়। বিশেষত আমরা তো মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের কথা মেনে আধুনিক জীবন অতিবাহিত করি না। মনুর ভাবনা-মতে, ব্রাহ্মণ্যের অনুশাসনে যাগ-যজ্ঞ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি দাসত্বের মধ্যেও পুরুষতান্ত্রিকতা তৈরি হয়েছিল, সেটা সেই সময়কার চাহিদা মতোই হয়েছে। পুনশ্চ সেই পুরুষতান্ত্রিকতা যে হাজার-দু'হাজার বছর টিকে রইল, সেটাও নিশ্চয়ই সমাজই চেয়েছে।

কিন্তু আজকের দিনে তো আমরা মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের নির্দেশ মেনে চলি না এবং চলতে চাইও না। ফলত আইনও কিন্তু সমাজের চাহিদা মতোই তৈরি হয়েছে। আজকের দিনের আইনে ৪৯৮ ধারা অথবা ৪৯৮-এ— এ সব তো আজকের সমাজের প্রয়োজনই হয়েছে, মনু-যাজ্ঞবল্ক্য কিংবা মহাভারত-রামায়ণে তো এই ধারার প্রয়োজনই ছিল না, কিংবা মেয়েদের উপর শরীরিক অত্যাচার করা, মেয়েদের গায়ে হাত তোলা, তাদের মানসিক কষ্ট দিয়ে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া, এ সব প্রসঙ্গ ছিল না বলেই পুরুষের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠেনি। এ প্রসঙ্গে রামায়ণী নায়িকা সীতার প্রসঙ্গ আপনারা দয়া করে তুলবেন না, কেননা মহাকাব্যের ব্যাপ্ত জগতে যা ঘটে, তার কারণগুলি ব্যক্তিগত জগতের মধ্যে থাকে না, বিশেষত সীতাকে অহেতুক সন্দেহ করার শাস্তি রামচন্দ্রকে কী ভাবে দেওয়া হয়েছে, সেটা বোঝার জন্য মহাকাব্য পড়ার সর্বতোব্যাপ্ত দার্শনিক যোগ্যতা চাই এবং চাই কবিজনোচিত এক সমবাসী হৃদয়, যেখানে প্রতিবিস্তিত হতে পারে মহাকাব্যের ক্রোধবিরহী কবির মানসকল্প। তিনি যে কখন নিঃশব্দে তাঁর প্রশ্রয়লালিত নায়কের পাশ থেকে সরে গিয়ে মিত-সূক্ষ্মভাষিণী নায়িকা সীতার পাশে দাঁড়িয়ে গেছেন, সেটা বুঝলে এটাও বুঝবেন যে, মহাকাব্যিক পৌরুষেয়তার বিরুদ্ধে সেইখানেই মহাকাব্যিক প্রতিবাদের অভিসন্ধি তৈরি হয়ে যায়।

মহাকাব্যে মেয়েদের প্রতিবাদ কী ভাবে হয়েছে এবং কতটা হয়েছে, এখানে তার বিশদ বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজনই বোধ করছি না, কেননা প্রগতিবাদিনী যত তথাকথিত মনস্বিনী আছেন, তাঁরা পূর্বাচ্ছেই বুঝে রেখেছেন যে, পুরুষ-কবির পৌরুষেয় ভাষায় মেয়েদের মন বোঝাতেই পারেন না। নিজে বোঝা তো দূরের কথা। আমরা মনে করি— কাব্য-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে পুরুষের ভাষা কিংবা মেয়েদের ভাষা বলে কিছু হয় না। মেয়েদের চোখে অথবা পুরুষের চোখে বিষয়-ভিত্তিক কিছু পার্থক্য হতেই পারে, এটা তবু মনে করি যে, যিনি উদার-হৃদয় মহাকবি, তিনি মেয়েদের হৃদয় মেয়েদের থেকেও বেশি বুঝতে পারেন এবং তাঁর প্রসন্নোদার ভাষা-ব্যবহার এতটাই সূষ্ঠ এবং সমৃদ্ধ হতে পারে, যেখানে মেয়েদের চোখ, কিংবা মেয়েদের ভাষার কোনও পৃথক তাৎপর্য যুক্তিহীন অনর্থক আড়ম্বর বলে মনে হয়।

যদি এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথকেই শুধু উদাহরণ এবং প্রত্যুদাহরণ হিসেবে ভাবা যায়, তা হলে ব্যক্তিগত কথালোপে চিত্রপরিচালক প্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষের কথাটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। ঋতুপর্ণ বলেছিলেন— রবীন্দ্রনাথ মূলত এক জন মহিলা কবি, তিনি মহিলাদের কবি। আমি উত্তরে বলেছিলাম— এ-বিষয়ে চৈতন্য মহাপ্রভুকে তা হলে প্রাগ্রসর গুরু বলে মানতে হয়, বিশেষত তাঁর ভাব-জগতে ‘রাধাভাব’ এমনই এক অপূর্ব-নির্মাণ, যেখানে গভীর মধুর প্রেম শুধু রাধার মধ্যেই সমাহিত। কৃষ্ণের মতো ‘অখিল-রসামৃত-মূর্তি’ এক প্রেমিক পুরুষও এখানে প্রেমের কোনও আদর্শ নন। চৈতন্যের ভাবরাজ্যে রাধা কী ভাবে কৃষ্ণকে দেখছেন, সেটাই প্রেমের উদাহরণ। কৃষ্ণ এখানে রাধা প্রেমের বিষয়-মাত্র।

সবচেয়ে বড় কথা, এই রাধাপ্রেমের ভাষা কিন্তু একান্ত ভাবেই পুরুষের তৈরি। সে পুরুষ এমনই এক প্রেমিক কবি, যিনি মেয়েদের থেকেও, মেয়েদের মন বোঝেন বেশি এবং এই পুরুষ কবির মনে করেন যে, সেই মহানায়ক কৃষ্ণকেও যদি তাঁর তদগত কৃষ্ণপ্রেম বুঝতে হয়, তা হলে সেটা রাধার হৃদয় দিয়েই বুঝতে হবে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য এবং রসতত্ত্বে চৈতন্য মহাপ্রভুর এই রাধাভাব এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ যে, প্রেমের ক্ষেত্রে অভীষ্ট পুরুষকে পাওয়া, না-পাওয়া, মিলন-বিরহ, প্রার্থনা-প্রত্যাখ্যান— সব কিছুই এক কৃষ্ণপ্রেরণা রমণীর হৃদয় দিয়েই অনুভবযোগ্য হয়ে উঠেছে। ফলত আমাদের পুরুষ কবিরও অনেকেই রমণীর হৃদয় দিয়েই প্রেমের কবিতা লিখেছেন এবং সে কবিতার ভাষাও তদুচিত ভাবে রমণী-হৃদয়ের দুঃখ, অভিমান, সাময়িক কাঠিন্য এবং কোমল মাধুর্য বহন করে।

পশ্চিম দেশের সাহিত্যেও অনেক পুরুষ কবি-সাহিত্যিকই যে মেয়েদের উপযুক্ত ভাষাতেই রমণীর হৃদয় উন্মোচন করেছেন— এই সশ্রদ্ধ স্বীকারোক্তিটুকু ফরাসি ভাষার এক মহিলা গবেষকের কথায় ফুটে উঠেছে— ফরাসি ভাষায় লেখা সেই বিখ্যাত গ্রন্থে ‘উইমেন অন লাভ: এইট সেঞ্চুরিজ অব ফেমিনাইন রাইটিং’। গ্রন্থটি লিখেছেন ইভলিন সালেরো। মূল ফরাসিতে লেখা ‘Histoire et mythologie de l'amour’- গ্রন্থটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন হেলেন আর লেন।

এখানে গ্রন্থটিরই প্রথম পাতার প্রথম পরিচ্ছেদেই ইভলিনের সেই অকপট স্বীকারোক্তি এবং কৃতজ্ঞতা। ইভলিন লিখেছেন— ‘In French literature, the passionate cries of women in love have come from men: the names of phèdre, Bérénice, Madam de Mortsau, Madame de Rênal, Emma Bovary, are Racine, Balzac, Stendhal or Flaubert.’

ইভলিনের এই অসামান্য স্বীকৃতিটুকুই আমাকে মুগ্ধ করে তোলে— আমি তখন নিদ্বিধায় বলতে পারি যে, আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অনেক পুরুষ কবিই মেয়েদের ভাষা বুঝতেন এবং বুঝতেন মেয়েদের হৃদয়। বিশেষ করে যে পুরুষ-কবি নিজেই প্রেমে পাগল হয়ে আছে, সে তার কণ্ঠলগ্না প্রিয়র হৃদয় বুঝবে না, তার ভাষা বুঝবে না, সেটা হয় নাকি? বিশেষত প্রেমে পড়ার সমকালে, যেখানে প্রেমিকা অবাস্তর কোনও কথা বললেও মনে হয়, কেন বলল এবং কথা না বললে মনে হয়, কেন বলল না, সেই সময় পুরুষ যদি এক রমণীর মুখের ভাষা, চোখের ভাষা এবং হৃদয়ের ভাষা নাই বুঝতে পারে, তা হলে তার প্রেমিক হওয়াই সাজে না, তিনি কবি হবেন কী করে!

আমি অবশ্য কবি আর প্রেমিকের মধ্যে কোনও তফাত বুঝি না— আমাদের রসশাস্ত্রকারেরাও তো একই কথা বলেছেন। আনন্দবর্ধনের কতো ‘অলঙ্কার-সরণির ব্যবস্থাপক’ পূর্বাচার্যদের কথিত উক্তি উদ্ধার করে বলেছেন— কবি যদি শৃঙ্গার-চেতনায় উজ্জীবিত হন, তবেই সম্পূর্ণ জগৎ তাঁর কাছে রসময় হয়ে ওঠে— ‘শৃঙ্গারী চেৎ কবি কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ’। আর ঠিক এই রকম এক রস-চমৎকৃতি-সমন্বিত কাব্য-কবিতার মধ্যে দয়া করে পুরুষ-মহিলার চেতনা-ভেদ, কবিত্ব-ভেদ এবং ভাষাভেদ না করাই ভাল! আরও ভাল হয়, যদি তথাকথিত প্রগতিময়ী এবং প্রতিভাময়ী বক্তৃতার মধ্যে ওই সব বিচিত্র শব্দগুলি — ‘অবজেক্টিফিকেশন’, ‘কমোডিফিকেশন’— ইত্যাদি যদি সাময়িক ভাবে বর্জন করেন। কেননা কাব্য বিষয়ক চর্চা-চমৎকারের মধ্যে, আরও সহজ করে বললে— ‘রোম্যান্টিক’ কবিতার মধ্যে যদি মাঝে মাঝেই এই সব ‘অবজেক্টিফিকেশন’, ‘কমোডিফিকেশন’-এর কথা আসে, তা হলে সেটা কতটা বিরক্তিকর ভাবে বিসদৃশ হয়, তা প্রকাশ করেছেন সংস্কৃত সাহিত্যের এক তীক্ষ্ণভাষী কবি। তিনি লিখেছেন— রসসমন্বিত শ্লোক আশ্বাদনের সময় যারা শ্লোকান্তর্গত শব্দের উৎপত্তি নিয়ে ভাবতে বসে, তাদের সঙ্গেই তুলনা হয় সেই সব পাটোয়ারি-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের, যারা নিবিড় মিলন-উৎসুক রমণীর দেহবস্ত্র উন্মোচন করার সময় সেই বস্ত্রের দাম কত, সেটা নিয়েই বেশি মাথা ঘামান— ‘নীলী-বিমোক্ষণ-বেলায়াং বস্ত্র-মৌল্য-বিচিন্তকাঃ’।

আরও একটা কথা ভেবে দেখার মতো। দেখুন, স্ত্রী-পুরুষের

সাধারণী বৃত্তিতে যে কামনার ক্ষেত্র তৈরি হয়, সেটা নারী-পুরুষের একই রকম। তবে সেই কামনার কথা বেশির ভাগ পুরুষই তাদের ‘আকার-ইঙ্গিত-চেষ্টা’-র মাধ্যমে যত প্রকট ভাবে প্রকাশ করতে পারে বা করে, বেশির ভাগ মেয়েরাই সেটা পারে না এবং তার কারণ নাকি হাজার হাজার বছরের ‘সোশ্যাল কন্ডিশনিং’ অথবা আরও একটা ভাষা, যেটা সিমোন দ্য বোভোয়ার-র মতো প্রাজ্ঞ বিদূষীর তৈরি— ‘দ্য কালচারাল প্রেসিং অব সেক্স’। তবে এ বিষয়টা সম্পূর্ণ মেনে নিয়েও বলি— আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রমণীরা নিজের মনের কথা, এমনকি নিজের যৌন সদিচ্ছার কথাও অনেকেই অনেক সময় বেশ সোচ্চারে বলতে পেরেছেন। আর আমার পূর্বোক্ত পছন্দের গবেষক ইভলিন-ও দেখিয়েছেন যে, মধ্যযুগের ফরাসি রমণীরাও এ বাবদে কম যান না এবং আমি তাঁর সঙ্গে একমত যে, অনেক পুরুষও মেয়েদের মনের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আমি যখন পৌরুষেয় রাধাভাবের উল্লেখ করেছিলাম, সেখানেও আমার পুরুষ কবিদের দোসর হলেন গুস্তাভ ফ্লব্যের, যিনি তাঁর বিখ্যাত ‘মাদাম বোভারি’ লেখার পরবর্তী সময়ে এমা বোভারির বিপর্যস্ত যৌনজীবনের কথা মনে রেখেও মন্তব্য করেছেন— ‘মাদাম বোভারি ইজ মি’।

অতএব পুরুষ কবি-সাহিত্যিকরাও মেয়েদের কথা লিখতে পারেন, সার্থক বর্ণনা দিতে পারেন তাদের সুখ-দুঃখ যন্ত্রণার। আর যারা ভাবেন যে, মেয়েরা তাদের দুঃখ-যন্ত্রণার কথা কোনও ভাবে ব্যক্ত করে ফেলতে পারলেও নিজেরদের শরীর কিংবা তাঁদের যৌনতার কথা বলতে পারতেন না, তাঁদের ব্যাপারে সিমোন দ্য বোভোয়ার-র বিপ্রতীপে ইভলিন বড় সন্দর্ভক মন্তব্য করে বলেছেন—

This ardent sensuality is expressed in a way that comes as a surprise: It is not at all what we would expect from the psychoanalytic theories that were first propounded at the end of the nineteenth century and have subsequently ruled almost the whole of twentieth-century thought on the subject. Ingenuously, being familiar neither with Freud nor with Simone de Beauvoir, women express themselves as subjects, and speak of their lovers as objects, the objects of their desires, the objects of their fantasies, the objects of their daydreams. They “take him in their arms” (and never the contrary), they “make their breast a cushion for him” (and never the opposite), they “give him the kiss of love” (and never receive it first), they promise themselves to “hold him in their power,” they take “their pleasure of him.”

ইভলিনের এই বার্তার নিরিখে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে স্ত্রীলোকের শৃঙ্গার-সুখের কথা, যা তাঁদের নিজের মুখ থেকেই বেরিয়েছে, সেটা এখন প্রকাশ করার সময় এসেছে। এতকাল আমি এ বিষয়ে সঙ্কুচিত ছিলাম। ভেবেছিলাম— সে সব কথা লিখলেই আমার পরিণতি নিয়ে নিন্দুক জনের জিহ্বা আরও মসৃণ হবে। তাঁরা বলতে থাকবেন— লোকটা রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে ছিল ভাল, হঠাৎ এটা তার কী ধরনের ভীমরতি হল যে, আজ তিনি দেখাচ্ছেন, শৃঙ্গার-চেতনায় আবিষ্ট রমণী তাঁর মনের কথা নিজের মুখেই বলছে। বিশ্বাস করুন, আমি প্রথমে ভেবেছিলাম— আমি এই বিষয় নিয়ে জলে যদি বা নামি, বেণী ভিজাব না। অর্থাৎ ঠাণ্ডা-ঠোণ্ডা কথার বলব ভেবেছিলাম।

কিন্তু মাঝখানে হঠাৎই ফেমিনিস্টদের সেই সুচিন্তিত ঘোষণা শোনা গেল— ‘মাই বডি মাই চয়েস’। ঘোষণাটার প্রধান তাৎপর্য কিন্তু যতখানি মেয়েদের নিজের কথা নিজে বলার মধ্যে, তার চেয়ে অনেক বেশি একটা সোচ্চার স্বাধীনতার মধ্যে— যেখানে মেয়েরা বলতে পারে— আমার মাথায় বুদ্ধি আছে এবং যে কোনও বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত আমিই নিতে পারি এবং আমার জননাঙ্গ আছে, সেখানে আমি সন্তান ধারণ করব, নাকি করব না, কিংবা আমি অ্যাবরশন করব, নাকি করব না, সে

ব্যাপারে আমিই সিদ্ধান্ত নেব।

আমি দেখলাম— এই ঘোষণা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং অত্যন্ত সমর্থনযোগ্য বিষয় এবং এই সিদ্ধান্তের মধ্যে আমার নাক গলানোর কোনও ক্ষমতা নেই। যুগপৎ এটাও আবিষ্কার করলাম যে, এই ঘটনা যেন সমস্ত পুরুষের অতিপৃথক এক স্বার্থ-জগতের অধিবাসী করে তুলছে, তাদের আত্মীকৃত একান্ত চেতনা যেন সমস্ত পুরুষকে ‘অ্যালিয়েন্ট’ করে দিচ্ছে। বাস্তবে এটা আমরা এত দিনে বুঝে ফেলেছি যে, বিভেদ তৈরি করার একটা অতি সযৌক্তিক এবং সপ্রতিভ দিকও আছে, যেখানে খুব সন্দর্ভক উপায়ে এই ‘অ্যালিয়েনেশন’ তৈরি করা যায় এবং সেটাকে খুব সুন্দর ভাবে ‘লেক্টিস্ট লিবারালিজম’-এর মতো এক দার্শনিক পরিসরের মধ্যে সুস্থিতও করা যায়।

এই পরিসরে মেয়েদের প্রসঙ্গ সবার আগে আসে এবং সেখানে তাঁদের অঙ্গসজ্জা, ভাষা, শারীরিক এবং মানসিক স্বতন্ত্রতার জায়গাগুলি রাষ্ট্রযন্ত্র এবং আইনপ্রণেতাদেরও এত সযৌক্তিক ভাবে অভিভূত করে ফেলেছে, যাতে এখন ‘চেয়ারম্যান’ শব্দটার মধ্যে শুধু ‘ম্যান’ কথাটা যুক্ত আছে বলে মেয়েদের স্বাধিকারে আঘাত লাগল। ফলে ‘চেয়ারম্যান’ অবশেষে ‘চেয়ারপার্সন’ হলেন Mr. এর বৌ Mrs. হলেও অপমান। Miss-Mrs.-এর তফাত করা চলবে না। আবিভূত হলেন Ms. আর মার্কিন-মুলুকে He এবং She-ও জেভার বায়াসের বিপাকে পড়ে নতুন সন্তান ধরা দিয়েছেন। বাবা হলেন ‘পেরেন্ট নান্সার ওয়ান’ এবং মা হলেন ‘পেরেন্ট নান্সার টু’। নাকি এ দু’টির ক্রমনির্ণয় ঠিক হল না, ওয়ান-টু উল্টো হওয়া উচিত, কারণ ‘টু’ ব্যাপারটা মানহানিকর। তবু বাঁচোয়া, মা আর ‘মাদার’-এর মতো অপমানজনক অভিধায় চিহ্নিত হলেন না, তিনি এখন Birthing parent নামে সম্মানিত বোধ করতে লাগলেন। মা সন্তানকে ‘ব্রেস্ট মিল্ক’ খাওয়ালেও অপমান, সন্তানের এখন ‘হিউম্যান মিল্ক’ খেয়ে মায়ের স্তন্যাক্ষণ শোধ করে দিচ্ছেন।

আমার শুধু জিজ্ঞাসা, এই ভাষা ব্যবহার করে কি সাহিত্য রচনা করা যাবে? নাকি সমাজ বদলে দেওয়া যাবে এই ভাষায়? ভাগ্যি মানি, আমাদের দেশের প্রগতিবাদিনীরা এখনও পর্যন্ত মা-কে মা বলার মধ্যে তেমন অপমান খুঁজে পাননি। হয়তো বা ভয়বশতই এটা তাঁরা বুঝেছেন যে, এ দেশে মা-কে মা বলা বন্ধ করতে বললে এখানকার অতিশিক্ষিত প্রগতিশীলারাও ক্ষিপ্ত হয়ে যাবেন। বিশেষত মা কালী যদি এক বার Birthing Goddess হিসেবে চিহ্নিত হন, তা হলে মা লক্ষ্মী অথবা সরস্বতী মায়েরদের যে কী অনুবাদ হবে, এবং তাতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং কবি রামপ্রসাদের যে কী গতি হবে, তা ভাবতে ভয় হয়।

আজকাল হয়তো বা অনেকেই এটা বুঝতে আরম্ভ করেছেন যে, অতিরিক্ত স্ত্রী-স্বাধীনতার অতিচেতনাও কিন্তু এক ধরনের বিপ্রতীপ বিভেদ তৈরি করে এবং এই কথাটা ও দেশে ‘ব্ল্যাক-হোয়াইট’দের সম্বন্ধেও যেমন প্রযোজ্য, তেমনই প্রযোজ্য এ দেশের হিন্দু-মুসলমানের ভাবনায় অথবা উচ্চ-নীচের জাতি ভাবনায়। সবচেয়ে বড় কথা, যে দেশে পাঁচ হাজার বছরের ‘সিভিলাইজেশনাল কালচার’-এর পরম্পরা চলছে, সেখানে কায়মনোবাক্যের মধ্যে যদি স্ত্রীলোকের পৃথক ভাষা, স্তন-জঘনের অতিচেতনা অথবা অচেতনা, স্ত্রী-ভাব অথবা স্ত্রী-স্বভাবের নগণ্যতা নিয়ে অতিভাবনা তৈরি হয়, তবে সেটা বিপ্রতীপ ভাবে অন্যতর এক বিভেদের জন্ম দেয়, সেটাকে আজকাল ‘রিভার্স ডিসক্রিমিনেশন’ বলে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে। অন্য দিকে ব্ল্যাক-হোয়াইট অথবা আমাদের দেশে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র-দলিত নিয়ে যেটা ইতিবাচক অতিচেতনা, তাকে এখন বলা হচ্ছে ‘রিভার্স রেসিজম’।

এই প্রসঙ্গের ইতি টানার আগে আমি এক বিশ্ববিখ্যাত রাজনৈতিক নেতার বক্তব্য থেকে একটি বড় উদ্ধৃতি দিতে চাই। ইউক্রেন যুদ্ধের পূর্ব পর্যায়ে ২০২১-এর ২১ অক্টোবর রাশিয়ার ‘ভালদাই ডিসকালশন ক্লাব’-এর প্লেনারি সেশন-এ আলোচনার বিষয় ছিল ‘গ্লোবাল শেক-আপ ইন দ্য টোয়েন্টিফার্স্ট সেন্টিরি’। চার দিনের এই আলোচনা সভার অন্যতম প্রধান বক্তা ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিন। আমি তাঁরই সুচিন্তিত এবং বৃহৎ বক্তব্যের মাঝখান থেকে একটি বৃহৎ উদ্ধৃতি এখানে



যোজনা করছি আমার সহৃদয় পাঠকদের ধৈর্যশীল অবধানের জন্য—

॥ ২ ॥

... Zealots of these new approaches even go so far as to want to abolish these concepts altogether. Anyone who dares mention that men and women actually exist, which is a biological fact, risk being ostracised. “Parent number one” and “parent number two,” “birthing parent” instead of “mother,” and “human milk” replacing “breastmilk” because it might upset the people who are unsure about their own gender. I repeat, this is nothing new; in the 1920s, the so-called Soviet Kulturtraegers also invented some newspeak believing they were creating a new consciousness and changing values that way. And, as I have already said, they made such a mess it still makes one shudder at times.

Not to mention some truly monstrous things when children are taught from an early age that a boy can easily become a girl and vice versa. That is, the teachers actually impose on them a choice we all supposedly have. They do so while shutting the parents out of the process and forcing the child to make decisions that can upend their entire life. They do not even bother to consult with child psychologists — is a child at this age even capable of making a decision of this kind? Calling a spade a spade, this verges on a crime against humanity, and it is being done in the name and under the banner of progress. ...

এখান থেকেই বোধহয় আমরা কবিতার প্রসঙ্গ তুলে দিতে পারি— যে-কবিতা মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষরা লেখে অথবা পুরুষ সম্বন্ধে লেখে মেয়েরাও। পুরুষের কামনা এবং তার কামনার ভাষা কেমন হতে পারে, সেটা আমাদের জানা এবং বহুকথিতও বটে। কিন্তু মেয়েদের কামনার মাত্রা অথবা কামনার স্বয়ংপ্রকাশে তাঁদের ভাষা কেমন মধুর-মোহিনী ব্যঞ্জনায় কাব্য-সাহিত্যের আত্মা তৈরি করে, সেটাও আমরা দৃষ্টান্ত সহকারে দেখব। তাই বলে এটাও কিন্তু ভাববেন না যে, মেয়েদের মনের কথা, তাদের শৃঙ্গারোত্তরা ভাবনার কথা মেয়েরাই শুধু বলতে পারে, পুরুষরা তা পারে না।

এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যার কথা হল কবিতার বিষয়। কোনও মহাকবির কবিতার বিষয় শুধু নদী, পাহাড়, সমুদ্র কিংবা পত্র-পুষ্প অথবা বৃক্ষ-লতা নয়, এমনকি কাব্য-নাটকে বিভিন্ন রস-বিস্তারের ক্ষেত্রেও ক’জন মহাকবি ভয়ানক রস কিংবা বীভৎস রসের বর্ণনায় হাত পাকিয়েছেন? অথবা যদি হাত পাকিয়েও থাকেন, তা হলে সেই কাব্য বা কাব্যাংশ ক’জন সহৃদয়ের অন্তর স্পর্শ করেছে? কোনও সন্দেহ নেই যে, ভয়ানক কিংবা বীভৎস যেমন বর্ণনায় তথা নাট্যরূপে সহৃদয় জনের রসাস্বাদনযোগ্য হয়ে ওঠে— যেমন সিনেমায় হিটলারের অত্যাচারের চিত্র দেখে আমরা শিউরে উঠি অথবা মনুষ্যশব শিয়াল-শকুনে খুবলে খাচ্ছে— এমনটা দেখে মনে যে বীভৎসতা জাগে— এ সব ক্ষেত্রে শিউরে ওঠা বা ঘৃণায় চক্ষু মুদে ফেলা পর্যন্তই আমাদের রস-চর্চণা তৈরি হয়। কিন্তু এমন রসাস্বাদন তো মনোহরণ নয় কখনওই, এমনকি তার স্মৃতিও আমরা উপেক্ষা করি।

কিন্তু এই তুলনায় করুণ রস কিংবা বীর রস অনেক বেশি উপভোগ্য, হাস্য কিংবা অদ্ভুত রসও তাই। কিন্তু সমস্ত রসের মধ্যে তথাকথিত শ্রেষ্ঠ সাদ্বিক শাস্ত রসই বা ক’জনের মনে দাগ কাটে? হয়তো

এই কারণেই ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন যখন শৃঙ্গার-রসের প্রসঙ্গে আসেন, তখন খুব জোর দিয়ে বলেন যে, শৃঙ্গার-রসই একমাত্র মধুরতম রস, যা মনকে সবচেয়ে বেশি এবং সর্বতোভাবে আল্লাদিত করে। ফলস্বরূপ শৃঙ্গারময় কাব্যের মধ্যেই সমস্ত মাধুর্যের প্রতিষ্ঠা—

শৃঙ্গার এব মধুরঃ পরঃ প্রহ্লাদনো রসঃ।

তন্ময়ং কাব্যমাস্ত্রিত্য মাধুর্যং প্রতিতিষ্ঠতি॥

সত্যি কথা বলতে কী, আমরা শৃঙ্গার-বিষয়ক কবিতার কথাই বলতে চাই, যেখানে ভারতবর্ষের মহিলা কবিদের এক-একটি চার লাইনের কবিতা-মুক্তকও আমাদের শ্রেষ্ঠতম রসশাস্ত্রকার আলঙ্কারিকদের কাব্য-বিষয়ক উদাহরণ-প্রত্যাধরণ হয়ে ওঠে। আর সেই শ্রেষ্ঠতা বোঝানোর জন্য সেই কবিরা যেহেতু নর-নারীর শৃঙ্গার-মধুরতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, তাই শৃঙ্গারের অতি-বিলক্ষণ প্রাধান্যটুকুও আমাদের প্রথম আলোচ্য হওয়া উচিত। কথাটা আমাদের অতিগভীর রসশাস্ত্রীয় সংবাদেও বোঝানো যায়।

সংস্কৃত শব্দ-শাস্ত্রের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল— এখানে শব্দ থেকে শব্দ তৈরি হয়। ফলে নূতন-সৃষ্ট শব্দের মধ্যে শব্দের মৌল অর্থটা খানিক শক্তি হারিয়ে সেই শব্দের নতুন অভিসন্ধি তৈরি করে। এমনই এক মধুর শব্দ হল ‘শৃঙ্গার’। শৃঙ্গার শব্দের অন্তর্গত ‘শৃঙ্গ’ কথাটার মানে তো ‘শিং’ যা দিয়ে পশু রাজ্যে চুলকানোর কাজ চলে, আর ইংরেজিতে শিং হল ‘horn’। এবারে যদি ইংরেজি শব্দটার শিং বাগিয়ে ধরি, তা হলে ওই ‘horn’ থেকে যখন ‘horny’ শব্দটা আসবে, তখন কিন্তু পশুজগৎ ছেড়ে এই মনুষ্যলোকে এসে দেখবেন, এক জন ব্যক্তি, সে পুরুষও হতে পারে, নারীও হতে পারে, সে কিন্তু এক ভাবে বিসদৃশ এক চুলকুনির শিকার এবং এই চুলকুনি কিন্তু যৌনতায় আক্রান্ত— ওঁদের ভাষায় সেটা ‘itching’, ‘scratching’ অর্থাৎ ‘arousal’ বা যৌনতার জাগরণ।

এখানে ‘শৃঙ্গার’-শব্দের ব্যাখ্যা-প্রযুক্তিতে আমাদের প্রসিদ্ধ রসশাস্ত্রকার বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্যদর্পণে বললেন— ‘শৃঙ্গ’ শব্দের অর্থ হল কামুকতার প্রথম উদ্বেদ, রতিভাব অথবা কামুকতার জাগরণ এখান থেকেই— ‘শৃঙ্গং হি মন্যথোদ্বেদস্তদাগমন-হেতুকঃ’। রসশাস্ত্রের এই মহাতাপ্যর্ময় ‘শৃঙ্গ’ শব্দটিকে মহাকবি কালিদাস কী সুচতুর কৌশলে তাঁর কাব্যের আঙ্গিকে ব্যবহার করেছেন, সেটা বোঝা যায় ‘কুমারসম্ভব’-এ অকালবসন্তের বর্ণনায়। বসন্তের আগমনে সমস্ত প্রকৃতি যখন শৃঙ্গারোদ্দীপনে রোমাঞ্চিত, তখন কালিদাস তির্যক প্রাণীদের শৃঙ্গার-চেষ্টা বর্ণনা করে লিখলেন— ভ্রমর-ভ্রমরী একই পুষ্পপাত্র থেকে মধু খাচ্ছে, আর এক কৃষ্ণসার মৃগকে দেখা যাচ্ছে সে তার অভীষ্ট মৃগীর গায় শিং দিয়ে চুলকে দিচ্ছে এবং সেই কণ্ঠ্যনীর প্রক্রিয়ার স্পর্শ-মধুরতায় মৃগীর চোখ দুটি আবেশে বুজে আসছে— ‘শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীঃ মৃগীমকণ্ঠ্যত কৃষ্ণসারঃ’।

এখানেই শৃঙ্গ শব্দের মধ্যে যার দৃঢ়তা, আক্রমণ-ক্ষমতা এবং ‘পেনিট্রেশন’-এর তাৎপর্য আছে, তেঁর সর্বটুকুই অন্তরে ধারণ করে একটা প্রত্যয় যোগ করা হল— ‘আরকন’ প্রত্যয়। তাতেই শব্দটা দাঁড়াল শৃঙ্গার। রসশাস্ত্রের সংজ্ঞায় শৃঙ্গ থেকে শৃঙ্গারে উত্তরণ কিন্তু আসলে যৌনতা থেকে উদ্দীপনী রোমাঞ্চে উত্তরণ। ‘সেকশ্যুয়ালিটি’ থেকে ‘ইরোটিক্সে’ উত্তরণ— পণ্ডিতরা যে ‘ইরোটিসিজম’-কে বলেছেন— ‘ইরোটিসিজম ইজ দ্য কালচারাল প্রসেসিং অব সেক্স’। এইখানেই কৃষ্ণসার মৃগের শৃঙ্গ-কণ্ঠ্যনে মৃগীর চক্ষু দুটি স্পর্শসুখে নিমীলিত হয়, অথবা

কানে কানে প্রেম প্রেম বার্তা কহিবার ছলে

সুভদ্রার লজ্জারূপ কুসুমকপোল

চুম্বিছে ফাল্গুনী।

কথাটা খুব ভাল বলেছিলেন অস্ট্রাভিও পাজ্জ। তিনি গ্রন্থের নাম দিয়েছেন ‘দ্য ডবল ফ্রেম: এসেজ অন লাভ অ্যান্ড ইরোটিসিজম’। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্যে আগুনের রূপকে যে বস্তুটি চিহ্নিত, সেটা কিন্তু ‘সেকশ্যুয়ালিটি’। কারণ, এটাই সেই আদিমতম প্রাকৃতিক উপাদান যেখান থেকে ‘ইরোটিসিজম’ এবং ‘লাভ’-এর সৃষ্টি হয়। আরও স্পষ্ট করে বললে এই রকম দাঁড়ায়— সৃষ্টির আদি থেকে কামনার যে আগুন

জ্বলছে তা থেকেই উঠে আসে রক্তিম উজ্জ্বল সেই ডগডগে লাল শিখা, যার নাম ‘ইরোটিসিজম’ আর ঠিক এই উপরিপ্রান্তিক যে মধুর নীল সরু শিখাটি তিরতির করে কাঁপতে থাকে, সেটাই হল ভালবাসা। এই তিনটিই একে অন্যের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করে, একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত অথচ প্রত্যেকেই মাঝে মাঝে আপন স্বতন্ত্রতা ঘোষণা করে। আমরা এই প্রবন্ধে ‘সেকশ্যুয়ালিটি’ নিয়ে আলোচনা করব না, ভালবাসা নিয়েও খুব নয়। আমাদের আলোচ্য হয়ে উঠবে ‘ইরোটিক্স’, যেটাকে আমাদের সাবেকি ভাষায় বলব শৃঙ্গার।

এই শৃঙ্গারবাসিত চিন্তের মধ্যে যদি ‘অবজেক্টিফিকেশন’, ‘কমোডিফিকেশন’ ইত্যাদি শব্দ যদি কবিচিন্তা আক্রান্ত করে, বিশেষত রমণী-শরীরের প্রতি পুরুষের দৃষ্টিপাত-মাত্রেরি যারা যৌনতার অভিসন্ধি তৈরি করেন, তাঁদের ‘ইরোটিক্স’ বোঝানো যতখানি সহজ, ‘ইরোটিসিজম’ বোঝানো ততটাই কঠিন। এটা কঠিনা এবং তরলাদের বোঝাতেই পারি না যে, ‘ইরোটিসিজম’-এর ক্ষেত্রে সমুদ্রিষ্ট নারী-পুরুষের পারস্পরিক দৃষ্টিপাতই শুধু নয়, এমনকি তাঁদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সেখানে গৌণ বিষয়; রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের সমস্ত সামগ্রী, বেশ-বাস, শয্যা গন্ধ, চরণের নুপুর, এমনকি উত্তরীয় খণ্ড তথা ওড়নাও এখানে একতরের আবেশ তৈরি করে, অথবা অন্যতরের শৃঙ্গারমন্দির ভাব তৈরি করে।

আমাদের আজন্ম-সহবাসিনী প্রকৃতিও এখানে বাদ থাকে না— সে না হলে আমার শৃঙ্গারী কবির মোহনবাঁশি বাজেই না। এ বাবদে আমাদের পাশ্চাত্যের গরিমা-লুন্ধ মুগ্ধ পাঠকরা জ্ঞানদাসের পদ শুনে বলতেই পারেন— ও সব ভাবের কবিতা আমাদের নয় না, কিন্তু এটা ওঁরা বোঝেন না যে, শৃঙ্গারী কবির জগতে নর-নারীর উন্মুখ বাস্তবের মধ্যে জল, হাওয়া, বৃক্ষ-লতা, বর্ষা-বসন্ত সবটাই ‘ইরোটিসাইজড’ হয়ে ওঠে। আজকাল ওদেশের ভাবুরা এই বিষয়টাকে ‘ইকোপোয়েটিক্স’ বলে একটা ‘ডেভিস্যান্ট নর্ম’ তৈরি করেছেন। আমরা খ্রিস্টপূর্ব শতকে এর নাম দিয়েছি উদ্দীপন বিভাব, যা রসনিপুণের অন্যতম কারিগর।

আসলে সত্যিই তো এ সব ভাবের কথা, আর ভাবের কথার মধ্যে বাৎস্যায়নের নাগরিক বৃত্তি যেমন থাকে, তেমনই থাকে গ্রাম্যতা, আর যাহা আছে তাহা কহিবার নয়, সখি—

সখীর সহিত জলেতে যাইতে সে কথা কহিবার নয়।

যমুনার জল করে ছল-ছল, তাহে কী পরাণ রয়।

এবার ‘খোপার পাটে’, জলের ঘাটে কাঞ্চনমালার মিনতি—

পুষ্করিণীর চাইর পারে রে ফুটল চাম্পা ফুল।

ছাইরা দেরে চেংরা বন্ধু বাইড়া বান্‌তাম চুল॥

দুঃখ পাড়ার লোক দুঃখমণি করিবে।

এমন কালে দেখলে বন্ধু কলঙ্ক রটাবে॥

হস্ত ছাড় পরাণের বন্ধু চইলা যাইতাম ঘরে।

কি জানি কক্ষের কলসি ভাসাইয়া নেয় সুতে॥

দূরে বাজে মনের বাঁশি এ না কলা বনে।

তোমার সঙ্গে অইব দেখা রাত্রি নিশা কালে॥

এই হল শৃঙ্গারী কবির জগৎ। ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক আনন্দবর্ধন তাঁর ‘ধ্বন্যালোক’ গ্রন্থে লিখেছেন— যে মহান কবির মধ্যে কবিত্বের পূর্ণ পরিপাক ঘটেছে, তাঁরা এমন কবিতা লিখতেই পারেন না, যেখানে রস-ভাবের তাৎপর্য নেই। আর রস-ভাবের তাৎপর্যের বোধ যদি কবির মধ্যে থাকে, তা হলে এমন কোনও বিষয় নেই যা কবির শব্দমন্ত্রের অভিঘাতে দ্বিগুণ আশ্বাদন তৈরি না করে ক্ষান্ত হয়। আনন্দবর্ধন লিখছেন— রসাস্বাদনের এই বিশদ চর্চণা তৈরি করতে হলে ‘ইরোটিসিজম’-এর বোধ কবির অন্তরশায়ী হওয়া দরকার। কবি যদি শৃঙ্গারী হয়ে ওঠেন, তা হলে সম্পূর্ণ জগৎ তাঁর কাছে রসময় হয়ে ওঠে— শৃঙ্গারী চেৎ কবি কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ। কিন্তু কবি যদি ‘বীতরাগ’, কামনা-বাসনার স্পর্শহীন, মোহহীন, বিরাগী হয়ে পড়েন, তা হলে সম্পূর্ণ জগৎই নীরস হয়ে ওঠে— ‘স এব বীতরাগশ্চেন নীরসং সর্বমেব তৎ’।

কাজেই কবিতার মধ্যে শৃঙ্গারী কবির ‘রসৈকতাৎপর্যময়’ ভাবটাই সব এবং এই শৃঙ্গার শব্দটা একটু বিশদ অর্থে গ্রহণ করলে ‘ইরোটিসিজম’-এর বিশাল তাৎপর্যটাও সমজ্ঞাস হয়ে ওঠে, বলেই আনন্দবর্ধন লিখেছেন— কবি সানুরাগে শৃঙ্গারী হয়ে উঠলে, তিনি অচেতন বস্তুর মধ্যেও চেতনার সঞ্চারণ ঘটাতে পারেন, আবার চেতন বস্তুর মধ্যে অচেতনের ব্যবহার আরোপ করতে পারেন। আমরা আরও পরিষ্কার করে বলি— শৃঙ্গারী কবি আকাশ-বাতাস থেকে আরম্ভ করে নদী-পর্বত সমস্ত বস্তুকে কী ভাবে শৃঙ্গারী করে তুলতে পারেন তার প্রতিছত্র প্রমাণ আছে কালিদাসের ‘মেঘদূত’-এ। আর আমরা না হয় একটা উদাহরণ দিই টি এস এলিয়ট থেকে —

She is alone
With all the old nocturnal smells
That cross and cross across her brain.
The reminiscence comes
Of sunless dry geraniums
And dust in crevices,
Smells of chestnuts in the streets,
And female smells in shuttered rooms,
And cigarettes in corridors
And cocktail smells in bars.

আমার মনে আছে পৌরুষের দৃষ্টিপাতের প্রতি অসূয়াগ্রস্ত এক ভদ্রলোক স্ত্রীলোকের উপর পৌরুষের আক্রমণের চিন্তায় লিখেছিলেন— জয়দেবের বর্ণনা স্ত্রীলোকের কাছে স্ত্রীভাবের অবমাননা ছাড়া কিছু নয়। কারণ জয়দেবের রাধা সখীকে বলেছেন— প্রথম যখন কান্ত কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা হল, সে আমার কী লজ্জা, প্রথম সমাগমের লজ্জা। তার পর তাঁর মুখে আমার রূপগুণের শত প্রশংসা চাটু শুনে আমি যেই একটু অনুকূল হয়েছি, যেই না আমি একটু ইতিবাচক হেসেছি, অমনি কিনা, কী দুষ্ট স্বভাবের মানুষ রে, অমনি কিনা আমার জঘনমেখলায় হাত রেখে শিথিল করে দিল মেখলার বন্ধন— ‘মৃদু-মধুর-স্মিত-ভাবিতয়া শিথিলীকৃত-জঘন-দুকূলম্’।

ইংরেজ গবেষক বলেছেন, কৃষ্ণ এখানে রাধার প্রতি যে ব্যবহার করেছেন, সেটা অনেকটা নেকড়ে বাঘের ছাগল ধরার সমান। আমরা তা বলি না, কেননা আমরা এটাকে ‘উইমেন্স সেকশুয়ালিটি’-র দিক থেকেও দেখতে পারি। বিশেষত এই বর্ণনা রাধার জবানবিত্তে, অতএব সামান্য চূষনালিঙ্গনের সুযোগ থেকে কী ভাবে স্তন-জঘনের দিকে পুরুষের হস্ত প্রসারিত হয়, সেটা স্ত্রীলোকের যৌন-ওৎসুক্য থেকেও ব্যাখ্যাত হতে পারে। আমরা ব্যাপারটা বুঝতাম না, যদি না অ্যানাইস নিন তাঁর ডায়েরিগুলো লিখতেন, অথবা না লিখতেন ‘ডেল্টা অব ভেনাস’ বা ‘ইরোটিকা’। এটা তো এই ১৯০৩ থেকে ১৯৭৭ সালের এক রমণীর জীবন। জীবৎকালে তাঁর লেখাকে লোকে পর্নোগ্রাফির

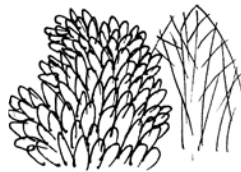
তুল্য সংস্করণের মর্যাদা দিয়েছে। তার পর নারী আন্দোলনের জোরে নিন তো মোটামুটি সাহিত্যিকের মর্যাদা পেয়েছেন এবং এখন তো অন্যতর মর্যাদাসম্পন্ন, যেহেতু তিনি অসামান্য নিপুণতায় ‘উইমেন্স সেকশুয়ালিটি’-র কথা বলেন।

জয়দেব রাধার মনোভাব ব্যক্ত করছেন সখীদের কাছে— কী কী তাঁর সঙ্গে হয়েছে, প্রথম সমাগম থেকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। তাতে প্রথম আরম্ভেই অনেকের মত তৈরি হয়ে গেল— এটা কবির লেখা পর্নোগ্রাফি। রাধা বলেছেন— আমাকে সে তার পর কিশলয়-শয়নে শোয়াল, বহুক্ষণ শুয়ে রইল আমার বুকের উপর মাথা দিয়ে, তার পর আলিঙ্গন করল, চুষন করল নিঃশেষে। আমি অলসে চোখ বুজেছিলাম, ওর মুখে-চোখে পুলকের উদ্ভাস, আমি যেমেনে একশা হলাম খানিকটা শ্রমে, আর সবটাই আনন্দে, আমার কৃষ্ণের উপর মত্ততা বাড়ছিল। মানলাম এই কবিতার মধ্যে যৌনতা আছে, প্রকট লালসাতৃপ্তির আনন্দ আছে, কিন্তু এটাই নিন-এর ভাষায় এ রকম— ‘Electric flesh-arrows traversing the body, A rainbow of color strikes the eyelids. A foam of music falls over the ears, It is the gong of orgasms.’

আমি আগেই জানিয়েছিলাম যে, কবিতা-রচনার ক্ষেত্রে পুরুষের ভাষায় রমণীর সুখ-দুঃখ পুরুষের ভাবনা অনুসারেই প্রকাশিত হয়, এ কথাটা আমি তেমন মানি না। জয়দেব কবির ভাষা যদি সে দিক থেকে গ্রহণযোগ্য না হয়, তা হলে এক জন পুরুষের স্পর্শে রমণীর ভাষা কী রকম হতে পারে, সেটা অ্যানাইস নিন-এর ভাষায় খানিকটা বোঝালাম বটে। এখানে আমি সংস্কৃতের এক মহিলা কবির ভাষা উচ্চারণ করে শোনাব এবং সে কবিতা এমনই যে, আমাদের রসশাস্ত্রের অনেক প্রসিদ্ধ পুরুষও সে-কবিতাকে ধ্বনি-ব্যাঙ্গনার অপূর্ব দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কবির নাম বিজ্জকা অথবা বিজ্জা, ত্রিস্টায় অষ্টম শতকের কবি।

বিজ্জকার মতো বিদগ্ধা কবির উদাহরণে সখীদের সঙ্গে যৌবনবতী নায়িকার বিশ্রুদ্ভালাপ সেখানে এইরকম দাঁড়ায়— ধন্য মানি তোদের কথা, সখী! ধন্য মানি তোদের। তোরা এত কথাও বলতে পারিস। প্রিয়তমের সঙ্গে সঙ্গম-মিলন ঘটান সময়ও তোরা ভাল-মন্দ এত কথা বলতে পারিস, এত স্তুতি-চাটু-প্রিয়ভাষণ করতে পারিস। আমার তো বাপু কী যে হয়! যে মুহূর্তে আমার কোমরের কশিতে সে এক বার হাত দেয়, তার পর— সত্যি বলছি, আর কিছু মনে করতে পারি না রে, কিছু মনে করতে পারি না— সখ্যঃ শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি।

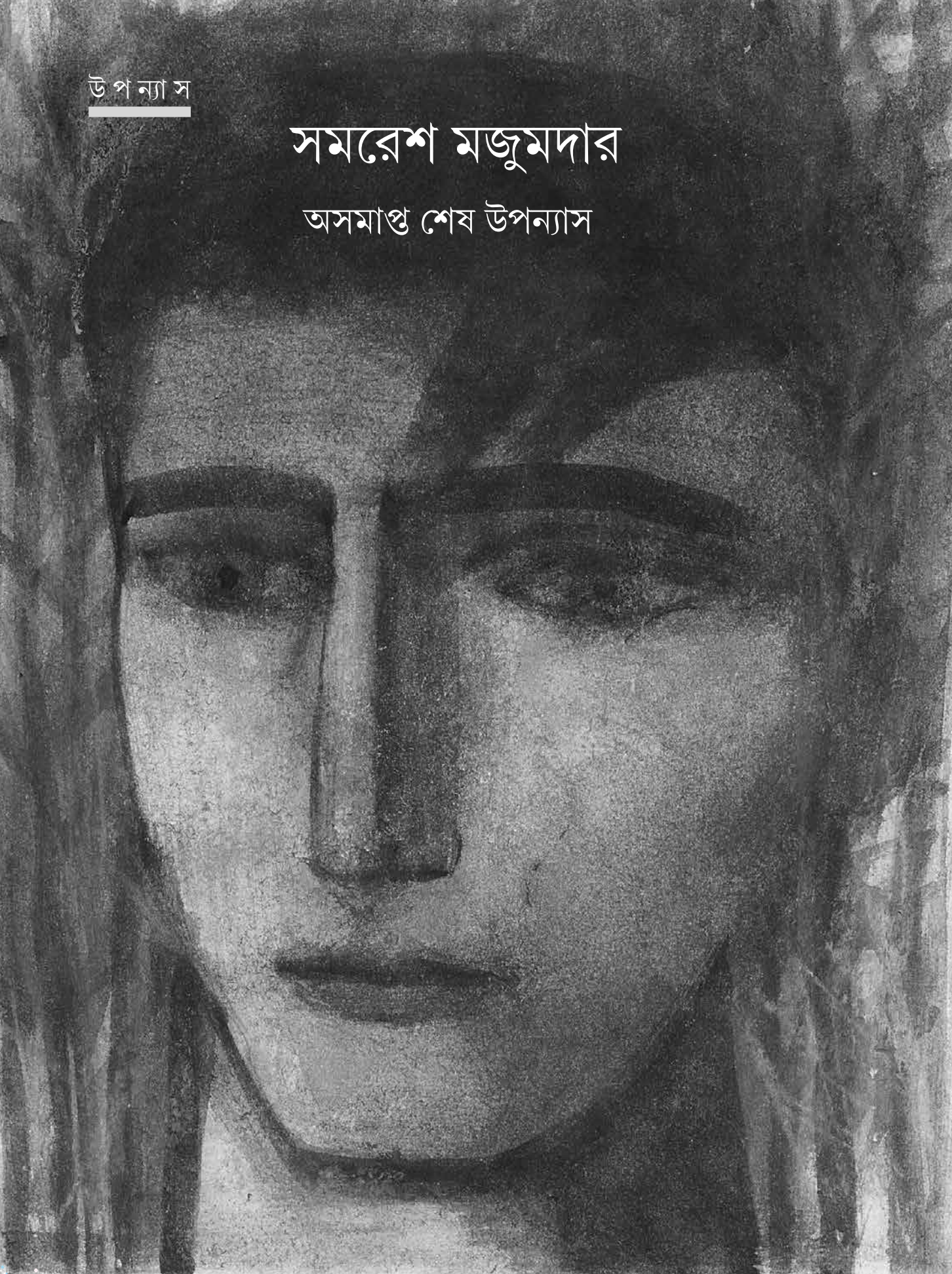
বিজ্জকার কবিতায় এই রমণী কি শুধু আপন মুগ্ধতার কথাই বলছে? এটা কি তাদের ইচ্ছের মেয়েলি ভাষা নয়? অলমিতি— এ বিষয়ে আমার বিশদ গবেষণার চলমান প্রয়াসে আপনাদের শুভেচ্ছা প্রার্থনীয়। আমার এই অনুসন্ধান সুসম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত আয়ুধান হওয়ার আশীর্বাদ করুন আমাকে।



উপন্যাস

সমরেশ মজুমদার

অসমাপ্ত শেষ উপন্যাস





পা লুডির নব ডাক্তার বললেন,
“আজকের রাতটা যদি আপনি
এখানেই থেকে যান তাহলে
কি সমস্যা হবে?”

প্রশ্নটা শুনে অবাক হল
বিবেকানন্দ। এখন ঘড়িতে চারটে বেজে বাইশ,
সন্ধে আসবে এখনও সওয়া ঘণ্টা পরে। তার মধ্যে
সে এখান থেকে রওনা হয়ে বান্দোয়ান পেরিয়ে
যেতে পারবে ধীরেসুস্থে বাইক চালিয়ে। তার মুখের
দিকে তাকিয়ে নব ডাক্তার হাসলেন। “আপনি
জানলার বাইরেটা লক্ষ করেননি মনে হচ্ছে। আজ
ভয়ঙ্কর ঝড় বৃষ্টি হবে।”

“সে কী!” ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে জানলার
পাশে চলে গেল বিবেকানন্দ। বাইরেটায় নজর
বুলিয়ে সে চাপা গলায় বলল, “সর্বনাশ।” তারপর
ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, “আজ আর আপনার সময়
নেব না। নিলে বেরুতে পারব বলে মনে হয় না।
অনেককাল পরে আকাশে মেঘের এত ঘনঘটা
দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এখনই রওনা হলে বান্দোয়ানে
পৌঁছে যাব বৃষ্টি পড়ার আগেই।”

“বেশ। আপনার যাতে সুবিধে হয়। তাহলে এক কাজ করি, সামনের রবিবারে আমি জামশেদপুর যেতে পারি, তখন ওই প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলার সুযোগ করে নিতে পারা যাবে।”

বাইরে বেরিয়ে এসে বাইক চালু করার চেষ্টা করল বিবেকানন্দ। তাকে লক্ষ করে নব ডাক্তার বললেন, “একটা অনুরোধ, বেশি দূর যাওয়ার আগেই যদি গায়ে বৃষ্টির জল পড়ে তাহলে কোনও দ্বিধা নয়, সামান্য ভিজে গেলেও ফিরে আসবেন।”

ইঞ্জিন চালু হয়ে গেলে একটা হাত ওপরে তুলে সন্মতি জানিয়ে গতি বাড়াল বিবেকানন্দ।

ফিনফিনে মশারির মতো রোদ পৃথিবীর ওপর ছড়ানো ছিল এতক্ষণ, পিচের রাস্তায় মানুষ দূরের কথা, গরু-ছাগলও এখন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ছায়া ঘন থেকে আরও ঘন হচ্ছে। মিনিট দশেক যাওয়ার পরেই দু’পাশের ঘরবাড়ি উধাও হয়ে গেল। এখন শুধু বড়সড় গাছের মাঝখানে নানান রকমের ঝোপঝাড়। মানুষের দেখা নেই। বিবেকানন্দ বাইকের গতি বাড়াল। চোখ ঈষৎ ওপরে তুলে সে দেখে নিয়েছে কালো মেঘের দল গভীর ভঙ্গিতে আকাশটাকে দখল করে নিচ্ছে। ওই মেঘ গলে গেলে এই রাস্তায় আর স্বচ্ছন্দে বাইক চালানো যাবে না।

একটা সাঁকো পেরিয়ে এল বাইক। সাঁকোর নীচে এখন খুব বেশি স্রোত ছুটে যাচ্ছে না। সামনেই একটা টিলা। পিচের পথে সেই টিলা ঐক্যবাক্যে পেরিয়ে ওপাশে চলে গেলে, সেই টিলা পার হতে না-হতেই হাতের ওপর একফোঁটা ঠান্ডা জল এসে পড়ল আকাশ থেকে। গতি বাড়াবার চেষ্টা করল বিবেকানন্দ। সামনেই একটা এলাকা জুড়ে গভীর জঙ্গল। বৃষ্টির আগে ওই জঙ্গল পেরিয়ে গেলে বান্দোয়ানে ভিজতে ভিজতেও পৌঁছনো যাবে।

কিন্তু এই সময় ভয়ঙ্কর হাওয়া যেন আছড়ে পড়ল পৃথিবীর ওপরে। বিবেকানন্দের বুঝতে অসুবিধে হল না, মেঘেরা আর আকাশে থাকতে চাইছে না। পরপর কয়েকটা গর্জনে গতি বাড়িয়ে বাইকটাকে রাস্তার একপাশে নিয়ে যেতে বাধ্য হল বিবেকানন্দ। এর জন্য কোনও পরিকল্পনা করেনি, করতে হল না, তার শরীরের ভেতরে থাকা কেউ যেন তাকে বুঝিয়ে দিল, এটাই আত্মরক্ষার

একমাত্র পথ।

সরু পথের একপাশে গাছের নীচে বাইক দাঁড় করিয়েও বৃষ্টির জল থেকে আত্মরক্ষা করা মুশকিল হল। চারপাশে তাকাল বিবেকানন্দ। গাছের আড়াল ছাড়া এখানে আত্মরক্ষার কোনও পথ নেই। তবে ভেতরের দিকের গাছগুলো বেশ ঘনঘট এবং ঝাপড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের নীচে গেলে বৃষ্টির জল কিছু কম পড়বে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কথাটা মনে আসতেই হেসে ফেলল বিবেকানন্দ। বৃষ্টির জল জঙ্গলের একটি বিশেষ জায়গায় কম-বেশি পড়ে না, সমানভাবে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। গাছের ডালপাতা যেখানে খুব ঘন হয়ে আকাশ আড়াল করে রেখেছে, সেখানে বৃষ্টির জল হুড়মুড়িয়ে গায়ে এসে পড়ে না।

পিচের পথ ছেড়ে পায়ে চলা পথ ধরে খানিকটা ভেতরে চলে এসে বুঝতে পারল বিবেকানন্দ, জলের শব্দ কমে আসছে, শরীরে তেমন ভাবে লাগছে না। বাইক বন্ধ করে একপাশে রেখে বিবেকানন্দ এখন একটা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল যেখানে মাঝেমধ্যে জল গড়িয়ে নামছে ওপর থেকে।

কিন্তু আলো কমে আসছিল, ছায়া ঘন হচ্ছিল দ্রুত। অন্ধকার শেষ আলোটুকু গিলে ফেললে তার আর কিছু করার থাকবে না। আর এই প্রবল বৃষ্টিতে আলো নিভে যাওয়া রাস্তা দিয়ে বাইক চালিয়ে বান্দোয়ান পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই যদি দুর্ঘটনা ঘটে যায়! তার চেয়ে এই গাছগুলোর আড়ালে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থামার জন্য অপেক্ষা করাই ভাল।

আপ্রাণ জল বাঁচানোর চেষ্টা করেও না-ভিজে দাঁড়ানো গেল না। কিন্তু বৃষ্টি থামল রাত ন’টা নাগাদ। পিচের পথটার দিকে না-গিয়ে বিবেকানন্দ জঙ্গলের ভেতরে সরু পথটা ধরে খানিকটা যেতেই অবাক হয়ে গেল। জঙ্গল খানিকটা ঢালু জমি বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছে এবং তারপরে টলটল করছে জল। পাহাড়ি নদী কিন্তু স্রোত কম। চওড়ায় খুব বেশি হলে দেড়শো ফুট কিন্তু তার ওপরে হালকা চাঁদের আলো পড়ায় অপূর্ব সুন্দরী হয়ে উঠেছে চরাচর।

মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল বিবেকানন্দ। হঠাৎ তার মনে হল এরকম একটা চমৎকার জায়গায়



যদি একটা বাড়ি বানানো যেত তাহলে কী ভালই না হত। কিন্তু এই জঙ্গল নিশ্চয়ই সরকারি সম্পত্তি, যা সাধারণ মানুষকে বিক্রি করা হয় না। কিন্তু অনেক সরকারি জমি তো সাধারণ মানুষকে বিক্রি না করে লিখে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্যে। সেভাবেই যদি পাওয়া যেত।

বৃষ্টি ধোওয়া এই গাছপালা, সামনের জলের ধারা, মেঘছুট আকাশ দেখতে দেখতে বিবেকানন্দের মনে হচ্ছিল, আহা এমন জায়গায় যদি সে পাকাপাকি বাস করতে পারত। কিন্তু বাস করতে চাইলে তো সরকারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। এইসব জায়গায় যখন সাধারণ মানুষ বাড়ি তৈরি করে থাকছে না তখন বোঝাই যাচ্ছে সরকারের অনুমতি ছাড়া বাস করা সম্ভব নয়।

বাইক বিদ্রোহ করেনি। বৃষ্টিতে ভিজেও

তাকে চাপ দিতেই সক্রিয় হয়েছিল। দু'পাশের ভেজা গাছ গাছালি, মাঠ, জমে যাওয়া বৃষ্টির জল পেরিয়ে বিবেকানন্দ যখন বান্দোয়ান চৌরাস্তায় পৌঁছল তখন কোথাও কোনও আলো জ্বলছিল না। মানুষজন যে যার দোকানপাট বন্ধ করে ঘরে ফিরে গিয়েছে। বান্দোয়ানের মধুদার চায়ের দোকানে মাঝেমাঝে টুঁ মারে যাতায়াতের পথে, এখন সেই ঝাঁপ বন্ধ হওয়া দোকানের দিকে একবার তাকিয়ে গতি কমাল না সে। মনে একটা ভাললাগা টনটন করছে, এই মন নিয়ে জামশেদপুরে ফিরে নিজের বিছানায় শরীর বিছিয়ে দিলে কি যে ভাল লাগবে। নিজের মনে নিজের পিঠ চাপড়াল বিবেকানন্দ।

সেই যে মেঘ উড়ে এসেছিল আচমকা তা সহজে এই তল্লাট ছেড়ে চলে যেতে চাইছিল না।

বাড়িতে অসুস্থ বৃদ্ধা মা আর অবিবাহিত দাদা ছাড়া আর কেউ নেই। বিবেকানন্দ যে-চাকরি করছিল তার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। তার নিজস্ব পারিবারিক বিপর্যয়ের কারণে শেষ কয়েক বছর সে নিজেকে প্রায় ঘর আর অফিসের মধ্যেই আটকে রেখেছিল। এই নিয়ে কারওর সঙ্গে কোনও কথা বলতে চায়নি সে। যে কয়েকজন কাছের মানুষ সম্পর্ক রেখে চলে তারাও কৌতূহল দেখায় না। জেনে গিয়েছে, কোথায় থামতে হয়।

বৃষ্টির জন্যে বাইরে বের হওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু চোখে সেই সরু রাস্তাটা, ভেজা জঙ্গল, জঙ্গলের ভেতরে খানিকটা গেলেই জলের ধারা, নীল আকাশ অদ্ভুত মায়াময় হয়ে রয়েছে। সেই ছবি যেন বিবেকানন্দের মনের চোখ থেকে সরে যাচ্ছিল না।

বিবেকানন্দের ঘনিষ্ঠ একজন স্কুলে পড়ান। তাঁর সরকারি মহলে একটু জানাশোনা আছে। তিনি খবর নিয়ে এলেন, যে-জমির কথা বিবেকানন্দ বলছে তা একেবারেই সরকারি জমি, সাধারণ মানুষ টাকা দিলেই ওই জমি পাবে না। তবে কোনও কোঅপারেটিভ সংস্থা অথবা মানুষের সেবার জন্যে যাঁরা একত্রে কাজ করতে চাইছেন তাঁরা আবেদন করলে সেই আবেদন হয়তো মঞ্জুর হতে পারে। সেক্ষেত্রে, খুব বেশি হলে পাঁচাত্তর বা নব্বই বছরের জন্যে ওই রকম সংস্থাকে লিজ দেওয়া যেতে পারে।

কথাগুলো শোনার পর ইচ্ছেটা আরও বেড়ে গেল বিবেকানন্দের। খুব অল্প বয়স থেকে জামশেদপুরের পাড়া এবং স্কুলে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকজনকে নিয়ে কমিটি তৈরি করার দায়িত্ব দিল মাস্টারমশাইকে। ভদ্রলোককে সবাই কানাই মান্টার বলে চেনে, ওঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ কারওর নেই।

সরকারের কাছে আবেদন করার আগে কানাই মান্টার বিবেকানন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। কানাই মান্টার জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি তো ওই জমিতে কোনও লাভজনক ব্যবসা করবেন না?”

“একদম না।” বিবেকানন্দ মাথা নাড়ল।

“তাহলে কাজের লোক পাওয়া মুশকিল হবে।” কানাই মান্টার হেসে বললেন, “মধু নেই, কখনও মধু হয় না, এমন ফুলে মৌমাছিদের উড়ে

আসতে দেখা যায় না। আপনি কাজের লোক পাবেন বলে মনে হয় না, তবে কি কপাল ভাল হলে ঠিকঠাক লোক পেয়ে যাবেন।”

“দেখুন, ব্যাপারটা যখন মাথায় এসেছে তখন আমি চেষ্টা করবই। একটা কমিটি তৈরি করে তাদের নাম সরকারের কাছে দিতে হবে, এই তো! ঠিক আছে, সেই কমিটির লোকজন কাজ করছে কি করছে না তা কি সরকার দেখতে আসবেন?” বিবেকানন্দ বলল।

অনেকটা সময় আলোচনার পর নামের তালিকা তৈরি হল যাঁদের নিয়ে কমিটি তৈরি হবে। এঁরা সবাই জামশেদপুরের বাসিন্দা, কেউ চাকরি করেন, কেউ ব্যবসা। তালিকায় চোখ বুলিয়ে বিবেকানন্দ বলল, “আপনি এঁদের সঙ্গে কথা বলুন। আমরা যা করতে চাইছি তা জানার পর ওঁদের মতামত কী হয় তা শোনা দরকার।”

“একদম ঠিক কথা। কিন্তু এই পরিকল্পনার পুরোটাই আপনার মাথা থেকে এসেছে। তাই আপনি যাদের নিয়ে এত বড় কাজ করতে চান তাদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া উচিত। যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে দলে নেবেন। মনে রাখবেন কাজ আপনাকেই করতে হবে। যার সঙ্গে কাজ করছেন তাকে চিনে নেওয়া জরুরি।” কানাই মান্টার গম্ভীর গলায় বললেন।

তবু বিবেকানন্দ অনুরোধ করায় কানাই মান্টার দুটো নাম বললেন। “এঁদের একজন প্রাইমারি স্কুলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করে মাসখানেক আগে অবসর নিয়েছেন। দ্বিতীয় জনও স্কুলে গেমসটিচার ছিলেন। অসুস্থ হয়ে দীর্ঘ ছুটি নেওয়ায় বেচারার চাকরি যায়।” কানাই মান্টার বললেন, “এঁরা দু’জনেই ভাল মানুষ বলে জানি। তা ছাড়া দু’জনেরই পিছুটান নেই।”

“কী রকম?” জিজ্ঞাসা করল বিবেকানন্দ।

কানাই মান্টার হাসলেন, “এঁরা দু’জন অবিবাহিত তাই কোনও পিছুটান নেই। কাজে মন বসে গেলে এঁরা খুব উপকারে আসবেন।”

পুরো তালিকা তৈরি করা খুব সহজ ছিল না। যাদের সঙ্গে নিয়মিত আড্ডা দিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে উৎসাহীদের বেছে শেষে কানাই মান্টারের প্রস্তাবিত দু’জনের সঙ্গে জুড়ে একটা তালিকা

তৈরি করা হল। কানাইমাস্টারের পরিচিত একজন উকিল কাগজপত্র তৈরি করলেন। এরকম একশো মাইলের মধ্যে যে সব দরিদ্র আদিবাসীরা আছে, তাদের পরিবারের সন্তানদের উন্নত জীবনযাপনের জন্যে সাহায্য করতে একটি শিক্ষাক্রম তৈরির প্রকল্প সরকারের কাছে পেশ করে থেমে গেল না বিবেকানন্দ, শহরের ক্ষমতাবান কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করে নিজের ইচ্ছের কথা জানাল।

জামশেদপুরে জন্ম, বড় হয়ে ওঠা। অথচ যে-সব রাস্তা দিয়ে বাইকে যেতে যেতে জায়গাটা পছন্দ করে রেখেছিল বিবেকানন্দ, সেটা জামশেদপুরের প্রায় গা ঘেঁষা হলেও পশ্চিমবাংলার ম্যাপেই চিহ্নিত। অতএব ওই জমিতে কিছু করতে হলে তাকে যেতে হবে কলকাতায় সোসাইটি অফ ল্যান্ড রেভেনিউ অফিসে। থমকে গেল বিবেকানন্দ। সরকারি অফিসে কারওর সুপারিশ ছাড়া গেলে কতটা কাজ হবে তাতে সন্দেহ আছে। এসব নিয়ে অনেক গল্প চলে আসে।

কিন্তু কানাই মাস্টার এর পরে যে-খবরটা নিয়ে এলেন তাতে সমস্ত উৎসাহ এক লহমায় নেতিয়ে গেল। “বান্দোয়ানের দিকে যাওয়ার এই পথের দু’পাশের সমস্ত জমি সরকারি সম্পত্তি, যা কোনওমতেই সাধারণ মানুষের কাছে সরকার বিক্রি করবে না।”

“তা হলে আর কিছুই করার নেই।” বলল বিবেকানন্দ।

“তাই তো মনে হচ্ছে। এই পথে আসতে আসতে কোনও পাকা বাড়ি তো দেখতে পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না। এই নির্জন ভূতুড়ে এলাকায়, কেই-বা জমি কিনে ফেলে রাখবে বলুন।” কানাই মাস্টার মাথা নাড়লেন, “তবে আমার মনে হয় একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে আশপাশের জায়গাগুলোয় খোঁজ খবর করা উচিত। আপনি কী বলেন?”

হাসল বিবেকানন্দ, “আশেপাশে যেসব গ্রাম আছে তাদের বাসিন্দাদের নামে জমি আছে বলে মনে হয় না।”

হাসলেন কানাই মাস্টার, “ওই যে কবিতা আছে, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দ্যাখো তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন! দ্যাখাই যাক।”

মানুষটিকে আরও পছন্দ হল বিবেকানন্দের, বলল, “দেখুন।”

প্রতি রবিবার বাইক চালিয়ে জামশেদপুর থেকে চলে আসে বিবেকানন্দ। অন্তত দুই কিলোমিটার পথের দু’পাশে কোনও বাড়ি দূরের কথা, একটা আটচালাও নেই। ছায়াঘন একটা আবহাওয়া যেন ঝিমিয়ে থাকে এখানে। যে-জায়গায় সে প্রথম দিন পা দিয়েছিল সেটি তার ভারী পছন্দের।

সেখানে পৌঁছে বাইক থেকে নামতেই অবাক হয়ে গেল বিবেকানন্দ। যে-প্রাণীটি চলা পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সেটা যে একটা হরিণ তা বুঝে বেশ মজা পেল সে। কিন্তু এই হরিণ তার বালকবেলা বেশি দিন পেরিয়ে আসেনি। বিবেকানন্দ এক পা এগোতেই বেশ জোরে পথ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে উধাও হয়ে গেল। খানিকটা ভেতরে ঢুকেও তার দেখা আর পেল না বিবেকানন্দ।

অর্থাৎ এই জঙ্গলে এখনও বন্যপ্রাণী আছে। হরিণ যখন দেখতে পাওয়া গিয়েছে তখন অন্য প্রজাতির প্রাণীও থাকতে পারে। জায়গাটার আকর্ষণ তার কাছে যেন অনেক বেড়ে গেল। জঙ্গলের উল্টো দিকে এসে দাঁড়াতেই টলটলে জল দেখতে পেল সে। দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। সরকারি নিয়ম ভাঙার ক্ষমতা তার নেই, তাহলে না হয় কিছু একটা করা যেত। এখন ভরসা শুধু কানাই মাস্টার। বিবেকানন্দের সাধ হচ্ছিল, এখানেই যদি সে শেষ জীবনটা থাকতে পারত এই জঙ্গল এবং নদীর পাশে, তাহলে তার আর কিছুই চাওয়ার থাকত না।

কোনও কোনও মানুষের চেহারা এত সাধারণ হয় যে, দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে যে কোনও লোক। কানাই মাস্টার সেই ধরনের মানুষ। বিয়ে করেননি। একটা পৈতৃক ব্যবসা আছে যা টিমটিমিয়ে চলে। কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই কানাই মাস্টারের। যে-কাজ করতে ভাল লাগে তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে তাঁর একটুও দ্বিধা হয় না। বিবেকানন্দের ইচ্ছে তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। সাধারণ

বাঙালি লোকালয় ছেড়ে গভীর নির্জন জঙ্গলে গিয়ে থাকতে চায় না। কিন্তু কানাই মাস্টারের মনে প্রশ্ন জেগে উঠেছিল, পশু পাখি জঙ্গলে তাদের খেয়ালখুশি মতো চমৎকার থাকতে পারে কিন্তু একজন মধ্যবয়সি মানুষ এলে সেখানে থাকবে কী করে! তাঁর বিবেকানন্দের কথা শুনে মনে হয়েছে ওই নির্জনের সৌন্দর্য উপভোগ করতেই তিনি সব ছেড়ে চলে আসতে চাইছেন। অর্থাৎ ব্যবসা করার মতলব মোটেই নেই। এইরকম খেয়ালি মানুষ কানাই মাস্টারকে সবসময় আকর্ষণ করে। তিনি মরিয়া হলেন যে করেই হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।

বিবেকানন্দ যেখানে চাকরি করে সেখানে তার সুনাম আছে। কিন্তু এইরকম একটা প্রস্তাবের কথা শুনে অনেকেই তার মস্তিষ্ক ঠিক আছে কিনা সন্দেহ করল। সারাজীবনের অর্জিত অর্থ জঙ্গলে ফেলে কেউ না-খেয়ে মরতে চাইলে তাকে তো নির্বোধ ছাড়া কিছু বলা যায় না। উৎসাহ দেওয়া দূরের কথা, বেশির ভাগই তার পাশ থেকে সরে গেল। কিন্তু অফিসের বাইরে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যারা, তাদের সঙ্গে কথা বলার পর তারা নিমরাজি হয়েছে। তারা ওই জঙ্গলে ঘেরা জায়গায় কটেজ তৈরি করে থাকার বাসনা কেউ কেউ প্রকাশ করেছে। তবে জমির দাম বাবদ কে কত দেবে সেই ব্যাপারে কেউ

মুখ খোলেনি।

এক বিকেলে বিবেকানন্দের অফিসে চলে এলেন কানাই মাস্টার। বললেন, “এভাবে হবে না। আপনাকে কতগুলো জিনিস আগেই ঠিক করে নিতে হবে।”

“যেমন?”

“জমিটা আপনি কিনছেন কেন?”

“থাকব বলে।”

“আপনি না হয় থাকবেন কিন্তু আর যাদের সঙ্গে চাইছেন তারা তো নাও থাকতে চাইতে পারেন। আপনাদের মতগুলো তো আলাদা হতে পারে। তাই প্রথমেই অনেক লোককে সঙ্গে নিয়ে জমি না কিনে আপনার নিজের পক্ষে যতটা জমি কেনা সম্ভব, তা একাই কিনুন।”

“কিন্তু কানাইবাবু, জমিটা কেনার তো কোনও উপায় দেখছি না।”

“একটা উপায় আছে। চলুন আমার সঙ্গে।”

“কোথায়?”

“অপূর্ববাবুর কাছে। জামশেদপুরের সবচেয়ে বয়স্ক জমির ডিলার। ওঁর কাছে গেলে উনি আপনাকে ঠিকঠাক পথ বলতে পারবেন।” কানাই মাস্টার বললেন।

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী





শেষটুকু শুধু কাল্পনিক

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

আমার একটা পরকীয়া আছে। না, পরকীয়া বললে সম্পর্কটাকে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে বলা ভাল, আমার কলেজবেলায় একটা প্রেম ছিল। প্রেমিকা এবং আমার অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেছে, তবু প্রেমটা টিকে আছে।

শ্রীরামপুর কলেজে সায়েন্স নিয়ে একই ক্লাসে পড়তাম আমি আর সুজাতা। দু'জনের বাড়িই কোমগরে। আমাদের পৈতৃকবাড়ি। সুজাতাদের ভাড়াবাড়ি। ওর স্কুলবেলা কেটেছে মোহানপুরে। ওটাই ওদের আদিবাড়ি। সুজাতার অনুরোধে আমি এখন চলেছি ওই মোহানপুরেই। বসে আছি তারকেশ্বর লোকালে। কাঁধে

চামড়ার ঝোলাব্যাগ। ভিতরে জলের বোতল, তোয়ালে রুমাল, চিরুনি আর কিছু পত্রপত্রিকা। তারকেশ্বরে নেমে আরও চোদ্দো কিলোমিটার বাসে যেতে হবে। আজ রবিবার, তাই ট্রেন ফাঁকা। বসার সিট পেয়েছি।

সুজাতা লেখাপড়ায় খুব ভাল ছিল। কলেজে পড়তে পড়তে চান্স পেল মেডিক্যাল। ধরেই নিয়েছিলাম আমাদের সম্পর্কের পরিসমাপ্তি ঘটল এখানেই। তা কিন্তু হল না। মেডিক্যাল কলেজের হস্টেল থেকে সুজাতা নিয়মিত চিঠি লিখত আমায়। তখন মোবাইলের যুগ আসেনি। কোমগরের বাড়ি ছেড়ে সুজাতার বাবা-মা চলে গেল কলকাতায়। পাবলিক বুথ থেকে সুজাতার সঙ্গে

ফোনে কথা হত। আমার লেখালিখির খবর নিত সে। তখন শুধু লিটল ম্যাগাজিনেই লিখি। বেশ ক'বার বড় কাগজে গল্প বেরোল আমার। তখন ওর সে কী আনন্দ! তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছিলাম, আমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ও কিছু ভাবছে না। না ভাবাই স্বাভাবিক। ওর স্টেটাস ক্রমশ আমার চেয়ে অনেক উপরে উঠে যাচ্ছে। ডাক্তারির এমডি করছে সে। আমি গ্র্যাজুয়েশনের পর একটা ওয়ুথ কোম্পানির চাকরিতে ঢুকেছি।

এক সময় অনিবার্য ভাবে সুজাতার বিয়ের নেমন্তন্ন খেলাম। পাত্রও বিরাট ডাক্তার। বিয়ের পর সুজাতা আগের মতোই যোগাযোগ রাখত আমার সঙ্গে। আমি এক দিন বলেছিলাম, “হ্যাঁ রে, তুই যে এ ভাবে আমার সঙ্গে রিলেশনটা রেখে দিয়েছিস, তোর বর জানলে ঝামেলা করবে না?”

সুজাতা বলল, “বরকে তো তোর কথা আমি বলে দিয়েছি। তুই আমার প্রথম এবং একমাত্র প্রেমিক। কই, ঝামেলা করেনি তো!”

সুজাতা যে একটু খেপি টাইপের, সেটা নিশ্চয়ই ওর বর খুব তাড়াতাড়ি বুঝে নিয়েছিল। নয়তো কোনও হাজব্যান্ড এ সব কথা সহ্য করে!

সুজাতা সব চেয়ে মারাত্মক খেপামিটা করল আমার বিয়ের রিসেপশনে। আমার বৌ মিলির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম সুজাতার। বললাম, আমার কলেজের বন্ধু।

সুজাতা তক্ষুনি বলে উঠেছিল, “না গো, বাজে কথা। তোমার কাছে চেপে যাচ্ছে। আমি ওর কলেজ প্রেমিকা।”

খতমত খেয়ে গিয়েছিল মিলি। তবু হাসছিল। ভাবছিল নিছকই ঠাট্টা। সুজাতা আবার বলে উঠেছিল, “আমি কিন্তু ইয়ার্কি মারছি না।”

আমি জানতাম এটা নিয়ে একটা ঝড় উঠবে। সেই রাতেই উঠেছিল। তবে বেশি ক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মিলি আমার কাছে জানতে চাইল, “আপনার যে কোনও প্রেমিকা আছে, বিয়ের আগে তো বলেননি!”

আমি বললাম, “দূর! ও একটা পাগল। ওর কথা ধরতে আছে নাকি! অতিরিক্ত পড়াশোনা করে ওর মাথাটা গেছে।”

মিলি জানতে চাইল কী পড়াশোনা করেছে সুজাতা। সবটা বললাম। জানালাম পড়াশোনা শেষ করে এখন কলকাতার নামজাদা নার্সিংহোমগুলোয় রোগী দেখে। সেখানে প্রচুর চাপ। ফলে মাথার গোলমালটা আরও বেড়ে গেছে।

কেন কী জানি, আমার সব কথা বিশ্বাস করে নিল মিলি। সুজাতার সঙ্গে দিবা বন্ধুত্ব হয়ে গেল ওর। ফোনে কথা হত দু'জনের। তখন বাড়িতে বাড়িতে ফোন। মা-বাবার কিংবা নিজের সামান্য শরীর খারাপ হলেই মিলি ফোন করত সুজাতাকে। এখন করে আমাদের দশ বছরের ছেলের জন্য। এক

এক সময় মনে হয়, বিনা পয়সায় অত বড় ডাক্তারের চিকিৎসা পাওয়ার জন্যই কি মিলি সুজাতাকে মেনে নিল?

নিজের কোনও দরকারে সুজাতাও আমায় যখন তখন ডেকে পাঠায়। কাউকে হয়তো এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে হবে। কিংবা কোনও দরকারি জিনিস কোন দোকানে পাওয়া যায় খোঁজ নিতে হবে। কখনও আবার আমার গল্পও শুনতে চায়। বলে, “তোর একটা গল্প নিয়ে অমুক হসপিটালে চলে আয়। বিকেল তিনটে থেকে চারটে ফ্রি আছি।”

অফিসে কোনও ছুতো দেখিয়ে বেরিয়ে পড়ি। সুজাতাকে আমার গল্প শোনাতে ভাল লাগে। এক সময় ও-ই ছিল আমার গল্পের প্রথম পাঠক।

দুঃখের গল্প হলে জানলার বাইরে তাকিয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলে সুজাতা। তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, “ঠিক আছে। তুই এখন বাড়ি যা। আমার ওটি আছে।”

মিলির মতো সুজাতাকেও সন্দেহ হয় আমার। আসলে গল্পকারের দৃষ্টি তো, মানুষের মনের নানা প্যাঁচপয়জারের দিকে লক্ষ রাখতে হয়। আমার কেন যেন মনে হয়, সুজাতা আমার সঙ্গে সম্পর্কটা রেখে দিয়েছে ফাই-ফরমশ খাটানোর জন্য। আমার গল্প শুনে ওর দু'ফোঁটা চোখের জল হয়তো অভিনয়। যত দিন যাচ্ছে মানুষের সম্পর্কগুলো স্বার্থকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে। আগেকার আবেগ কিংবা মূল্যবোধ আর নেই। তবে মিলি বা সুজাতা আমার সঙ্গে যে আচরণই করুক, আমার তাতে কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। এই যেমন আজ আমাকে দেশের বাড়ি পাঠাচ্ছে সুজাতা, এতে আমার লাভই হচ্ছে। একটা নতুন জায়গায় যাওয়া হবে, গল্পের কোনও প্লট পেয়ে যেতে পারি। গ্রাম নিয়ে আমার তেমন গল্প নেই।

সুজাতার দেশ মোহানপুর নাকি গুণগ্রাম। ওদের পালপাড়ায় একমাত্র সুজাতাদেরই পাকা বাড়ি। ওদের পদবীতেই পাড়ার নাম। সুজাতার ঠাকুরদা ছিলেন দুঁদে উকিল।

তারেকশ্বরে ঢুকছে ট্রেন। সিট ছেড়ে উঠে পড়লাম। ট্রেনের পথটা তো ভালই এলাম। এখন দেখা যাক বাসে ভিড় কেমন হয়!

বাসেও ভিড় কম। জানলার ধারের সিটটা পাইনি। পরের সিটটায় বসে জানলার বাইরেটা দেখতে পাচ্ছি। বাস ছাড়ার খানিকক্ষণের মধ্যে গ্রামের প্রেক্ষাপটে এসে পড়লাম। জানলা দিয়ে দেখছি খেতজমি, পুকুর, মাটির বাড়ি। রোদ এখনও সে ভাবে চড়া হয়নি। এখন দশটা বাজতে দশ মিনিট দেরি। একদম সময় ধরে চলছে সব কিছু। সুজাতার দেশের বাড়ির কাজটা সেরে দুপুরের আগে বেরিয়ে আসতে হবে। ওদের বাড়িতে লাঞ্চার ঝামেলাটা রাখলে চলবে না। দুপুরের খাবারটা খাব বাড়ি ফিরে। রবিবারে বেলা করেই খাওয়া হয় বাড়িতে।

সুজাতাদের বাড়িতে খুব বেশি কাজ নেই

আমার। ও বাড়িতে এখন শুধু এক জনই বাসিন্দা। সুজাতার কাকিমা। উনিই বাড়ির দেখাশোনা করেন। সুজাতার কাকা মারা গেছেন বছর পাঁচেক হল। কাকা-কাকিমার সন্তান বলতে একটাই ছেলে। সে-ও বাবা মারা যাওয়ার আট মাসের মাথায় আত্মহত্যা করে। কারণ, প্রেমে আঘাত। খুড়তুতো ভাইয়ের ও ভাবে মারা যাওয়াটা আজও মনে নিতে পারেনি সুজাতা। সুজাতার দুই দিদি থাকলেও কোনও ভাই নেই। খুড়তুতো ভাই ছিল তার ছোটবেলার খেলার সঙ্গী।

গত শুক্রবার সুজাতা আমাকে ফোন করে হাসপাতালে ডেকেছিল। বলেছিল, জরুরি দরকার। প্রাইভেট হাসপাতালে ওর কেবিনে গোলাম। জরুরি দরকারটা বলল। আগের রাতে ও নাকি খুড়তুতো ভাই দিপুকে স্বপ্ন দেখেছে। তার পর থেকেই আদিবাড়ির জন্য মন টানছে সুজাতার। আমাকে বলল, “তুই গিয়ে এক বার বাড়িটা দেখে আয়। কাকিমা কেমন আছে দেখে শুনে আসবি। আর কিছু টাকা দেব তোকে। কাকিমার হাতে দিবি।”

আমি বলেছিলাম, “তোর মন টানছে, আমি দেখে এলে কি শান্তি পাবি? তুই বরং নিজেই ঘুরে আয় না।”

“আমি এতগুলো অপারেশন ফেলে যাই কী করে বল? রোগীর বাড়ির লোক সব আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে আছে। তুই দেখে এলেই আমার দেখা হবে। পরে সময় সুযোগ করে যাব। তখনও তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব,” বলেছিল সুজাতা।

আমি বুঝেছিলাম মোহানপুরে আমাকে যেতে হবেই। কবে যেতে হবে ঠিক করে দিল সুজাতাই। বলেছিল, “সামনের রবিবার চলে যা। অফিস ছুটি থাকবে তোর। দুপুরে আমাদের বাড়িতে খেয়ে নিস। কাকিমা অবশ্য তোকে না খাইয়ে ছাড়বে না।”

তখনই আমি ঠিক করে নিয়েছিলাম দুপুরে খাব না। সকাল সকাল কাজ সেরে চলে আসব। সুজাতার কাকিমাকে আমি কখনও দেখিনি। একদম অপরিচিত কোনও বাড়িতে খেতে আমার অস্বস্তি হয়।

কাজ বুঝিয়ে দেওয়ার পর সুজাতা ওর ছোটবেলার বাড়ি নিয়ে অনেক গল্প করল। দীর্ঘ স্মৃতিচারণ। অনেকটাই আমার আগে শোনা। নতুন বলতে যেটা বলল, ওর কাকিমা নাকি এখনও বিশ্বাস করেন তাঁর ছেলে আত্মহত্যা করেনি। বিশ্বাসটা এত দৃঢ়, নিজের ছেলেকে তিনি দেখতেও পান। কথা বলেন ছেলের সঙ্গে, মানে নিজের মনে বিড়বিড় করেন আর কী! ছেলেকে খাবার বেড়ে দেনা... ঘটনাটা খুবই কষ্টের। তবে গল্পের উপাদান আছে।

“দাদা, টিকিট।”

সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কন্ডাক্টর।

আমি পার্স বের করে মোহানপুর সদাশিবতলার ভাড়া জানতে চাই।

কভাস্টর বলে, “কুড়ি টাকা।”

পার্স থেকে ভাড়া বের করে দিই
কভাস্টরকে। বলি, “স্টপটা এলে আমাকে
একটু ডেকে দেবেন।”

টিকিট দিয়ে ঘাড় নাড়ে কভাস্টর।

বাস থেকে নেমে পড়েছি। কভাস্টরই
নামিয়ে দিল সদাশিবতলায়। জায়গাটা
ছোটখাটো বাজার মতো। সুজাতা বলেছিল,
“বাড়িতে পাঁচশো টাকার মিষ্টি নিয়ে যাস।
সদাশিবতলায় নেমে ভজন ময়রার দোকান
থেকে নিবি। ওদের মিষ্টি খুব বিখ্যাত।”

অবাক হয়েছিলাম, “বাড়িতে তো শুধু
কাকিমা। তাঁর জন্য পাঁচশো টাকার মিষ্টি!”

সুজাতা বলেছিল, “কাকিমা আশপাশের
বাড়িতে দেবে। তারা জানবে আমি পাঠিয়েছি।
ওদের ভুলে যাইনি জেনে খুশি হবে তারা।”

হাঁটতে হাঁটতে ভজন ময়রার দোকানের
সামনে এসে পড়লাম। টালির চালের দোকান।
টিনের বোর্ডে দোকানে নাম লেখা ‘তারা
মা মিষ্টান্ন ভান্ডার’। নীচে নামের চেয়েও
বড় অক্ষরে লেখা ‘ভজন ময়রার সুপ্রসিদ্ধ
দোকান’। চার ধাপ সিঁড়ি ভেঙে দোকানের
শো-কেসের সামনে দাঁড়লাম। মিষ্টিগুলোর
স্বাস্থ্য বেশ ভাল। দেখেই মনে হচ্ছে টাটকা।

শো-কেসের ও পারে একটি ছেলে এসে
জিজ্ঞেস করল, “কী দেব বাবু?”

“রসগোল্লা ক’টাকা করে?”

“পাঁচ আর দশ।”

“দশ টাকারটা দাও। পঞ্চাশ পিস,” বলার
পর জানতে চাইলাম, “ভাই, পালপাড়টা
কোনদিকে বলতে পারো?”

“খুব দূরে নয়। আপনি একটা রিকশা
নিয়ে নিন। মিনিট পনেরো মতো লাগবে।”

রিকশা চেপে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।
রাস্তার দু’পাশে প্রাচীন সব গাছ। মাটি,
গাছপালা, পুকুর, ডোবা মিলে অদ্ভুত এক
ঘোর লাগা গন্ধ। দেখতে দেখতে পালপাড়ায়
চলে এলাম। রিকশাওয়ালাই আমাকে
জানাল। এখানে এসে সুজাতার কথা মিলল
না। বলেছিল পালপাড়ায় ওদের বাড়িটাই
শুধু পাকা। তা নয়। বেশির ভাগ বাড়ি মাটির
হলেও, কয়েকটা পাকাবাড়িও আছে। সুজাতা
বোধহয় অনেক বছর আসেনি এ দিকে।

ছোট একটা মাঠের কাছে এসে দাঁড়িয়ে
পড়ল রিকশা। বেশ ক’টা বাচ্চা ছেলে মাঠে
ফুটবল খেলছে। রবিবার, স্কুল নেই। তাই
সকালেই খেলতে নেমে গেছে। রিকশাওয়ালা
হাত তুলে মাঠের ও পারের বাড়িটা দেখিয়ে
বলল, “ওই যে পালদের বাড়ি।”

উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একতলা বাড়ি। রং
সাদা। খোলা সদর দরজা লাগোয়া সিমেন্টের
লাল বেঞ্চ। সেখানে এক মধ্যবয়সি মহিলা
মাঠের দিকে মুখ করে বসে আছেন। একটু
বুঝি উদাসীন। মাঠের খেলায় মন আছে
বলে মনে হচ্ছে না। উনি নিশ্চয়ই সুজাতার

কাকিমা। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে মাঠের পাশে
পায়ে চলা রাস্তাটা ধরলাম। আমার কাঁধে
ব্যাগ, হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি।

সদরের কাছে গিয়ে মহিলাকে বললাম,
“আপনি তো সুজাতার কাকিমা? আমি
সুজাতার বন্ধু। আকাশ।”

অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন মহিলা। পিঠের
শাড়ি টেনে বললেন, “ও তাই নাকি! সাজু
পাঠিয়েছে তোমাকে! এসো বাবা, এসো।”

আমি কাকিমার হাতে রসগোল্লার হাঁড়িটা
ধরিয়ে স্নো মোশনে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম
করতে যাচ্ছিলাম, জানি উনি আমাকে
আটকাবেন। কিন্তু না, বাধা দিলেন না। প্রণাম
করে সোজা হতে গিয়ে খেয়াল করলাম
মাঠের হইচই বন্ধ। কী হল? ঘাড় ফিরিয়ে
দেখি মাঠের সমস্ত খুদে প্লেয়ার আমার পিছনে
এসে দাঁড়িয়েছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি
ওদের দিকে। খেলা ছেড়ে কেন এসে দাঁড়াল
ওরা? ব্যাপারটা ক্লিয়ার হল কাকিমার কথায়।
বাচ্চাগুলোকে বললেন, “দেব রে বাবা, দেব।
অতিথিকে আগে ঘরে বসাই। জল টল দিই।
তার পর সবাইকে দেব।”

বুঝলাম ওদের নজর রসগোল্লার হাঁড়িটার
দিকে। কাকিমা আমার উদ্দেশ্যে বললেন,
“চলো বাবা, ভিতরে যাই।”

দুপুরের খাওয়াটা কাকিমার কাছে খেতেই
হল। উনি আমায় প্রথমে বসার ঘরে নিয়ে
এলেন। বিশাল ঘর। চাউস সোফা-আলমারি
দিয়ে সাজানো। পুরনো আমলের সিলিং ফ্যান
চালিয়ে দিয়ে কাকিমা বলেছিলেন, “একটু
বিশ্রাম নাও। আমি শরবত নিয়ে আসি।”

গন্ধরাজ লেবুর শরবত আর আমার
আনা রসগোল্লা থেকে দুটো দিয়েছিলেন
কাকিমা। সামনের টেবিলে যখন গ্লাস আর
প্লেট নামাচ্ছেন। আমি খামে করে দেওয়া
সুজাতার টাকাটা ব্যাগ থেকে বের করে দিলাম
কাকিমার হাতে।

বলেছিলাম, “সুজাতা পাঠিয়েছে।”

উনি খামটা হাতে নিয়ে বললেন, “তুমি
কী ভালবাস? মাছ না মাংস?”

আমি বলেছিলাম, “এ মা, না। দুপুরে খাব
না আমি। এখনই চলে যাব।”

কাকিমা আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে
তাকিয়ে রইলেন, যেন এ রকম অবাস্তব কথা
জীবনে প্রথম শুনেছেন। তার পর বললেন,
“না খেয়ে গেলে এ বাড়ির কত বড় অমঙ্গল
হবে বুঝতে পারছ? বাড়ির লোকই বা কী
বলবে আমাকে!”

বাড়িতে আর লোক কোথায় যে, কেউ
কিছু বলবে কাকিমাতে? তা হলে উনি বোধহয়
সুজাতার কথা বলছেন। আমি ফের এক বার
বোঝাতে যেতেই কাকিমা বলে উঠেছিলেন,
“আমার বেশি ক্ষণ লাগবে না। একটু বাজার
ঘুরে আসি। তুমি তত ক্ষণ বাড়ির চারপাশটা
ঘুরে দেখো। স্নানও সেরে নিতে পারো

পাতকুয়োয়। গামছা তারে মেলা আছে।”

কথা শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে
গিয়েছিলেন কাকিমা। খানিক বাদে জানলা
দিয়ে দেখলাম কাকিমা এক হাতে বাজারের
ব্যাগ, অন্য হাতে আমার আনা রসগোল্লার
হাঁড়িটা নিয়ে সদরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।
মিষ্টিগুলো বিলোবেন মাঠের বাচ্চাগুলোকে
আর প্রতিবেশীদের।

বসার ঘর থেকে বেরিয়ে আমি
সুজাতাদের বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখতে
থাকলাম। তালা দেওয়া তিনটে ঘর। বসার
ঘর, রান্নাঘর আর কাকিমার ঘর খোলা। সবই
কড়ি বরগার ছাদ। বড় বড় দরজা, জানলা।
রান্নাঘরে গ্যাসের উনুনটা ছাড়া চার পাশে
একশো বছরের পুরনো আবহ। সুজাতা
আমাকে এ বাড়ির যা যা বর্ণনা দিয়েছিল,
সমস্ত মিলে যাচ্ছিল। লম্বা ঢাকা বারান্দা,
খোলা বারান্দা, চওড়া উঠোন, সেখানে প্রাচীন
আমগাছ, উঠোনের এক পাশে হাঁস-মুরগি
রাখার খাঁচা। এখন অবশ্য খাঁচাগুলো ফাঁকা,
ভাঙা। মোবাইলে বাড়ির কিছু ফোটা তুলতে
থাকলাম। সুজাতাকে গিয়ে দেখাতে হবে।

উঠোন থেকে চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে
ছাদে। সিঁড়ি ধরে উঠলাম উপরে। ছাদ থেকে
বাড়ির পিছনটা দেখা গেল। টলটলে একটা
পুকুর। সেটা ঘিরে অনেক গাছপালা। ভেসে
আসছিল নানা পাখির ডাক। শান্ত নিরালা
একটা বাড়ি।

বাড়িটার আবহাওয়ার মধ্যে এমন ভাবে
ডুবে গিয়েছিলাম, যেন দেখতে পাচ্ছিলাম এই
বসতবাটার অতীত বাসিন্দাদের। যার মধ্যে
ফ্রক পরা সুজাতাও আছে। ওর ভাই দিপুকেও
যেন দেখলাম দিদির সঙ্গে ছোটোপাটি করতে।

সুজাতার কাকিমা যদি এ বাড়ির দেখভাল
না করতেন, স্মৃতিগুলো এত জীবন্ত থাকত
না। মহিলার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে গেল আমার।

ছাদ থেকে নেমে বাড়ির পিছনে
গিয়েছিলাম। পুকুরটা দেখে চান করার লোভ
হচ্ছিল। কত দিন সাতার কাটিনি পুকুরে।
সাঁতার শিখেছি আমাদের পাড়ার পুকুরে।
পাড়ায় এখন একটাও পুকুর নেই। সব পুকুর
বুজিয়ে বাড়ি হয়ে গেছে।

এ বাড়ির পুকুর আমার কাছে একেবারেই
অচেনা, তাই এখানে সাঁতার কাটার ঝুঁকি
নিইনি। স্নান করলাম পাতকুয়ার জলে। কী
ঠান্ডা জল! কাঁপুনি এসে যাচ্ছিল।

কাকিমা তত ক্ষণে ফিরে এসেছেন। ঢুকে
গেছেন রান্নাঘরে। স্নান সেরে আমি যখন
বসার ঘরে ফিরছি। আওয়াজ পেয়ে কাকিমা
বলেছিলেন, “সেনবাড়ি তোমার খাবার দিতে
চাইছিল। নিইনি। তুমি বন্ধুর বাড়ি এসেছ। এ
বাড়ির রান্নাই তোমাকে খাওয়ানো উচিত।
তবে বেলার দিকে বাজার গেলাম তো, মাংস
পেলাম না। মাছ নিয়ে এসেছি।”

ঘরে ঢোকান আগে বলেছিলাম, “মাছই
আমি বেশি পছন্দ করি কাকিমা।”

রান্নাঘরে গ্যাস আভেন আছে, প্রেশার কুকারের সিটি কানে আসছিল। বুধতে পারছিলাম রান্নায় বেশি সময় লাগবে না। স্নান করার পর অল্প খিদে পাচ্ছিল। এমন সময় মাথায় এল, সুজাতা যে বলেছিল ওর কাকিমা নিজের মনে কথা বলেন, সে রকম তো কিছু দেখলাম না। উনি অবশ্য আমার সামনে খুব কম সময়ই থেকেছেন। ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম কাকিমা এক মনে রান্না করছেন। কই, নিজের মনে বিড়বিড় করছেন না তো!

আবার ফিরে এলাম বসার ঘরে। জানলা দিয়ে তাকিয়েছিলাম উঠানের দিকে। শালিক, চড়াই নেমে আসছে মাটিতে। ধুলো উড়িয়ে নিজেদের মধ্যে ঝটাপটি করছে। বড় করে শ্বাস টানছিলাম আমি। দূষণমুক্ত বাতাস যেন পেটের নাড়ি অবধি ঝুঁয়ে ফিরে আসছিল।

এক সময় কাকিমা এসে বললেন, “এসো বাবা, খেতে এসো। আমার হয়ে গেছে।”

মাথায় এল কাকিমার ক’টা ফোটো তোলার দরকার। সুজাতা অনেক দিন তার কাকিমাকে দেখেনি। কবে যে দেখবে তারও কোনও ঠিক নেই। মোবাইল হাতে নিয়ে কাকিমাকে বলেছিলাম, “চলুন, আপনার ছবি তুলি। আবার কবে আসা হবে কে জানে!”

কাকিমার মধ্যে কোনও দ্বিধা, সন্দেহ দেখলাম না। শাড়ি ঠিক করে টেনে তৈরি হয়ে গেলেন ফোটো তুলতে। আমি গুঁকে নিয়ে বাইরের বারান্দায় গেলাম।

ফোটো তুলে খেতে গেলাম রান্নাঘরে। আসন পেতে কাঁসার থালায় খেতে দিয়েছিলেন। কাঁসার গ্লাসে জল। পদ ছিল, ভাত, শাকভাজা, আলু-পটলের ডালনা আর মাছের ঝোল। তাতে দুটো মাছের টুকরো। সঙ্গে দই-মিষ্টি।

দারুণ রান্না! ঠাকুমা-দিদিমা আমলের স্বাদ। খুব তৃপ্তি করে খেলাম। খাওয়া শেষ হলে কাকিমা বললেন, “ঘরে গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও। বিকেলে একেবারে চা খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে।”

আপত্তি করলাম না। এ বাড়িতে থাকতে আমার ভালই লাগছে। খুব জোর করলে আমি হয়তো রাতেও থেকে যেতে পারি। আপাতত আমার আনা একটা সাময়িক পত্রিকা ওল্টাচ্ছি। মনে প্রশ্ন এল, সুজাতা যে বলেছিল, কাকিমা নিজের মনে বিড়বিড় করেন, দিপূর জন্য খাবার বাড়েন। বিড়বিড় করতে দেখলাম না। খাবার বেড়েছেন কি না দেখব?

সোফায় প্রায় শুয়েই ছিলাম। ম্যাগাজিনটা রেখে উঠে পড়লাম। ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেলাম। আরে, সত্যিই তো আসন পেতে খাবার বাড়ি আছে। কিন্তু কাকিমা কোথাও নেই। এই খাবার নিশ্চয়ই তাঁর নয়। মা-কাকিমারা এত গুছিয়ে খেতে বসেন না। সুজাতার কথা তা হলে মিলে গেল? এমন সময় উঠোন থেকে ভেসে এল

কার যেন ডাক, “মা! ও মা!”

ছিটকে বেরিয়ে এলাম বাইরের বারান্দায়। দেখি এক যুবক উঠোন ধরে এগিয়ে আসছে। আমাকে দেখে একটু থতমত খেল। এই ছেলেটিই ‘মা’ বলে ডাকছিল। বয়স হিসেব করলে দিপূর বয়সি হবে ছেলেটি। মাথাটা টাল খেয়ে গেল আমার। এটা কি ভৌতিক কাণ্ড? নাকি দিপূ আসলে মরেনি? ছেলেটি উঠে আসছে বারান্দায়। আমি তড়িঘড়ি বসার ঘরের দিকে এগোলাম।

পরের দিন। অফিস ফেরত এসেছি সুজাতার চেম্বারে, বসে আছি ভিজিটর এরিয়ায়। এটা ওর নিজের চেম্বার। বসে রাত আটটার পর থেকে। সুজাতা এখন রোগী দেখছে। ওর কম্পাউন্ডারকে বলেছি আমি এসেছি সেটা সুজাতাকে জানাতে।

জানিয়েছে নিশ্চয়ই। যে কোনও মুহূর্তে আমার ডাক আসতে পারে। আমি ঠিক করেছি সুজাতাকে সব রিপোর্ট দেব, শুধু কাকিমার দিপূর জন্য খাবার বাড়িটা বলব না। ওই যুবকের কথাও না। সে হয়তো দিপূ। নয়তো কাকিমাকে মা বলে ডাকবে কেন? এমনিতে আমার লেখায় নানা জটিলতা থাকলেও, বাস্তবে সেটার উপস্থিতি আমি পছন্দ করি না। সেই জন্য যুবকটি খেয়ে দেয়ে চলে যাওয়ার পর আমি কাকিমাকে জিজ্ঞেস করিনি ওর পরিচয়। যেন দেখিইনি ছেলেটাকে। বিকেল পড়তে কাকিমা আমার জন্য চা নিয়ে এসেছিলেন। সেটা খেয়ে কাকিমাকে প্রণাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি।

“স্যর, এ বার আপনি যান। ম্যাডাম ডাকছেন...” বলল, সুজাতার কম্পাউন্ডার।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলাম।

পুশ ভোর ঠেলে সুজাতার ঘরে পা রাখতেই, খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর মুখ। জিজ্ঞেস করল, “কেমন দেখলি সব?”

“বলছি, বলছি...” বলে সুজাতার টেবিলের এ পারের চেয়ারে বসলাম। বললাম সুজাতার দেশের বাড়িতে যা যা ঘটেছে।

সুজাতা জানতে চাইল, “কাকিমা আমার খুব নাম করছিল, না রে?”

কাকিমা ওর নাম প্রায় করেননি। তবু গুকে খুশি করতে বললাম, “তোমার কথা খুব বলছিলেন। ছোটবেলায় খুব দুরন্ত ছিল তুমি!”

সুজাতা নিজের মনে হাসতে লাগল।

“দুরন্ত” তথ্যটা ওর গল্প থেকেই পাওয়া। আমি বললাম, “দাঁড়া, মোবাইলে তোদের বাড়ির অনেক ছবি তুলেছি। তোকে দেখাই।”

“দেখাতে হবে না। আমার ফোনে পাঠিয়ে দে...” বলল সুজাতা।

ফোটোগুলো গুকে পাঠিয়ে দিলাম। মন দিয়ে দেখছে ছবিগুলো। মুখটা বিষণ্ণ, স্মৃতি ভারাক্রান্ত। হঠাৎ একটা ফোটোয় থামল সুজাতা। ওর ফোনের স্ক্রিন আমার দিকে ঘুরিয়ে জানতে চাইল, “এই ভদ্রমহিলা কে?”

আমি তো অবাক। বললাম, “কেন? তোর কাকিমা। চিনতে পারছিস না?”

সুজাতা জোর দিয়ে বলল, “ইনি আমার কাকিমা হতেই পারেন না। তুই ভুল ঠিকানায় চলে গিয়েছিলি।”

“বাড়ির ছবিগুলো দেখে কী মনে হল তোর? ওটা তোদের বাড়ি নয়?”

এ বার আর কোনও উত্তর নেই।

ফোটোগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে সুজাতা। বলছে, “কিছু একটা গন্ডগোল হয়ে গেছে রে! প্লিজ আকাশ, তুই আবার কাল মোহানপুরে যা। অফিসে ডুব মার। কাকিমার জন্য আমার ভীষণ টেনশন হচ্ছে। এই ভদ্রমহিলার পরিচয় জিজ্ঞেস কর। কাকিমার খবর জানার চেষ্টা কর। এই মহিলা তোকে এক বারও বললেন না যে, তিনি আমার কাকিমা নন!”

আমি চুপ করে থাকি। মহিলার কোনও দোষ নেই। আমি তো তাঁকে এক বারও জিজ্ঞেস করিনি, উনি সুজাতার কাকিমা কি না। শুধু বলেছিলাম, “আপনি তো কাকিমা?” তবে উনি সুজাতাকে চেনেন এটা বোঝা গিয়েছিল। তার মানে যে যুবকটি দুপুরে খেয়ে গিয়েছিল সে গুঁরই ছেলে।

“কী রে আকাশ! যাবি তো কাল?”

অসহায় ভাবে জানতে চায় সুজাতা। এত বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও ওর গুণগ্রামের বাড়িটা বেহাত হতে দিতে চায় না। একেই বলে মাটির টান।

আমি বললাম, “যাব।”

এক সপ্তাহ কেটে গেছে। আমি মোহানপুরে যাইনি। সুজাতাকে অবশ্য বলেছি, গেছি। আমি যেহেতু গল্পকার, একটা গল্প বানাতে হয়েছে সুজাতার জন্য। বলেছি, “উনি সেনকাকিমা। তোদের পাড়াতেই বাড়ি। তুই চিনতে পারলি না! তোর কাকিমা গেছেন বাপের বাড়ি। সেনকাকিমাকে বাড়িটা দেখাশোনা করতে দিয়ে গেছেন।”

ওই মহিলার মুখে সেনবাড়ির কথা শুনেছিলাম। চালিয়ে দিলাম সেঁটাই। সুজাতা একটু অনমনস্ক হয়ে বলেছিল, “হ্যাঁ, কাকিমা মাঝে মাঝে আরামবাগে বাপের বাড়ি যায় বটে। এক ভাই বেঁচে আছে। কিন্তু আমি এই সেনকাকিমাকে কিছুতেই মনে করতে পারছি না কেন বল তো?”

“এত কাজের মধ্যে থাকিস, সব কি আর মনে থাকে!”

আশ্বস্ত হল সুজাতা। সুজাতাকে ভুল বোঝানো নিয়ে আমি এতটুকু অনুতপ্ত নই। আমার গল্পটা একেবারেই বাস্তব ঘেঁষা। ওই মহিলার মতো অভিভাবকরাই তো অনেকের স্মৃতিকে পাহারা দেন, সজল করে রাখেন ভিটেমাটি। তিনি নিজের কাকিমা, না পরের, তাতে কী-ই বা আসে যায়!

শিল্পী: বৈশালী সরকার



জনগণের উদ্দেশে বক্তৃতামঞ্চ থেকে নেতার ভাষণ

লোকসমাজের কাছে ফেব্রার যুক্তসাধনা

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়

অনেক দিন আগে একটা গল্প শুনেছিলাম, সতিমিথ্যে জানা নেই, জানার তেমন দরকারও বোধহয় নেই। উড়োজাহাজের আদিযুগের গল্প। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বেড়াতে গিয়েছিলেন চিনের কিছু মানুষ। আমেরিকানরা তাঁদের নিয়ে গিয়েছেন এরোপ্লেন দেখাতে। তাঁরা গেলেন, যথাস্থানে শান্ত মুখে দাঁড়ালেন, সামনে দিয়ে ছুটে গেল সেই আশ্চর্য শকট, আকাশে উড়ল, ভাসল বেশ কিছু সময়, তার পরে নেমে এল। জীবনে প্রথম উড়োজাহাজ দেখলেন দূরদেশের অতিথিরা। শান্ত মুখেই। আমেরিকান গাইড সহজাত উত্তেজনায় জিজ্ঞাসা করলেন, “দারুণ না?” ওঁরা বললেন, “হ্যাঁ, ভালই তো।” জবাব শুনে একটু ক্ষুণ্ণ এবং ততোধিক বিস্মিত হয়ে গাইড প্রশ্ন করলেন, “আপনারা অবাক হলেন না?” অতিথিদের এক জন একই রকম ঠান্ডা

গলায় বললেন, “না তো! অবাক হওয়ার কিছু ছিল বুঝি? ওটা তো ওড়ার জন্যই বানিয়েছিলেন আপনারা। উড়েছে।”

আজকাল নানা উপলক্ষে যখনই কেউ বলেন, “দেশটা কী ছিল আর কী হয়ে গেল”, কিংবা নিজেরও যখন মনে হয় কথাটা, তখনই ওই গল্পটা খুব মনে পড়ে। ভাবি, এতে আশ্চর্য হওয়ার কী-ই বা আছে? এমনটাই হওয়ার কথা ছিল, হয়েছে। এক দিনে তো হয়নি! অযোধ্যায় একটা আস্ত মসজিদ যখন দিনেদুপুরে গোটা দুনিয়ার চোখের সামনে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল, তখন আমাদের অনেকের মনেই প্রথম অনুভূতিটা ছিল এক অপার বিস্ময়ের। এমনটা আদৌ ঘটতে পারে! তার পর তিন দশক কেটে গিয়েছে। অযোধ্যায় মাথা তুলছে রামমন্দির। লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, মন্দিরের মহিমা ততই দৃশ্যমান হবে। আমরা দেখব

এবং দেখব না। আমাদের দেখেও না দেখার অভ্যাস দারুণ পাকাপোক্ত হয়েছে, আর তার সঙ্গে সমান তালে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে বিম্মিত হওয়ার ক্ষমতা। যা হওয়ার নয়, হতে পারে বলে ভাবিনি কোনও দিন, তেমন কত কিছুই অনায়াসে ঘটছে এবং আমরা আরও অনায়াসে মেনে নিচ্ছি। সব সময় চেষ্টা করে মানতে হচ্ছে তা-ও নয়, প্রায়শই বেমালুম মেনে নেওয়া যাচ্ছে।

ভারতের বর্তমান শাসকদের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এইখানেই। কী হতে পারে, কী হতে পারে না, কোনটা স্বাভাবিক, কোনটা নয়, এই সমস্ত বিষয়ে সমাজের একটা বড় অংশের ধ্যানধারণা বা মানসিকতা তাঁদের জমানায় কেবল পাল্টে যায়নি, অনেকাংশেই উল্টে গিয়েছে। যেমন, ধর্মনিরপেক্ষতা বহুত্ববাদ সহিষ্ণুতা ইত্যাদি যে শব্দগুলি ভারতীয় গণতন্ত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবেই গণ্য হত, দেখতে দেখতে সেগুলি অবলীলাক্রমে অচল, অবাস্তব, উপেক্ষণীয়, এমনকি বর্জনীয় সাব্যস্ত হয়ে উঠল। শাসক গোষ্ঠীর নায়কনায়িকা এবং মুখপাত্ররা দিনে দু'বেলা এই শব্দগুলি উচ্চারণ করে চললেন রীতিমতো ব্যঙ্গবিক্রপের সুরে, আমরাও সেই উচ্চারণে অভ্যস্ত হলাম, যেন ওগুলো সত্য-সত্যই ব্যঙ্গবিক্রপের বিষয়। অন্য দিকে, তাঁদের শিবির থেকে অহরহ প্রচারিত হয়ে চলল এমন সমস্ত কদর্য এবং ভয়ানক বাণীমালা, যা আগে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং সংখ্যাগুরুরা আধিপত্যবাদ বলেই গণ্য হত। এই সে-দিনও যা অসহনীয় ছিল, তা খুব সহজেই সহনীয় হয়ে উঠল। এই সয়ে-যাওয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাস নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সামাজিক ভিতটি যে বহু দিন ধরে গড়ে তোলা হয়েছে এবং সমাজমানসে তার প্রতিস্পর্শী গণতান্ত্রিক বহুত্বের ধারণা ক্রমশই দুর্বল হয়েছে, এ কোনও নতুন কথা নয়। কিন্তু পুরনো হলেও কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই বাস্তবকে স্বীকার করে এবং তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই বাস্তবকে পাল্টানোর লড়াই সম্ভব হতে পারে, যে লড়াই গণতান্ত্রিক ভারতের ঘুরে দাঁড়ানোর পক্ষে, বস্তুত উঠে দাঁড়ানোর পক্ষে কেবল প্রয়োজনীয় নয়, অপরিহার্যও। প্রশ্ন হল, কী ভাবে সেই সংগ্রাম গড়ে তোলা যায়, কী ভাবে তাকে শক্তিশালী করে তোলা যায়।

সংস্কৃতির রাজনীতি

এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আমাদের সহায় হতে পারে একটি সাম্প্রতিক গ্রন্থ। গত বছরের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হয়েছিল সমাজতত্ত্ববিদ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের *জাতীয়তাবাদের সত্য-মিথ্যা*। তাঁর লেখা *দ্য ট্রুথস অ্যান্ড লাইজ অব ন্যাশনালিজম* (২০২১)-এর বাংলা তর্জমা এই বই। ‘জাতীয় সংস্কৃতির নামে আগাপাছতলা রাজনৈতিক’ হিন্দুত্বকে সারা দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়ার যে দানবীয় অভিযান সত্ত্ব পরিবারের শাসককুল চালিয়ে যাচ্ছেন এবং রীতিমতো সফল ভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন, চার্বাক নামক ‘অজ্ঞাত’ প্রাচীন কথকের জবানিতে লিখিত এ-বই তার এক বহুস্তর এবং গভীর বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ। সেই বিশ্লেষণ নিছক জ্ঞানচর্চার প্রকরণ নয়, ওই সর্বনাশা অভিযানকে প্রতিহত করার উপায় খোঁজার দায়ও তার পিছনে এক বড় তাগিদ হিসেবে কাজ করেছে। সেই তাগিদ থেকেই নাগরিকদের, বিশেষত শিক্ষিত ও সচেতন ‘অল্পবয়সি’দের উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট একটি আহ্বান জানিয়ে বইটি শেষ হয়। হিন্দুত্ববাহিনীর আগ্রাসী আধিপত্য থেকে দেশটাকে বাঁচানোর জন্য এক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান। ‘লড়াই লড়াই লড়াই চাই’ বলে দল বেঁধে রাস্তায় নেমে পড়লেই সে-কাজ সম্পন্ন হবে না, আবার সমমনস্কদের নিয়ে চেনাজানা এবং অনুকূল পরিমণ্ডলে বসে উদার ধর্মনিরপেক্ষতার জয়ধ্বনি দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে গরলাস্ত সংখ্যাগুরুবাদের মুণ্ডপাত করলেও দায় মিটেবে না। কী করতে হবে? একটা বড় কাজ জনসংযোগ সাধনের। ময়দানে ভিড় জমিয়ে মাচার উপর থেকে মাইক্রোফোন সহযোগে সেই ভিড়ের উদ্দেশ্যে সুসমাচার বিতরণ নয়, চাই সত্যিকারের সংযোগ গড়ে তোলার আন্তরিক এবং নিরন্তর উদ্যোগ। তার অনেক দিক, অনেক মাত্রা। একটি দিকের কথা বিশেষ করে বলা হয়েছে ওই উপসংহারের একটি অনুচ্ছেদে। সেটি উদ্ধৃত করা যাক:

“... অল্পবয়সিদের বলছি, এলিট আর সাধারণ জনতার মধ্যকার সাংস্কৃতিক দূরত্ব কমিয়ে আনো। শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজটা করতে হলে সবার জন্য ইংরেজি ভাষা শেখার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে অল্প কিছু ইংরেজি-জানা মানুষের মধ্যে যেসব জ্ঞান আর ধারণা সীমিত, তা আঞ্চলিক ভাষায় ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমার অনুরোধ, তোমরা বন্ধুরা মিলে নিজেদের জানা আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা, লেখালিখি করো, অভিনয় করো, বিতর্ক করো, সাংগঠনিক কাজ করো। তোমাদের ইংরেজি-বলা ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে যারা ইংরেজি পড়ে না, তাদের সঙ্গে কথা বলা। কাজটা পরিশ্রমসাধ্য। কিন্তু হলফ করে বলতে পারি, এই প্রচেষ্টা শুরু করলে ওয়েবসাইট খেঁটে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা জানা যায়, তার থেকে অনেক বেশি জানতে পারবে।”

পরের অনুচ্ছেদে আছে এই আহ্বানের অন্তর্নিহিত যুক্তিটির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: “সত্যি বলতে কি, হিন্দুত্বের রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইতে গেলে শুধুমাত্র রাজনীতির প্রাঙ্গণে লড়াই করলে চলবে না, তার বাইরেও যেতে হবে। মনে রেখো, জাতির সঙ্গে একাত্মবোধ করে মানুষ যে আবেগজনিত শক্তি অর্জন করে, তার জন্ম কল্পনায়। আর সেই কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করে গল্প, কবিতা, গান, নাটক। এই আবেগ ভাষার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। সেজন্যই বলছি, তোমরা বন্ধুরা মিলে যে ভাষা মানুষের সঙ্গে একাত্ম বোধ করায়, সেই ভাষার গভীরে বাস করতে শেখো।”

শুধুমাত্র রাজনীতির প্রাঙ্গণে লড়াই করলে চলবে না— এই কথাটিকে যেন ভুল ভাবে না বুঝি। রাজনীতি শব্দটিকে এই বাক্যে ব্যবহার করা হয়েছে তার চলতি অর্থে। সেই অর্থের গণ্ডি অতিক্রম করে রাজনীতির বৃহত্তর এবং গভীরতর ধারণাটি যদি বিবেচনা করা হয়, তবে জনসংযোগের গোটা প্রকল্পটিকে প্রবল ভাবে রাজনৈতিক বলেই গণ্য করতে হবে। বস্তুত, চলতি এবং সন্ধীর্ণ অর্থে যাকে রাজনীতি বলে চিনি, সর্বগ্রাসী রাজনৈতিক হিন্দুত্বের অভিযানকে তা দিয়ে প্রতিহত করা যাবে না, শিক্ষা-সংস্কৃতির যাবতীয় প্রকরণকে সর্বক্ষেত্রে সমস্ত প্রকারে ব্যবহার করতে হবে, সে জন্য এক দিকে ওই প্রকরণগুলিকে ক্রমাগত উন্নত করা দরকার এবং অন্য দিকে যাঁরা সেগুলি ব্যবহার করবেন তাঁদের নিরন্তর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে নিজেদের উন্নতি সাধন জরুরি— এই সামগ্রিক উদ্যোগটি সুস্পষ্ট ভাবেই রাজনৈতিক উদ্যোগ। রাজনীতিকে নতুন করে বোঝার এবং নির্মাণ করার উদ্যোগ।

লক্ষণীয়, হিন্দুত্ববাহিনী দীর্ঘদিন ধরে গোটা দেশে সে-কাজ চালিয়ে এসেছে, চার্বাকের ভাষায় ‘এদের নিষ্ঠাবান সৈনিকেরা বছরের পর বছর স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছে, দূর দূর জেলায়, দলিত মহল্লায়, আদিবাসী গ্রামে...’। ‘নিষ্ঠাবান’ শব্দটি বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা সচরাচর নিষ্ঠার ধারণাটিকে সদর্থক পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং অন্যায় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যও গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করা যায়, তেমন কাজ পৃথিবীতে বহু লোক অতীতেও করেছে, এখনও করছে। সত্ত্ব পরিবারের লক্ষ্য এবং কার্যক্রম বিপজ্জনক বলেই তাদের ‘নিষ্ঠাবান সৈনিকদের’ কর্মকাণ্ডকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার। এই সব কাজ চেনা অর্থে রাজনীতির প্রাঙ্গণে ঘটেনি, কিন্তু বিজেপি তথা সত্ত্বের রাজনৈতিক অভিযানে তার অবদান বিপুল, সূত্রাং একেবারে বাস্তব কার্যকারিতার দিক থেকেই ওই কাজগুলি প্রবল ভাবে রাজনৈতিক। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সত্ত্ব এই সত্যটি সম্পর্কে যোলো আনা সচেতন। নিজেদের ‘অ-রাজনৈতিক’ এবং ‘সাংস্কৃতিক’ তকমা নিয়ে তারা বরাবর আঠারো আনা সতর্ক থাকে, ‘আরএসএসের রাজনীতি’ শব্দবন্ধটি সভার মাঝে পড়লেই তৎক্ষণাৎ শজারুর কাঁটাগুলি সমুদ্যত হয়ে ওঠে। তারা জানে, সমাজের বিভিন্ন স্তরে লোকের মগজ এবং মনের দখল নিতে পারলে ক্ষমতা দখল করা এবং ধরে রাখার দৌড়ে অনেক দূর এগিয়ে থাকা যাবে। ‘আইটি সেল’ আকাশ থেকে পড়েনি, তার পিছনে আছে এই মগজ-দখল অভিযানের দীর্ঘ পরম্পরা। এবং তার তৎপর সেনানীরা কেবল ভার্চুয়াল পরিসরে নিজেদের কারবার সীমিত রেখেছেন মনে করলে মস্ত ভুল হবে। এই মুহূর্তে সদরে বা মফসসলে ইতস্তত পাড়ার মোড়ে নিয়মিত কান পাতলে অনেক সময়েই শোনা যায়, এক শ্রেণির



বার্তা প্রচারের ব্যাপক আয়োজন যথেষ্ট নয়, চাই প্রকৃত সংযোগ গড়ে তোলার আন্তরিক উদ্যোগ

মানুষ সঙ্ঘের গুরুকুলে উৎপন্ন রকমারি জ্ঞানামৃত পরিবেশন করছেন। ওয়াকিবহাল নগরবাসী জানেন, ওখানে আড্ডা নয়, ক্লাস চলছে।

হিন্দুত্ববাহিনীর প্রতিস্পর্ধীরা এই দৌড়ে উত্তরোত্তর পিছিয়ে পড়েছেন। নেহরু ঘরানার পুরনো জাতীয়তাবাদ থেকে শুরু করে সংসদীয় বা অন্য বর্গের বামপন্থা— সব পথ এসে এই এক জায়গায় মিলে যায়। তাদের রাজনীতিতে সাংস্কৃতিক মাত্রাটি উত্তরোত্তর ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর। হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে, তাদের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেওয়ার মধ্যেই এখন এই দলগুলির সাংস্কৃতিক অবস্থান সীমাবদ্ধ থাকে, সেই বক্তৃতার কণ্ঠস্বরও অবশ্য ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে, বক্তব্যও তথৈবচ। গল্প, কবিতা, গান, নাটক, খোলামেলা আলোচনা ইত্যাদি সংস্কৃতির যে সব প্রকরণের কথা চার্বাক বলেছেন, যা এক সময় আমাদের দেশে ‘প্রগতিশীল’ রাজনৈতিক দলগুলি প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার করত, সেগুলি এখন নিতান্তই গৌণ, উপেক্ষিত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ বিরল। মানুষের মনের দখল নেওয়ার বিশেষ কোনও উদ্যোগই আজ আর তাদের কার্যক্রমে অবশিষ্ট নেই। চিন্তাভাবনাতো আছে বলে মনে হয় না। এখানে পশ্চিমবঙ্গের কথাই বিশেষ করে বলছি। এ-রাজ্যের রাজনীতি থেকে যথার্থ সাংস্কৃতিক অনুশীলনের চিন্তা এবং কাজ প্রায় পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে। তাকে ফিরিয়ে আনা জরুরি। কিন্তু সে-কাজ কেবল দলীয় রাজনীতির উপর ছেড়ে দেওয়া চলে না। সমাজের বৃহত্তর পরিসরে এই সাংস্কৃতিক জনসংযোগ বা জনসংযোগের সংস্কৃতিকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় গড়ে তোলা দরকার, দরকার তাকে যত দ্রুত সম্ভব যত বেশি সম্ভব প্রসারিত করা। ‘যুদ্ধকালীন’ শব্দটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য, কারণ আমরা এখন যে সঙ্কটে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তাকে যুদ্ধপরিস্থিতি বললে কিছুমাত্র অতুক্তি হয় না। সর্বগ্রাসী বিধাত্ত বিদ্বেষের গ্রাস থেকে নিজেদের বাঁচাতে চাইলে এই উদ্যোগের কোনও বিকল্প নেই। এখানেই চার্বাকের পরামর্শের গুরুত্ব। তিনি দলীয় রাজনীতিকে সরিয়ে রাখার কথা বলেননি, কিন্তু জনসংযোগকে তার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ রাখার পরামর্শও দেননি। উদ্যোগটা সমাজের ভিতর থেকেই আসা দরকার, রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠী সেই সমাজের অঙ্গ, তার অংশ। বস্তুত, অংশীদার।

কথা বলা, কথা শোনা

কী ভাবে গড়ে তোলা যায় সেই উদ্যোগ? তার কোনও তৈরি-করা

কর্মসূচি নেই, থাকতে পারে না। বস্তুত, কর্মসূচি তৈরি করার কাজটাও হবে এই উদ্যোগেরই অঙ্গ। সেই কর্মসূচি যদি তার রূপায়ণের মধ্যে দিয়ে, সেই রূপায়ণের উদ্যোগ থেকে উঠে আসা সাফল্য ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পরিমার্জিত হতে থাকে, তা হলেই সেটা ফলপ্রসূ হবে। অর্থাৎ, জনসংযোগের মধ্য দিয়েই জনসংযোগের পথ খুঁজতে হবে। তরুণতরুণীদের উদ্দেশ্যে চার্বাকের একটি বাক্য এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণীয়: “তোমাদের ইংরেজি-বলা ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে যারা ইংরেজি পড়ে না, তাদের সঙ্গে কথা বলো।” পশ্চিমবঙ্গে এই ‘কথা বলা’র কাজটিই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় এবং সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। প্রয়োজন এবং অবহেলা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে। গভীর সম্পর্ক। সূত্রী অবহেলার কারণেই প্রয়োজন এত বেশি, আবার প্রয়োজন এত প্রবল বলেই অবহেলা এমন ক্ষতিকর। অবহেলা আজকের নয়, বহুকালের। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে গড়ে ওঠা আমাদের সামাজিক পরিসরটিতে তথাকথিত ‘শিক্ষিত’ এবং ‘সংস্কৃতিমান’ বর্গটি কেবল আকারে ক্ষুদ্র নয়, তার মজ্জায় মজ্জায় নিহিত আছে শিক্ষা-সংস্কৃতির বিপুল অভিমানে।

‘পিপল লাইক আস’ নামক বলয়ের অধিবাসী যে ভদ্রমণ্ডলী বৃহত্তর লোকসমাজকে মানসিক ভাবে অস্পৃশ্য করে রেখেছেন, তাঁরা এই আলোচনায় গৌণ, কারণ তাঁরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশীদার হতেই রাজি নন। ‘সামাজিক মানুষ’ অর্থে তাঁদের মনুষ্যত্বই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু যাঁরা বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সংযোগ রচনা করতে চান তাঁরাও— ব্যতিক্রম সাপেক্ষে— জনসংযোগ বলতে বোঝান উপর থেকে একতরফা কথামৃত বিতরণ। হিসেবটা সহজ সরল: তাঁরা জানেন কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল, কোনটা নান্দনিক, কোনটা প্রগতিশীল; সেই জ্ঞানাজ্ঞানশলাকায় তাঁরা অজ্ঞানতিমিরাক্ষ মুঢ়জনের চক্ষু উন্মীলন করবেন, সমাজ সংস্কৃত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের কথা বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ শিক্ষিত নাগরিক সমাজের সাংস্কৃতিক চিন্তায় ও কর্মকাণ্ডে তাঁদের ভূমিকা প্রধান ছিল বললে কম বলা হবে, সেই ভূমিকা প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্যে পর্যবসিত হয়েছিল। এহো বাহ্য, আগে কহ আর। সাড়ে তিন দশকের ধারাবাহিক বামফ্রন্ট শাসনের প্রভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং বৃহত্তর বামপন্থী পরিসরের মধ্যে সীমারেখা উত্তরোত্তর অস্পষ্ট হয়েছে, দলীয় মতামতকেই সাধারণ ভাবে বাম আদর্শ বা চিন্তা হিসেবে



মনোযোগ দিয়ে মানুষের বক্তব্য শোনা বিচক্ষণ নেতার গুণ

গণ্য করতে সমাজ অভ্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক-সাংস্কৃতিক চিন্তায় প্রথমত জারি হয় বামপন্থী আধিপত্য, ক্রমশ তা দলীয় আধিপত্যের রূপ নেয়। এই কারণেই আমাদের সাংস্কৃতিক রাজনীতিকে দলীয় রাজনীতির থেকে আলাদা করে দেখা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই প্রেক্ষাপটেই প্রশ্ন ওঠে— দলীয় রাজনীতির চালকরা বৃহত্তর লোকসমাজের সঙ্গে সংযোগের কাজটিকে কী ভাবে দেখেছেন?

সমস্যা সেখানেই। আমাদের বামপন্থী নেতাদের (নেত্রীরা তো বিরলের মধ্যেও বিরলতম) মনোজগৎও সচরাচর ‘পিপল লাইক আস’-এর বলয়েই সীমাবদ্ধ থেকেছে— তাঁদের চিন্তা-চেতনাতোও বরাবর এই ধারণার প্রবল প্রতাপ ছিল যে, লোকসমাজের ‘প্রাকৃত’ রুচি ও বিশ্বাসকে উন্নততর ভাবনার সাহায্যে ‘সংস্কৃত’ করাই তাঁদের দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে বামপন্থী দলনেতাদের, বিশেষত তাত্ত্বিক নেতাদের সামাজিক অবস্থানের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। তাঁরা ছিলেন সাধারণ ভাবে সমাজের উপরতলার মানুষ। উচ্চকোটির সাংস্কৃতিক অভিমান এবং দূরত্ব তাঁদের, সকলের না হলেও, অনেকেরই মজ্জাগত। কেউ কেউ হয়তো সেই অভিমান বর্জন করতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁরা ব্যতিক্রমী। উপরতলার নেতাদের এই সাংস্কৃতিক অভিমানকে একটা তাত্ত্বিক যুক্তির অবয়ব দেওয়ার দরকার ছিল। সেই প্রয়োজন মেটাতে উপযোগী হয়ে উঠল ‘ভানগার্ড পার্টি’র ধারণা। কেতাবে বলা আছে: পার্টি জানে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, সে পথ দেখাবে। পার্টি মানে দাঁড়াল পার্টির নেতৃত্ব। এ-বার, সেই নেতৃত্ব তাঁদের সাংস্কৃতিক ধারণাকে ‘ইহাই সত্য’ বলে পরিবেশন করলেন। মেলালেন তাঁরা, মেলালেন।

সন্দেহ নেই, এই প্রবণতা ইতিহাসের সমস্ত পর্বে একই রকমের ছিল না। গত শতাব্দীর প্রথমার্ধে, বিশেষত চল্লিশের দশকে লোকসমাজের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সংশ্লিষ্ট বা সমর্থক বিভিন্ন গণসংগঠনের একটা যথার্থ সংযোগ রচনার আন্তরিক উদ্যোগ হয়েছিল, কেবল দলীয় মত প্রচারে সীমিত না থেকে মানুষের কাছে গিয়ে তাঁদের দাওয়ায় বসে কথা শোনার এবং বোঝার চেষ্টাও চলেছিল। কিন্তু পরবর্তী ইতিহাসে সেই ধারা ক্রমে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়। বিশেষত সত্তরের দশকে রাজশাসনের ক্ষমতা হাতে আসার পরে বামপন্থী রাজনীতিকদের চোখে সংস্কৃতির চর্চা হয়ে দাঁড়ায় পার্টি বা পার্টির ‘সংস্কৃতিমনস্ক’ নায়কদের বিচার-বিবেচনার বিষয়, জনসমাজের সঙ্গে সংযোগের উপায় বা পরিসর

হিসেবে সংস্কৃতির কোনও প্রয়োজনই তাঁরা স্বীকার করেননি, হয়তো আদৌ উপলব্ধি করেননি। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, বামফ্রন্ট জমানার প্রথম পর্বে সাক্ষরতা আন্দোলন একটা বড় রকমের আশা জাগিয়েছিল, কিন্তু অচিরেই পার্টি-প্রশাসনের আমলাতন্ত্র সেই আন্দোলনকে গ্রাস করে, সামাজিক আন্দোলন দেখতে দেখতে সরকারি কর্মসূচিতে পরিণত হয় ও এক সময় দিগন্তে বিলীন হয়ে যায়। এই কাহিনি সাংস্কৃতিক আধিপত্যের রাজনীতিকেই নির্ভুল ভাবে চিহ্নিত করে।

এই উপর-থেকে-নীচে আসা সংস্কৃতির পরিণতি যা হওয়ার ছিল, তা-ই হয়েছে। লোকসমাজ তার দিক থেকে ক্রমশ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। রাজনীতির পরিসরে এই মুখ-ফেরানোর উৎকট পরিণাম আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি। এখানে সে-প্রশ্ন নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, অর্থনীতি এবং প্রযুক্তির কল্যাণে ঝাঁপিয়ে পড়া অন্তহীন বিনোদনের সুনামিতে প্লাবিত লোকসমাজে পরিশীলিত রবীন্দ্ররুচি এবং শ্লোগানবদ্ধ মাস্করবাদ, কোনওটিই আর হালে পানি পাচ্ছে না। আমরা, তথাকথিত প্রগতিশীল ভাবনা এবং সুস্থ রুচির ধ্বজাধারীরাও, হতাশায় অথবা বিরক্তিতে, সেই সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। আমাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে বসে ‘ওদের’ রুচিহীন মানসিকতার নিন্দায় পারস্পরিক ঘাড়-নাড়ার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রসাদ খুঁজেছি। অক্ষম এবং নিষ্ফলের আত্মপ্রসাদ। মনে পড়ল, কিছু দিন আগে একটি বামপন্থী সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমাবেশে কিছু সময় কাটানোর অবকাশে কয়েক জনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে ‘প্রগতিশীল সংস্কৃতি’ চর্চা করে আসা মানুষ তাঁরা, সমাজের ভাল চান, চতুর্দিকে কদর্যতার উপদ্রবে মর্মান্বিত। তাঁদের ধারণা, হাতে ক্ষমতা থাকলে নতুন করে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতেন, এই কুরচির কবল থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করার চেষ্টা করতেন। কেউ এক বারও বললেন না, যাঁদের শোধরতে চাইছেন তাঁদের কথা শোনা দরকার, জানা দরকার তাঁরা কী ভাবছেন, কী পছন্দ করছেন, কী বিশ্বাস করছেন, কেনই বা। লোকের ভাল করার সমস্ত স্পৃহা যদি লোকের প্রতি, তাঁদের চিন্তাভাবনা, রুচি-পছন্দের প্রতি প্রবল বিরাগ এবং/অথবা গভীর অবহেলার ভিতরে উপর দাঁড়িয়ে থাকে, তবে পরিণাম অতি সহজেই অনুমেয়।

লোকসমাজ যা ভাবছে, যে ভাবে পৃথিবীকে দেখছে, রুচি, বিনোদন,



উগ্র সাম্প্রদায়িক আগ্রাসন ও ধ্বংস

সংস্কৃতি ইত্যাদির যে অর্থ তৈরি করছে এবং অনুশীলন করছে, তাকে নির্বিবাদে মেনে নেওয়ারও কোনও প্রশ্ন নেই। সেই ভাবনায় পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন বিরাট। কেন? প্রশ্নটা কেবল গুরুতর নয়, জটিলও বটে। আমরা সচরাচর জন-রুচির অবনমন বা বিকৃতি নিয়ে এই কারণে চিন্তিত বোধ করি যে, তা আমাদের রুচি এবং নীতিবোধে আঘাত করে। ভাল-মন্দের একটা নীতিমূলক বিচারের ভিত্তিতেই আমরা বাস্তবকে দেখি। শেষ বিচারে এটা আধিপত্যের অবস্থান থেকেই দেখার শামিল। কিন্তু অন্য ভাবেও বাস্তবকে দেখা সম্ভব, তার সমালোচনা সম্ভব, তাকে পরিবর্তনের যুক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। জনরুচিকে আমাদের নৈতিকতার চশমা দিয়ে না দেখে সেই রুচির নির্মাণ ও অনুশীলনের সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা বুঝতে পারব, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে লোকসমাজের চিন্তায় ও চেতনায় এক গভীর এবং মৌলিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে চলেছে। এক কথায় বললে, সেটা হল নিজস্ব ভাবনার ক্ষয়। নিজের মতো করে ভাবতে পারার যে সামর্থ্য একটা সার্থক জীবনের অন্যতম বিনিয়াদি শর্ত, যার অভাবে সামাজিক মানুষ তার মৌলিক স্বক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়, সমাজের এক বিরাট অংশ সেই সামর্থ্য উত্তরোত্তর হারিয়ে ফেলেছে। রুচি বা প্রগতিশীলতা অনেক পরের কথা, জনপ্রিয় সংস্কৃতির চেহারা-চরিত্র আজ যেখানে পৌঁছেছে, তা যথার্থ ভাবনার সমস্ত পথ রোধ করে, সেই সংস্কৃতির প্লাবনে ভেসে যেতে যেতে ভাবনার সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে যায়।

এবং, এই চিন্তাশক্তিহীন মনে খুব সহজেই প্রবেশ ও অধিষ্ঠান করতে পারে সমস্ত পরিবারের প্রচারিত ধ্যানধারণাগুলি। এটা কোনও আকস্মিক আপতন নয় যে, তাদের গুরুকুলে প্রশ্ন করার অভ্যাসকে সুনজরে দেখা হয় না। যে মস্তিষ্কে প্রশ্ন জন্মায় না, সেটাই আধিপত্যবাদের কাক্ষিত। নিজস্ব চিন্তাকে খর্ব করে, ধ্বংস করে তোতাকাহিনি রচনার লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষার আয়োজন থেকে শুরু করে অষ্টপ্রহর গণমাধ্যম এবং সমাজমাধ্যমে নাগরিকদের রকমারি উত্তেজনায় নেশাগ্রস্ত করে রাখার গোটা ব্যবস্থাটাই সেই অ-চেতন মগজ নির্মাণের মহাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। অন্য সমস্ত প্রশ্ন সরিয়ে রাখলেও বলা যায়, শুধু এই কারণে

সমাজের সাংস্কৃতিক ক্ষয়কে মেনে নেওয়া যায় না যে, তা হিন্দুত্ববাহিনীর সাংস্কৃতিক অভিযানকে বিপুল ভাবে সাহায্য করছে, তার এগিয়ে যাওয়ার পথ ক্রমাগত প্রশস্ত করে দিচ্ছে। এই সত্যটিকে আমরা আজও তার প্রাপ্য গুরুত্ব দিইনি। দেওয়া দরকার।

সহযাত্রীর সন্ধান

প্রশ্ন হল, এই ক্ষয় রোধ করে সাংস্কৃতিক উত্তরণের পথে কী ভাবে লোকসমাজকে সহযাত্রী করে তোলা যাবে? কেন তাঁরা সহযাত্রী হবেন? তথাকথিত শিক্ষিত নাগরিক বর্গের ‘স্বাভাবিক’ নেতৃত্ব আজ আর লোকসমাজ মেনে নেবে না। আজ যদি গল্পে কবিতায় নাটকে গানে আলোচনায় তর্কবিতর্কে জনসমাজকে হিন্দুত্বের মোকাবিলায় সমর্থ ও সচল করে তুলতে হয়, তবে তা এমন ভাবে করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের চেতনা স্বাভাবিক ভাবে সাড়া দিতে পারে। কঠিন কাজ। সে-কাজে নামতে চাইলে ফিরে আসতে হবে ওই ‘কথা বলা’র কথাতেই। দশকের পর দশক, প্রজন্মের পর প্রজন্ম যাঁদের উপেক্ষা করে এসেছি অথবা উপদেশ দিয়েছি, তাঁদের কাছে গিয়ে শুনতে হবে, কী তাঁদের কথা, জানতে হবে তাঁদের আনন্দ ও বেদনার সুলুকসন্ধান। যথার্থ শুশ্রূষা নিয়ে তাঁদের দাওয়ায় গিয়ে বসলে তাঁরা অবশ্যই কথা বলবেন। মানুষ কথা বলতে চান, যদি শ্রোতা তৈরি থাকে। এবং সেই কথা বলার মধ্য দিয়েই তাঁরা ভাববেন, চিন্তার অনুশীলন করবেন, আমরা শ্রোতারা সেই অনুশীলনের শরিক হব। এবং শরিক হয়ে উঠতে পারলে আমরাও উপলব্ধি করব, কী ভাবে তাঁদের কাছে আমাদের চিন্তাভাবনাগুলোকে পৌঁছে দিতে হবে, যা তাঁদের চেতনায় নতুন প্রাণের সঞ্চারণ ঘটতে পারে, তাঁদের ভাবিয়ে তুলতে পারে, তাঁদের মন এবং মস্তিষ্কে নতুন সামর্থ্য দিতে পারে। সেই সামর্থ্য আবার তাঁদের প্রয়োজনের ধারণাকেও পাল্টে দেবে, পাল্টে দিতে থাকবে। প্রয়োজন কেবল খাওয়া-পারার নয়, কেবল রুজি রোজগারের নয়, সাংস্কৃতিক প্রয়োজনও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত, খাওয়া-পরা, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলির সঙ্গে সংস্কৃতির ধারণাকে মেলাতে পারলে সাংস্কৃতিক প্রয়োজনও মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে বাধ্য। দরিদ্র নাগরিকের সন্তান যদি সরকারি স্কুলে ভাল ভাবে লেখাপড়া শিখতে পারে, তা হলে তার ভবিষ্যৎ আজকের মতো তমসাচ্ছন্ন মনে হবে না, আর তখন তিনি নিজের জীবন-বাস্তবের মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করবেন, সুস্থ সমাজবোধ এবং সংস্কৃতির চর্চা কেন সেই ভবিষ্যতের পক্ষে মূল্যবান। সেই বোধের প্রেরণাতেই বিদ্রোহের প্রচারকদের বিরুদ্ধে নিজের অবস্থান খুঁজে নেবেন তিনি। লোকসমাজের সাংস্কৃতিক প্রয়োজনকে তার জীবনযাপনের সঙ্গে গ্রথিত করতে পারলেই সেই সমাজ আমাদের সাংস্কৃতিক অভিযানে সহযাত্রী হয়ে উঠতে পারে, বিদ্রোহ এবং একাধিপত্যের বিরুদ্ধে অমিত শক্তিদ্বারা সহযাত্রী।

হিন্দুত্ববাহিনীকে প্রতিহত ও পরাস্ত করার জন্য সামাজিক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক অভিযান, এই দুইয়ের সমন্বয় সাধন আজ কেবল জরুরি নয়, অপরিহার্য। তরুণ প্রজন্মের শিক্ষিত সচেতন নাগরিকদের এই যৌথ উদ্যোগেই অগ্রণী হতে হবে। সে জন্য প্রয়োজন নিরন্তর অনুশীলন, পরিশ্রম, পুরনো দিনের ভাষায় যার নাম ‘সাধনা’। এলিট সমাজের— অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থানের একমাত্রিক ছকে বাঁধা অর্থে নয়, শিক্ষা-সংস্কৃতির সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিতে যাকে ‘এলিট’ বলা যায়, সেই সমাজের ঘেরাটোপ ছিন্ন করে লোকসমাজের সহযাত্রী ও সহযোদ্ধা হয়ে উঠে যথার্থ সাংস্কৃতিক রাজনীতির যুক্তসাধনা শুরু করার জন্য চার্বাক অল্পবয়সীদের যে পরামর্শ দিচ্ছেন, এই যৌথ নির্মাণের মধ্যে দিয়েই তা রূপায়ণের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। আবারও বলা দরকার, বড় অর্থে যাকে রাজনীতি বলে বুঝি, কাজটি তা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সমাজের বৃহত্তর অংশের মানুষের সঙ্গে, তাঁদের দৈনন্দিন জীবন ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আন্তরিক সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়েই সেই রাজনীতি অগ্রসর হতে পারে। এক দিন আমাদের রাজনীতি এই সংযোগের সাধনায় অভ্যস্ত ছিল। আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি। ছবিটা নতুন করে আঁকা দরকার।



পরিচয়

স্মরণজিৎ চক্রবর্তী

১৯৯৮

॥ বিজু ॥

বাড়ির পিছনের দিকটা এই দুপুরবেলা একদম ফাঁকা। লোহার ঘোরানো সিঁড়িটা দিয়ে এই যে ডলিদি নেমে আসছে, সেটা বিজু আর কামু ছাড়া কেউ জানে না।

আজ ডলিদির বিয়ে। তাই বাড়ি থেকে বেরোনো একদম বারণ। কিন্তু না বেরিয়ে ডলিদির উপায় নেই। সবার চোখের আড়াল দিয়ে, লুকিয়ে ডলিদি তাই বাড়ির পিছনের জমাদার আসার সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে।

ও দিকটায় ডলিদির ঘর। সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম। সেই বাথরুমের সিঁড়িটাই ডলিদি কাজে লাগিয়েছে।

ডলিদি লাহাবাড়ির মেয়ে। যেমন সুন্দরী, তেমন

লেখাপড়ায় ভাল। ওদের এই জারুলতলির সবাই ডলিদিকে সম্রমের চোখে দেখে। কত যুবক যে ডলিদিকে পছন্দ করে তার ইয়ত্তা নেই! বিজুকে যে ডলিদি খুব ভালবাসে, সেটা সবাই জানে। তাই অনেকেই বিজুকে ধরে, বলে ডলিদিকে যেন তাদের হয়ে একটু বলে বিজু।

বিজুর বয়ে গিয়েছে বলতো! বিজুর যাতে লাভ নেই, সে কাজ ও করে না। এই যে ডলিদির বিপদে বিজু সাহায্য করছে, সেটাও লাভ ছাড়া নাকি?

হ্যাঁ, ডলিদি বিপদে পড়েছে! মানে ভালই বিপদ যাকে বলে। সেই ব্যাপারেই ডলিদি গতকাল বিজুকে ডেকে পাঠিয়েছিল।

বিজু অবাক হয়েছিল খুব। কাল ডলিদির বিয়ে, সেখানে আজ এমন ওকে আর্জেন্টলি ডেকে পাঠাল কেন?

লাহারা এই অঞ্চলের নামকরা সোনার ব্যাপারী। এখানে তো বটেই, কলকাতাতেও ওদের চারটে বড় বড়

সোনার দোকান আছে।

সব গয়না ওরা এখানেই বানায়। বিশাল বড় লাহাবাড়ির এক পাশে ওদের গয়না তৈরির ঘর। সারা দিন সেখান থেকে ঠুকঠাক শব্দ আসে। দরজার কাছে বিশাল লম্বা-চওড়া দু'জন দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকে।

অন্য দিন কামু ওর সঙ্গে থাকলেও গতকাল কিন্তু বিজু একাই গিয়েছিল। কারণ, ডলিদি তেমনই বলেছিল ওকে।

কামুটা আসলে খুব সরল। জীবনের প্যাঁচঘোঁচ বোঝে না। আর বিজুকে বিশ্বাস করে খুব। বিজুও ওকে সঙ্গে রাখে, কারণ কামুর থেকেও নানা সুবিধে পায় ও। কামুর বাবা লাহাদের ব্যবসার ম্যানেজার। কামুর হাতে টাকাপয়সা থাকে টুকটাক। কামু সে সব বিজুর জন্যই খরচ করে।

ডলিদি কিন্তু বিজুর চরিত্রের এই দিকটা জানে না। আসলে বিজু খুব ভাল করে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে জানে। ও বোঝে একটা মানুষেরই নানা জনের কাছে নানা পরিচয় হয়।

গতকাল লাহাবাড়িতে গিয়ে বিজু দেখেছিল, বিশাল বড় বাড়িটা যেন বিয়ের আনন্দ-আয়োজনে ফেটে পড়েছে। এর মধ্যে ডলিদির কী এমন দরকার পড়ল!

ডলিদির ঘরে ঢুকে কেমন যেন থমকে গিয়েছিল বিজু। ডলিদি এমন চুপ করে বসে আছে! কেন? মুখচোখ শুকনো। উস্কোখুস্কো! ব্যাপারটা কী?

বিজু সাবধানে জিজ্ঞেস করেছিল, “কী হয়েছে ডলিদি?”

ডলিদি কাঁপা গলায় বলেছিল, “খুব বিপদে পড়েছি। আমার পাঁচ হাজার টাকা খুব দরকার রে বিজু। কী করব বুঝতে পারছি না।”

“পাঁচ হাজার!” বিজু ঘাবড়ে গিয়েছিল। এ যে অনেক টাকা! ও কোথায় পাবে? আর ডলিদি কি সত্যি বলছে? ডলিদির টুকটাক মিথ্যে বলার অভ্যাস আছে। কিন্তু বিয়ের আগের দিন মিথ্যে বলবে! তাও টাকা নিয়ে!

বিজুর বাবার ছোট একটা ফোটা স্টুডিয়ে আছে। তাতে খুব যে ভাল আয় হয়, তা নয়। ওই কোনও মতে চলে যায়। মফসসলের ফোটা স্টুডিয়ো থেকে কত আর আয় হতে পারে? ওর পক্ষে তো আর এত টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয়!

ও জিজ্ঞেস করেছিল, “কেন ডলিদি! এত টাকা লাগবে কেন?”

ডলিদি বলেছিল, “আসলে লাগবে তিরিশ! কিন্তু আমি কুড়িয়ে বাড়িয়ে পঁচিশ জোগাড় করতে পেরেছি। আর পারছি না।”

পঁচিশ হাজার টাকাও অনেক টাকা! ডলিদির কাছে সেটা থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু বাকি পাঁচ হাজার ও কোথা থেকে পাবে?

“এত টাকা কেন লাগবে ডলিদি?” প্রশ্নটা করতে না চেয়েও করে ফেলেছিল বিজু।

ফর্সা ডলিদি নিমেষে লাল হয়ে গিয়েছিল। এই রে ভুল কিছু জিজ্ঞেস করে ফেলল নাকি? বিজু সঙ্গে সঙ্গে বলেছিল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে, বলতে হবে না। বাদ দাও!”

ডলিদি সময় নিয়েছিল একটু। তার পর বলেছিল, “তোমার সাহায্য যখন চাইছি তখন তোকে বলি! তুই চঞ্চলদাকে চিনিস? আমায় গান শেখায়?”

“আরে হ্যাঁ! চঞ্চল ঘোষ। ওই সারেং-বাড়িতে একা একা থাকে। ও সম্পর্কে আমার বাবার পিসতুতো বোনের ননদের ছেলে। কেন? কী হয়েছে? ও কিছু করেছে?”

ডলিদি যেন আরও একটু লাল হয়েছিল। চোয়াল শক্ত করে চোখের জল সামলাতে সামলাতে বলেছিল, “আমি গাধা এমন একটা কাণ্ড করেছে! মুহূর্তের দুর্বলতায় ওর সঙ্গে... মানে ওকে... কী বলি তোকে! আমার এমন কিছু ওর কাছে আছে, যা অন্য কারও হাতে পড়লে বিপদ হবে আমার। ও বলছে তিরিশ হাজার দিলে সে সব ফেরত দেবে! পঁচিশ আছে... তাই পাঁচ... এ সব তোকে বিশ্বাস করে বলছি... আর তো কাউকে বিশ্বাস করা যাবে না!” ডলিদি মাথা নামিয়ে নিয়েছিল।

কাল বিয়ে আর আজ এমন বিপদ! চঞ্চল একটা ফালতু মাল। দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু একদম বাজে ছেলে। ওদের বাড়িতে ওকে নিয়ে নানা কথা শুনেছে।

বাবাকে বলতে শুনেছে, “হারামজাদা শয়তান একটা। নিজের রূপ দিয়ে ভুলিয়ে কত জনের যে সর্বনাশ করেছে!”

বাবার কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল বিজুর! চঞ্চল তা হলে ডলিদিরও সর্বনাশ করেছে!

ডলিদি বিছানা থেকে উঠে এসে হাত ধরেছিল বিজুর, “কিছু একটা কর। না হলে আমায় সুইসাইড করতে হবে! প্লিজ! আমি টাকাটা বোভাতের দিনই দিয়ে দেব! প্লিজ!”

বিজু খানিক ভাবার ভান করে বলেছিল, “এক জন আছে। কিন্তু পাঁচের বদলে তাকে ছ'হাজার ফেরত দিতে হবে।”

“ছয়!” ডলিদি মাথা নেড়ে বলেছিল, “ঠিক আছে, তাই... তাই দেব! বিয়ে করে যাওয়ার সময় মা আমায় বেশ কিছু টাকা দেবে সঙ্গে রাখার জন্য। আমি তার থেকে দিয়ে দেব। আমি তোমার পায়ে পড়ি বিজু কিছু একটা কর!”

বিজু কিছু করেনি। করেছে কামু।

গতকাল লাহাবাড়ি থেকে ফিরে বিকেলে কামুকে নিয়ে নদীর ধারে গিয়েছিল বিজু। তার পর বাঁধের উপর বসে, জিলিপির ঠোঙা হাতে ধরিয়ে বলেছিল, “খুব বিপদ হয়েছে কামু। তুই কিছু না করলে ডলিদির প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে!”

“আমি!” কামু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল বিজুর দিকে।

বিজু বলেছিল, “ছ'হাজার টাকা ডলিদির খুব দরকার! তুই একটু জোগাড় করে দিতে

পারবি না?”

“ছ...” কামুর গলায় জিলিপি আটকে গিয়েছিল, “এত টাকা! কেন?”

বিজু মিথ্যে করে বলেছিল, “ডলিদির এক বান্ধবী। তাদের খুব দরকার। ডলিদি বড় মুখ করে বলেছে। এখন ছয় শট হচ্ছে! প্রেস্টিজের ব্যাপার! প্লিজ!”

“তুই জোগাড় করতে পারছিস না?” কামু জিলিপিটা ঠোঙায় ঢুকিয়ে ফেলেছিল।

“আমাদের অবস্থা তো জানিস!” বিজু বলেছিল, “তোমার বাবা... মানে ইয়ে কাকু তো লাহাদের সোনার দোকানের ম্যানেজার। বিক্রিবাটা দেখে! গাড্ডি গাড্ডি টাকা থাকে কাকুর কাছে! মোটে ছ'হাজার। ডলিদি বোভাতের দিন দিয়ে দেবে! প্লিজ একটু দেখ!”

কামু অবাক হয়ে বলেছিল, “বাবা ধরতে পারলে মেরে ফেলবে!”

“তুই এত সাহসী, বুদ্ধিমান! তোমার কথা তো ডলিদিই বলল। এখন তুই না বাঁচালে ডলিদির সম্মান থাকে না!”

ঠোঙা হাতে ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল কামু। তার পর বলেছিল, “ডলিদি আমার কথা নিজে বলেছে!”

করুণ মুখে মাথা নেড়েছিল বিজু। মনে মনে আনন্দ হচ্ছিল খুব! ডলিদির সর্বনাশ আর ওর পৌষ মাস! এক হাজার প্রফিট!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল ডলিদি। পরনে ময়লা একটা চুড়িদার। গায়ে মাথায় জড়ানো ওড়না। এ ভাবে কেউ ডলিদিকে চিনতে পারবে না।

ডলিদি কাঁপা গলায় বলল, “স্নানে ঢুকেছি বলে বাথরুমের পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে এসেছি। কাজ সেরেই ফিরব! বিজু, তুই এনেছিস তো রে?”

কামুর থেকে আগেই টাকা নিয়ে নিজেরটা সরিয়ে রেখেছিল বিজু। এবার খামে ভরা বাকি পাঁচ হাজার এগিয়ে দিল। তার পর “চলো ডলিদি, বদলে নিজের সাইকেলের দিকে এগোল ও।

ডলিদিও এগিয়ে গেল সাইকেলের দিকে! তাড়াতাড়ি গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। বিয়েবাড়ি থেকে বৌ গায়েব জানলে কেলেকারির শেষ থাকবে না।

বিজু দেখল কামু একা একা দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিজু হাসল মনে মনে। লোকে কামুকে ওর বন্ধু হিসেবে জানলেও, ও কামুকে জানে বুদ্ধি হিসেবে।

৯ কামু ৯

সকালে ঘুম থেকে উঠে একটু থম মেরে বসে থাকে কামু। কিন্তু আজ তা করল না। আসলে ও যে কাজটা করেছে, সেটা ধরা পড়ে গেলে বাড়িতে যে কী লম্বাকাণ্ড হবে সেটা ও ভাল করেই জানে! ওর বাবা লোকটা খুব

তিরিক্ষি মেজাজের। সবার সঙ্গে খেঁকিয়ে ছাড়া কথা বলতে পারে না।

কামুরা দুই ভাই এক বোন। বোন ছাড়া বাকি সবাই বাবার ভয়ে কাঁঠ হয়ে থাকে। বোনের জন্য যেন বাবা দেবদূত! আর বাকি সবার জন্য রাক্ষস! একটা মানুষেরই যে কত পরিচয় হয়, কামুর ভাবলে অবাক লাগে।

লাহাদের সোনার ব্যবসার টাকা-পয়সাসহ অনেকটাই দেখে বাবা। খিটখিটে হলেও বাবা খুব সং। তাই লাহাবাবু খুব নির্ভর করেন বাবার ওপর। এমন অবস্থায় যদি টাকা নিয়ে গোলমাল হয়, কী যে হবে কেউ জানে না!

বিজু টাকার কথা বলার পরেই কামুর পেটের মধ্যে কেমন যেন গুড়গুড় করছিল। মনে হচ্ছিল তালবাগান মাঠে পূজোর সময় যে লাল ফটফটি বাইকটা মরণকুপের কাঠের কুয়োর গায়ে চক্কর মারে, সেটা ওর পেটের মধ্যেই বাইবাই করে ঘুরছে!

কিন্তু বিজু ওর প্রাণের বন্ধু। ওর কথা ফেলে কী করে! তা ছাড়া ডলিদি নিজে ওর কথা বলেছে! ভাবা যায়! ডলিদি হল জারুলতলির রবিনা ট্যান্ডন। কামুর কাছে মেঘলা দিনের আলো।

বিজুকে সব কথা বলে ও। কিন্তু এটা বলতে পারে না। কারণ, বিজু শুনলে ভাববে এর মধ্যে যৌনতা আছে। হ্যাঁ সেটা আছে, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে প্রেম! অন্যের প্রেমের ব্যাপারটা সাধারণ মানুষজন ঠিক ধরতে পারে না। যত ক্ষণ না সে নিজে কষ্ট পায়, তত ক্ষণ প্রেমের কষ্ট সে উপলব্ধি করতে পারে না। তাই নিজের প্রেমের কষ্ট অন্যকে শুনিয়ে লাভ হয় না। কামু যতই বোকা হোক, এটা বোঝে।

শুধু ডলিদি ওর কথা নিজে বলেছে বলে গাঁটরি থেকে ছ'হাজার টাকা সরিয়েছে কামু। বাবার কাছে এমন করে মাঝে মাঝে কিছু টাকা রাখে লাহাবাবু। বাবা মাসের শেষে এক সঙ্গে সব হিসেব বুঝিয়ে ফেরত দেয়!

কামু মনে মনে হিসেব করেছিল যে, বিয়ের দুদিনের মাথায় বৌভাত। সে দিন ওরা কন্যাত্রী গেলে এক ফাঁকে টাকাটা বিজুকে দিয়ে দেবে ডলিদি। আর তার পর বিজু সেটা ওকে দিলে, ও বাড়ি এসে জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে দেবে! এর মধ্যে লাহাবাড়িতে ডলিদির বিয়ে নিয়ে বাবা ব্যস্ত। বিশ্বস্ত লোক হিসেবে অনেক দায়িত্বও আছে বাবার উপর। বৌভাত মিটলে আসবে। ফলে কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না!

তবে মনে যথেষ্ট ভয় আছে কামুর। বাই চাপ যদি কোনও গোলমাল হয়, তা হলেই ও শেষ!

তাই কাল রাতে বিয়েবাড়ির সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিজুকে জিজ্ঞেস করেছিল কামু, “কী রে, টাকাটা সময় মতো ফেরত পাওয়া যাবে তো?”

“যাবে না কেন? ডলিদি কি মিথ্যে বলবে?

শুধু কাউকে এটা বলিস না কিন্তু! মনে থাকে যেন। ডলিদি নিজে তোকে ভরসা করেছে!” বিজু কাঁধে হাত দিয়েছিল ওর!

কামু বলেছিল, “চিন্তা করিস না। আমি কাউকে বলব না।”

বিজু আরও কিছু বলত, কিন্তু তখনই শাঁ করে সাইকেল নিয়ে ওদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল চঞ্চলদা।

এই লোকটাকে খুব খারাপ লাগে কামুর। দেখতে সুন্দর হলেই যে মানুষ ভাল হয় না, তার উদাহরণ হল এই লোকটা। সব সময় খারাপ খারাপ কথা বলে। লোকটাকে দেখেই কেমন যেন শক্ত হয়ে গিয়েছিল কামু।

চঞ্চলদা বলেছিল, “কীবে নস্টে ফস্টে, বিয়েবাড়িতে জায়গা হয়নি? পাছায় লাথ মেরে বের করে দিয়েছে?”

বিজু গম্ভীর গলায় বলেছিল, “তুমি যাও চঞ্চলদা, এখানে ফালতু ঝামেলা করো না।”

“হুঁং বিয়ে!” মাথা নেড়ে চঞ্চলদা চলে যাওয়ার আগে বলেছিল, “হাজারটা চুরি করে চোর এখন শালু সেজেছে!”

চঞ্চলদা চলে যাওয়ার পরে সে দিকে চোয়াল শক্ত করে তাকিয়েছিল বিজু।

কামু জিজ্ঞেস করেছিল, “এই কথাটার মানে কী রে? চঞ্চলদা এমন বলল কেন? চোর মানে? কে চোর?”

বিজু কোনও উত্তর দেওয়ার আগেই হইচই শুরু হয়ে গিয়েছিল চার দিকে। ওরা দেখেছিল বিশাল প্রসেশন করে বরকে নিয়ে পাড়ায় ঢুকছে বরযাত্রী।

“দাদা, বাবা ডাকছে তোকে!” চাঁপা, মানে বোনের ডাকে চটকা ভাঙল কামুর।

বাবা! এখন! ক'দিন তো বাবার ফেরার কথা নয় বাড়িতে! তা হলে হঠাৎ এখন বাবা কী করছে এখানে!

একটা বরফের গিরগিটি হাঁটে গেল কামুর শিরদাঁড়া দিয়ে। পৃথিবীটা যেন নড়ে উঠল আচমকা। ওর মনে হল মরণকুপের সেই বাইকওয়ালা যেন ফটফটি বাইকটার স্পিড বাড়িয়ে দিল দ্বিগুণ! এ বার কী হবে?

বাবা বিছানায় বসেছিল। সামনে টাকা রাখার গাঁটরি খোলা। ফর্সা মানুষটা লাল হয়ে আছে একদম।

“ছ'হাজার টাকা কম কেন?” বাবা সরাসরি জিজ্ঞেস করল!

ভয়ে প্রায় পেছাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল কামুর! বাবা আচমকা টাকা নিতে এসেছে কেন? বিয়েতে লাগবে?

কোনও মতে নিজেকে সামলে নিয়ে কামু বলল, “আমি জানি না বাবা!”

বাবা যেন কামুর মুখ থেকে এটা শোনার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

“শুয়ারের বাচ্চা!” বলেই বাবা ঝাঁপিয়ে পড়ে কামুকে মাটিতে ফেলে লাথি মারতে

শুরু করল। আর বলতে লাগল, “হারামি! জানোয়ার! কোথায় টাকা বল! চাঁপা নিজে তোকে চুরি করতে দেখেছে! বল শালা কোথায় টাকা। বল...”

বাবার গায়ে অসুরের শক্তি। কামু কিছু ক্ষণের মধ্যেই চোরের মার খেয়ে নেতিয়ে পড়ল। সব কেমন যেন আবছা! যেন জলের তলা থেকে পৃথিবী দেখার মতো লাগছে সব! এর মধ্যে বাবা কী সব বলে যাচ্ছে।

মারছে। চিৎকার করছে। কিন্তু কিছুই যেন আর গায়ে লাগছে না ওর! শুধু মনে হচ্ছে শরীরের ওজন কয়েক হাজার কিলো হয়ে গিয়েছে!

মারটা থামল আচমকা। কামু আবছা ভাবে যেন বুঝল, মা এসে নিজের শরীর দিয়ে আগলাচ্ছে ওকে। মায়ের গায়েও কয়েক ঘা পড়েছে, তার পর বাবা মারটা বন্ধ করেছে!

মা কোনও মতে কামুকে তুলে বসাল। তার পর নিজের হাতের দুটো সোনার চুড়ি খুলে বাবাকে দিয়ে বলল, “নিজের ছেলেকে কেউ এমন করে মারে? এটা নাও। বিক্রি করে টাকা মেটাও! এটা আমার মায়ের চুড়ি। তোমাদের গুপ্তির নয়, নাও!”

আবছা চোখে কামু দেখল বাবা চুড়ি দুটো হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে!

নিজের জন্য জীবনে এই প্রথম বার গর্ব হল কামুর। এত মার খেলেও ও কিন্তু বিজু বা ডলিদির নাম বলেনি! ও বোকা হতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক নয়।

আচমকা বাইরে থেকে একটা গলা পেল ওরা, “ব্রেলোক্যা, এই ব্রেলোক্যা, লাহাবাবু ডাকছে তোমায়। চলো! ও দিকে কেলেঙ্কারি হয়েছে। চঞ্চল সুইসাইড করেছে! পুলিশ এসেছে, চলো।”

বাবা দ্রুত টাকার থলি আর চুড়ি দুটো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

টালুমালা মাথা আর সারা শরীরের ব্যথা নিয়ে বসে রইল কামু। চঞ্চলদা সুইসাইড করেছে! কেন? কাল রাতেও তো দেখল ওকে! তা হলে? কী হল হঠাৎ!

ঘেঁটে যাওয়া মাথা আর শরীর নিয়ে বসে রইল কামু। সেদিন রাতে জ্বর এসেছিল। জ্বরের ঘোরেও বুঝতে পারছিল, মা সারারাত জেগে মাথার কাছে বসে আছে। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর ফিসফিস করে বলছে, “ভাল হয়ে যাবি শিগগিরই, চিন্তা করিস না, মা আছেন মাথার উপর...”

আচমকা সেই ঘোরেই সব কিছু মুছে ফেলে ওর মনে হল, সকালেই তো চলে যাওয়ার কথা, ডলিদি নিশ্চয়ই চলে গিয়েছে! আচ্ছা, ডলিদি কি ওর কথা মনে রাখবে?

পাঁচিশ বছর পরে, ২০২৩

॥ বিজু ॥

কত দিন পরে ডলিদিকে দেখল বিজু!

বেশ মোটা হয়ে গিয়েছে ডলিদি। মাথার চুলে পাক। চোখে রিমলেস চশমা। গায়ের রং যেন আরও ফর্সা হয়েছে! পঁচিশ বছর পরে মাসখানেক হল আয়ারল্যান্ড থেকে এখানে ফিরে এসেছে ডলিদি।

শুনেছে ডলিদির স্বামী মারা গিয়েছে কিছু দিন আগে। এক ছেলে বিদেশেই পড়ছে। ডলিদি শুধু মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে এসেছে। দিন দশেক হয়ে গেলেও বিজুর দেখা করতে আসা হয়নি ডলিদির সঙ্গে।

আসলে পুরনো দিন তো আর নেই! বিয়ের মাসদুয়েকের মধ্যে বিদেশ চলে গিয়েছিল ডলিদি। তার পর আর যোগাযোগ ছিল না। সেটাই স্বাভাবিক। বিজু কে? পাড়ার পাতানো ভাই ছাড়া তো আর কেউ নয়।

এই পঁচিশ বছরে বিজুর জীবন অনেক পাল্টে গিয়েছে। বাবা মারা গিয়েছে কয়েক বছর আগে। ওদের ফোটো স্টুডিও এখন বিজুই চালায়। ভালই চলে ব্যবসা। লোকজন আজকাল ছবিপাগল। সারা ক্ষণ সব কিছুকে ডকুমেন্ট করে রাখার প্রবণতা সবার। তার সঙ্গে বিয়ের ছবি তোলার ধুমও পড়েছে! প্রি-ওয়েডিং, ওয়েডিং, পোস্ট-ওয়েডিং, কন্ড রকমের ছবি। লাখ টাকার উপরে সব প্যাকেজ! নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ। ভালই রোজগার হয় বিজুর।

বিজু কলকাতাতেও একটা স্টুডিও করবে বলে সম্প্রতি একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। অ্যাডভান্স দশ লাখ। আর সেটা শোধ দিতে গিয়েই বেকায়দায় পড়েছে বিজু। নগেন মাহাতোর থেকে কিছু ধার করেছে। তাও মাস পাঁচেক হয়ে গেল। শোধ দিতে দিতে এখনও দু'লাখ বাকি।

নগেন ইদানীং খুব চাপ দিচ্ছে। আকারে ইঙ্গিতে বলছে মাসখানেকের মধ্যে টাকা শোধ না দিলে মুশকিল হবে!

নগেনের নাকি খুন করতে হাত কাঁপে না। বিজুর ভয় করছে এ বার। উন্নতি করার নেশায় যতটা হজম করতে পারে, তার চেয়ে বেশি খেয়ে ফেলেছে ও! কী যে করবে এখন!

লাহাদের কাছে গিয়েছিল বিজু। লাহাবাবুর ছোট ছেলে শান্টুদা এখন বাড়ির মাথা। বিজুকে ভালই চেনে। ওদের হয়ে নানা অনুষ্ঠানে কাজও করেছে বিজু। তা ছাড়া এক সময় ডলিদি যে ওকে ভাই হিসেবে দেখত, সেটাও শান্টুদা জানে।

বিজু দু'লাখ টাকা ধার চায় শুনে শান্টুদা বলেছিল, “টাকা কি গাছে ফলে বিজুবাবু? এক কাজ কর। এখানকার স্টুডিওটা তো তোর নিজের। সেটা বন্ধক রাখ আমার কাছে। বদলে টাকা দিচ্ছি। সম্পর্ক সম্পর্কের জায়গায়, ব্যবসা ব্যবসার! কী বলিস?”

আরে, এখানকার স্টুডিওটার কাগজও তো ব্যাঙ্কে জমা আছে। কিন্তু সেটা আর বলেনি শান্টুদাকে। বিজু মাথা নিচু করে বাড়ি ফিরে এসেছিল।

আর এর কয়েক দিন বাদে, মানে আজ থেকে দু'সপ্তাহ আগে একটা কাণ্ড হয়েছিল! বাবার পিসতুতো বোন মণিপিসি মারা গিয়েছিল। বিধবা, নিঃসন্তান মানুষ। সাত কুলে বিজু ছাড়া তার আর কেউ নেই! তাই শ্রাদ্ধের কাজকর্ম সব বিজুকেই করতে হয়েছে। আর তার পর যা কিছু পিসির ছিল, সব ওরই হয়েছে!

তবে পিসির প্রায় কিছুই ছিল না। নড়বড়ে চৌকি। জাল-ছেঁড়া মিটসেফ। পালিশ-ওঠা আলনা। কিছু সাপা থান। সাড়ে ছ'শো টাকা। আর একটা টিনের বাস্ক। তালা দেওয়া। গায়ে বাংলায় লেখা—শ্রীচঞ্চল ঘোষ।

বৌ আর ছেলে ঘুমিয়ে পড়ার পরে, দু'দিন আগে গভীর রাতে টিনের বাস্কটা বের করেছিল বিজু। তার পর পলকা তালটাকে হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে খুলেছিল ডালাটা।

কিছু কাচের গুলি। হলেদেটে হয়ে যাওয়া একটা গানের বই। জং ধরা জ্যামিতি বস্ক। বেশ কিছু গানের খাতা। ব্যস, আর কিছু নেই।

ও বুঝেছিল যে চঞ্চল মারা যাওয়ার পরে পিসির কাছে এসেছিল এগুলো। চঞ্চলেরও কেউ ছিল না তা হলে।

এ সব জাক্স। ফেলে দেবে বাস্ক ধরে। ভেবেও কী মনে হওয়ায়, একটা গানের খাতা নিয়ে ফরফর করে পাতা উল্টে দেখেছিল বিজু। আর তখনই একটা লম্বাটে খাম খাতার ভিতর থেকে উড়ে গিয়ে পড়েছিল মাটিতে। কী এটা? কী আছে এতে!

বিজু খামটা তুলেছিল মেঝে থেকে। তার পর খাম থেকে বের করেছিল চারটে রঙিন ছবি ও তার নেগেটিভ!

“কেমন আছিস বিজু?” ডলিদি হেসে জিজ্ঞেস করল।

বিজু বলল, “এই চলছে এক রকম। তুমি কেমন আছো?”

ডলিদিকে কেমন যেন ক্লান্ত লাগছে। এখন বছর পঞ্চাশেক বয়স ডলিদির। কিন্তু যেন আরও বেশি মনে হচ্ছে!

ডলিদি হাসল। স্নান হাসি। তার পর বলল, “ভুল দিনে এলি বিজু। আমি একটু বেরোব। কোনও দরকার ছিল? না হলে অন্য দিন আসিস, গল্প করব।”

“আসলে ডলিদি,” ইতস্তত করল বিজু, তার পর পকেট থেকে একটা খাম বের করে সামনে বাড়িয়ে দিল। বলল, “এটা... মানে এই ছবি আর নেগেটিভগুলো... চঞ্চল ঘোষের ট্রাক্স থেকে পেয়েছি। তুমি খারাপ কিছু মনে কারো না ডলিদি... আমি জানি... এ ভাবে এসব আচমকা ছবি... চঞ্চল একটা জানোয়ার ছিল। আমি ছবি আর নেগেটিভ তোমায় দিয়ে গেলাম। নষ্ট করে ফেলো!”

ডলিদি কিছু ক্ষণের জন্য যেন পাথরের মতো হয়ে গেল। তার পর খাম থেকে ছবিগুলো বের করে দেখল এক বার। চোখ

স্থির। চোয়াল শক্ত! মুখের রং কি বদলাল!

বিজু কী বলবে বুঝতে পারল না। ওর সব মনে পড়ে গেল এক লহমায়!

সেই দুপুর! টাকা! রাত্রি! মৃত্যু!

মনে পড়ল টাকাটা ডলিদি ফেরত দিয়েছিল ওকে। কিন্তু ও কামুকে ফেরত দেয়নি! বুদ্ধুটাকে টুপি দিয়ে বলেছিল, ডলিদি টাকা দেয়নি।

ডলিদি ছবিগুলো খামে ঢুকিয়ে বলল, “জানিস, চঞ্চল কী ভাবে মারা গিয়েছিল?”

“হ্যাঁ জানি। সুইসাইড! বিষ খেয়ে!” বিজু মাথা নাড়ল।

“না, কেউ জানে না। কিন্তু আমি তোকে বলছি বিজু, সবাই সুইসাইডই জানে! আসলে আমি মেরেছিলাম জানোয়ারটাকে। ওকে ভালবাসতাম আমি। সেই সুযোগ নিয়ে আমার এমন কিছু ছবি তোলে ও। পরে বুঝে যখন সরে গেলাম, ও রাগ করতে লাগল। এর পর আমার বিয়ে ঠিক হলে, ও ব্ল্যাকমেল শুরু করল। সেই তিরিশ হাজার টাকা! মনে আছে? আমি সে দিন দুপুরে ওর কাছে গিয়েছিলাম টাকা দিতে। ও আমায় ছবি ও নেগেটিভ ফেরত দিয়েছিল। কিন্তু জানতাম ওর কাছে নিশ্চয়ই আরও আছে! তাই ওর পানের মধ্যে সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছিলাম। সোনার কাজ হয় আমাদের। সায়ানাইড পাওয়া কঠিন নয় আমার পক্ষে। পানের ডিবের চারটে পানের একটাতে সায়ানাইড দিয়ে এসেছিলাম। যখন ওটা খাবে তখন মরবে। আর আমি স্পটে থাকব না। হাতের ছাপ যাতে না পড়ে তাই হাতে ওড়না জড়িয়ে নিয়েছিলাম! শয়তানটা সেই মারণপানটা খেয়েছিল রাতে! নানা গোয়েন্দা গল্প পড়েছি জীবনে। ভেবেছিলাম এ ভাবেই কাজে লাগাই সেই বিদ্যো...” ডলিদি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার পর আচমকা কথা ঘুরিয়ে বলল, “ছেঁটদা বলছিল, তোর নাকি টাকার দরকার? সত্যি?”

বিজু হাঁ করে তাকিয়ে রইল। সত্যি ওর টাকার দরকার। সেটাও এখানে আসার আগে মনে ছিল। ভেবেছিল পুরনো দিনের দোহাই দিয়ে যদি ডলিদির থেকে টাকা নিতে পারে। কিন্তু এখন আর ও সব মনে নেই।

ও কোনও মতে বলল, “টাকা? না না, আমি কিছু চাই না ডলিদি। আমার কাছে কোনও ছবিটিবিও আর নেই। তুমি এগুলো নষ্ট করে ফেলো!”

ডলিদি হাসল। তার পর বলল, “একটু দাঁড়া, আসছি। তোর বিপদ, টাকার দরকার! শুনে খারাপ লেগেছে আমার!”

আরও দশ মিনিট পরে রাস্তায় বেরোল বিজু। হাতে একটা মিষ্টির প্যাকেট। ডলিদি দিয়েছে। বলেছে দিদি হিসেবে দিয়েছে, বাড়িতে গিয়ে যেন প্যাকেট খোলে।

মিষ্টি! কুলকুল করে ঘামছে বিজু। এখনও ডলিদির পক্ষে সায়ানাইড পাওয়া

কঠিন নয়। সোনার কাজ এখনও হয় এই বাড়িতে। চোকো মিষ্টির বাস্কে কি তা হলে মৃত্যু আছে? সত্যি কি ডলিদি চঞ্চল ঘোষকে মেরেছিল? নাকি মিথ্যে বলছে। ডলিদি যে টুকটাক বানিয়ে এমন নানা কথা বলত। ওর কাছে যে কোনও ছবি নেই সেটা কি আদৌ বিশ্বাস করেছে? কিন্তু এমন ব্যাপারে কি মিথ্যে বলবে কেউ!

আজ এই অঞ্চলে কেবল ফল্ট হয়েছে। চার দিক অন্ধকার। বিজু পিছন ফিরে দেখল। রাক্ষসপুরীর মতো লাগছে অন্ধকার বিশাল বাড়িটাকে। ওকে কি ওখান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ডলিদি?

না, এ সেই ছোটবেলার ডলিদি নয়, এ রাক্ষসী! এ জীবনে আর কখনও ওর সামনে যাবে না বিজু!

সামনেই, পথের পাশে একটা ময়লা ফেলার প্লাস্টিকের ডাব্বা! বিজু দূর থেকেই সেই দিকে ছুড়ে দিল প্যাকেটটা। পকেট থেকে রুমাল বের করে ভাল করে হাত মুছে নিল। তার পর নিজের বাইকের দিকে এগিয়ে গেল। মনে মনে বলল, 'দিদি না ছাই! এ রাক্ষসী!'

॥ কামু ॥

যাঃ শালা, কারেন্ট অফ নাকি! বাস থেকে নেমে লাহাবাড়ির পাশের রাস্তায় ঢুকে মনে হল কামুর। এমনিতেই আজ দিনটা খারাপ গিয়েছে। ব্যাঙ্কে লোন পায়নি। মারোয়াড়ি যে লোকটা দেড় লাখ টাকা ধার দেবে বলেছিল সেটাও দেয়নি। কী যে করবে কামু, কিছু বুঝতে পারছে না!

বাবা মারা যাওয়ার পরে ভাই-বোনেরা টাকাপয়সা নিজেদের মতো গুছিয়ে মাকে ওর ঘাড়ে ঠেলে দিয়ে কেটে পড়েছে। চিরকালে বোকা কামু সব বুঝেও কিছু করতে পারেনি। তা ছাড়া এই পোড়া পৃথিবীতে মা-ই তো একমাত্র মানুষ, যে ওকে বরাবর ভালবেসেছে! ঝড়ঝাপটা থেকে আড়াল

করেছে! তাকে দেখবে না শেষ বয়সে!

আসলে সারা জীবনটাই এমন গেল ওর। মানুষকে বিশ্বাস করল আর ঠকল। সেই ছোট থেকে শুরু হয়েছে। স্কুলের বন্ধুরা নানা ভাবে বোকা বানিয়েছে ওকে। এমনকি, প্রাণের বন্ধু বিজু পর্যন্ত ছাড়েনি। ওর কথা মতো ছ'হাজার টাকা চুরি করেছিল, সেটা পর্যন্ত আর কখনও ফেরত পায়নি!

এখন বিজুর বড় দোকান। ঠোঁটে সিগারেট বুলিয়ে বাইক দাবড়ে ঘুরে বেড়ায়। ওর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ফিরেও তাকায় না। কষ্ট হয় কামুর। কিন্তু কী করবে? জীবনে কষ্ট নিয়েই বেঁচে থাকতে হয়, ও জানে।

মা বলে, “যে সয়, সে রয়। একটু সহ্য কর, সব ভাল হবে, দেখিস। মাথার উপর মা আছেন। তিনি সব ঠিক করে দেবেন।”

আর কত সহ্য করবে! দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্ধকারে সামনের দিকে এগোল কামু। টাকা! টাকা কোথায় পাবে!

একটা জেরক্স মেশিন আর লেজার প্রিন্টার কিনতে হবে। মনমোহিনী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে ওর দোকানটায় বসাবে। কাছে অনেক কোটিং সেন্টার। আজকাল লেখাপড়ার নোটের জেরক্স আর প্রিন্ট-আউট খুব চলে।

কিন্তু টাকাটা...

চিন্তাটা আচমকা ছিঁড়ে গেল কামুর।

একটা বাইক পিছন থেকে হুড়মুড় করে যেন এসে পড়ল ঘাড়ের ওপর। অন্যান্যন্থ থাকায় শেষ মুহূর্তে সরতে গিয়েও পুরোটা পারল না কামু। বাইকের সামনের গ্রিলে জোরে ধাক্কা খেল পায়ে। আর ছটকে পড়ল পাশে একটা প্লাস্টিকের ওয়েস্ট বিনের উপর।

কামুর ধাক্কায় বিনটাও উলটে গেল।

আঃ! বেশ লেগেছে! কোমরটা ঝনঝন করছে। বাইকটাও ধাক্কা মেরে পড়ি কী মরি করে পালিয়েছে। পথে আর কেউ নেই। চার দিক এত অন্ধকার, মনে হচ্ছে যেন কেউ সারা এলাকার উপর কালো কালি ঢেলে দিয়েছে!

পকেট থেকে কোনও মতে মোবাইল বের করে টর্চ জ্বালাল কামু। ভাগ্যিস এটা ভেঙে যায়নি! আলো জ্বালিয়ে চার দিকটা দেখল ও। বিনটা উল্টে সব ময়লা রাস্তায় ছড়িয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে ওটা কী?

একটা মিষ্টির বাস্ক! প্লাস্টিকের প্যাকেট ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। আর প্যাকেটের মধ্যে থেকে কী উঁকি দিচ্ছে ওগুলো!

দ্রুত ওটা তুলল কামু। তার পর প্যাকেটটা মোবাইল ধরা হাতে কোনও মতে ছিঁড়ল। আরে এ কী! চারটে পাঁচশো টাকার বাস্কিল! মানে দু লাখ টাকা! এটা কে এ ভাবে ময়লায় ফেলে গেল!

হাত কাঁপছে কামুর। এত টাকা! কার? আশপাশে কেউ নেই! তা হলে?

ও দেখল একটা ছোট চিরকুট। আলোয় দেখল তাতে লেখা—

‘তোকে দিলাম এটা। এক সময় অনেক সাহায্য করেছিস। তোর দরকার এখন। তাই দিচ্ছি, রাখিস। জানি, সরাসরি দিলে হয়তো তোর খারাপ লাগবে, হয়তো নিবি না। তাই দিদি হিসেবে এই ভাবে দিলাম। খুব ভাল থাকিস ভাই!’

কোন দিদি তার ভাইকে দিয়েছে? কিন্তু সে তো নয়নি! তা হলে? তা হলে এটা কার? ওর? ও কি নেবে? নাকি নেবে না! আচ্ছা, না নিয়েই বা কী করবে? ফেলে দেবে? নষ্ট করবে? ওর যে খুব টাকার দরকার!

কামু ঘামছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে ওর! কোমরের ব্যথা বোধ হচ্ছে না আর। পেটের মধ্যে ফিরে এসেছে সেই মরণকুপের ফটফটি বাইক-চালক!

ও আকাশের দিকে তাকাল। অসংখ্য তারার বুটি! স্বর্গের জানালা? মা কি তা হলে বিপদে-আপদে ঐর কথাই বলেন? মায়ের কথা কি সত্যি? তিনি আছেন? কিন্তু তিনি কে? কী তাঁর পরিচয়? তিনিই কি ঈশ্বরী!

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী



আলোচনারত দুই বিজ্ঞানী: ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ ও নিলস বোর

কোপেনহেগেন

পথিক গুহ

চার্লস পার্সি (সি পি) স্নো ‘দ্য টু কালচারস’ (১৯৫৯) গ্রন্থে লিখেছিলেন— ‘এটা অদ্ভুত যে, বিংশ শতকে বিজ্ঞানের অতি সামান্য অংশই কলাবিদ্যা আত্মস্থ করেছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, কবির ব্যবহার করেন বিজ্ঞানের শব্দ— এবং ভুল ভাবে। এক সময় দেখা যেত প্রতীকশব্দ তাঁরা খুব ব্যবহার করছেন কবিতায় রহস্যজনক অর্থে। আর যখন পোলারাইজড লাইট শব্দটা ব্যবহার করা হত, তখন যাঁরা ব্যবহার করতেন, তাঁরা ব্যবহার করতেন এমন ভাবে, যেন তাঁরা বোঝাতে চান প্রশংসনীয় আলো। বিজ্ঞান কোনও ভাবেই কলাবিদ্যার ও রকম কোনও উপকার করতে পারে না...’

নাটক যদি কলাবিদ্যার অংশ হয়, তা হলে স্নো-র খেদ মিটে যেতে পারে। ইদানীং কালে প্রচুর নাটক লেখা হচ্ছে, যেগুলোর উপজীব্য বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানীকে নিয়ে নাটক বলতে ‘গালিলেওর জীবন’ মনে পড়বে কলকাতার দর্শকদের। ‘বহুরূপী’ নাট্যগোষ্ঠী অভিনীত যে নাটক মন জয় করে নিয়েছিল দর্শকদের। আর, মুখ্য চরিত্রে শঙ্কু মিত্রের অভিনয়! ভোলার নয়।

যদিও গালিলেওকে নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক নাটক, তবুও বারটোল্ট ব্রেখট-রচিত ‘গালিলেওর জীবন’-ই সবচেয়ে বিখ্যাত। ব্রেখট-রচিত নাটকগুলোর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে বিখ্যাত? এ প্রশ্নের উত্তরও ‘গালিলেওর জীবন’। ওই নাটক ব্রেখটকে অমরত্ব দিয়েছে। অনেকেই জানেন না যে, ব্রেখট নাটকটি বারবার লিখেছিলেন। ব্রেখট দু’দশক ধরে নাটকটা লিখছিলেন। নাটকের উপজীব্য বারবার বদলে গিয়েছিল এই

দু’দশকে। ১৯৩৮-এ লেখা ‘গালিলেওর জীবন’ নাটকে বিজ্ঞানী চতুর, কিন্তু শঠ নন। ১৯৪৭-এ লেখা নাটকে গালিলেও চতুর এবং শঠ দুটোই।

কেন এই বদল? ১৯৪৫-এ ঘটে গেছে হিরোশিমা এবং নাগাসাকি। অ্যাটম বোমা তৈরির ঘটনা ব্রেখটকে বুঝিয়ে দিয়েছে, বিজ্ঞানীরা আর যা-ই হোন, ধোয়া তুলসীপাতা নন।

‘নাট্য আনন’ গোষ্ঠী অভিনীত ‘অ-পবিত্র’ হালফিলের বিজ্ঞান-নির্ভর এক নাটক। যদিও নাটকটি জেরোম লরেন্স এবং রবার্ট লি লিখেছিলেন ১৯৫৫ সালে (‘ইনহেরিট দ্য উইন্ড’), তবু এ নাটক এখনও প্রাসঙ্গিক। বিশেষ করে, হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের ধর্ম নিয়ে মাতামাতির ফলে। চার্লস রবার্ট ডারউইনের বিবর্তনবাদ ঠিক, না বাইবেলের কথা ঠিক— এ নিয়ে দ্বন্দ্ব। এ কাজিয়া হয়েছিল আমেরিকায় টেনেসি প্রদেশে। কাজিয়ার কাহিনি সত্যিকারের ঘটনা। সত্যি ঘটনা অবলম্বনে লেখা নাটক। এ কালের আর একটি জনপ্রিয় নাটক হল ‘কোপেনহেগেন’।

হ্যাঁ, ১৯৯৮ সালে রচিত ‘কোপেনহেগেন’ ইদানীং কালের এক জনপ্রিয় নাটক। এ বছর ২৫-তম বর্ষপূর্তি হচ্ছে নাটকটার। এই রজতজয়ন্তী বর্ষে নাটকটার প্রতি ফিরে-দেখা জরুরি।

‘কোপেনহেগেন’-এর রচয়িতা মাইকেল ফ্রাইন। যিনি ‘কোপেনহেগেন’ ছাড়াও ‘দ্য টু অব আস’, ‘দ্য স্যান্ডবয়’, ‘ডংকিজ ইয়ারস’, ‘ডেমোফ্রিসি’, ‘আফটারলাইফ’ প্রভৃতি নাটক লিখেছেন। ‘দ্য অবজারভার’ কাগজে কলামনিষ্ট হিসেবে জীবন শুরু। ৩১ বছর বয়সে প্রথম উপন্যাস লেখেন। ‘দ্য টিন মেন’। কম্পিউটার যে মানুষের পরিশ্রম

লাঘব করার নামে মানুষের একটার পর একটা কাজকর্ম কেড়ে নিচ্ছে, সে বিষয়ে উপন্যাস। উপন্যাসটি কেবল সমারসেট পুরস্কারই জেতে না, পি জি ওডহাউস কাহিনিটির ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আপাতত ‘কোপেনহেগেন’ নাটকের কথা বলা যাক। সকলেই জানেন, কোপেনহেগেন ডেনমার্কের রাজধানী শহর। সেই শহরে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এসেছিলেন জার্মান নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ওয়ার্নার কার্ল হাইজেনবার্গ এবং তাঁর বন্ধু কার্ল ফ্রিডরিখ ফন ওয়াইজখার। হাইজেনবার্গ-এর সেটাই প্রথম কোপেনহেগেন সফর নয়। তার আগে তিনি ১৯২০-র দশকে কয়েক বছর কাটিয়ে গেছেন কোপেনহেগেন শহরে। বস্তুত তাঁর বিখ্যাত আবিষ্কার ‘অনিশ্চয়তা তত্ত্ব’ (কোনও ছুটন্ত কণার বেগ এবং অবস্থান দুটোই এক সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়; একটা যতটা নির্দিষ্ট, অন্যটা ততটাই অস্পষ্ট) এ শহরে বসেই। তখন তিনি গবেষণা করেন গুরু নিলস বোর-এর বিখ্যাত ইনস্টিটিউটে। তখন তাঁর বয়স কম। এই সময় তাঁর বয়স চল্লিশ। তিনি এ শহরে আবার এসেছেন। এসেছেন গুরু বোর এবং তাঁর পত্নী মার্গারিথ বোর-এর সঙ্গে দেখা করতে। যাঁরা তাঁকে একদা অপত্যম্নেহে দেখেছেন। বোর দম্পতির প্রথম সন্তান জাহাজডুবিতে মারা না-গেলে হাইজেনবার্গ-এর বয়স হতেন।

মনে রাখতে হবে, সময়টা ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বর মাস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনেক দিন শুরু হয়ে গেছে। অ্যাডলফ হিটলার দিকে দিকে জিতছেন। জার্মানি ডেনমার্ক দখল করছে। শুধু তা-ই নয়, জার্মানি অ্যাটম বোমা তৈরি করলে, তার প্রস্তুতি গবেষণার প্রধান আবার হাইজেনবার্গ। এই পরিস্থিতিতে গুরু-শিষ্যে কী কথা হল?

কেউ জানে না। শুধু জানে, সাক্ষাতের পর বোর প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলেন হাইজেনবার্গ-এর উপর। বোরকে তিনি কী বলেছিলেন? উত্তর নেই। বোরকে হাইজেনবার্গ কি এটা বলেছিলেন যে, ইংল্যান্ড-আমেরিকা যেন অ্যাটম বোমা তৈরি না করে, জার্মানির বিজ্ঞানীরা ওই বোমা তৈরি না-করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে? নাকি তিনি জার্মানির গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছিলেন, জানতে গিয়েছিলেন যে, মিশ্রশক্তির বিজ্ঞানীরা অ্যাটম বোমা তৈরি করছেন কি না? মূল এই দুই প্রশ্ন জরুরি, হাইজেনবার্গ যখন জার্মানির বোমা তৈরির প্রধান। অ্যাটম বোমার মূল নীতি—পদার্থ মানে এনার্জি বা ধাক্কা—তা এক জার্মান বিজ্ঞানীর (অ্যালবার্ট আইনস্টাইন) আবিষ্কার। অ্যাটম বোমার মূল কাজ—নিউটন কণার আঘাতে ভারী পরমাণু ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়ামের ভেঙে যাওয়া—আবিষ্কৃত হয় জার্মানিতে। সেজন্য মিশ্রশক্তির বিজ্ঞানীরা ধরেই নেন যে, যুদ্ধবাজ হিটলারকে জার্মান বিজ্ঞানীরা অ্যাটম বোমা তৈরি করে দেবেন। জার্মান বিজ্ঞানীরা এ ব্যাপারে কতটা এগিয়েছেন, সেটা জানার তাগিদ বড় করে দেখা দেয় বিশ্বযুদ্ধ শেষের পর। বিশেষ করে, হিরোশিমা-নাগাসাকির পর। যখন দেখা যায়, জার্মানির অ্যাটম বোমা তৈরির উদ্যোগ মুখ খুঁড়ে পড়েছিল, তখন কার দোষে সেটা হয়েছিল, তা জানা জরুরি হয়ে পড়ে। সেজন্য হাইজেনবার্গ-এর ১৯৪১ সালের কোপেনহেগেন সফর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে।

১৯৯৮ সাল থেকে লন্ডনে অভিনয় শুরু হয় ‘কোপেনহেগেন’ নাটকটির। রয়্যাল ন্যাশনাল থিয়েটার নাটকটির প্রযোজনা করেন পরিচালক টম স্টোপার্ড। বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক নাটক যিনি পরিচালনা করেছেন। লন্ডনে নাটকটির অভিনয় থেকে শুরু হয় বিতর্ক। তা আরও বাড়ে আটলান্টিসের ও পারে নিউ ইয়র্ক শহরে ২০০০ সালে রয়্যাল থিয়েটারে অভিনয় শুরু হলে। ব্রডওয়েতে ‘কোপেনহেগেন’ পরিচালনা করেন মাইকেল ব্ল্যাকমোর। সেমিনার সিমপোজিয়াম পুরো আমেরিকা

জুড়ে শুরু হয়ে যায়। ‘দ্য নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব বুকস’ পত্রিকায় ফ্রাইন লেখেন, ‘আমি স্তম্ভিত নিউ ইয়র্কের প্রতিক্রিয়া— ভাল এবং মন্দ—দেখে। আমি যখন নাটকটা লিখেছিলাম, আমি তখন ভাবিনি কেউ ওটা প্রযোজনা করতে চাইবে। কোনও ছোটখাটো প্রেক্ষাগৃহে হয়তো ওটা মঞ্চস্থ হবে। আমি ভাবিনি কেউ নাটকটা দেখতে আসবে। স্বপ্নেও ভাবিনি নাটকটা আলোচিত হবে।’ কেন এত আলোচনা নাটকটা ঘিরে? এর চমৎকার উত্তর দিয়েছেন বিজ্ঞানী এবং লেখক জেরেমি বার্নস্টাইন। মিউনিখ থেকে প্রকাশিত ‘সাডেশ জিটাং’ পত্রিকায় তিনি মন্তব্য করেন, ‘বড় কোনও ঘটনাকে মানুষের মাত্রায় নিয়ে আসার যে প্রবণতা সর্বদা কাজ করে, এখানেও তাই।’ বড় ঘটনা হল হিটলারের হাতে অ্যাটম বোমা না-আসা। যদি তা আসত, তা হলে পৃথিবী ওলট-পালট হয়ে যেত। সেই ঘটনার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের হাইজেনবার্গ-বোর আলোচনা। ‘কোপেনহেগেন’ বছরের শ্রেষ্ঠ নাটক বিবেচিত হয়ে টোনি অ্যাওয়ার্ড পায়। ব্ল্যাকমোর বিবেচিত হন শ্রেষ্ঠ পরিচালক, বোরের স্ত্রী মার্গারিথ-এর চরিত্রে অভিনয় করে ব্ল্যার ব্রাউন পান শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার।

উপজীব্য কী ‘কোপেনহেগেন’-এর? আগেই বলেছি, হাইজেনবার্গ-এর ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের কোপেনহেগেন সফর নিয়ে লেখা। নাটকে চরিত্র মোটে তিন। হাইজেনবার্গ, বোর এবং বোরের স্ত্রী মার্গারিথ। তাঁরা যেন মরণোত্তর ফিরে এসেছেন ওই সফর আতশ কাচের তলায় ফেলার জন্য। নাটকের প্রথম সংলাপ মার্গারিথের। বোরকে তিনি জিজ্ঞেস করেন—

মার্গারিথ: কিন্তু কেন?

বোর: তুমি এখনও ও বিষয়ে ভাবছ?

মার্গারিথ: ও [হাইজেনবার্গ] কেন কোপেনহেগেন এসেছিল?

১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে যখন হাইজেনবার্গ-বোর কথাবার্তা হয়, তখন সেখানে মার্গারিথ উপস্থিত ছিলেন কি না, জানা যায় না। ছিলেন না, বলেই ধরে নেওয়া যায়। মার্গারিথ এ নাটকে উপস্থিত কাহিনির খাতিরে।

কাহিনির উপজীব্য এপিষ্টেমোলজি অব ইনটেনশন। এপিষ্টেমোলজি শব্দটা দর্শনশাস্ত্রের। শব্দের অর্থ বিশদে জ্ঞান। জ্ঞানতত্ত্ব। সাদা বাংলায়, কী এবং কেন। এপিষ্টেমোলজি অব ইনটেনশন শব্দবন্ধের অর্থ—কী করছি, এবং কেন তা করছি। কেন হাইজেনবার্গ বোরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন, সে সম্পর্কে তিন বার জানতে আগ্রহী হয় ‘কোপেনহেগেন’-এর চরিত্রেরা। নাটকের কুশীলবের ভাষায় যে সব

কথাবার্তা হয়েছিল, তার খসড়া। হাইজেনবার্গ তিন বার চেষ্টা করেও বুঝতে পারেন না কী কথা হয়েছিল। তিন বারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ, ফ্রাইন দেখান, মানুষের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপারটা ধোঁয়াশা। ঠিক যেমন কোয়ান্টাম মেকানিক্সে একটা কণার ব্যাপারটা ধোঁয়াশা।

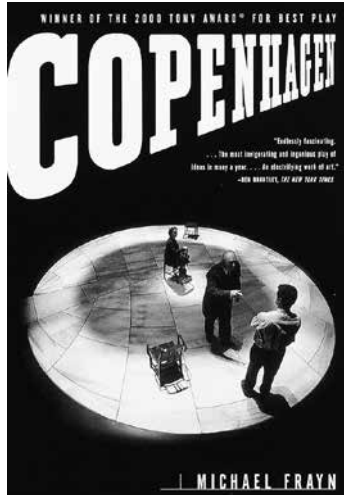
হ্যাঁ, নাটকটার আদ্যোপান্ত জুড়ে থাকে আনসার্টেনিটি বা অনিশ্চয়তা। মার্সেল প্রুস্ত-এর লেখা ‘রিমেমব্রান্স অব থিংস পাস্ট’-এর মতো ‘কোপেনহেগেন’ নাটকের পাত্রপাত্রীরা কোনও কিছুই আর ঠিক ঠিক মনে করতে পারছেন না। নাটকের শুরুতে আছে—

মার্গারিথ: তোমরা কোথায় হাঁটতে হাঁটতে কথা বলেছিলে, তা-ও মনে করতে পারছ না।

হাইজেনবার্গ: আমরা কোথায় হেঁটেছিলাম? নিশ্চয়ই ফেন্ড পার্কে। পুরনো দিনে আমরা যেখানে হাঁটতাম।

মার্গারিথ: কিন্তু ফেন্ড পার্ক হচ্ছে গুঁর ইনস্টিটিউটের পিছনে। জায়গাটা আমরা যেখানে থাকি, সেখান থেকে চার কিলোমিটার দূরে!

হাইজেনবার্গ: আমি দেখতে পাচ্ছি গাছ থেকে পাতা পড়ছে শরতে। ব্যান্ডস্ট্যান্ডের আলোয় দেখতে পাচ্ছি...



‘কোপেনহেগেন’ বইটির প্রচ্ছদ



ফার্ম হল: এখানে বন্দি করে রাখা হয়েছিল দশ জন জার্মান বিজ্ঞানীকে

বোর: হ্যাঁ। কারণ তুমি মনে রেখেছ, আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল অক্টোবরে।

মার্গারিথ: না, তোমাদের দেখা হয়েছিল সেপ্টেম্বরে।

বোর: তখন পাতা পড়ে না!

মার্গারিথ: সেটা ১৯৪১ সাল। রাস্তায় আলো ছিল না!

হাইজেনবার্গ, বোর এবং মার্গারিথ-এর কথাবার্তার মাঝে ‘কোপেনহেগেন’ নাটকে জার্মান প্রকল্পে হাইজেনবার্গ-এর জড়িয়ে থাকার প্রসঙ্গ উঠে আসে এ ভাবে—

মার্গারিথ: তোমার বলা রহস্যময় কথাটা যেন কী?

হাইজেনবার্গ: কোনও রহস্য নেই। ছিলও না। আমি ওটা পরিষ্কার মনে করতে পারি। আমার প্রাণ চলে যাচ্ছিল। আমাকে সমঝে কথা বলতে হচ্ছিল। আমি কেবল আপনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক জন পদার্থবিজ্ঞানীর কি নৈতিক অধিকার থাকে পরমাণুশক্তি বিষয়ে কাজ করার। তাই তো?

বোর: আমি মনে করতে পারছি না।

হাইজেনবার্গ: আপনার মনে নেই, কারণ আপনি সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়েছিলেন। আপনি হাঁটা থামিয়ে দিয়েছিলেন।

বোর: আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।

হাইজেনবার্গ: খুব ভয় পেয়েছিলেন। আপনি যে ওটা মনে করতে পারছেন সেটা ভাল। আপনি আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়েছিলেন।

বোর: কারণটা স্পষ্ট। তুমি ও বিষয়ে কাজ করছিলে।

হাইজেনবার্গ: সঙ্গে সঙ্গে আপনি নিদ্রান্ত নিয়ে নিলেন যে, আমি হিটলারের হাতে অ্যাটম বোমা তুলে দিতে চাই।

বোর: ঠিক তাই!

হাইজেনবার্গ: না! পরমাণু চুল্লি! আমরা ওটা তৈরি করার চেষ্টা করছিলাম। মেশিন থেকে শক্তি। আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা করছিলাম। যাতে জাহাজ চালানো যায়।

বোর: পরমাণু চুল্লির ব্যাপারে তুমি একদম বলোনি।

হাইজেনবার্গ: আমি কোনও কিছু সম্পর্কেই কিছু বলিনি! বিশদে কিছু বলিনি। বলতে পারছিলাম না। কোনও ধারণা ছিল না কতটা আড়িপেতে শোনা হচ্ছে। কতটা বলব না-বলব তা...

বোর: কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি মনে করো যে, ইউরেনিয়াম দুটুকরো হওয়া থেকে অ্যাটম বোমা তৈরি করা যায়।

হাইজেনবার্গ: আহ! ফের সেই প্রশ্ন।

বোর: আমার পরিষ্কার মনে আছে, তুমি কী বলেছিলে।

হাইজেনবার্গ: আমি বলেছিলাম, তা সম্ভব।

বোর: ওতেই আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম।

‘কোপেনহেগেন টেমস কমপ্লেক্সিটি অব সায়েন্স’। নাটকটি দেখে নিউ ইয়র্কের এক নাট্য সমালোচক লেখেন। পদার্থবিজ্ঞানী জেনাথন লোগান সেই হেডলাইন দিয়ে শুরু করেন ওঁর ‘কোপেনহেগেন’ বইটির সমালোচনা ‘আমেরিকান সায়েন্টিস্ট’ পত্রিকায়। পত্রিকাটির ২০০০

সালের জুলাই-অগস্ট সংখ্যায় ছাপা হয় সে সমালোচনা। লোগানের লেখার হেডলাইন ‘আ স্ট্রেঞ্জ নিউ কোয়ান্টাম ফিজিক্স’। ওঁর দাবি, নাট্যকার ফ্রাইন ‘কোপেনহেগেন’ লিখতে গিয়ে বড় ভুল করেছেন কোয়ান্টামের ব্যাপারটায়। মানে, কোয়ান্টামের অনিশ্চয়তা আর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপারটা ঠিক নয়। তাই, বিজ্ঞানের জটিলতা ‘টেম’ (সরল করেছে) করেছে বলা যাবে না নাটকটি সম্পর্কে। সহজ করতে গিয়ে ইতিহাস বিকৃত করেছেন ফ্রাইন।

ফ্রাইনের নাটক সম্পর্কে লোগানের এ রকম কথা বলার কারণ আছে। বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানি অ্যাটম বোমা তৈরির ব্যাপারে কতটা এগিয়েছিল, তা জানার জন্য মিত্রশক্তির তরফে এক মিশন তৈরি করা হয়। নাম দেওয়া হয় ‘অলসোস’ মিশন। অলসোস গ্রেফতার করে দশ জন জার্মান বিজ্ঞানীকে, যাঁদের জড়িত থাকার কথা অ্যাটম বোমা তৈরির কাজে। ওঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন হাইজেনবার্গ, তেমন ছিলেন অটো হান (যিনি প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন ইউরেনিয়াম পরমাণু দুটুকরো হয়েছে), হিটলার-সমর্থক বিজ্ঞানী কার্ট ডিবনারও। মোট দশ জন বিজ্ঞানীকে গ্রেফতার করা হয়। ওঁদের রাখা হয় কেমব্রিজের কাছে গডমেথেষ্টার-এ একটা অট্টালিকায়। বাড়িটার নাম ফার্ম হল। অট্টালিকার দেওয়ালে গোপনে মাইক্রোফোন ফিট করা ছিল। যাতে জার্মান বিজ্ঞানীরা নিজেদের মধ্যে কী কথাবার্তা বলেন, তা রেকর্ড হয়ে যায়। হিরোশিমা-নাগাসাকির খবর বন্দি জার্মান বিজ্ঞানীরা ফার্ম হলে-এ বসেই শোনেন। এমনকি, হান যে ১৯৪৫ সালে ইউরেনিয়াম দুটুকরো হওয়া আবিষ্কারের জন্য নোবেল প্রাইজ পান, সে খবরও বন্দি জার্মান বিজ্ঞানীরা ওখানে বসেই পান। বিবিসি রিপোর্টে হিরোশিমা-নাগাসাকির খবর পেয়ে প্রথমটা জার্মান বিজ্ঞানীরা প্রথমটা বিশ্বাসই করতে পারেননি। ভাবলেন ওঁদের ভাওতা দেওয়ার জন্য মিত্রশক্তির বিজ্ঞানীরা ছল করেছে। পরদিন সকালে কাগজের রিপোর্টে ওঁদের বিশ্বাস হয়।

ওখানেই ওঠে ক্রিটিকাল মাস-এর প্রশ্নটা। ক্রিটিকাল মাস হল, অ্যাটম বোমায় ন্যূনতম যে পরিমাণ মশলা লাগে, তাই। ক্রিটিকাল মাস বুঝতে গেলে অ্যাটম বোমার ব্যাপার সামান্য বোঝা দরকার। অ্যাটম বোমায় ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন কণা দিয়ে আঘাত করা হয়। আঘাতের ফলে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম পরমাণু দুটুকরো হয়ে যায়। আর পাওয়া যায় দু’-তিনটে নতুন নিউট্রন কণা। সেই কণাগুলো আবার নতুন ইউরেনিয়াম বা পরমাণুকে আঘাত করে। ফলে তারাও দুটুকরো হয়ে যায়। এখন, নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম পরমাণু যে দুটো টুকরোয় বিভক্ত হয়ে গেল, সে দুটো টুকরোর মোট ভর মূল যে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম পরমাণু বিভক্ত হয়েছিল, তাদের ভরের চেয়ে কম। ভর তো এ ভাবে হারিয়ে যেতে পারে না। আইনস্টাইন-অবিষ্কৃত নিয়ম অনুযায়ী, তা এনার্জিতে রূপান্তরিত হয়। সেই এনার্জিই ধাক্কা বা অ্যাটম বোমার ক্ষয়ক্ষতি। অ্যাটম বোমায় ক্ষয়ক্ষতি হয় মুহূর্তে। আর পরমাণু চুল্লিতে হয় তিলে তিলে। এইটুকুই তফাত, অ্যাটম বোমা আর পরমাণু চুল্লিতে আর কোনও প্রভেদ নেই।

ক্রিটিকাল মাস-এর গণনা অ্যাটম বোমা তৈরির আগে জরুরি। বোমায় কী পরিমাণ ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম থাকলে নিউট্রন কণার পথে ইউরেনিয়াম বা প্লুটোনিয়াম পরমাণু পড়বে, বা তারা বিভক্ত হবে, এনার্জি উৎপন্ন হবে, তা জানা দরকার। মিত্রশক্তির বিজ্ঞানীদের পক্ষে ক্রিটিকাল মাস গণনা করেন রডলফ পিয়েরেলস এবং অটো ফ্রিশ। কিন্তু ফার্ম হল-এ জার্মান বিজ্ঞানীদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা থেকে বোঝা যায়, হাইজেনবার্গ তখনও অ্যাটম বোমার ক্রিটিকাল মাস গণনা করেননি। কারণ, তিনি এক এক বার ওই গণনায় এক এক রকম ফল পাচ্ছিলেন। ফার্ম হল-এর গণনায় যে সব ফল পাচ্ছিলেন হাইজেনবার্গ, সে সব ফল বিশ্লেষণ করে লোগান লেখেন, অ্যাটম বোমা তৈরির কাজ হাইজেনবার্গ কিছু জানতেন না। আগে তো ক্রিটিকাল মাস গণনা, তার পরে অ্যাটম বোমা বানাতে নেমে পড়া! এ কথা ‘আমেরিকান সায়েন্টিস্ট’ পত্রিকার ১৯৯৬ সালের মে-জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।



স্ত্রী মার্গারিথ বোরের সঙ্গে বিজ্ঞানী নিলস বোর

কেন হাইজেনবার্গ অ্যাটম বোমার ক্রিটিকাল মাস গণনা করেননি? তিনি তো হিটলারের অধীনে অ্যাটম বোমা তৈরি করতে চাননি। হিটলারের হাতে অ্যাটম বোমা এলে, তিনি তো পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলবেন। এটা হাইজেনবার্গ জানতেন বলেই তিনি হিটলারের হাতে অ্যাটম বোমা এসে যাক, তা চাননি। এই মতের বড় সমর্থক ছিলেন হাইজেনবার্গ নিজে, এবং তাঁর বন্ধু ফন ওয়াইজাখার। ওঁরা দু'জনে বিশ্বযুদ্ধের পরে এই মত প্রচার করেন। এই মত কি মিথ্যে? অনেকের ধারণা তাই। হাইজেনবার্গ বোমার কিছু বুঝতেন না।

‘কোপেনহেগেন’ বইয়ের সমালোচনায় কী লেখেন লোগান? লেখেন, ‘একটা সিউডোসায়েন্টিফিক ফ্যান্টাসি এই নাটকের ভরকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে।’ সিউডোসায়েন্টিফিক ফ্যান্টাসি কেন? বিজ্ঞানের মোড়কে এখানে গালগল্প পেশ করা হয়েছে। নাটকে বোর এক জায়গায় বলছেন, ‘ব্রহ্মাণ্ড ঠিক-ঠিক জানার মতো নিরপেক্ষ নয়। এর সব কিছুই সম্ভাব্যতায় ভরা।’ সেজন্য কী উদ্দেশ্যে হাইজেনবার্গ কোপেনহেগেন গিয়েছিলেন, তা জানা সম্ভব নয়। এই হচ্ছে নাটকের বক্তব্য।

কিন্তু, লোগান লেখেন, বড় বস্তুর বেলায় (মানুষের মাপে) তো কোয়ান্টাম মেকানিক্স খাটে না। সেখানে তো কার্যকারণের সম্পর্কই বিদ্যমান। কারণ আগে ঘটে, কার্য পরে। হাইজেনবার্গ কী উদ্দেশ্যে কোপেনহেগেন গিয়েছিলেন, তা তো জানা যায়। লোগান লেখেন, ১৯৪০ সালে জার্মান সামরিক বাহিনীর জন্য হাইজেনবার্গ ক্রিটিকাল মাস-এর যে গণনা করেছিলেন, তাতে শত শত টন ইউরেনিয়াম লাগত। ফার্ম হল-এ বন্দিদশায় যখন তিনি গণনা করেন, তখন তিনি শত শত টনের বদলে টন টন ইউরেনিয়াম হিসেব করেন। এই ভুল গণনাই হিটলারের হাতে অ্যাটম বোমা না-থাকার কারণ।

ইতিহাসের বিকৃতি লক্ষ্য করেন লোগান। নাটকের এক জায়গায় আছে, বিজ্ঞানী এনরিকো ফের্মি শিকাগোয় বোমার লক্ষ্যে যতটা এগিয়েছিলেন, তার চেয়ে ঢের বেশি এগিয়ে গিয়েছিলেন জার্মান বিজ্ঞানীরা। এটা ঠিক নয়। লোগান লেখেন, ১৯৪১-এর সেপ্টেম্বরে, যখন হাইজেনবার্গ এবং ফন ওয়াইজাখার কোপেনহেগেন যাচ্ছেন, তখন জার্মানিতে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম তৈরির প্রকল্প পরিত্যক্ত হয়েছে। আমেরিকার যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত বিজ্ঞান গবেষণার প্রধান ভ্যানেবার বুশ, প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডিলানো রুজভেল্টকে লিখতে যাচ্ছেন, অ্যাটম বোমা তৈরি সম্ভব। তা হলে জার্মানির তরফে এই মিথ্যে প্রচারের উদ্দেশ্য? লোগানের মতে, তা নাটকটাকে সাহায্য করেছে। নাটকে ফ্রাইন বলতে চেয়েছেন, হাইজেনবার্গ-এর কথার মর্মার্থ যদি বোর বুঝতেন (বিজ্ঞানীদের অ্যাটম বোমা বানানো উচিত নয়), তা হলে পৃথিবী লাভবান হত।

সমালোচনা আরও আছে। লোগানের মতোই নাটকটার খুঁত ধরলেন পেনসিলভানিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি-র অধ্যাপক পল লরেন্স

রোজ। যিনি ১৯৯৮ সালে বই লিখেছিলেন ‘হাইজেনবার্গ অ্যান্ড দ্য নাৎসি অ্যাটমিক বম্ব প্রজেক্ট: আ স্টাডি ইন জার্মান কালচার’। তিনিও লোগানের মতোই ‘সংশোধনবাদ’-এর গন্ধ পেলেন নাটকটার মধ্যে। রোজের মতে, ওই সংশোধনবাদ ডেভিড আর্ভিং রচিত মিথ্যা প্রচারের চেয়েও ক্ষতিকর। ১৯৬৭ সালে ইংরেজ লেখক আর্ভিং-এর লেখা বইটির নাম, ‘দ্য জার্মান অ্যাটমিক বম্ব: দ্য হিস্ট্রি অব নিউক্লিয়ার রিসার্চ ইন জার্মানি’। বইটি ওই বছরেই লন্ডনে প্রকাশিত হয় ‘দ্য ভাইরাস হাউস’ নামে। আর্ভিং ছিলেন এক জন ‘হলোকস্ট ডিনয়ার’। মানে হিটলারের আমলে জার্মানিতে যে হলোকস্ট (ইহুদি-নিধন) হয়েছিল, তা তিনি মানতে চাইতেন না। এমন লেখকের কাছে আর কী-ই বা আশা করা যায়?

রোজের মতে, ‘কোপেনহেগেন’ নাটকটা কলা, বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের পক্ষে ক্ষতিকর। নাৎসি জামানা আর কিছুকাল স্থায়ী হলে যে পৃথিবী রসাতলে যেত, সে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি নাটকে। বলা হয়নি এ কথাটাও যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি-অধিকৃত পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশেই হাইজেনবার্গ এবং ফন ওয়াইজাখার বক্তৃতা দিতে যেতেন। যেমন ডেনমার্ক-এ গিয়েছিলেন। ওঁরা গিয়ে বলতেন যে, জার্মানির অধীনে থাকাই ভাল।

যে কোনও জিনিসের প্রভাব বোঝা যায় তার প্রতিক্রিয়া দেখে। ২০০২ সালে হঠাৎ একটি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কথাবার্তার এক শরিক বোর। তিনি কী ভেবেছিলেন ওই কথোপকথন সম্পর্কে, তা বেরিয়ে আসে হঠাৎ। বেরিয়ে আসে হাইজেনবার্গের উদ্দেশ্যে লেখা বোরের একগাদা খসড়া চিঠি। বোরের স্বভাব ছিল বিচিত্র। বলার বা লেখার ক্ষেত্রে বারবার পরিমার্জনা করতেন। হাইজেনবার্গ-এর উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিগুলোর ক্ষেত্রেও তাই। বারবার একই চিঠির খসড়া, কিন্তু খসড়াই চূড়ান্ত নয়। মানে, বোর ওই চিঠিগুলো পোস্ট করেননি।

বোর মারা গিয়েছিলেন ১৯৬২ সালে। তাঁর প্রয়াণের পঞ্চাশতম বর্ষপূর্তিতে, অর্থাৎ ২০১২ সালে, ওই খসড়া চিঠিগুলো প্রকাশের কথা ছিল। তার দশ বছর আগে, ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওই খসড়া চিঠিগুলো প্রকাশের ব্যবস্থা করে বোর পরিবার। এর আগে বোর পরিবারের তরফে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ওই কথোপকথন নিয়ে একমাত্র প্রবন্ধ লেখেন বোরের ছেলে এবং নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী আগে বোর। ওই প্রবন্ধটি ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়।

হাইজেনবার্গ-এর উদ্দেশ্যে বোরের খসড়া চিঠিগুলো ১৯৫৬ সালে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত ‘হেলার আলস টাউসেন্ড সেনেন’ (যা জেমস ক্লেয়ার-এর ইংরেজি ভাষান্তরিত হয় ১৯৫৮ সালে, নাম হয় ‘ব্রাইটার দ্যান আ থাউজ্যান্ড সানস’) এর ড্যানিশ ভাষায় অনুবাদ (‘স্টারকের এন্ড টুসিন্ড সোল’) পড়ে। এই অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে। লেখকের নাম রবার্ট জাক্স।

বইয়ের নাম লক্ষণীয়। জার্মান লেখকের এটি তৃতীয় বই। এর আগে তিনি ১৯৪৫ সালে ‘ডার কাফপ ডার শুইৎহ উম ডাই প্রেসফ্রেইট’ (‘সুইটজারল্যান্ড’স স্ট্রাগল ফর ফ্রিডম অব দ্য প্রেস’), এবং ১৯৫৪ সালে ‘টুমরো ইজ অলরেডি হিয়ার’ লেখেন, তবুও আর কোনও বই ওঁর নামের সঙ্গে এভাবে পরিচিত নয়। ওই বই পড়ে স্নো বলেছিলেন, ‘এই বইখানি উল্লেখযোগ্য ভাবে ভাল... পরমাণু বোমার উপর আমার জানা বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ইতিহাস’। দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল-এর মতে, ‘এটা আমার পড়া বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং। এটা যে কোনও উপন্যাসের চেয়েও উত্তেজনাপূর্ণ।’

জাক্স বইয়ের নাম দেন ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ থেকে। আমেরিকার অ্যাটম বোমা তৈরির প্রকল্প ম্যানহাটন প্রজেক্ট-এর বিজ্ঞানীপ্রধান রবার্ট জে ওপেনহাইমার ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই পরীক্ষামূলক বোমা বিস্ফোরণের মুহূর্তে গীতার শ্লোক আবৃত্তি করেন। ওপেনহাইমার সংস্কৃত জানতেন। গীতা কণ্ঠস্থ ছিল তাঁর। গীতার একাদশ অধ্যায়ে আছে অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের বিস্তারিত দেখানোর ঘটনা। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা দেওয়ার দায়িত্ব সঞ্জয়ের উপর ন্যস্ত ছিল। সে দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান সঞ্জয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিস্তারিত দেখাচ্ছেন। সেই

দৃশ্য ধৃতরাষ্ট্রকে কী ভাবে বর্ণনা করলেন সঞ্জয়? ‘দিবি সূর্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুখিতা।। যদি ভাঃ সদশী সা স্যাদ্ ভাসন্তস্য মহাত্মনঃ।।’ অর্থাৎ, যদি আকাশে সহস্র সূর্যের প্রভা যুগপৎ সমুদিত হয়, তা হলে সেই দীপ্তি বিশ্বরূপের প্রভার কিঞ্চিৎ তুল্য হতে পারে। জঙ্ক বইয়ের নামকরণের ক্ষেত্রে ধার নেন সঞ্জয়ের মুখের কথা। ‘ব্রাইটার দ্যান আ থাউজ্যান্ড সানস’।

ওই বইটার ড্যানিশ অনুবাদ পড়ে রেগে যান বোর। কারণ বইটায় ছিল ১৯৪১ সালের ওই মিটিং-এর বর্ণনা। হাইজেনবার্গ লিখছেন— ‘আমি যত দূর মনে করতে পারছি, যদিও আমি ভুল হতে পারি, এত দিন হয়ে গেল, কথাবার্তা হয়েছিল এ রকম। আমার কোপেনহেগেন সফর হয়েছিল ১৯৪১-এর শরতে। আরও ঠিকমতো বললে, অক্টোবরের শেষে। আমরা তখন ‘ইউরানভ্যারেইন’ প্রকল্পে যুক্ত। ইউরেনিয়াম আর ভারী জল নিয়ে কাজ করছি। আমরা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছি যে, বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনে ইউরেনিয়াম আর ভারী জল ব্যবহার করে পরমাণু চুল্লি (ফন ওয়াইজাখারের তাত্ত্বিক গণনা অনুযায়ী) তৈরি করা যায়। এ ভাবেই পরমাণু চুল্লিতে ইউরেনিয়াম-২৩৯ ব্যবহার করে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পাওয়া যেতে পারে। ওই ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরে অ্যাটম বোমায় ব্যবহার করা যেতে পারে। আমরা যুদ্ধের বাজারে জার্মানিতে ইউরেনিয়াম-২৩৫ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার অন্য কোনও পদ্ধতি জানতাম না। অপরপক্ষে অ্যাটম বোমা তৈরি করার জন্য বিস্ফোরক পদার্থ যে পাওয়া যায় পারমাণবিক চুল্লি অনেক বছর ধরে চলার পর, সে ব্যাপারেও আমরা নিশ্চিত ছিলাম। সুতরাং অ্যাটম বোমা তৈরি করা যেত বড়সড় প্রকল্প গ্রহণ করলে। আমরা জানতাম যে, অ্যাটম বোমা তৈরি করা যায়, শুধু ভুল করেছিলাম প্রযুক্তিগত খরচের হিসেবটায়। পরিস্থিতি আমাদের পক্ষে সুবিধেজনক মনে হয়েছিল, কারণ পদার্থবিজ্ঞানীরা ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্রভাব খাটাতে পারত। যদি অ্যাটম বোমা তৈরি করা অসম্ভব হত, তা হলে এ রকম পরিস্থিতি তৈরি হত না। যদি অ্যাটম বোমা সহজে তৈরি করা যেত, তা হলে বিজ্ঞানীরা সেই বোমা না তৈরি করে থাকতে পারত না। বিজ্ঞানীরা সুবিধেজনক পরিস্থিতিতে কারণ তাঁরা সরকারের সঙ্গে তর্ক করতে পারবেন যে, যুদ্ধের সময় বোমা তৈরি করা যাবে না। অন্য পক্ষে, যদি পর্যাপ্ত উদ্যোগ ও-ব্যাপারে চালানো যেত, তবে বোমা তৈরি করা যেত। পরবর্তী ঘটনাক্রমে এটা প্রমাণ হয় যে, দুটো পক্ষেরই যুক্তি ছিল— আমেরিকা তো জার্মানির বিরুদ্ধে অ্যাটম বোমা প্রয়োগ করেনি।

এই পরিস্থিতিতে আমরা ভাবলাম, বোরের সঙ্গে কথা বলা মূল্যবান হবে। কথাবার্তা হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের বোর-এর বাসগৃহের পাশে। এটা জেনে যে, বোর জার্মানির রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিদের নজরদারিতে আছেন এবং আমার-ওঁর কথাবার্তার রিপোর্ট পাঠানো হবে জার্মানিতে। আমি কথোপকথন এমন ভাবে করতে যত্নবান হয়েছিলাম, যাতে আমার প্রাণসংশয় না হয়। সম্ভবত আমি কথাবার্তা শুরু করেছিলাম এই বলে যে, আমার প্রশ্ন, যুদ্ধের সময় বিজ্ঞানীদের অ্যাটম বোমা তৈরি করা উচিত কি না। কারণ এ ব্যাপারে প্রস্তুতি দ্রুত এগোচ্ছে। ভবিষ্যতে যুদ্ধের কৌশল আমূল বদলানোর লক্ষ্যে। বোর তৎক্ষণাৎ আমার প্রশ্নের মর্মার্থ বুঝতে পারলেন। তাঁর ভয়াব্র্ত প্রতিক্রিয়া দেখে আমি সে-কথা বুঝতে পারলাম। আমার যত দূর মনে পড়ে, তিনি আমাকে উত্তর দিলেন পাল্টা প্রশ্ন করে— সত্যি কি তুমি মনে করো ইউরেনিয়াম দুটুকরো হওয়া দিয়ে বোমা তৈরি সম্ভব? হয়তো আমি উত্তর দিয়েছিলাম, নীতিগত ভাবে সেটা সম্ভব বলে আমি জানি। কিন্তু তার জন্য চাই প্রচুর কারিগরি সাহায্য, যা এই যুদ্ধের মধ্যে সম্ভব হবে না বলে আশা করা যায়। বোর আমার উত্তরে আতঙ্কিত হন। বোঝাই যায় তিনি ধরে নিয়েছেন আমি তাঁকে বোঝাতে চাইছি, জার্মানি অ্যাটম বোমা তৈরির লক্ষ্যে অনেক দূর এগিয়েছে। যদিও আমি পরে ওই ভুল ধারণা সংশোধনের চেষ্টা করেছি, তবু সম্ভবত আমি বোর-এর পূর্ণ আস্থা অর্জন করতে পারিনি। এই কারণে যে, আমি বোরের সঙ্গে কথা বলেছিলাম রেখে-ঢেকে (যেটা আমার পক্ষে ভুল হয়েছিল)। আমি ভয়ে-ভয়ে ছিলাম পাছে আমার বলা কোনও কথা পরে আমার বিরুদ্ধে যায়। কথোপকথনের ফলাফলে খুব

দুঃখিত হয়েছিলাম।’

এই বর্ণনার পর জঙ্ক তাঁর বইতে লেখেন, ‘হাইজেনবার্গ অবশ্য কথোপকথনের আসল শব্দগুলো স্মরণ করতে পারছেন না। কথোপকথনের উপজীব্য যদি মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখা যায়, তা হলে খুঁটিনাটির উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। যেহেতু কথোপকথনের অংশগ্রহণকারীদের কেউই কোনও স্টেনোগ্রাফিক রেকর্ড রাখেননি, সেহেতু হাইজেনবার্গ-এর যা মনে আছে— বিপক্ষে যা বলা যাক, তা সন্দেহও— তাকে কথাবার্তার সূত্র বলে মানতে হবে।’

মানতে আপত্তি বোর-এর। তাই ওই চিঠি লেখা। লিখতে গিয়ে এগারো বার খসড়া করেন বোর। আগেই বলেছি, মনঃপূত না হলে বোর বারবার খসড়া করতেন।

প্রথম খসড়া চিঠি এই রকম—

‘প্রিয় হাইজেনবার্গ,

আমি একটি বই পড়লাম, যার লেখক রবার্ট জঙ্ক। বইটি সম্প্রতি ড্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটির নাম ‘স্টারকের এন্ড টুসিন্ড সোল’। আমার তোমাকে বলা দরকার যে, পড়ে আমি স্তম্ভিত হয়েছি। এই কারণে যে, স্মৃতি তোমাকে ঠকিয়েছে বইটির লেখককে চিঠি লিখতে গিয়ে। চিঠির অংশবিশেষ ছাপা হয়েছে ড্যানিশ ভাষায় প্রকাশিত ওই বইটির মধ্যে।

ব্যক্তিগত ভাবে, আমাদের কথোপকথনের প্রত্যেকটি শব্দ আমার মনে আছে। ডেনমার্ক আমাদের বড় দুঃখের এবং টানা পড়নের মধ্যে ওই কথোপকথন হয়েছিল। বিশেষ করে আমার এবং মার্গারিথের উপর ওই কথোপকথন বেশ ছাপ ফেলেছিল। ছাপ ফেলেছিল, তোমরা দু’জনে ইনস্টিটিউটে যাদের সঙ্গে কথা বলেছিলে, তাদের উপর। তুমি আর ওয়াইজাখার জোর দিয়ে বলেছিলে, যুদ্ধে জার্মানি জিতবেই, এবং আমাদের পক্ষে যুদ্ধের উল্টো ফলের আশা করা নিতান্ত বোকামি এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রে জার্মান প্রস্তাবে নিশ্চুপ থাকা শ্রেয়। আমার পরিষ্কার মনে আছে ইনস্টিটিউটে আমার ঘরে হওয়া সেই সব কথাবার্তা। তুমি ধোঁয়াশা করে বলেছিলে, যা থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, তোমার নেতৃত্বে জার্মানিতে পরমাণু অস্ত্র তৈরির সব কাজ হচ্ছে। তুমি বলেছিলে, পুরোটা বলার দরকার নেই, কারণ তুমি সব কিছু জানো। তুমি গত দু’বছর ধরে মোটামুটি ভাবে ওই প্রস্তুতির ব্যাপারটা দেখছ। আমি কিছু না বলে শুনে যাচ্ছিলাম, কারণ মানব সমাজের অনেক কিছু নির্ভর করছে ওর উপর। আমাদের ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব সন্দেহও, আমরা আজ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত দুই দেশের প্রতিনিধি। জাঙ্কের উদ্দেশ্যে লেখা তোমার চিঠিতে যার উল্লেখ আছে, আমি যে ভাবে চুপচাপ এবং গম্ভীর ভাবে অ্যাটম বোমা প্রস্তুতির ব্যাপারটা তোমার মুখে শুনছিলাম, সেটা তোমার মনের মধ্যে চলা ভুল বোঝাবুঝির ফল। তিন বছর আগে যে দিন শুনেছি ইউরেনিয়াম-২৩৮-এর বদলে ইউরেনিয়াম-২৩৫-কে ধীরগতি নিউট্রন কণা দুটুকরো করতে পারে, সে দিনই আমি বুঝতে পেরেছি যে, ওই দুই ধরনের ইউরেনিয়ামকে আলাদা করে কোনও না কোনও বোমা তৈরি সম্ভব। ১৯৩৯-এর জুন মাসে আমি বার্মিংহাম-এ একটা বক্তৃতায় ইউরেনিয়াম দুটুকরো হওয়ার ব্যাপারটা আলোচনা করি। ওই বক্তৃতায় আমি বলেছিলাম ওই বোমার ফল কী হবে। আমি অবশ্য এ কথাও বলেছিলাম যে, প্রযুক্তিগত প্রস্তুতি এত বিশাল যে, ওই বোমা কবে তৈরি করা যাবে, তা এখনই বলা যাবে না। ওই সময় আমার ধারণায় যাকে আঘাত বলা যায়, তা যদি কিছু পেয়ে থাকি, তা এ কারণে নয় যে, আমার জানা ছিল জার্মানি সর্বতো ভাবে চেষ্টা করছে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রথম হতে।

তা ছাড়া তখন আমি জানতাম না যে, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা ওই পথে কতটা এগিয়েছে। ওটা আমি জানতে পারি পরের বছর। যখন আমি ইংল্যান্ড যাই, এবং শুনি যে জার্মানির দখলদারি সেনারা ডেনমার্ক আমাদের গ্রেফতারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

নিশ্চিত ভাবে আমাদের কথাবার্তা থেকে এবং আমার বিশ্বস্ত বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা থেকে আমি এটা জানতে পারি। এটা সম্পর্কে এই বলার যে, তুমি আর ওয়াইজাখার আলোচনাসভার আয়োজন

করেছিলে জার্মান ইনস্টিটিউটে, তা অন্য ব্যাপার ছিল। আমার এ নিয়ে কোনও সন্দেহ তখনও ছিল না, এখনও নেই। আমি অবশ্য ওই আলোচনা সভায় যাইনি নীতিগত কারণে। আমাদের এখানে তোমাদের আসা অন্য কারণে। এই কারণে যে, তোমরা আমাদের আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলে, বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আমাদের যেন কোনও ভাবে কোনও ক্ষতি না হয়।

এই চিঠি তোমার এবং আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাক। জাক্সের বই যে পরিমাণ আলোড়ন তুলেছে ড্যানিশ কাগজপত্রে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার এটা সমীচীন মনে হয়েছে যে, আমি এই চিঠির খবর গোপনে বিদেশমন্ত্রক এবং রাষ্ট্রদূত ডাকউইংজ-কে জানিয়ে রাখছি।

প্রথম খসড়া শেষ হচ্ছে এই ভাবে। চিঠির তারিখ লেখা নেই। তবে মনে হচ্ছে, ১৯৫৭ সালের কোনও এক সময় লেখা হয়েছিল এই খসড়া চিঠিটি। 'ব্রাইটার দ্যান থাউজ্যান্ড সানস' বেরোয় ১৯৫৮ সালে। এটি মূল জার্মান থেকে ইংরেজি অনুবাদ। মূল জার্মান ভাষায় যেহেতু বইটি বেরোয় ১৯৫৬ সালে, সেহেতু বইটির ড্যানিশ ভাষায় অনুবাদ ('স্টারকের এন্ড টুসিন্ড সোল') ১৯৫৭ সালে হবে বলে মনে হয়। পরের খসড়া চিঠি ১৯৬১ সালে লেখা বলে মনে হয়। কারণ ওই চিঠি বোর-এর তরফে হাইজেনবার্গ-এর ৬০-তম জন্মদিনে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা। হাইজেনবার্গ জন্মেছিলেন ১৯০১ সালে। তার ৬০-তম জন্মদিন ১৯৬১ সালে হয়ওয়ারই কথা।

এগারো বার খসড়া করলেও, প্রথম খসড়া চিঠিটিকেই বোর-এর প্রতিক্রিয়া বলে বিশেষজ্ঞরা ধরে নেন। প্রতিক্রিয়ার আবার প্রতিক্রিয়া হয়। 'সায়েন্স' জার্নালে রিপোর্ট বেরোয় 'লেটার্স অ্যাভার ফিজিসিস্ট সাপোর্টেড নাথিস বম্ব'। অর্থাৎ, হাইজেনবার্গ যে জার্মান অ্যাটম বোমা সমর্থন করেছিলেন, সেটা বোর-এর চিঠিতে আছে। 'সায়েন্স' জার্নালে এই রিপোর্ট বেরোয় ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০২। ২২ মার্চ 'সায়েন্স' জার্নাল চিঠিপত্র কলামে ছাপে মিউনিখে ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর ফিজিক্স-এর ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ ইনস্টিটিউট-এর অধ্যাপক ক্লাউস গটস্টাইনের বক্তব্য। গটস্টাইনের দাবি, কোথাও হাইজেনবার্গ নিজমুখে বলেননি যে, তিনি অন্তর্গতমূলক কাজ করে জার্মান অ্যাটম বোমা বানচাল করতে চান। তা ছাড়া বোর এবং হাইজেনবার্গ-এর পরিবার একসঙ্গে সময় কাটান এবং ওঁরা ছুটি উপভোগ করেন প্রিন্সে বেড়াতে গিয়ে, ওই ১৯৪১ সালের সাক্ষাতের পরেও। ১৯৬১ সালে হাইজেনবার্গ-এর ৬০-তম জন্মদিনে যে স্মরণিকা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, তাতে যে নিবন্ধ পাঠান বোর, তা প্রশংসাসূচক। সুতরাং, এ সবার পরে কিছুতেই বলা যাবে না যে, বোর রাগ করে ওই চিঠি লিখেছিলেন।

বোর রাগ করে যে চিঠি লিখেছিলেন হাইজেনবার্গকে, সে চিঠি 'দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস' কাগজে বেরোয় ৭ ফেব্রুয়ারি। ৯ ফেব্রুয়ারি তার পরিপ্রেক্ষিতে ওই কাগজে বেরোয় 'কোপেনহেগেন'-এর লেখক ফ্রাইন-এর বক্তব্য। ফ্রাইন বলেন, 'হাইজেনবার্গ অ্যাটম বোমা বা অন্য কোনও বোমা দিয়ে কাউকে মারেননি। আর বোর— ঠিক ভাবে বা ভুল করে— মিত্রশক্তির বোমার মধ্য দিয়ে অনেকের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি চিঠিপত্র কলামে বেরোয় নিউ হ্যাম্পশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং হাইজেনবার্গ-এর ছেলে জোখেন হাইজেনবার্গ-এর মন্তব্য। ওই কলাম জোখেন লেখেন, তিনি মানছেন না এই অপবাদ যে, হিটলারের অ্যাটম বোমা প্রকল্পের নেতা হিসেবে হাইজেনবার্গ নাথিস বোমার পক্ষে ছিলেন। সুতরাং বোর হাইজেনবার্গকে চিঠি লিখলেন কি লিখলেন না, তাতে কিছু এসে যায় না।

'কোপেনহেগেন' নাটকের আর একটা প্রতিক্রিয়া হল হাইজেনবার্গ-

এর একান্ত ব্যক্তিগত চিঠিপত্র প্রকাশ। জার্মান প্রকাশনা সংস্থা রেসিডেঞ্জ ভেরলাগ থেকে ২০১১ সালে বেরোয় 'সাইন লাইবে লি'। হাইজেনবার্গ ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত জী এলিজাবেথকে যত চিঠি লিখেছিলেন, আর তার উত্তরে হাইজেনবার্গকে যে চিঠিগুলি লিখেছিলেন এলিজাবেথ, সেই সব। ২০১৬ সালে ইয়েল ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে বেরোয় তার ইংরেজি অনুবাদ 'মাই ডিয়ার লি'। জার্মান ভাষায় মূল চিঠিগুলি সম্পাদনা করেছেন আনা মারিয়া হার্শ-হাইজেনবার্গ। এলিজাবেথ মারা যান ১৯৯৮ সালে। ১৯৭৬ সালে হাইজেনবার্গ মারা যাওয়ার পরে চিঠিগুলি এলিজাবেথের কাছে ছিল। তার ইচ্ছানুসারে চিঠিগুলো হাইজেনবার্গ-এর বড় মেয়ে আনার কাছে যায়। তিনিই সম্পাদনা করেছেন চিঠিগুলি। মূল জার্মানে লেখা চিঠিগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন আইরিন হাইজেনবার্গ। হাইজেনবার্গ-এর পুত্রবধূ।

'কোপেনহেগেন' নাটকের জন্যই যে চিঠিগুলি বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে, সে কথা স্বীকার করেছেন আনা। তাঁর কথায়, 'মা মারা গিয়েছেন ১৯৯৮ সালে। সেই সময় থেকে আমার বাবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি থাকার ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠে। এটা মাইকেল ফ্রাইন রচিত 'কোপেনহেগেন' নাটকটির জন্য। আমি সে কারণে ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মাকে লেখা বাবার চিঠিগুলি খুঁটিয়ে দেখি। যুদ্ধের সময় তাঁর অভিজ্ঞতা এবং সে সময়ের বিচ্যুতি

সম্পর্কে যদি কিছু তথ্য মেলো' চিঠিগুলো পড়ে, আনা জানিয়েছেন, তিনি আকৃষ্ট হন। ইহুদি প্রশ্ন কিংবা হিটলার প্রসঙ্গে একটা কথাও নেই। ওগুলো তখন নিষিদ্ধ বিষয়। কিন্তু ওই চিঠিগুলোর মধ্যে এমন অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পেয়েছে, যা ওই নির্দয় সময়ে সহ্যশক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে।

ওই চিঠিগুলোর মধ্যে একটি চিঠি— যা হাইজেনবার্গ লিখেছিলেন এলিজাবেথকে ১৯৪১ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে— ২০০৩ সালের অগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্যই বোর পরিবারের এক গুচ্ছ খসড়া চিঠি প্রকাশের প্রতিক্রিয়া। ওই চিঠি প্রকাশ হাইজেনবার্গ-এর পরিবারের তরফে। হাইজেনবার্গ এলিজাবেথকে চিঠি লিখছেন মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার আর শনিবার। একটাই চিঠি, তিনটে অংশ। জানা যাচ্ছে, বোর-হাইজেনবার্গ সাক্ষাৎ হয়েছিল অনেক জায়গায়— তার মধ্যে ছিল বোরের বাসগৃহ আর তাঁর ইনস্টিটিউট। আর, তিনজটা সৃষ্ট হয়নি ওঁদের মধ্যে কথোপকথনে। বস্তুত, হাইজেনবার্গ এবং ফন



হাইজেনবার্গ ও তাঁর স্ত্রীর চিঠির সংকলন

ওয়াইজখার যে সপ্তাহব্যাপী কোপেনহেগেন সফর করছিলেন, তার শেষ সপ্তাহেই সময়টা সুন্দর কেটেছিল। বোর, হাইজেনবার্গকে পড়ে শুনিয়েছিলেন (কী পড়ে শুনিয়েছিলেন, তা লেখেননি হাইজেনবার্গ), হাইজেনবার্গ, বোর-কে বাজিয়ে শুনিয়েছিলেন মোৎসার্ট-এর এ-মেজর সোনাতা। এলিজাবেথকে লেখা হাইজেনবার্গ-এর চিঠি পড়ে টমাস পাওয়ারস (যাঁর লেখা 'হাইজেনবার্গ'স ওয়ার' পড়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন ফ্রাইন) 'দ্য নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব বুকস'-এ লেখেন, 'বোর কোথায় রেগে গিয়েছিলেন? কতটা রেগে গিয়েছিলেন? ওঁদের মধ্যে সংঘাত কি তৎক্ষণাৎ শুরু হয়েছিল? তা কতটা গভীর ছিল? চিঠিটা দেখে মনে হয় না।'

হাইজেনবার্গ আত্মজীবনী লেখেন ১৯৭১ সালে। জার্মান ভাষায় সেই আত্মজীবনীর নাম 'ডার টেইল উন্ড ডাস পাঞ্জ'। আর্নল্ড জে পমেরানস সেই আত্মজীবনী জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। নাম দেন, 'ফিজিক্স অ্যান্ড বিয়ন্ড: এনকাউন্টারস অ্যান্ড কনভারসেশনস'। বিভিন্ন পর্বে ভাগ করা সেই আত্মজীবনী। যেমন, 'ইন্ডিভিজুয়াল বিহেভিয়ার ইন দ্য ফেস অব পলিটিক্যাল ডিজাস্টার (১৯৩৭-১৯৪১)'। 'টুওয়ার্ডস আ নিউ বিগিনিং (১৯৪১-১৯৪৫)'। ১৯৪১ সালের ঘটনাবলি বলতে গিয়ে হাইজেনবার্গ বর্ণনা করেছেন বোরের সঙ্গে তাঁর ওই কথোপকথন।

হাইজেনবার্গ লিখেছেন, ভুল বোঝাবুঝি মেটানোর অনেক চেষ্টা তিনি করেছেন। অবশেষে ব্যর্থ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। মনে করেছেন, অতীতকে অতীত হিসেবে থাকতে দেওয়াই ভাল।

প্রতিক্রিয়া আরও আছে। ডেভিড কাসিডি, যিনি হাইজেনবার্গ-এর জীবনী লিখেছেন (লক্ষণীয় যে, ওই জীবনীর নাম ‘আনসার্টেনটি: দ্য লাইফ অ্যান্ড সায়েন্স অব ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ’), তিনি আর একটা বই লিখেছেন ২০০৯ সালে। এই বইয়ের নাম ‘বিয়ন্ড আনসার্টেনটি: হাইজেনবার্গ, কোয়ান্টাম ফিজিক্স অ্যান্ড দ্য বম্ব’।

নাটকে বোর এবং হাইজেনবার্গ যে ভাষায় কথা বলেন, তা সাধারণ দর্শকের বোধশক্তির বাইরে। ‘কোপেনহেগেন’ নিউ ইয়র্ক শহরে শুরু হলে ‘দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস’ দৈনিক কাগজের নাট্য সমালোচক বেন ব্র্যান্টলি প্রশংসা করে লেখেন যে, ‘অনেক বছরের মধ্যে এটিই সবচেয়ে কৌতুহলোদ্দীপক ভাবনার কারিকুরি।’ এর পরেও কাগজটি পরখ করতে চায় নাটকের সংলাপ কে কেমন বোঝেন, কতটা বোঝেন। পরীক্ষা করা যায় কী করে?

নাটকে বোর এক জায়গায় হাইজেনবার্গকে বলছেন, ‘কিন্তু হাইজেনবার্গ, হাইজেনবার্গ! তোমাকেও পথ বদলে দিয়েছে। যদি জনগণ তোমায় দেখতে পেত, যদি আলোয় দেখতে পেত, তা হলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমারও কী হয়েছে, সেটা দেখতে পেত! সমস্যা হল তোমার কী হয়েছে সেটা জানা! কারণ সেটা বুঝতে গেলে তোমায় একটা মানুষ হিসেবে না-দেখে, শুধু একটা কণা হিসেবে বিবেচনা করতে হবে না, একটা তরঙ্গও ভাবতে হবে। আমাকে শুধু তোমার উদ্ভাবিত কণা-মেকানিক্সই ব্যবহার করলে চলবে না, [আরউইন] শ্রোডিন্গার-উদ্ভাবিত ওয়েভ ফাংশনও কাজে লাগাতে হবে।’

ওয়েভ ফাংশন। ১৯২৬ সালের শ্রোডিন্গার ওই ফর্মুলা আবিষ্কার করেন। ১৯২৪ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী লুই ডিব্রয় দেখান যে, প্রত্যেকটি কণাই একটা তরঙ্গ। আবার প্রত্যেক তরঙ্গই একটা কণা। এর উপর

ভিত্তি করে শ্রোডিন্গার ওয়েভ ফাংশন আবিষ্কার করেন। ওয়েভ ফাংশন আদ্যন্ত বিজ্ঞানের ধারণা। সাধারণ দর্শক তার কতটা বোঝেন? বোঝেন না যে, তা বলাই বাহুল্য। ‘দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস’ কাগজ বোরার চেষ্টায় ২০০০ সালের ১৪ মে তারিখে একটি রিপোর্ট ছাপে। রিপোর্টের হেডলাইন, ‘এনজয় দ্য শো! টেস্ট উইল ফলো’। লেখক রিক মারিন। অন্য আইডিয়া— অনিশ্চয়তা তত্ত্ব, যা নাটকের মূল বিষয়— তা কতটা বোঝেন দর্শক, তা নির্ণয় করতে ওই রিপোর্ট।

অনেকের মতামত নেন মারিন। তাঁদের মধ্যে মাইকেল কাম্পস্টি, (নাটকে হাইজেনবার্গ-এর চরিত্রাভিনেতা), নাট্যকার ফ্রাইন, প্রখ্যাত পদার্থবিদ ব্রায়ান গ্রিন (‘দ্য এলিগ্যান্ট ইউনিভার্স’, ‘দ্য ফেরিক অব কসমস’, ‘দ্য হিডেন রিয়ালিটি’ এবং ‘আনটিল দ্য এন্ড অব টাইম’ বইগুলির লেখক) যেমন ছিলেন, তেমন ছিলেন নাম-না-জানা এক দর্শকও। গ্রিনের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব কী, তা জানার কথা, তিনি জানেনও। কাম্পস্টি-র জানার কথা নয়, তবু তিনি জানেন। মারিন ফ্রাইনকে জিজ্ঞেস করায়, এই উত্তর পান— ‘নাটকটা নিউ ইয়র্কে ব্রডওয়েতে চলাকালীন এক জন দর্শকের কাছ থেকে এই চিঠি পাই। তিনি জানতে চান, বিজ্ঞানের কিছু বোঝেন না, এমতাবস্থায় নাটকের বিজ্ঞানটা বাদ দিলে কি খুব অসুবিধে হত? আমি তাকে লিখলাম, বিজ্ঞানের অংশটা বাদ দিলে ব্রডওয়েতে অত দিন চলত না।’

সবচেয়ে মজার মন্তব্য করেন নাম-না-জানা সেই দর্শক। মারিনকে তিনি বলেন, ‘রাস্তায় গাড়ির আওয়াজে কিছু শুনতে পাচ্ছি না।’ অনিশ্চয়তা তত্ত্ব কী, তা জিজ্ঞেস করায় মারিনকে বলেন, ‘না, আমি জানি না। উরে বাবা, আপনি আমার সব কথা রেকর্ড করছেন নাকি?’

এইখানে ‘গালিলেওর জীবন’ নাটকের সঙ্গে ‘কোপেনহেগেন’-এর তফাত। ‘গালিলেওর জীবন’ নাটকে বিজ্ঞান বেশি নেই, যেটুকু আছে, তা যৎসামান্য। আর ‘কোপেনহেগেন’? বিজ্ঞানে ঠাসা। তা সত্ত্বেও এই নাটক জনপ্রিয়। বার্নস্টাইনের কথা মনে পড়ছে।

উপন্যাস

কুসুমবীজ

কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়





ডিসেম্বর ১৯৪১

ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য পানের সাজি থেকে এক খিলি পান মুখের মধ্যে দিয়ে চিবোতে থাকলেন। ক্ষিতীশকে পরিবৃত করে রেখেছেন বিড়দা গ্রামের জনা দশেক লোক। কনকনে শীতে তারা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে কতক্ষণে ক্ষিতীশ পানের পিকটা পিকদানিতে ফেলে আবার যুদ্ধের গল্প বলতে শুরু করবেন। গ্রামের লোকেরা শুনেছে বটে বিশ্বজুড়ে আবার একটা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। তবে সেই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি কেমন সে ব্যাপারে কোনওই ধারণা নেই। আর এই গ্রামে সেই যুদ্ধের গল্পগুলোই বয়ে নিয়ে আসেন ক্ষিতীশ। বোলপুর থেকে বর্ধমান হয়ে খোদ কলকাতা, ক্ষিতীশের কাছে যুদ্ধের গল্প আসার সূত্র একটাই। কয়েক দিনের বাসি খবরের কাগজ।

ক্ষিতীশের খবরের কাগজ যেমন বিড়দা গ্রামের বাইরে থেকে আসে, তেমনই আসে জর্দাটা। ক্ষিতীশ মুখে পুরলেই চার দিকে ভুরভুরে গন্ধ ছড়ায়। আর আছে ক্ষিতীশের হুকোটা। হুকোর গন্ধটা যেন জর্দার গন্ধের দোসর। এ গ্রামে ওরকম জমিদারি জর্দা আর তামাক কে খায়? নেশা করার জন্য আছে দোজা আর বিড়ি। কখনও কখনও মহার্ঘ আফিমের গুলি কপালে জোটে।

ক্ষিতীশ জাতে ব্রাহ্মণ। তার উপর গ্রামের মোড়ল। নিজে মাটির বাড়ির দাওয়ায় মধ্যমণি হয়ে বসে গল্প বলেন। ক্ষিতীশের দু' পাশে বলরাম, হলধরের মতো গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর ব্রাহ্মণ মোড়ায় বসে রয়েছেন। আর সামনের নিকোনো উঠানে কয়েকজন বাগদি, বাড়ির। তারা ক্ষিতীশের গল্প অবাক হয়ে শোনে কিন্তু বোঝে না। গল্পের শেষে নিজেদের মতো করে একটা-দুটো আজব তথ্য আর নিজেদের মতো দৃশ্যকল্প মাথায় নিয়ে ঘরে ফেরে। পৃথিবী সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণা নেই। পৃথিবী বলতে তাদের কাছে পুর্বের চরাচর থেকে পশ্চিমের চরাচর। তবে মোড়লের যুদ্ধের গল্পে আছে শুধু উৎকর্ষ। আশঙ্কা হয় যুদ্ধ করতে এই বিড়দা গ্রামে কোনও দিন কুয়াশা ফুঁড়ে ইংরেজ পুলিশ আর মিলিটারিরা যেন না চলে আসে। কে কী বুঝল না-বুঝল তাতে ক্ষিতীশের কিছু এসে যায় না। যুদ্ধের গল্প বলা তাঁর এক রকম নেশা আর সেই গল্প বলার সময় পরিবৃত হয়ে থাকতে তিনি ভালবাসেন।

যুদ্ধের গল্পের সঙ্গে বলরাম, হলধরেরা চাতক হয়ে থাকেন যদি এক খিলি জর্দা পান পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষিতীশ গল্প বলায় যেমন অকুপণ, পান জর্দা বিলোনায়ে বিপরীত। তবে ব্রাহ্মণদের কপালে যুদ্ধের গল্পের মাঝে এক প্রস্তু এক পেয়লা চা জোটে।

“তার পর?” হলধর গায়ে শালটা জড়িয়ে অধৈর্য গলায় জিজ্ঞেস করলেন।

ক্ষিতীশ থুক করে পিকদানিতে পিক ফেলে বুড়ো আঙুল দিয়ে ঠোঁটের কষ মুছে বলতে আরম্ভ করলেন, “তার পর আর কী? যা হওয়ার ছিল তাই হল। আমেরিকার রুজভেল্ট সাহেব বলে দিলেন, এতদিন আমরা যুদ্ধ করিনি, তফাত ছিলাম। এবার ব্যাটা জাপানি তোমরা আমাদের বন্দরে বোমা ফেলে উড়িয়ে দিলে আর আমরা চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকব? আমরাও যুদ্ধ করব। ব্যস, ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলেছে মার্কিনরা।”

এই গ্রামে পৃথিবীটা ঠিক কেমন, কোথায় কোন দেশ আছে সে সম্পর্কে একমাত্র সম্যক ধারণা আছে বলরামের কনিষ্ঠ পুত্র সমীরণের। গল্প বলায় ক্ষিতীশের চেয়েও দড়।

সমীরণ বয়সে যুবক। মামার বাড়ি বর্ধমান থেকে লেখাপড়া করে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছে। বলরামের তাই নিয়ে এক বুক গর্ব। সমীরণ ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতায় গিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কলম পেশার কোনও কাজ পেতে পারত কিংবা কোনও সাহেবি সওদাগরি আপিসে চাকরি। বিড়দা গ্রামে সর্বোচ্চ শিক্ষিত হয়েও সে ইংরেজদের অধীনস্থ হতে চায় না। বিপ্লবীদের খাতায় নাম লিখিয়েছে। ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়াতে চায়। থেকে থেকে ‘বন্দেমাতরম’ বলে ওঠে। তবে স্বভাবে একটু অলস। আপাতত নেতৃত্বের নির্দেশে বিড়দাতে গা ঢাকা দিয়ে আছে। বড় কোনও একটা কাজে লাগানো হবে ওকে। আপাতত গ্রামের একমাত্র পাঠশালাটার সঙ্গে নাম জুড়ে রেখেছে। সমীরণ মাস্টার। নামের পিছনে মাস্টার কথাটা থাকলেও আদর্শে মাস্টারি করে না। ওটাও এক রকম ভেক। মাঝে মাঝে পাঠশালায় যায়। নিজের ম্যাট্রিক পাসের দস্তে গুটিকয়েক অ-আ-ক-খ পড়ুয়াদের কী পাঠদান করবে ভেবে পায় না। তবে তার একখানা গ্লোব আছে। ক্ষিতীশের কাছে যুদ্ধের গল্প শুনতে আসার সময় সমীরণ কাঁধের বোলায় গ্লোবখানা নিয়ে আসে। তার অবশ্য অন্য আরও একটা কারণও আছে। সে প্রসঙ্গ পরে।

হারিকেনের আলোটা অল্প একটু উজ্জ্বল দিয়ে কোলের উপর গ্লোবটা ঘোরাতে ঘোরাতে সমীরণ জিঞ্জেস করল, “কী বন্দরের নাম বললেন, জেঠাবাবু?”

ক্ষিতীশের স্মৃতিশক্তি প্রখর। এই স্মৃতিশক্তি তাঁর স্লাঘাও বটে। এক বার যা পড়েন স্মৃতিকোষে তা বহু দিন ধরে রাখতে পারেন। জর্দার সুগন্ধি ছড়িয়ে বললেন, “পার্ল হারবার। প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ।” “প্রশান্ত মহাসাগর... প্রশান্ত মহাসাগর...” সমীরণ একটু ঝুঁকে গ্লোবটা হারিকেনের কাছে এনে প্রশান্ত মহাসাগরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ খুঁজতে থাকল। হলধর বিরক্ত গলায় বললেন, “আহ, ওই গোলার মধ্যে অত কী খুঁজিস?”

সমীরণ স্বভাবোচিত দাঙ্কি গলায় উত্তর দিল, “সব যদি আপনি বুঝে যেতেন কাকাবাবু তা হলে তো আর কথাই ছিল না। কলম্বাসের কাছে এইটা ছিল না বলে ভারতবর্ষ আবিষ্কার করতে গিয়ে আমেরিকা পৌঁছে গিয়েছিল,” তার পর গ্লোবটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্ষিতীশকে দেখাতে থাকল, “এই দেখুন জেঠাবাবু, এইটুকু একটা দেশ জাপান। সে কিনা এই এত বড় একটা দেশ আমেরিকাকে আক্রমণ করে তুলোধানো করছে।”

ক্ষিতীশ মাথা ঝুঁকিয়ে দেখতে থাকলেন। হলধরও মাথা ঝুঁকিয়ে গ্লোবখানা গভীর হয়ে দেখতে থাকলেন। হলধর অবশ্য আড়ো বহরে ছোট বড় দেশ বোঝেন না। ইংরেজ আর মার্কিন সাহেবদের তফাত বোঝেন না। একটা জাপানি মানুষকেও কখনও চোখে দেখেননি। শুনেছেন ওরা বেঁটেখাটো, ফ্যাকাসে রং, চাপা নাক। অত্যাচার করতে ইংরেজদের থেকে কম যায় না। এই বাগদি বাড়িরদের সামনে বয়সে ছোট ম্যাট্রিকুলেশন পাসের কাছে হারতে চান না। বললেন, “জাপানিদের এলেম কত সেটা তোর ওই গোলকে লেখা নেই। শুনলি না খিতিদা কী বলল? সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ থেকে এক ঝাঁক বিমান উড়ে বোমা ফেলে এসেছে। ঠিক যেন মহাভারতের যুদ্ধ। কবে বোমাগুলো ফেলল খিতিদা?”

ক্ষিতীশ আবার অভ্রান্ত স্মৃতিশক্তির পরিচয় দিলেন, “এই তো গেল সপ্তাহের ঘটনা। বললাম তো তাদের, ছ’টা বিমানবাহী জাহাজ থেকে সাড়ে তিনশো-র উপর জাপানি যুদ্ধবিমানের ঝটিকা আক্রমণ। পরের দিনই রুজভেল্ট সাহেব গোটা দেশের সমর্থন নিয়ে মিত্রশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিয়েছে।”

আজ অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। গায়ে কশলটা আর-এক বার ভালভাবে জড়িয়ে সমীরণ ক্ষিতীশের বাড়ির ভেতরের দিকে তাকাল। ভেতরের দরজা পর্যন্ত হারিকেনের আলো পৌঁছোচ্ছে না। বিশেষ করে ডান দিকের ঘরটার দরজা পর্যন্ত। চোখদুটো চঞ্চল হয়ে উঠল। সমীরণ আন্দাজ করতে পারছে এখনও কেন থালায় করে চায়ের পেয়ালা নিয়ে সে আসছে না। দরজার আড়ালের অন্ধকারে লুকিয়ে সেও যে মগ্ন হয়ে আছে যুদ্ধের গল্প শুনতে।

“আঁই রাখাল, আরও কাঠকুটো জ্বালা। শীতে তাপ নিই,” সমীরণ সামনে বসা এক জন বাড়িরকে বলল। তাপের চেয়েও আসল উদ্দেশ্য

আলো। উঠানের ওই কোণে কাঠ জ্বালালে আগুনে রঙে তাকে দেখতে বড় ভাল লাগে।

সমীরণ একটু অস্থির হয়ে উঠানে পায়চারি করতে থাকল। জেঠাবাবুর গল্পে একটা বিরাম দরকার। তা হলে সে যদি চা করে আনার ফুরসত পায়।

হলধর সমীরণের দিকে তাকিয়ে বলল, “কী এত ভাবছিস বলত?”

“ভাবনার কী শেষ আছে কাকাবাবু? মার্কিনিরা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দিল মানে মিত্র শক্তিতে আর-একটা দেশ জুড়ে গেল। এতে আমাদের ভাল হল, না খারাপ হল?”

“আমাদের আর কী এসে যায়?”

“অনেক কিছুই এসে যায়। ইংরেজ আর মার্কিনিরা কিন্তু শত্রুর ছিল। তারা মিত্রশক্তির ছাতার তলায় বন্ধু হয়ে গেল।”

“তাতে কী এসে গেল? মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কৌরব পাণ্ডবরাও তো কত শত্রুর রাজকে বন্ধু করে নিয়েছিল।”

“কাকাবাবু সব কি আর মহাভারত দিয়ে হয়? আমাদের বর্তমান সময়টা ভাবতে হবে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অন্য দেশকে ইংরেজ পাশে পেয়ে আরও শক্তিশালী হয়ে গেলে আমাদেরই ক্ষতি।”

ক্ষিতীশবাবু বললেন, “কোথায় তোর ইংরেজ তাড়ানো আর কোথায় বিশ্বযুদ্ধ।”

“তাই তো বলছি। খবর আছে। সুভাষবাবুর অন্তর্ধান এবার বছর ঘুরতে চলল। উনি এখন হিটলারের দেশে। জাপানকে সঙ্গে নিয়ে...” সমীরণ থেমে গেল। আবেগের বশবর্তী হয়ে বেশি কথা বলে ফেলছে কি? নেতৃত্বের কড়া নির্দেশ আছে অনেক তথ্য গোপন রাখতে। জানা নেই ইংরেজরা কোথায় কোন খোচরকে পুষে রেখেছে।

হলধর বললেন, “তোরা আর কী বিশ্বযুদ্ধ দেখেছিস? প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমি কয়েকদিন কলকাতায় গিয়েছিলাম...” হলধর বলতে শুরু করলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চরিত্রচর্চণ চোখে দেখা অতি সামান্য অভিজ্ঞতা। এসব বাগদি বাড়িররাই একমাত্র হাঁ করে শোনে। তারা মাথায় নানান বিচিত্র দৃশ্যকল্প আঁকে। গ্রামের একধারে শালবন থেকে তখন শনশন আওয়াজ ভেসে আসে। ভাবে একদিন যুদ্ধের ডঙ্কা বাজিয়ে ওইদিক থেকেই বিপদ ধেয়ে আসবে। ভয়ঙ্কর বিপদ।

এমন সময় ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যর বাড়ির অন্ধকার এক ঘর থেকে থালায় পেয়ালা সাজিয়ে সে বেরিয়ে এল। তমালিকা। সমীরণ স্থগ্ন হয়ে গেল। অনন্ত মুহূর্তের প্রতীক্ষার যেন অবসান হল। সমীরণের স্বপ্নে যেমন আছে ইংরেজ শাসনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ, তেমনই সেই স্বাধীন দেশে অনেক রঙিন স্বপ্ন আছে তমালিকাকে নিয়ে।

॥ ২ ॥

জানুয়ারি ২০২৩

চরাচরে আজকের সূর্যটা শেষ পর্যন্ত অস্ত যেতে বসেছে। আমি যথারীতি হাত মুড়ে বুড়ো আঙুল দেখালাম। প্রথমটা অবশ্য বলার মতো নতুন কোনও ঘটনা নয়। সৃষ্টির আদিমতম লগ্ন থেকে এই ঘটনা রোজই বিরামহীন ঘটে চলছে। তবু প্রত্যেকদিন এটা আমার কাছে নতুন একটা ঘটনা। আমার মনে হয় প্রত্যেকদিন ভোরে পূর্বের চরাচরে একটা অপাপবিদ্ধ নতুন সূর্য ওঠে। সেটা সেদিনের সূর্য। আর সারা দিন ধরে পৃথিবীর সব গ্লানি, সব বিব শুষে নিয়ে আমাকে সাক্ষী রেখে গোপুলি রাঙিয়ে ক্লান্ত সূর্যটা পশ্চিমের চরাচরে অস্ত যায়।

মাটির টিবিটার উপর স্থির হয়ে বসে আছি। এইসময় আমি হাওয়া-মোরগের মতো ঘুরি না। সেই কোন কিশোরবেলা থেকে এই সময়ে পশ্চিম দিকে চেয়ে চেয়ে সমাধিস্থ হয়ে বসে আমার দিন মুড়ায়। সূর্যটা যখন পাপের বোঝা নিয়ে ডুবতে যায় আমি এক বার হাত মুড়ে বুড়ো আঙুল দেখাই। ওটা যেন খানিকটা অনুমতি দেওয়া। অমনি সূর্যটা বুপ করে ডুবে যায়। আজকাল মোবাইল ফোনে ওই হাত মোড়া বুড়ো আঙুলের ইমোজির যাই মানে হোক, আমার ডুবন্ত সূর্যকে বুড়ো আঙুল

দেখানোটা অবশ্য বিক্রপ। নাহ, সারাদিনে আমার থেকে সূর্য শুবে নেওয়ার জন্য কোনও কিছু পায় না। প্রতিস্পর্ধীর আক্রোশ নিয়ে আমার বয়স শুধু একদিন বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ডুব দিয়ে আর-একটা আগামিকালের জন্য অপেক্ষা করে।

লম্বা শ্বাস নিয়ে গোধুলির আলোয় চারদিক দেখলাম। এককালে এখানে ঘন শালবন ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজরা এখানে সেই শালবন খানিকটা কাটিয়ে দিয়েছিল। তার পর অবশিষ্ট শালবনটাও কখনও গ্রাম থেকে কোনও কারণে কাটানো হয়েছিল। এখন তাই বিক্ষিপ্ত কিছু গাছগাছালি ছাড়া বাকিটা ধু ধু জমি। তার মধ্যে সাপের মতো আঁকাবাঁকা একটা খাল। এই শালবন কাটানো জমিতে আজও কোনও চাষ হয় না, কেউ বাড়ি ঘরদোরও করেনি। বিঘের পর বিঘে পতিত জমি। তবে কোনও এককালে কী করে যেন এই জমির পাট্টা বিলি বন্টন করা হয়েছিল। বর্ধমান জেলার এত উর্বর ফসলি জমির মধ্যে এরকম বিস্তীর্ণ পতিত জমি দেখে অনেকে আশ্চর্য হয়। এক বার সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল যদি অন্তত এক ফসলি জমি করা যায়। এক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটা প্রোজেক্ট করে বিফল হয়েছিল।

এই পতিত জমির বিষেখানেকের পাট্টা আমাদেরও আছে। এই বিষেখানেক ছাড়া সবটাই সম্পত্তি কলকাতার এক কোম্পানি ইকো ভিলেজ করবে বলে কানে নিয়েছে। জমির পাট্টাগুলো ছিল এই বিড়দা গ্রামের আমাদেরই চার পুরুষের লতায় পাতায় জ্ঞাতিগুপ্তির মধ্যে। আমাদের জমির পাট্টা আমার মায়ের নামে। এই যে কয়েক একর অনুর্বর জমি, বংশ পরম্পরায় এর যে কত টুকরো মালিক ছিল, কলকাতা থেকে কোম্পানি টাকার থলি নিয়ে বনবান না করলে হয়তো জানা যেত না। টাকার থলি যত বনবান করেছে তত এর-ওর বাড়ি থেকে পাট্টা বেরিয়েছে। সবাই কলকাতার কোম্পানিকে জমি বিক্রি করে দিয়েছে। শুধু আমি কিছুতেই এই জমি বিক্রি করতে রাজি নই। মা এটা নিয়ে ধন্দে আছে। মা আমার জেদের কারণ কিছুটা বুঝতে পারলেও এই নিষ্ফলা জমিটা বিক্রি করে দেওয়ার শত প্রলোভন থেকে হুমকি, কিছুতেই আমাকে টলানো যায়নি।

আমাদের অভাবের সংসার। এই জমি ছাড়া অবশ্য গ্রামের অন্য প্রান্তে আমাদের আছে পনেরো বিঘে বর্গা ফসলি জমি। সেই জমির চাষে আর মায়ের বিধবা পেনশনের টাকায় সংসার চলে। কাল রাতে কারা যেন আমাদের জমির ধান ট্রাক্টর চালিয়ে পুরো নষ্ট করে দিয়েছে। নিতুকাবা আমাদের ভাগ চাষি। সকালবেলায় নিতুকাবা কাঁদতে কাঁদতে এসে খবর দিয়েছিল। কারা করেছে সেটা অনুমান করা কষ্টের নয়। এটাও ওই চাপ সৃষ্টির এক প্রক্রিয়া। বিক্রি করার ধান আর রইল না। বছরভর টাকার অভাব হবে। তখন বাধ্য হয়ে কোম্পানির কাছে এই জমিটা বিক্রি করতে হবে। তবু আমাকে টলানো যাবে না। এই জমির উপরই তো আছে এই টিবিটা। আমার সিংহাসন। টিবির একপাশে রয়েছে কুসুম গাছের বোপা। যখন জংলা গাছগুলোয় আগুনে হলুদ কমলা রঙের থোকা থোকা ফুল ফোটে, সূর্যাস্তর আগুনে কমলাও লাল হয়ে যায়। আমি হলফ করে বলতে পারি এই দুনিয়ায় এমন কোনও রাজসিংহাসন নেই, যা মহার্ঘ হিরে-মানিক দিয়ে এর চেয়ে ভাল সাজতে পারে। তাই তো আমি আমার সিংহাসনে বসে প্রত্যেকদিন প্রতিবাদী প্রতিস্পর্ধী হয়ে ডুবন্ত সূর্যকে বুড়ো আঙুল দেখাই। এই যে আমাদের চাষ নষ্ট হয়ে গিয়েছে কাল রাতে, যা আজকে সকালে যে সূর্যর আলোয় জানলাম, সেই সূর্যটা অন্ত যাওয়ার সময় তার জন্য আমাকে কি একরাশ দৃষ্টিস্তা দিয়ে যেতে পারল?

“মনা।”

ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম টিবির নীচে কখন যেন হাবুদা আর কয়েকজন এসে দাঁড়িয়েছে। হাবুদা হাতছানি দিয়ে ডাকল, “মনা, এক বার নীচে নেমে আয়।”

হাবুদাকে দেখলে এখন বেশ হাসি পায়। চিরকালই হাবুদাকে দেখে এসেছি, হাড় জিরজিরে খালি গায়ে পৈতে বুলিয়ে খাটো করে লুঙ্গি পরে টো টো করে ঘুরে বেড়াতে। এখন কলকাতার যে কোম্পানি এই বাঁজা জমি কিনেছে, হাবুদা গ্রামের অনেকের মতো তাদের প্রোজেক্ট সাইটে কাজ পেয়েছে। হাবুদা এখন খাকি জামাকাপড় পরে। তার উপর একটা

কমলা ফ্লোরোসেন্ট ফতুয়া। মাথায় হলুদ হেলমেট, পায়ে গামবুট। এগুলো পরে হাবুদা এখনও অবশ্য সড়গড় হতে পারেনি। থেকে থেকে প্যাণ্টের মধ্যে জামাটা গোঁজে।

দেখলাম হাবুদার সঙ্গে একই রকমের পোশাকের আরও দুটো লোক আর সেই মেয়েটা কাল যার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছিল। আমি জানি আজ আবার হাবুদা এই মেয়েটা আর লোকলস্কর নিয়ে কেন এসেছে। আমাকে বোঝাতে। মেয়েটা বাইরের মেয়ে। কয়েকদিন দেখছি এসেছে। আসার পর থেকেই এখানে ঘুরঘুর করে। ও বুঝতে না পারলেও হাবুদার অন্তত বোঝা উচিত আমাকে লাখো চেষ্টা করলেও রাজি করতে পারবে না। বিশেষত কাল রাতে আমাদের পাকা ধান নষ্ট করিয়ে দেওয়ার পরও আমি যখন কাউকে কিছু বলতে যাইনি।

কল্লনাজেঠি বিড়দার পঞ্চায়েত প্রধান। কলকাতার কোম্পানিটার সঙ্গে সাঁট করে ছেলে গাবলুকে করে দিয়েছে গাল ভরা এক নাম, কোঅর্ডিনেটর। আর সঙ্গে জুতে দিয়েছে হরিশ উকিলকে। গাবলুকে অবশ্য বিশেষ কষ্ট করতে হয়নি। চিরকালের বিবদমান জ্ঞাতি-গোষ্ঠীরা সুড়সুড় করে পর্চা হাতে কল্লনাজেঠির বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে দিয়েছিল। গাবলু একটা ম্যাপ বিছিয়ে দাগ দিয়ে দিয়ে কোম্পানির কাগজ তৈরি করে আর হরিশ উকিল কোর্ট-কাছারি করে পাকা কাগজে সেই করিয়ে দিলে গাবলু কোম্পানির কাছ থেকে চেক নিয়ে আসে। এর মধ্যে আমিই যেন কুলাঙ্গারের মতো বাদ আছি। রাজি হলে টাকার সঙ্গে এই প্রোজেক্টে হয়তো একটা চাকরিও পেয়ে যেতাম। হাবুদার মতো খাকি পোশাক, গামবুট আর হেলমেট পরে ঘুরতাম।

হাবুদা আবার হাত নাড়িয়ে চোখমুখ কুঁচকে তাড়া দিল, “আই মনা। নাম না।”

আমার কী তাড়া! আমি আমার মজির মালিক। ইচ্ছে না করলে নাও নামতে পারতাম। বিশেষ করে ওই মেয়েটাকে নিয়ে আবার যখন হাবুদা এসেছে। কিন্তু সূর্যকে আমার আজকের মতো বুড়ো আঙুল দেখানো হয়ে গিয়েছে। এমনতেই আমি এখন নামতাম। ধীরে সুস্থে নীচে নেমে বিরক্ত গলায় বললাম, “কী হয়েছে?”

মেয়েটা দু’পা আমার দিকে এগিয়ে এল। কাল ঝগড়ার সময় জেনেছি মেয়েটা ইঞ্জিনিয়ার। মেয়েটার পোশাক-আশাক হাবুদার বা সঙ্গের লোকগুলোর মতো নয়। ঘন নীল জামা, জিপ্সের প্যান্ট, মাথায় সাদা হেলমেট। মেয়েটা টিবিটা দেখিয়ে একটা বেমক্সা প্রশ্ন করল, “আচ্ছা এই যে টিবিটা, এটা কি ন্যাচারাল?”

আজব প্রশ্ন! এরকম কোনও প্রশ্ন আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। সত্যি কথা বলতে, নিজেও কখনও ভেবে দেখিনি। জ্ঞান হওয়া ইন্তক এই টিবিটা এরকমই দেখেছি। পুরো ন্যাড়া। শুধু টিবির নীচে কুসুম গাছের কিছু বোপ আছে। তা ছাড়া কোনও আগাছা পর্যন্ত জন্মায় না। গলায় বিরক্ত ধরে রেখে উত্তর দিলাম, “আপনাদের সাইটে আমাদের গ্রামের অনেকেই তো কাজ করছে। তাদের জিজ্ঞেস করুন না। আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? আর আপনি রোজ এখানে আসেন কেন?”

“আপনি তো আশ্চর্য লোক। সাধারণ একটা প্রশ্ন করছি, তাতেই এত অ্যাটিটিউড দেখাচ্ছেন কেন?”

হাবুদা আমাকে একটু সামলানোর চেষ্টা করল, “ঠিক করে কথা বল না মনা।”

ঠিক করে আর কী কথা বলব? এই মেয়েটার এত বড় স্পর্ধা, কাল আমার কোনও অনুমতি নেওয়ার তোয়াক্কা না করেই কুসুম গাছ ছিঁড়ছিল। সেই নিয়েই কাল তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গিয়েছে। কল্লনাজেঠি, গাবলু, হরিশ উকিল থেকে আরম্ভ করে কোম্পানির লোক কিছুতেই আমাকে আর মাকে বাগে আনতে না পেলে এইবার হয়তো এই মেয়েটাকে লেলিয়েছে।

গুস্তীর গলায় বললাম, “এই টিবিটা কিন্তু আমার জমির মধ্যে পড়ে।” আনমনা গলায় মেয়েটা বলল, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।”

“কিছু বললেন?”

“না, বলছিলাম এই টিবিটা আপনার জমির মধ্যে পড়ে সেটা জানি। আপনাকে শুধু জিজ্ঞেস করছি এই টিবিটা ন্যাচারাল কিনা?”

“জানি না।”

“কত দিনের পুরনো হবে বলুন তো এটা?”

আবার আজব প্রশ্ন। তবে অবাস্তব প্রশ্নের অবাস্তব উত্তর হাবুদাই দিল। মোলায়েম গলায় বলতে আরম্ভ করল, “আপনাকে বলছিলাম না ম্যাডাম, এই জমির উপর অভিশাপ আছে। তাই আবাদি হয় না...”

“কত যে মধুর স্মৃতি রয়েছে। গল্প, কবিতা, গান।”

হাবুদা ফ্যালফ্যালে মুখে বলল, “আজ্ঞে ম্যাডাম। অ্যাঁই মনা, ম্যাডাম জিজ্ঞেস করছিলেন তুই এখানে রোজ আসিস কেন?”

“আমার জমি, আমি কেন আসব, সে কৈফিয়ত দিতে হবে নাকি?”

“মনা, একটু ঠিক করে কথা বল না।”

মেয়েটা অল্প হাত তুলে হাবুদাকে থামিয়ে আমাকে বলল, “আপনাদের বাড়ি এক বার যেতে পারি?”

“মায়ের সঙ্গে কথা বলবেন? লাভ হবে না,” তির্যক হেসে মাথা বাঁকাতে থাকলাম।

“বিক্রির জন্য আমি বলতে আসিনি। ওটা আমার কাজ নয়। শুনেছি আপনাকে বললেও আপনি রাজি হবেন না। আমি শুধু এক বার আপনাদের বাড়ি যেতে চাই। অনেক কিছু কানেক্টেড।”

“হঠাৎ আমাদের বাড়ি কেন?”

“আপনার পূর্বপুরুষ ছিলেন বলরাম চৌধুরী।”

আমি হাবুদার দিকে তাকালাম। বলরাম চৌধুরী ছিলেন আমার বাবার ঠাকুরদা। এইসব তথ্য হাবুদাই নিশ্চয়ই কোথা থেকে জোগাড় করে জুটিয়েছে।

“তো?”

“সই।”

“মানে?”

“জ্যোৎস্না চৌধুরী ছিলেন বলরাম চৌধুরীর পুত্রবধূ।”

এবার রীতিমতো আশ্চর্য হলাম। বলরাম চৌধুরী নামটা গ্রামের কোনও দস্তাবেজে থাকলেও বাবার ঠাকুরমার নাম কোথাও আছে কি? কেউ তো আর বাবার ঠাকুরমার নাম মনে রাখেনি। আমি বোধ হয় প্রথম কারও মুখে নামটা শুনলাম। আর মেয়েটা এইসব বলছেই বা কেন?

“আপনাদের বাড়ি এক বার যেতে চাই।”

আমি কিছু বলার আগে আমাকে একেবারে উপেক্ষা করে হাবুদা গদগদ গলায় বলল, “হ্যাঁ ম্যাডাম। ও বলার কে? আমি আপনাকে নিয়ে যাব সোনাকাকির কাছে।”

“এই ঢিবি আমার খুব আপন। কত যে গল্প লুকিয়ে আছে,” মেয়েটা আবার খানিক আনমনা গলায় বলল।

কথাগুলোর মাথামুড় বুঝলাম না। জমিটা হাতানোর এ আবার কী রকম চাল? বিরক্ত চোখে হাবুদা আর মেয়েটার দিকে তাকালাম। তার পর হনহন করে আল দিয়ে হাঁটতে থাকলাম। পেছন থেকে হাবুদার গলার আওয়াজ পেলাম, “এত দেমাগ দেখাস না মনা। যে আলটা দিয়ে হাঁটছিস সেটা এখন কোম্পানির। বন্ধ করে দিলে, এই ঢিবিতে রোজ রোজ আসার পাগলামির শখ তোর ঘুচে যাবে।”

॥ ৩ ॥

বিরশি বছর আগে

“আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি।

তোমায় দেখতে আমি পাই নি।

বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাই নি ॥

আমার সকল ভালোবাসায় সকল আঘাত সকল আশায়

তুমি ছিলে আমার কাছে, তোমার কাছে যাই নি ॥”

হাতে সময় কম। মনে মনে একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যর বাড়ির দিকে যাচ্ছিল সমীরণ। বাড়ির সামনে পৌঁছোতেই পা দুটো থেমে গেল। বাড়ির ভেতর থেকে সুরেলা গলায় গান ভেসে আসছে। সঙ্গে হারমোনিয়াম। তবে এই গানের সুরে বিষাদ। সমীরণ একটু চিন্তা করে শ্রাবণ মাস থেকে কড় গুনতে থাকল।

ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ। পাঁচ মাস তো হতে চলল, রবি ঠাকুর মারা গিয়েছেন, মেয়েটা এখনও শোক কাটিয়ে উঠতে পারল না? তেতো মনে বিড়বিড় করে উঠল, “বাপ মা মরলে এতদিন শোক থাকে না। আর এক কবির জন্য এত শোক!” সে যতই লোকে বিশ্বকবি বিশ্বকবি বলে আহ্বাদ করুক না কেন। এই শোক না কাটলে তমালিকা যে আপন হবে না। মনের কথা আদান প্রদান করা যাবে না।

ধূতির মালকোঁচা ঠিক করে নিয়ে পাঁচিলের মধ্যে দরজা ঠেলে উঠানে ঢুকল সমীরণ। সুযোগটা আচমকা ঘটে গেল। তাই একটু হিসেব করেই এসেছে। জেঠাবাবুকে দেখেছে লোকলশকর জুটিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে যুদ্ধের গল্পের সেই বাসি খবর বিলোতে। জেঠাইমাকে দেখেছে বড় পুকুরের দিকে স্নান করতে যেতে। পৌষ মাস জুড়ে স্নান করে ভিজে কাপড়ে জেঠাইমা ধর্মঠাকুরের মন্দিরে ব্রত করতে যাবে। এই মাসটায় আধঘণ্টা করে সময় রোজ পাওয়া যাবে। তাই আর সময় নষ্ট করেনি।

সমীরণের ঝোলায় গ্লোব ছাড়া আজ আরও দুটো মহার্ঘ বস্তু আছে। প্রথমটা একটা দেশি পিস্তল। দু’দিন হল পিস্তলটা পেয়েছে বোলপুরে গোপন এক মিটিং-এর পরে। দ্বিতীয়টা একটা বই। ফেরার পথে জোগাড় করে এনেছে শান্তিনিকেতন থেকে। যে কবিকে নিজের প্রেমের অন্তরায় মনে করে, যাকে মনেপ্রাণে সহ্য করতে পারে না, সেই কবির শেষ কবিতার বই। সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধের খবরে মগ্ন ক্ষিতীশের হয়তো এই বইয়ের খবরটা চোখেই পড়েনি। তা হলে সন্দের গল্প বলার আসরে এক বার হলেও বলতেন। সে নজর করেননি বা বলেননি ভালই হয়েছে। মহার্ঘ বস্তু দুটো একটু খেলিয়ে তপী অর্থাৎ তমালিকাকে দেখাতে হবে।

“তুমি মোর আনন্দ হয়ে ছিলে আমার খেলায়—

আনন্দে তাই ভুলেছিলেম, কেটেছে দিন হেলায়।

গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখসুখের গানে

সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান তো গাই নি ॥”

সমীরণ নিঃশব্দে দালানে উঠে দরজার পাশে কান পাতল। তপী ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সমীরণ নরম গলায় ডাকল, “তপী।”

ভেতরে ফোঁপানিটা বন্ধ হল। একটু পরেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল তমালিকা। চোখের কোল ভিজে। সমীরণকে দেখে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চোখের কোল মুছে বলল, “ও সমুদা, তুমি!”

“জেঠাবাবু আছেন?”

“বাবা তো বাইরে গিয়েছেন। শুনছিলাম চণ্ডীমণ্ডপে যাচ্ছেন।”

সমীরণ চিন্তিত মুখে বলল, “জেঠাবাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিল।

জেঠাবাবু যুদ্ধের এত খবর রাখছেন, নতুন কিছু খবর এসেছে যা খবরের কাগজে এখনও ছাপেনি, জানি না ঠাঁর জানা আছে কি না।”

তমালিকা আগ্রহী গলায় জিজ্ঞেস করল, “কী খবর?”

“সে জেঠাবাবুকেই আগে বলব। এদিকে শুনেছিস তো, জাপান পূর্ব এশিয়ায় প্রচণ্ড আগ্রাসন করছে। হংকং আগেই দখল করে নিয়েছিল। এর পর সিঙ্গাপুর, মালয় হয়ে বর্মার দিকে এগোবে। জানিস কোথায় দেশগুলো?”

একটু চিন্তা করে তমালিকা বলল, “মালয়, ব্রহ্মদেশ জানি। সিঙ্গাপুর নাম শুনেছি। কোথায় গো? তোমার গ্লোবটা সঙ্গে নেই?”

সমীরণের ঝোলায় যে গ্লোবখানা আছে সেটা আলাদা করে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। পেট ফোলা ঝোলাটা গ্লোবের অন্তিত্ব জানান দিচ্ছে।

“আছে। তবে কাউকে যদি না বলিস, তার আগে তোকে আরও জিনিস দেখাতে পারি।”

তমালিকা খুব কৌতূহলী গলায় বলল, “কী, দেখাও।”

সমীরণ এক বার চারদিকটা সন্তপর্ণে তাকাল। তার পর নিচু গলায় বলল, “ঝোলা থেকে বার করে দেখানো যাবে না। দেখতে হলে এখানে দ্যাখ।”

কোলের উপর ঝোলাটা নিয়ে ঝোলার মুখটা একটু ফাঁক করল সমীরণ। তমালিকা সমীরণের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ঝোলার ভেতরে উঁকি দিল। সমীরণ চোখ বন্ধ করে লম্বা একটা শ্বাস নিল। অদ্ভুত একটা মাতাল করা গন্ধ। দু’হাতের মধ্যে তমালিকার তুলতুলে শরীরটা। ইচ্ছে

করছে দু' হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে বুকের কাছে টেনে নিতে।

“সর্বনাশা!” তমালিকা ভয় পেয়ে মুখ চাপা দিয়ে বলল, “তুমি বন্দুক নিয়ে ঘুরছ?”

“বন্দুক নয়, পিস্তল। দল থেকে দিয়েছে। বোলপুরে আমাদের মিটিং ছিল। খুব গোপনে অনেক কিছু আলোচনা হয়েছে।”

“তুমি মানুষ মারবে?” তমালিকার মুখে ভয় ভাব আর কাটছে না।

“এত আশ্চর্য হচ্ছে কেন তুই? বিপ্লবীদের কথা যেন শুনিসনি। আমাদের দেশকে ব্রিটিশরাজ মুক্ত করার জন্য ইংরেজদের যদি গুলি-বোমা দিয়ে মেরে মেরে তাড়াতে গিয়ে ফাঁসি যেতে হয়, তাই যাব। বন্দেমাতরম। দল বলেছে আমাদের এখন প্রচণ্ড সতর্ক থেকে সমস্ত গতিবিধির ওপর কড়া নজর রেখে ঠান্ডা মাথায় আমাদের স্বাধীনতার জন্য বিশ্বযুদ্ধকে কীভাবে কাজে লাগাতে হবে ভাবতে হবে। তুই তো রবি ঠাকুরের শোকেই ডুবে আছিস। এখন কবিতা-গান নিয়ে শোকে ডুবে থাকার সময় নয়। আমাদের এই বর্ধমানে কী কী হয়ে চলেছে কিছুই খবরাখবর রাখছিস না,” সমীরণ দু' দিকে মাথা নাড়াতে থাকল।

“কেন, বর্ধমানে আবার কী হল?”

“বোস। মন দিয়ে শোন। রবি ঠাকুর মারা গেলেন গেল শ্রাবণ মাসে আর ভাদ্র মাসে আমাদের বর্ধমানের মহারাজ বিজয়চাঁদ। বর্ধমান রাজাদের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশিদিন রাজত্ব করা মহারাজ। মহারাজের ইংরেজি তোষণ বিদ্রোহ নিয়ে সুনাম দুর্নাম যাই ছিল, উনি কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিজের মতো সমর্থন করে এসেছেন। কংগ্রেস তাই মহারাজকে নিজেদের লোকই মনে করত। এখন মহারাজের মৃত্যুর পর নতুন সিংহাসন পেয়েছেন ওঁর বড় ছেলে উদয়চাঁদ। ইংরেজরা ওঁকে অনেক কমিটি-টিমিটিতে রেখেছে। কয়েক মাস সবে হল। এখনও বোবা যাচ্ছে না উদয়চাঁদ কোন পক্ষ নেবেন। ইংরেজদের পক্ষ নাকি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পক্ষ। বিশেষ করে এই বিশ্বযুদ্ধের টালমাটাল সময়ে।”

তমালিকা সত্যিই এত সব খবর রাখে না। বাবাও এসবের ব্যাপারে আলোচনা করেন না। বাবার একমাত্র আগ্রহ বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে। কিন্তু কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না যে সমুদ্রা বন্দুক চালিয়ে মানুষ মারবে। চিন্তিত হয়ে আনমনা গলায় বলল, “মোহনদাস গান্ধীই তো ঠিক। অহিংসার পথে স্বাধীনতা অর্জন করা।”

হো হো করে হেসে উঠল সমীরণ, “অহিংসা, এত অহিংসাতেই যদি সব মীমাংসা হয়ে যেত তা হলে পৃথিবী জুড়ে এত বড় যুদ্ধ কেন হচ্ছে বল তো?”

তমালিকা তবু অবিশ্বাসী গলায় জিজ্ঞেস করল, “তুমি বন্দুক মানে ওই পিস্তল চালাতে পারো?”

সমীরণ হাসল, “কেন পারব না? তবে নিখুঁত হতে আরও অনুশীলন করতে হবে।”

“কোথায় অনুশীলন করবে?”

“গোপনে করতে হবে। ওই শালবনের ভেতরে করতে হবে। ওখানে কেউ যায় না। কেন তুই দেখবি?”

তমালিকা মাথা নাড়ল, “না বাবা। আমার ওসব দেখে কাজ নেই।”

সমীরণ একটু চুপ করে থেকে বলল, “যদিও তোকে বলছি এটা গান কবিতার সময় নয়, তবু তোকে আর-একটা জিনিস দেখানোর ছিল।”

তার পর সমীরণ ঝোলা থেকে বার করল তুরূপের তাস। রবীন্দ্রনাথের ‘শেষ লেখা’। পাতলা একটা কাব্যগ্রন্থের বই। তার পর বলল, “এই বইটা হচ্ছে রবি ঠাকুরের শেষ লেখা অপ্রকাশিত কবিতাগুলো নিয়ে...”

এত কথা শোনার সময় নেই। বইটা দেখেই তমালিকার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। বইটা ছুঁয়ে দেখতে তার সইছে না। হাত বাড়িয়ে বলল, “দাও, দাও।”

বইটা হাতছাড়া করল না সমীরণ। বইটার শেষের দিকে একটা পাতা খুলে অনভ্যস্ত গলায় আবৃত্তি করার চেষ্টা করতে থাকল,

“তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি

বিচিহ্ন হলনা-জালে,

হে হলনাময়ী।

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে

সরল জীবনে।

এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বের করছে চিহ্নিত;

তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।”

এইটুকু কোনওরকমে পড়ে বইটা মুড়ে ফেলে ঝোলায় ঢুকিয়ে নিল সমীরণ। তমালিকা আবার অনুনয়ের গলায় বলল, “দাও, দাও না গো।”

সমীরণ মাথা নাড়ল, “না, এ বই তোর হাতে দেওয়া যাবে না।”

শুকনো মুখে তমালিকা জিজ্ঞেস করল, “কেন?”

“শান্তিনিকেতনে যার কাছ থেকে এই বইটা নিয়ে এসেছি, সে শর্ত দিয়েছে এই বই কারও হাতে দেওয়া যাবে না। এই বই আমার কাছে অন্য উদ্দেশ্যে আছে। তবে একটা উপায় হতে পারে।”

“কী উপায়?” তমালিকা চঞ্চল হয়ে জানতে চাইল।

“পনেরোটা মাত্র কবিতা আছে বইটায়। আমি তোকে একটা একটা করে পড়ে শোনাতে পারি। তুই খাতায় টুকে নিবি।”

তমালিকা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, “বেশ, আমি এফুনি খাতা কলম নিয়ে আসছি।”

সমীরণ হাত তুলল, “না, এখানে নয়।”

“তবে?”

“গোপনে। তোকে শালবনের ভেতর ওই টিবিটার কাছে আসতে হবে যেখানে কুসুমবীজের জন্য যাস।”

তমালিকা বুঝতে না পেরে বলল, “মানে?”

“আমাকে চাঁদমারি অনুশীলন করতে হবে। পিস্তলে গুলি ছুটলে গুড়ুম করে জোর আওয়াজ হবে। যতই শালবনের ভেতর অনুশীলন করি, ওই আওয়াজ বাইরে আসবেই। তাই আমাকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, বোলপুর থেকে গুসকরা হয়ে বিকেলের রেলটা ভেঁপু বাজিয়ে যখন বড় সাঁকোর ওপর দিয়ে ঝমঝম আওয়াজ করে পেরোবে তখন অনুশীলন করতে হবে।”

তমালিকার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। তাই দেখে সমীরণ আরও ব্যাখ্যা আরম্ভ করল, “বড় সাঁকোটা পেরোনোর সময় রেল ইঞ্জিন লম্বা লম্বা হুইসেল বাজায়। সেই হুইসেলের আওয়াজে যথাসম্ভব গুলির আওয়াজকে ঢাকতে হবে।”

“কিন্তু আমি?”

“দেশ স্বাধীন করার জন্য মেয়েরা কত বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে বল তো? বীণা দাস, লতিকা ঘোষ, কল্পনা দত্ত কত নাম বলব! বীণা দাস তো স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করে প্রায় মেরেই দিয়েছিল। হতচ্ছাড়াটা কপালজোরে বেঁচে গিয়েছে কান ঘেঁষে গুলি চলে যাওয়ার জন্য। এতদিন জেল খেটে বীণা দাস এই সবে ছাড়া পেয়েছে। দেশের জন্য কী আত্মত্যাগ বল তো? আমি তো তোকে এত সব করতে বলছি না। টিবিটাকে আড়াল করে শালবনে অনুশীলন করার সময় তুই শুধু খেয়াল রাখবি কেউ দেখে ফেলছে কিনা। যদি ধরা পড়ে যাই, তা হলে আমাদের ঢাল হবে তোর রবীন্দ্রনাথ। তুই জানিস না তপী আমি তোকে কতটা...”

সমীরণের কথা শেষ হল না। উঠানে একটা উত্তেজিত মহিলাকণ্ঠ শোনা গেল, “সই, সই...”

সমীরণ চমকে উঠে দেখল উঠানে ওর সদ্য বিবাহিতা বৌদি, জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না ঠিক আশা করেনি এখানে সমীরণকে দেখতে পাবে। গায়ে এত বড় কাণ্ড হচ্ছে এখন। নিজের ঘোমটাটাকে ঠিক করল। কিন্তু উত্তেজনা কমছে না।

“কী হয়েছে সেজো বৌঠান?”

জ্যোৎস্না হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, “চণ্ডীমণ্ডপে দু' গাড়ি পুলিশ-মিলিটারি এসেছে।”

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সমীরণ। তার পর দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

চুপ করে খাটে শুয়ে ছিলাম। আমাদের ছোট দোতলা পাকা বাড়িটা গ্রামের এক প্রান্তে। মায়ের শোওয়ার ঘর থেকে গ্রামটা যেমন দেখা যায়, আমার শোওয়ার ঘরের দক্ষিণের জানলা দিয়ে সেরকম জমিটা

দেখা যায়। সেখানে এখন পূর্ণ উদ্যমে ‘ইকো ভিলেজের’ কাজ হচ্ছে। তার মধ্যে অতন্ত্র টিবিটা নির্মোহের মতো মাথা উঠিয়ে আছে। এখন অবশ্য চাঁদের আলোয় টিবিটাকে ঠিক ঝাঁঝি পোকার শব্দ মাথানো নির্মল সিল্যুটের মতো দেখায় না। প্রোজেক্টের কাজ আরম্ভ হয়েছে। ওদের ফ্রেন, এক্সক্যাভেটর, পাইলিং চলে চকিশ ঘণ্টা। চকিশ ঘণ্টা পাইলিংয়ের দুম দুম আওয়াজ, জেনারেটরের ঘট ঘট, এসব আর কে বাধা দেবে? গ্রামসুদু সব জাতিগুষ্ঠিকেই তো কোম্পানি কিনে নিয়েছে।

শুনেছি দ্রুত এই ‘ইকো ভিলেজের’ প্রোজেক্ট তৈরির কাজ শেষ হবে। এটা গ্রামের উন্নয়নের অংশ। টুরিস্টরা আসবে। গ্রামের ব্যবসাপাতি বাড়বে। গাবলু এক বার মাকে একটা ছবি দেখাতে এনেছিল। রিস্ট তৈরি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে কেমন দেখতে হবে। রাজপ্রাসাদের মতো একটা বাড়ি। সেই বাড়ি ঘিরে রূপকথার বইয়ের ছবির মতো বাগান, ছোট ছোট কুটির। বাঁজা জমিটার বুকে মখমলের মতো সবুজ ঘাস। কত রকমের ফুল, প্রজাপতি। জমির মধ্যে দিয়ে ওই যে অজগরের মতো খালটা, তার দু’ পাশ পাথর দিয়ে বাঁধানো। জলের মধ্যে লাল, নীল, সবুজ বোট।

মা যেন একটু টলে গিয়েছিল, “সত্যি এরকম হবে রে গাবলু?”

“দেখো তুমি সোনাকাকি। তোমাকে তা হলে এতদিন ধরে বলছি কী! এক বার কোম্পানি কাজ শেষ করে হ্যাণ্ডওভার দিয়ে দিলে তোমার ওই জমি কেনার কেউ থাকবে না। আর মনা যাবেই বা কী করে ওই জমিতে? চারদিকে তো পাঁচিল তোলা হবে। দ্বীপের মতো থাকবে মনার টিবিটা।”

গাবলু এক বার আড় চোখে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমার চোখ তখন ছিল মায়ের সামনে বিছানো ছবিটার দিকে। ছবিটা যদি এক স্বপ্নের ভবিষ্যৎ হয়ে থাকে, সেখানে টিবিটা নেই।

আমি আনমনা হয়ে জানলা দিয়ে টিবিটার দিকে তাকিয়ে আছি। জমির মধ্যে দিয়ে খালটা চরাচরে গিয়ে কুয়াশার ঘেরাটোপের মধ্যে মিশেছে। ঠিক সেই জায়গায় ঘোমটার মতো একটা রেলের ব্রিজ। হুইসেল বাজিয়ে মাঝে মাঝে ঝমঝম করে রেল যায়। এককালে নিশ্চয়ই কালো ধোঁয়া উড়িয়ে রেল যেত। আমি অবশ্য দেখিনি। এখন ইলেকট্রিক রেল। তবে আমি কল্পনা করি রাতের অন্ধকারে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনের মাথা দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরোয়। খুদে খুদে রেলের কামরাগুলো থেকে জোনাকির মতো যে ফুটফুটে আলোগুলো জ্বলে থাকে তারা স্বপ্ন বয়ে নিয়ে যায়। আর দেখতে পাই এককালে ওখানে ঘন শালবন ছিল।

তিনবার শাঁখ বেজে উঠল। মা তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে শাঁখ বাজিয়ে সন্দেশ দিচ্ছে। এমন সময় একটা গলার ডাক পেলাম, “সোনাকাকি, সোনাকাকি!”

গলাটা হাবুদার। দক্ষিণ যে জানলাটা দিয়ে জমিটা দেখা যায় ওইদিকে আমাদের উঠোন নয়। পশ্চিম দিকের জানলাটা দিয়ে উঠোনটা দেখা যায়। একটু কৌতূহলী হয়ে জানলার একপাশে নিজেই একাডাল করে দাঁড়ালাম। হাবুদার সঙ্গে সেই ইঞ্জিনিয়ার মেয়েটা এসেছে। আমি জানতাম হাবুদা ঠিক মায়ের কাছে নিয়ে আসবে মেয়েটাকে। তবে আজকেই এই রাত্রি নামার সময়, ভাবিনি।

হাবুদা তুলসীতলার কাছে এগিয়ে গিয়ে মায়ের সঙ্গে নিচু গলায় কথা বলছে। মেয়েটা উঠোনে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আমাদের বাড়িটা দেখছে। সেই একই পোশাক। মাথায় শুধু সাদা হেলমেটটা নেই। গায়ে কালো চকচকে জ্যাকেট। তার হুডিটা মাথার উপর টানা। নিজেকে জানলার একপাশে আরও গুটিয়ে নিলাম। আমাকে যেন দেখতে না পায়। কিন্তু কতক্ষণ? আমার তো এখন মায়ের কাছে যাওয়া উচিত। মেয়েটা মাকে কী বলবে, কী বোঝাবে, কে জানে! শেষমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে নামলাম। হাবুদা আমাকে দেখে বলল, “আয় মনা।”

মায়ের মুখে খানিকটা থতমত ভাব। আমি এগিয়ে আসতেই মা বলল, “শুনেছিস মনা, ওরা কী বলছে?”

এর মধ্যে আবার মাকে কী বলে ফেলল? অবশ্য নতুন কথা কী আর বলবে? সেই তো ইনিয়ে বিনিয়ে জমিটা বিক্রির কথা বলবে। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালাম। আলো-আঁধারিতে হুড়ির ঘোমটায় মেয়েটার মুখে একটু যেন হতভম্ব ভাব। থেকে থেকে আমাদের বাড়িটার দিকে অবাক চোখে তাকচ্ছে।

ভেবেছিলাম সেই পুরনো কথা উঠবে। কিন্তু হাবুদা একেবারে অবাক করে অন্য কথা বলল, “তুই আর সোনাকাকি তো সব ব্যাপারেই ‘না’ বলিস। এটায় আর একদম ‘না’ বলিস না। ম্যাডাম নিজে এসেছেন তোদের বাড়ি।”

“কী জন্য বলবে তো?” গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

“ভাড়া।”

“ভাড়া?” শুনে খুব অবাক হয়ে বললাম।

“আরে বাবা, বুঝলি না নাকি? তোদের দোতলাটায় তো কেউ থাকিস না। প্রোজেক্টের কয়েকটা মাস ম্যাডাম ভাড়া নিয়ে থাকতে চাইছেন, কোম্পানি ভাল ভাড়া দেবে। ভাড়া দিলে বাড়িটা তো আর বিক্রি হয়ে যাচ্ছে না।”

কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাড়িভাড়া দেওয়া আমাদের গ্রামে একেবারে প্রচলিত ছিল না। ছোট বড় পাকা বাড়ি, মাটির দালান – যে যার নিজের মতো থাকত। এই কোম্পানির প্রোজেক্ট আরম্ভ করার পর ইদানীং কিছু কিছু ভাড়ায় থাকার রেওয়াজ হয়েছে। প্রোজেক্টের কাজে আসা বাইরের লোকেরা অনেকে গুসকরায় হোটলে থাকে। কোম্পানির গাড়ি সাইটে পৌঁছে দেয়। আবার কেউ কেউ গ্রামেই দু’-চার জন করে দল বেধে ভাড়ায় থাকে। এটা বাড়তি উপার্জন। তবে আমাদের বাড়িতে ভাড়ায় থাকার প্রস্তাব নিয়ে এর আগে কেউ কখনও আসেনি।

আমাদের বাড়িটা অতি সাধারণ। নীচে একতলায় দুটো ঘর। দুটো ঘরের মধ্যে দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। দোতলাতেও দুটো ঘর। একতলায় দালানের একপাশে মায়ের রান্নাঘর। আর-একপাশে কলঘর। ব্যস। বাবা মাটির বাড়িতে থেকে সারাজীবনে আস্তে আস্তে দোতলা এই ছোট বাড়িটা করে ফেলেছিল, এটাই জীবনের সেরা সাফল্য মনে করত।

“আমরা ভাড়া দিই না,” যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় বললাম।

হাবুদা তবু নাছোড়বান্দা। মাকে বলতে থাকল, “আর কত হাতের লক্ষ্মী পায়ো চেলবে সোনাকাকি? মনাকে বোঝাও। তোমার তো শরীরের এই অবস্থা। বাতের ব্যথায় সিঁড়ি ভাঙতে পারো না। দোতলায় আর থাকে কে? বন্ধই তো পড়ে রয়েছে। দিয়ে দাও গো। তোমাদের ধানও তো কাল রাতে সব গেল।”

আমাদের উঠোনের একপাশে ধানের মরাই। ধান উঠলে ওই মড়াইতে ভর্তি করা হয়। তার পর বিক্রি। এবার মরাইটা আর ভরবে না। মা অসহায় চোখে এক বার খড় ছাওয়া মরাইটার দিকে তাকাল। জানি মড়াইয়ের ভেতরটা এখন প্রায় ফাঁপা। মা এমনিতে শক্ত ধাতের মহিলা। ভেতরে ভেতরে যতই দ্বিধাধন্দ থাকুক, যেভাবে জমি বিক্রিটা আটকাতে এখনও আমার পাশে আছে, আশা করেছিলাম এফুনি দু’জনকে বিদায় করবে। তার জায়গায় মা মড়াইয়ের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল। মেয়েটা সেই অবাক চোখে চেয়ে আছে আমাদের বাড়িটার দিকে। মা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, “কী দেখছ মা?”

“আশ্চর্য! এখানে আসার পর থেকে আমার মনে হচ্ছে আমি আগে কখনও এখানে এসেছিলাম। ওই টিবিটা... এই বাড়িটা...এই ধানের গোলাটা...”

ধানের গোলা মানে মরাইটার কথা বলছে। এই মরাইটা বছদিনের পুরনো। সেই যখন আমাদের মাটির বাড়ি ছিল তখনকার আমলের। দরকার মতো শুধু সংস্কার হয়েছে। কিন্তু মরাইটা একই জায়গায় রয়ে গিয়েছে। আমি মনে মনে হাসলাম। আশ্চর্য অভিনেত্রী। কিছু একটা চক্রান্তের জাল বুনেছে মনের ভেতর।

“তোমার বাড়ি কোথায়?” মা আবার জিজ্ঞেস করল।

“কলকাতায়।”

“আগে কখনও এসেছ এখানে?”

“না, কিন্তু বিশ্বাস করুন, কিছু একটা কানে স্টেড।”

মা ব্যাপারটা কিছু বুঝল না। এক বার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “তোমার নামটা কী মা?”

“ঈশিতা। ঈশিতা মৈত্রী।”

আমি ভাবছি মা এত কথা বলছে কেন? তাও আবার হাবুদার সামনে। বললাম, “আপনারা এবার আসুন।”

ঈশিতা কাতর চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, “প্লিজ কাকিমা!”
মায়ের যে আজ কী হয়েছে। মেয়েটা জাদুটা কবে দিল নাকি? আমাকে ইশারায় থামতে বলে বলল, “সন্ধেবেলায় এলে। একটু বোসো। মনা, দাওয়ায় মাদুরটা বিছিয়ে দে তো।”

আমাদের বাড়িতে আছে কয়েকটা নড়বড়ে মোড়া আর একটা পুরনো মাদুর। আমি এনে দালানে মাদুর বিছিয়ে মোড়া দুটোও রাখলাম। ঈশিতাকে গম্ভীর গলায় বললাম, “জুতো খুলে ওপরে এসে বসুন।”

জুতো খোলার কথাটা না বললেও হত। কথাটা বলার মধ্যে একটা শ্লেষ ছিল। হাবুদা ব্যস্ত হয়ে একটা মোড়া উঠোনে দিয়ে বলল, “এইখানে বসে জুতোটা খুলুন ম্যাডাম।”

ঈশিতা অবশ্য মোড়ায় বসল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই জুতোটা খুলে দালানে উঠে এসে পা বুলিয়ে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসল। মা হাবুদাকে ডেকে নিয়ে ভেতরে রান্নাঘরের দিকে গেল। এই প্রথম সুযোগ পেলাম মেয়েটার সঙ্গে একান্তে কথা বলার।

“আপনার সত্যিকারের কী উদ্দেশ্য বলুন তো?”

“বললাম তো। এখানে ভাড়া খাচ্ছি।”

“কেন, আপনাকে কোম্পানি গুসকরায় হোটেল দেয়নি?”

“দিয়েছে। কিন্তু ওখানে থাকতে পারছি না। ছোট্ট একটা হোটেল। সেই জায়গাটা খিঞ্জি জায়গা। অপরিষ্কার। ক্লস্ট্রোফোবিক লাগছে। তা ছাড়া খাওয়াদাওয়া নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। এখানে তো অনেকে ভাড়া নিয়ে থাকছে।”

“তা আমাদের বাড়িটাই পছন্দ হল? শহুরে শখ। গ্রামের বাড়িতে ক’দিন থাকব। নাকি অন্য কিছু?” ঈশিতার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকলাম।

ঈশিতা একটু উদাস গলায় বলল, “কী জানি। গতকাল হাবুবাবু এখানে দুটো বাড়ি দেখাতে এনেছিলেন। আমি অন্য একটা বাড়ি খুঁজছিলাম। সেটা আর নেই। তার পর আপনাদের এই বাড়িটা দেখে...”

ঈশিতার কথা শেষ হল না। মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। পেছনে পেছনে হাবুদা। হাতে রেকাবি। মায়ের হাতে একটা থালা। থালার উপর কয়েকটা চায়ের কাপ। থালাটা মেয়েটার দিকে এগিয়ে মা বলল, “হাবু বলল তুমি দুধ-চিনি ছাড়া চা খাও। এই নাও। তোরও চা এনেছি মনা।”

চায়ের কাপটা এগিয়ে মা হাবুদার হাত থেকে রেকাবিটা নিয়ে ঈশিতার পাশে রাখল। রেকাবিতে মুড়ি, দুটো ফুলুরি আর গোলাপি রঙের একটা মন্ডা। আমি দেখে ফিক করে হেসে ফেলে বলে ফেললাম, “প্রথম আমাদের বাড়িতে এলেন। খান। অবশ্য যদি আপনার খাওয়ার সমস্যা না হয়।”

মেয়েটা এক বার আমার দিকে তাকাল। তার পর রেকাবি থেকে এক খাবলা মুড়ি নিয়ে ফুলুরি কামড়ে চিবোতে থাকল।

“বাহ কাকিমা! ফুলুরিটা দারুণ।”

“বাড়িতেই ভেজেছি।”

“আচ্ছা কাকিমা, একটা আবদার করব? যদি আপনার কাছে থাকে।”

“কী?”

“কুসুমবীজ।”

মায়ের ভুরুটা একটু কোঁচকাল। তার পরে হেসে উঠে বলল, “ও... কুসুমবীজ। জানো তুমি! আমার তো ধারণা ছিল আজকালকার শহরের ছেলেমেয়েরা জানেই না মুড়ির সঙ্গে কুসুমবীজ খাওয়ার কথা।”

মা ভেতর থেকে হাতের মুঠোয় খানিকটা কুসুমবীজ নিয়ে এসে মুড়ির উপর ছড়িয়ে দিল।

“কুসুমবীজ।” ঈশিতার চোখমুখ কেমন বদলে গেল। মুড়ির থেকে কয়েকটা কুসুমবীজ বার করে খানিকক্ষণ দেখে মুখে ফেলে বলল, “বাহ, দারুণ খেতে তো... কোথায় যেন... ও আচ্ছা, হাবুবাবু কাল ওই টিবিটার পাশে যে কুসুম গাছগুলো দেখেছিলাম, এটা বুঝি সেই গাছেরই বীজ?”

হাবুদা গদগদ গলায় বলল, “ঠিক ধরেছেন ম্যাডাম। এখন অনেক জায়গায় কুসুম ফুলের চাষ হলেও এই গাঁয়ে হয় না। ওইখানে নিজের থেকেই হয়। মনা নিজের হাতে সোনাকাকির জন্য বীজ ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। কুসুম তেলের খুব গুণ ম্যাডাম। সোনাকাকি বলো, অমাবস্যা-পূর্ণিমায় বাতের ব্যাথায় কুসুম তেল তোমার কেমন কাজ দেয়।”

মা বলল, “তা ভালই দেয়। মন্ডাটাও খেয়ে মা। প্রথম দিন এলে, মিষ্টিমুখ কোরো।”

আমি যত মায়ের কথা শুনছি অবাক হচ্ছি। এ যেন আমার অচেনা মা। ঈশিতাকে বললাম, “এখানে ফোনে অর্ডার করলে ভট ভট করে বাইক চালিয়ে বাড়িতে পিৎজা, বাগার্স পৌঁছোয় না। ছানার মিষ্টির দোকানও নেই।”

ঈশিতা আমার দিকে এক বলক তাকিয়ে মাকে বলল, “আপনার ছেলে কি এভাবেই সবার সঙ্গে কথা বলে?”

“আহ মনা!” মা ঈষৎ শাসনের চোখে আমার দিকে তাকাল।

আচমকা ঈশিতা একটা প্রশ্ন করে বসল, “আচ্ছা কাকিমা, তমালিকা ভট্টাচার্য আপনার বাড়িতে থাকতেন?”

মা নামটা শুনে একটু চমকে উঠল, “তুমি কী করে জানলে?”

“সেটা ই তো... এই বিড়তেই তমালিকা ভট্টাচার্যের বাড়ি ছিল। যে বলল সে... এখানে আসার পর অদ্ভুত অনেক কিছু আমাকে টানছে। ওই টিবি... এই বাড়ি... ওই ধানের গোলা...”

ঈশিতা চুপ করে গেল। এই বিষয়ে তোষামোদি উত্তর দেওয়ার জন্য হাবুদার কাছেও কিছু নেই। আমার আশ্চর্য ভাব কাটছে না। মাও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “থাকতেন। বহুকাল আগে। আমিও ওঁকে দেখিনি।”

“তমালিকা ভট্টাচার্যের বাবা ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য ছিলেন এই গ্রামের মোড়ল, তাই না?”

মা খুব অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল।

“ওদের বাড়িটা এখনও আছে?”

মা নিচু গলায় বলল, “না। মাটির বাড়ি। বছরদিন পড়ে গিয়েছে। ওদের বংশের আর কেউ নেই।”

“তাই শুনলাম। বাড়িটা আর নেই। ওই বাড়িটাই সবচেয়ে দরকার ছিল আমার।”

“কিন্তু তুমি এত সব জানলে কী করে?”

“প্রতিদিন সন্ধ্যায় তমালিকাদের বাড়িতে যুদ্ধের গল্পের আসর বসত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন।”

“আঁ?”

“না, কিছু নয়,” একটু ছটফট করে উঠে ঈশিতা বলল, “কী করে বোঝাই আপনাকে কাকিমা? বললেও আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না। কিছু খবর এখানে এসে পেয়েছি। আপনার কাছে কনফার্ম করলাম। তবে আমি ঠিক করে নিলাম কাকিমা।”

“কী?”

“আমি তোমাকে সোনাকাকিমা বলে ডাকব আর আমি তোমাদের দোতলায় থাকব। ব্যস, ফাইনাল। অফিসকে বলব কাল কনট্রাক্টের কাগজপত্র করে তোমাকে দিয়ে সুই করিয়ে নিয়ে যাবে।”

মা তো হতবাক। আমিও। আমতা আমতা করে মা বলল, “সে কী! তুমি তো দোতলাটা দেখেইনি। এখানে থাকার সুবিধে অসুবিধে...”

“আমার সব দেখা আছে কাকিমা। কাল ব্যাগপত্র নিয়ে একেবারে চলে আসব। আজকে আসি। অফিসের গাড়িটা গুসকরা যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। সাইটে ফিরতে হবে।”

মাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরল মেয়েটা। হাবুদা তোষামোদ করার জায়গা ফিরে পেয়ে বলার চেষ্টা করল, “সে না হয় আমি হারানকে বলে দিচ্ছি ম্যাডাম। জিপ গাড়িটা আপনাকে এখানে এসে তুলে নেবে। ততক্ষণ আপনি দোতলাটা এক বার...”

ঈশিতা আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটা তেরচা হেসে বলল, “চলি। কাল দেখা হবে। ব্যাক্স ফর কুসুমবীজ।”

॥ ৫ ॥

বিরশি বছর আগে

বিড়দার মতো ঘটনাবিহীন নিস্তরঙ্গ গ্রামে অপ্রত্যাশিত একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে জুড়ে আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এতদিন

বিশ্বযুদ্ধের খবরাখবর সবাই যেটুকু জানত বা কল্পনায় ছবি আঁকত সবই ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যর মুখে মুখে শুনে। এবার বিশ্বযুদ্ধের কাড়া-নাকাড়া বাজতে চলছে বিড়দার প্রান্তরে। বিশ্বযুদ্ধের ম্যাপে যুক্ত হতে চলছে বিড়দার নাম।

সেদিন চণ্ডীমণ্ডপে গণপতি ঘটক ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যকে বোঝাচ্ছিল, তপীর জন্য এবার খুব ভাল একটা সম্বন্ধ জোগাড় করেছে। কুষ্ঠীতে একেবারে রাজঘোটক। পাত্রের লগ্নের সপ্তমে চন্দ্র তুঙ্গে ইত্যাদি।

ক্ষিতীশ মেয়ের বিয়ে নিয়ে চিন্তিত। একমাত্র সন্তান। তপীর জন্মের পর আর গর্ভবতী হতে পারেননি ভগবতী। বংশে বাতি দেওয়ার মতো কোনও পুত্রসন্তান না থাকার গভীর দুঃখ আছে। এর উপর মেয়েটার বয়স বাড়ছে। যুদ্ধটা আরও ঘনি়ে এলে তখন আর বিয়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি থাকবে কি না জানা নেই। তবে ক্ষিতীশ গণপতির উপরও বিরক্ত। ঘটকটা একের পর-এক সম্বন্ধ আনলেও দু' হাত কিছুতেই চার করতে পারছে না। উল্টে অযৌক্তিক অজুহাত দিচ্ছে, সম্বন্ধ পাকা হলেই কারা যেন ভাংচি দিয়ে দিচ্ছে।

গণপতি ঘটক ইতস্তত করে একটা চিঠি বার করে ক্ষিতীশের হাতে দিয়ে বলল, “এই দেখুন বাবু। কেতুগ্রামে সম্বন্ধটা তো পাকাই হয়ে গিয়েছিল। দেনাপাণ্ডার কথা চলছিল। কিন্তু ওদের বাড়িতে এই চিঠি গিয়েছে।”

ক্ষিতীশ চিঠিটা পড়তে গিয়ে খেপে উঠলেন। চিঠিতে লেখা আছে, মেয়ের মাথার রোগ আছে। রবি ঠাকুরের গান, কবিতা সব মুখস্থ। সেগুলোই সবসময় বিড়বিড় করে বলে। সংসার ধর্মে কোনও মন নেই।

“এটা মাথার রোগ? এক বার পড়লেই মুখস্থ হয়ে যাওয়া আমাদের রক্তের ধারা। আমি কি তাদের যুদ্ধের গল্প কাগজ পড়ে পড়ে শোনাই? কোন মূর্খ এই চিঠি দিয়েছে?”

হলধর গলা খাঁকরে বললেন, “শান্তিনিকেতনে তপীকে অতদিন রাখাই তোমার ভুল হয়ে গিয়েছে খিতিদা। কত কী যে মুখস্থ করে এসেছে। চিঠিটা দাও তো দেখি। হাতের লেখাটা যদি চিনতে পারি।”

হাতে হাতে হাতের লেখা চেনার জন্য চিঠিটা ঘুরছে। কাঁচা হাতে লেখা। কে কেন তপীর বিয়ের ভাংচি দেওয়ার চেষ্টা করছে এই সব নিয়ে কথাবার্তার সময়ই আচমকা এক সঙ্গে হাজির পুলিশ আর মিলিটারির গাড়ি। আসল কাজ ছিল মিলিটারিদের। পুলিশ শুধু গ্রাম চেনাতে এসেছিল। মিলিটারিরা অবশ্য গ্রাম চিনতে খুব একটা আগ্রহী নয়। তারা যে কাজটা করতে চায় সেটা যত দ্রুত সম্ভব করে ফেলতে চায়। তার জন্য গ্রামবাসীকে যা যা সাহায্য করতে হবে, তা যেন করা হয়, এই বার্তাটুকু বয়ে এনেছিল। এটা কোনও অনুরোধ নয়, ইংরেজ সরকারের হুকুম।

মিলিটারিরা যা করতে চলেছে সে সম্পর্কে বিন্দুবিসর্গ কোনও ধারণা বিড়দাবাসীর না থাকলেও ব্যাপারটা নিয়ে এখন আর উদ্বেজনার শেষ নেই। সেই সঙ্গে অবশ্য আছে অজানা আতঙ্কও। ওই যে গ্রামের এক প্রান্তে শালবন আর বোপ জঙ্গল আছে, মিলিটারিরা একদিনের মধ্যে শালবনের একধারে ক্যাম্প ফেলে বেড়া দিয়ে দিয়েছে। বেড়া ঘেরা জায়গায় কয়েকটা তাঁবু। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় তাঁবুটায় কলকাতা থেকে এসে পৌঁছেছে এক সার্ভেয়ারবাবু। শালবনের মধ্যে ঢুকে দলবল নিয়ে তিন ঠ্যাংওয়ালা যন্ত্রপাতি নিয়ে কী সব মাপজোক করে। ফোটো তোলে। জায়গাটায় কঠোর ভাবে প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু অতি উৎসাহী গ্রামবাসীদের কেউ কেউ গিয়ে লুকিয়ে উকিরুকি মেরে তাদের কর্মকাণ্ড দেখে এসেছে। দেখতে পেলে মিলিটারিরা হ্যাট হ্যাট করে তড়িয়ে দেয়। কখনও বন্দুক উচিয়ে তাক করে ভয় দেখায়। এসব যখন গ্রামেই হচ্ছে তখন ক্ষিতীশ চণ্ডীমণ্ডপে বা বাড়িতে সান্ন্যাকালীন আসরে যতই বাসি খবরের কাগজ থেকে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের হালহকিকতের বিবরণ দেন, শ্রোতাদের এখন সে সব পানসে লাগে।

হলধর সেদিন সান্ন্য আসরে বললেন, “আমার মন কিন্তু কু ডাকছে খিতিদা। চার্চিল ব্যাটা কিন্তু যুদ্ধটা এবার এইখানে কেন্দ্র করে করবে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে এরকম দেখা গিয়েছে।”

হলধর কথায় কথায় মহাভারতের উদাহরণ টানেন। কিন্তু জানতে চাইলে ঘটনার বিবরণ দিতে পারেন না। বলরাম বললেন, “মহাভারতের

কথা ছাড়ে। ওখানে চার্চিল আবার কোথায় ছিল? বলো, কেন তোমার এমন মনে হচ্ছে?”

হলধর লম্বা শ্বাস নিয়ে বললেন, “দেখো বাপু, আমি সোজা অন্ধ করেছি। চার্চিল ব্যাটা সবে এক বছর হল প্রধানমন্ত্রী হয়েছে। খিতিদার কথা শুনে লোকটা যে যুদ্ধবাজ, বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু নিজের লন্ডন দেশটাকে নষ্ট করতে দেবে কেন? তার চেয়ে এই বিড়দায় করুক। জাপানিরা এখানে এসে আকাশ থেকে বোম ফেলে সব উড়িয়ে দিক। নেটিভরা মরলে কী এসে যায়, সাহেব-মেমরা তো বাঁচল। কী বলেন খিতিদা? ওই যে জাপানিরা মার্কিনদের দ্বীপে বোমা ফেলে সব উড়িয়ে দিল, কী যেন নামটা বলেছিলেন?”

“পার্ল হারবার,” গম্ভীর গলায় বললেন ক্ষিতীশ। আগে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা, গতি প্রকৃতি, হালহকিকত একাই দিতেন। এখন সবাই মতামত দিতে আরম্ভ করেছে।

হলধর মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ, দেখে মিলিয়ে নেবেন, এই বিড়দা হতে চলেছে আর-এক পার্ল হারবার।”

ক্ষিতীশ কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে থাকলেন। এই মুখের দল ভাল করে কিছু বোঝার চেষ্টা করে না।

তমালিকাও দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব আলোচনা শুনতে শুনতে আনমনা হয়ে পড়ে। তমালিকা বিশ্বাস করে বিশ্বকবির মৃত্যু গোটা পৃথিবীর কাছে মহাশুষ্ক পতন। এটা মহাশুষ্ক পতনের বছর চলেছে। যোরতম দুঃসময়। চিন্তা আরও আছে। সেদিন যখন মিলিটারিরা গ্রামে এসেছিল, সেই যে সমুদ্র ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল তার পর থেকে তার আর কোনও খোঁজ নেই। সেইও কিছু বলতে পারছে না। সমুদ্র কি বিপ্লবীদের দলবল এনে ‘বন্দেমাতরম’ বলে মিলিটারিদের আক্রমণ করবে? সমুদ্রের কাছে পিস্তল আছে। ভাবলেই বুকটা কঁপে ওঠে।

তমালিকা দু'দিন ধরে বাবার ঘড়িটা নিয়ে একটা হিসেব করেছে। বোলপুরে থেকে গুসকরা হয়ে রেল ইঞ্জিনটা হুইসেল বাজিয়ে বড় সাঁকো পেরোয় পৌনে চারটের কাছাকাছি। সেই সময় কি অনুশীলন করতে সমুদ্র লুকিয়ে আসে? যদি এক বার শালবনের ভেতরে যাওয়া যেত! তবে একা যাওয়া যাবে না। এক জন সঙ্গী দরকার। আর সেই ছাড়া কে সেই সঙ্গী হতে পারে?

কথাটা শুনেই জ্যোৎস্না ভয়ে আঁতকে উঠেছিল, “না না সই! ওখানে কিছুতেই যাওয়া যাবে না। শুনেছি মিলিটারিরা বড় বড় করে ‘শালবনে প্রবেশ নিষেধ’ লিখে রেখেছে।”

“সই, তুই এত ভয় পাচ্ছিস কেন? আমরা শুধু যাব আর আসব। কেউ কেউ তো গিয়েছে। মিলিটারিরা দেখতে পেলে শুধু তড়িয়ে দেয়। গুলি করে প্রাণে মেরে দেয় না তো!”

চিন্তিত গলায় জ্যোৎস্না প্রশ্ন করেছিল, “কেন যেতে চাইছিস তুই?” একটু চুপ করে থেকে তমালিকা বলেছিল, “সমুদ্র তো তোর ছোট দেওর। তোর চিন্তা হয় না?”

জ্যোৎস্নার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল, “বুঝেছি, ছোট ঠাকুরপোর জন্য যত চিন্তা শুধু তোর। সারাজীবনের জন্য এই চিন্তাটা নিবি তো? আমার তো খুব ইচ্ছে। আমি ছোট ঠাকুরপোকে বলেওছি। বেশ হবে দুই সই জাও হয়ে যাব। তার পর কী হয়েছে জানিস?”

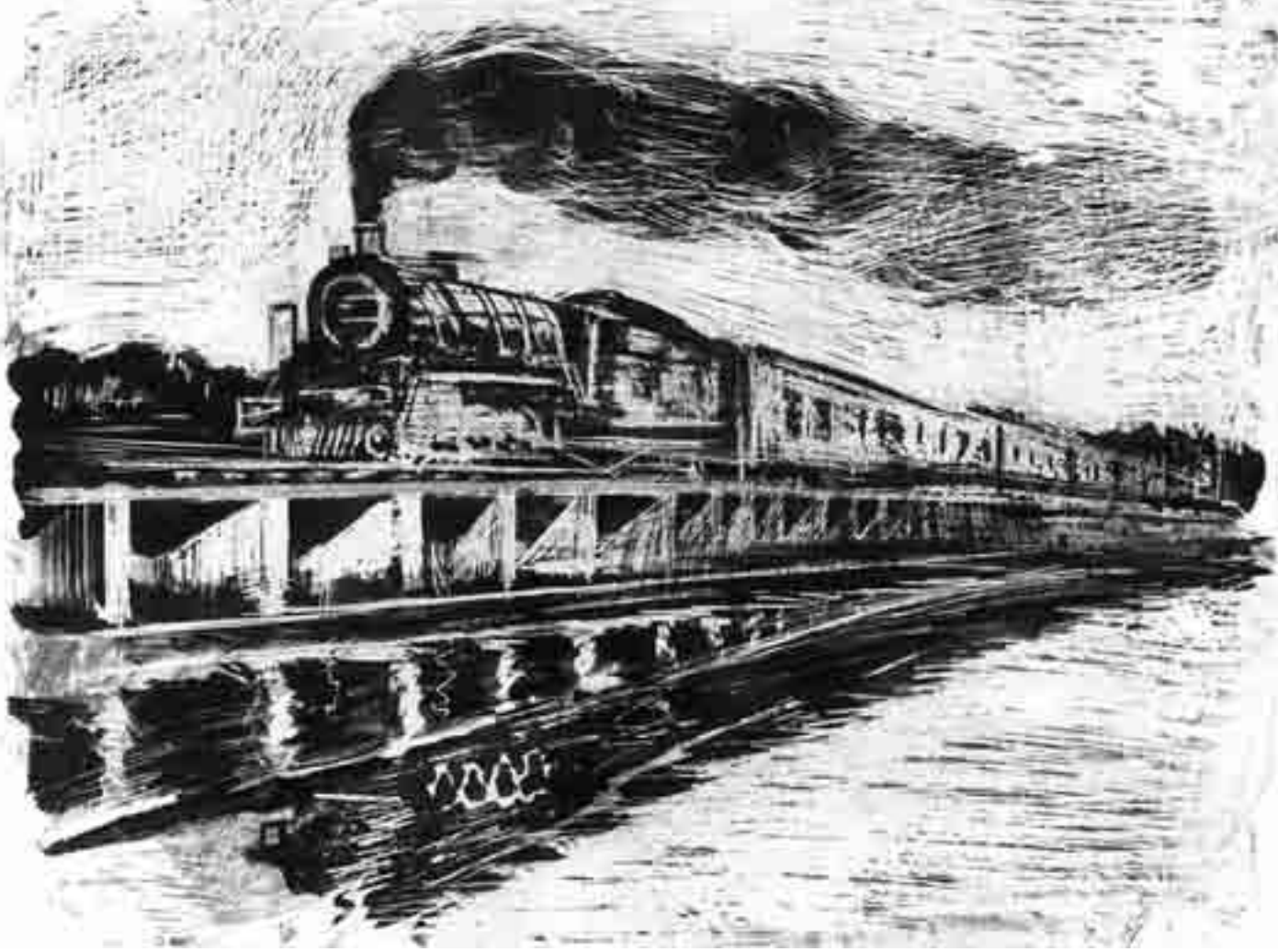
তমালিকা লজ্জা পেয়ে বলে উঠেছিল, “যাহ, তোর যত বাজে কথা। সমুদ্রার সঙ্গে আমার একটা অন্য খুব দরকারি কাজ আছে।”

“কী কাজ শুন?”

“একটা বই... ও তুই বুঝবি না। তোকে সইয়ের দিব্যি দিচ্ছি, এক বারটি চল আজ।”

সইয়ের দিব্যি! এর পর আর কিছু বলা চলে না। জ্যোৎস্নাকে নিমরাজি হতেই হয়েছিল।

দুপুর গড়াতেই জ্যোৎস্না তমালিকার বাড়িতে চলে এসেছে। বাড়িতে শাশুড়িকে বলে এসেছে, সইয়ের বাড়ি যাচ্ছি। মেজাজ ভাল থাকলে শাশুড়ি এ ব্যাপারে কোনও আপত্তি করেন না। ভাগ্য ভাল আজ শাশুড়ির মেজাজ ভাল ছিল। তবে চিন্তা অন্য। যদি মিলিটারিরা ধরে নেয় বা অন্য কেউ দেখে ফেলে তখন কী হবে।



তমালিকা অবশ্য একটা বুদ্ধি বের করেছে। খবর নিয়েছে সার্ভেয়ারবাবু শালবনের পূর্ব দিকে মাপামাপির কাজ করছেন। ওরা যাবে পশ্চিম দিকে। ওদিকটায় কেউ যায় না। ওদিকে টিবিটার পেছনে কিছু কুসুম গাছের ঝাড় আছে। ধরা পড়লে বলবে কুসুমবীজের জন্য ফুল তুলতে গিয়েছিল। সবাই জানে তমালিকা কুসুমবীজ খেতে কী রকম ভালবাসে।

দ্রুত পায়ে দুই সই শালবনের দিকে এগোতে থাকল। তমালিকা জানে কোন পথ দিয়ে শালবনের পশ্চিম দিকে গেলে কেউ দেখতে পাবে না। পথে যেতে যেতে জ্যোৎস্না জিঙ্গেস করল, “হ্যাঁ রে সই, তোর ইচ্ছের কথা জেঠাইমা জানেন?”

“উফ, তোকে বলছি না, তুই যা ভাবছিস তা নয়। সমুদার সঙ্গে আমার সতিই খুব দরকার।”

“ওই বইয়ের কথা বলবি তো? কী বই শুনি? নিশ্চয়ই রবি ঠাকুরের কোনও বই।”

“ঠিক ধরেছিস। রবি ঠাকুরের শেষ কবিতাগুলো নিয়ে যে বইটা বেরিয়েছে সেটা সমুদার কাছে আছে।”

জ্যোৎস্না আবার হাসতে থাকল, “ছোট ঠাকুরপোর কাছে রবি ঠাকুরের বই! বইটা তোর মন পাওয়ার জন্যই কিনেছে। তুই জানিস কিনা জানি না। ছোট ঠাকুরপো কিন্তু রবি ঠাকুরকে দু’চোখে দেখতে পারে না। মরুকগে যাক। যাকে দেখতে পারে তার কথাই ভাবি। ওই গণপতি ঘটককে দিয়ে তোর কপালে বর জটবে না। এ আমি হলফ করে বলে দিলাম। শাশুড়িকে বলে ঘটকালিটা আমাকেই করতে হবে দেখছি।”

কথা বলতে বলতে দু’জনে পৌঁছে গেল শালবনের পশ্চিম দিকে। এক বার চারদিক দেখে নিল। নাহ, কেউ কোথাও নেই। এ দিকে

শালবনটা ঘন। বিকেল হতে চলেছে। শালবনের ভেতরটা অন্ধকার অন্ধকার। তাতে অবশ্য সুবিধেই হয়েছে। দিব্যি লুকিয়ে লুকিয়ে আরও ভেতর দিকে যাওয়া যাবে। শীতের ঝরা শুকনো শালপাতা মাড়িয়ে যথা সম্ভব আওয়াজ না করে আরও ভেতর দিকে এগোতে থাকল দু’জনে। আর একটুখানি। শাল গাছের ফাঁক দিয়ে বড় সাঁকোটা দেখা যাচ্ছে। তার পেছনে সূর্যটা তেজ হারিয়ে ক্রমশ গেরুয়া ধারণ করছে। বহু দূর থেকে রেল ইঞ্জিনের ক্ষীণ একটা আওয়াজ শোনা গেল আর সেই সঙ্গে উদাত্ত একটা গলা—

“বৃথা বাক্য থাক। তব দেহলিতে শুনি ঘণ্টা বাজে,
শেষপ্রহরের ঘণ্টা; সেই সঙ্গে ক্লান্ত বক্ষোমাবো
শুনি বিদায়ের দ্বার খুলিবার শব্দ সে অদূরে
ধ্বনিতোছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পূরবীর সুরে।”

জ্যোৎস্না খামচে ধরল তমালিকার বাজুটা। উত্তেজনায় এতক্ষণ খেয়ালই করেনি, আর একটু বাঁ দিকে যে টিবিটা রয়েছে তার উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা মানুষ। না, সই এই শালবনে যে ছোট ঠাকুরপোকে খুঁজতে এসেছে, এই মানুষটা সে নয়।

তমালিকা মস্তমুগ্ধের মতো এগোতে থাকল টিবিটার দিকে। মানুষটা এখনও ওদের উপস্থিতি টের পায়নি। ওদের দিকে পেছন ফিরে চেয়ে আছে ওই কমলা সূর্য আর রেললাইনের দিকে। রেল ইঞ্জিনটা ধোঁয়া উড়িয়ে এগিয়ে আসছে দেখা যাচ্ছে।

“সই, চল পালাই,” চাপা গলায় বলল জ্যোৎস্না।

তমালিকার যেন ঝঁশ নেই। কে এই মানুষ যে অমন ভরাট গলায় গুরুদেবের কবিতা আবৃত্তি করতে পারে?

রেলগাড়িটা হুইসেল বাজিয়ে বড় সাঁকোটা পেরিয়ে যেতেই মানুষটা

ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখে ফেলল দু'জনকে। ঢাল থেকে নেমে এসে মসমস করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। লোকটাকে সামনে দেখে জ্যোৎস্না ভয়ে কঁপে উঠল। খাকি পোশাক। পায়ে কালো গামবুট। হাতে একটা শোলার টুপি। কোমরে বুক চামড়ার বেল্ট। বেশ তেজোদ্দীপ্ত পুরুষ। লোকটা পুলিশ না মিলিটারি? সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, “কারা আপনারা?”

তমালিকার গলায় কথা সরছে না। অপলক দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকিয়ে আছে। অগত্যা মাথার ফোমটাটা আর একটু টেনে নামিয়ে মিনমিনে গলায় কোনও রকমে জ্যোৎস্না বলল, “আমরা এই গাঁয়েই থাকি। কুসুম ফুল তুলতে এসেছিলাম। অপরাধ হয়ে গিয়েছে। আর কোনও দিন আসব না।”

“কুসুম ফুল?”

“ওই... ওই ওইখানে ঝাড় আছে। আর আসব না। চল সই।”

“দাঁড়ান,” লোকটা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, “আপনাদের নাম?”

গলা পুরো শুকিয়ে গিয়েছে জ্যোৎস্নার। চোঁক গিলতেও যেন পারছে না। এ তো মহা বিপদ! লোকটা নামধাম সব জেনে নিচ্ছে। এর পর কী যে আছে কপালে। জ্যোৎস্না জড়সড় হয়ে কোনও রকমে নিজের নাম বলতে যাচ্ছিল তার আগেই তমালিকা ভাবুক গলায় বলে উঠল, “সেঁজুতি।”

জ্যোৎস্না কঁপে উঠল। সই নাম লুকোচ্ছে নাকি? এফুনি তো ধরা পড়ে যাবে। লোকটার মুখে অবশ্য মুদু হাসি খেলে গেল, “জানেন দেখছি। তা হলে রবীন্দ্রনাথ পড়েন?”

তমালিকা ঘাড় নাড়ল। লোকটা বলল, “কী যেন বললেন? কুসুম ফুল। যান। নিয়ে আসুন।”

“না, দরকার নেই,” জ্যোৎস্না আবার তমালিকার হাত ধরে টান দিল।

লোকটা এবার নিজের পরিচয় দিল, “আমি শুদ্ধশীল গুহ। এখানকার সার্ভেয়ার। কাল থেকে ঠিকাদাররা এই দিকের শালবন কাটতে আরম্ভ করতে পারে। আপনাদের কুসুম গাছও হয়তো আর থাকবে না। যা নেওয়ার নিয়ে যান।”

॥ ৬ ॥

আজ কোনও কারণে সাইটে পাইলিংয়ের কাজ বন্ধ আছে। দুম দুম শব্দটা নেই। চারদিকটায় তাই সেই পুরনো নিবুম। ঝিঁঝিঁদের আজ কেউ বিরক্ত করছে না। তারা আপন মনে ডেকে চলেছে। কারেন্ট চলে গিয়েছে। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। সন্দের দিকে এক বার কারেন্ট চলে গেলে তিন-চার ঘণ্টার আগে আসে না। তাতে আমার কোনও অসুবিধে হয় না। দিব্যি লাগে। মা একটু গজগজ করে। রাত্রিবেলায় রান্নাবান্না সেয়ে টিভিতে পরপর কয়েকটা সিরিয়াল দেখাই মায়ের একমাত্র নেশা, বিলাসিতা। কারেন্ট চলে গেলে সিরিয়াল দেখতে পারে না, এইটুকুই শুধু জীবনে আক্ষেপ।

দাওয়ায় একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। মা আমার সামনে ভাতের থালা নামিয়ে হ্যারিকেনের আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে বলল, “কী হয়েছে রে তোর?”

আমি জানতাম কথাটা কখনও না কখনও শুরু হবেই। হয় মা শুরু করবে না হয় আমি। ধৈর্যের পরীক্ষায় আমিই জিতলাম। আমার চুপ করে থাকাটাই আমার উত্তর।

“তাকে একটা কথা বলতে পারিনি...”

একটাই মাত্র পাঁচমেশালি তরকারি। বাটিটা ভাতের উপর উপড় করে বললাম, “জানি কী বলবে। মেয়েটা কিন্তু বেশ। পান পাতার মতো মুখ। কী যেন বলে, পটল চেঁচা চোখ। চেরি ফলের মতো ঠোঁট। তোমার বৌমা হলে বেশ হবে বলো? কিন্তু মুশকিল যে একটাই। তোমার ছেলে কাঠ বেকার আর মেয়েটা ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ার মানে কি জানো তো?”

মা আহত গলায় বলল, “এরকম করে বলছিস কেন?”

আমার ভেতরে তখন রাগ গরগর করছে। বললাম, “তোমার নারায়ণের এবার কী হবে মা? ভাড়াটে রাখছ। মুরগি ঢুকবে তো এবার।” মায়ের মুখটা থমথম করে উঠল। আমি মা দু'জনেই নিরামিষাশী।

বাবা মারা যাওয়ার পর মা বৈধব্য পালনের জন্য আমিষ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মাকে অনেক বুঝিয়েও রাজি করাতে পারিনি। বাবা ছিল কমিউনিস্ট। এসব কিছুই মানত না। সেসব যুক্তিও কাজে লাগেনি। মাকে এতটা কড়া গলায় না বললেও হত। আমি জানি এর পর মায়ের চোখটা চিকচিক করে উঠবে। মা অন্য দিকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। গ্রাসটা মুখে তুলে খুব বিশ্বাস লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মা অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করল, “ভেগান মানে কী রে?”

ভেগান! শব্দটা কোথাও যেন শুনেছি। মনে পড়ছে না। মোবাইলে গুগল খুলে দেখতে হবে। দমবন্ধ পরিবেশে মা মাঝে মাঝে এমন এমন প্রশ্ন করে, গনগনে রাগের অভিমুখ ঘুরে যায়।

“জিজ্ঞেস করছ কেন?”

“কল্পনাদিকে বলেছিলাম। কল্পনাদি বলেছিল মেয়েটা নিরামিষ খায়। আমাকে যাওয়ার আগে বলে গেল ভেগান।”

মেয়েটা কাল চলে যাওয়ার আগে যখন মায়ের সঙ্গে কথা বলছিল তখন আমি তেজ দেখিয়ে ভেতরে চলে এসেছিলাম। তাই শেষ কথাগুলো শোনা হয়নি। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর মা যে নামটা করল, কল্পনাজেটি।

“তুমি কল্পনাজেটির কাছে গিয়েছিলে? কখন? বলোনি তো। মেয়েটাকে কল্পনাজেটি পাঠিয়েছে?”

“সেটাই তো বলতে যাচ্ছিলাম তোকে। আজোবাজে কথা বলে বলতেই দিলি না।”

“বলো।”

“যা বলল, আমার তো পেটের মধ্যে গুড়গুড় করছে। যার জোরে তোর টিবিটা বাঁচাতে চাইছি, সেটাই বোধ হয় আর থাকবে না।”

“মানে?”

“পরশু ওরা ধান নষ্ট করে দিয়েছে। এবার পুরো জমিটাই যাবে।”

এই চাষের জমিটুকুই আমাদের একমাত্র সম্বল। উর্বর জমি। তিন মরসুম ফসল দেয়। সেই আয়েই আমাদের মায়ে-ছেলের সংসার চলে। বাবা সরকারি করণিক ছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর মায়ের হাফ পেনশন আর ফসল বিক্রির টাকায় কোনও রকমে চলে যায়। তবে এই নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই।

“মানে? কী বলেছে কল্পনাজেটি?”

মা একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে বলল, “এতদিনে বুঝলাম এই অজ জায়গায় কেন হোটেল তৈরি হচ্ছে। জানিস, সরকার মস্ত হাইওয়ে তৈরি করবে। টোল নেওয়া হাইওয়ে। কলকাতা থেকে বোলপুর। সেই রাস্তা তৈরির জন্য সরকার জমি অধিগ্রহণ করবে। তার মধ্যে আমাদের জমিটা পড়েছে। ওটা চলে গেলে আমাদের আর থাকবেটা কী? আমার পরে তোর বাবার হাফ পেনশনটাও তো থাকবে না। তা ছাড়া নিতুর দিকটাও দেখতে হবে। ওরও সংসার চলে এই ভাগ চাষে। ওর চলবে কী করে?”

হেসে উঠলাম, “তোমাকে যে যা পারে বুঝিয়ে দেয় মা। এটা কত নম্বর গল্প? আস্ত একটা দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে আছে, বর্ধমান থেকে গুসকরা হয়ে বোলপুর যাওয়ার রাস্তা আছে, আবার একটা হাইওয়ে? বুঝতে পারছ না, তোমাকে ভয় দেখিয়েছে। এটা একটা নতুন গল্প।”

“না রে। সত্যদাও ছিল। সত্যদাও বলল।”

সত্যদা মানে সত্যানন্দ ভট্টাচার্য। কল্পনাজেটির স্বামী। সত্যানন্দ নাম না হয়ে মিথ্যানন্দ হওয়া উচিত ছিল। সত্যজ্যেই আমাদের পঞ্চায়েত প্রধান ছিলেন। এখন এটা মহিলা সংরক্ষণের আওতায় চলে আসায় কল্পনাজেটিকে প্রধান করে বকলমে নিজেই রাজত্ব চালান। মা এটা কিছুতেই বুঝতে চায় না। এক সময় বাবা আর সত্যজ্যেই খুব ভাল বন্ধু ছিল। তার উপর লতায় পাতায় ততো ভাই।

“তুমি এখনও সত্যকাকাকে বিশ্বাস করো? পরশু রাতে যা হয়েছে তার পরেও? ওরা ট্রাক্টর চালিয়ে ধান নষ্ট করেছে, চুরি করেছে। জমিতে ট্রাক্টরের চাকার দাগ আছে। সারা রাত ধরে ট্রাক্টর চালিয়ে তাণ্ডব করে চুরি করল, বলতে চাও কেউ জানে না? কই, আর কারও জমিতে তো এটা হয়নি। বেছে বেছে আমাদেরটাতেই হল?”

“এটায় কিন্তু সত্যদার কোনও হাত নেই। খুব দুঃখ করছে আমার

কাছে। বলেছে, যারা ধান চুরি করেছে তাদের বের করবেই। জানতে পেরেছে যারা এসেছিল সব বাইরের লোক। মুখে গামছা জড়ানো ছিল। আমাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবে। নিতুর দিকটাও দেখবে বলেছে। এটা তো অস্বীকার করতে পারবি না, আপদে বিপদে ওরই পাশে দাঁড়ায়? সত্যি যদি জমি চলে যায়, তোর ভবিষ্যৎ কী হবে?”

“মা, বোঝার চেষ্টা করো। ওরা তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে। এক সিঙ্গুরে চাষের জমি অধিগ্রহণ করে বাবাদের চৌকিষ বছরের সরকার উল্টে গেল। এর পরে আবার চাষের জমি অধিগ্রহণ? তুমি বিশ্বাস করে এলে? আর তার সঙ্গে মেয়েটাকে ভাড়া দেওয়ার কী সম্পর্ক?”

“সতুদা আর কল্লনাদি বোঝাল। বলল, একটা একলা মেয়ে তো। নিরামিষ খায়। ভাড়া তো, বিক্রি নয়। তাও পাকাপাকি নয়। মেয়েটা যতদিন এখানে থাকবে...”

“তার মানে তুমি জানতে। আচ্ছা মা, তোমার এক বারও মনে হল না যে এটা একটা চক্রান্ত হতে পারে?”

“জানিস তো, মেয়েটার না খুব কষ্টের জীবন। অল্প বয়সে বাবা-মা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছে। ওর বাবার এক বন্ধু ওকে মানুষ করেছে। এতে চক্রান্তের কথা কী বলছিস?”

“অদ্ভুত যুক্তি তোমার মা। বাপ-মা মরা মেয়ে শুনে গলে জল হয়ে গেলো। বাড়িতে আমি আছি, একটা জোয়ান মরদ ছেলে, কাল যদি মেয়েটা মিথ্যে আমার নামে কোনও অপবাদ জুড়ে দেয়?”

“একেকবারে ভাবিনি তা নয়। মেয়েটা কিন্তু সত্যিই এখানকার অনেক কিছু জানে। বিশেষ করে পুরনো দিনের কথা। মাঝে মাঝে এমন গড়গড় করে বলে দিচ্ছে, আমিও জানি না। সন্দেহ হয়। জানিস, তোর ঠাকুরদার বাবার নাম বলরাম ভট্টাচার্য, সেটা পর্যন্ত বলে দিল। কেন পূর্বপুরুষের নাম দিয়ে চক্রান্ত করবে বল? মেয়েটা তো এখানে অন্য কাজে এসেছে। মেয়েটার চোখ দুটো দেখার পর...”

“এই অন্য কাজটা যে কী, সেটাই চিন্তার মা। তা কী দেখলে ওর পটল চেরা চোখে?”

“সে তুই যাই বল। ভারী ঢলাঢলে মুখ। ঠিক যেন... আচ্ছা, মেয়েটা হঠাৎ তপীঠাকুরমার ভাল নামটা জানল কী করে বল তো?”

“ঠিক যেমন করে বলরাম ভট্টাচার্যর নামটা জানে। জ্যোৎস্না ঠাকুরমার নামটা জানে। ফ্রড। এরা কোন দিকে কী খোঁজ নিয়ে কোন ধান্দায় আসে, কল্লনাও করতে পারবে না।”

অবিশ্বাসী গলায় মা বলল, “যাহ! তপীঠাকুরমার খবর দিয়ে আর কী করবে?”

“তুমি দিবি একটা মিথ্যে বললে। তপীঠাকুরমাকে তুমি দেখোনি?”

“বিয়ের পরে মাত্র একক মাস দেখেছি। তপীঠাকুরমার তখন অনেক বয়স। তার ওপর মাথার ওই অবস্থা। তখন ঘো এই পাকা দালানটা ছিল না। মাটির একচালি বাড়ি। উত্তর দিকের ঘরে তপীঠাকুরমা থাকত। দরজায় বাইরে থেকে শিকল তোলা থাকত।”

মা নতুন কথা কিছু বলছে না। পুরনো স্মৃতিচারণা করছে। এসব আমার জানা। তপীঠাকুরমা পাগল হয়ে গিয়েছিল। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর তপীঠাকুরমার আর কেউ ছিল না। তপীঠাকুরমা ছিল আমার বাবার ঠাকুরমার সই। ঠাকুরমাই তপীঠাকুরমাকে নিজের কাছে এনে রেখেছিল।

“তুমি বললে না তো, বললে কেন তপীঠাকুরমাকে তুমি দ্যাখোনি?”

“আহ! দেখেছি বললেই হয়তো আরও কথা বাড়ত। গুরুজনদের কেছা মুখে আনতে নেই।”

“ও কেছা! তাই না? ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে আজকালকার দিনে ওটা কেছা বললে বেড়ালেও হাসবে। তা, কী ঠিক করেছে, দোতলাটার পুরোটাই ভাড়া দেবে?”

“না, একটাই ঘর দেব। ঘরটা খালি করতে বাকি জিনিসগুলো অন্য ঘরে রাখতে হবে তো।”

“বাতের ব্যথায় বহুকাল তো দোতলায় যাওনি। খেয়াল আছে কি বাবার পড়ার ঘরের দেওয়ালে তপীঠাকুরমার যৌবনের একটা ফোটো টাঙানো আছে?”

মা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলল, “মেয়েটার চোখটা অনেকটা...”

মায়ের কথাটা আমি শেষ করে দিলাম, “অনেকটা তপীঠাকুরমার মতো। আচ্ছা, তপীঠাকুরমা কুসুমবীজ খেতে ভালবাসত? আমার টিবিটার কাছে যেত?”

মায়ের চোখ বলমল করে উঠল, “টিবিটার কাছে যেতেন কিনা জানি না। তবে কুসুমবীজ খেতে খুব ভালবাসতেন। মুঠো মুঠো খেতে চাইতেন। বেশি কুসুমবীজ খেলে আবার পেট গরম হয় বলে...”

শেষ গ্রাসটা খেয়ে ভাতের থালাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম, “যাক মা। সব অঙ্ক মিলে গেল।”

“কিসের অঙ্ক?”

“ওই ইঞ্জিনিয়ার মেয়েটা... ঈশিতা না কী যেন নাম... নির্ঘাত তপীঠাকুরমার পুনর্জন্ম। দেখলে এসে থেকে কেমন ‘এই জায়গাটা আগে দেখেছি, আগে দেখেছি’ বলে হাবভাব করছিল। তপীঠাকুরমাদের বাড়িটা তো আর নেই, তাই যে বাড়িতে মারা গিয়েছিল সেই বাড়িটাকেই ভর করেছে। তোমাকেও তোমার না দেখা কালের কথা, নাম-টাম কেমন গড়গড় করে বলে দিচ্ছে বললে। আর তুমিও বিশ্বাস করছ। এক্কেবারে পুনর্জন্ম। ক্রমশ আরও প্রকাশ হবে। পরে বাকিটা মিলিয়ে নিয়ো।”

১১ ৭ ১১

বিরশি বছর আগে

চণ্ডীমণ্ডপে ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য দলবল নিয়ে বসে সেই যুদ্ধের গল্প শোনাচ্ছিলেন। ঘরের দ্বারের মিলিটারি ক্যাম্প হওয়ার পরও সেখানকার কার্যকলাপের ব্যাপারে গ্রামের মোড়ল হয়েও ক্ষিতীশের কাছে কোনও খবর নেই বলে অজানা দেশগুলোর গল্প শুনতে শুনতে উচ্চবর্ণের শ্রোতার মাঝে মাঝে অধৈর্য হয়ে পড়েন। ক্ষিতীশ আগ্রাণ বোঝানোর চেষ্টা করেন, বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধ ক্রমশ জটিল আকার ধারণ করছে। গতিবিধি দেখে মনে হচ্ছে হিটলারই পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে যাবে কিছুদিনের মধ্যে। ইংরেজ আর মার্কিনরা যেন এঁটে উঠতে পারছে না। তবে তারাও সমানে উক্কর দিয়ে যাচ্ছে। এখন কত নতুন নতুন ছোট বড় দেশের নাম শোনা যাচ্ছে। বিশেষ করে ইউরোপে। এই দেশের পতন হচ্ছে তো অন্য দেশ কেউ দখল করে নিচ্ছে। অবশ্য জটিলতা যত বাড়ছে আর গ্রামের লোকের বিশ্ব পরিস্থিতি নিয়ে অনাগ্রহ যত বাড়ছে, ততই যুদ্ধের গল্প বলার তাল হারিয়ে ফেলছেন ক্ষিতীশ।

এই সময়ে সমুটা যে কোথায় পালিয়ে গেল! ছেলেটা থাকলে ওই গ্লোবখানায় অচেনা দেশগুলো দেখিয়ে গুরুত্বটা আরও বোঝানো যেত। ক্ষিতীশ রোজই এক বার করে বলরামের কাছে খোঁজ লেন সমুর। আজও জিজ্ঞেস করলেন, “ছেলেটার কোনও খবর পেলি?”

বলরাম জানেন ম্যাট্রিকুলেশন পাস দিয়েও সমু বিপ্লবী হতে চায়। বাড়িতে সবসময় সশস্ত্র সংগ্রাম করে বিপ্লবের কথা বলে। বন্দেমাতরম বলে। তবে ব্যাপারটা বাইরে কিছুতেই জানাজানি হতে দিতে চান না বলরাম। সমুর মায়ের ছোট ছেলের জন্য সব সময় বুক কাঁপে। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করাটাই কাল হয়েছে। মাঝে মাঝেই এখানে সেখানে কোথায় যে মিটিং আছে বলে চলে যায় কিছু বলে না। এবার একটু বেশি দিনের জন্যই গিয়েছে। সত্যিই কোনও খবর নেই। এদিকে গ্রামের গোড়ায় মিলিটারি ক্যাম্প। বলরাম ভয়ে ভয়ে আছেন, সমুর কথা এক বার যদি মিলিটারিরা জানতে পারে, গ্রামে ফিরলেই নির্ঘাত ওকে ধরে নিয়ে যাবে।

সমুর মা অবশ্য ইদানীং অন্য একটা কথা বলছে। যদি সমুকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করে মাথা থেকে দেশ স্বাধীন করার বিপ্লবের ভূতটা নামানো যায়। ছেলেটার যেন ওই সূর্য সেন, বিনয় বসু, বাদল বসু, দীনেশ গুপ্তর মতো পরিণতি না হয়। ক’দিন ধরে তপীর নামটাও বলছে সমুর মা। কথাটা এখনও ক্ষিতীশের কাছে পাড়তে পারেননি বলরাম।

ক্ষিতীশ আবার জিজ্ঞেস করলেন, “হ্যাঁ রে, বলছি সমুর কোনও খবর পেলি?”

সম্বিত ফিরে পেয়ে বলরাম বললেন, “না খিতিদা। ও তো একটু আপনভোলা। হয়তো এ দিক ও দিক মামার বাড়ি, পিসির বাড়ি কোথাও গিয়েছে। চলে আসবে।”

“সে যাক। তবে বলে যাবে তো!”

বিয়ের সম্বন্ধের কথাটা এই চণ্ডীমণ্ডপে বলা যাবে না। খিতিদার বাড়ি যেতে হবে। সমুর মাকেও নিয়ে যেতে হবে। তপীর সঙ্গে সেজো বৌমার খুব ভাব। সেই পাতিয়েছে ওরা। খিতিদা আর বৌঠাকরুন হয়তো রাজি হয়ে যাবে। একমাত্র মেয়ে। সে বিয়ের পর এই গাঁয়ে থাকবে। তবে একটা সমস্যা আছে। দু’জনেই সমগোত্রীয় ভট্টাচার্য। তারও একটা উপায় অবশ্য আছে। কন্যাকে মাতুলালয়ের কাউকে দিয়ে সম্প্রদান করতে হবে। এসবও বিস্তারিত আলোচনা আছে। গলাটা একটু খাঁকরে পরিষ্কার করে বলরাম বললেন, “সমুর মাকে নিয়ে আজ এক বার তোমার বাড়ি যাব ভাবছিলাম খিতিদা।”

ক্ষিতীশ শুনে একটু অবাক হলেন। এখানে গ্রামে কেউ এভাবে বলে কয়ে কারও বাড়িতে আসে না। যখন ইচ্ছে চলে আসে। তবে আজই বলরাম আসতে চাইছে? এক খিলি পান মুখে পুরে সুগন্ধ ছড়িয়ে ক্ষিতীশ উৎসাহী গলায় বলে উঠলেন, “ভালই হবে তোরা এলে। ভাতারের দিক থেকে আজ তপীকে সম্বন্ধ দেখতে এক ঘরকে গণপতি নিয়ে আসবে। তুই ম্যাট্রিকুলেশন পাস ছেলের বাপ। গাঁয়ের মান। তুই থাকলে আমাদেরও মানটা বাড়ে।”

হলধর বলে উঠলেন, “এ তো খুব ভাল কথা। হ্যাঁ, মেয়েটারও তো বয়স হচ্ছে। এই বয়সে তো বিয়েথা হয়ে ছেলপুলে হয়ে যাওয়া উচিত। কেন যে ওকে শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠিয়ে শুধু শুধু বয়সটা বাড়ালেন। বিয়েটা এত দেরি করে ভাবলেন।”

“এক কথাই বারবার বলিস। চেষ্টা তো করছি। গণপতিও...” বিয়ের ভাণ্ডির অগ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা আর না করে ক্ষিতীশ বললেন, “মেয়েটারও স্বশুরবাড়ি পছন্দ হওয়া দরকার।”

“মেয়েছেলের আবার রাজি পছন্দ হওয়া-হয়ির কী আছে? বাপ যেখানে ঠিক করে দেবে, সেখানেই বিয়ে হয়ে যাবে। তাই জনাই বারবার না বলে থাকতে পারি না, ওই রবি ঠাকুরের আশ্রমে মেয়েটাকে লেখাপড়া শেখাতে পাঠানো উচিত হয়নি। তা কাল যারা দেখতে আসছে তারা পাল্টি ঘর তো? অবস্থা কী রকম?”

“গণপতি ঘটক তো কোণ্ঠি মিলিয়ে সম্বন্ধটা এনেছে। ভাল বর্ষিষ্ণু পরিবার। অনেক জমিজমা আছে, একটা তেলকলও আছে। তিন ছেলে, দুই মেয়ে। মেয়ে দু’টির ভাল পরিবারে বিয়ে হয়েছে। এটি মেজোর জন্য। এমনিতেই তো আমাদের গাঁ নিয়ে লোকের এখন অনেক দ্বন্দ্ব। বলরাম তুই থাকলে একটু বুঝিয়ে বলতে পারবি। তোর সেজো বৌমাকেও বলিস আসতে। তপীকে একটু সাজগোজ করিয়ে দেবো।”

হলধর বললেন, “বেশ আমিও না হয় আসব।”

বলরামের মুখটা ছোট হয়ে গেল। সমুর কথাটা খিতিদার কাছে পাড়তে দেরি হয়ে গেল। এখন যদি যারা সম্বন্ধ দেখতে আসছে, তাদের পছন্দ হয়ে যায়... ভাবতে ভাবতে বলরাম আনমনা হয়ে পড়লেন। আর সেটা ভাঙল আশপাশে সবাইকে নড়েচড়ে উঠে দেখতে।

চণ্ডীমণ্ডপ থেকে রাস্তাটা সোজা গ্রামের বাইরের দিকে গিয়েছে। সেই রাস্তা ধরে হেঁটে আসছে খাকি পোশাক পরা এক জন। পেছন থেকে তার মাথায় ছাতা ধরে আছে একটা লোক। কে যেন বলে উঠল, “মিলিটারিদের সার্ভেয়ারবাবু।”

সার্ভেয়ারবাবু ক্ষিতীশ বিস্মিত হলেন। কিন্তু যাকে এগিয়ে আসতে দেখছেন সে নিতান্তই এক যুবক। তা হোক। সরকারি আধিকারিক। ওরা তো নিজের মতো শালবনের মধ্যে কাজ করে। খবর পেয়েছেন ঠিকাদাররা এখন পূব দিক থেকে ঝোপ-জঙ্গল-শালবন কাটিতে আরম্ভ করেছে। বড় বড় সেই গাছ কাটা হয়ে গেলে গাড়ি করে কোথায় চলে যায় জানা নেই। তবে এই ঠিকাদারদের কাজটা মাথায় একটা ভাবনার জন্ম দিয়েছে।

যুদ্ধের খবরের সঙ্গে আর-একটা খবরও খুব চোখ টানে ক্ষিতীশের। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো এই যুদ্ধতেও অনেকে ঠিকাদারি করে লক্ষপতি

হয়ে যাচ্ছে। এই গল্পটা অবশ্য কারও কাছে করেন না। তবে ঠিকাদারির কাজ পাওয়ার একটা সুযোগ দোরগোড়ায়। ওদের জন্য না হয় গাঁয়ের মরদ বাগদি-বাউড়িগুলোকে দিয়েই শালবনটা কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু সেকথা বলার সুযোগই পাচ্ছেন না।

ওরা কিন্তু কেউ এর আগে গ্রামের দিকে এক বারও আসেনি। ক্ষিতীশের ভুরুটা কুঁচকে উঠল। একই সঙ্গে বৃকের ভেতরটা দুলে উঠল। ও দিকে সমুর কথা ভেবে বলরাম আরও কুঁকড়ে উঠলেন। হলধর যথারীতি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

সার্ভেয়ারবাবু ক্ষিতীশের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, “আপনি গ্রাম মোড়ল শ্রী ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য মহাশয়?”

ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে মাথা ঝুকিয়ে বললেন, “আজ্ঞে হজুর।”

“আমি শুদ্ধশীল গুহ,” হাতজোড় করে শুদ্ধশীল বলল, “এখানে সার্ভের কাজ আমিই করছি। আপনাদের গ্রামে কোনও দিন আসা হয়নি। আজকে ইচ্ছে হল একটু ঘুরে দেখি।”

“নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই,” ক্ষিতীশ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। এই চণ্ডীতলায় বসতেই বা কোথায় দেবেন, আপ্যায়নই বা কী ভাবে করবেন। তার পরেই মাথায় এল, ঈশ্বর করুণাময়। তপীকে আজ দেখতে আসবে বলে গুসকরা থেকে ফল মিষ্টি আনিয়েছেন। বাড়িতে একখানা চেয়ারও আছে।

“হজুর, আগে একটু অধমের বাটিতে পায়ের ধুলো দিন। তার পর আপনাকে পুরো গ্রাম ঘুরিয়ে দেখাব।”

“বেশ,” শুদ্ধশীল আপত্তি করল না। মুখে একটা মৃদু হাসি ফুটল।

ক্ষিতীশ হলধরকে তাড়া দিয়ে উঠলেন, “যা, যা... খবরটা দে।”

হলধর ধুতি সামলে ছুটলেন ক্ষিতীশের বাড়ির দিকে।

“হজুরের এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?”

“আপনি আমাকে এভাবে হজুর হজুর বলবেন না। আমি বঙ্গসন্তান। মিলিটারিদের কাজ করতে এসেছি। আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ। আমার নাম ধরে নিঃসঙ্কোচে সম্বোধন করতে পারেন।”

ক্ষিতীশ কী বলবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। হাঁটতে হাঁটতে শুদ্ধশীল হঠাৎ অদ্ভুত একটা প্রশ্ন করল, “আপনাদের গ্রামে রবীন্দ্রচর্চা হয় বুঝি?”

ক্ষিতীশ প্রথমে প্রশ্নটার অর্থ বুঝতে পারলেন না। বললেন, “আজ্ঞে?”

“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, গল্প, কবিতা নিয়ে চর্চা?”

“ও তাই বলুন। বোলপুর শান্তিনিকেতন তো এখান থেকে খুব দূরে নয়। যদিও ওটা বীরভূমে পড়ে, তবে কাছেই তো। গরুর গাড়ি করে ধরুন না গুসকরা ইসটিশন যেতে এক ঘণ্টা। তার পরে রেলগাড়িতে কয়েকটা মাত্র ইসটিশন। আমার এক ভাই আছে বিশ্বভারতীতে। করণিক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওকে খুব স্নেহ করতেন। আমার মেয়েকেও তো ভাই কিছুদিন পড়িয়েছিল ওখানে। যেতে চান ওখানে? আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আমার ভাই সব যত্ন করে ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবে আপনাকে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখন তো আর নেই।”

“আসলে গ্রাম দেখার সঙ্গে আমি কিছু বইও খুঁজছিলাম। গ্রামে আর কোনও পাঠাগার তো আশা করা যায় না। যদি কারও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থাকে। বইপত্রের কিছু আনা তো হয়নি। কাজ শেষ হয়ে গেলে সন্দের পরে পড়ার কিছু পাই না।”

ক্ষিতীশের চোখ চকচক করে উঠল, “পাবেন, পাবেন। আমার বাড়িতে অনেক বই আছে। বঙ্কিমবাবু, শরৎবাবু, রবীবাবু— সবার বই পাবেন। আমার মেয়ের কাছে সব আছে। তা ছাড়া অনেক খবরের কাগজ পত্রিকা আসে আমার কাছে। দু’চারদিনের পুরনো। সব পাঠিয়ে দেব আপনার কাছে।”

আজ বর্ধমান গিয়েছিলাম। বাবা বর্ধমানে কাজ করত। ওখানকার একটা ব্যাল্কে অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। বাবার করে যাওয়া আর একটাই

ফিল্ড ডিপোজিট অবশিষ্ট রয়েছে। এবার সেটা ভাঙতে হবে। আসলে টাকাটা আমার যত না দরকার তার চেয়ে বেশি দরকার নিতুকার। ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর নিতুকা একদম ভেঙে পড়েছে। আমি দেখেছি যতই এখন বিজ্ঞাপনের প্রচার হোক, ব্যাঙ্কের কাজ পাঁচ মিনিটে হয়ে যায়, আমার ক্ষেত্রে হয় না। আজকেও হল না। আবার আর-একদিন আসতে হবে। নতুন করে আবার কেওয়াইসি জমা দিতে হবে। মায়ের ফোটো, সেই চাই।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে গেল। মায়ের ঘরে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ল দুটো সুটকেস আর একটা ব্যাগ দেওয়ালের একপাশে দাঁড় করানো আছে। বুঝতে অসুবিধে হল না ওগুলো কার। আমার মুখ দেখে মা বলল, “সকালে এসে হাবু রেখে গিয়েছে। মেয়েটা আপিস করে আসবে। হাত-মুখ ধুয়ে আয় বাবা। ভাত বাড়ছি। অনেক বেলা হয়ে গেল।”

মনটা একেবারে তেতো হয়ে গেল। কোথাও কি হেরে যাচ্ছি? মিথ্যে বললাম, “বর্ধমান খেয়ে এসেছি।”

মা নিজে থেকেই বলতে আরম্ভ করল, “একটাই তো ঘর চেয়েছে। আমার ওপরের ঘরটাই দিয়েছি। হাবু লোক দিয়ে পরিষ্কার করিয়েছে। খাট আর টেবিল-চেয়ার রেখে বাকি সব পাশের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে।”

“কোন ঘরটা দিলে?”

“বললাম যে, আমার ওপরের ঘরটা।”

“তুমি দোতলায় গিয়েছিলে? এর পর হাটুর ব্যথা নিয়ে আর একটাও কথা বলতে এসো না।”

মা একটু চুপ করে থেকে বলল, “রাগ করিস না বাবা। এক বার তো যেতে হয়েছিল।”

“ওই ঘরটা বাবার পড়ার ঘর ছিল। বইয়ের আলমারিটা কী করলে?”

“পাশের ঘরে সরিয়ে দিয়েছে। তোর বাবার কোনও জিনিস নেই। তপীঠাকুরমার ফোটোটা পর্যন্ত হাবুকে বলে পাশের ঘরে করিয়ে দিয়েছি।”

দোতলায় আমি উঠিই না প্রায়। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে দোতলাটা আর আমাকে টানে না। মায়ের জন্যও একতলাতেই থাকি। পাশাপাশি ঘর। ঘরদুটোর মধ্যস্থান দিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। তবু আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না যে বাবা শখ করে, অনেক কষ্ট করে যে দোতলাটা করেছিল, ভাড়া খাকার নাম করে অচেনা একটা মেয়ে ওখানে এসে বাবার পড়ার ঘরটা দখল করে থাকবে, সে মা যতই বাবার জিনিসপত্তর পাশের ঘরে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুক না কেন। কাঁধের কাপড়ের ব্যাগটা নামিয়ে রেখে চটি গলালাম।

“এখন আবার কোথায় যাচ্ছিস?” মা জানতে চাইল।

“রোজ যেখানে যাই।”

হন হন করে হাটতে আরম্ভ করলাম। সূর্যটা ঢলে পড়তে আরম্ভ করেছে। ঠিক সময়ে আমাকে টিবিটায় পৌঁছোতেই হবে। কিন্তু টিবির কাছাকাছি পৌঁছোতেই দেখতে পেলাম টিবির উপর দিশিতা রয়েছে। ঠিক আমার মতোই সূর্যর দিকে মুখ করে বসে রয়েছে। পরনে সেই ঘন নীল জামা, জিনসের প্যান্ট, কালো গামবুট আর সাদা হেলমেট। আমি পেছন থেকে টিবির মাথায় পৌঁছে গলাটা অল্প খাঁকরাললাম। দিশিতা আমার দিকে চেয়ে বলল, “এসে গিয়েছ?”

একেবারে ‘তুমি’ সম্বোধন! অবশ্য খেয়াল করেছি প্রথম আলাপের দিনেই কয়েকবার মাকে ‘আপনি’ বলার পর ‘তুমি... তুমি’ করে কথা বলছিল। আপন হতে চাইছে। আমার হঠাৎ বাবার কথা মনে হল। বাবা সবাইকে ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করত। কিন্তু কেউ সেই ‘আপনি’টা ‘তুমি’তে নামিয়ে আনলে বাবা মুহূর্তের মধ্যে তাকে পাল্টা ‘তুমি’ বলত। সে থানার দারোগা থেকে বড় সরকারি অফিসার যেই হোক না কেন। দু’ হাত কোমরে রেখে বললাম, “এখানে কেন এসেছ?”

“কেন এখানে আসতে নেই নাকি? যদিও এই জমিটা তোমার, কিন্তু কোনও নো এন্ট্রি বোর্ড তো লাগিয়ে রাখোনি।”

আমি চুপ করে বিরক্ত চোখে ওর দিকে চেয়ে রইলাম। সূর্য ডুবতে আর বেশি বাকি নেই। আর এই সময়টা আমার নিজস্ব। দিশিতা একটু

সরে গিয়ে জায়গা করে বলল, “বোসো না।”

কোনও সন্দেহ নেই, মেয়েটা গায়ে পড়ে বস্তুত্ব করতে চাইছে। এটা একটা ফাঁদ। মা যে কেন কিছুতেই বুঝল না। আমি দাঁড়িয়েই থাকলাম।

“হাবুদা বলছিল তুমি রোজ সূর্যাস্তের সময়ে এখানে আসো। সূর্যাস্তের দৃশ্যটা কিন্তু বেশ ভাল। তবে এই টিবিটা চুম্বকের মতো টানে আমাকে। কত যে গল্প লুকিয়ে আছে। রোজ তো সূর্যাস্ত দেখতে আসো। কোনও দিন কান পেতে গল্পগুলো জানার চেষ্টা করেছ?”

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, “গল্প?”

“কবিতাও আছে। ‘ধ্বনিতোছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা পুরবীর সুরে...’

আমি এখানে এলেই কানের মধ্যে এরকম নানা শব্দ বাজে। তুমি শুনতে পাও? আচ্ছা, টিবিটার নীচে ওই দিকে যে ঝোপটা রয়েছে, লাল কমলা ফুল, ওগুলোই কুসুম গাছ, তাই না?”

ও ভাল করেই জানে ওগুলো কুসুম গাছ। নিজেই আগের দিন বলেছিল। কী বলেছিল এখন নিজেই ভুলে গিয়েছে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে অনুমান করার চেষ্টা করলাম মেয়েটা কোন দিকে আমাকে গড়াতে চাইছে।

“দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? বোসো না। আমাকে বন্ধুরা নাম ছোট করে ঈশা বলে ডাকে। তুমিও আমাকে ঈশা বলে ডাকতে পারো।”

ঠিক এই সময়েই সূর্যটা আজকের মতো চরাচরে ডুব দেওয়ার প্রস্তুতি নিল। এবার শুধু আমার অনুমতির অপেক্ষা। আমি হাত মুড়ে বুড়ো আঙুল দেখালাম। আর সূর্যটা টুপ করে ডুবে গেল।

দিশিতা আমার দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হেসে বলল, “বাবাঃ! স্মার্ট তো। যেই ঈশা বলে ডাকতে বললাম ওমনি ‘ডান’ বলে থামস আপ দেখালো।”

“এবার নামো,” গভীর গলায় বললাম।

“হাতটা ধরো তো একটু,” ঈশা হাতটা বাড়াল। আমি পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে নিলাম।

“তোমার অ্যারোগেস্টা একটু অসভ্য টাইপের। পা-টা স্লিপ করে যাচ্ছে বলে হাতটা ধরতে বলছি।”

ঈশা... না এই নামটাই মনে এল, ছোট দু’ অক্ষরের নাম, হাতটা আবার বাড়াল, “নাও ধরো।”

অগত্যা পকেট থেকে হাতটা বের করতেই হল। সামান্য টান দিয়ে ওকে দাঁড় করলাম।

“থ্যাঙ্ক ইউ।”

“তুমি হঠাৎ তপীঠাকুরমা... মানে তমালিকা ভট্টাচার্যর কথা মাকে জিজ্ঞেস করলে কেন?”

“বেচারি তমালিকা। পড়তে পারল না শান্তিনিকেতনে। বাবা শান্তিনিকেতন থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এল বিয়ে দেবে বলে। গণপতি ঘটক যত সম্বন্ধ আনে, সব কে যেন ভেঙে দেয়। বেচারিকে এক জনই আশ্রয় দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার শেষ জীবন...” গভীর একটা শ্বাস ছাড়ল ঈশা।

গণপতি ঘটক? এই নাম আমি জীবনে শুনিনি। মেয়েটা কী সব বলছে, একবর্ণ মাথায় ঢুকছে না। আমার রগের উপর আঙুলটা রেখে ওকে দেখিয়ে বললাম, “তোমার কি এইখানটা ঢিলে?”

ছোট্ট একটা শ্বাস নিয়ে ঈশা বলল, “সোনাকাকিমা খুব সরল। মিথ্যে বলতে পারেন না। সোনাকাকিমা আসলে তমালিকা ভট্টাচার্যকে দেখেছেন, তাই না?”

“আমি জানি তুমি কী অভিনয় করার চেষ্টা করছ। নিজেকে কী প্রমাণ করতে চাইছ।”

“কী বলো তো? আমারও খুব জানতে ইচ্ছে করে।”

একটু চুপ করে থেকে বললাম, “সোনার কেপ্পা পড়েছ বা সিনেমাটা দেখেছ? মুকুল?”

একটু চিন্তা করে ঈশা হেসে উঠল, “ওহ মুকুল! শুধু সোনার কেপ্পা কেন? ‘মহল’, ‘মধুমতী’, ‘ওম শান্তি ওম’ থেকে ‘রাবতা’... কত বলব? সব দেখেছি। পুনর্জন্ম, জাতিস্মর এইসব বলছ তো? হতেও পারে। না হলে এখানটা এত চেনা চেনা লাগছে কেন? তোমাদের বাড়িটা, তোমাদের

গ্রামটা, এই শালবন... এই টিবি। কেন মনে হচ্ছে তমালিকা ভট্টাচার্য...”

“তুমি যদি তমালিকা ভট্টাচার্যের পুনর্জন্ম হও এবং সেই সঙ্গে জাতিস্মরণও, তা হলে আমাদের বাড়িটা...” বাকি কথাগুলো বলতে গিয়েও গিলে নিলাম। তপীঠাকুরমা আমাদের যে বাড়িতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিল সেটা মাটির একতলা বাড়ি ছিল। তপীঠাকুরমা আমাদের এখনকার দোতলা বাড়িটা দেখেইনি। একমাত্র যোগসূত্র আছে ধানের মরাইটা। দেখা যাক ওর অভিনয়ের দৌড় কতটা। তার পর বোঝা যাবে আসল উদ্দেশ্য।

সূর্য ডোবার পর আলো ঝুপ ঝুপ করে কমে আসছে। ঈশা বলল, “চলো, এবার নামা যাক। সাইট অফিসে ফেরার আগে তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল।”

টিবির উপর থেকে দু’জনে নেমে এলাম। ঈশা বলতে থাকল, “আমাকে যে ঘরটায় সোনাকাকিমা থাকতে দিয়েছে সেটা বারো বাই যোলো। যথেষ্ট বড় ঘর। মাপটা বলে দিচ্ছি বলে আবার পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে কোরো না। হাবুদাকে ফিতে দিয়ে সকালে মাপিয়েছি। ঘরটার ফোটো হোয়াটসঅপে পাঠিয়েছে।”

অবাক হয়ে বললাম, “হাবুদা দু’ দিনে এত স্মার্ট হয়ে গেল নাকি? হোয়াটসঅপে ফোটো তুলে পাঠাতে শিখে গিয়েছে?”

ঈশা হেসে উঠল, “আরে না, না। ওর তো স্মার্টফোনই নেই। সঙ্গে সাইটের আর-এক জন ছিল। সে পাঠিয়েছে। যাক গে, তবে সমস্যা একটাই। ঘরটায় একটা মাত্র থ্রি পিন পাওয়ার সকেট। আমার কিন্তু গোটা চারেক সকেট লাগবে। মোবাইলের চার্জারেই তো একটা লাগবে। তা ছাড়া আরও কিছু গ্যাজেট আসবে।”

“কী গ্যাজেটস জানতে পারি কি?”

“নিশ্চয়ই। বাড়িওয়ালাকে বলতে হবে তো পারমিশনের জন্য। ভয় নেই, এসি লাগাব না। এই ধরো একটা ছোট ফ্রিজ, ইন্ডাকশন হিটার, টি-মেকার এই সব। এক্সটেনশন বোর্ড দিলে লোড নিতে পারবে না। সাইটের ইলেক্ট্রিশিয়ানকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেব। একটা পনেরো অ্যাম্পিয়ার বাকি পাঁচ অ্যাম্পিয়ার হলেই হবে। আর্থিং চেক করতে হবে। খরচ আমিই দেব। আশা করি আপত্তি করবে না।”

“এখানে মাঝে মাঝেই কারেন্ট চলে যায়। টানা চার-পাঁচ ঘণ্টা থাকে না। কালবৈশাখী ঝড় জলে তো কখনও দু’-তিন দিন কারেন্ট থাকে না।”

“এখন তো শীতকাল। বর্ষা আসতে ঢের দেরি। ততদিনে আমার কাজ হয়ে গিয়ে ফিরে যাব।”

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, “বর্ষার আগে এই ইকো ভিলেজ পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাবে?”

“না, না। তিরিশ মাসের প্রোজেক্ট। সব তো আড়াই মাস হয়েছে। আমি বলছি, আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। চলি। আজকের কাজ একটু বাকি আছে। শেষ করে তোমাদের বাড়িতে যাচ্ছি। ও হ্যাঁ, সোনাকাকিমাকে বলে দিয়ে আমার রাতের খাওয়ার চিন্তা না করতে। যতদিন না তোমাদের বাড়িতে সেটল হচ্ছি, হাবুদা আমার খাবার তৈরি করে আনার দায়িত্ব নিয়েছে। তবে সাইট থেকে ফিরে সোনাকাকিমা যদি কুসুমবীজ দেওয়া এক বাটি মুড়ি আর চা দেয়, ‘না’ বলব না।”

ঈশা ওদের সাইট অফিসের দিকে পা বাড়াল। আমি আলটা ধরলাম। আজকে এই দিকটায় মাটি খোঁড়াখুঁড়ি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। এখন থেকে দু’ বেলা কড়া নজর রাখতে হবে, আমার জমিতে যদি একটাও কোদালের কোপ পড়েছে, তুলকালাম করব। এসব ভাবলেই আমার ভেতরে একটা ঝগড়ার মহড়া চলে। রক্ত ফুটতে থাকে। কিন্তু আজ যেন মনটা কেমন বিক্ষিপ্ত। নিপুণ তাসুড়ের মতো ঈশা একটার পর একটা তাস খেলে যাচ্ছে। নিজেকে ক্রমশ রহস্যময়ী করে তুলছে। আর আমি?

“ঈশা,” গলা ছেড়ে ডাকলাম। ঈশা দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার দিকে ফিরল। এবার দু’জনের দু’জনের দিকে এগিয়ে আসার কথা। এই ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে আমার বেশ লাগে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। ঈশা এগিয়ে এল, “বলো।”

“তোমার বয়স কত?”

“মেয়েদের বয়স জিজ্ঞেস করা অভদ্রতা নয় কি? অবশ্য তুমি এগুলো কৈয়ার করো না বলেই মনে হয়।”

“তমালিকা ভট্টাচার্য মারা গিয়েছেন ১৯৮১ সালে। এটা ২০২৩। তোমার বয়স বিয়াল্লিশ অন্তত নয়।”

“ও আচ্ছা। পুনর্জন্মের থিয়োরি ভুল প্রমাণ করতে চাইছ? শোনো, আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস করা হয় আত্মা অবিনশ্বর। মানে এখানে যখন তমালিকা ভট্টাচার্য মারা গেলেন তক্ষুনি কোনও এক নার্সিং হোমের লেবার রুমে টুপ করে সেই আত্মাটা নিয়ে একটা বাচ্চার জন্ম হয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদতে লাগল। তাই তো?”

“ঠিক। জাতিস্মরণটা তবুটা তাই ঠিক জমবে না। চেষ্টা কোরো না।”

ঈশা আমার বুকে একটা টোকা মেরে বলল, “কে বলল তোমাকে জাতিস্মরণের ঠিক ইমিডিয়েটলি আগের জন্মেরই স্মৃতি থাকবে? আত্মা যদি অবিনশ্বর হয় তা হলে জন্ম-মৃত্যু, জন্ম-মৃত্যু এই সাইকেল চলতেই থাকবে যতদিন না সে মুক্তি পাবে। আগের জন্মে না হোক তার আগের জন্মে আমি তমালিকা ভট্টাচার্য হতেও পারি আবার অন্য কেউও হতে পারি। সময়ই হয়তো সেটা বলতে পারবে।”

॥ ৯ ॥

বিরশি বছর আগে

বাড়িতে শুদ্ধশীল গৃহকে এনে ঘরের মধ্যেই বসাতে চেয়েছিলেন ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য। মাটির দেওয়াল। ঘরের ভেতরটা ঠান্ডা। তবে শুদ্ধশীল চাইল বাইরে দাওয়াতেই বসতে। সেখানেই নিজের চেয়ারখানা দিয়ে বসতে দিয়েছেন ক্ষিতীশ। হলধর, বলরামরা সঙ্গে এসেছিল। তাদের ক্ষিতীশ কায়দা করে চলে যেতে বলেছেন। মনের মধ্যে ঠিকাদারি করে বড়লোক হওয়ার যে সুপ্ত বাসনা আছে সেটা বাস্তবায়িত করার জন্যই হয়তো ধর্ম ঠাকুর এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গ সবার সামনে বলা যাবে না। অন্তঃপুরে বৌ-মেয়েকে বলেছেন সার্ভেয়ারবাবুর আদর-আপ্যায়নের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করতে। তার প্রথম পর্বে শুদ্ধশীলকে দেওয়া হয়েছে শ্বেত পাথরের গ্লাসে লেবুর শরবত।

রান্নাঘরে ফল কাটতে মায়ের সঙ্গে ব্যস্ত তপী। তবে মনের এক অদ্ভুত অবস্থা। এক দিকে বৃকের মধ্যে একটা ধুকপুকানি চলছে। সার্ভেয়ারবাবু সেদিন ওদের শালবনের মধ্যে দেখে ফেলেছিল। সেই নালিশ বাবার কাছে করতে আসেনি তো? আর-এক দিকে নিজেদের বাড়ির দালানে এই সুদর্শন যুবকের উপস্থিতির ভাললাগাটাকেও অস্বীকার করতে পারছে না। কী যেন এক সম্মোহন আছে মানুষটার আবৃত্তিতে।

শরবতের গ্লাসে চুমুক দিয়ে শুদ্ধশীল বলল, “তা, যুদ্ধের আর গতিপ্রকৃতি কী বুঝছেন?”

ক্ষিতীশ ঈষৎ লজ্জিত হলেন। উনি যে যুদ্ধের গল্প বলেন এই খবর তা হলে মিলিটারি ক্যাম্প পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। এরা কি জানে উনি সবসময় বলেন, হিটলারই আর ক’দিন পরে পৃথিবীর একচ্ছত্র সশ্রাব্য হয়ে যাবে? ইংরেজরা মুছে যাবে। সার্ভেয়ারবাবু ইংরেজ সরকারের লোক। হাত কচলে বললেন, “আমি আর কতটুকু খবর পাই? তবে যা শুনছি হিটলার আর মুসোলিনি মিলে ভয়ঙ্কর তাণ্ডব শুরু করেছে। কিন্তু এখন যখন ইংরেজ আর মার্কিনিরা হাতে হাত মিলিয়েছে, এই যুদ্ধ জিতেই ছাড়বে।”

“আর জাপানিরা?”

ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যর স্মৃতিশক্তি প্রখর। সেইটুকু সম্বল করে বললেন, “ঠিক বলেছেন হুজুর। হংকং দ্বীপটাকে তো দখল করে নিল। তার পর মালয়, ফিলিপাইনও দখল করার মুখে।”

“মানে বিপদটা বুঝতে পারছেন? ইংরেজ আর মালয়দের সম্মিলিত সেনাবাহিনীকে পুরো পর্যদুস্ত করে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হয়ে ক্রমশ বর্মা হয়ে ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছে। পূর্ব দিক থেকে ভারতবর্ষকে আক্রমণ করা মানে ঢাকা, যশোর, খুলনা হয়ে কলকাতার দিকে আসা। জানেন কি, গতকাল জাপানিরা জোহোর প্রণালী অতিক্রম করে সিঙ্গাপুরে ঢুকে গিয়েছে?”

এত টাটকা খবর ক্ষিতীশের কাছে নেই। ফল কেটে শ্বেতপাথরের রেকাবিতে সাজাতে সাজাতে তমালিকাও কান খাড়া করে রয়েছে। ইস, বড্ড সমুদার গ্লোবটার কথা মনে হচ্ছে। সিঙ্গাপুর কোথায়, জোহোর প্রণালী, কোথায় গ্লোবটা থাকলে বুঝে নেওয়া যেত।

“আপনি মিলিটারিদের খাস মানুষ। অত খবর কি আর আমরা রাখতে পারি?”

“তা অবশ্য ঠিক। আসলে কী জানেন? জাপানিদের দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় আগ্রাসন যত দ্রুত হচ্ছে, ইংরেজ আর মার্কিন সরকারের কপালে তত ভাঁজ পড়ছে।”

“যা, ফল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?” তমালিকা মায়ের কাছে তাড়া খেল। তার পর ফলের থালাটা হাতে নিয়ে দাওয়ায় এল।

“আমার কন্যা। ভাগ্যের বিভ্রমনা বুঝেছেন। এই একটিই সন্তান।”

শুদ্ধশীল আলতো হাতে তমালিকাকে নমস্কার করে বলল, “এত ফল এনেছেন?”

শুদ্ধশীল বুঝতে দিল না, পরিচয়টা আগেই হয়েছে। অল্প নিশ্চিত হয়ে তমালিকা ফলের রেকাবিটা একটা মোড়ার উপর নামিয়ে হাতজোড় করে নমস্কার করল। ক্ষিতীশ তোষামোদি গলায় বললেন, “এত আর কোথায়, সামান্য। আজ যখন আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে তখন অন্নগ্রহণ করে যেতে হবে।”

“না, না আমি তো এসেছিলাম বইয়ের সন্ধান।”

ক্ষিতীশ ভুলেই গিয়েছিলেন। এবার ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, “ও হ্যাঁ মা তপী। রবিবাবু, শরৎবাবুর বইগুলো সব নিয়ে আয় তো।”

এই প্রথম তমালিকার বিরক্ত লাগল। বই কি আর একটা-দুটো? কত কষ্টে সংগ্রহ করা প্রাণাধিক এক-একটা বই! বাবা এসব কি কিছুই বোঝে না? তমালিকার মুখে বিরক্তির ভাবটা দৃষ্টি এড়াল না শুদ্ধশীলের। অল্প তির্যক হেসে বলল, “ভয় পাচ্ছেন?”

কথাটা যে শুদ্ধশীল তমালিকাকে বলল সেটা খেয়ালই করলেন না ক্ষিতীশ। বলে উঠলেন, “না, ভয় আর কী? আপনারা তো দোরগোড়ায় গ্রাম রক্ষা করতে রয়েছেন। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। এটা জানার আমাদের সকলের খুব আগ্রহ। এখানে মিলিটারিদের বড় ঘাঁটি হবে, তাই না?”

হেসে উঠল শুদ্ধশীল, “মিলিটারিদের কাজকর্ম খুব গোপনীয়। সত্যি কথা আপনাকে বলছি। আমি নিজেও ঠিক জানি না কী হবে এখানে। আমাকে সার্ভে করার যেটুকু দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটুকুই করছি।”

ফলের রেকাবি নামিয়ে তমালিকা চলে যায়নি। সার্ভেয়ারবাবু বই নেবে। কোন বই চাইছে, সে বই আছে কিনা তাও জানে না। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর, কথা বলার ভঙ্গি খুব আকর্ষণীয়। শুনতে শুনতে তমালিকা বলে ফেলল, “কী কাজ?”

শুদ্ধশীল তমালিকার দিকে চাইল। তার পর বলতে থাকল, “জমি জরিপের কাজ। কতখানি জমি আছে। শালবন কেটে ফেললে মোট কতটা জমি আছে। জমি কী রকম শক্ত।”

“শক্ত মানে?”

শুদ্ধশীল উত্তর দেওয়ার আগেই ক্ষিতীশ বলে উঠলেন, “শালবন থাকলেও ও জমি খুব শক্ত জমি। আপনারা কেটে পরিষ্কার করে দিলে ভাল মিলিটারি ঘাঁটি তৈরি করতে পারবেন। হুজুর, নিজের লোক মনে করে একটা কথা বলি। আপনারা বাইরে থেকে ঠিকাদার এনে শালবন কাটাচ্ছেন। এই কাজটা এক বার বিশ্বাস করে আমাকে দায়িত্ব দিন। বিভূদায় অনেক দক্ষ জোয়ান মরদ বাউরি বাগদি আছে। আপনি হুকুম করলে পুরো জঙ্গল কাটিয়ে দেব।”

“পুরো জঙ্গল কাটার আদেশনামা এখনও আসেনি। যেটুকু কাটা হয়েছে তা শুধু ওই সার্ভে করার জন্য। সমস্ত রিপোর্ট দেখে সেই সিদ্ধান্ত নেবেন উচ্চ পর্যায়ের মিলিটারি কর্মকর্তারা। আমি কয়েকদিন হল সবে আমার প্রাথমিক রিপোর্ট জানিয়েছি। এখন পরবর্তী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছি। তাই তো কয়েকদিন একটু ফুসরত পেয়ে গ্রামটা ঘুরে দেখব ভেবেছি।”

ক্ষিতীশ জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে থাকলেন, “অবশ্যই। অবশ্যই।

আমি নিজে আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাব। শুধু একটাই কথা একটু স্মরণে রাখবেন হুজুর। আপনি যদি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে আমার কথাটা একটু সুপারিশ করেন। এ কী, আপনি তো কিছুই খাচ্ছেন না।”

শুদ্ধশীল একটা আপেলের টুকরো তুলে নিয়ে বলল, “একটা সত্যি কথা বলুন তো, আপনি তো এত যুদ্ধের খবর রাখেন। প্রত্যেকদিন যুদ্ধটা কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে খবর রাখেন। কিন্তু বিশ্বজুড়ে এত মৃত্যু, হাহাকার, অত্যাচার এসব আপনার রোজ পড়তে ভাল লাগে?”

এই আচমকা প্রশ্নের জন্য প্রশস্ত ছিলেন না ক্ষিতীশ। কী বলবেন ভেবে উঠতে পারলেন না। যুদ্ধের বিপক্ষে বলা মানে এখানে মিলিটারিদের ঘাঁটি হওয়া সমর্থন না করা। আর তা হলে জলাঞ্জলি যাবে ঠিকাদারি করে বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন।

শুদ্ধশীল আবার তমালিকার দিকে তাকাল। তমালিকার চোখে যেন অভূত কিছু শব্দ লেখা আছে। শুদ্ধশীল নিজের মনে বলে উঠল,

“হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোরকুটিল পঙ্খ তার, লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর’ ব্রাণ মহাপ্রাণ, আন’ অমৃতবাণী,
বিকশিত কর’ প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপূর্ণা,
করণাঘন, ধরণীতল কর’ কলঙ্কশূন্য।”

লাইনগুলো বলার পর শুদ্ধশীল দেখল ক্ষিতীশ আর তমালিকার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে। তবে দু’ চোখের ভাষা দু’ রকম। তমালিকা হঠাৎকৃত পায়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল আর কিছুক্ষণের মধ্যে কয়েকখানি বই নিয়ে ফিরে এসে শুদ্ধশীলের হাতে দিল।

প্রত্যেকটা বইয়ের উপর যত্ন করে কাগজের মলাট দেওয়া রয়েছে। মুক্তের মতো হাতের লেখায় লেখা রয়েছে বইয়ের নামগুলো। শুদ্ধশীল একটা একটা করে বইয়ের নাম দেখতে থাকল। ‘কড়ি ও কোমল’, ‘সোনার তরী’, ‘মানসী’, ‘পূরবী’, ‘বলাকা’...

হঠাৎ উঠানে একটা পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। তমালিকা অবাক চোখে দেখল, সমীরণ। আচমকা এতদিন পরে? বেশ কিছুদিন তো ওর সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছিল না। চেহারা একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। গায়ের রংটা রোদে পুড়ে তামাটে হয়েছে। চুল উন্মোখুন্মো। জামা ধুতি মলিন। তবে কাঁধের পেট ফোলা ঝোলাটা একই রকম আছে।

সমীরণও যেন একেবারেই আশা করেনি এই দুপুরে এই বাড়িতে এই দৃশ্য দেখতে হবে। হিসেব মতো এই সময় জেঠাবাবুর চণ্ডীমণ্ডপে থাকার কথা। জেঠাইমার ধর্মঠাকুরের মন্দিরে। এতদিন অন্য গ্রামে লুকিয়ে ছিল। কিন্তু তপীর জন্য মনটা ক’দিন ভীষণ ছটফট করছিল। আজ মরিয়া হয়ে দেখা করতে এসেছিল। আজকে ওকে রাজি করাতই শালবনে যেতে। অনেক অনেক কথা বলার আছে যে।

তবে এক লহমার দৃশ্যে যা বোঝার বুঝে গেল সমীরণ। চেয়ারে সার্ভেয়ার। পাশে অনুগত ভৃত্যর মতো দাঁড়িয়ে আছেন জেঠাবাবু। একটা মোড়ার উপর ফলের রেকাবি। সার্ভেয়ারের হাতে কতগুলো বই। আর উদ্ভাসিত মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে তমালিকা।

যেরকম আচমকা এসেছিল সেরকমই ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল সমীরণ। ক্ষিতীশ আপাতত ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলেন না। শুদ্ধশীল ‘পূরবী’ বইটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “অনেক ধন্যবাদ। আজ চলি। পড়া শেষ করে এটা ফেরত দিয়ে আবার একটা বই নিয়ে যাব।”

॥ ১০ ॥

ঈশার আমাদের বাড়িতে থাকার বেশ কয়েকদিন হয়ে গেল। মেয়েটার সম্পর্কে এই ক’দিনে আর বিশেষ নতুন কিছু বুঝে উঠতে পারিনি। ঈশা নিজের মতোই দোতলায় থাকে। সকালে রেডি হয়ে সাইটে যায়। আমাদের বাড়ি থেকে সাইট প্রায় এক কিলোমিটার দূর। হেঁটেই যায়। সন্ধ্যাবেলায় হেঁটেই ফেরে। এখনও ওর রান্নাটা হাবুদা এনে দেয়। ঘর পরিষ্কার, কাপড়জামা কাচার জন্য মা-ই বাসন্তীর মাকে বলে ব্যবস্থা

করেছে। ইলেকট্রিক পয়েন্টও কয়েকটা করিয়ে নিয়েছে। তবে ও যে গ্যাজেটসের কথা বলেছিল, সেসব কিছু এখনও আসেনি।

বেশ বুঝতে পারছি মায়ের কিন্তু দিবা পছন্দ হয়ে যাচ্ছে ঈশাকে। সাইট থেকে ফেরার পরে দাওয়ায় বসে মায়ের হাতে একবাটি কুসুমবীজ দেওয়া মুড়ি আর চা খেয়ে খানিক গল্প করা এখন রোজকার ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। আমি জানি মাকে আর সাবধান করে কোনও লাভ নেই। তবে মায়ের দিকটাও বুঝি। কথা বলার জন্য নতুন একটা কাউকে পেয়েছে। মেয়েটা এমনিতে তো খুবই মিশুক। ও যখন মায়ের সঙ্গে গল্প করে আমি ধারেপাশে থাকি না। মায়ের কাছে শুনেছি যখনই মায়ের সঙ্গে গল্প করে ওই তপীঠাকুরমার কথা জিজ্ঞেস করে। জ্যোৎস্নাঠাকুরমা, সমীরণদাদুর কথা বলে।

“সোনাকাকিমা আসছি,” আজ সকালে সাইটে যাওয়ার সময় রোজকার মতো ঈশা বলল।

“দুগ্ধা, দুগ্ধা...” মা জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, “সাবধানে কাজ করো মা।”

“তোমার নামের মতো তোমার মনটাও খাঁটি সোনা। চিন্তা করো না সোনাকাকিমা,” মাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরে ঈশা বলল।

আমি আমার ঘরে জানলার পাশে নিজেই লুকিয়ে রেখে ঈশার বেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখছিলাম। ও বেরিয়ে যাওয়ার পরও দেখলাম মা দালানের খুঁটিটা ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মায়ের এখন খুব ব্যস্ততার সময়। ঘর পরিষ্কার করবে। রান্না চাপাবে। মাকে ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দৃষ্টিস্তা হল, শরীর খারাপ হল নাকি?

বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম মায়ের মুখটা বিষণ্ণ, চোখে জল।

“কী হয়েছে মা?”

মা আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখটা পরিষ্কার করে বলল, “কবে যে তোকে এরকম রোজ সকালে কাজে বেরোতে দেখব মনা।”

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্নান হাসলাম, “তোমার শিক্ষা হয়নি মা? আমাকে না জানিয়ে সোনার বালাদুটো বিক্রি করে সতুকালাকে টাকা দিয়েছিলে স্কুলে আমার একটা চাকরির জন্য।”

“সেটাই তো, সতুঠাকুরপো বলছে হয়ে যাবে। এখন একটু গন্ডগোল চলছে বলে হচ্ছে না।”

“তুমি টিভিতে কি শুধুই সিরিয়াল দেখো? আশপাশের খবরের চ্যানেলগুলো একটুও দেখো না?”

“তুই সব সময় ওই এক কথা বলিস। কোথায় কী সব পরীক্ষা দিয়ে কলকাতায় ছেলেমেয়েরা সব ধর্মীয় বসে রয়েছে, কোন কোন মন্ত্রীদেব বাড়িতে টাকার পাহাড় পাওয়া যাচ্ছে...”

“টাকার পাহাড়ের ছবিটা টিভিতে দেখেছ মা? ওর মধ্যে তোমার বালা বিক্রি করা নোটের বাউন্ডলও আছে।”

“সতুঠাকুরপো ওরকম নয়। তোর বাবার এত বন্ধু ছিল। দেখছিস তো বিজুর চাকরিটা করে দিয়েছে।”

“কতদিন চাকরিটা থাকে দ্যাখো।”

“অলুক্ষুনে কথা বলিস না মনা।”

“তুমি থাকো তোমার সতুঠাকুরপোকে বিশ্বাস করে। আচ্ছা, এই সব আবার ওই মেয়েটাকে বলানি তো? খুব তো নতুন সই পাতিয়েছ।”

মা চুপ করে থাকল। অর্থাৎ বলেছে।

খুব বিরক্ত গলায় বললাম, “মা, তুমি কেন বুঝতে পার না, বেকার হলেও আমার একটা আত্মসম্মান আছে। আর আমি কি তোমাকে বলেছিলাম তোমার বালা বিক্রি করে সতুকালাকে ঘুষ দিতে? তুমি যদি এরকম শুরু করো, তোমার সইয়ের কাছে আমার গল্প করো, আমি কিন্তু বাড়ি ছেড়ে চলে যাব। কোথাকার না কোথাকার একটা মেয়ে, তার কাছে বাড়ির সব হাঁড়ির খবর গল্প করছ!”

মা আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য কথা ঘোরানোর চেষ্টা করল, “বলিনি তো। ও আমাকে কত কথা জিজ্ঞেস করে। কিন্তু আমি তো তপীঠাকুরমার কথা কিছু বলিনি। ওই বরঞ্চ আমাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলছিল।”

“তপীঠাকুরমার বাবা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ঠিকাদারি করতে গিয়েছিলেন না?”

মায়ের মুখটা খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ সব জানে। সব জানে। আমি কিন্তু কিছু বলিনি মনা।”

মায়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম। তার পর মায়ের হাতটা টেনে ধরে বসলাম, “বোসো। তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে।”

মা ব্যস্ততার কথা বললেও আমি আজ নাছোড়বান্দা। আমাকে জানতেই হবে আজকে।

“তপীঠাকুরমার কথা আজ সব বলো তো মা। মেয়েটার তপীঠাকুরমাকে নিয়ে এত ইন্টারেস্ট কেন? কেন হঠাৎ জাতিস্মর সাজতে চাইছে?”

“কী করে বলি বল তো?”

“তপীঠাকুরমার কী হয়েছিল যে পাগল হয়ে গিয়েছিল? কেন আমাদের বাড়িতে এনে রাখা হয়েছিল?”

“আমিও কি সব জানি? তোর বাবাও কোনও দিন এই নিয়ে একটাও কথা বলেনি আমাকে। এখন আর কে মনে রেখেছে তপীঠাকুরমাকে? যেটুকু শুনেছি তোর ঠাকুরমার মুখ থেকে। যা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে। আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে। সেও আজ কতদিন আগেকার কথা। তপীঠাকুরমার বাবা-মা মারা যাওয়ার পর কেউ ছিল না। তোর বাবার ঠাকুরমা সংসারে অনেক লড়াই করে নিজের সইকে বাড়িতে এনে রেখেছিলেন। সেই থেকে আমৃত্যু এই বাড়িতেই ছিলেন।”

“বিশেষ কোনও একটা ঘটনা কেউ যে মনে রেখেছে সেটা চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছ। বেশ, তপীঠাকুরমা কেন পাগল হয়ে গিয়েছিল, যেটুকু জানো সেটুকুই বলো।”

একটা অস্বস্তি মেশানো গলায় মা বলল, “তপীঠাকুরমার বিয়ে হয়েছিল কি না সেটা নিয়ে একটা সন্দেহ হয়েছিল।”

“বিয়ে?”

“বলছি না, কিছু জানি না। শুনেছি গ্রামে যখন ফিরে এসেছিল, তখন থেকেই মাথা খারাপ। সব সময় নাকি বিভ্রিড় করে কী সব বলত। কেউ মানে বুঝত না। শালবনে চলে যেত।”

“গ্রামে ফিরে এসেছিল মানে? কোথায় গিয়েছিল?”

“মনা, তুই ছাড় এবার। মেয়েটার থেকেও বেশি প্রশ্ন করছিস।”

“না দাঁড়াও। আমার প্রশ্ন এখনও শেষ হয়নি। তুমি তো বলেছিলে তপীঠাকুরমা শিক্ষিত ছিল।”

“তখনদার দিনে গ্রামের মেয়েদের একটুকু লেখাপড়া করাই অনেক ছিল। বলা হত মেয়েদের লেখাপড়া করলে মাথার ব্যামো হয়। সেখানে তপীঠাকুরমা অনেক লেখাপড়া করেছিলেন।”

“তা হলে মাথার ব্যামোটা লেখাপড়া করার জন্য হয়েছিল?”

“আহ! ঈশা ঠিকই বলে। তুই সব কথা বড় ট্যারা ট্যারা বলিস। তপীঠাকুরমার এক কাকা বিশ্বভারতীতে কাজ করতেন। শুনেছি তমালিকা নামটা নাকি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। মাঝে মাঝে তপীঠাকুরমা যখন কাকার কাছে যেত, বিশ্বভারতীতে ঘুরত। সেই দেখে দেখেই লেখাপড়া করার আগ্রহ হয়। কাকা ওখানে ভর্তিও করে দিয়েছিল।”

আশ্চর্য! সেদিন টিভিতে ঈশা এরকমই কিছু বলেছিল। জিজ্ঞেস করলাম, “ওখানেই লেখাপড়া শিখেছিলেন? কত দূর পড়াশোনা করেছিলেন?”

“ঠিক জানি না। তবে বছর খানেকও নয় বোধ হয়। তোর বাবার মুখে শুনেছি, তপীঠাকুরমার মুখস্থ করার একটা আশ্চর্য গুণ ছিল। মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার পরও রবীন্দ্রনাথের কবিতা নির্ভুল আবৃত্তি করতে পারত। তবে তপীঠাকুরমার বাবা কিছুটা উদার হলেও শাস্তিনিকেতনটা বোধ হয় ঠিক পছন্দ ছিল না। মেয়ে বড় হচ্ছিল। তার উপর গ্রামের মোড়ল ছিলেন। লোকে তপীঠাকুরমার আইবুড়ো থাকা নিয়ে কথা বলাবলি আরম্ভ করেছিল। তাই ওঁর বাবা বিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রামে ফিরিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই বিয়ে দিয়ে উঠতে পারছিলেন না।”

“এক ঘটক সম্বন্ধ জোগাড় করে নিয়ে আসত আর কেউ ভাঙিয়ে দিত। আবার তুমি বলছ তপীঠাকুরমার বিয়ে নিয়ে নাকি একটা সন্দেহ হয়েছিল।”

মা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “বিয়ে ভাঙিয়ে দিত?

এরকম কিছু শুনিনি তো। তুই কী করে জানলি মনা?”

“ছাড়ো না। গল্পটা যত আলাদা হয় তত ভাল। আর কী জানো?”

“তপীঠাকুরমার আরও অনেক গুণ ছিল। ভাল ছবি আঁকতেন। অবন ঠাকুর সেই ছবির প্রশংসা করেছিলেন। বললাম যে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার পরও রবি ঠাকুরের কবিতা মুখস্থ নিজের মনে আওড়ে যেতেন, গান গাইতেন। সবই তোর বাবার কাছে শুনেছি।”

“বেশ। আর কী মনে আছে?”

“ব্যস বাপু, আর কিছু জানি না। সবই তো আমি শুনেছি। কেন এত সব জানতে চাইছিস বল তো?”

“কারণ তুমি যা যা আমাকে বলছ, তার একটা কথাও মেয়েটাকে বলবে না। কিছুতেই বলবে না। পারলে যত পারবে মিথ্যে বলবে। দেখব ও কত বড় জাতিস্মর।”

“কী যে বলিস, বুঝছি না।”

“যা বললাম, সেটা মনে রেখো তা হলেই হবে।”

আমার মোবাইলটা হঠাৎ বেজে উঠল। আমার অতি সস্তার মোবাইলটা সচরাচর বাজে না। কেউ আমাকে তেমন ফোন করে না। আমিও কাউকে ফোন করি না। নেহাত আজকাল সব কাজেতেই মোবাইল নম্বরটা দিতে হয় বলে মাসে মাসে সিমকার্ড রিচার্জ করার বাজে খরচটা করতে হয়। মোবাইলে খুব একটা নামও সেত করা নেই। অচেনা একটা নম্বর ফোনের স্ক্রিনে। একটু ইতস্তত করে ফোনটা ধরলাম।

“হ্যালো।”

“মনা...” গলাটা চিনতে পারলাম। হাবুদা। কিন্তু হাবুদা আমার মোবাইল নম্বর পেল কোথা থেকে? কখনও তো হাবুদাকে আমার নম্বর দিয়েছি বলে মনে পড়ল না।

“মনা, হাবুদা বলছি রে।”

“বুঝতে পেরেছি। বলো।”

হাবুদা একটু চাপা উত্তেজিত গলায় বলল, “এক বার আমাদের সাইট অফিসে আয় তো।”

ঠান্ডা গলায় বললাম, “কেন?”

“একটু দরকার আছে। কলকাতা থেকে কোম্পানির বড় বড় সাহেব এসেছে।”

“যেই আসুক। পরিষ্কার বলে দাও জমি আমরা বিক্রি করব না। সে যত টাকাই দিক।”

“আহ, তোর মাথায় সেই এক কথা। অন্য দরকারে ডাকছে। ধর্মঠাকুরের দিব্যি, জমির কথা বলবে না।”

“তা ছাড়া আর ওদের কী কথা আছে?”

“আয় না।”

ফোনটা কেটে দিলাম। মা আমার দিকে একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়ে আছে। মায়ের ধারণা, ফোন মানেই জরুরি কোনও কথা।

“কার ফোন রে?”

আমি এক দমেই সবটুকু বলে দিলাম, “হাবুদা। ওদের অফিসে ডাকছে। কলকাতা থেকে ওদের কারা সব এসেছে। আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। বুঝতেই পারছ, কী বলতে চায়।”

মা কাতর গলায় বলল, “যা না। ডাকছে যখন।”

মায়ের মুখের দিকে এক দণ্ড তাকিয়ে একটা সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি যাব। ওদের সাইটেই যাব। মাথা উঁচু করে ওদের অবজ্ঞা করে ওদের সাইট অফিসের সামনে দিয়ে গটগটিয়ে হেঁটে গিয়ে আমার সিংহাসনে গিয়ে বসব। উঠে দাঁড়িয়ে গায়ে পাঞ্জাবি গলিয়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে চটি পরতেই মা “দুগ্ধা, দুগ্ধা...” বলে জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

রাস্তায় নেমে ভেতরে একটা মৃদু উত্তেজনা টের পেলাম। কতক্ষণে গিয়ে ওদের অবজ্ঞাটা দেখাতে পারব। লাল কাঁকর বিছানো পথে চটির মশমশ আওয়াজ হচ্ছে। এমন সময় পেছনে একটা ভট ভট আওয়াজ শুনতে পেলাম। ধুলো উড়িয়ে একটা বাইক আমার পাশে দাঁড়াল। বাইকটা চালাচ্ছে গাবলু। পেছনে শালং।



গাবলুর এখন চালচলনই বদলে গিয়েছে। দামি জামাকাপড় পরে। ঘোড়ার মাথার মতো চুল কাটে। তাতে আবার সোনালি রং করে। চোখে বাহারি সানগ্লাস। সেই সানগ্লাসটা টেনে নাকের ডগায় নামিয়ে বলল, “কী রে শ্লা! এখন তো খুব মস্তি। রাতে মায়ের আঁচলের তলায় ঘুমোস নাকি দোতলায়?”

শালং দু’ হাত দিয়ে দাঁত বের করে একটা অল্লীল ভঙ্গি দেখিয়ে বলল, “চটকাই। মটকাই।”

গাবলু ছোপ পড়া দাঁতগুলো দেখিয়ে খ্যাক খ্যাক করে হাসতে থাকল, “শ্লা, কী কপাল করে জন্মেছি মাইরি। বাপটা আমাদের বাড়িতে একটা ঘর ভাড়া দিতে পারল না। সব সময় ভয়েই মরল। শ্লা কিছু হয়ে গেলে ভোটের কী হবে!”

তার পর পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে শালং-কে বলল, “দে।”

শালং বুক পকেট থেকে একটা গুটখার প্যাকেট বের করে মুখটা ছিঁড়ে গাবলুর হাতে দিল। গাবলু প্যাকেটটা থেকে সবটুকু মুখে পুরে হাও হাও গলায় বলতে থাকল, “শোন শ্লা বোকা... কোম্পানি সব শাস্তি সুরক্ষার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছে। মেয়েটার গায়ে যদি একটাও আঁচড় পড়ে, তোকে শ্লা ল্যাংটো করে তোর বাপের চিবির মধ্যে পুঁতে দেব।”

থুক করে আমার চটির সামনে একদলা লাল থুথু ফেলে বাইকে ধুলো উড়িয়ে গাবলু চলে গেল। আমি থমকে দাঁড়িয়ে আছি। কানদুটোয় মনে হচ্ছে আঙুন লেগেছে। তার মধ্যেই টের পেলাম আমার ভেতরে একটা সিদ্ধান্ত বদলে যাচ্ছে।

১১ ১১

বিরশি বছর আগে

ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য গুম মেরে বাড়ির দাওয়ায় মধ্যমণি হয়ে বসে রয়েছেন। বলরাম, হলধরেরা যথারীতি রয়েছেন। তবে আজ বাগদি, বাউরিরা কেউ নেই। তারা ভয়ে আসেনি। আজ আর সুগন্ধি পানের সুবাস ছড়িয়ে যুদ্ধের গল্প বলছেন না ক্ষিতীশ। গল্প বলার মতো মানসিক অবস্থাতেই নেই।

বিড়দার মতো শান্ত গ্রামের প্রান্তরে মিলিটারিদের আসাই একটা তরঙ্গ তুলেছিল। কিন্তু আরও অনেক বড় তরঙ্গ যে অপেক্ষা করে রয়েছে কেউ ঘোরতর দৃষ্টিতেও ভাবেনি। আর সেই তরঙ্গটা তুলে দিয়ে গিয়েছে বলরামের কনিষ্ঠ পুত্র সমীরণ।

সমীরণ যে কোথায় আত্মগোপন করে ছিল বলরাম সত্যিই জানতেন না। তবে সেই না জানাটা কাউকে বুঝতে দেননি। এমনকি সমুর মাকেও। ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যর মুখেই শুনেছিলেন সে হঠাৎ করে কয়েক দণ্ড গুঁর বাড়িতে দুপুরে দেখা দিয়েছিল। তার পর আবার সেই তার কোনও খোঁজ নেই। গাঁয়ের কেউ পর্যন্ত দেখেনি ওকে। বলরাম বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ করেও সমুর দেখা পাননি। কিন্তু সমু যে শালবনে লুকিয়ে থাকতে পারে কল্পনাতেও ভাবেননি। তাও শুধু শালবনে লুকিয়ে থাকলে কথা ছিল, সে যে এমন কাণ্ড ঘটিয়ে বসবে? অসহায় চোখে ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যের দিকে তাকালেন বলরাম। গ্রামের মোড়ল হলেও কিছু কি করার ক্ষমতা আছে খিতিদার? আর ক্ষমতা থাকলেও চেষ্টা কি করবেন খিতিদার? এত সব কাণ্ডের পরে বহু ইতস্তত করেও কিছুই তো বলে উঠতে পারেননি। খুঁটি থেকে হারিকেনের আলোটা জ্বলছে তাতে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে খিতিদার মুখটা। ঝিঝির ডাকগুলোও আজ বড় বেশি স্পষ্ট।

প্রায় নিঃশব্দে তমালিকা একটা থালা নিয়ে ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল। থালার উপর রোজকার মতো চায়ের পেয়ালা। ঘরকম নিঃশব্দে এসেছিল সেরকমই নিঃশব্দে সবাই তুলে নিল এক-একটা পেয়ালা। তমালিকা ঘরের মধ্যে ফিরে এল। এক দেওয়ালে বইয়ের আলমারি। বইগুলোর উপর চোখ বোলাতে লাগল। তার পর আনমনেই বের করে আনল একটা বই। এই বইয়ের আশ্রয়েই যদি মনের উপর দিয়ে বয়ে চলা ঝড়কে ক্ষণিকের জন্য শান্ত করা যায়। হারিকেনের আলোটা অল্প উল্কে দিয়ে আলমারির সামনেই বাবু হয়ে বসে কোলে বইটা নিয়ে আলগোছে পাতা ওল্টাতে লাগল।

দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;

হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রখর।

জনশূন্য পল্লিপথে ধুলি উড়ে যায়

মধ্যাহ্ন-বাতাসে; স্নিগ্ধ অশ্বখের ছায়

ক্লান্ত বৃদ্ধা ভিখারিণী জীর্ণ বস্ত্র পাতি

ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাত্রি

বাঁ বাঁ করে চারি দিকে নিস্তব্ধ নিঃশ্বাস—

শুধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

নাহ! মনটা যে কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। থেকে থেকে ভেসে উঠছে কয়েক ঘণ্টা আগেকার দৃশ্য।

দুপুরবেলাতেই চলে এসেছিল জ্যোৎস্না। আজকে তমালিকাকে পাত্র পক্ষ দেখতে আসবে। গণপতি ঘটক তাদের সময় হিসেব করিয়েই নিয়ে আসবে। কাছেই লক্ষণপুর গ্রাম। সেখানে তাদের আত্মীয়র বাড়ি। ভাতার থেকে সেই বাড়িতেই এসে উঠেছে তারা। বাবা গরুর গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। তারা বিকেল বিকেল আসবে। গোখুলি লগ্নে কন্যা দেখতে চায়। বাড়িতে সকাল থেকেই সাজ সাজ রব। বাবা সকালে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়েছিলেন। তার মধ্যেই সব কিছু এলোমেলো করতে বাবা হঠাৎ করে নিয়ে এসেছিল সার্ভেয়ারবাবুকে।

সার্ভেয়ারবাবু অবশ্য বেশিক্ষণ থাকেননি। ওই একটু আধটু ফল খেয়ে আর পুরবী বইটা নিয়ে চলে গিয়েছেন। কিন্তু বলেছেন এই বইটা ফেরত দিয়ে আবার একটা বই নিতে আসবেন। মনে কেমন যেন ধরে গিয়েছে সার্ভেয়ারবাবুকে। বিশেষ করে গুঁর আবৃত্তি। এই নিয়ে দু’ বার আবৃত্তি শুনল। আর কি সুযোগ হবে? আচ্ছা উনি বলে গেলেন ‘যতদিন থাকবেন’। কতদিন থাকবেন?

এসবই মনের কথা। মনের এসব কথাকে প্রশ্রয় দিতে নেই। মনের কথা মনের ভেতর আরও ডুবিয়ে দেয়। সইকেও এসব কথা কিছু বলা যাবে না। আর বলেই বা কী হবে? আজকে গণপতি ঘটক যাদের নিয়ে আসছে তারাই হয়তো একটা তারিখ-লগ্ন ঠিক করে পালকিতে চাপিয়ে এই বাড়ি থেকে নিয়ে চলে যাবে।

মা আজ তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া খাইয়ে দিয়েছিল। তার পরে বলেছিল একটু ঘুমিয়ে নিতে। দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিলে মুখটা ফোলা ফোলা লাগবে। তার পর কাজল পমেটম দিয়ে রূপটান করে দেবে সই। সই তো সেই দুপুরেই চলে এসেছিল। কিন্তু এক বিছানায় দুপুরে সই থাকলে ঘুম কি আর হয়? কত কত যে গল্প দু’জনের মধ্যে, শেষই তো আর হয় না।

“তোদের বাড়িতে সার্ভেয়ারবাবু এসেছে খবরটা শুনেই তো আমার বুক কঁপে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, নির্ঘাত তোকে আর আমাকে পেয়াদা দিয়ে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে।”

“যাহা উনি তেমন নন। বই নিতে এসেছিলেন।”

জ্যোৎস্না ভেংচি কেটে বলল, “যাহা উনি তেমন নন। বই নিতে এসেছিলেন। তা বই না তোর মন?”

তমালিকা লজ্জায় গাল লাল করে বলল, “বাজে কথা বলিস না।”

“বাজে কথা? আর কতজনকে মন দিবি রে সই?”

“তুই বাজে কথা থামাবি?”

“কেন রে! আমার ছোট ঠাকুরপোটা কী দোষ করল? সেও তো শুনলাম এসেছিল।”

“এসেছিল। কিন্তু কেন জানি না।”

“জানি না আবার! একটা সত্যি কথা আজ বল তো সই, ঠাকুরপো মাঝে মাঝেই তোর সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাই না? তুই কাউকে বলিস না। আমাকেও না। নিজের সইকেও বিশ্বাস করে বলতে পারিস না,” জ্যোৎস্না অভিমানী হয়ে ঠোঁট ফুলিয়েছিল।

“বিশ্বাস কর। আজকেই এসেছিল।”

“জানিস, শুধু তোদের বাড়িতেই এসেছিল। তার পর কোথায় যে চলে গেল!”

“মানে?”

“বাড়িতে যায়নি। বাবা সব জায়গায় খোঁজ করছে, কোথাও নেই।”

“সে কী?” এই খবরটা তমালিকারও জানা ছিল না।

জ্যোৎস্না মিটিমিটি অর্ধপূর্ণ হাসতে থাকল, “তুই-ই পারবি খবর দিতে। জানাস কিন্তু ভাই! বাড়িতে সবাই বড্ড চিন্তায় আছে। আর দেখ দেখি। জেঠাইমা সবচেয়ে কঠিন কাজটা আমাকেই দিল। তোকে পরির মতো সাজিয়ে দিতে হবে। তার পর যদি তোর চাঁদপানা মুখটা দেখে পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়ে যায়?”

“যাহ!”

“তুই যেদিন আমাকে সত্যি কথা বলবি আমিও তোকে একটা সত্যি কথা বলব।”

“কী বল?”

তমালিকার চিবুকটা ধরে নাড়িয়ে জ্যোৎস্না বলেছিল, “চাঁদপানা মুখটা ওরা পছন্দ করলেও বিয়ে তোর ছোট ঠাকুরপোর সঙ্গেই হবে।”

আনমনা হয়ে দুপুরের কথা ভাবছিল তমালিকা। কোলের উপর খোলা বই। বিক্ষিপ্ত হয়ে আবার লষ্ঠনের আলোয় বইয়ের পাতায় মন দেওয়ার চেষ্টা করল তমালিকা।

তাকানু ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে
চাহিনু প্রিয়ার মুখে; কহিলাম ধীরে,
‘তবে আসি’। অমনি ফিরিয়ে মুখখানি
নতশিরে চক্ষু-‘পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি
অমঙ্গল অশ্রুজল করিল গোপন।

কিন্তু আবার চোখ বাপসা হয়ে উঠল। শিউরেও উঠল একটু। ঘটনার আরও ভয়ঙ্কর দিক যে তখনও বাকি ছিল।

পশ্চিমের জানলা দিয়ে রোদ পড়ছে। জ্যোৎস্না তমালিকাকে সাজাতে বসেছে। ক্ষিতীশ ঘর-বার করছেন। গণপতি ঘটক কখন গরুর গাড়ি নিয়ে আসে। শীত যেতে বসেছে। তবে এখনও বেলা তাড়াতাড়ি মুড়িয়ে যায়। গোধূলি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝুপ ঝুপ করে চলে আসবে।

জ্যোৎস্না খুব যত্ন করে তমালিকার খোঁপা বাঁধছিল। তমালিকা বলল, “এত সুন্দর করে খোঁপা বাঁধছিস। এর পর চুল খুলে দেখতে চাইলে সেই তো খোঁপা খুলে ফেলতে হবে।”

“সে অমন পাত্রপক্ষ দেখতে চায়। তোর কোমর ছাপানো চুল। শোন, জেঠাইমা বলেছেন বলে আমার করা কয়েকটা এমব্রয়ডারি নিয়ে এসেছি। টিয়া পাখিরটা দেখাস কিন্তু। বলবি নিজের হাতে করেছিস।”

“ওমা, তোর করা জিনিস আমি করেছি বলে মিথ্যে বলব কেন?”

“সেলাই ফোঁড়াই দেখাবি নাকি তোর ওই আঁকার খাতা...”

জ্যোৎস্নার কথা শেষ হল না। হঠাৎ ‘গুডুম’ ‘গুডুম’ করে দুটো আওয়াজ। দু’জনেই চমকে উঠল। এই আওয়াজ তো পরিচিত আওয়াজ নয়। দু’জনে জানলার ধারে গেল। আওয়াজটা কোথা থেকে এল? বাইরে দেখল ক্ষিতীশও উদ্ভিগ্ন হয়ে রাস্তায় নেমে অনুমান করার চেষ্টা করছেন কোথা থেকে এল এই আওয়াজ। এক ঘর, দু’ ঘর থেকে লোকজন বেরোতে আরম্ভ করেছে।

জটলা বাড়তে থাকল। সকলেই অনুমান করল এই আওয়াজ এসেছে শালবনের ভেতর থেকে। ওদিকে কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ফলে অনুমান আর আশঙ্কা দুটোই বাড়তে থাকল।

“মনে হচ্ছে খিতিদা, বিশ্বযুদ্ধটা বিড়দায় পৌঁছেই গেল। জাপানিরা চলে এসেছে।”

“আমি জানতাম এটাই হবে। বলেছিলাম কিনা ব্যাটা চার্চিল মনে মনে এই বুদ্ধিই এঁটেছিল।”

“এক বার সবাই মিলে যাব ওদিকে?”

“পাগল নাকি? শালবনের মধ্যে জাপানিরা এসে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে। দেখতে পেলেই গুলি করবে।”

“খিতিদা, বলুন এখন কী করব? গাঁ ছেড়ে সবাই পালাব?”

ক্ষিতীশ আর কিছু ভাবতে পারছেন না। দু’ হাতে মাথা চেপে ধরছেন। আজকেই এই আক্রমণ হওয়ার ছিল? কারা আক্রমণ করল? সত্যি কি জাপানিরা? কোন দিক দিয়ে এল ওরা? বড় রাস্তা দিয়ে গ্রামে ঢোকান কাঁচা রাস্তাটার দিকে তাকালেন ক্ষিতীশ। ওদিক দিয়েই তো গণপতি ঘটকের ওদের নিয়ে আসার কথা।

সেই রাস্তাতেই অবশেষে দেখা গেল গণপতি ঘটককে। তবে গরুর

গাড়িতে নয়। পড়িমরি ছুটতে ছুটতে আসছে। ক্ষিতীশের বাড়ির সামনে পৌঁছে এক বুক হাঁফাতে হাঁফাতে কোনও রকমে বলল, “সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে... জল... জল...”

এক ঘটি জল আনা হল। তার কয়েক ঢৌক খেয়ে কিছুটা ঘাড়ে মুখে দিয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে বলল, “সার্ভেয়ারবাবুকে গুলি করেছে।”

“কে?” সমস্বরে অনেকগুলো গলা বেজে উঠল। তার উত্তরে গণপতি যে নাম বলল, সেই নাম শোনার প্রস্তুতি কারও ছিল না।

“সমু।”

গণপতিকে ঘিরে ভিড় আরও ঘন হল। টুকরো টুকরো কথা জুড়ে যা জানা গেল, শালবনের টিবিব উপর সার্ভেয়ারবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন। বনের ভেতরে পেছন থেকে ওকে গুলি করেছে সমীরণ। তবে গুলি করে সমীরণ পালিয়ে যেতে পারেনি। মিলিটারিরা ওকে ধরে আটকে রেখেছে। গণপতি যাদের আনছিল ওই গুলির আওয়াজ শুনেই তারা গরুর গাড়ি ঘুরিয়ে পালিয়েছে। গণপতি খবরটা পেয়েছে এক চাষার কাছ থেকে। সে নিজে দেখেছে এই ঘটনা। তার পর প্রাণভয়ে সে-ও পালিয়েছে।

“সার্ভেয়ারবাবু গুলি খেয়ে মরে গিয়েছে?”

গণপতি মাথা ঝাঁকাল, “সেসব আর কিছু জানি না। গুলি খেলে লোকে বাঁচে নাকি?”

বলরাম থিরথির করে কাঁপছিলেন। টলমল পায়ে এগোতে যাচ্ছিলেন। খপ করে ঝুঁর হাতটা ধরলেন হলধর, “কোথায় যাচ্ছিস?”

ছুটফট করে উঠে অসংলগ্ন গলায় বলরাম বললেন, “যাই, ছেলেটাকে ওরা ধরে রেখেছে...”

“পাগল হয়েছিস তুই? সমু এখন খুনের আসামি। তার উপর মিলিটারিরা ওকে ...”

তমালিকার হাত-পা সব অবশ লাগছিল। এই একটু আগে অমন সুন্দর ভরাট গলায় যে আবৃত্তি করছিল ‘বিকশিত কর’ প্রেমপদ্ম চিরমধুরিন্যন্দ; শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য, করুণাঘন, ধরণীতল কর’ কলঙ্কশূন্য...’ সে মরে গেল, সে আর এই পৃথিবীতে নেই? তাকে মেরে ফেলল সমুদা? কেন? কেন? কেন?

ঘরের মধ্যে মুখ ফেরাল তমালিকা। সেই বোবা হয়ে মুখ ছোট করে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে মাটিতে বসে রয়েছে।

“তপী...তপী...”

বাবার ডাকে সম্মিৎ ফিরল তমালিকার। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল বাবা আর বলরামকাঁকা। আর সবাই চলে গিয়েছেন। বাবা বলল, “জল দে কাকাকে।”

তমালিকা জল এনে দিল। জল খেয়ে তমালিকার মাথায় হাত রেখে বিড়বিড় করে বলরাম বললেন, “জানি না ছেলেটার ফাঁসি হবে না দ্বীপান্তর! তুই সুখী হোস মা।”

॥ ১২ ॥

চরাচরে সূর্যটা ডোবার সময় হয়ে আসছে। আমি অনেক ক্ষণ টিবিব উপর বসে রয়েছি। আজ আমার নিস্তরঙ্গ ঘটনাবিহীন দিনে একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। আজ কি আমি সূর্যকে হাত মুড়ে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারব? নাকি সূর্য আজ কমলা বিদ্রুপের আলো ছিটিয়ে সদন্তে আমার অনুমতির তোয়াক্কা না করে ডুব দেবে?

সকালে সেই যে সিদ্ধান্তটা বদলে ফেলেছিলাম সেই অনুযায়ী সাইট অফিসের সামনে গিয়ে দাঁড়িলাম। এ দিক ও দিক তাকালাম। একটু দূরে দেখলাম গাবলুর বাইকটা স্ট্যান্ড করা আছে। দুটো দামি গাড়িও দাঁড়িয়ে আছে। তবে গাবলু বা শালংকে কোথাও দেখতে পেলাম না। অবচেতন মনে ঈশাকেও কি খুঁজছিলাম? গোটা জায়গাটা জুড়ে অনেকে কাজ করছে। তার মধ্যে নীল জিন্স, ঘন নীল জামা আর সাদা হেলমেট মাথায় কাউকে দেখতে পেলাম না। হাবুদাকেও নয়। নিজেই ক্রমশ জড়সড় অপ্রস্তুত লাগতে আরম্ভ করল। কী করা উচিত আমার? ফিরে যাওয়া নাকি আমার মোবাইলে হাবুদা যে নম্বরটা থেকে ফোন করেছিল, সেই নম্বরটায় ফোন করা?

এখানে অবশ্য আমাদের গ্রামের অনেকেই এখন লেবার খাটে। হঠাৎ মটরদাকে দেখতে পেয়ে গোলাম।

“মনা, তুই এখানে?”

“হাবুদাকে দেখেছ?”

“হাবু... ও বলছিল বটে তুই আসবি। দাঁড়া এখানে। দেখছি।”

একটু পরেই হাবুদা প্যান্টের মধ্যে শার্ট গুঁজতে গুঁজতে হস্তদন্ত হয়ে এসে বলল, “চল। চল।”

সাইট অফিসটা দেখেছি। এই প্রথম ভেতরে এলাম। খুপরি খুপরি কয়েকটা ঘর আর-একটা বড় হল ঘর। আমাকে হাবুদা বড় হল ঘরটাতেই নিয়ে এল। সেখানে এক আধপাকা আধকাঁচা চুলের ভদ্রমহিলা দু’জন ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। টেবিলের উপরে বড় লেন্স লাগানো একটা ক্যামেরা। হাবুদা ঢুকতেই ভদ্রমহিলা হাবুদার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন। হাবুদা গদগদ গলায় বলল, “ম্যাডাম, ওই আপনি ডাকছিলেন না ওকে...” তার পর কনুই দিয়ে আমাকে আলতো খোঁচা মেরে নিচু গলায় বলল, “নামটা বল।”

“সংগ্রাম ভট্টাচার্য।”

ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে নমস্কার করে বললেন, “আমি শালিনী সিংহ। মার্কেটিং হেড। বসুন।”

ভদ্রমহিলা বেশ ব্যক্তিত্বময়ী। আমার একটু খারাপই লাগল। শিষ্টাচার কি ভুলে যাচ্ছি? আমার তো নমস্কার করে নিজের নামটা বলা উচিত ছিল। শালিনী সিংহ ছেলেমেয়ে দু’জনকে বললেন, “তোরা তা হলে একটু ঘুরে আয়।”

তার পর হাবুদাকেও ইঙ্গিত করলেন।

একটা ডায়েরি খুলে শালিনী সিংহ বললেন, “আমি শুনেছি আপনার কথা।”

কী শোনার থাকতে পারে আমার কথা এক ওই জমি বিক্রি করতে না চাওয়া ছাড়া? বুঝে উঠতে পারলাম না কী বলব। এমন সময় মটরদা ঢুকল কাচের গ্লাসে জল নিয়ে। গ্লাসটা আমার সামনে নামিয়ে রাখল। বহুদিন পরে আমার প্রচণ্ড হাসি পেল। জীবনে এই প্রথম কেউ বোধ হয় এভাবে কাচের গ্লাসে জল দিল। শালিনী সিংহ জিজ্ঞেস করলেন, “চা না কফি?”

“কিছু লাগবে না।”

শালিনী সিংহ তবু মটরদাকে বললেন, “চা দিন।”

আশ্চর্য, এরা আমাকে এত খাতির করছে কেন? মাথাটা নামাতেই টেবিলের তলায় পাজমার নীচটা চোখে পড়ল। গুটখার ছিটে ছোপ লেগে রয়েছে। গা-টা ঘিনঘিন করে উঠল। শালিনী সিংহ বললেন, “কাজের কথায় আসা যাক। দেখুন এখানে এই স্কেলে একটা ইকো ভিলেজ, আমরা চাই এই একটা হ্যাপেনিং প্লেস হোক। সেনসেশন ক্রিয়েট হোক। লোকের ইন্টারেস্ট গ্রো করুক, একটা ব্র্যান্ডিং হোক। আমরা একটা ওয়েবসাইট লঞ্চ করতে চলেছি। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রেজেন্স দেব। তাই আমাদের কনটেন্ট চাই। আমি চাই আমাদের কনটেন্ট ক্রিয়েশন টিমের সঙ্গে আপনি কাজ করুন।”

আজ বোধ হয় শুধু আশ্চর্য হওয়ার দিন। এই একটু আগে মটরদা যেমন কাচের গ্লাসে জল দিল, তেমনি অদ্ভুত এক প্রস্তাব।

“আমি কনটেন্ট-টনটেন্ট লিখতে জানি না ম্যাডাম।”

শালিনী সিংহ অল্প ভুরু কঁচকে জানতে চাইলেন, “আপনাদের বাড়িতেই তো দীক্ষিতা থাকছে এখন? শি স্পোক ভেরি হাইলি অ্যাবাউট ইউ। ইনফ্যাক্ট ও বলল, ইউ আর দ্য রাইট পার্সন।”

“আমার মনে হচ্ছে আপনার কিছু ভুল হচ্ছে ম্যাডাম। দীক্ষিতা মাত্র কয়েকদিনই আছে আমাদের বাড়ি। আমি এই ক’দিনই ওকে চিনি। ও থাকে ওর মতো। আমি আমার মতো। সেভাবে আলাপই নেই।”

“স্ট্রেঞ্জ! দীক্ষিতা তো কখনও বাজে কথা বলে না। শি ইজ ওয়ান অবআওয়ার বেস্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ার।”

ঠিক এই সময়েই মটরদা একটা কাগজের কাপে করে চা নিয়ে এল। চা-টা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখার সময় নিচু গলায় কানের কাছে বলল, “মেশিনের চা, খা।”

চা হয়তো আমি খেতাম না। কিন্তু শালিনী সিংহের ব্যক্তিত্বের কাছে হার মানলাম। এক বার শিষ্টাচার দেখাইনি। আর-এক বার অভদ্রতা করতে পারব না। এটা আমার বাবা-মায়ের দেওয়া শিক্ষা নয়। কিন্তু ওই কাগজের চায়ের কাপে চুমুক দেওয়াটাই কাল হল। মেশিনের চা এত গরম হয় জানতাম না। এমনতেই আমি হুদহুদে গরম চা খেতে পারি না। আর এখন এক চুমুক চা-টা খেয়ে উঠেও যেতে পারছি না। ওই সময়টুকু কাটানোর জন্য শালিনী সিংহ বললেন, “আমরা আসলে আমাদের কনটেন্টে এখনকার হিষ্টিটা ক্যাপচার করতে চাইছিলাম। আপনি লোকাল। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে।”

দু’দিকে মাথা নাড়লাম, “না ম্যাডাম। এখানে সে রকম কোনও হিষ্টি নেই। সাদামাটা আটপোরে একটা গ্রাম। একটা পুরনো মন্দির খালি আছে। ধর্মঠাকুরের মন্দির। গ্রামের লোকদের বিশ্বাস জাগ্রত, তবে আমি নাস্তিক।”

শালিনী হাসলেন, “বাস এইটুকুই? আর কোনও ইতিহাস নেই? হতেই পারে না।”

“শুধু এইটুকু শুনেছি, বর্ধমানের মহারাজা আমাদের এক পূর্বপুরুষকে কোনও একটা কাজে খুশি হয়ে এই জায়গাটা দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম বসতি করেছিলেন। চাষবাস আরম্ভ করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারিররা কিছুদিনের জন্য ক্যাম্প ফেলেছিল এখানে। তবে আপনি যেমন হ্যাপেনিং বলছেন, তেমন কিছুই হয়নি। তা ছাড়া একটা শালবন ছিল এখানে। প্রথমে মিলিটারিরা কিছুটা, পরে গ্রামের লোকজন বাকিটা কেটে দিয়েছিল। এর বেশি কোনও ইতিহাস নেই। আমার মনে হয় না এর বেশি আর কেউ কিছু আপনাকে বলতে পারবে।”

“আপনার মনে হয় না ব্যাপারটা একটু স্ট্রেঞ্জ? সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় মিলিটারিরা হঠাৎ এখানে ক্যাম্প করতে এসেছিল কেন?”

শালিনী আমার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমার হঠাৎ মনে পড়ল ঈশার কথা। জাতিস্মর সাজতে চাইছে। জানি না কোন ইতিহাসের কোন টুকরো খবর কী ভাবে কাজে লেগে যাবে ওর। ভেবেচিন্তে উত্তর দিলাম, “শুনেছি কোনও একটা প্রোজেক্টের জন্য।”

“কী প্রোজেক্ট?”

এভাবে শালিনী আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন বুঝতে পারছি না। বললাম, “জানি না।”

চা-টা প্রায় শেষ করে এনেছি। শালিনী এই প্রসঙ্গ আর বাড়ালেন না। ঈষৎ ব্যস্ততা দেখালেন, “সব জায়গার হিষ্টি থাকে। খোঁজ করে দেখুন, গ্রামের বড়দের জিজ্ঞেস করে দেখুন। এনিওয়ে, আমার দিক থেকে অফারটা ওপেন রইল। কিছু পেলে দীক্ষিতাকে জানান। আপনার সঙ্গে আলাপ করে ভাল লাগল। তবে আপনার কাছে সব কিছু ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট। নো গ্রে শেডস ইন বিটুইন।”

শালিনী সিংহ নমস্কার করলেন। শেষের কথাগুলো কেন বললেন বুঝতে পারলাম না। আমিও প্রতিনমস্কার করে উঠে দাঁড়ালাম। দরজায় একটা মেরুন পর্দা ঝোলানো ছিল সেটা ঠেলে বেরোতে যাব। এমন সময় থমকে গেলাম। দরজার বাইরে গাবলু। অবাক মুখে আমার দিকে চাইল। এতক্ষণ কি বুঝতে পারেনি যে আমি ভেতরে ছিলাম, নাকি আশা করেনি শালিনী সিংহ আমাকে ডাকতে পারেন?

তবে গাবলু আমাকে থমকে দাঁড় করায়নি। দাঁড় করিয়েছে একটা দেওয়াল জোড়া ফ্লেক্স। ঢোকার সময় এটা চোখে পড়েনি। এখন একদম সামনাসামনি দেখছি। এ ছবি আমি আগে দেখেছি। এই ইকো ভিলেজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর ভবিষ্যতে কেমন দেখতে হবে। অবাক করছে যেটা সেটা আমার টিবিটার উপর অদ্ভুত একটা স্থাপত্য। একটা গাছ। গাছের ডালে কয়েকটা পাখি। পাখিগুলো একে অন্যর দিকে চেয়ে রয়েছে। গাবলু বাড়িতে মাকে যে ছবিটা দেখিয়েছিল সেখানে টিবিটাই ছিল না। টিবিটা কিনতে পারবে না বুঝে এরা কি অন্য কিছু ভাবছে?

সাইট অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। হাবুদা অপেক্ষাই করছিল। আমাকে দেখেই জিজ্ঞেস করল, “কী বলল রে?”

“দীক্ষিতা কোথায়?”

“হারানোর সঙ্গে জিপে বেরিয়েছে।”

“ফিরে এলে বলে দিয়ে, বিকেল চারটের সময় যেন ঢিবিতে আসে। কথা আছে ওর সঙ্গে।”

বাড়ি ফিরে এসে প্রথমেই মায়ের উপর ফেটে পড়লাম, “তুমি ঈশাকে বলেছিলে?”

মা খতমত খেয়ে বলল, “কী মনা? বিশ্বাস কর, তুই বলে দেওয়ার পর আমি আর কিছু বলিনি।”

“তা হলে কেন আমাকে ওরা কাজ দেওয়ার জন্য ডেকেছিল? কে জানে আমি লিখি? তুমি... তুমিও কি জানো যে, আমি লিখি? মিথ্যে কথা তুমি বলতে পারো না মা।”

মা আমতা আমতা করতে থাকল। দালানের খুঁটিটায় একটা লাথি মেরে বললাম, “মা, নেহাত আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। থাকলে কবেই চলে যেতাম। এর পর কিন্তু রেললাইনে মাথা দিতে হবে।”

মা দু’হাতে কান চাপা দিয়ে বলে উঠল, “বালাই যাট। এসব অনুক্ষুনে কথা বলিস না বাবা। আর ভুল হবে না মনা।”

যে সময়ে আমি ঢিবিটায় যাই, তার অনেক আগেই আজ ঢিবিতে পৌঁছেলাম। চারদিকে সাইটে কাজ হলেও, এইদিকটায় কোনও কাজ হচ্ছে না। কেন আজ তাড়াতাড়ি এলাম? ভেতরে হটফটানি? অস্থিরতা? আমি যে রোজ এখানে এসে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকি, আজ কেন পারছি না? কিছুই প্রতীক্ষায় রয়েছে?

হাবুদাকে বলেছি ঈশাকে এখানে পাঠাতে। ও এলে কী কথাবার্তা হবে তার একটা কাল্পনিক চেহারা মাথার মধ্যে বাজতে আরম্ভ করল।

‘বলো কী জন্য ডেকেছ?’

‘নিশ্চয়ই জরুরি কথা আছে।’

‘রাতে বাড়িতে বলা যেত না?’

‘না, যেত না। তোমাকে আমার একটাই কথা বলার আছে। তুমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।’

‘হঠাৎ?’

‘দয়া দেখানোর স্পর্ধা পেলে কোথায়?’

‘কিসের দয়া?’

‘ন্যাকামো করো না। শালিনী সিংহকে আমাকে কাজ দেওয়ার কথা কে বলেছিল?’

‘যেই বলে থাকুক, তুমি গেলে কেন?’

‘দয়া যদি করতেই চাও, একটাই করো। আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাও। কালকেই।’

‘যাব। যেদিন তমালিকা ভট্টাচার্যর সবটুকু জেনে যাব।’

সূর্যটার দিকে তাকলাম। তখনও তেজ মরেনি। সাইটের দিকে তাকলাম। কেউ এগিয়ে আসছে না এই দিকে। আবার সূর্যটার দিকে তাকলাম। সূর্যটা যেন একটা বিদ্রূপের ‘স্মাইলি’ হয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে। এর পরে চরাচরে সূর্যটা ডোবার প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করবে।

॥ ১৩ ॥

বিরশি বছর আগে

দেখতে দেখতে আরও বেশ কিছু মাস কেটে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ক্রমশ আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। বিড়দা গ্রামে সেই উত্তেজনাটুকু অবশ্য স্তিমিত হয়ে পড়েছে। আসলে বিড়দায় হঠাৎ করে উত্তেজনার পারদটা চড়িয়েছিল মিলিটারিরা। কিন্তু ওরা যেমন হঠাৎ করে এসেছিল সেরকমই হঠাৎ করে চলে গিয়েছে। তার সঙ্গে অবশ্য সার্ভেয়ার শুদ্ধশীল গুহকে সমীরণের গুলি করার কোনও সম্পর্ক আছে কি না জানা নেই।

সমীরণ ধরা পড়ে গিয়েছিল মিলিটারিদের হাতে। কিন্তু তার পর তার কী হয়েছিল কেউ জানে না। গ্রামে পুলিশ এসেছিল। বলরামকে বিস্তর জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। কিন্তু সমীরণের কোনও হদিস তারাও দিতে পারেনি। বলেছে ও মিলিটারিদের কাছে আছে, কিন্তু কোথায় জানে না। বলরামের দৃঢ় ধারণা মিলিটারিরা ওকে ফাঁসি দিয়ে দিয়েছে কিংবা দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দিয়েছে।

পৃথিবীর মানচিত্রে তখন যুদ্ধ যেন দু’খণ্ডে হচ্ছে। এক পশ্চিমে।

আর-এক পূর্বে। পশ্চিমের যুদ্ধে যতই নানা কৌশলের উপাদান থাকুক আসল আতঙ্ক কিন্তু পূর্বে জাপানিদের নিয়ে। জাপানিরা অপ্রতিরোধ্য হয়ে আগ্রাসন করছে। এবং তারা অত্যন্ত ক্রুর আর নির্ধূর। সিঙ্গাপুর দখল করে ফেলেছে। আমেরিকা, মালয় ও ফিলিপাইনের হাজারে হাজারে সেনাকে জাপানিরা অক্লেশে বন্দি করে ফেলেছে। প্রবাসী চিনেদের গণহত্যা করে ওদের লক্ষ্য এখন আমেরিকা।

ক্ষিতিশ ভট্টাচার্যর যুদ্ধের গল্প বলার নেশা একই রকম রয়েছে। সন্ধেবেলায় বাড়ির দাওয়ায় মধ্যমণি হয়ে বসে সুগন্ধি পানের সুবাস ছড়িয়ে যুদ্ধের গল্প শোনান। হলধর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সঙ্গে সাযুজ্য খোঁজেন। বলরাম উদাস হয়ে বসে থাকেন। থেকে থেকে ছোট ছেলের কথা মনে পড়ে। এই তো সেদিনও সে এই যুদ্ধের গল্প শুনতে আসত। তার ব্যাগে থাকত গ্লোবখানা। যুদ্ধের গল্প শুনতে শুনতে কখনও উত্তেজিত হয়ে পায়াচারি করতে করতে ভাবত কী ভাবে এই যুদ্ধকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অনুকূলে আনা যায়! গ্লোব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খিতিদার বলা দেশগুলো খুঁজে খুঁজে দেখত। শেষে কী যে এক আত্মঘাতী কাণ্ড করে বসল ছেলেটা।

বলরাম অবশ্য এই পরিণতির জন্য মনে মনে খানিকটা নিজেও দোষে। সমুদ্র মা অনেকদিন ধরেই তো বলছিল খিতিদার কাছে সমুদ্র সঙ্গে তপীর কথাটা পাড়তে। একই গ্রামের মধ্যে সমগোত্রী বিয়ে। শুধু এইটুকুই ইতস্তত দ্বিধা ধন্দই ছিল না, মনে মনে একটা অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষাও ছিল। গাঁয়ের একমাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাস দেওয়া ছেলো। তার অনেক বড় ঘরে বিয়ে দেওয়া যেত। ম্যাট্রিকুলেশন পাস কি চাটখানি কথা? এখন অবশ্য এসব ভেবে আর কী হবে? অন্ধকারে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন বলরাম।

যুদ্ধের গল্প শোনার আগ্রহ হারিয়েছে আর-এক জন। তমালিকা। আগে দরজার পেছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গল্প শুনত। সে-ও সমুদ্রার কাছে গ্লোবে দেশ চিনত। এখন আর সেসব কিছুই ভাল লাগে না। বাবা তার বিয়ে দেওয়ার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। গণপতি ঘটক এখন ওখান থেকে সম্বন্ধ জুটিয়ে আনার চেষ্টা করছে। আনেও। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত কারণে সব বিয়ের সম্বন্ধ নষ্ট হয়ে যায়। তাতে অবশ্য তমালিকার দুঃখ নেই। যত দুঃখ হয় ওই শালবনে গেলে।

শালবনে যাওয়ার এক জনই সঙ্গী আছে। সেই। আর গন্তব্যও একটাই জায়গা। ঢিবিটা। প্রশ্নও বোধ হয় একটাই।

সেরকমই আর-একটা দিন। আকাশ মেঘলা। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। দুপুরের দিকে একটু ধরেছে। তমালিকা জ্যোৎস্নাকে নিয়ে গেল শালবনে। উত্তর যদিও জ্যোৎস্নার জানা তবুও জিজ্ঞেস করল, “কী দেখতে আসিস রোজ রোজ বল তো সেই?”

উদাস চোখে তমালিকা কখনও বিড়বিড় করে আবৃত্তি করে, “যে-কথা বলিতে চাই, বলা হয় নাই, সে কেবল এই—, চিরদিবসের বিশ্ব আঁখিসম্মুখেই দেখিনু সহস্রবার দুয়ারে আমার।”

আবার কখনও জ্যোৎস্নার চোখের দিকে চেয়ে বলে, “আমার সব কথা এই ঢিবির মধ্যে লুকোনো আছে।”

“কেমন সব কথা বলিস তুই। শুনলে মাঝে মাঝে গা ছম ছম করে।”

ঢিবির একপাশে কুসুম ফুল তুলতে তুলতে তমালিকা বলে, “আচ্ছা, সমুদ্র সার্ভেয়ারবাবুকে গুলি করল কেন?”

“আহা সেই। সেই এক প্রশ্ন রোজ করিস। আমিও যে ছাই কাউকেই বলতে পারি না। তুই বুঝিস না, ছোট ঠাকুরপো তোকেই ভালবাসত। তোর জন্য ও কী কী করতে পারে তুই জানিস না? সেদিন তোর সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল। আর এমনই পোড়া কপাল, তুই কিনা ঠিক তখনই সার্ভেয়ারবাবুকে বই দিচ্ছিলি। কী বুঝে বসল কে জানে?”

“জানিস বড় আফসোস হয়। আমি সমুদ্রার ঝোলায় পিস্তলটা দেখেছিলাম। তখন যদি জানতাম... ও জানিস আমি নিয়ে রেখে দিতাম। কিছুতেই আর সমুদ্রাকে দিতাম না।”

“এখন আর সে সব ভেবে কী হবে? আমারও মাঝে মাঝে খুব খারাপ চিন্তা হয় জানিস তো। কে জানে ঠাকুরপো বেঁচে আছে না ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। একটা সত্যি বলবি তুই? ঠাকুরপোর জন্য তোর চিন্তা হয় না? প্রাণে দুঃখ হয় না?”

তমালিকা আবার উদাস হয়ে যায়। শালবনের ভেতর থেকে রেললাইনটা দেখিয়ে বলে, “ভাবলে বড্ড কষ্ট হয় জানিস তো। ওই রেললাইন দিয়ে রেলগাড়িটা গিয়েছিল। বাবাকে কতবার বলেছিলাম, এক বার গুসকরা ইন্সটিশনে নিয়ে চলো। গুরুদেবকে দেখব। জানিস সই, তখন কিন্তু এক বারও ভাবিনি গুরুদেব শেষবারের মতো রেলগাড়ি চেপে চলে যাচ্ছেন। ভাবতাম, কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে গিয়ে শরীর ভাল করে ঠিক আবার ফিরে আসবেন। রবি যে ওই দিনের শেষের সূর্যর মতো অস্ত যেতে চলেছেন বুঝিনি। দ্যাখ দেখতে দেখতে বছর ঘুরে আর-একটা শ্রাবণ চলে এল। কতদিন হয়ে গেল গুরুদেব নেই।”

জ্যোৎস্না এত কথার মারপ্যাঁচ বোঝে না। সোজা কথা একটাই জানতে চায়। ছোট ঠাকুরপো ওর বুকের মধ্যে রয়েছে কিনা। তমালিকা চেয়ে রয়েছে পশ্চিমে রেললাইনের দিকে। রেললাইনটা পার করে সূর্য অস্ত যাবে। কিন্তু আত্মমগ্ন মেয়েটা খেয়াল করেছে কি, ডুবন্ত সূর্যর দিকে ধীর লয়ে এগিয়ে আসছে কালো একটা মেঘ?

“চল, তোর কাব্য অনেক হয়েছে। এখুনি আবার বৃষ্টি আসবে। ঘরে পৌঁছোতে পৌঁছোতে ভিজে একশা হলে মা আর কোনও দিন আসতে দেবে না।”

তমালিকার হাত ধরে টেনে জ্যোৎস্না শালবনের বাইরে নিয়ে এল। বাড়ি ফেরার পথ বৃষ্টিতে লাল কাদা কাদা হয়ে আছে। তার মধ্যে দু’জনে একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করল।

জ্যোৎস্না কাদা মাথা রাস্তাটা ভাল করে পরখ করে বলল, “সই, এ কিসের দাগ? গরুর গাড়ির চাকার দাগ তো নয়।”

তমালিকা বিস্মিত গলায় বলল, “মনে হচ্ছে মোটর গাড়ির।”

ব্যাপারটা চিন্তার। মোটর গাড়ি এই গ্রামে কখনও আসে না। এলেও বছরে এক-আধবার পুলিশের গাড়ি। তা হলে কি আবার পুলিশের গাড়ি এল? কী হল আবার? দুশ্চিন্তায় দু’জনে হাঁটার গতি বাড়াল। তবে বাড়ির একটু কাছাকাছি আসতেই দূর থেকে গাড়িটা দেখতে পেল তমালিকা। কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ বাড়ল। এ গাড়ি তো পুলিশের গাড়ি নয়।

বাড়ির উঠানে পা দিতেই চমকে উঠল তমালিকা। বাড়ির উঠানে তখন বেশ ভিড়। বাবার চেয়ারে যে বসে রয়েছেন... না এই বর্ষার গোখুলির আলোতেও চিনতে একটুও ভুল হচ্ছে না, সার্ভেয়ারবাবু। জ্যোৎস্না মুখের উপর এক হাত ঘোমটা টেনে নিল। তারও চিনতে ভুল হচ্ছে না সার্ভেয়ারবাবুকে। সার্ভেয়ারবাবুর একটু দূরে শাওড়ি হতে দিয়ে পড়ে রয়েছেন। আর স্বশ্রমশাই সার্ভেয়ারবাবুর পা-দুটো জড়িয়ে হাউ হাউ করে কেঁদে চলেছেন, “হুজুর, আমার ছেলোটাকে কোথায় পাব?”

প্রবল অস্বস্তিতে পড়েছে শুদ্ধশীল। অসহায় চোখে এ দিক ও দিক তাকাতে চোখে পড়ল সেই মুখটা, যার জন্য এখানে ছুটে আসা।

১৪

আমার জীবন নিয়ে আমার কোনও সমস্যা নেই। সমস্যা নেই ঘুম নিয়েও। এমনিতেই রাত্রি নটার পর অন্য গ্রামের মতোই আমাদের গ্রামও নিব্বম হয়ে যায়। সাড়ে নটার মধ্যে শুয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ বই পড়ি। ইচ্ছে হলে পুরনো ডায়েরিটায় হাবিজাবি লেখার চেষ্টা করি। তার পর ঘুম পেলে ঘুমিয়ে পড়ি। আজও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। কাল সকালে আবার বর্ষমানের ব্যাঙ্কে যাব মায়ের সই করা কেওয়াইসি জমা করে বাবার শেষ ফিক্সড ডিপোজিটটা ভাঙতে। রোজ সকালে নিতুকাকা এসে শুকনো মুখে বসে থাকে। মুখে কিছু বলে না। কিন্তু আমি জানি নিতুকাকা কিসের আশায় রোজ আসে। নিতুকাকার হাতে কিছু টাকা দিতে পারলে ওর দুশ্চিন্তাটা কমে। জানি না কাল বর্ষমানে ব্যাঙ্কের কাজটা মিটবে কিনা। ব্যাঙ্ক হয়তো আবার কিছু ফিকির খুঁজবে। এসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। কিছু একটা বনবন করে পড়ল কি? ঠিক বুঝতে পারলাম না কোনও স্বপ্ন দেখছিলাম নাকি সত্যিই বাড়ির মধ্যে কিছু পড়ে আওয়াজটা হল? এখন পৌষ মাস। শীতকালে নিব্বমটা আরও ঘন। অনেক দূরের আওয়াজও কানের কাছে স্পষ্ট হয়ে কাছের মনে হয়।

মোবাইলটা অন করে দেখলাম পৌনে একটা। নাহ, আর কোনও অন্য রকম আওয়াজ নেই। আওয়াজের অনুরণনও নেই। ভেতরের অন্ধকারে দেওয়াল ঘড়ির কাঁটার টিক টিক আওয়াজ। বাইরেও চেনা আওয়াজ। সাইটে পাইলিংয়ের কাজ হচ্ছে। গুম গুম আওয়াজ। আর সেটা ছাপিয়ে বিঝির সুরেলা আওয়াজ বাজছে।

ঘুমটা ছুটে গেল। শুয়ে শুয়েই জানলা দিয়ে বাইরে দিকে তাকলাম। কয়েকদিন পরে বোধ হয় পূর্ণিমা। আকাশে ভেসে রয়েছে বাকবাকে রূপোলি চাঁদ। তাকে ঘিরে ঝিকমিকি তারা। কয়েক টুকরো সাদা মেঘ অলস হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। এপাশ ওপাশ করছি। রাতে ঘুম না এলে ঘড়ির সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টার কাঁটাগুলো ভারী হয়ে ঘুরতেই চায় না। এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। একেবারে স্পষ্ট।

কান খাড়া করলাম। শব্দটা মাত্র ওই দু’-তিনবারই। আমার উপরের ঘরটা তালা দেওয়া আছে। পাশের ঘরটায় ঈশা থাকে। হাবুদাকে দিয়ে ওই ঘরটা খালি করে মা জিনিসপত্তর আমার উপরের ঘরে রাখিয়েছে। এর পর আর বিছানায় শুয়ে থাকা যায় না। উঠে দালানে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়লাম। সিঁড়ির দরজাটা খোলা। যত দূর মনে পড়ছে মা ঈশাকে বলেছিল, রাতে উপরে উঠে যাওয়ার পর সিঁড়ির দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতে। সেটা ঈশা করে কিনা জানা নেই। তবে আমাদের কলঘরটা একতলায়। তার দরজাটা বাইরে থেকে শিকল তোলা। তা হলে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে কি এক বার দেখা উচিত? পর মুহূর্তে নিজেকে সন্দ্বরণ করে নিলাম।

দালান থেকে উঠানে নেমে এলাম। দোতলার দিকে তাকলাম। ঈশা যে ঘরটায় থাকে তার জানলাগুলো খোলা। অন্ধকার। পাশের ঘরের জানলাগুলো বন্ধ। কিন্তু খড়খড়ি দিয়ে কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না। মায়ের ঘরে এলাম। মা দরজা খুলেই শোয়। মা অকাতরে ঘুমচ্ছে। মশারিটা তুলে মাকে অল্প নাড়িয়ে জাগলাম। মা ধড়ফড় করে উঠে বলল, “কী হয়েছে মনা?”

“কিছু হয়নি মা। ঘাবড়িয়ে না। এমনি ঘুমটা একটা আওয়াজে ভেঙে গেল। মনে হল দোতলা থেকে একটা আওয়াজ এল। এক বার উপরে গিয়ে দেখি।”

মা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, “চোর এল নাকি?”

হাসলাম, “আমাদের আম গাছটায় আম চুরি করতে ছাড়া কোনও চোর কোনও দিন এসেছে? আর এখন তো আমার মুকুলও আসেনি।”

“এখন ওই হোটেলের কাজে অনেক বাইরের লোক আসছে। দেখলি তো চোরেরা রাতে এসে আমাদের ধান লুণ্ঠগাট করে নষ্ট করে দিল। চল গিয়ে দেখি। সোমথ একটা মেয়ে আছে ঘরে।”

বিরক্ত গলায় বললাম, “সোমথ মেয়ে! এতদিনে তোমার চৈতন্য হল? এই জন্য বলেছিলাম এই সব ভাড়া দেওয়ার ঝামেলায় যেয়ো না।”

ঠিক এই সময় বাইরে একটা ভট ভট করে বাইক যাওয়ার আওয়াজ পেলাম। বাইকের আওয়াজটা চেনা। গাবলুর। আমাদের বাড়ির সামনেই কি বাইকটা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল? আওয়াজটা তো বাইরে থেকেই শুরু হল। মা আমার মুখের দিকে তাকাল। বললাম, “গাবলু।”

“গাবলু, তাই না রে? মাঝে মাঝে মাঝরাতে আওয়াজ পাই। ছেলেটা শুনেছি এখন নেশাভাং করে।”

আমার ঘুম অবশ্য গভীর। মাঝরাতে গাবলুর বাইকের আওয়াজে কোনও দিন ঘুম ভাঙেনি। অথচ আজ সামান্য আওয়াজেই ঘুম ভেঙে গেল। মা ঘরের বাইরের দিকে পা বাড়াল, “চল, উপরে গিয়ে দেখি। মেয়েটা ছাদে যাওয়ার কথা বলছিল। ছাদের সিঁড়ির দরজাটা ঠিক করে বন্ধ করেছে কিনা কে জানে? নীচের সিঁড়ির দরজাটা তো বন্ধ করে না। অবশ্য কলঘরে যেতে হলে নীচে তো আসতেই হবে।”

“ছাদে কেন?”

“জামাকাপড় কেচে একটু মেলার জায়গা চাইছিল। বাসন্তীর মাও বলছিল। চল, গিয়ে দেখি।”

“থাক, তোমার আর হাঁটুর ব্যথা নিয়ে দোতলায় উঠে কাজ নেই। সিঁড়ির মুখটায় একটু দাঁড়াও। আমি উপরে গিয়ে দেখে আসছি।”

মা চিন্তিত মুখে সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। আমি উপরে উঠে

ডান দিক, বাঁ দিক দুটো ঘর দেখলাম। ডান দিকের ঘরটায় ঈশা থাকে। বাঁ দিকের ঘরটা বন্ধ। শিকল তোলা। তালা ঝুলছে। একটু ইতস্তত করে ঈশার ঘরের দরজাটায় আওয়াজ করে ডাকলাম, “ঈশা... ঈশা...”

কয়েকবার ডাকার পর ঈশার গলার আওয়াজ পেলাম, “আসছি।” দরজাটা খুলে ঘুম জড়ানো চোখে ঈশা আমাকে দেখে অবাক গলায় বলল, “কী হয়েছে সংগ্রাম?”

ঈশাকে দেখে আমার একটু অস্বস্তি হল। পরনে একটা হাত কাটা গোলাপি গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট। গেঞ্জির উপর একটা হলুদ স্মাইলি। ঠিক যেমন সূর্যটা আমাকে দেখিয়েছে।

“তুমি ঠিক আছ?” জিজ্ঞেস করলাম।

“হ্যাঁ... কেন... কী হয়েছে?”

আমার কাছে খুব জুতসই কোনও জবাব নেই। আওয়াজটা হয়তো সামান্যই ছিল। অথবা আমার মনের ভুল। এর জন্য মাঝরাতে মেয়েটাকে জাগানো হয়তো একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল।

“উপর থেকে একটা আওয়াজ পেলাম। মাও চিন্তা করছে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে।”

“সোনাকাকিমারও ঘুম ভেঙে গিয়েছে? কই আমি তো কোনও আওয়াজ পাইনি। এসো, ভেতরে এসো।”

“না। থাক। ছাদটা একটু দেখে আসি।”

“চলো, আমিও যাই। আচ্ছা, সাবধানে কিন্তু ছাদের দরজার কোণে একটা ছোট ভিমরুলের চাক আছে। জানো তো?”

ভিমরুলের চাক? কবে হল? সত্যি আমি কতদিন ছাদে যাইনি! ঈশা ঘরের মধ্যে গিয়ে গায়ে একটা জ্যাকেট চাপিয়ে এসে আমার পেছন পেছন ছাদের দিকে উঠতে থাকল। সিঁড়ির নীচ থেকে মায়ের উদ্বিগ্ন গলার আওয়াজ পেলাম, “মনা...”

“এখানে সব ঠিক আছে মা। ঈশাও ঠিক আছে। তুমি শুতে যাও। আমি আসছি।”

মোবাইলের টর্চ জ্বেলে দেখলাম সত্যিই ছাদের দরজার চৌকাঠে ভিমরুলের একটা চাক হয়েছে। পুরো দরজাটা খুললে চাকটা ভেঙে যাবে। খিলটা তুলে সাবধানে দরজাটা খুলে ছাদে পা রাখলাম। জ্যেৎমায় ভেসে যাচ্ছে ছাদটা। এরকম নির্মল জ্যেৎমা মাসের পর-মাস, বছরের পর-বছর এই ছাদটা ধুয়ে দেয়। কিন্তু আমার কোনও দিন দেখা হয়নি।

“কোনও দিন আসো না ছাদে, তাই না?”

আশ্চর্য! মেয়েটা কি মনের কথা বুঝতে পারে? ঈশা আমাকে পাশ কাটিয়ে ছাদের এক দিকের পাঁচিলের কাছে এগিয়ে গেল। নীচে ঝুঁকে কিছু দেখল। আমি ওকে কী বলতে পারি? হয় ‘চলো নীচে চলো’, না হয় ‘তোমাকে সূর্যাস্তের আগে চিবিটায় আসতে বলেছিলাম, এলে না কেন?’ এর পর আমাদের কথোপকথনটা হয়তো এরকম হবে—

‘কেন, ডেকেছিলে কেন?’

‘নিশ্চয়ই জরুরি কথা ছিল।’

‘রাতে বাড়িতে বলা যেত না?’

‘না, যেত না।’

‘বেশ, তা হলে এখন বলো।’

‘তোমাকে আমার একটাই কথা বলার আছে। তুমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।’

‘হঠাৎ?’

‘দয়া দেখানোর স্পর্ধা পেলে কোথায়?’

‘কিসের দয়া?’

‘শালিনী সিংহকে আমাকে কাজ দেওয়ার কথা কে বলেছিল?’

ঈশার মোবাইলটা বেজে উঠল। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে লাইনটা কেটে দিয়ে মোবাইলে টাইপ করতে থাকল। কাউকে কোনও মেসেজ করছে কি? এত রাতে?

“সরি,” মোবাইলে টাইপ করতে করতে ঈশা বলল, “একটু দাঁড়াও।”

বলতে চাইলাম, ‘কী খবর এত রাতে কাউকে পাঠাচ্ছ? তোমার মতলব কী জানি না। তুমি আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।’ কিন্তু কথাগুলো শেষ পর্যন্ত বলে উঠতে পারলাম না। গলাটা ঈষৎ পরিষ্কার

করে গভীর হয়ে বলার চেষ্টা করলাম, “চলো নীচে চলো।”

“প্লিজ এক মিনিট।”

ঈশা পাঁচিলে ঠেস দিয়ে মোবাইলে টাইপ করা শেষ করে মোবাইল পকেটে ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “শালিনী সিংহকে ‘না’ বলে দিলে কেন?”

“আমাকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার দয়া দেখানোর ইচ্ছে তোমার হল কেন? এটাও কি তোমার আর-একটা বদভ্যাস? বেকারের আত্মসম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলা।”

“আরে, আমি কাজ পাইয়ে দেওয়ার কে? একটা কনটেন্ট লিখে আর কত পেতে? দু’ হাজার, পাঁচ’ হাজার। হাবুদার মাইনে তার অনেক বেশি। আমি ভেবেছিলাম এখানে কেউ এক জন থাকবে যার রিসার্চটা করতে ভাল লাগবে। শালিনী সিংহ আমাকে ফোনে বলেছিলেন, এরকম কাউকে জানা থাকলে নামটা দিতে। আমি আর সে রকম এখানে কাকে চিনি? হাবুদাদের মতো কাউকে দিয়ে তো আর এই কাজ হয় না। তোমার নামটা মনে হয়েছিল, জাস্ট ক্যাজুয়ালি বলেছিলাম।”

“তুমি যেটা ক্যাজুয়ালি বলছ সেটা উনি সিরিয়াসলি নিয়েছেন। কেন আমার নামটা মনে হল?”

“তোমার হাতে মাঝে মাঝে একটা ডায়েরি দেখি। নিশ্চয়ই লেখো। যাই হোক, আবার বলছি তোমার নাম কোনও রেকর্মেণ্ড করিনি ক্যাজুয়ালি রেফার করেছিলাম মাত্র। তাতে যদি তোমার আত্মসম্মানে কোনও আঘাত লেগে থাকে, অয়্যাম এক্সট্রিমলি সারি।”

“তুমি ভাবছ আমি বুঝি না? ক্যাজুয়ালি? যে জায়গার কোনও ইতিহাসই নেই, সেই জায়গার ইতিহাস খোঁজা! এক দিলে অনেকগুলো পাখি। মাকে বোঝানো, আমাকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা। আর কোম্পানির কাজে আমাকে সূচ হয়ে ঢুকিয়ে আবার ওই চিবিটা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা। ওটার উপর তোমাদের কী লোভ, তোমাদের অফিসে গিয়ে ফ্লেক্সের ছবিতেই দেখে এসেছি।”

ঈশা বলল, “ফ্লেক্সের ডিজাইনটা আমারই করা। চিফ আর্কিটেক্টের অরিজিনাল প্ল্যানে ইচ্ছে ছিল ওখানে একটা পোড়া মাটির মন্দির করা। আমি যে গাছের ডিজাইনটা করেছি, তার কোনও মানে বুঝেছ?”

ডালে ডালে পাখি বসার ডিজাইনটা আমি মাথাতেই রাখিনি। এক বলক দেখেই মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল। ওখানে স্থাপত্যটার একটাই অর্থ হয়, চিবিটা ওরা আমার থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

অল্প হেসে ঈশা বলল, “শোনো, আমি হচ্ছি আমাদের কোম্পানির একমাত্র এমপ্লয়ি, যে চায় না চিবিটা বাকি জমিটার মতো কৃত্রিমতায় ঢেকে যাক। শুনে অবাক হচ্ছ তো? কিন্তু আমি সত্যিই সেটা চাই। কেন জানো? এই জায়গায় সত্যিই অনেকগুলো ইতিহাস আছে। হয়তো একটার সঙ্গে আর-একটা জুড়ে আছে। সব কিছুই কেন্দ্রস্থলে আছে কিন্তু চিবিটা। অনেক অনেক গল্প লুকিয়ে আছে চিবিটার মধ্যে।”

আমি অবাক হয়ে ঈশার দিকে তাকিয়ে আছি। ঈশা একটু থেমে বলতে থাকল, “কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট আমি কলকাতার অফিসে দেখেছি। এই জমি কেন উর্বর নয়? মাটিতে অদ্ভুত কিছু মেটিরিয়াল আছে। এই অঞ্চলেই শুধু নয়, পৃথিবীতেও রেয়ার। কখনও উষ্ণা পড়েছিল কি? না, উষ্ণা পড়লে বড় গর্ত হত। তার উপর আশি বছর আগেও এখানে একটা ঘন শালবন ছিল। অনুর্বর জমিতে শালবন? ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত নয় কি? ইকো ভিলেজ এক বার তৈরি হয়ে গেলে এসব চিরকালের মতো কৃত্রিমতার চাদরের তলায় ঢাকা পড়ে যাবে। চিরতরে ঢাকা পড়ে যাবে তমালিকা, শুদ্ধশীল, সমীরণ, জ্যেৎমা...”

॥ ১৫ ॥

বিরশি বছর আগে

শুদ্ধশীল দু’ হাত দিয়ে ধরে বলরামকে উঠিয়ে বলল, “আপনি ব্যোজোষ্ঠ। এভাবে আমার পায়ে হাত দিয়ে অপরাধ বাড়াবেন না।”

বলরাম আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে হাত জোড় করে সজল চোখে হাটু গেড়ে বসে বলতে থাকলেন, “অপরাধ আমার। আমার সাত পুরুষের। চোন্দো পুরুষের। না হলে আমার কুলান্ধর ছেলে আপনাকে

গুলি করে মারতে চায়? ঈশ্বর করুনাময়। আপনি জীবিত। দয়া করে শুধু বলুন, সে কোথায়? সে কি বেঁচে আছে এখনও?”

“শুনুন, আপনার ছেলে গুলি ছুটিয়েছিল ঠিকই। তবে আমার দিকে তাক করে নয়। ব্যাপারটা একটু কাকতালীয় ছিল। কিন্তু আপনার ছেলে ধরাও পড়ে গিয়েছিল। স্বীকার করেছিল ও স্বদেশি করে। চাঁদমারি অনুশীলন করতে গিয়েছিল। ও ছিল সিভিলিয়ান। তাই মিলিটারিরা ওকে পুলিশের হাতে দিয়ে দেবে ঠিক করেছিল।”

বলরাম কাতর গলায় বললেন, “কোথায়? আমি কত থানা-দারোগার কাছে খোঁজ করেছি, কেউ সন্ধান দিতে পারেনি। বলেছে মিলিটারিরা জানে। কোথায় যাব বলুন?”

শুদ্ধশীল আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল, “বেশ। আমি কথা দিচ্ছি আমি যথা সম্ভব খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করব। আপনাদের একটা কথা বলি। এটা সত্যি যে আমি ইংল্যান্ডের অধীশ্বর রাজার আনুগত্যের চাকরি করি। কিন্তু আমার ধর্মীতে বইছে ভারতীয় রক্ত। আমিও মনে প্রাণে চাই আমরা স্বাধীন হই। আপাতত আমার ভটচাজমশাইয়ের সঙ্গে একটা দরকার ছিল, সেটা মিটিয়ে নিতে দিন। বর্ষা বাদলের দিন। আমাকে আবার ফিরে যেতে হবে। এমনিতেই রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় আসতে বেলা গড়িয়ে গেলা।”

ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য এবার হাল ধরলেন। অতিথি এসেছেন তাঁর বাড়িতে বিশেষ কাজে। গ্রাম সেখানে মেলা বসিয়ে দিয়েছে। গলা চড়িয়ে একে একে সবাইকে বিদেয় করলেন। আকাশ তখন অন্ধকার হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে। জোলো একটা বাতাস বইছে। ক্ষিতীশ বললেন, “হুজুর, ভেতরের ঘরে চলুন।”

“আপনাকে আমি আগেও বলেছি ভটচাজমশাই, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ। আমাকে হুজুর বলে সম্বোধন করলে বড় অস্বস্তি হয়। আমি ইংরেজ সরকারের এক জন সার্ভেয়ার মাত্র। আপনি অক্লেশে আমাকে শুদ্ধশীল বলতে পারেন। যাক, আপনাকে কাজের কথাটা বলি। আমি যখন এখানে ছিলাম, আপনাদের বাড়িতে এসেছিলাম, আপনি ঠিকাদারি করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। সেই আগ্রহ কি আপনার এখনও আছে?”

ক্ষিতীশের চোখদুটো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বিশ্বযুদ্ধের সময় ঠিকাদারি করে বড়লোক হওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তার মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল সেইদিনই যেদিন বিড়দার প্রান্তর থেকে মিলিটারিরা ক্যাম্প তুলে চলে গিয়েছিল। সেই স্বপ্নের যেন আবার পুনর্জন্ম হতে চলেছে।

“নিশ্চয়ই সার্ভেয়ারবাবু... হুজুর...”

“একটু চা পেতে পারি?”

“আজ্ঞে... ছি ছি... আমি তো...তপী...তপী...” ক্ষিতীশ স্বাভাবিক ভাবেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তার পর চায়ের বন্দোবস্ত করে এসে হাত কচলাতে থাকলেন, “বিষয়টা যদি আর-একটু বিস্তারিত শোনা যায়।”

শুদ্ধশীল চেয়ারে গাটা ঈষৎ হেলিয়ে বলতে শুরু করল, “আপনি তো বিশ্বযুদ্ধের সব খবর রাখেন। জাপানিরা কী ভাবে আগ্রাসন করে চলেছে, আপনার অজানা নয়। জাপান রেঙ্গুন পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে। কিন্তু মিত্রশক্তিতে আমেরিকা যোগদান করার পর জাপানকে প্রতিহত করতে মিত্রশক্তি ক্রমশ সফল হচ্ছে। গত কয়েক মাসের ঘটনাই দেখুন। প্রথমে নিউ গায়ানায় কোরাল সমুদ্র যুদ্ধে মার্কিনিরা জাপানিদের সম্পূর্ণ প্রতিহত করে দিয়েছে।”

ক্ষিতীশের স্মৃতিশক্তি প্রখর। মাত্র কয়েক মাস আগের এই সমুদ্র যুদ্ধের কথা মনে পড়ায় মাথা সম্মতির মাথা বাঁকালেন।

“ভটচাজমশাই, পার্ল হারবার যেভাবে বিমান দিয়ে ধ্বংস করেছিল জাপানিরা সেভাবেই নিউ গায়ানায় নৌবহর দিয়ে মোরেসবি নৌবন্দর ধ্বংস করে আমেরিকাকে বিপাকে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। এই যুদ্ধে সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার যেটা হয়েছে সেটা জানেন কি?”

না, বিস্তারিত অত খবর ক্ষিতীশ জানেন না। সেটা শুনতে হল শুদ্ধশীলের কাছ থেকেই।

“সমুদ্রের উপর দু'দেশের মুখোমুখি নৌবহর। জাপান বনাম আমেরিকা। কিন্তু দু'দেশের নৌবহর থেকে নৌবহরে একটাও

গোলাগুলি ছোড়া হয়নি। পুরো যুদ্ধটাই হয়েছে আকাশে আকাশে। অর্থাৎ বিমানযুদ্ধ।”

তমালিকা চা করে নিয়ে আসতে গিয়ে সেই দরজার পাশে আটকে গিয়ে কান পেতেছে। এভাবেই তো শোনা অভ্যাস যুদ্ধের গল্পের। আর সার্ভেয়ারবাবুর জ্ঞান, বাচনভঙ্গি তো অতুলনীয়।

“এই বিশ্বযুদ্ধ তাই আকাশের যুদ্ধ। যে আকাশে যত পারদর্শী বলীয়ান হবে সেই জিতবে। এই সার কথাটা বিলেত, আমেরিকা, জার্মানি, রাশিয়া থেকে জাপান সবাই বুঝে গিয়েছে। ভাবছেন এত গল্প কেন বলছি? কারণ আপনি যুদ্ধের খবর রাখেন। যুদ্ধের খবর সম্পর্কে আগ্রহী।”

“তা আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু... আজ্ঞে... ঠিকাদারির বিষয়টা...”

দরজার পাশে চায়ের পেয়ালা হাতে মেয়েকে চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভগবতী তাড়া দিলেন, “কী রে, চা-টা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? জুড়িয়ে যাবে তো। একেই বাদলার দিন। যা, দিয়ে আয়। লুচি-বেগুনভাজা ভাজতে হবে।”

তমালিকা চায়ের পেয়ালাটা শুদ্ধশীলকে দিতেই শুদ্ধশীল পেয়ালাটা হাতে নিয়ে ওর চোখের দিকে তাকাল। মেয়েরা পুরুষমানুষের চোখের মুগ্ধতার ভাষা বোঝে। তমালিকার গাল ঈষৎ লাল হল। কানেও যেন হালকা একটা হালকা।

শুদ্ধশীল তমালিকার দিকে চেয়ে বলল, “আপনাকে একটা জিনিস ফেরত দেওয়ার ছিল। সেটাও আমার আজ আসার আর-একটা কারণ।”

শুদ্ধশীল চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে সঙ্গে রাখা ব্যাগটা খুলে একটা বই বের করল। মলাট দেওয়া বইটায় মুক্তোর মতো হাতের লেখায় ফুটে রয়েছে, ‘পুরবী – শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর’।

শুদ্ধশীল বইটা এগিয়ে ধরল তমালিকার দিকে। তমালিকা বইটা নিতেই ক্ষিতীশ বলে উঠলেন, “এ বই আবার আপনি কষ্ট করে ফেরত দিতে এলেন কেন?”

“কারণ, ফেরত না দিলে পরের বইটা যে আর পাব না।”

শুদ্ধশীলের মুখের মুচকি হাসি দেখে তমালিকার মনে হল কানের কাছে হালকাটা আরও বাড়ল।

“আপনি অতিশয় সজ্জন,” ক্ষিতীশ তোষামোদির গলায় বললেন।

“না, না। বইটা পড়ে ফেরত দেওয়াটা তো আমার কর্তব্য। আসলে হয়েছিল কী, আপনাকে বলেছিলাম বোধ হয়, এখানে আমার সার্ভের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। রিপোর্ট পাঠিয়ে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলাম। তার পর সেইদিন যেদিন গুলি চলল, নির্দেশ এল আমাকে যেন তৎক্ষণাৎ পানাগড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে আর সুযোগ পাইনি বইটা ফেরত দিতে আসার। মিলিটারিরাও এখানে যে উদ্দেশ্যে সার্ভে করিয়েছিল তার উপযুক্ত মনে না করে ক্যাম্প তুলে নিয়েছিল। ফলত আমারও আর এখানে আসার সুযোগ হয়নি।”

মা চা দিয়ে এসে লুচি ভাজতে বলেছে। সার্ভেয়ারবাবু বাদলার দিনে বেশিক্ষণ থাকবেন না, আগেই বলে রেখেছেন। বাবা বলেছে তার আগে যথাযোগ্য অতিথি আপ্যায়ন করার। কিন্তু তমালিকা যে কিছুতেই যেতে পারছে না।

ক্ষিতীশের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। ভেবেই নিয়েছিলেন বিড়দার প্রান্তরে মিলিটারিরা আবার ক্যাম্প পাতবে। শালবন কাটার ঠিকাদারি পাওয়া যাবে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, “এই জায়গাটা উপযুক্ত হল না?”

“না,” মাথা নাড়ল শুদ্ধশীল, “হতেই পারত। কিন্তু শালবনের মধ্যে ওই খালটা বাদ সেবেছে।”

“কাজটা কী?”

“বিমান ওঠা নামার জন্য রানওয়ে তৈরি করা। এয়ার স্ট্রিপ।”

ক্ষিতীশের চোখ কপালে উঠল, “এই পাড়াগাঁয়ে মিলিটারিরা বিমানবন্দর করবে?”

“আপনি যেটা বাংলার পাড়াগাঁ ভাবছেন, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার গুরুত্ব অপরিমীম। শুধু এই বর্ধমানই নয়, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম পুরো অঞ্চলটাই।”

এত যুদ্ধের খবর রাখেন ক্ষিতীশ কিন্তু এটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছে



না। হলধর একটা কথা মাঝে মাঝেই বলত, ব্যাটা চার্চিল যুদ্ধটা এবার এইখানে কেন্দ্র করে করবে। সেটাই কি সত্যি হতে চলেছে?

শুদ্ধশীল বলতে থাকল, “জাপানি পদাতিক এবং নৌবাহিনীর উপর কড়া নজরদারি করার জন্য তাই একটাই উপায় দেখা গিয়েছে। আকাশপথ। মার্কিনিরা তাই ঠিক করেছে বাংলায় বেশ কয়েকটা বিমানঘাঁটি করবে। গুসকরার কাছে এক জঙ্গল কেটে সেই বিমানঘাঁটি করার সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গিয়েছে। কাজও শুরু হয়ে যাবে। আমার নতুন পোস্টিং ওখানেই হয়েছে।”

“গুসকরার কাছে কোথায়?”

“গুরগ্রাম... নাম শুনেছেন?”

“বিলক্ষণ। আমার বিড়দার চেয়ে অনেক ছোট গাঁ। এখান থেকে বারো চোদ্দো ক্রোশ দূর হবে।”

“আপনি আগ্রহী থাকলে রানওয়ে করার কাজে যে স্থানীয় ঠিকাদারদের খোঁজা হচ্ছে, আপনার নামটা সুপারিশ করতে পারি।”

“রানওয়ে... মানে...”

“বিমান ওঠানামার জন্য লম্বা সিমেন্টের শক্তপোক্ত রাস্তা।”

ক্ষিতীশ আর বিশেষ কিছু ভাবলেন না। ঠিকাদারি করার স্বপ্নটা তখন মনের মধ্যে চকচক করতে আরম্ভ করে দিয়েছে। শুদ্ধশীলকে আপ্যায়নের কোনও ক্রটি রাখলেন না। করজোড়ে বারবার বলতে থাকলেন, দু’-একদিনের মধ্যেই ওরগাঁ যাবেন।

টিপ টিপ করে আবার বৃষ্টি শুরু হল। শুদ্ধশীল বলল, “এবার আসি।”

“এই রাতে যাবেন? পথে যদি আবার গাড়ি খারাপ হয়? তার চেয়ে রাতটা এখানেই বিশ্রাম করে যান।”

“না। অসুবিধে হবে না।”

বিদায় নেওয়ার সময় তমালিকা এগিয়ে এল। নিচু গলায় বলল, “আজ কোনও বই নেবেন না?”

ক্ষিতীশ যথারীতি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, “হ্যাঁ, দে দে। উনি একলা মানুষ থাকেন।”

শুদ্ধশীল বলল, “দেবেন বলছেন? বেশ, তা হলে আপনার ভাললাগা

বই-ই একটা ধার দিন।”

তমালিকা দ্রুত পায়ে ঘরের মধ্যে থেকে একটা বই নিয়ে এল। বইটার নাম ‘শেষ সপ্তক’।

বইটা নিয়ে শুদ্ধশীল মোটরগাড়ি করে চলে গেল। কিন্তু তমালিকার মনের মধ্যে একটা ঘোর রেখে গেল। তমালিকা ঘরের মধ্যে থেকে অদ্ভুত একটা সঙ্গীত শুনতে থাকল। মোটরগাড়ি চলে যাওয়ার আওয়াজ। বৃষ্টির শব্দ। মৃদুমন্দ মেঘের ডাক। শুদ্ধশীলের ফেরত দিয়ে যাওয়া ‘পুরবী’ বইটা খাটের উপর ছিল। ওটা আলমারিতে তুলে রাখতে হবে। বইটা নিয়ে মলাটের উপর কিছুক্ষণ আলতো হাত বোলাল। কী রকম যেন একটা অনুভূতি পাচ্ছে। লণ্ঠনের সামনে বসে আলগোছে বইটা খুলল।

যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে; এই জীবনের সকল সাদা কালো
যাদের আলো-ছায়ার লীলা; সেই যে আমার আপন মানুষগুলি
নিজের প্রাণের স্রোতের পরে আমার প্রাণের বরণা নিলো তুলি;
আনমনায় একটা শিহরন নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল তমালিকা।
ওল্টাতে ওল্টাতে একটা পাতায় এসে চোখ কুঁচকে উঠল। কবিতার নাম,
লীলা-সঙ্গিনী।

দুয়ার-বাহিরে যেমনি চাহি রে

মনে হ’লো যেন চিনি,—

কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,

ছিলে লীলা-সঙ্গিনী?

কিন্তু এই পাতাটা এমন কেন? পাতায় লেগে রয়েছে লাল কাদামাটি। সেটা যেন পরিষ্কার করতে গিয়েও ছোপ রেখে গিয়েছে।

৥ ১৬ ৥

ব্যাঙ্কের ওই মায়ের ফোটো আর সই করা কাগজ নিয়ে বাবার শেষ ফিল্ড ডিপোজিটটা ভাঙানোর কাজে আজ বর্ধমান যাব ঠিক করেছিলেন। দশটা নাগাদ যখন জলখাবার খেয়ে ঝোলায় সব কাগজপত্র নিয়ে

বেরোনোর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, ঠিক তখনই এল ঈশার ফোনটা।

“হ্যালো সংগ্রাম, ডিয়ার, একটা উপকার করে দেবে?”

ঈশার নম্বরটা আমি ওর নাম দিয়ে সেভ করে রেখেছি। সেদিন রাতে আমরা একে অপরের ফোন নম্বর বিনিময় করে রেখেছিলাম। তার অবশ্য একটাই উদ্দেশ্য ছিল। রাত্রে যদি কোনও প্রয়োজন হয় ও আমাকে ফোন করতে পারবে। কিন্তু তার পর কেউ কাউকে ফোন করিনি। এই প্রথম ঈশার ফোন। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ঈশা অল্প ছটফটে আদুরে গলায় বলে উঠল, “প্লিজ... প্লিজ... ডিয়ার...”

প্লিজ, ডিয়ার এই শব্দগুলোর মধ্যে অদ্ভুত এক আকৃতির সুর। তবু নিজেকে বেঁধে রেখে রসকষহীন গলায় বলার চেষ্টা করলাম, “আমি একটু বেরোছিলাম। কী হয়েছে বলো?”

“আরে, আমাকে আজকে অফিসের কাজে দুর্গাপুরে যেতে হচ্ছে আর আজকেই স্পন্দন আসছে। কোনও মানে হয় বলো? ছুট করে কাজের দিন আসছে। আমি ওকে বারবার বলেছিলাম রবিবার আসতে। কাল রাতেও চ্যাট হয়েছে। এই একটু আগে ফোন করে বলছে, ও নাকি শক্তিতে ব্রেকফাস্ট করছে। আসছে।”

“কে স্পন্দন?”

“ও তোমাকে স্পন্দনের কথা আগে বলিনি না? লং স্টোরি। বলব। আপাতত টু কাট ইট শর্ট, তোমাকে বলেছিলাম না, আমার কিছু জিনিসপত্র গ্যাজেটস আনব। সেগুলোই নিয়ে আসছে।”

“তো, আমি কী করব?”

ঈশা গলাটা আবার আদুরে করে আবদার করতে থাকল, “প্লিজ ডিয়ার, একটু রিসিভ করে নিয়ো। আর একটু ওকে ওয়েট করিও। আমি দেখছি কত তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারি।”

আশ্চর্য! আমাকে এভাবে বলছে কেন? এভাবে ‘ডিয়ার ডিয়ার’ বলে কখনও আমাকে বলেনি। আজকেই প্রথম। কিন্তু যার কথা বলছে সে তো ওদের সাইট অফিসে গিয়েই অপেক্ষা করতে পারে। হাবুদা আছে জিনিসপত্র রেখে দেওয়ার জন্য। ও নিজেকে কী ভাবে? ইঞ্জিনিয়ার। ভাল চাকরি করে। আর আমি বেকার বলে আমার হাতে অফুরন্ত সময়? আমার কোনও কাজ থাকতে পারে না? ডিয়ার ডিয়ার বললেই হল?

“হাবুদাকে বলো।”

ঈশা যেন একটু শঙ্কিত হয়ে পড়ল, “না, না। হাবুদা নয়। আমি চাই না স্পন্দন সাইটে আসুক।”

“কেন?”

“উফ! তোমার সব প্রশ্নের কি উত্তর আমাকে দিতে হবে সংগ্রাম?”

স্পন্দন কে, আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। কিন্তু ঈশার শেষ কথাগুলোই আমাকে ভাবিয়ে তুলল। সত্যি কথা বলতে ঈশাই বা কে, কেন এত তপীঠাকুরমার কথা বলে, জাতিস্বরের মতো ব্যবহার করে তাই তো জানা নেই। খারাপ কোনও উদ্দেশ্য থাকলে তার ইঙ্গিতও এখনও কিছু পাইনি। স্পন্দন বলে যে আসছে তার কাছে কিছু জানা যাবে কি?

“ঠিক আছে। যিনি আসছেন তাঁকে তোমার ঘরে বসাতে পারি?”

“অফকোর্স। থ্যাঙ্কস আ লট সংগ্রাম। আমি দেখছি কত তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি।”

ফোনটা ছেড়ে মায়ের কাছে গিয়ে বললাম, “মা, ঈশার ঘরের তালার চাবিটা এক বার দেবে?”

মা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কেন রে?”

“ওর কে এক বন্ধু আসবে। ওর ঘরে বসাতে হবে।”

“বন্ধু? কই সকালে কিছু বলল না তো।”

“আমাকেও আগে বলেনি। এই একটু আগে ফোন করে বলল।”

মা চিন্তিত মুখে বলল, “কিন্তু চাবি তো ঈশার কাছে।”

“তোমার কাছে ডুপ্লিকেট নেই?”

মা ঘরে গিয়ে একটা চাবির গোছা এনে বলল, “এটার মধ্যে দেখ দেখি মনা, আছে কিনা।”

চাবির গোছাটা নিয়ে দোতলায় এলাম। ঈশার ঘরের তালার দিকে নম্বর মিলিয়ে ডুপ্লিকেট চাবিটা বের করেও থমকে দাঁড়লাম। এটা ঠিক হচ্ছে কি? একটা মেয়ের অবর্তমানে ওর ঘরের তালার খুলে ঢুকব? তার

চেয়ে ওই স্পন্দন না কে যেন আসছে, ওর সামনেই তালার খুলে ওকে বসতে বলব।

নীচে নেমে আসতে যাচ্ছিলাম। হটাৎ উল্টোদিকের তালার বন্ধ দরজাটার দিকে চোখ পড়ল। ঈশাকে থাকতে দেওয়ার জন্য ওর ঘরটা ফাঁকা করে হাবুদা অনেক জিনিস এই ঘরে ঢুকিয়েছে। তার পর এই ঘরটায় ঢোকাই হয়নি।

ঘরের তালার খুললাম। ঘরটায় এখন গাদাগাদি করে জিনিস ঠুসে রেখেছে হাবুদা। ধুলোও জমেছে। ভ্যাপসা একটা বন্ধ ঘরের গন্ধ। একটু আলো বাতাস ঢোকানোর জন্য জানলাদুটো গিয়ে খুললাম। ঘরে আলো ঢুকতে প্রথমেই চোখে পড়ল বাবার বইয়ের আলমারির ওপর খাড়া করে রাখা তপীঠাকুরমার সাদাকালো ফোটোটা।

ফোটোটোর সামনে গিয়ে দাঁড়লাম। এত মন দিয়ে খুঁটিয়ে কোনওদিন ফোটোটা দেখিনি। তপীঠাকুরমার যৌবনের ফোটো। খুব সুন্দরী ছিলেন। ভীষণ বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। মনে মনে তপীঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনাকে নিয়ে হঠাৎ এত রহস্য কেন? কী হয়েছিল আপনার?’

মনে হল তপীঠাকুরমা যেন বলে উঠলেন, ‘আচ্ছা, শুধু আমার ফোটোই কেন?’

আসলে প্রশ্নটা আমার মনের মধ্যেই বেজে উঠল। সত্যি তো, এই প্রশ্নটা কোনও দিন ভাবিনি কেন? তপীঠাকুরমা আমাদের বংশের কেউ ছিলেন না। উনি শুধু আমার বাবার ঠাকুরমার সই ছিলেন। বাবার ঠাকুরদা, ঠাকুরমার কোনও ফোটো নেই আমাদের বাড়িতে। অথচ তপীঠাকুরমার ফোটো রয়েছে। কে তুলেছিল এই ফোটো? কেনই বা বাবা যত্ন করে রেখে দিয়েছিল? এর কোনও উত্তর নেই আমার কাছে।

বাবার আলমারিটার দিকে চোখ পড়ল। বাবার বই, খাতাপত্র, ডায়েরি সব মা যত্ন করে রেখে দিয়েছে। ওর মধ্যে কী কোনও উত্তর পাওয়া যাবে? আলমারিটা খুলে বাবার লেখা খুঁজতে থাকলাম। বাবা লেখার ব্যাপারে একটু অযত্নশীল ছিল। ডায়েরি আর খাতাগুলোতে খাপছাড়া করে কখনও হিসেব লেখা, কখনও কমিউনিস্ট পার্টির কোনও আশ্বর্ষের কথা লেখা, আর বেশির ভাগটাই কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন মিটিংয়ের বিষয়বস্তুর কথা লেখা। এই সব খুঁজতে খুঁজতেই এক জায়গায় পেলাম বাবার ছোটদাদু সমীরণ ভট্টাচার্য সম্পর্কে কিছু লেখা। আর আশ্চর্য, সেখানে গায়ে গায়ে উল্লেখ আছে তপীঠাকুরমার কথাও।

“মনা... মনা...”

মা নীচ থেকে ডাকছে। নীচে নেমে এসে দেখলাম এক জন ঝকঝকে ছেলে দাঁড়িয়ে। আমি এগিয়ে যেতেই ছেলোটা হাত বাড়িয়ে বলল, “হাই আমি স্পন্দন। ইউ মাস্ট বি সংগ্রাম।”

“হ্যাঁ, আসুন।”

মাও ছেলোটাকে আপ্যায়ন করল, “এসো বাবা।”

ছেলোটা হেসে বলল, “ঈশা আপনাদের কথা খুব বলে। আপনি, সোনাককিমা। আপনারা ওকে একেবারে বাড়ির মেয়ে করে নিয়েছেন।”

মা এইটুকু কথাতেই বিগলিত হয়ে পড়ল। এর পরে এম্ফুনি নির্ঘাত ব্যস্ত হয়ে পড়বে চা আর দুটো খিন অ্যারাকট বিস্কুট দিতে।

“মনা, ওকে নিয়ে গিয়ে বসা। খুলতে পেরেছিস ঈশার ঘরটা?”

আমি চোয়াল শক্ত করলাম। ছেলোটা কী মনে করবে? ছেলোটাকে শুনিয়ে বললাম, “চাবি নেই তো। ওপরে পাশের ঘরে বসাচ্ছি।”

স্পন্দন কিছু জিনিসপত্র নিয়ে এসেছিল। সেগুলো নিয়ে উপরের ঘরে এল। একটু জায়গা করে বসার ব্যবস্থা করলাম। ঘড়ি দেখলাম। না, আজ আর কেওয়াইসির কাগজপত্র ব্যাঙ্কে জমা দিতে বর্ধমান যাওয়া হবে না। ছেলোটা মোবাইল নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ খুলে দেখতে থাকল। প্রাথমিক কৌতূহলটা মিটেছে। ছেলোটাকে উপরের ঘরে পৌঁছে দিয়ে নীচে নেমে এসে আমার ঘরে চুপ করে বসেছিলাম। দিনটা বৃথা নষ্ট হল। অথবা সত্যিই হল কি? এই যে ছেলোটা আসার আগে উপরের ঘরে বাবার লেখাপত্র, সেখান থেকে এমন কিছু তথ্য পেলাম যা আগে কোনও দিন খোঁজই করিনি। অবশ্য খোঁজ করলেই বা কী হত? তপীঠাকুরমা তো বিস্মৃতির অতলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে শুধু বাবার ঘরে দেওয়ালে একটা ফোটো হয়ে ছিলেন। কোনও দিন সেই ফোটোর চোখদুটোর দিকে

তাকিয়ে সেই চোখের ভাষায় কী লেখা আছে খুঁজে দেখিনি।

এমন সময় মা যথারীতি চা বিস্কুট নিয়ে এল। মাকে বললাম, “এত জামাই আদর করার কিছু আছে কি মা? এর পর দুপুরে কী খাবে সেটাও কি জিজ্ঞেস করে আসব?”

“আহ! মনা, তুই দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছিস। নে দিয়ে আয় চা-টা।”

চা বিস্কুট নিয়ে আবার বিরস মুখে উপরে এলাম। কিন্তু ঘরে ঢুকতে গিয়েই একটু চমকে উঠলাম। স্পন্দন তপীঠাকুরমার ফোটোর সামনে একদৃষ্টিতে চেয়ে চূপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে আমার দিকে চেয়ে বলল, “তমালিকা ভট্টাচার্য!”

বিস্ময়ে আমার মুখে ফুটে বেরল, “আপনি কী করে চিনলেন?”

আমার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিয়ে স্পন্দন বলল, “ধ্যাক্স। আমি আসলে আজকে এসেছি আপনার সঙ্গেও একটু কথা বলার জন্য যখন ঈশা থাকবে না।”

আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, “আমার সঙ্গে?”

“বলছি। আপনার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি আপনি খুবই আশ্চর্য হচ্ছেন। তমালিকা ভট্টাচার্যকে আমি কী ভাবে চিনলাম। আপনাকে দুটো ফোটো দেখাই।”

স্পন্দন মোবাইলে হোয়াটসঅ্যাপ খুলে একটা ফোটো দেখাল। ফোটোর মাথায় দেখলাম ওটা ঈশার ফরওয়ার্ড করা। তারিখটা চট করে মনে পড়ে গেল। ঈশা যেদিন হাবুদাকে পাঠিয়েছিল পাশের ঘরটা পরিকার করতে। মায়ের নির্দেশে হাবুদা যাদের নিয়ে এসেছিল তারা বাবার বইয়ের আলমারি, তপীঠাকুরমার ফোটো ইত্যাদি ওঘর থেকে এঘরে সরানোর আগেই ফোটো তুলেছিল। সেই ফোটোতেই জ্বলজ্বল করছে দেওয়ালে টাঙানো তপীঠাকুরমার ফোটো। অর্থাৎ তপীঠাকুরমার ফোটো সরানোর আগেই হোয়াটসঅ্যাপ মারফত সেটা পৌঁছে গিয়েছিল ঈশার কাছে। কিন্তু আসল বিস্ময় হচ্ছে, ফোটোটা যে তপীঠাকুরমার সেই নামটাই তো কোথাও লেখা নেই। তা হলে স্পন্দন বা ঈশা ফোটোটা যে তমালিকা ভট্টাচার্যের, চিনল কী ভাবে?

“ফোটোটা কে তুলেছিল জানেন?”

মাথা নাড়লাম, “কোনও আইডিয়া নেই।”

“ফোটোটা তুলেছিলেন শুদ্ধশীল গুহ। সম্পর্কে আমার পূর্বপুরুষ। ঈশার সঙ্গে ওঁর কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। তবে সম্পর্ক একটা আছে। দাঁড়ান, এই ফোটো আর-একটাও আছে। দাঁড়ান দেখাচ্ছি।”

স্পন্দন ওর মোবাইলের ফোটো গ্যালারি খোঁজে আর-একটা ফোটো দেখাল। অবিকল তপীঠাকুরমার এই ফোটোর মতো। শুধু ফ্রেমের ধরনটা আলাদা।

১১৭১

বিরশি বছর আগে

বিয়াল্লিশের দ্বিতীয় অর্ধে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিপাকে পড়তে থাকল। নিউ গিনি দখলের জন্য জাপান মরিয়া ছিল। নিউ গিনির মিলন বে বা রবি যুদ্ধে জাপানিদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নৌ-পদাতিক বাহিনীকে অস্ট্রেলিয়ার ফৌজরা প্রতিহত করে দিল। এই জয় মিত্রশক্তিকে বাড়তি অগ্নি জেগে জোগাল। ইংরেজ আর মার্কিনিরা বুঝতে পারল বর্মা ছাড়িয়ে পূর্ব এশিয়ায় জাপানের আগ্রাসনকে ঠেকানোর একটা বড় উপায় হচ্ছে জাপানি সেনাবাহিনীর উপর নিরস্তর নজরদারি করা এবং সুযোগ বুঝলেই আকাশ থেকে আক্রমণ করা। তাই বাংলা জুড়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কয়েকটি বিমানঘাটি তৈরি করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। পূর্ব বিহারে দুধকুন্ডি, বিষ্ণুপুরের কাছে পিয়ারাডোবার মতো বেশ কয়েকটি বিমানঘাটির মতো গুসকরার অনতিদূরে জঙ্গল কেটে গুসকরা এয়ারফিল্ড তৈরির কাজ আরম্ভ হয়েছে।

যুদ্ধের ঘনঘটায় ঠিকাদারি করে বড়লোক হওয়ার ঘটনাগুলো ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যর ওই খবরের কাগজ পড়ার অভিজ্ঞতা। বাস্তবে শুদ্ধশীলের কাছ থেকে উপায় পেয়ে পরের দিনই গরুর গাড়ি করে গিয়ে হাজির হলেন গুঁরগায়ে। সেখানে তখন মিলিটারিরা ক্যাম্প ফেলেছে।

সত্যিকারের যুদ্ধকালীন ব্যস্ততায় জঙ্গলের মধ্যে নানা মাপজোক, তদারকির চলছে। দু’এক জন ঠিকাদারকে কাজে লাগানো হয়েছে। মিলিটারি উর্দি পরা সাহেবরা তার তদারকি করছে।

অল্প খোঁজ করেই শুদ্ধশীলকে খুঁজে পেলেন ক্ষিতীশ। শুদ্ধশীল অবশ্য সাদরেই অভ্যর্থনা করল, “এসেছেন! আমি কম্যান্ডান্ট সাহেবকে বলে রেখেছি আপনার কথা।”

শুদ্ধশীল ক্ষিতীশকে কম্যান্ডান্টের কাছে নিয়ে গেল। একটা তাঁবুর মধ্যে ভীষণ লাল গম্ভীরমুখো সাহেব। ক্ষিতীশ করজোড়ে কুঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সাহেবের সঙ্গে শুদ্ধশীলের ইংরেজিতে কথাবার্তা হল। ক্ষিতীশ তার কিছুই বুঝতে পারলেন না। কথার ফাঁকে ফাঁকে শুদ্ধশীল সাহেবের প্রশ্নের তর্জমা করতে থাকল, “সাহেব জিজ্ঞেস করছেন, আপনার জঙ্গল কাটানোর অভিজ্ঞতা আছে কি না?”

আগে এই কাজ কখনও করাননি ক্ষিতীশ। তবে জঙ্গল কাটানো আর কী এমন শক্ত কাজ? কাজটা তো গাছ কাটা। ক্ষিতীশ সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন।

“সাহেব জিজ্ঞেস করছেন আপনি কতজন জোয়ান কুলি-কামারের জোগাড় দিতে পারবেন?”

ক্ষিতীশ মনে মনে বিড়দার বাগদি বাড়িরদের মুখগুলো ভাবলেন। মনে মনেই চট জলদি হিসেব করে বললেন, “পঁচিশ-তিরিশজন তো হবেই হজুর।”

“সাহেব জিজ্ঞেস করছেন, ওদের নিয়ে এখানে এসে থাকতে পারবেন কিনা?”

“মানে?”

“মানে বিড়দা থেকে রোজ রোজ যাতায়াত করতে অনেক সময় লেগে যাবে। এখানে যে সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে তাতে কুলি-কামারদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে আপনাকেও। সাহেব জিজ্ঞেস করছেন, আপনি পারবেন কিনা?”

“এখানে কোথায় থাকব?” চিন্তিত গলায় ক্ষিতীশ জিজ্ঞেস করলেন।

“সে ভার আমাদের। আমাদের ব্যারাক ছাড়াও আমরা কিছু অস্থায়ী বাড়ি তৈরি করাচ্ছি। লেবার আর ঠিকাদারদের আলাদা থাকার ব্যবস্থা হবে সেখানে। সাহেব জানতে চাইছেন আপনি কি রাজি?”

ক্ষিতীশ নিশ্চিত হয়ে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন। ব্যস, ক্ষিতীশের ঠিকাদারির কাজ পাওয়া পাকা হয়ে গেল। জঙ্গলের একটু অংশ কাটার বরাত পেয়ে গেলেন। এবং সেই কাজ করার জন্য যে টাকার প্রতিশ্রুতি পেলেন তা বছরভর নিজের বাহান্ন বিষয়ে চাষ করে যা উপার্জন হয় তার তিন গুণেরও বেশি।

একেবারে ফুরফুরে মনে বিড়দায় ফিরে এলেন ক্ষিতীশ। তিন-চারদিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে ফেলতে হবে। সন্ধ্যের দাওয়ার মধ্যমণি হয়ে যথারীতি আবার বসলেন। আজ আর যুদ্ধের গল্প নয়। দামি পান জর্দার সুবাস ছড়িয়ে বলতে থাকলেন হাতের নাগালে কী মস্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে চলেছে। তৈরি হতে চলেছে আস্ত একটা বিমানঘাটি। সেখানে নিরস্তর বিমান ওঠা-নামা করবে।

ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যের খবরের কাগজে দেখানো একটা-আধটা ফোটো দেখা ছাড়া আস্ত বিমান কখনও চোখে দেখিনি বিড়দাবাসী। এমনকি আকাশে উড়তেও না। ক্ষিতীশের কথা শুনতে শুনতে জাতপাত নির্বিশেষে যে যার মতো চোখ বুজে কল্পনায় দেখতে শুরু করল বড় বড় উড়োজাহাজ ফানুসের মতো উঠছে, চিলের মতো গ্রামের মাথায় ঘুরছে।

“খিতাদা, চলো কাল আমরা সবাই মিলে যাই গিয়ে দেখে আসি বিমান ওড়া,” হলধর প্রস্তাব দিলেন।

ক্ষিতীশ বিরক্ত হলেন, “কী শুনছিস তা হলে? এখন কোথায়? আগে জঙ্গল কাটা হবে। সিমেন্ট ঢালা রানওয়ের রাস্তা হবে। তবে তো। অনেক দায়িত্ব রে হলধর। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব করাতে হবে,” তার পর বাগদিদের দিকে তাকিয়ে বললেন, “অ্যাঁহ, তোরা কে কে যাবি নাম ঠিক করে আমাকে কাল বল।”

আজ দরজার পেছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তমালিকা শুধু নয় ভগবতীও দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। শুনতে শুনতে তাঁর কপালে গভীর

চিত্তার ভাঁজ পড়ছিল। রাব্রিবেলায় স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি অন্য গাঁয়ে গিয়ে থাকতে যাবেন?”

ক্ষিতীশ তখন ঠিকাদারির স্বপ্নে বুঁদ হয়ে রয়েছেন, “হুম।”

“ওখানে কে আপনার রান্নাবান্না দেখাশোনা করবে?”

“কেন? তোমরাও যাবে।”

“সে কী করে সম্ভব? স্বপ্নের ভিটে... নারায়ণ আছেন... তাঁর নিতাপূজা আছে...”

সে রাতেই ঠিক হয়ে গেল ভগবতী থেকে যাবেন বিড়দায় আর ক্ষিতীশ তমালিকা নিয়ে যাবেন ঠিকাদারি করতে যাওয়ার অস্থায়ী ঠিকানায়। খবরটা পরের দিনই রটে গেল গোটা গ্রামে। তমালিকার মনে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া। জীবনে এক বারই কয়েক মাসের জন্য গ্রামের বাইরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়ে কাকার বাড়ি ছিল। সে অভিজ্ঞতা, সে স্মৃতি বড়ই মধুর। আর-এক বার নতুন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ আসছে। মনের মধ্যে ভেসে উঠছে সার্ভেয়ারবাবুর মুখ। কানের কাছে যেন শুনতে পাচ্ছে তার ভরাট গলায় আবৃত্তি, ‘প্রাচীন অতীত, তুমি নামাও তোমার অর্ঘ্য; অরূপ প্রাণের জন্মভূমি, উদয়শিখরে তার দেখো আদিজ্যোতি। করো মোরে আশীর্বাদ, মিলাইয়া যাক ত্বা তপ্ত দিগন্তরে মায়াবিনী মরীচিকা...’

আবার মনের মধ্যে একটা চোরা মন খারাপ। নিজের বাড়ি, নিজের গ্রাম ছেড়ে গিয়ে অচেনা অজানা একটা জায়গায় গিয়ে থাকতে হবে। কথা বলার জন্য সার্ভেয়ারবাবুকে কি রোজ পাবে? আর উনি যদি কথা বলতে না চান, কে থাকবে ওখানে কথা বলার জন্য?

ক্ষিতীশের বাড়িতে সাজো সাজো রব। ভগবতী গোছাচ্ছেন চাল, ডাল, তেল, মশলা রান্নার জিনিসপত্র। তমালিকা দুটো তোরঙ্গ খুলে গোছাচ্ছে। একটায় নিজের জামাকাপড়। অন্যটায় নিজের প্রিয় বই, আঁকার খাতা আর যৎসামান্য প্রসাদনী। বই নির্বাচন করার সময় শুধু নিজের ভাললাগাই নয়, অবচেতনে বেছে চলেছে কোন কোন বই সার্ভেয়ারবাবুরও ভাল লাগবে।

এই তুমুল ব্যস্ততার মধ্যে দুপুরে এল জ্যোৎস্না। তার মুখটা ভার, ধমধমে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তমালিকার গোছানো দেখছিল। তমালিকা বলল, “কী রে সই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবিই শুধু? আমায় সাহায্য করবি না?”

জ্যোৎস্না তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। তার পর নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, “কুসুমবীজ নিয়েছিস?”

“এই তো দ্যাখ, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছিস। মা-ও বলছিল কুসুমবীজ শেষ হয়ে গিয়েছে।”

জ্যোৎস্না যেন এই উত্তরের অপেক্ষাতেই ছিল, “চল তা হলে।”

“কোথায়?”

“যেখানে সবচেয়ে ভাল কুসুমবীজ পাওয়া যায়।”

এক রকম জোর করেই জ্যোৎস্না তমালিকাকে নিয়ে শালবনের জঙ্গলে নিয়ে গেল। তখন বিকেল। ঢিবিটা ঘিরে গাছের ডালে কুসুমফুলগুলো সব কেমন বিষণ্ণ লাগছে আজ। দু’জনে শাড়ির আঁচলে বীজ ছাড়িয়ে ভরতে থাকল। জ্যোৎস্না ভারাক্রান্ত গলায় বলল, “তোমার মনে খুব আনন্দ, তাই না রে সই?”

“কেন?”

“নতুন জায়গায় যাবি। তোর সার্ভেয়ারবাবু থাকবেন। তাকে বই দিবি, গান শোনাবি, কবিতা শোনাবি।”

“যাহ, কী সব বাজে কথা বলছিস তুই! আমি তো যাচ্ছি বাবার দেখাশোনার জন্য।”

“আয়নায় তোর মুখটা এক বার দেখেছিস? খুশিতে বলমল করছে। ইস আমার এরকম ভাগ্য কোনও দিন হবে না।”

“কেন হবে না? তুইও আসবি। বলরামকাকা তো বাবাকে বলেছেন, ওখানে আসবেন। বড় সাহেবদের সঙ্গে সমুদার ব্যাপারে কথা বলবেন। তখন তুইও আসবি।”

“যেন আমাকে শাশুড়ি কত যেতে দেবে। তুই শুধু সার্ভেয়ারবাবুর সঙ্গেই কথা বলবি? বড় সাহেবদের সঙ্গে কথা বলবি না?”

তমালিকা অবাক হল, “আমি বড় সাহেবদের সঙ্গে কী কথা বলব?”

“কেন? ছোট ঠাকুরপোর কথা জিজ্ঞেস করবি না? কোথায় রেখেছে ওকে? বেঁচে আছে কিনা? তুই জানিস না ছোট ঠাকুরপো তোকে কতটা ভালবাসত। একটা কথা কোনও দিন বলিনি তোকে। তুই চলে যাবি তাই আজ বলছি। তুই জানিস গণপতি ঘটক তোর যত সম্বন্ধ নিয়ে আসে তার ভাংচি দেয় কে?”

“মানে...”

জ্যোৎস্না মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, “ঠাকুরপো আমায় দিয়ে লিখিয়ে পাত্রদের বাড়িতে চিঠি পাঠায়। ঠাকুরপো গণপতি ঘটককে উৎকোচ দিয়ে সব ঠিকানা জোগাড় করে।”

“তোমার হাতের লেখা!” তমালিকা কিছুক্ষণ স্থাপু হয়ে গেল। তার পর মুখটা কঁচকে বলল, “ছিঃ! সমুদা এত নীচ। রবি ঠাকুরের নাম নিয়ে আমার চরিত্র নিয়ে কথা বলে বেনামে চিঠি পাঠায় আমার বিয়ে ভাঙিয়ে দেবে বলে। এই সমুদা শিক্ষিত? ম্যাট্রিকুলেশন পাস? বিপ্লবী? আর সেই চিঠি তুই লিখে দিস সই?”

জ্যোৎস্না তীব্র মাথা ঝাঁকাল, “কে বলেছে তোকে তোর চরিত্র নিয়ে বাজে কথা বলে, নিজে রবি ঠাকুরকে দেখতে না পারলেও তোর রবীঠাকুরের জন্য ভালবাসার কথা বলে। তুই ঠাকুরপোর ভালবাসার কথা কোনও দিন বুঝলি না।”

॥ ১৮ ॥

এই প্রথম আমি কাউকে আমার ঢিবিটাকে দেখাতে নিয়ে এলাম। স্পন্দনের কাছে যতটুকু শুনছি একেবারে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। অবিশ্বাস্য! আর স্পন্দনের কাছে শোনার পর এই প্রথম নিজের মধ্যে ঈশার জন্য একটা অন্য রকম অনুভূতি অনুভব করছি। সেই অনুভূতি অনুকম্পার। আমার মতো সামান্য এক জন চালচুলোহীন বেকার মানুষ সত্যি কি কাউকে সাহায্য করতে পারে?

বাড়িতে স্পন্দন আমাকে সেটাই বারবার বুঝিয়েছে, “পারে, পারে... ঈশার অগাধ আস্থা, বিশ্বাস আছে তোমার উপর।”

এই কয়েক ঘণ্টাতেই স্পন্দনের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কখন যেন বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। স্পন্দন নিদ্বিধায় আমাকে ঈশার সঙ্গে ওর হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট পড়তে দিয়েছে। ইতস্তত করে সেগুলোতে চোখ বোলাতে বোলাতে আমার কোনও সন্দেহই নেই, স্পন্দনকে ঈশা যা যা বলেছে তাতে আমার সম্পর্কে ওর মূল্যায়নটা ঠিক কী। অথচ আমি মেয়েটার সঙ্গে অনেক কঠিন ব্যবহার করেছি, কখনও দুর্ব্যবহারও। তার পরেও আমার জন্য ও এত ভেবেছে। এমনকি গাবলুর একটা ফোটো পাঠিয়ে স্পন্দনকে লিখেছে, ‘আঙ্কলকে বল ইমিডিয়েটলি যেন লোকাল পুলিশকে বলে ব্যবস্থা নেয়।’ তারিখ সময় দেখে বুঝলাম এই মেসেজটাই সেদিন রাতে ছাদ থেকে করেছিল।

এই আঙ্কল হচ্ছেন স্পন্দনের বাবা। রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষকর্তা। অনিলাভ সেনগুপ্ত। ঈশার বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কাল যখন গাবলু অযাচিত হয়ে এসে বলেছিল, “তুই মাইরি আমাকে শুধু শুধু কেস খাইয়ে দিচ্ছিস। আমি কি তোর মাথায় মেশিন লাগিয়ে বলেছি, তুই জমিটা না দিলে দানা ঠুসে দেব? সম্পর্কে তো আমরা ভাই, নাকি?” তখন গাবলুর এই ব্যবহারের আচমকা পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পারিনি। এখন কারণটা স্পষ্ট হল।

একটু আগেই স্পন্দনের কাছে জেনেছি, ঈশার বাবা-মা অ্যান্ড্রিডেটে মারা যাওয়ার পর ঈশাকে অনিলাভ সেনগুপ্ত কন্যামেহে মানুষ করেছেন। অবশ্য এর পরে ওর স্পন্দনের সঙ্গে ঈশার গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা জানি না। যেটুকু হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট আমাকে স্পন্দন দেখিয়েছে, অনৈতিক হলেও আমি যেন খুঁজতে চেয়েছিলাম চ্যাটের মধ্যে ওদের সম্পর্কের কথা বুঝতে, কিন্তু কোনও আন্দাজ পাইনি।

ঢিবিটার সামনে এসে দাঁড়িলাম দু’জনে। এখন মাথার উপর সূর্য। সাইটের কাজে সম্ভবত মধ্যাহ্নে বিরতি চলছে। কী রকম অলস দেখাচ্ছে

সাইটটা। চেনা আওয়াজগুলো, চেনা কোলাহল কিছুই নেই। টিবিটার কাছে পৌঁছে দেখলাম স্পন্দনেরও সাইট দেখা নিয়ে কোনও আগ্রহই নেই। বরং এক মনে দেখতে থাকল টিবিটা। তার পরে নিজের মনেই মন্তব্য করল, “কত যে এই টিবিটার আর কুসুম গাছের ফোটা তুলে পাঠিয়েছে ঈশা! এখন এটা দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে এটা আমার কতকালের চেনা। ঠিক ঈশার মতোই। দিস ইজ দ্য গ্লেস। চলো, এখানে আমরা আর-এক বার পুরো অঙ্কটা মিলিয়ে দেখি।”

টিবিটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে স্পন্দন বলতে শুরু করল, “দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে ব্রিটিশ আর্মি সার্ভে করতে এসেছিল। সেই সার্ভে ছিল রুটিন সার্ভে। শুদ্ধশীল গুহ ছিলেন সার্ভেয়ার। তাঁর ডায়েরি থেকে জানা যায় এই অঞ্চলে অনেক জায়গাতেই তখন ব্রিটিশ আর্মি সার্ভে করাছিল। এর পরে গুঁরগ্রামে আমেরিকান এয়ারফোর্সের জন্য এয়ারফিল্ড করার কাজ শুরু হয়। নথি ঘাঁটলে দেখা যায় মূল যুদ্ধক্ষেত্রের সীমানার বাইরে নিরাপদ কোনও জায়গায় থেকে বিমানে নজরদারি বাহিনীর জন্য ডিটচমেন্ট ১০১ নামের মিশন শুরু হয়। মার্কিন বিমানবাহিনী ভারতে আসতে শুরু করে এবং বাংলার বিভিন্ন জায়গায় এয়ারফিল্ড তৈরির কাজ শুরু হয়। তবে সেই সিদ্ধান্ত হয় ১৯৪২ সালের মে-জুন মাস নাগাদ। সুতরাং এই বিড়দা বা আশপাশের গ্রামে ব্রিটিশ আর্মি কেন ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে সার্ভে করাছিল সেটা ঠিক স্পষ্ট নয়।”

আমার কাছে এইসব ইতিহাসের কোনও গুরুত্ব নেই। এই কথাগুলো একটু আগেও স্পন্দন বাড়িতে বলেছিল টুকরো টুকরো করে। এখন শুধু একটু শুদ্ধিয়ে বলছে।

“সংগ্রাম, ঈশার কোম্পানি তোমাকে কনটেন্ট লেখার অফার দিয়েছে না? এই তথ্যগুলো তোমার কাজে লাগবে।”

বললাম, “তোমাকে বোধ হয় ঈশা বলেনি যে, প্রস্তাবটা আমি গ্রহণ করিনি। আমি আগ্রহী নই।”

“বোশ। ঈশার কোম্পানির জন্য না হোক, ঈশার জন্য কনটেন্টটা তো দরকার।”

আমিও স্পন্দনের পাশে টিবিটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িলাম।

“স্পন্দন, তোমাকে একটা সত্যি কথা বলব? ঈশা যেদিন প্রথম এখানে এল, আমাদের বাড়িতে এল, আমি ওকে সন্দেহই করেছি, কী মতলবে ও এরকম করছে? ওর কোম্পানির ইন্টারেস্টের সঙ্গে এই টিবিটার তো একটাই সম্পর্ক। এটা কিনে নেওয়া। ওদের ইকো ভিলেজের অংশ করা। এখানে কী স্থাপত্য হবে তার ডিজাইন পর্যন্ত ঈশা করে রেখেছে। কিন্তু তার সঙ্গে তপীঠাকুরমা মানে তমালিকা ভট্টাচার্যের কী সম্পর্ক? পূনর্জন্ম, জাতিস্মরের অভিনয় এসবই ভেবে গিয়েছি। কিন্তু ‘কেন’র কোনও উত্তর পাইনি। যদি না আজকে তোমার কাছ থেকে...”

আমাকে থামিয়ে দিয়ে লম্বা একটা শ্বাস ফেলে স্পন্দন বলল, “এক ধরনের ক্রিপ্টোমনেসিয়া। অদ্ভুত এক মানসিক ব্যাধি। মানুষের মনের অদ্ভুত এক জাদু। মনের মধ্যে অসংখ্য তথ্য। কিন্তু সেই তথ্যের উৎস কোথায় সেটা তার মনে নেই। মনে হয়, আরে এসবই তো আমার নিজের চোখে দেখা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা। যেমন এই টিবিটা। অসংখ্য ফোটা হোয়াটসঅপ্যে ঈশা আমাকে পাঠিয়েছে। টিবিটা আমার পৃষ্ঠানুপৃষ্ঠ চেনা। কিন্তু কাল যদি আমার মাথা থেকে সম্পূর্ণ মুছে যায় যে ঈশার পাঠানো হোয়াটসঅপ্যের ফোটা থেকে আমি এই টিবিটাকে চিনেছি, আমার মনে হবেই আমি আগে কোনও দিন এখানে এসেছিলাম, টিবিটাকে আমি আগে নিজের চোখে দেখেছি। মনোবিদরা মনে করেন, অধিকাংশ জাতিস্মরারাই আসলে ক্রিপ্টোমনেসিয়ায় আক্রান্ত। তাঁরা যেটা পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে করেন, সেটা আসলে এই জন্মেরই আহত কোনও তথ্য যার উৎস তাঁরা বেমানম ভুলে গিয়েছেন।”

একটু দম নিয়ে স্পন্দন আবার বলতে আরম্ভ করল, “শুদ্ধশীল, তমালিকা বা সমীরণ, কারও সঙ্গেই ঈশার কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই, সেটা তোমাকে আগেই বলেছি। তবে সম্পর্ক আছে একটাই। শুদ্ধশীল গুহের একটা ট্রাঙ্ক। সেই ট্রাঙ্কে ছিল শুদ্ধশীল গুহের অনেক জিনিসপত্রের মধ্যে কয়েকটা ডায়েরি। উনি ছিলেন আমার মায়ের দাদু।

অত্যন্ত পরিপাটি গোছানো মানুষ ছিলেন। চমৎকার ডায়েরি লিখতেন। সেই ডায়েরিতেই আছে ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য, তমালিকা ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য, সমীরণ ভট্টাচার্যদের কথা। এমনকি গণপতি ঘটকেরও কথা। জানো, বিরশি বছর আগে একদিন সূর্যাস্তের সময়ে এখানেই তমালিকা আর জ্যোৎস্নাকে প্রথম দেখেছিলেন শুদ্ধশীল। উনি তখন এই টিবির উপর দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। তমালিকারা বলেছিলেন গুঁরা কুসুমবীজের জন্য কুসুম ফুল তুলতে এসেছিলেন। শুদ্ধশীল সেদিনই জেনে গিয়েছিলেন তমালিকা গুঁর মতোই এক রবীন্দ্রপ্রেমিক। কী সুন্দর ভাবে সেইসব কথা লিখে গিয়েছেন ডায়েরিতে। তোমাকে তো বলেইছি ঈশার বাবা আর আমার বাবা ছোটবেলার বন্ধু। ঈশা সেই কোন ছোটবেলা থেকেই আসত আমাদের বাড়ি। জানি না কবে ও হাতে পেয়ে গিয়েছিল শুদ্ধশীলের ডায়েরি।”

বললাম, “আমরা কী এক অদ্ভুত ইতিহাস ঘাঁটছি। জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য ছিলেন আমার বাবার ঠাকুরমা। বিয়ে হয়ে এই গ্রামে আসার পর প্রাণের বন্ধু পেয়েছিলেন তমালিকাকে। সেই পাতিয়েছিলেন।”

“এটাও ঈশা জানে। তোমার সম্পর্কে প্রথম ইন্ট্রোয় আমাকে লিখেছিল, ‘সইয়ের পুতি, অর্থাৎ নাতির ছেলে।’”

“আচ্ছা, তুমি যেটা বললে, ক্রিপ্টোমনেসিয়া, স্মৃতিতে তথ্যের উৎস কোথায় ভুলে গিয়েছে। ইশাকে ডায়েরিটা আর কখনও দেখাওনি?”

“বহুবার। কিন্তু মাথায় যেটা এক বার গেঁথে গিয়েছে সেটাই অটল বিশ্বাস। ডায়েরিটা দেখালে বলে এ ডায়েরি যখন লেখা হত আমি বোধ হয় সেটাও দেখেছি। ডায়েরিটা নিয়ে এসেছি। দেব তোমাকে। মেয়েটা তমালিকাকে নিয়ে বড্ড কষ্টে আছে।”

“কিন্তু তোমার কাছে যেমন শুদ্ধশীল গুহের ডায়েরিতে অনেক ঘটনার বিবরণ লেখা আছে, আমাদের কাছে তেমন কোনও তথ্যই নেই। আমার বাবার কিছু ডায়েরি খাতাপত্র আছে। সেখান থেকে জেনেছি সমীরণ ভট্টাচার্য ছিলেন জ্যোৎস্নার দেওর। পরবর্তীকালে তিনি এই গ্রামের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেননি। কলকাতায় ব্যবসা করতেন। বাবার সঙ্গে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল। বাবা ডায়েরিতে কয়েকবার উল্লেখ করেছেন, উনি তমালিকার মতো অনেককে ঠকিয়েছেন।”

“কে যে কাকে ঠকিয়েছে! শুদ্ধশীলের ডায়েরি পড়লে মনে হবে উনি তমালিকার প্রেমে পড়েছিলেন। শুধু প্রেমে পড়েছিলেন বললে সবটা বলা হবে না, রীতিমতো প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিলেন। কিন্তু গুঁর আচরণ ছিল খুব সংযত। প্রেমের তাড়নাতেই সম্ভবত ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যকে গুসকরা এয়ারফিল্ডে ঠিকাদারির কাজ পাইয়ে দিয়েছিলেন। তবে কল্পনাও করতে পারেননি, ব্যারাকের কাছে ঠিকাদারদের কলোনিতে ক্ষিতীশের সঙ্গে তমালিকাও চলে আসবেন। এর পরে দু’জনে প্রচুর নিজের মতো সময় কাটিয়েছিলেন।”

“ঈশা সেসব জানে?”

“ডায়েরিটা তো পড়েছিল। যখন প্রথম পড়েছিল তখন ওর সম্ভবত পিউবার্টি। ওই বয়সে এসব পড়ে রোমাঞ্চে মুগ্ধ হওয়ার বয়স। তার পরে পরেই কার অ্যান্ড্রিডেন্ট। ঈশার বাবা-মা দু’জনেই সামনের সিটে ছিলেন। স্পট ডেড। ঈশারও মাথায় চোট লেগেছিল। কিছুটা স্মৃতিভ্রংশ আর সাংঘাতিক ট্রমা। সেটারই ম্যানিফেস্টেশন হল ক্রিপ্টোমনেসিয়া। শি নিডস ইয়োর হেল্প।”

অসহায় গলায় বললাম, “আমি কী সাহায্য করতে পারি?”

স্পন্দন পকেট থেকে একটা খাম বের করে আমার হাতে দিয়ে বলল, “ওকে এখানে পাঠাও।”

খামটা খুলে কাগজ বের করে দেখলাম প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে পুরো স্কলারশিপ নিয়ে এম টেক করার অফার লেটার। কাগজটা যত্ন করে আবার খামে ঢুকিয়ে স্পন্দনকে জিজ্ঞেস করলাম, “শুদ্ধশীল গুহ ডায়েরিতে আর কী কী লিখে গিয়েছেন?”

“ইন্টারেস্টিং বা দুর্ভাগ্য যাই বলো, ১৯৪২-এর পরে তিন বছরের ডায়েরি মিসিং। ১৯৪৬ থেকে আবার ডায়েরিগুলো আছে যতদিন উনি লিখেছিলেন। ১৯৪৫-এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ডায়েরি থেকে জানা যায় শুদ্ধশীল ততদিনে কলকাতায় ট্রান্সফার

হয়ে এসে সেটলড। বিয়ে করেছেন। সংসারী হয়েছেন।”

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, “শুদ্ধশীল ঠাঁর ডায়েরিতে কোথাও লিখেছিলেন কি যে তমালিকা উন্মাদ হয়ে গিয়েছেন? জানতেন কি এই বিড়দায় তমালিকা আবার ফিরে এসেছিলেন এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাঁকে আগলে রেখেছিলেন আমার বাবার ঠাকুরমা, তমালিকার সই জ্যোৎস্না?”

স্পন্দন অবাধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “না। তবে ঈশা এখানে এসে খোঁজ করে জেনেছে তোমাদের ওই কে যেন, ঈশাকে খুব ম্যাডাম, ম্যাডাম বলে তোয়াজ করে...”

“হাবু, আমরা হাবুদা বলি।”

“ইয়েস হাবুদা। তোমাদের বাড়িতে এক পাগলি থাকত।”

“পাগলি কথাটা অসম্মানজনক।”

“সরি। তোমাদের গ্রামপ্রধানও একই কথা বলেছেন। শুধু তোমার মা বলেছেন, তমালিকা বিদূষী ছিলেন। গ্রামের লোক ঠাঁকে বুঝত না।”

“মা বলেছে?”

“হ্যাঁ, সোনাকাকিমা একাধিকবার বলেছেন। ঈশা তমালিকার সতি অতীতটা জানতে চায়। হয়তো ঈশা নয়, ওর ভেতরে বাস করা তমালিকা জানতে চায়। সেখানে দুটো ভার্শন। এক, উনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। দুই, উনি সতিই সাধারণের বোঝার বাইরে ছিলেন। একমাত্র তুমি যে সতিটা কনফার্ম করবে, ঈশা সেটাই বিশ্বাস করবে।”

একটু চুপ করে থেকে বললাম, “সতিটা হচ্ছে উনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের শিকল তুলে বন্ধ করে রাখা হত ঠাঁকে।”

“এই সতিটা ঈশা নিতে পারবে না। আচ্ছা, ঠাঁর উন্মাদ হয়ে যাওয়ার কোনও কারণ জানো?”

“বাবার লেখা থেকে যেটুকু জেনেছি ১৯৪৩ সালে ভয়ানক ফেমিন, মানে মনস্তর হয়েছিল।”

“ইয়েস। ম্যানমেড বা আরও স্পেসিফিকালি বলতে গেলে চার্লিসমেড মনস্তর।”

“ঠিক। সেই মনস্তরে যখন এই বিড়দার মতো বাংলার শয়ে শয়ে গ্রাম অনাহারে উজাড় হয়ে যাচ্ছিল তখন তমালিকার একটা নিশ্চিত খাওয়া-পারার জীবন ছিল ঠাঁরগ্রামের ব্যারাকে। ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য ঠাঁর স্ত্রী ভগবতীকেও নিয়ে এসেছিলেন। বাংলার এই মর্মান্তিক অবস্থার খবর তমালিকা পেতেন। ঠাঁর সবচেয়ে বেশি চিন্তা ছিল সই কেমন আছেন। একটা ভুল খবর পেয়েছিলেন, সই মারা গিয়েছেন। খুব অনুভূতিপ্রবণ ছিলেন। সেই শোকটাই সম্ভবত সহ্য করতে পারেননি। অবস্থা কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পর যখন গ্রামে ফিরে এসেছিলেন, তখন তিনি প্রায় উন্মাদ। নিজের প্রাণাধিক প্রিয় সইকেই আর কোনও দিন চিনতে পারেননি। অথচ এই টিবিরা কাছ চলে আসতেন কুসুমবীজের জন্য, সইয়ের সঙ্গে গল্প করার জন্য।”

“আশ্চর্য্য।”

“আরও আশ্চর্য্য তমালিকার সেই ফিরে আসার পরেও ছিল গ্রামবাসীর কিছু সন্দেহ। যারা ওখানে কাজ করত তারা তো দেখেছিল শুদ্ধশীলের সঙ্গে তমালিকার সম্পর্ক। গান শোনাতে, ফোটো তোলাতেন। কেচ্ছার আশ্বাদ তো চিরকালই মুচমুচে।”

খামটা আমার হাতেই ধরা ছিল। স্পন্দনকে ফেরত দিতে গেলে ওটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, “ঈশা খুঁজে খুঁজে এই চাকরিটা করতে এখানে এসেছে শুধু তমালিকা ভট্টাচার্যের জন্য। ও শুধু অবচেতনে খোঁজে তমালিকার একটা শাস্তিপূর্ণ জীবনের পরিগতি। প্লিজ হেল্প হার। এইটুকু কনটেন্ট ওর জন্য তৈরি করে দিতে পারবে না?”

॥ ১৯ ॥

বিরশি বছর আগে

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ও পারে—

আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে।

বাতাস বহে মরি মরি, আর বেঁধে রেখে না তরী—

এসো এসো পার হয়ে মোর হৃদয়মাঝারে।

শুদ্ধশীল মুখ চোখে হাততালি দিয়ে উঠে বিহ্বল গলায় বলে উঠল, “অসাধারণ!”

তমালিকা ঈষৎ লজ্জাবনত গলায় বলল, “আপনি আমার সব গানকেই অসাধারণ বলেন।”

“আমার কাছে তো আর কোনও প্রতিশব্দ নেই তমালিকা। গান শুনতে শুনতে ভাবছিলাম যদি গানের লড়াই হয়, তা হলে কে তোমাকে হারাতে পারবে?”

“কেন? আপনি।”

শুদ্ধশীল হেসে উঠল, “আমি? আমি তো গাইতেই পারি না।”

“অস্বাভাবিক লড়াইয়ে সবসময় গান হবে কেন? কবিতাও তো হতে পারে। আপনি এত ভাল আবৃত্তি করতে পারেন, পরীক্ষা দিন না একটা। হৃদয়মাঝারে... হৃদয়মাঝারে... র দিয়ে শুরু।

শুদ্ধশীল একটু চিন্তা করে বলল,

“রজনী প্রভাত হল

পাখি, ওঠো জাগি,

আলোকের পথে চলো

অমৃতের লাগি।

“কি হয়েছে, পেরেছি?” শুদ্ধশীল জিজ্ঞেস করল।

তমালিকা বলল, “কোনওক্রমে পেরেছেন। আমি কিন্তু আরও ভাল আশা করেছিলাম।”

“হতাশা শিরধার্য করলাম। কিন্তু জানতে পারি কি কী রকম আশা?”

তমালিকা এক বুক শ্বাস নিয়ে আবৃত্তি করতে লাগল

“রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি

রানী, তোর মধুখানা দিঠি

রানী, তুই মণি তুই ধন,

তোর কথা ভাবি সারাক্ষণ।”

আবৃত্তি শেষ করে তমালিকা শুদ্ধশীলের দিকে তাকাল। মুখ সেই দৃষ্টিটা এখনও আছে শুদ্ধশীলের চোখে। তমালিকার গালে লাল আভা খেলল। ‘র’ দিয়ে রবি ঠাকুরের এই কবিতাটাই কেন প্রথমে মনে পড়ল? আরও কত তো কবিতা ছিল। ‘রূপসী আমার, প্রেয়সী আমার, যাইবি কি তুই যাইবি কি তুই’... না সেটাও বোধ হয় ঠিক হত না... ‘রাতের বাদল মাতে তমালের শাখে; পাখির বাসায় এসে ‘জাগো জাগো’ ডাকে’... এটাও তো বলতে পারত।

‘রানী, তোর ঠোঁট দুটি মিঠি’... শুদ্ধশীলের চোখ আটকে আছে তমালিকার ওষ্ঠের উপর। নিজেই সামলে শুদ্ধশীল খবরের কাগজে মোড়া একটা জিনিস তমালিকার হাতে দিয়ে বলল, “তোমার জন্য একটা উপহার আছে।”

“কী উপহার?”

“খুলেই দ্যাখো।”

তমালিকা কাগজের মোড়ক খুলে দেখল ফ্রেমে বাঁধানো ওর নিজের একটা ফোটো। এখানে আসার পর একদিন বিকেলে নিজের ক্যামেরায় ফোটোটা তুলেছিল শুদ্ধশীল। এর আগে তমালিকা কখনও ফোটো তোলেনি। তাই খুব আগ্রহ ছিল ফোটোটা কেমন হয় দেখার জন্য। শুদ্ধশীল বলেছিল, ফোটো পেতে সময় লাগবে। কলকাতায় ধোলাই ছাপাই হয়ে আসবে। ফোটো যে তুলবে, তার জন্য আগে থেকে বলেনি শুদ্ধশীল। তা হলে একটু সাজগোজ করত। কিন্তু এখন ফোটোর ফ্রেমটা হাতে ধরে নিজের সাদাকালো ফোটোটা দেখতে দেখতে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছে। এ কী তার রূপের গুণ না যিনি ক্যামেরাবন্দি করেছেন তাঁর হাতযশ?

শুদ্ধশীল তমালিকার মুখ চোখের দিকে তাকিয়েছিল। এমন সময় একটা গলা পেল, “স্যার।”

সন্ধিৎ ফিরতে দেখল এক জন আদালি এসে দাঁড়িয়েছে।

“কম্যান্ডার সাহেব আপনাকে ডাকছেন।”

শুদ্ধশীল উঠে দাঁড়িয়ে তমালিকাকে বলল, “আসি। হুকুম এসেছে। তবে ‘র’য়ের লড়াই কিন্তু জারি রইল।

ঘর থেকে বেরোনোর মুখেই দেখা হয়ে গেল ক্ষিতীশের সঙ্গে। এই দেখা কি অকস্মাৎ নাকি উনি আড়ি পেতে অপেক্ষা করছিলেন?

“হুজুর। একটু দেখবেন যদি রানওয়ের কাজটা পাই।”

শুদ্ধশীল কোনও প্রতিশ্রুতি না দিয়ে কম্যাভারের তাঁবুতে এল। কম্যাভার বললেন, “তুমি এক জনকে চেয়েছিলে না? এক জন বিপ্লবী। ওয়ার প্রিজনার হয়ে আছে। মিলিটারি জেল সুপারেন্টেনডেন্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। হি ইজ হিয়ার। গো অ্যান্ড ডিসাইড হিজ ফেট। কোন কাজে লাগাতে চাও।”

কম্যাভারের তাঁবু থেকে বেরিয়ে শুদ্ধশীল ব্যারাকের সেই তাঁবুতে পৌঁছোল যেখানে বন্দিদের রাখা হয়। এখন এক জনই মাত্র বন্দি সেখানে। সমীরণ ভট্টাচার্য।

তাঁবুতে ঢুকে শুদ্ধশীল প্রহরীদের ইশারা করল বাইরে যেতে। একান্তে মুখোমুখি হল সমীরণের।

“তা হলে তুমিই হলে সে যে বিড়দার শালবনের জঙ্গলে আমাকে গুলি করে মারতে চেয়েছিলো।”

দু’ হাতে লোহার শিকলের হাতকড়ি পরানো। সমীরণ বলে উঠল, “বন্দেমাতরম।”

“এ যে বড় পবিত্র মন্ত্র ভাই। তুমি তো ভেক ধরেছ। আমাকে কি সত্যিই ইংরেজ সরকারের সার্ভেয়ার বলে গুলি করে মারতে চেয়েছিলে নাকি সহ্য করতে পারোনি? আমার হাতে ধরা ছিল তখন ‘পুরবী’ বইটা। তোমার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। আমি চমকে টিবিবর উপর থেকে পড়ে গিয়েছিলাম। বইটার একটা পাতা লাল কাদামাটি লেগে নষ্ট হয়েছিল।”

সমীরণ কোনও উত্তর দিতে পারল না। শুধু ছটফট করে উঠে লোহার শিকলগুলো ঝনঝন করে উঠল। শান্ত গলায় শুদ্ধশীল বলতে থাকল, “তোমাকে আমার আগে দেখা হয়নি। কারণ নিরাপত্তার জন্য আমাকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে তোমার সঙ্গে থাকা বোলাটা বাজেয়াপ্ত করে একই গাড়িতে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে ছিল একটা গ্লোব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ কবিতার বই, আর-একটা চিঠি। চিঠিটা পড়ে আমি খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। হয় নিজের হাতের লেখা বিকৃত করে অথবা কাউকে দিয়ে লিখিয়ে যতই আত্মপরিচয় গোপন রাখার চেষ্টা করেছ, শেষ পর্যন্ত কিন্তু ধরা পড়েই গেলে। অনুমান করছি গণপতি ঘটককে উৎকোচ দিয়ে ঠিকানাগুলো তুমি জোগাড় করতে। আমার প্রশ্ন, যাকে এত ভালবাস, তাকে সরাসরি কথাটা কেন বলোনি?”

সমীরণ মাথা নিচু করে শুনছিল। আস্তে আস্তে মুখ তুলে বলল, “আপনি কি পেরেছেন?”

শুদ্ধশীল চুপ করে থাকল। সমীরণ বলতে থাকল, “আজ এখানে আমাকে নিয়ে আসার পর দেখলাম বিড়দার কয়েকজন এখানে কাজ করছে। কথা বলার সুযোগ তো আপনারা দেবেন না। তবু ওই ফাঁকেই জেনেছি, ক্ষিতীশজ্যেষ্ঠ এখানে ঠিকাদারি করছে। তমালিকাকেও এখানে নিয়ে এসেছেন। এসবই আপনার ফন্দি, তাই তো?”

শুদ্ধশীল এক জন গার্ডকে ডেকে বলল সমীরণের হাতের শিকল খুলে দিতে। তার পর বলল, “এসো আমার সঙ্গে।”

তমালিকা কোলে ফোটোর ফ্রেমটা নিয়ে বসেছিল। হঠাৎ শুদ্ধশীলের সঙ্গে সমীরণকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল।

“সমুদা, তুমি?”

ক্ষিতীশ ভট্টাচার্যও বেরিয়ে এসে সমীরণকে দেখে অবাক হয়ে গেল। শুদ্ধশীল বলল, “বলরামবাবুকে কথা দিয়েছিলাম সমীরণকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। কিন্তু আইনের খাতায় ও যুদ্ধাপরাধী। এখনই বিড়দায় ফেরত যেতে পারবে না। এই ব্যারাকে থেকে কাজ করতে হবে। ভট্টাচামশাই ঠিকাদারি করতে আপনার এক জন ম্যানেজার দরকার। রানওয়ের করার বরাত পেতে গেলে অনেক হিসেব রাখতে হবে। দেখুন সমীরণকে দিয়ে সেই কাজটা করাতে পারেন কি না?”

ক্ষিতীশ করজোড়ে বললেন, “হুজুর, আপনি অতিশয় মহানুভব। আমি তো ওকে কোনও দিন ক্ষমা করব না।”

শুদ্ধশীল সমীরণের দিকে তির্যক হেসে বলল, “দেখো চেষ্টা করে। আমি তো রইলাম।”

টিবিটার উপর চুপ করে বসে রয়েছে। এই টিবিটা আর এখন আমার নয়। হরিশ উকিল আজ কোম্পানির নামে কাগজপত্তর করে দিয়েছে। আমার মন বিষণ্ণতা আর অবসাদে ডুবে রয়েছে। এই অবসাদ আর বিষণ্ণতা অবশ্য এই টিবির মালিকানা হারিয়ে নয়, একরাশ শূন্যতার জন্য।

স্পন্দন সেদিন শুদ্ধশীল গুহর ডায়েরিটা আমাকে দিয়ে ঈশার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গিয়েছিল। আর সেই ডায়েরির মধ্যে ছিল খামটা, ঈশার প্রিন্টন ইউনিভার্সিটিতে পুরো স্কলারশিপ নিয়ে এম টেক করার অফার লেটার। ডায়েরিটা খুব মন দিয়ে পড়েছি। স্পন্দন যেমন বলেছিল ঠিক তেমনই গুছিয়ে লিখে গিয়েছেন শুদ্ধশীল। তমালিকার গুণ, তমালিকার জন্য গুঁর অনুভূতি একেবারে স্পষ্ট করে লিখেছেন। পড়তে পড়তে একটা জিনিসই বারবার মনে হয়েছিল, এসব উনি তমালিকাকে কেন বলেননি? অতিশয় ভদ্র ছিলেন নাকি সঙ্কোচ, নাকি কুণ্ঠা নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে নিজের জীবনটাকেই খুব অনিশ্চিত মনে হয়েছিল? প্রেম কি এসবের কোনও কিছু পরোয়া করে?

হাবুদাকে ফোন করেছিলাম, “একটা গাড়ি ভাড়া করে দিতে পারবে হাবুদা?”

“কোথায় যাবি মনা?”

“গুরগ্রাম।”

হাবুদা খুব আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, “গুরগাঁ যাবি গাড়ি ভাড়া করে? এই তো এইটুকু রাস্তা। বাসে চলে যা।”

“তোমার ম্যাডামকে নিয়ে যাব।”

“ম্যাডাম যাবেন? তা হলে তো সাইটের গাড়ি বলে দিলেই হয়।”

“না। আমি পয়সা দেব। আর শোনো, ঈশা কিন্তু এখনও ব্যাপারটা জানে না। তুমি আগে থেকে বোলো না।”

ইশাকে বলেছিলাম ছুটি নিতে। এক জায়গায় নিয়ে যাব।

“সে না হয় একদিন তোমার জন্য ছুটি নিলাম। কিন্তু কোথায় যাব সেটা কি সারগ্রাহীজ থাকবে?”

“আপাতত তাই ধরো।”

“সোনাকাকিমাও যাবে?”

“না, শুধু তুমি আর আমি।”

“আচ্ছা, দেখি কী মতলব আছে তোমার,” ঈশা তির্যক অর্থপূর্ণ হেসেছিল।

গুরগ্রামের মোড় থেকে গাড়িটা ঘুরতেই ঈশা অবশ্য বুঝে ফেলেছিল কোথায় যাচ্ছি। আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলেছিল, “থ্যাক্স ইউ। দ্যাখো আমি আসার পর থেকে রোজ ভেবেছি এখানে আসব, কিন্তু আসা আর হয়েই উঠছিল না।”

“সেটা আমিও বেশ আশ্চর্য হয়েছি যে তোমাকে এই জায়গাটা টানছে না কেন? তমালিকা ভট্টাচার্য কয়েক বছর তো এখানে ছিলেন। শুদ্ধশীলও ছিলেন। সমীরণ ছিলেন।”

ঈশা চুপ করেছিল। গুরগ্রাম জঙ্গলে এর আগে আমিও কোনও দিন আসিনি। খুব সুন্দর ঘন জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে ভাঙাচোরা কংক্রিটের রানওয়ে। মিলিটারি ছাউনির ধ্বংসস্তুপের কিছু দেওয়াল। রানওয়ের মধ্যে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ইশাকে নিয়ে নেমেছিলাম।

“কী মনে হচ্ছে? এখানে আগে কোনও দিন এসেছিলে? এখানেই কোথাও থাকতেন তমালিকা। এখানেই কোথাও শুদ্ধশীল তমালিকার ফোটো তুলেছিলেন।”

“তুমি কী করে জানলে?”

আমার বোলা থেকে বের করেছিলাম শুদ্ধশীলের ডায়েরিটা।

“ও, স্পন্দন দিয়ে গিয়েছে বুঝি। তা হলে এটাও নিশ্চয়ই বলে গিয়েছে ক্রিপ্টোমনেসিয়ার কথাও।”

“তুমি নিজে কেন বুঝেও বুঝছ না।”

“কী করব বলো। আমার ভেতর তমালিকার অস্তিত্বকে আমি অস্বীকার করি কী ভাবে?”

“একটা খণ্ড অস্তিত্ব। তমালিকার বিড়দায় থাকার অস্তিত্ব। এই অস্তিত্বটাকে বিসর্জন দাও। তাতে তমালিকার আত্মাও শান্তি পাবেন।”

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উদাস চোখে জঙ্গল দেখতে দেখতে ঈশা জিজ্ঞেস করেছিল, “তমালিকার শেষ জীবন কেমন কেটেছিল?”

জীবনে প্রথমবার হয়তো মিথ্যে কথা বললাম, “খুব ভাল। সইয়ের কাছে থাকতেন। নিজের মতো গান-কবিতার চর্চা করতেন।”

“তবে যে শুনেছিলাম উনি বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন, তোমাদের বাড়িতে শেষ জীবন খুব কষ্টে কেটেছিল।”

“কে বলেছে? মা?”

“না, ওই কুসুম ভট্টাচার্য। গ্রামপ্রধান।”

“ওদের কথা বিশ্বাস করলে? পার্টি পলিটিক্স করা ধান্দাবাজ। আমাদের বাড়ি সম্পর্কে যত আজবাজে কথা রটিয়ে বেড়ায়। জমিটা হাতাতে চায়। খুঁড়ে খুঁড়ে যত মিথ্যে অপবাদ দেয়। ওদের গিয়ে জিজ্ঞেস করো, তমালিকাঠাকুরমাকে নিয়ে কেছাও হয়তো শুনতে পাবে।”

“সোনাকাকিমা বলেছেন উনি খুব বিদূষী ছিলেন। তমালিকা ভট্টাচার্য এত গুণী মহিলা, এভাবেই তা হলে হারিয়ে যাবেন?”

“না যাবেন না। আর তার ব্যবস্থা তো তুমিই করেছ।”

“আমি কী ভাবে?”

“ইকো ভিলেজের মধ্যে টিবি'র উপর যে স্থাপত্যটা করেছ, ওই যে গাছ, ডালে ডালে পাখি, ওই স্থাপত্যটাই তমালিকার স্মৃতি হয়ে থাকবে। টিবি'র মধ্যে থাকুক না সব গল্প। সব গল্প সবার জানার দরকার কী?”

বিহ্বল হয়ে ঈশা জিজ্ঞেস করেছিল, “তুমি দিয়ে দেবে টিবিটা?”

“দুটো শর্তে। এক, টিবিটা যেমন আছে তেমনই যেন থাকে। তার উপর স্থাপত্যটা তুমি যেমন ডিজাইন করেছ, ঠিক তেমনই যেন তৈরি হয়।”

“আর দু'নম্বর শর্ত?”

শুদ্ধশীলের ডায়েরির মধ্যে রাখা খামটা বের করে বলেছিলাম,

“তোমাকে যেতে হবে।”

ঈশা কিছুক্ষণ স্থাগুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরে বারবার করে কেঁদে ফেলে বলেছিল, “মনে হচ্ছে সইকে আবার ফিরে পেলাম।”

হরিশ উকিলকে দিয়ে পাকাপোক্ত কাজ করিয়ে আমার শর্তটা পূরণ করিয়ে গিয়েছে ঈশা। সঙ্গে আর-একটাও শর্ত জুড়ে দিয়েছে, আমি যখন খুশি ইকো ভিলেজের মধ্যে যেতে পারি। আমি টিবিটা বিক্রি করতে চাইনি। দানপত্র করতে চেয়েছিলাম। ঈশা কিছুতেই রাজি হয়নি। ‘ইমোশনাল ফুল’ বলেছিল আমাকে। আমি ইমোশনাল! কে কাকে ইমোশনাল বলে। তবে ভেবে দেখেছি ঠিকই বলেছিল। আমার মধ্যে ওই শালিনী সিংহ যেমন বলেছিলেন, ‘শুধুই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, নো গ্রে শেডস ইনবিটুইন’, সেটাই ঠিক।

চেকটা পেলে ওটা ভাঙিয়ে ওই টাকাটা দিয়ে মাকে সোনার একজোড়া বালা কিনে দেব আর বাকিটা নিতুকাবাকে দেব। আর আমার জন্য কী পড়ে থাকবে, ওই একরাশ শূন্যতা। যে শূন্যতা আজ সকালে আরও গভীর করে কলকাতায় ফিরে গিয়েছে ঈশা।

আজকেও চরাচরে সূর্যটা শেষ পর্যন্ত অস্ত যেতে চলেছে। তবে আজ যেন সূর্যটা ল্লান, দুঃখী। প্রতিস্পর্ধীর আক্রোশ নেই। অপেক্ষা করে রয়েছে আমার হাতের বুড়ো আঙুল দেখার। ভারী আঙুলটা তুলে নেমে এলাম টিবিটা থেকে। কুসুম ফুল আর নেই। কাল সব তুলে মাকে দিয়েছিলাম। মা এক কোঁটো কুসুমবীজ দিয়েছে ইশাকে। কিন্তু আজ নতুন একটা কলি ফুটেছে। সূর্যের চেয়েও বেশি গনগনে তার হলদে কমলা পাপড়িগুলো। ফুলটা তুলতে গিয়েও থেমে গেলাম। আলতো করে ফুলটার গায়ে হাত বোলালাম। কে জানে কে কখন কোন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকে!

(বিড়দা একটি কাল্পনিক গ্রাম)

শিল্পী: কুনাল বর্মণ





শ্রীশ্রীদুর্গা, বিদেশি আঙ্গিকে নির্মিত পোর্সেলিন মূর্তি

সংগ্রহ: স্পন্দন দাস, সৌজন্য: সুশোভন অধিকারী



মা ও খুকি

উল্লাস মল্লিক

“হ্যাঁ লো, মা!”

“হ্যালো, হ্যালো!”

“হ্যালো মা! শুনতে পাচ্ছ?”

“কে, খুকি বলছিস? খুকি... হ্যালো!”

“হ্যাঁ মা, আমি বলছি; শুনতে পাচ্ছ না!”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, এ বার পাচ্ছি। কী যে জ্বালানে ফোন হয়েছে! এই আছে, এই নেই... সে দিন তোর বড়জেটি ফোন করেছিল, কল্যাণীর বিয়ে নাকি, তা দেনাপাওনা কত, সেটাই শোনা হল না।”

“ও বাবা, কল্যাণীদের বিয়ে! কোথায় হচ্ছে গো?”

“গোন্দাল পাড়ার দিকে।”

“যাক, কাছাকাছিই! দেখে শুনে না, প্রেম?”

“প্রেম হলেও কি আর বলবে! সবাই তো এখন সতী-সাধবী সাজতে চায়। কল্যাণীর কাণ্ড জানতে বাকি আছে কিছু! ইশকুলে পড়ার সময় একটা ছোকরা মাস্টারের সঙ্গে লটখট পাকিয়েছিল... সেটা গেল, তার পর রঘুদেববাটিতে যে বাড়িতে থাকত, সেই বাড়িওয়ালার ছেলের সঙ্গে...”

“ও মা, এটা তো জানতাম না!”

“আমিও কি ছাই জানতুম! সামন্তদের বড় ছেলের তো শালির বাড়ি রঘুদেববাটি, এই তো বিয়ে হয়েছে ছ’মাস... মুক্তোর মা-ই তো সে দিন... আরও কথা শুনবি? তোর জেটি... বলতে গেলে নিজের থুতু নিজের গায়েই পড়ে... তোর জেটিরও নাকি ওই বাড়িওয়ালার সঙ্গে



ছিল! ভাব তুই, এ দিকে বাপ-ব্যাটা, ও দিকে মা-বেটি...গলায় দড়ি...গলায় দড়ি...কথায় তা হলে বলেছে কেন, সব পাখিতে মাছ খায়, মাছরাঙাই শুধু কলঙ্কিনী! লজ্জা লজ্জা! সেই জনেই নাকি ওখানকার বাস ওঠাতে হয়েছে। লোকটার বৌ আবার পঞ্চায়েত প্রধান। তার তো খুব পাওয়ার, সে সব জনতে পেরে রাতারাতি উচ্ছেদ করে দেয়। আমি তো সে বাড়িতে গেছি। বেশ খোলামেলা ঘরগুলো, আলো-হাওয়া খেলে। তাই বলি, অমন বাড়ি ছেড়ে কিনা— সে কথা বলেওছিলুম তোর জেঠিকে— তা বলল, অনেক টাকা বাড়িভাড়া বাড়াতে বলছে। একটু যেন খটকা মতো লেগেছিল তখন। তার পর মুক্তোর মায়ের মুখে শুনে... যাকগে বাবা, আমার অত খবরে দরকার নেই...”

“ছেলে কী করে মা?”

“সেটাও তো ছাই শোনা হল না এই মরণদশা ফোনের জন্যে। কট কট আওয়াজ হয়ে বন্ধ হয়ে গেল। কত বার চেষ্টা করলুম, লাগলই না আর। প্রদীপকে বললুম, ‘তোর ফোনে একবার ধরে দে না, তোর জেঠির সঙ্গে কথাটা শেষ হল না..’ বলল কিনা, ‘আমি এখন বেরোচ্ছি, পরে ধরে দেব।’ আজ সকালে বলতে গেলুম, বলল, চার্জ নেই। ছেলের যা মেজাজ, কী আর বলব তোকে খুকি... আমি আর কিছু বলিনি...”

“দাদার কাজের খবর কিছু নেই?”

“চেষ্টা থাকলে তো হবে। তুহিনের বাবা একটা কাজের কথা বলেছিল। কী যেন পেলাই উড না কী, সেই পেলাই উডের কারখানা। তা বাবুর মনপসন্দ হল না, অনেক দূর রাস্তা...যাতায়াতেই মাইনের পয়সা ফুরিয়ে যাবে। আরে বাবা, মাইনে তো বাড়বে, প্রথমেই কি আর এককাঁড়ি টাকা কেউ দেয় নাকি! বসে থাকার চেয়ে তো ভাল! তা কে বলবে... রোজই তো রাতে খেয়ে ফেরে, গুম হয়ে এসে শুয়ে পড়ে। কী জ্বালায় যে জ্বলছি... সত্যি, আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।”

“শোনা না মা, সামনের মাসে টাকা পাঠাব, তুমি কালোকাকার দোকান থেকে একটা ফোন কিনে নিয়ো।”

“ও তোকে তো বলিনি, কালোর মা-টা মরে গেছে গেল হুগুয়।”

“সে কী গো! রাগুঠাকমা মরে গেল! আমাকে বড্ড ভালবাসত গো বুড়ি, ঠাকমার হাতের কত আচার যে খেয়েছি। লাস্ট যে বার বাড়ি গেলাম, ঠাকমা আমচুর দিল। বলল, ‘পরের বার আসবি যখন, কুলের আচার করে রাখব, নিয়ে যাবি...’ বড্ড ভালমানুষ ছিল গো ঠাকমা। আমাকে বলত, ‘কবে বিয়ে করবি লো, আমি যে নিককনে হব তোর বিয়েতে! মুখে ফেস পাওডার, চাঁটে লিপিস্টিক— সব ছেলে-ছোকরার দল সবাইকে ছেড়ে আমাকে দেখবে! তোর বরকেও ফুসলে নেব।’ কী হয়েছিল গো, আমি তো দিবি ভাল দেখে

এলাম। বলল, ডান হাঁটুতে বড্ড ব্যথা... আর বলল ‘কবে বিয়ে করবি লো ছুঁড়ি’...হ্যালো মা, শুনতে পাচ্ছ...হ্যালো...হ্যালো...”

“হ্যালো মা, শুনতে পাচ্ছ?”

“হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস, হ্যালো খুকি...”

“হ্যালো, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ মা?”

“হ্যাঁ পাচ্ছি, পাচ্ছি এ বার...এই রকম ধরেছে ফোনটা; হুটহাট কেটে যাচ্ছে...”

“তুমি কিন্তু কালোকাকার কাছ থেকে ফোন একটা নিয়ে নিয়ো...”

“খুকি, বলছিলুম কী, তোর ভাইয়ের ক’টা বই হলে খুব ভাল হয়...”

“কী বই? পড়ার বই তো ক্লাসে ওঠার সময়ই সব কিনে দিয়েছি।”

“এগুলো নাকি বাড়তি বই। ভাল নম্বর পেতে লাগে। দশ কেলোসের ফাইনাল পরীক্ষা তো আর মেরেকেটে একটা বছর...ওর তো মাথা ভাল, তোর বাপের সঙ্গে রতন মাস্টারের দেখা হয়েছিল, সে-ই বলেছে। বলেছে, ও আমাদের ইশকুলের নাম উজ্জ্বল করবে।”

“রতনবাবু সার এখনও আছে ইশকুলে?”

“আর নাকি তিন মাস আছেন। আমাদের প্রলয়কে খুব ভালবাসে। প্রলয়কে অবিশ্যি সবাই ভালবাসে... মাথা ভাল তো ওর... আবার শান্তিশিষ্ট, তাই...”

“এ বার ভাবছি বাড়ি গেলে ইশকুলটা ঘুরে আসব। কত দিন ও দিকে যাইনি, গেটের পাশে একটা কী বড় কৃষ্ণচূড়া গাছ ছিল... লাল লাল ফুল বিছিয়ে থাকত... আমরা কুড়োতাম। আমি পিয়ালী চন্দনা বন্দনা শিপ্রা...”

“গাছটা ঝড়ে একদম ভেঙে পড়েছে রে খুকি, ভাগ্যিস ইশকুল বন্ধ ছিল তখন!”

“যাহ! অত সুন্দর গাছটা ভেঙে গেল!”

“ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। তোর বন্ধু শিপ্রা রে; বিয়ে হল ক’দিন আগে, এখন বাপের বাড়ি এসে বলেছে, আর যাবে না।”

“ও বাবা, তাই?”

“হ্যাঁ! বলছে তো ডিভোর্স করে নেবে...”

“বাবা, ডিভোর্স একেবারে!”

“বলছে তো তাই?”

“কেন, কী হয়েছে?”

“অত কী আর খুলে বলে মানুষকে! আর ওদের সব ব্যাপারেই চাপা চাপা ভাব। তবে তারকের মা বলছিল, ছেলেটার নাকি দোষ আছে, ঠিক মতো ব্যাটা ছেলে নয়। তবে যাই বলিস শিপ্রার কিন্তু দেমাক ছিল! রংটা না হয় একটু ফর্সা, অত রূপের দেমাক কী আছে!”

“তা অবশ্য ছিল। খুবই ছিল।”

“বলছিলুম কী খুকি, তা হলে তোর ভাইয়ের বইগুলো কী হবে রে!”

“কত করে পড়বে?”

“তা তো...কী জানি...আচ্ছা প্রলয় আসুক জিজ্ঞেস করে তোকে বলব। গরুটা ভাবছি বিক্রি করে দেব, বুঝলি...”

“তোমরা গরু বিক্রি করে দেবে, মানে

লালিকে বিক্রি...”

“হ্যাঁ, কী আর করব, ওর আর বাচ্চাকাচ্চা হবে না। একটা গরু পোষা কম হাপা! আমার আর শরীর বয় না; যা খাই অম্বল... তার পর খরচ খরচা আছে...”

“ইস, লালিকে বিক্রি করে দেবে মা, কী শাস্ত গরু বলে! চোখগুলো যেন কাজল টানা, আমাকে দেখলেই গা ঘেঁষে আসত আর গলা বাড়িয়ে দিত...”

“সে তো জানি, মায়া কি আমারও কম, কিন্তু কী করব বল! বসে বসে একটা অত বড় প্রাণীকে টানা... আমারও কি খারাপ লাগছে না! তোর দাদাটা যদি একটু মানুষের মতো হত, আজ আমার চিন্তা থাকত! তোর বাবাও হুট করে অমন বেকার হয়ে বসে গেল, সব চাপটা তোর ওপর! সত্যি, তোর কথা ভাবলেই চোখে জল আসে আমার। তোর তো এত দিনে বর-ছেলে নিয়ে স্বশ্রদ্ধার করার কথা...কী যে সব হয়ে গেল...সব সর্বনাশ... সত্যি বলছি বাঁচতে ইচ্ছে করে না...”

“মা কেঁদো না; কাঁদলে সমাধান হবে কি... তার চেয়ে যেমন চলছে... ভাই বড় হয়ে গেলে চাকরি-বাকরি পেলে তখন দেখবে সব ঠিক মতো হচ্ছে আবার। দাদাকে একটু বুঝিয়ে বলো...ঠান্ডা মাথায় বলো বুঝিয়ে...”

“ও কি বোঝার মতো আছে রে খুকি... মাঝে তো বুঁকেছিল বিয়ে করবে, তাই নিয়ে কী অশান্তি! এক ঘাটের মড়া ঘটক জুটিয়েছিল কোথা থেকে, সে দেখি এক দিন বাড়িতে হাজির। বলে কিনা গরিবের মেয়ে, দিতে-থুতে পারবে না বিশেষ, আমি বলি, ওরই তো চালচুলোর ঠিক নেই, বৌ এনে তুলবে কোথায়, খাওয়াবে কী! তা ছেলের কী অশান্তি, কী তাগু! তোর বাবার গায়ে তো হাতই তুলে দিল। বুড়ো মানুষ কি আর টাল সামলাতে পারে...পড়েই গেল, অবলা শরীর, কী বলব বল...”

“লাগেনি তো?”

“লেগেছে, কনুইয়ের কাছটা ছড়ে গেছে, হাঁটুতেও লেগেছে...খুঁড়িয়ে হাটছে...”

“মা, দাদা হঠাৎ বৌ নিয়ে এলে, তুমি কিন্তু ঘাড় পাতবে না বলে দিচ্ছি...একদম ছোটলোক হয়ে গেছে...”

“পেটে ধরেছি, বলতে খারাপ লাগে, আমাকে কী বলল জানিস! বলল কিনা, ‘তুইও তোর মেয়ের মতো লাইনে গিয়ে দাঁড়া, রোজগার করে আন...’”

“হ্যালো, হ্যালো, মা, শুনতে পাচ্ছ?”

“ফোনটা আবার... হ্যাঁ খুকি, শুনতে পাচ্ছিস... হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস, যাহ, কেটে গেল... দূর বাবা!”

“হ্যালো, মা, শুনতে পাচ্ছ, হ্যালো...”

“হ্যাঁ খুকি, শুনতে পাচ্ছিস তুই!”

“শুনতে পাচ্ছ মা...”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ বার পাচ্ছি, বল...”

“হ্যাঁ, বলছি বাবাকে না হয় একটা ভিটামিন টনিক-ফনিক দাও, কমজোরি শরীরটা একটু বল পাবে। অস্ত্রদার ওষুধের দোকানে গিয়ে বলবে, তা হলেই হবে। জানো মা, সে দিন একটা কাণ্ড...”

“কী?”

“অস্ত্রদার একটা মামা আছে না, যে ওদের বাড়ি খুব আসত; ফর্সা, লম্বা মতো, ডান দিকে ভুরু ওপর একটা আঁচিল, একটু তুতলে তুতলে কথা বলত...”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি। এখন আর দেখি না। আগে খুব আসত। ওর বৌটাকেও দেখেছি। বৌটা ভালমানুষ, আমাদের বাড়িতেও দু’-এক বার এসেছে...কেন, কী হয়েছে রে!”

“এক দিন দেখি অস্ত্রদার সেই মামাটা আমাদের এখানে এসেছে...”

“এই রে, কী সবেবানাশ! তাকে দেখতে পেয়েছে নাকি...”

“না, দেখতে পায়নি। কিন্তু আর একটু হলেই... আমি অমনি তাড়াতাড়ি মুখে রুমাল চাপা দিয়ে একটা ঘরে ঢুকে গেছি।”

“যাক গে বাবা, খুব ফাঁড়া গেছে! পুজো-টুজো দিয়ে দিতে হবে একটা... এমনিতেই তোকে নিয়ে সব কত খোঁজ লোকের, কত প্রশ্ন! কবে নাকি চৈতালির বাবা তোর বাবাকে বাজারে ধরেছিল, ‘কোথায় কাজ করে তোমার মেয়ে? কী নাম কোম্পানির? সে কী! মেয়ে গেঞ্জি কোম্পানিতে কাজ করে বলছ, অথচ কোম্পানির নাম জানো না!’ তার পর বলেছে ‘কোথায় থাকে মেয়ে, কলকাতার মতো জায়গায় মেয়েদের একা ছাড়া ঠিক নয়। পুজোতে নাকি বাড়ি আসে না... পুজোতেও কি কারখানা খোলা থাকে... তাই আবার হয় নাকি... সব জায়গায় ছুটি, শুধু তোমার মেয়ের কারখানা খোলা...’ এ রকম নানা সাত-সতেরো কথা বলেই চলেছে।”

“ওই লোকটা মহা কুচুটে! নিজের মেয়ে দুটো কী কীর্তি করে বেড়াচ্ছে, আগে দেখো সেটা! বাবাকে বলে দেবে কথা না বলতে, দেখা হলে যেন অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়, নোংরা লোক একটা!”

“হ্যাঁ, লোকের সব কত প্রশ্ন, কেন রে বাবা, আমার কি তাদের খবরে থাকি! আবার শোন না কেমন কথা, সেদিন নবর মা বলল, দিদি, তোমাদের বুমুরের বিয়ে দেবে না? এইবেলা দেখে শুনে দিয়ে দাও, মেয়েছেলের রূপ যৌবন ঝরে যেতে আর কত ক্ষণ! ওর কি নিজের পছন্দ করা আছে নাকি, আজকালকার ছেলেমেয়েদের তো ব্যাপার...”

“তুমি কী বললে?”

“বলেছি, দেখি, আর একটা-দুটো বছর...”

“জানো মা, আমাদের উল্টো দিকের বাড়ির একটা মেয়ে, মেয়েটা ছ’-আট মাস হল এসেছিল। নাম কাকলি। আমার সঙ্গে খুব কথা বলত। ওর লাভারের কথা বলত। ওর লাভার বাসের কন্ডাক্টর ছিল, অ্যান্ড্রিডেটে

মরে যায়, সেই কাকলির বিয়ে হয়ে গেল! ওর এক বাবুর মনে ধরেছিল ওকে; সে বিয়ে করবে কাকলিকে... এই তো আগের রবিবার চলে গেল। যাওয়ার আগে সবাইকে মিষ্টি খাইয়ে গেল...”

“বাবা! বলিস কী!”

“হ্যাঁ, ভাগ্য করে এসেছে...”

“সে তো ঠিক কথাই।”

“যাক বাবা, একটা মেয়ের কত সাধ-আহ্লাদ থাকে স্বামীর ঘর করার... ভাগ্যবতী মেয়ে যা-ই হোক।”

“সে তো বটেই...”

“এখন ঠিক মতো মিলমিশ হলেই ভাল।”

“সেটা অবশ্য কথা। লোকটাকে কিন্তু দেখে ভাল বলেই মনে হয়েছে আমার।”

“শোন না খুকি, তাকে একটা কথা বলব বলব ভাবছি...”

“কী কথা?”

“বলছি, রান্নাঘরের টালিগুলো তো হনুমানের অত্যাচারে রাখা যাচ্ছে না; রোজ ভেঙে চৌচির, কত আর পাল্টাব! একটা টালি আঠেরো ঢাকা, তার পর তোর বাবার আর শরীরে কুলোয় না। এক দিন উঠে মাথা ঘুরছিল, ভাগ্যিস সতীনাথ ঠিক সময় মতো এসে পড়েছিল। ও আর প্রলয় কোনও রকমে ধরে ধরে নামাল। তার পর থেকে আর উঠতে দিই না... বলছিলুম কী, এ বার পুজোর পর যদি ঢালাইমতো একটু করে নেওয়া যায়... মানে, পুজোর সময় তাদের রোজগার ভাল হয় বলিস, তাই বলছিলুম আর কী। না হলে বড্ড অসুবিধে... বৃষ্টি হলে রান্নাঘর একেবারে জলে ভেসে যায়, তাই বলছিলুম যদি...”

“হ্যালো, খুকি শুনতে পাচ্ছিস!”

“হ্যাঁ!”

“সাদা নেই দেখে আমি ভাবলুম কেটে গেল বুঝি আবার!”

“না, না।”

“তবে এখনও তো দেরি আছে। তাকে একটু আগে-ভাগে জানিয়ে রাখলুম...”

“আচ্ছা দেখি...”

“খুকি, তোর গলাটা কেমন যেন হয়ে গেল, কী রে, শরীর ঠিক আছে তো!”

“শরীরের আর কিছু হওয়ার উপায় কী!”

“না, তুই ঠিক করে বল। লুকোচ্ছিস কিছু! বল ঠিক করে।”

“না গো।”

“দেখ খুকি, আমি মা! তুই আমার মেয়ে; তুই আমায় পেটে ধরেছিস, না আমি তোকে! লুকোবিনি কিছু! বল আমাকে, না হলে চিন্তায় আমার ঘুম হবে না!”

“শোনো না, একটা ছেলে...”

“হ্যাঁ, তা কী হয়েছে, সেটা বলবি তো!”

হ্যালো, হ্যালো... শুনতে পাচ্ছিস খুকি... যাহ, কেটে গেল আবার... কী জ্বালাতনে ফোন রে বাবা... হ্যালো...”

“হ্যাঁ মা, শুনতে পাচ্ছি।”

“তা হলে চুপ করে আছিস কেন! কী হয়েছে বল! কে ছেলে বলছিস...”

“বলছি, আমায় খুব পছন্দ তার।”

“পছন্দ! পছন্দ তো হবেই; না হলে কেউ পয়সা ফেলে আসে।”

“সে কথা নয় গো মা, বলছে আমাকে বিয়ে করবে।”

“অ্যাঁ! সে কী রে! বিয়ে করবে মানে!...

হ্যালো, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস খুকি... খুকি হ্যালো, বিয়ে করবে মানে কী... যাহ... হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস খুকি...”

“হ্যাঁ, পাচ্ছি।”

“বিয়ে মানে কী!”

“বিয়ে মানে আবার কী হবে, শাঁখা সিঁদুর দিয়ে ঘরের বৌ করে নিয়ে যাবে বলছে...”

“কী আবোল তাবোল বলছিস!”

“সত্যি মা।”

“কে ছেলে... কোথাকার ছেলে...”

“রান্নাঘরের ও দিকে বাড়ি। মা মরে গেছে, বাবা আর ছেলে থাকে। ছুতোর মিস্তিরি কাজ করে।”

“তা তোকেই বিয়ে করতে চায় কেন! কোথায় দেখাশোনা হল তাদের?”

“এখানেই। তিন-চার মাসের মতো হবে। প্রথম এসেছিল আমার কাছে। তার কিছু দিন পরে আবার এল; কয়েক দিন পর আবার। বলল, আমাকে ওর খুব ভাল লাগে। বিয়ে করবে। আমি তো হেসে ফেলেছি। বললাম, ‘মদদট খেয়ে এসেছ নাকি!’ তার পর মাঝে মাঝেই আসে আর বলে, ‘কাজ ছেড়ে দাও। চলো বিয়ে করি।’ পরশু আবার আসবে, ওর বাড়িতে নিয়ে যাবে; বাবাকে বলবে, মেলায় চেনাজানা হয়েছে।”

“তা তুই কী ভাবছিস?”

“ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছি না মা। ছেলোটো কিন্তু খুব ভাল; তুমি দেখলে বুঝতে।”

“ও রকম ভাল অনেক দেখা আছে! নিয়ে যাবে, তার পর শখ-আহ্লাদ মিটে গেলে মেরে ঝুলিয়ে দেবে। না না, বাপু ও সব ফন্দিতে পা দিস না, যেমন আছিস, বেশ আছিস; দিবি আছিস... বলছি মায়ের কথা শোন!”

“ও বলেছে, দরকারে ও আমাদের বাড়িও যাবে, গিয়ে কথা বলবে...”

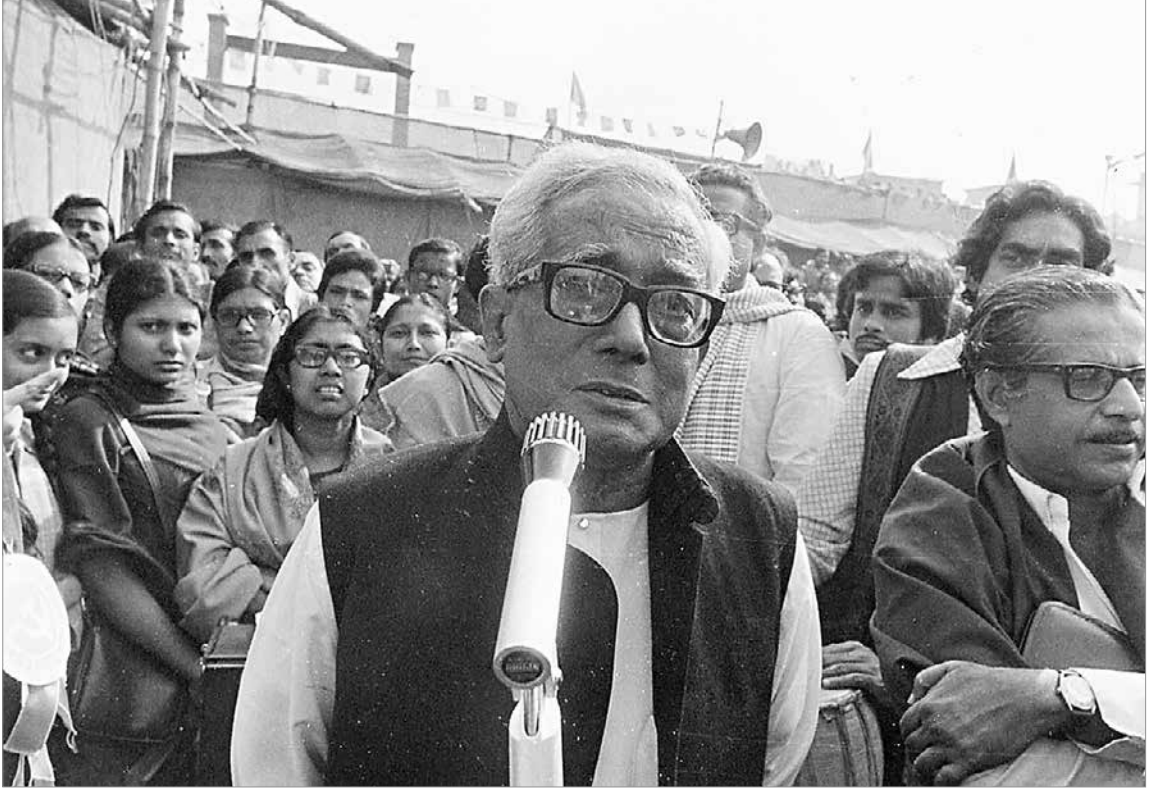
“না না, এখানে আসতে হবে না! তুই মাথা থেকে ও সব সর। আমি এক বারে ঠিক বলছি, ও ছেলের ধান্দা সুবিধের নয় জানবি। শোন না, তা হলে তোর ভাইয়ের বইগুলোর পয়সা দিবি তো, আর রান্নাঘরের ঢালাইটা... হ্যালো হ্যালো, যাহ! কেটে গেল নাকি... খুকি শুনতে পাচ্ছিস... হ্যালো, হ্যালো... ফোনটার এই মরণদশা... খুকি...”

“হ্যাঁ, বলো।”

“ও, আছিস তুই?”

“আছি তো মা; কোথায় আর যাব বলো...”

শিল্পী: সায়ন চক্রবর্তী



দাপুটে নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত মানুষ হিসেবে ছিলেন যুক্তিনিষ্ঠ ও স্নেহশীল

তাঁহাদের কথা

দেবাশিস ভট্টাচার্য

এই লেখা আসলে কিছু খণ্ডচিত্র। তাঁদের নিয়ে, দীর্ঘ সময় ধরে যাঁরা ছিলেন বাংলার রাজনীতিতে এক-একটি স্তম্ভ স্বরূপ। সব সময় তাঁদের উপস্থিতি এবং ব্যক্তিত্বের ভর অনুভব করা যেত। তা সে বিরোধী নেতা হিসেবেই হোক, বা শাসকদলের।

তাঁদের রাজনীতি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য না-ই হতে পারে। তাঁদের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত সমর্থনযোগ্য ছিল, তা-ও নয়। কারও কারও বিরুদ্ধে তো রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগও বিস্তর।

কিন্তু দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তাঁরা কেউ নিজস্ব গাড়ি-বাড়ি কিংবা সাদা-কালোয় মোটা টাকার পাহাড় গড়তে পেরেছিলেন বলে শুনিনি। যখন শাসকপক্ষের শীর্ষনেতা, তখনও সাদামাটা জীবন তাঁদের। চারপাশে চোখে পড়েনি সেপাই-সাক্ষী-পুলিশ-কম্যান্ডার দাপাদাপি। তাঁদের ধরা যেত, ছোঁয়া যেত, কাছে যাওয়া যেত অনায়াসে।

দুর্ভাগ্যজনক সত্যি হল, রাজনীতি এবং দুর্নীতি আজ কার্যত সমার্থক হয়ে উঠেছে। কে কত বেশি দুর্নীতিপরায়ণ, রাজনীতিকের মাত্রা এখন বস্তুত সবার আগে সেই মানদণ্ডে মাপা হয়। নেতা এবং সাংবাদিকের সম্পর্কের মধ্যেও জমছে বিষবাষ্প। কোথাও যেন মাথা তুলেছে ‘আমরা-

ওরা’-র দেওয়াল! দলনির্বিশেষে সবার চাহিদা হল সাংবাদিকের ‘আনুগত্য’। না হলেই ছমকি, ক্রেদবর্ষণ।

সাংবাদিকতায় এসে যখন ওই নেতাদের কাছে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি, রাজ্যে বামফ্রন্ট তখন ক্ষমতায় এবং তাঁরা এক-এক জন সেই ফ্রন্টে এক-একটি প্রধান শরিক দলের মাথা। বর্ণময়তায় প্রত্যেকে ছিলেন স্বতন্ত্র। মিল শুধু এক জায়গায়। ব্যক্তিজীবনকে তাঁরা কলুষমুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। আচরণে সৌজন্য, সহনশীলতার সীমাও লঙ্ঘন করেননি কখনও। ঘটেনি ব্যক্তি-আক্রোশের প্রকাশ। কারণ, তাঁরা জানতেন কোথায় থামতে হয়। আজ সেই জন্যই হয়তো তাঁদের কথা প্রাসঙ্গিক।

প্রমোদ দাশগুপ্ত

তাঁর ঘরে সাংবাদিকদের ভিড়ে সে দিন আমিই ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ এবং তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। প্রমোদ দাশগুপ্তের তা নজর এড়ায়নি। সকালে বামফ্রন্টের বৈঠক ছিল। বিকেলে তারই খবর সংগ্রহে সাংবাদিকরা গিয়েছেন আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সিপিএম-এর রাজ্য দফতরে। আমিও সেই দলে সবার শেষে, সবার পিছে গুটিসুটি দাঁড়িয়ে।

আনন্দবাজার পত্রিকায় সে দিন থেকে আমার উপর রাজনৈতিক সংবাদ সংগ্রহের ভার এসেছিল। সিপিএম-এর এখনকার অফিস তখনও তৈরি হয়নি। পাশে পুরনো বাড়িতে অফিস চলত। ওই বাড়িতেই ছিল ‘গণশক্তি’-র দফতর। উপরে ওঠার জন্য নিয়মকানুনেরও এত কড়া কড়ি ছিল না।

দোতলায় একটি বড় পুরনো টেবিল এবং কয়েকটি অতি সাধারণ কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ার পাতা ঘর। সেখানেই প্রমোদবাবু বসেছিলেন। তাঁর সামনে কয়েক জন পাকা মাথা সাংবাদিক। এবং অনিল বিশ্বাস, তিনি তখন গণশক্তির বার্তা সম্পাদক।

নিচুস্বরে কথা বলছিলেন প্রমোদ দাশগুপ্ত। তিনি কী বিষয়ে বলছেন, সাংবাদিকেরাই বা তাঁর কাছে কী জানতে চাইছেন, তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে না পেরে আমি তখন রীতিমতো নার্ভাস। সাংবাদিক বৈঠক শেষ করে প্রমোদবাবু এবার আমার দিকে তাকালেন। চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

আমার পাশেই ছিলেন তৎকালীন একটি বাংলা কাগজের এক সিনিয়র। আমি কিছু বলার আগেই তিনি আমাকে দেখিয়ে বললেন, “প্রমোদদা, ওর নাম দেবাশিস, আনন্দবাজারের...”

তাকে থামিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত জানতে চাইলেন, “ও সব বুঝেছে তো? ঠিকঠাক লিখতে পারবে?”

দাদা তাঁকে আশ্বস্ত করলেন, “অসুবিধে হলে আমি বলে দেব।”

সত্যিই তাঁর সাহায্য সেদিন আমার কাছে খুব জরুরি ছিল।

সেই শুরু। তার পর থেকে প্রমোদদার মৃত্যু পর্যন্ত দু’-আড়াই বছর সময়ের হিসেবে কিছুই নয়। কিন্তু প্রায় নিয়মিত আলিমুদ্দিনের পাটি অফিসে যাওয়ার সুবাদে অল্প দিনেই তাঁর খুব কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। বিভিন্ন ঘটনার ভিতর দিয়ে দেখেছি, তাঁর মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তিত্বের মধ্যে লুকিয়ে থাকা এক জন যুক্তিনিষ্ঠ, স্নেহপ্রবণ মানুষকে। সাংবাদিকের লেখায় সমালোচনা থাকলেও যিনি কখনও ঘর থেকে বের করে দিতেন না। হুমকি শোনাতেন না। কথা বন্ধ করতেন না। আঙুল তুলে বলতেন না, ‘প্রতিপক্ষের দালাল’ বা ‘চক্রান্তকারী’।

বরং দেখেছি কোনও বিষয়ে মন্তব্য করার পরে কথার কৌশলে বা সাংবাদিককে ধমকে-চমকে তা ‘ভুল’ প্রমাণ করতে না-চাওয়ার দৃঢ়তা। যেটি আজকের রাজনীতিতে প্রায় বিরল। বস্তুত খুব অল্প দিনের দেখাতেও প্রমোদবাবুর চরিত্রের এই সব দিক সাংবাদিক হিসেবে আমাকে আজও আকৃষ্ট করে।

একটি ঘটনা বলি। ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় আসে, সিপিআই তখন ফ্রন্টে ছিল না। তারা আসে ’৮২-র নির্বাচনের কিছু আগে। নতুন শরিককে ক’টি আসন দেওয়া হবে না হবে, তা নিয়ে বাজার তখন সরগরম। সিপিআই যতগুলি আসন দাবি করে বসে আছে, সিপিএম তত দিতে নারাজ। চলছে টানা পড়েন।

এমন সময়ে প্রমোদবাবু হঠাৎ এক দিন বিকেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে নৈমিত্তিক আলাপচারিতার সময়ে বলে বসলেন, “সিপিআই কি ঘরজামাই যে, যা চাইবে তাই দিতে হবে?”

পরদিনের আনন্দবাজারে তাঁর সেই মন্তব্য ছেপে বেরোতেই বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়েরা ফেটে পড়লেন।

আশ্চর্যের বিষয় হল, প্রমোদবাবু যখন ওই কথা বলেছিলেন, তখন সেখানে অন্য দু’-চার জন সিনিয়র সাংবাদিক উপস্থিত থাকলেও তাঁদের কারও কাগজেই মন্তব্যটি ছাপা হয়নি। ফলে যাবতীয় দায় বর্তাল আনন্দবাজারের সংশ্লিষ্ট রিপোর্টার, অর্থাৎ আমার উপর। ব্যাপারটি এমন দাঁড়িয়ে গেল যেন আমি প্রমোদবাবুর নামে মনগড়া খবর লিখেছি। পরদিন বিকেলে আলিমুদ্দিনে যেতেই অনিল বিশ্বাস বললেন, “তুমি অপেক্ষা করো। প্রমোদদা তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।”

সদ্য সিপিএম-এর নতুন অফিস হয়েছে। সেক্রেটারিয়েটের ঘরের লাগোয়া হলে নিয়ে গেলেন অনিলদা। প্রমোদদা এলেন। গম্ভীর মুখে চুরুটে টান দিয়ে ভাববাচ্যে জানতে চাইলেন, “আমি যা বলিনি, তা লেখা হল কেন?”

তাঁর প্রখর ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে আমি কিছুটা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বললাম, “আপনি তো বলেছিলেন...”

তিনি ফের বললেন, “না, বলিনি।”

তাঁর মতো নেতার পক্ষে আমার মতো সদ্য চাকরিতে ঢোকা রিপোর্টারকে নস্যাৎ করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু না, প্রমোদবাবু তা করেননি। কোনও হুমকিও দেননি। তার বদলে আমার জবাব শুনে চুরুটে টান দিয়ে এক মুহূর্ত চোখ বুজে রইলেন। তার পর চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলছ। আমি বলেছিলাম। তবে ওটা অফ দ্য রেকর্ড।”

সাহস সঞ্চয় করে আমি জানালাম, ‘অফ দ্য রেকর্ড’-এর বিষয়টি আমার জানা ছিল না। তিনি এক প্রবীণ সাংবাদিকের নাম করে বললেন, “কেন? ওঁকে বলে দিয়েছিলাম, ওটা লিখতে হবে না।” এবার আর একটু সাহসী হয়ে জানালাম, কেউ আমাকে সে কথা বলেননি।

প্রমোদ দাশগুপ্ত স্নেহশীল অভিভাবকের মতো আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, “ঠিক বলেছ। ভুলটা আমারই। আসলে তুমি নতুন তো, আমারই তোমাকে এটা বলে দেওয়া উচিত ছিল। পলিটিক্যাল রিপোর্টিং করলে এমন অনেক কথা শুনতে পাবে। তার সবই সব সময় লিখতে নেই। নিজেই এটা আস্তে আস্তে বুঝে যাবে। আর এটা মেনে না চললে কেউ খোলাখুলি কথাই বলবেন না কোনও দিন।”

রাজনৈতিক রিপোর্টিংয়ের এই মন্ত্রগুপ্তিটা, সত্যি বলতে কী, সেই প্রথম শিখলাম।

প্রায় একই রকম ঘটে ’৮২-র বিধানসভা ভোটের আগে। আমাদের কাগজের জন্য তাঁর একটি সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছিল। সিপিএম-এর এক বিধায়ক সম্পর্কে তখন জুলুম করে টাকা তোলার মতো নানা অভিযোগ শোনা যেত। প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, “আমরা খোঁজ করে দেখেছি। ও সব মিথ্যা।”

তার পরে নিজেই যোগ করলেন, “হাতের পাঁচটা আঙুল সমান হয় না। তা বলে হাতটা কেউ কেটে ফেলে না! এ সব কিন্তু লেখার নয়।”

খবর করা ছাড়াও তখনকার আলিমুদ্দিনে রোজকার হাজিরায় একটা অন্য মজা ছিল। প্রমোদবাবু কলকাতায় থাকলে প্রায়ই বিকেলে তাঁর টেবিল জুড়ে কাগজ পেতে মুড়ি ঢালা হত। এক দিকে বাদাম, এক দিকে বাতাসার ভাগ। যার যেনম খুশি তুলে নিয়ে খাওয়া। কচিৎ কখনও মহাকরণ ফেরত জ্যোতি বসুকেও দেখেছি। মুড়ি না খেলেও দু’-এক মিনিট বসতেন।

বিকলে বামফ্রন্ট বৈঠকের সাংবাদিক সম্মেলন থাকলে প্রমোদবাবুর নির্দেশে কাবাব এবং সের্কা রুটির মেনু ছিল মোটামুটি ধরাবাঁধা। ভাঁড়ে করে কাবাব আসত। সঙ্গে দু’ফালি পাঁউরুটি।

শনিবার বিকেলে সচরাচর কোনও ব্রিফিং করতেন না প্রমোদবাবু। কেন? তখন শনিবার বিকেলে টিভি-তে হিন্দি সিনেমা দেখানো হত। প্রমোদ দাশগুপ্ত হিন্দি সিনেমা দেখতেন। বহু নায়ক-নায়িকা সম্পর্কে তার কৌতূহল ছিল যে কোনও পাকা সিনেমারসিকের মতোই। তাই হিন্দি সিনেমার সময়টুকু তিনি টিভি ছেড়ে নড়তেন না। আর নড়তেন না ফুটবল, বিশেষ করে ইস্টবেঙ্গলের খেলা থাকলে।

সিপিএম-এর নতুন অফিস মানে এখনকার মুজফফর আহমেদ ভবন তৈরি হওয়ার পরে উপরে ওঠার ব্যাপারে নিয়মকানুন ক্রমশ কঠোর হতে শুরু করল। প্রমোদবাবু তখন অধিকাংশ দিনই নীচে লবিতে এসে রিপোর্টারদের সঙ্গে দেখা করতেন। বিদ্যাসাগরী চটি পায়ের, চুরুট মুখে ধীরে ধীরে নেমে আসতেন তিনি। রিপোর্টাররা তাঁকে ঘিরে বসতেন।

চিনে গিয়ে প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃত্যু হয় ’৮২-র নভেম্বরে। অক্টোবরে আমি দিল্লিতে বদলির নির্দেশ পেলাম। পূজোর পরেই চলে যেতে হবে। আর প্রমোদদা চিনে যাবেন নবমীর দিন। তাই পূজোর ছুটির আগের দিন এক বার দেখা করে আসতে চেয়েছিলাম। সন্ধ্যাবেলা পাটি অফিসে যেতে বলেছিলেন তিনি।

ওঠার আগে বললাম, “প্রমোদদা, আপনি যদি দিল্লি হয়ে ফেরেন, তা হলে দেখা হবে, খবরও হবে।”

উনি বললেন, “একেবারেই না। আমি কলকাতা থেকে যাব এবং কলকাতায় ফিরব।”

বলেছিলাম, “তা হলে আপনি ঘুরে আসুন। তার পরে আবার...”

কমিউনিস্টরা অদৃষ্টবাদী নন। কিন্তু কেন জানি না, সেদিন প্রমোদবাবু বলেছিলেন, “যদি বেঁচে ফিরি তো দেখা হবে।” চিনেই জীবনাবসান হল তাঁর। রাজ্য সিপিএম-এ সূচিত হল আর এক নতুন অধ্যায়।

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

“রাস্কেল, আমার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছ? ভেবেছ, আমি ছেলেমানুষ?”

তাঁর গমগমে আওয়াজে ফ্ল্যাটের ছোট ঘরটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। উল্টো দিকের চেয়ারে বসে সেই গর্জন আমি হজম করছি। খানিক আগেই বামফ্রন্ট বৈঠকের প্রেস ব্রিফিং করেছেন ফ্রন্টের চেয়ারম্যান সরোজ মুখোপাধ্যায়। তখনও ফ্রন্ট বৈঠকের কিছুটা গুরুত্ব ছিল এবং বৈঠকের ভিতরকার খবরাখবর জোগাড়ের জন্য কিছুটা ঘোরাঘুরিও করতে হত। সিপিআই-য়ের বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, আরএসপি-র মাখন পাল, ফরওয়ার্ড ব্লকের অশোক ঘোষের মতো নেতারা নিয়মিত ফ্রন্ট বৈঠকে যেতেন। সেই জন্যই আলিমুদ্দিনে আনুষ্ঠানিক সাংবাদিক বৈঠকের আগে-পরে সাংবাদিকেরা শরিক নেতাদের কাছে ধর্না দিতেন ‘ভিতরের খবর’ পাওয়ার আশায়।

বিষয়টি ঠিক মনে নেই। তবে সিপিআই-কে নিয়ে সে দিনের ফ্রন্টে কিছু একটা টানাপড়েন হয়েছিল। তারই খোঁজখবর পেতে বউবাজার থানার পিছনে বো স্ট্রিটে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের ছোট ফ্ল্যাটটিতে ঢুক করে ঢুকে পড়েছিলাম। সেদিন আমার উদ্দেশ্য-বুঝতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয়নি বিশ্বনাথদার।

ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “এসেছ, বোসো। চা খাও। কিন্তু ফ্রন্ট নিয়ে কোনও কথা নয়। যা বলার ওখান থেকে সরোজ (মুখোপাধ্যায়) বলে দিয়েছে।”

আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম, “সরোজদার বক্তব্যের পরেও তো আপনার কিছু বলার থাকতে পারে...” আর তখনই ওই ব্যাঘ্রধমক।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ওই রকম হুঙ্কারের পরেও বিশ্বনাথদার সামনে বসে থাকতে এতটুকু নার্ভাস লাগছিল না আমার। কারণ ছোট ফ্ল্যাটটির পর্দা দিয়ে আড়াল করা অন্দরমহল থেকে ইতিমধ্যেই তাঁর স্ত্রী, সিপিআই নেত্রী গীতাদি মুখ বাড়িয়েছেন এবং আমাকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছেন, ওটা কপট রাগ!

আমি তাই সাহসী হয়ে আরও এক বার খবরের প্রসঙ্গ তুলতে গেলাম। বিশ্বনাথদা এ বার চোঁচিয়ে উঠলেন, “গীতা... গীতা, দেখেছ এই রাস্কেলটার সাহস? ও আমাকে দিয়ে জোর করে কথা বলিয়ে নিতে চাইছে।”

চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে গীতা মুখোপাধ্যায় বললেন, “মিস্টার, (স্বামীকে এই সম্বোধনেই ডাকতেন তিনি) তোমার এই সব চিৎকার ও কেন সহ্য করবে বলো তো? আজকাল বাবা বকলেই ছেলেরা মানে না। আর বেচারা সেই থেকে...”

তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বিশ্বনাথদা বলে উঠলেন, “সহ্য করবে না তো গেট আউট। আমার ছেলে থাকলে আজ ওর চেয়ে বড় হত। একটু রাস্কেল বলেছি বলে ওর অপমান হয়ে গেল?”

এই রকম বকুনির মাধুর্য কি সহজে মেলে!

বিশ্বনাথদা শিখিয়েছিলেন, রাজনীতির লোকেদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে কথা বলতে হলে সকালবেলায় তাঁদের বাড়ি গিয়ে হাজির হতে হয়। ঠাট্টা করে বলেছেন, “তখন মেজাজটাও ঠান্ডা থাকে। আর সকালে কেউ চট করে মিছে কথা বলে না।”

বলেছিলাম, “তার মানে সকালে গেলে আপনি আর ইডিয়ট, রাস্কেল বলবেন না তো?”

হেসে বলেছিলেন, “তার পরে ওমলেটও খাওয়াবা।”

বহু দিন সকালে বিশ্বনাথদার বাড়ি গিয়ে চা-ওমলেট খেয়ে গল্প করে এসেছি। অবশ্যই খবরের ভাঁড়ার তাতে ভরেছে।

তাঁর খবর দেওয়ার কায়দাও ছিল বেশ মজার। বিতর্কিত বা তাঁদের পক্ষে অস্বস্তিকর কিছু জানতে চাইলে প্রথমেই একদফা ‘রাস্কেল, ইডিয়ট’-এর পর্ব চলত। তার পরে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তমলুকে রোগীদের মধ্যে ফল বিতরণ কিংবা পাঁশকুড়ায় দরিদ্রদের কম্বলদান জাতীয় কোনও সংবাদ লেখার ফরমায়েশ। অবশেষে ফিক করে হেসে বলতেন, “ওই তো ওই ঘরে সুকুমার আছে। ওর কাছে যাও। ও ছিল। সব জানো।”

এই সুকুমার হলেন সুকুমার গুপ্ত। বিশ্বনাথদা-গীতাদির সঙ্গে ওই সন্ধীর্ণ ফ্ল্যাটেই থাকতেন তিনি। তেঁতুল পাতায় ন’জনের মতো করে। ভিতরের দিকে একটি ছোট ঘর বরাদ্দ ছিল তাঁর জন্য। দলের প্রবীণ, শীর্ষস্থানীয় নেতা। ফর্সা, ছোটখাটো চেহারা। নিতান্ত ভালমানুষ। বিশেষ



বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঁ দিকে) অভিভাবকসুলভ বকুনিতেও মাধুর্য ছিল, সুকুমার গুপ্ত (ডান দিকে) ছিলেন অতি স্বল্পভাষী

কথাবার্তাও বলতেন না। বরং মনে হত, জগৎ-সংসারে কোথায় কী হচ্ছে, এ সব নিয়ে তাঁর যেন কোনও মাথাব্যথাই নেই। বিশ্বের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবরেও অচঞ্চল থাকার উৎকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন তিনি।

সেই সুকুমারদার ঘরে গিয়ে তাঁর পেট থেকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কথা বের করার পরিশ্রম বড় কম ছিল না। তাঁকে যেটুকু প্রশ্ন করা হত, তিনি যথাসম্ভব সংক্ষেপে হুঁ-হাঁ করে শুধু সেইটুকুর দায়সারা জবাব দিতেন। তাতে আর যাই হোক, খবরের খিদে মিটত না। উল্টে সবটাই সময়ের অপব্যয় হয়ে যেত।

এই ভাবে প্রায় বিধবস্ত হয়ে সুকুমার গুপ্তের ঘর থেকে বেরোনোর পরে বাইরের ঘরে বিশ্বনাথদা স্বয়ং ধরা দিতেন এবং শিশুসুলভ সারল্যে বলতেন, “কী, সুকুমার কিছু না বলে ভাগিয়ে দিল তো?”

এত কিছু পরে আসল খবরটুকু বলতেন তিনি। খুব গুছিয়ে বলে দিতেন, একেবারে খবরের কাগজে লেখবার মতো করে। এটা এক দিনের বা কোনও এক বারের ঘটনা নয়। এমনটাই ঘটত বারবার।

তখন লোডশেডিংয়ের যুগ। মাঝে মাঝেই বো স্ট্রিটে গিয়ে দেখতাম বিদ্যুৎহীন ছোট ঘরটিতে দরদর করে ঘামছেন বিশ্বনাথদা। আদুল গায়ে তোয়ালে গিয়ে ঘাম মুছছেন বারবার। এক এক সময় এই অবস্থায় তাঁর শ্বাসকষ্টও খুব বেড়ে যেত।

তবু সেই অবস্থাতেও বলতেন, “এই গরমে তুমি বসে কষ্ট করছ কেন? চলে যাও।”

কখনও চলে আসতে পারিনি। উল্টো দিকের চেয়ারে বসে তাঁর সেই কষ্ট দেখতাম। অনুভব করার চেষ্টা করতাম।

না, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঘরে কোনও ‘পাওয়ার ব্যাক আপ’ ছিল না। রাজ্যের শাসক ফ্রন্টের অন্যতম এক শীর্ষনেতা সম্ভবত তাঁর ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধের হিসেব করতে শেখেননি।

অশোক ঘোষ

সাংবাদিকতায় আমার শ্রদ্ধেয় এক অগ্রজ এক দিন বললেন, “চলো, এক জায়গায় নিয়ে যাব।”

আনন্দবাজার অফিস থেকে হাটা পথের দূরত্বে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য দফতর। পুরনো আমলের বাড়ি। বাথরুমের ‘ঝাঁঝ’ পেরিয়ে দোতলায় ওঠা। ঘরের মধ্যে ঘর। সেখানে বসেছিলেন অশোক ঘোষ।

আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই দাদা বলেছিলেন, “এই মানুষটিকে চিনে রাখো। পলিটিক্যাল রিপোর্টিং করতে হলে রোজ মন্দির-মসজিদ-গির্জার মতো এক বার করে এখানে মাথা ঠেকিয়ে যাবে।”

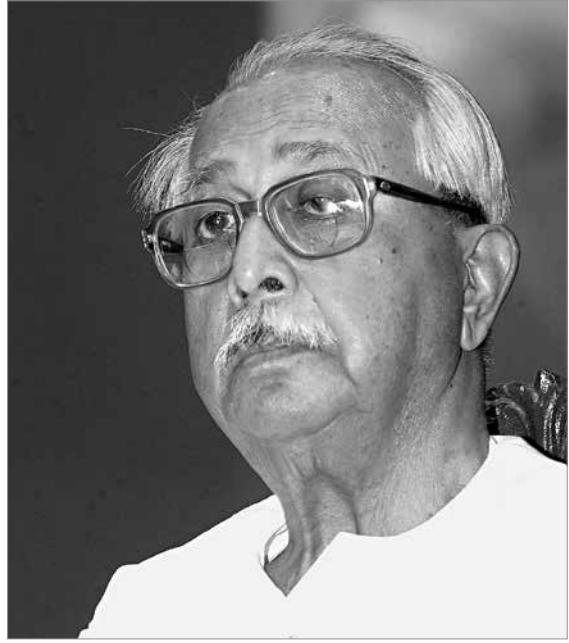
তার পর থেকে অন্তত তিরিশ বছর অশোকদার সঙ্গে সতিাই নিত্য যোগাযোগ রেখে চলতাম। তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একটানা ৬৫ বছর! ১৯৫১ থেকে আমৃত্যু, অর্থাৎ ২০১৬ পর্যন্ত। আর কোথায়, কোন দলে এমন নজির আছে, জানা নেই।

অকৃতদার অশোকদাকে যখন দেখেছি, তখনও তিনি কড়িয়ার সরকারি আবাসনের বাসিন্দা। নিতান্ত নিরাভরণ সেই ফ্ল্যাটেও গিয়েছি। তার পরে অশোকদার শরীর বেশি খারাপ হওয়ায় তাঁকে নিয়ে আসা হয় দলীয় দফতরের উপরতলায়। জীবনের শেষ কয়েকটি বছর সেখানেই কেটেছে তাঁর।

রাজনৈতিক গুরুত্বে বামফ্রন্টে ফরওয়ার্ড ব্লকের অবস্থান ছিল সিপিএমের ঠিক পরে। ফলে মন্ত্রীর সংখ্যাও অন্য শরিকদের থেকে কিছু বেশি। তাঁর আরও একটি কাজ ছিল— ফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে সমন্বয় রাখা। মাঝে মাঝেই খিটিমিটি লাগত। তখন অশোক ঘোষের তৎপরতা বেড়ে যেত।

ফ্রন্টের বৈঠক থেকে ফেরার পরে মওকা বুঝে তাঁর কাছে যাওয়া ছিল পেশাগত আবশ্যিকতা। তিনি মন দিয়ে বৈঠকে আগাগোড়া সব শুনতেন, বুঝতেন, আলোচনায় অংশ নিতেন এবং রিপোর্টারকে গুছিয়ে বলে দিতেন।

কেউ ভাবতেই পারেন, এ আর এমন কী অভিনব! কিন্তু অভিনব উপাদান অবশ্যই ছিল। কারণ বারবার দেখেছি, এটা করতে গিয়ে নিজের



বিরুদ্ধে লেখা নিয়ে কখনও অনুযোগ করেননি অশোক ঘোষ

কোলে ঝোল টেনে, মানে নিজের দলকে ‘বাঁচিয়ে’ কখনও খবর দিতেন না অশোক ঘোষ। যা হয়েছে, সেটা পুরোপুরি জানাতে দ্বিধা করতেন না।

এমনও হয়েছে, কখনও বলেছেন, “আজ তো ফরওয়ার্ড ব্লকের নাকে ঝামা ঘষে দিয়েছেন জ্যোতিবাবু। আপনাদের ভাল খবর হবে!” বলতে ভুলে গিয়েছি, তাঁর নাতির তুল্য রিপোর্টারদেরও কোনও দিন ‘আপনি’ ছেড়ে ‘তুমি’ বলতেন না অশোকদা। হাজার অনুরোধেও সেটা বদলাতে পারিনি।

কোনও দিন কোনও খবর লেখার পরে তা নিয়ে তাঁকে কোনও অনুযোগ করতেও দেখিনি। ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে কড়া কিছু লিখে পরদিন তাঁর কাছে যাওয়ার সময় অনেক বার ভেবেছি, আজ নিশ্চয় রোগে থাকবেন। অথচ ঘরে ঢুকতেই সহাস্যে তাঁর ব্যক্তিগত সহচর মানিক বা সুকান্তকে ডেকে বলেছেন, “মিষ্টি আনো। চা দাও।” কখনও বলেছেন, “বহরমপুরের ছানাবড়াগুলো আছে? দেবশিসবাবুকো দাও।” লেখা নিয়ে নিজে কোনও কথাই তোলেননি।

এক এক সময় আবার বলতেন, “একটা খবর বলছি। একটু গুছিয়ে লিখতে হবে।” দেখছি, সেই খবরটি তাঁর বা তাঁর দলের পক্ষে বিভ্রমনার। এটা লিখতে বলছেন দলের শীর্ষনেতা স্বয়ং? অশোকদা বলেছেন, “নয় কেন? লেখার জন্যই তো বলছি। চাই আনন্দবাজার লিখুক। আমাকেও একটু গালমন্দ করুক। খবর যা, তা খবর।”

শুধু বামের নয়, কংগ্রেস-সহ অন্যান্য বড় দলের ভিতরকার বহু খবরাখবরও অশোক ঘোষের কাছে পাওয়া যেত। খবরের ‘সোর্স’ হিসেবে এতটাই ‘কার্যকর’ ছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দাবিতে বলতে পারি, তাঁর দেওয়া কোনও খবর ভুল প্রমাণিত হয়নি।

তার একটি চরম উদাহরণ দিই। ২০০০ সাল। কালীপুজোর সঙ্গে। অফিস থেকে উঠব উঠব করছি। অশোকদার ফোন।

তাঁর সঙ্গে আমার ফোনালাপের একটি নিজস্ব সম্বোধন ছিল। আমি বলতাম, “দাদা, প্রণাম।”

তিনি বলতেন, “প্রণাম, প্রণাম।” সে দিনও তাই। কিন্তু তার পর উনি বললেন, “আজ শুধু প্রণাম নয়। এক বার আসতে হবে।”

এখন! কালীপুজোর সঙ্গেবেলায়! তিনি নাছোড়। অতএব গেলাম।

যেতেই বললেন, “একটা খবর পেলাম। তাই ডাকলাম।”

কী খবর? চোখ বুজে ধীরে ধীরে তিনি বলতে লাগলেন, “বড়বাবু তো (জ্যোতিবাবু) চললেন। ছোটবাবু (বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য) আসছেন।

নভেম্বরের ৫-৬ তারিখে শপথ।”

কী বলছেন দাদা! তিনি তাড়া দিয়ে বললেন, “বলে তো দিলাম। এ বার ছুটে গিয়ে লিখে ফেলুন।”

না, লিখতে পারিনি। কারণ পেশাগত বাধ্যবাধকতায় আরও যে ভাবে খবরটি যাচাই করার প্রয়োজন ছিল, সেই রাতে অনেক চেষ্টা করেও তা করতে পারিনি। খবরটি পরদিন করেছিল শুধু ‘দ্য টেলিগ্রাফ’। আর অশোক ঘোষ কটাক্ষ করে বলেছিলেন, “আমি তো ছোট পার্টির ছোট নেতা। তাই আনন্দবাজারের রিপোর্টার আমাকে ভরসা করতে পারেনি।”

অশোকদা তখন খুবই অসুস্থ। তবে তখনও হাসপাতালে ভর্তি হননি। সেই সময় একদিন দেখা করতে গিয়েছিলাম। দৃষ্টিশক্তিগতায় চিরকাল ভোগা লোকটি তত দিনে কার্যত অন্ধ। হাত বাড়িয়ে বললেন, “দেখতে তো পাই না। মুখটা এক বার সামনে আনুন। একটু হাত বুলিয়ে পুরনো চেহারাটা মনে করি।” তার পরে হাত ধরলেন এবং বললেন, “অনেক দিনের সম্পর্ক। ব্যবহারে কখনও কিছু ভুল হয়ে থাকলে মনে রাখবেন না।”

বড় বিস্ময় লাগে। এঁরাও নেতা ছিলেন! এঁরাও এক সময় পশ্চিমবঙ্গ ‘শাসন’ করেছেন!

মাখন পাল

তিনি ডাক দিলেন, “ওরে রামগুলাম, বাবুরা এসেছে। মুড়ির টিনখান একটু দে বাবা!”

বাচনে ওপার বাংলার ছাপ স্পষ্ট।

অনতিবিলম্বে মুড়ির টিন, মানে গুঁড়ো দুধের একটি পুরনো বিবর্ণ কৌটো, ঘরে পৌঁছল। সঙ্গে একটি থালায় সাজানো কয়েক কাপ চা। মাখন পাল বললেন, “নে তোরা, চা-মুড়ি খা।”

স্থান, রিপন স্ট্রিটের ক্রান্তি প্রেস। সেটি আরএসপি-র কমিউন এবং দলীয় পত্র-পত্রিকা ছাপানোর ঠিকানা। গেটে ঢুকলেই একটি প্রশস্ত উঠোন। তার ডান দিকে ছোট ছাপাখানা এবং লাগোয়া কয়েকটি ঘর। উল্টো দিকে একটি মাঝারি মাপের ঘরে দলের রাজ্য সম্পাদক মাখনদার থাকা-খাওয়া-শোয়া-বসা। বামফ্রন্ট সরকারের তাঁদের তখন তিন-চার জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী। প্রসঙ্গত, মাখনদা নিজেও ছিলেন জলপাইগুড়ির অতি বর্ষিষ্ণু পরিবারের ‘গৃহত্যাগী’ সন্তান।

আমি যখন তাঁকে দেখেছি, তিনি তখন প্রায় বৃদ্ধ। সুযোগ পেলে দুপুরে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে বিকেল চারটে নাগাদ উঠতেন মাখনদা। লুঙ্গি আর হাতাওয়া ঢোলা গেঞ্জি ছিল তাঁর পরিচিত পোশাক। নিপাট, পরিচ্ছন্ন অবয়ব। খবর চাইলে প্রথমেই বলতেন, “আজ কিছু নাই রে ভাই।”

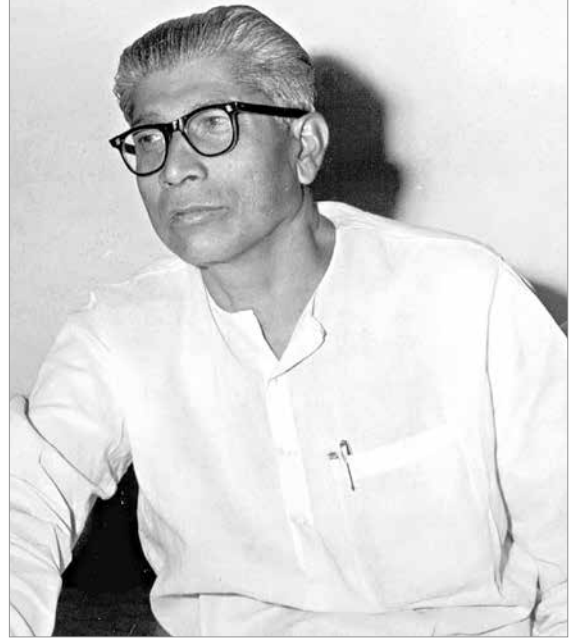
তাঁর বলার ধরনে কথাটি সেই সময় আমাদের মতো নব্য রিপোর্টারদের মহলে প্রায় মুখে মুখে ফিরত।

খবর দেওয়ার ব্যাপারে মাখন পাল কার্যত একটু কৃপণই ছিলেন। নিজে চট করে মুখ খুলতেন না। বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারিতে সিপিএমের চাপে আরএসপি যখন তাদের মন্ত্রী যতীন চক্রবর্তীকে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে, তখনও মাখনদাকে এ ব্যাপারে খুব বেশি কথা বলতে দেখিনি। বরং বেশি বলতেন অন্যেরা।

কোথায় কে কী লিখেছেন বা বলছেন, সে সব নিয়েও প্রকাশ্যে বিশেষ কোনও তাপ-উত্তাপ ছিল না মাখন পালের। এমনকি, আরএসপি সম্পর্কে কেউ কোনও সমালোচনা করেছে বললেও তিনি সেই প্রসঙ্গে জল ঢেলে দিয়ে বলতেন, “যে যা বলে বলুক। আমরা ছোট পার্টি। বড় বড় কথায় কাজ নাই।”

তবুও রাজনৈতিক খবর সংগ্রহের নিত্য ঘোরাফেরায় মাখন পাল কখনও বাদ পড়েননি। ক্রান্তি প্রেসে টু মারতেই হত। সেখানেই কখনও দেখা মিলত ত্রিদিব চৌধুরীরা। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাংসদ। কলকাতায় এলে থাকতেন ওইখানে।

এক দিন আমাদের বন্ধুদের মধ্যে একটি ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক ফস করে বলে বসলেন, “আপনারা তো ননী-মাখনের পার্টি।



বর্ষিষ্ণু পরিবারের সন্তান হয়েও অনাড়ম্বর রাজনৈতিক জীবন বেছে নিয়েছিলেন মাখন পাল

তাই কিছুই করতে পারবেন না!”

যিনি বলেছিলেন, তাঁর কোনও উদ্দেশ্য ছিল, তা নয়। সমস্যা বাংলা কম জানা। কিন্তু নিমেষে দেখলাম, মাখনদার মুখ থমথমে হয়ে গেল। আসলে আমাদের ওই বন্ধু বোঝেননি মাখনদা ছাড়াও তাঁর দলের এক প্রবীণ মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্যের নামটিও জড়িয়ে পড়েছে। আর ‘ননী-মাখনের পার্টি’ কথাটির অর্থ হয়ে যাচ্ছে ‘কামানেওয়ালা’।

এর পরে সেদিন আর ওখানে থাকার অবস্থা ছিল না। কয়েক দিন পরে মাখনদা হঠাৎ ওই সাংবাদিকের নাম করে জানতে চাইলেন, “ও কেন আসে না রে? ওরে নিয়ে আসিস। বলিস, আমি কিছু মনে রাখি নাই।”

মাঝে মাঝে আমরা আবদার করতাম, আজ ফিশ্ফাই বা কাটলেট খাওয়াতে হবে। মাখনদা হেসে বলতেন, “আমার পয়সা নাই রে।” কখনও বলতেন, “দেখি, এখনই তো জেকি (মন্ত্রী যতীনবাবুর ঘরোয়া নাম ছিল জ্যাকি) আসবে। ও টাকা দিলে হবে।” যতীনদা এসে চপ-কাটলেট আনাতে।

আরএসপি-র রাজ্য দফতর মৌলালির মোড়ে। রিপন স্ট্রিট থেকে ট্রামেই বেশি যাতায়াত করতেন দলের রাজ্য সম্পাদক মাখন পাল। তারও বছর ছয়েক আগে ক্ষমতায় এসেছে পার্টি। তখনও নিজস্ব গাড়ি ছিল না।

সেই আমলে এক বার ট্রাম থেকে পড়ে জখম হন মাখনদা। খবর পেয়ে প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁকে বলেন, “এখন পার্টি আপনার জন্য একটা গাড়ি তো কিনতে পারে?”

মাখনদার সদুত্তর মিলেছে না দেখে এবার প্রমোদবাবুর ঠাট্টা, “আচ্ছা গাড়ি না হয় আমরাই কিনে দেব আপনাকে। কিন্তু এ ভাবে এই বয়সে ট্রামে-বাসে উঠতে যাবেন না।”

মাখনদা হেসে উত্তর দিলেন, “আপনারা বড় পার্টি। আমাকে একটা গাড়ি দিতেই পারেন। তবে জানেন তো, এককালে বড় জমিদারেরা ছোট জমিদারদের হাতি উপহার দিত। মনে মনে বলত, আমি তো হাতি দিলাম। হাতির খোরাকি জোগাতে ওর জমিদারি উঠে যাক! আপনার প্রস্তাবও সেই রকম।”

কয়েক দিন পরে অবশ্য একটি অ্যাম্বাসাডর কিনেছিল আরএসপি। তাতে মাখন পাল চড়তেন এবং অন্যেরাও।

আন্ডারটেকার ও রূপকথা

ইন্দ্রনীল সান্যাল

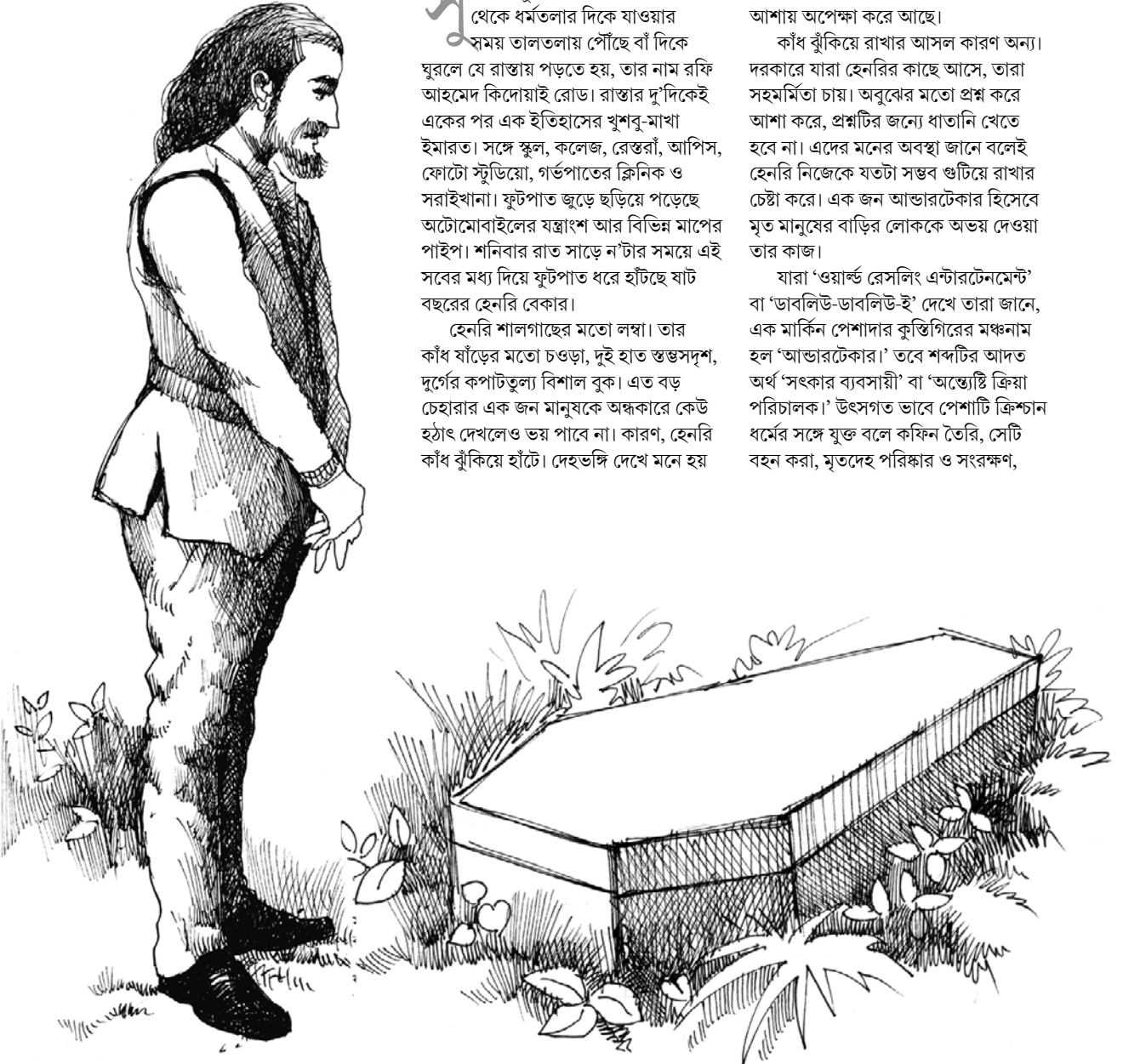
সুৱেন বাঁড়ুজ্জ রোড ধরে মৌলালি থেকে ধর্মতলার দিকে যাওয়ার সময় তালতলায় পৌঁছে বাঁ দিকে ঘুরলে যে রাস্তায় পড়তে হয়, তার নাম রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড। রাস্তার দু'দিকেই একের পর এক ইতিহাসের খুশবু-মাখা ইমারত। সঙ্গে স্কুল, কলেজ, রেস্টুরাঁ, আপিস, ফোটো স্টুডিও, গর্ভপাতের ক্লিনিক ও সরাইখানা। ফুটপাথ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে অটোমোবাইলের যন্ত্রাংশ আর বিভিন্ন মাপের পাইপ। শনিবার রাত সাড়ে ন'টার সময়ে এই সবে মধ্য দিয়ে ফুটপাথ ধরে হটছে যাঁট বছরের হেনরি বেকার।

হেনরি শালগাছের মতো লম্বা। তার কাঁধ যাঁড়ের মতো চওড়া, দুই হাত স্তম্ভসদৃশ, দুর্গের কপাটতুল্য বিশাল বুক। এত বড় চেহারার এক জন মানুষকে অন্ধকারে কেউ হঠাৎ দেখলেও ভয় পাবে না। কারণ, হেনরি কাঁধ ঝুকিয়ে হাঁটে। দেহভঙ্গি দেখে মনে হয়

সর্বস্ব সমর্পণ করে উপরওয়ালার বিচারের আশায় অপেক্ষা করে আছে।

কাঁধ ঝুকিয়ে রাখার আসল কারণ অন্য। দরকারে যারা হেনরির কাছে আসে, তারা সহমর্মিতা চায়। অবুঝের মতো প্রশ্ন করে আশা করে, প্রশ্নটির জন্যে ধাতানি খেতে হবে না। এদের মনের অবস্থা জানে বলেই হেনরি নিজেকে যতটা সম্ভব গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করে। এক জন আন্ডারটেকার হিসেবে মৃত মানুষের বাড়ির লোককে অভয় দেওয়া তার কাজ।

যারা 'ওয়ার্ল্ড রেসলিং এন্টারটেনমেন্ট' বা 'ডাবলিউ-ডাবলিউ-ই' দেখে তারা জানে, এক মার্কিন পেশাদার কুস্তিগিরের মঞ্চনাম হল 'আন্ডারটেকার'। তবে শব্দটির আদত অর্থ 'সৎকার ব্যবসায়ী' বা 'অন্তোষ্টি ক্রিয়া পরিচালক।' উৎসগত ভাবে পেশাটি ক্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে যুক্ত বলে কফিন তৈরি, সেটি বহন করা, মৃতদেহ পরিষ্কার ও সংরক্ষণ,



কবর খোঁড়া এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পরিচালনাও কাজের মধ্যে পড়ে। মোন্দা কথা, হেনরি একজন মৃত্যু ব্যবসায়ী। তার কোম্পানির নাম ‘বেকার অ্যান্ড কোং’।

আঠারোশো ত্রিশ সালে পল বেকার এবং তাঁর স্ত্রী মিলে ইংরেজ রাজপুরুষদের সুবিধার্থে কোম্পানিটি খোলেন। সেই থেকে চলছে। পলের নাতির নাতি এক বঙ্গললনাকে বিবাহ করেন। তার পর থেকে বেকার পরিবার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

হেনরির স্ত্রী মারা গেছে পনেরো বছর আগে, হার্ট অ্যাটাকে। তাদের একমাত্র সন্তান ডেভিড তখন কলকাতায় থাকত। এখন সে বো-বাচ্চা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় থিতু। হেনরি চাইলেই সেখানে চলে যেতে পারে। কিন্তু সে কলকাতা ছেড়ে নড়বে না।

দু’দশক আগেও বেকার অ্যান্ড কোং-এ চাকরি করত দশ জন কর্মচারী। এখন মাত্র দু’জন। অজয় আর মলিনা বিশ্বাস, স্বামী-স্ত্রী।

অজয় হল হেনরির ‘ম্যান ফ্রাইডে’। শববাহী গাড়ি চালিয়ে মৃতদেহ নিয়ে আসা, ফরমালডিহাইড নামক রাসায়নিক দিয়ে প্রক্রিয়াকরণের সময় হেনরিকে সাহায্য করা, শববাহী গাড়ি চালিয়ে গোরস্থানে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া— এগুলো সে করে। মলিনার কাজ রান্না করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, বাড়ি সাফ রাখা। দরকার পড়লে ডিপ ফ্রিজ থেকে মৃতদেহ চাগিয়ে তোলার ব্যাপারেও ওস্তাদ। মার্কোমধ্যেই হেনরিকে বলে, “মরে যাওয়ার আগে ব্যবসাসটা আমার নামে করে দাও হেনরিদা। তোমার পুণ্য হবে।”

হেনরি সব সময় বাংলা বললেও কাস্টমারের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলে। হেনরির পরামর্শ মতো মলিনা আর অজয়ও ইংরেজি ঝাড়ে। মলিনা এক বার এক ইংরেজিভাষী বঙ্গসন্তানকে বলেছিল, “আপনি বারবার এই জায়গাটাকে ‘মর্চুয়ারি’ বলছেন কেন? এটা লাশকটা ঘর নয়। আমার আন্নারটেকার। আমরা এই শহরের একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যারা মৃতদের সঙ্গে বসবাস করি।”

মৃতদের সঙ্গে বসবাস! এটাই হেনরির জীবন। বেশির ভাগ সময় ফরমালডিহাইডের বাঁঝালো গন্ধে নাক বন্ধ থাকা বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে আঙুলের ডগা থেকে চামড়া উঠে যাওয়াটাই রুটিন। তবে আজ কোনও মৃতদেহ নেই। তাই কাজও নেই। আজ খোলা হাওয়ায় ঘোরার রাত।

সুরেন বাঁড়ুজ্জে রোডে পড়ে হেনরি চলে এসেছে ধর্মতলার কাছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, রাস্তার ডান দিকে পুরনো দোতলা বাড়ির একতলায় নতুন একটা কাফে তৈরি হয়েছে। দেওয়ালে আঁকা রয়েছে গোলাপি রাজকন্যা, নীল রাজপুত্র আর সবুজ রঙের রান্ধস! কাফেটেরিয়ার সামনের দিকটা কাচে মোড়া। শোকেসে অনেক রকমের কেঁক, পেস্তি, মাফিন, কুজি আর প্যাটি সাজানো। আর

আছে অজস্র রকমের কফি।

কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল হেনরি। কাউন্টারের অন্য প্রান্ত থেকে এক বয়স্ক মহিলা পরিশীলিত কণ্ঠে বলল, “ফেয়ারিটেল কাফে ক্লোজ্জেজ্জ অ্যাট টেন পিএম, স্যার।” “সরি!” হেনরি ফুটপাতে নামল।

১১ ২ ১১

রূপকথা দাশগুপ্ত যে সাংবাদিকতা করবে, এ তার জন্মলগ্ন থেকেই নির্দিষ্ট ছিল। বাবা ইংরেজি খবরের কাগজের সাংবাদিক, মা বাংলা পত্রিকার। বেথুন স্কুল, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে ছাব্বিশ বছর বয়সে ট্রেনি জার্নালিস্ট হিসেবে সে যোগদান করেছিল পূর্ব ভারতের বৃহত্তম মিডিয়া হাউস ‘লিবার্টি ইন্ডিয়া’-র লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন ‘গসিপ’-এ। ট্রেনি জার্নালিস্ট থেকে সিনিয়র সাব এডিটর হতে সময় লাগল ছ’ বছর।

মেয়ের উন্নতিতে উচ্ছ্বসিত হলেও বাবা-মা সেটা প্রকাশ করেননি। মা বলেছিলেন, “বিয়েটা করে ফেল। বত্রিশ বছর বয়স হল। এর পরে বাচ্চা নিলে সমস্যা দেখা দেবে।”

রূপকথা বলেছিল, “দেখো মা, বায়োলজিকাল ক্লক আর কেরিয়ার ক্লক পরস্পরবিরোধী। একটাকে সময় দিলে অন্যটা ফস্কে যাবে। আমার প্রায়োরিটি কেরিয়ার! বাচ্চাকাচ্চা ইজ নট মাই কাপ অব টি!”

এখন রূপকথা একষড়ি। আজ থেকে উনত্রিশ বছর আগে বিয়ে না-করার কথা বলা দুঃসাহসের ছিল। তবে সেই দুঃসাহস দেখিয়েছিল রূপকথা। বাবা-মা আপত্তি শোনেননি। রূপকথাও সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে ঝগড়ায় যায়নি। টুক করে মার্চেন্ট নেভির ইঞ্জিনিয়ার শিলাদিত্যকে বিয়ে করে ফেলে। রূপকথা বা শিলাদিত্য— কারও মধ্যেই টিপিকাল দাম্পত্য, প্রেম বা সংসার করার আগ্রহ ছিল না। শিলাদিত্য বছরের মধ্যে ছ’মাস দেশের বাইরে থাকত। রূপকথাও ধর্মতলার পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যায়নি। এ সব সমস্যা সত্ত্বেও তাদের একটি মেয়ে হল। তার নাম রাখা হল শ্রুতি।

বিয়াল্লিশ বছর বয়সে রূপকথা হয়ে গেল গসিপের সম্পাদক। চব্বিশ ঘন্টাও কম পড়ছে কাজ করার জন্যে। প্রায়োরিটি লিস্টের এক থেকে ন’ নম্বর পর্যন্ত রয়েছে গসিপ। দেশে পরিবার। সেখানে বাবা-মা এবং শ্রুতির পরে শিলাদিত্যের নাম।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে শিলাদিত্যের সঙ্গে ডিভোর্স। বিচ্ছেদের নির্দিষ্ট কোনও কারণ ছিল না। বন্ধুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তি হল। শ্রুতি রইল রূপকথার কাছে।

হু হু করে বছর যেতে লাগল। পূর্ব ভারতের পাশাপাশি পশ্চিম ভারতেও এক নম্বর লাইফস্টাইল ম্যাগাজিন হয়ে গেল

গসিপ। প্রতি সপ্তাহে কলকাতা, মুম্বই, নাগপুর, পুনে, রাঁচি, পটনা করে বেড়াচ্ছে রূপকথা। বাবা-মা মারা গেলেন। ধর্মতলার বাড়ির বাসিন্দা বলতে শ্রুতি আর রূপকথা। শ্রুতি লেখাপড়া চুকিয়ে আমেরিকান স্পোর্টসওয়্যার সংস্থায় যোগ দিল। আঠাশ বছর বয়সেই সে কোম্পানির সাউথ ইস্ট এশিয়ার হেড। হংকং-এ থাকে, অটেল ডলার মাইনে পায়।

একাকিত্ব কাকে বলে সেটা রূপকথা বোঝার আগেই ভারতে চলে এল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো। যে তারকাদের সাক্ষাৎকার পড়ার জন্যে পাঠক ‘গসিপ’ কিনতেন, সেই তারকারাই টুইটার, ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুকে ফ্যানদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা শুরু করলেন। তারকারা কী ভাবে মেকআপ করেন, কোন ধরনের ওয়াকআউট করেন, কোন ডায়েট ফলো করেন, সেটা জানার একমাত্র প্ল্যাটফর্ম ছিল ‘গসিপ।’ সেই প্ল্যাটফর্মকে এক ধাক্কায় সরিয়ে তারকারা সোশ্যাল মিডিয়াকে প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার শুরু করলেন। নিজস্ব টিম দিয়ে ভিডিও শ্যুট করিয়ে দেখাতে লাগলেন মেকআপ, ওয়াকআউট, গোপন ডায়েট। গসিপের বিক্রি কমতে লাগল হুহু করে।

এই ক্রান্তিকালে রূপকথা বিরাট ঝুঁকি নিয়ে গসিপকে ওয়েব পোর্টালে বদলে ফেলল। পত্রিকার বিক্রি কমতে কমতে এক সময় সেটি বন্ধ হয়ে গেল। তত দিনে জমাটি ওয়েব পোর্টাল হিসেবে এক নম্বর অবস্থানে চলে এসেছে গসিপ ডট ইন। নতুন জমানার নতুন বিনোদনের সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিল রূপকথা। প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরা ধীরে ধীরে বিদায় নিল। চলে এল এক ঝাঁক তরুণ ছেলেমেয়ে। তারা একই সঙ্গে কপি লেখে, ফোটা আর ভিডিও শ্যুট করে, ইনফোগ্রাফিক্স বানায়, ‘ক্লিকবেট’-এর উপযোগী হেডলাইন তৈরি করে। অতীতে সপ্তাহে ছ’দিন অফিস করতে হত। এখন সাত দিন, রাত দিন। ‘ওয়ার্ল্ড ফ্রম হোম’ মানে যে বাড়িটা অফিস হয়ে যাওয়া এটা বুঝতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল রূপকথা। কাজের সমুদ্রে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

এই করতে করতে কবে যে মাথার সব চুল পেকে গেল, কবে রঞ্জনিবৃত্তি হল, কবে ষাট বছর এসে গেল— বোঝাই গেল না। অবসরের পরের দিন থেকে আর অফিসের কথা ভাবেনি রূপকথা। অতীত নিয়ে সে বাঁচে না। গসিপের পরে তার নতুন প্যাশন, ‘ফেয়ারিটেল কাফে।’

বাড়ির একতলায় একটি কাফে খোলার পরিকল্পনা রূপকথার মাথায় আসে আটাম বছর বয়সে। তখন থেকেই সে গোপনে কাজ শুরু করেছিল। কাফের উদ্বোধন হয়েছে অবসরের এক মাস পরে। এগারো মাস একটানা খেটে কাফেটি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

তবে এর মধ্যে তার জীবনে একটি বড় পরিবর্তন এসেছে। অবসরের এক বছর আগে ধরা পড়ে, রক্তে কৰ্কটরোগ বাসা বেঁধেছে।

অফিসের উদ্যোগে দ্রুত চিকিৎসা শুরু হয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পরে রূপকথা ভাল আছে, তবে বিপন্মুক্ত নয়। কাঁকড়াটি যায়নি। ছোট হয়ে, গুটিয়ে শরীরের কোথাও ঘাপটি মেয়ে বসে আছে।

মৃত্যুকে শরীতে বহন করতে হচ্ছে বলে মন খারাপ করার বান্দা নয় রূপকথা। সে সব সময় প্রাণোচ্ছল। এই যেমন এখন। রাত পৌনে দশটার সময় বিশাল চেহারার লোকটিকে কাফেতে ঢুকতে বারণ করার পরেই মনে পড়ল, দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে অন্তত দু'বার লোকটির সাক্ষাৎকার নিয়েছে। নাম মনে না থাকলেও পেশা মনে আছে।

কাচের দরজা খুলে রূপকথা বলল, “আন্ডারটেকারের জন্যে পৃথিবীর সব দরজা চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে।”

১১ ৩ ১১

“আপনি আমাকে চেনেন?” অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল হেনরি। এটা ঠিক যে বড় চেহারা ও সাহেবি ত্বকের কারণে সে সবার আগে চোখে পড়ে। কিন্তু তার পেশা জানে এমন লোকের সংখ্যা কম।

“আমি আপনার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম।” হেনরিকে বসতে অনুরোধ করল রূপকথা। মেনু কার্ড হাতে নিয়ে হেনরি ভুরু কুঁচকেছে, “অনেক বছর আগে একটা বাচ্চা মেয়ে এসেছিল। পরে এক লেডি আসেন। আর একবার একটা ছেলে এসেছিল ওয়েব পোর্টালের জন্যে।”

“বাচ্চা মেয়েটা আমিই ছিলাম। তখন ‘গসিপ’ ম্যাগাজিনে সদ্য ঢুকেছি। কলকাতাকে অন্য চোখে দেখার চেষ্টায় অচেনা পেশার মানুষজনকে নিয়ে একটা সিরিজ করেছিলাম। তার মধ্যে আপনি ছিলেন। পরে যে লেডি এসেছিলেন, সেটাও আমি। তবে তখন আমি এডিটর। গসিপের পোর্টালের থেকে আপনাকে কভার করার জন্যে কাকে পাঠিয়েছিলাম মনে নেই। কী খাবেন বলুন।”

“একটা ডাবল এসপ্রেসো আর একটা চিকেন প্যাটি,” বলল হেনরি। কফি মেকারে হাত দিয়ে রূপকথা বলল, “ডাবল এসপ্রেসো খুব কম কাস্টমার প্রেফার করে।”

আড়মোড়া ভেঙে হেনরি বলল, “আপনি আর গসিপে নেই?”

“রিটায়ার করেছি। আমি এখন সিনিয়র সিটিজেন! বাড়িতে বসে ল্যাপটপ খাওয়ার কথা। কিন্তু আমি কাজ করতে ভালবাসি।”

“আপনার বাড়ি কোথায়?”

“এটাই আমার বাড়ি। একতলাটা রেনোভেশন করার পর কাফের জন্যে জায়গা বেরিয়েছে,” প্যাটির প্লেট আর কফি মাগ

এগিয়ে দিল রূপকথা।

“আমরা খুব কাছাকাছি থাকি। এটা আগে বলেননি।” প্যাটিতে কামড় দিল হেনরি।

“কী ভাবে বলতাম?” চোখের পাতা ফড়ফড়িয়ে, ফ্লাট করার গলায় রূপকথা বলে ওঠে, “মিস্টার বেকার, ডু ইউ নো, আই লিভ নিয়ার বাই?”

“তা ঠিক!” হো হো করে হাসল হেনরি, “আপনার ফ্যামিলি?”

“ডিভোর্সের পরে একাই থাকি। বাবা-মা মারা গেছেন। মেয়ে হংকং-এ।”

“প্যাটিটা খুব ক্রিসপি!” কথার প্রসঙ্গ বদলায় হেনরি।

রূপকথা বলল, “প্রথম বার যখন আপনার কাছে গিয়েছিলাম, তখন ওই চত্বরের কেউ বলতে পারেনি ‘বেকার অ্যান্ড কোং’ কোন বাড়িটা। পরে বুঝেছিলাম ওরা জানত। বলতে চায়নি।”

“কী করে বুঝেছিলেন?” ডাবল এসপ্রেসোতে চুমুক দিল হেনরি।

“আপনার ইন্টারভিউ নিয়ে বেরিয়ে

আসার সময় খেয়াল করেছিলাম, লোকাল লোকেরা আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় স্পিড বাড়িয়ে হাঁটছে। অ্যান্ড ইফ, মৃত্যুকে পাশ কাটিয়ে পালাচ্ছে। যারা লোকাল নয়, তারা আপনার বাড়ির সামনে এসে বিজাতীয় গন্ধ পেয়ে নাক কুঁচকে এ দিক ও দিক দেখছে।”

“ওটা একটা কেমিক্যালের গন্ধ। আমার গা থেকে এখনও আসছে নাকি? সারি!”

“আপনার শার্ট থেকে পারফিউমের স্ফুটি স্মেল আসছে।”

হেনরি বলে, “এই কোলনটা আমার ছেলে ডেভিড পাঠিয়েছে। আলমারিতে পড়েই ছিল। আজ স্নান করে বেরোনার সময় মাখলাম। আসলে ব্যাক অব দ্য মাইন্ডে সব সময় কাজ করে, ওই স্মেলটা আসছে না তো? দ্যাট স্মেল অব ডেথ।”

‘স্মেল অব ডেথ’ শব্দবন্ধ শুনে হেনরির দিকে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে রইল রূপকথা। অবশেষে বলল, “আপনার শরীরের বাইরে মৃত্যুর গন্ধ লেগে থাকে। আমার শরীরের ভিতর থেকে মৃত্যুর গন্ধ ভেসে আসে।”

হেনরি কফিতে চুমুক দিল।

খুব সংক্ষেপে নিজের ব্যাখির কথা বলে অন্য বিষয়ে ঢুকল রূপকথা, “আপনার ছেলে কোথায় থাকে?”

“সে বৌ-বাচ্চা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায়। আমার বৌ মারা গেছে। আমার দু’জন স্টাফের মধ্যে কেউ না কেউ রাতে আমার সঙ্গে থাকে। ওরা হাঙ্গব্যান্ড ওয়াইফ। ওদের বাড়িতে দুটো মেয়ে। এক জনকে বাড়ি ফিরতেই হয়।”

দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রূপকথা বলল, “কাফে বন্ধ করব। আপনি ভিতরে চলুন। ডিনার করিয়ে ছাড়ব।”

“মেনু কী?” হেনরি আপত্তি করল না।

“আমি রাতে সুপ আর স্যালাড খাই।

তবে মেনু নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি এফিশিয়েন্ট কুক। যা বলবেন বানিয়ে দেব।”

মাথা চুলকে হেনরি বলল, “মুরগির মাংস আর রুটি হলেই হবে। সঙ্গে পেঁয়াজ-লবঙ্গ।”

“ডান!” ফেয়ারিটেল কাফে-র শাটার টেনে দিল রূপকথা।

চল্লিশ মিনিট পরে রাতের খাবার খেতে খেতে রূপকথা বলল, “এখন আপনার কাজের বাজার কেমন?”

“মৃতদেহ সংরক্ষণ তো কোনও রুটিন প্রসেস নয়! বিপদে না পড়লে লোকে আমার কাছে আসে না। ধরুন বাবা বা মা মারা গেছেন, ছেলেমেয়ে বিদেশে। তারা ইমিডিয়েটলি ছুটি অথবা এয়ার টিকেট পাচ্ছে না। তখন এক বা দু’সপ্তাহের জন্যে বডি ‘এমবামিং’ করতে হয়। এ ছাড়া অ্যান্ড্রিডেন্টাল ডেথ হলে অনেক সময় বডি বা ফেস বিকৃত হয়ে যায়। তখন যতটা পারি নরমালসি প্রিজার্ব করি।”

দু’জনের খাওয়া শেষ। হেনরি বলল, “সাড়ে এগারোটা বাজে। এ বার উঠি?”

ফেয়ারিটেল কাফের বিজনেস কার্ড এগিয়ে রূপকথা বলল, “চলুন, আপনাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিই।”

কার্ড হাতে নিয়ে হেনরি বলল, “আন্ডারটেকার কখনও ভিজিটিং কার্ড দেয় না। সে না বলে আসে।”

“পি জে!” নাক কুঁচকোয় রূপকথা।

হেনরি বলল, “এই রকম আরও কয়েকটা রন্ডি জোক শোনার জন্যে কাল আমার বাড়িতে আপনার নেমন্তন্ন। একটু আগে কাফে বন্ধ করে শার্প দশটার সময় আসবেন। মলিনা খুব ভাল চাইনিজ বানায়।”

১১ ৪ ১১

দোতলা বাড়িটা একদম আগের মতো আছে। রং বা পলেস্তারা পড়েনি। রংচটা কাঠের দরজার উপরে অ্যালুমিনিয়ামের সাদা সাইনবোর্ডে নীল রঙে লেখা, ‘বেকার অ্যান্ড কোং।’ নীচে ছোট হরফে প্রতিষ্ঠার সাল।

মলিনা দরজা খোলার পরে ভিতরে ঢুকে রূপকথা দেখল সে একটা হলঘরে দাঁড়িয়ে। ফ্যাকাশে নীল দেওয়ালে ঝুলছে নির্জন একটি কাঠের ক্রস। ঘরের কোণে একটি কফিন আর একটি হাতে টানা দু’চাকার গাড়ি দাঁড়িয়ে। লাশ বয়ে নিয়ে যাওয়ার হ্যান্ডকার্ট দেখে গা ছমছম করে! হলের এক দিকে অফিস ঘর। অন্য দিকের ঘরে বিশাল একটি ডিপ ফ্রিজ, যার থেকে ঝাঁঝালো গন্ধ ভেসে আসছে।

“বাড়িতে কয়েকটা মড়া না থাকলে আমাদের ঘুম আসে না,” নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল মলিনা, “আজ মড়া নেই বলে আমাদের মন খারাপ।”

এই রকমের রসিকতা পছন্দ নয় রূপকথার। সে নীরবে মলিনার সঙ্গে দোতলায় উঠল। দোতলাটা একদম আলাদা। প্রতিটি ঘরের দেওয়ালে ওয়াল পেপার। সব ঘরে একাধিক ব্রিটিশ আমলের আসবাব। অতীতে দু'বার এই ঠিকানায়ে এলেও দোতলায় আসা হয়নি। আজ ঘরগুলো দেখে হেনরির রুচির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মাল। মনে হল, এর সঙ্গে আগে আলাপ হয়নি কেন!

বসার ঘরের টেবিলে পানীয় আর খাদ্য সাজিয়ে বসে রয়েছে হেনরি। মলিনার বানিয়ে দেওয়া লেমন চিকেন আর হুইস্কি-সহ আড্ডা শুরু হল। কাফে নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলতে গিয়ে নিজেকে থামিয়ে রূপকথা বলল, “আচ্ছা, এমবামিং কাকে বলে?”

পছন্দের বিষয় পেয়ে হেনরি নড়েচড়ে বসল। “মারা যাওয়ার পরে শরীরের পচন শুরু হয়। সেটাকে ডিলে করার পদ্ধতির নাম এমবামিং। ফরমালডিহাইড নামের একটা কেমিক্যাল শরীরে ইনজেক্ট করতে হয়।

“ম্যাক্সিমাম কত দিন ডিলে করেছেন?”

লেমন চিকেন মুখে দিয়েছে রূপকথা। “গাড়ি অ্যান্ড্রিডেটে এক জাপানি ছোকরা মরে যায়,” হুইস্কিতে চুমুক দিল হেনরি, “জাপানে বডি পাঠানোর আগে সেটা আমার কাছে তিন সপ্তাহ ছিল।”

“বাপ রে!”

“ডিপ ফ্রিজ্জে অত দিন বডি রাখলে আকাশছোঁয়া ইলেকট্রিক বিল ওঠে। গরমকালে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। টাকাটা বাড়ির লোকের কাছে চাইলে আজোবাজে কথা বলে। বোঝাতে পারি না যে, এটা চ্যারিটি নয়। এই কাজ করে আমার পেট চলে। পেশাটা আর লাভজনক নেই। এই সময়ে, ইটস টাফ টু বি অ্যান্ড আন্ডারটেকার।”

পানপর্ব শেষ। মলিনা চিনা সুখান্য দিয়ে গেল। ডিনার চুকিয়ে হেনরি বলল, “রাত এগারোটা বাজে। আপনারকে ছাড়তে যেতে পারব না। আমার খুব টায়ার্ড লাগছে। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, রাতটা এখানেই থেকে যান। আমার আলাদা এসি বেডরুম আছে। মলিনা ওই ঘরের মেঝেতেই শোয়।”

“রাতে থাকব বলে পোশাক নিয়ে এসেছি,” বাথরুম যোগ্যর আগে বলল রূপকথা। পোশাক বদলে বেরিয়ে বলল, “এত বছর একাই কেরিয়ারের পিছনে দৌড়েছি। কখনও কিছু মনে হয়নি। আজকাল একা লাগে। আপনার লাগে না?”

“আমি আপনার মতো কেরিয়ারের পিছনে দৌড়েইনি। তবে একা লাগার অনুভূতিটা মিউচুয়াল...” সামান্য পান করেই নেশা হয়েছে হেনরির, “আপনার প্রতি আমার একটা আলগা ভাল লাগা... সরি, ফ্রেন্ডলি ফিলিং জন্মেছে। ইয়ে, বন্ধুত্বের মতো সামথিং!”

“শব্দ নিয়ে জাগলারির প্রয়োজন নেই মিস্টার আন্ডারটেকার! ‘ভাল লাগা’ ইঞ্জ আ

নাইস ওয়ার্ড! আমিও তোমার প্রতি... বাংলায় যাকে ‘টান’ বলে, সেটা অনুভব করছি। মাইন্ড ইট, ‘তুমি’ বললাম।”

“টান... টান...” বাথরুম গেল হেনরি। বেরিয়ে বলল, “আমার কিন্তু নাক ডাকে। দরজা জানলা বন্ধ থাকবে। তাও, তোমার যদি অসুবিধে হয়... তার জন্যে আগাম সরি।”

“একটা কথা বলি?”

“কী?” রূপকথার চোখে চোখ রেখে জানতে চাইছে হেনরি।

“ভাল লাগা, টান, ফ্রেন্ডলি ফিলিং... কত নাম, তাই না? তবে হোয়াটস ইন আ নেম?”

শালগাছের মতো লম্বা হেনরি থামের মতো হাত এগিয়ে দিল রূপকথার দিকে। “অকেলে হম, অকেলে তুম। হম-তুম সঙ্গ হ্যায় তো ফির কেয়া গম!” উদিত নারায়ণের বিখ্যাত গানটির দু’টি লাইন গাইল, “নাইস সং টু প্রোপোজ আ লোনলি গার্ল, নো?”

“লোনলি? ইয়াপ। গার্ল? নোপা!”

খিলখিলিয়ে হাসছে রূপকথা, “বুড়ি বলো! বুড়ি! গুড নাইট!”

অন্য ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়ল হেনরি।

পরদিন ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোনোর আগে রূপকথা বলল, “কাল আমি আর মলিনা অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করছিলাম। একটা জিনিস বুঝলাম। আমার পক্ষে এখানে রিলোকেট করা সম্ভব নয়। তুমিও কাজ ছেড়ে ওখানে শিফট করতে পারবে না। তবে আমরা রোজ দেখা করতে পারি।”

“তুমি যা বলবে!”

“আমি চেষ্টা করছি বাড়িটা বিক্রি করে দেওয়ার। ইট উইল টেক সাম টাইম। তত দিন পর্যন্ত এই ব্যবস্থাই চলুক। অ্যান্ড ইয়েস! তোমার দায়িত্ব হল রোজ সকাল ঠিক সাতটার সময় আমাকে ফোন করে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া। মনে থাকবে?”

“থাকবে,” ঠোট ফুলিয়ে বসে আছে হেনরি। ব্যবস্থাটি তার পছন্দ হয়নি। কিন্তু আন্ডারটেকাররা বাড়তি কথা বলে না।

১৫

এখানেই আন্ডারটেকার ও রূপকথার কাহিনি শেষ হতে পারত। কিন্তু কাহিনিটি সেই ভাবে শেষ হতে গিয়েও হচ্ছে না। কারণ, সেই রাতের ছ’মাস পর এক সকালে হেনরি ফোন করতে ও প্রান্তে একটানা রিং হয়ে গেল। রূপকথা ফোন ধরল না।

গত ছ’মাস দু’জনে চমৎকার কাটিয়েছে। রোজ দেখা করার তীব্র ইচ্ছে থাকলেও সেটা সম্ভব হত না। দিনের শেষে ভিডিয়ো কলে দর্শন-সুখ মিটত। সপ্তাহান্তে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে কাছপিঠে ঘুরে আসাটা রুটিন হয়ে গিয়েছিল। কোনও সপ্তাহে হেনরি কাটাচ রূপকথার বাড়ি, কোনও সপ্তাহে উল্টোটা

ঘটত। অল্পবিস্তর যৌনতাও কি আর হয়নি! তবে রোজ সকালে ফোন করে রূপকথার ঘুম ভাঙানোর রুটিনটা হেনরির খুব পছন্দের ছিল। ঘুম জড়ানো গলায় মোবাইলে পুচপুচ করে চুমু খেয়ে রূপকথা বলত, “গুড মর্নিং!” খুকিকণ্ঠে ‘মর্নিং’ শোনার লোভে ফোন করত হেনরি।

আজ মিনিমাম দশ বার ফোন করার পরেও রূপকথা ফোন না ধরায় বাড়ি থেকে বেরোল হেনরি। তার কাছে ওই বাড়ির চাবি আছে। সদর দরজা খুলে বেডরুমে ঢুকে সে দেখল, রূপকথা বিছানায় শুয়ে রয়েছে। গ্যাঁজলা জমে চিবুকে আর গালে সাদা দাগ হয়েছে। পিঁপড়েরা লাইন দিয়ে খাটে উঠে ঢুকে যাচ্ছে রূপকথার মুখে। ঘরে মাছি উড়ছে।

এরা সবার আগে মৃত্যুর খবর পায়।

হেনরির চোখ গেল দেওয়ালে আটকানো ফেল্টবোর্ডে। সে যে ক’বার এই ঘরে রাত কাটিয়েছে, ফেল্টবোর্ড ফাঁকা থাকত। আজ বোর্ডে একটা কাগজ মারা রয়েছে। তাতে বড় বড় হরফে লেখা,

হেনরি,

আমি ফোন ধরিনি বলে তুমি এসেছ। এ বার পরপর কয়েকটা কাজ করো। এই চিঠিতে আমার সইয়ের ঠিক নীচে প্রথম যে মোবাইল নম্বরটা লেখা আছে, ওটা আমার অফোলজিস্টের পার্সোনাল নম্বর। ফোন করলে উনি এসে ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দেবেন। কোনও পুলিশি ঝামেলা হবে না। সেই সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে আমাকে বেকার অ্যান্ড কোং-এর একতলায় রিলোকেট কোরো। এমবামিং সেরে শ্রুতিকে ফোন কোরো। ওর মোবাইল নম্বর দু’নম্বর লেখা।

হংকং থেকে আসতে বেশি সময় লাগার কথা নয়। তবে ছুটি বা প্লেনের টিকিট পাওয়া নিয়ে সমস্যা হতে পারে। যত দিন ও না আসে আমি তোমার কাছেই থাকব।

আর, ও হ্যাঁ! আমাদের এই সব ভালবাসাবাসি এক জন্মে ধরবে না। আবার দেখা হলে তোমাকে ঠিক চিনে নেব।

মলিনাকে বোলো, রাতে রুটি আর আন্ডা কারি বানাতে। সঙ্গে পেঁয়াজ আর লন্ডা।

— রূপকথা

চিঠির তারিখ তিন মাস আগের। হেনরি এই ঘরে এলে ফেল্টবোর্ড থেকে চিঠি খুলে রাখত রূপকথা।

রাস্তা দিয়ে কাঁধ ঝুকিয়ে হাঁটছে হেনরি। কাছের মানুষ দূরে চলে যাওয়ায় খারাপ লাগছে ঠিকই। একই সঙ্গে মাথায় ঘুরছে দায়িত্ব পালনের কথা। প্রেম হোক বা মৃত্যু, অস্তিত্বিক্রিয়া পরিচালনা যেন নিখুঁত হয়।

উপরওয়ালার হাতে সর্বস্ব সমর্পণ করে বিচারের আশায় অপেক্ষারত আন্ডারটেকার মোবাইলে প্রথম নম্বর ডায়াল করে।

শিল্পী: অমিতাভ চন্দ্র

উপন্যাস

সিউডো ইউডো

সুপ্রিয় চৌধুরী





বিশাল ঘরটা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা একটা বিষম ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। মাথার উপর অপারেশন থিয়েটারের উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝকে অর্ধচন্দ্রাকৃতি স্টেনলেস স্টিলের বাটিটায় কাঁচা রক্তমাখা প্রথম বুলেটটা পড়ার মৃদু শব্দ হল— ‘টিং!’

ডঃ রাইনহার্ড ব্রিগেল। পৃথিবীর অন্যতম সেরা শল্যচিকিৎসক। হাতে ধরা রক্তমাখা চিমটে, থমথমে চোখ তুলে তাকালেন সহকারী ডঃ ক্রিস্টিয়ানা স্টিলকের দিকে। “দেয়ার আর ফোর মোর বুলেটস লেঙ্ক ইন দ্য বডি। আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, এ রকম সিভিলিয়ান বুলেট ইনজুরিস, ব্রিডিং লাইক আ রিভার... প্রথমে গানশিপে উড়িয়ে এনে আফ্রিকার ওই দেশটায় হেলথ সেন্টারে ফার্স্ট এড...তার পর এই এতটা লম্বা ফ্লাইট জার্নি, তার পরেও লোকটা বেঁচে আছে কী করে, আই জাস্ট কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড! হি মাস্ট হ্যাভ আ হার্ট অব অ্যান অল্গা।”

“আই অলসো থিঙ্ক সো।”

বিস্ময়টা লেগে রয়েছে ডঃ ক্রিস্টিয়ানার চোখেও। বলতে বলতেই দ্রুত এগিয়ে এলেন ফোঁড়নি সূচ আর নাইলন সুতো নিয়ে। পিছনে পিছনে দুই নার্স। হাত ভর্তি গজ, তুলো, ব্যান্ডেজ আর অ্যান্টিসেপটিক লোশন। বুলেট বের করে নেওয়া ক্ষতস্থানটা সেলাই করে ফেলতে হবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সুইটজারল্যান্ড-অস্ট্রিয়ার সীমান্তবর্তী ছোট শহরটা। আল্পস পর্বতমালা থেকে মাত্র কিলোমিটার ঘাটেক দূরে। অপরাধ সূন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যপট। সবুজে সবুজ চার পাশ। স্প্রুস, মেপল, চেস্টনাট আর পাইনের সমারোহ। ছব্ব্ব একটা নিখুঁত পিকচার পোস্টকার্ডের মতো।

শহরের একদম কেন্দ্রস্থলে প্রায় একর তিরিশেক এলাকা জুড়ে রয়্যাল সালতানাত সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল অ্যান্ড স্যানেটোরিয়াম। হাসপাতালের দোতলায় নিজের ব্যক্তিগত বিলাসবহুল সুইটটায় সপার্বদ বসে জায়ান্ট স্ক্রিন মনিটরে পুরো অপারেশন প্রক্রিয়াটার উপর নজর রাখছিলেন সুলতান আবু বিন হাশেম। আরবের প্রান্তে বিপুল তেল সম্পদে সমৃদ্ধ ওই ছোট দেশটার একচ্ছত্র অধিপতি। এর বাইরেও একটা আন্তর্জাতিক খবরের চ্যানেল আর ইয়োরোপের অনেকগুলো শহরে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর এই সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল চেনের ব্যবসা। ভিয়েনা, গ্লাসগো সহ ইয়োরোপের একাধিক বিখ্যাত মেডিক্যাল কলেজের খ্যাতনামা সব চিকিৎসকরা জড়িত এই হাসপাতালের সঙ্গে।

প্রতিটা বুলেট বের করে আনার সঙ্গে সঙ্গে ফিনিকি দিয়ে তাজা রক্ত উঠে আসছিল ক্ষতস্থান উপরে। প্রতিবারই এক তীব্র অব্যক্ত যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছিল সুলতানের চোখমুখের প্রতিটি পেশি। গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল টকটকে লাল। একটু চাপ দিলেই যেন রক্ত বেরিয়ে আসবে। মনিটরের বিশাল স্ক্রিনে অপারেশন টেবিলে শোওয়া তুর্যর বিশাল শরীরটা। কড়া ডোজের অ্যানাস্থেশিয়ায় নিষ্পন্দ, অসাড়! ঘোর জ্ঞানহীন! সে দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সুলতানের মনটা পিছিয়ে যাচ্ছিল অনেক, অনেকগুলো বছর পিছনে।

১৯৯০ দশকের গোড়ার কথা। ভেঙে পড়ল মহা শক্তিদ্বার সোভিয়েত ইউনিয়ন। এদিকে সুলতানের প্রাসাদেও টালমাটাল অবস্থা। দুই তুতো-ভাইসালে আর হাফিজ, ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে দিয়েছিল গোটা প্রাসাদ জুড়ে। তার পরও নিস্তার নেই। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো এ চক্রান্তে যোগ দিয়েছিল খাদেম। সুলতানের সহোদর ভাই। পুরো নাম আবু বিন খাদেম। উদ্দেশ্য একটাই। তিন জনে একজোট হয়ে বিপুল তেল সম্পদে সম্পদশালী এ দেশটার দখল নেওয়া। ফলে পুরো প্রাসাদ জুড়ে চরম একটা অবিশ্বাসের পরিমণ্ডল। সেটা

চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছল, যে দিন সুলতানের দ্বিপ্রাহরিক খাবারের পাতে বিষ ধরা পড়ল।

দিনটা ছিল শুক্রবার। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে সবচেয়ে পবিত্র দিন, জুম্মা। জুম্মার নামাজ আদা করে প্রাসাদে ফিরে যেতে বসেছিলেন সুলতান। সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর প্রিয় কাবুলি বেড়াল সলোমন। নিজের থালা থেকে মাছের পাসিন্দা কাবাবের এক টুকরো পোষ্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন সুলতান। কয়েক মুহূর্ত পরই একটা ঘড়ঘড়ে গোঙানি বার হয়ে এসেছিল সলোমনের গলা দিয়ে। পরমুহূর্তেই তীব্র নীলচে বমি। দু'চার মিনিটের মধ্যেই প্রবল খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেছিল তুলতুলে লোমশ শরীরটা। ভেট ডক্টর ছুটে আসার আগেই সব শেষ। পরীক্ষায় তীব্র বিষের সন্ধান মিলেছিল সুলতানের খাবারে। নিজে প্রাণ দিয়ে তার প্রভুকে বাঁচিয়ে গেছিল সলোমন।

অতঃপর খোঁজ খোঁজ চার দিকে। চিরকনি তল্লাশি প্রাসাদ জুড়ে। জানা গেছিল সুলতানের এক অতি পছন্দের বাবুর্চি, নিখোঁজ ঘটনার দিন থেকেই। গোটা দেশ টুঁড়ে ফেলেও আর খোঁজ মেলেনি সে পাচকের। সুলতানের বুঝতে অসুবিধে হয়নি এ মারাত্মক চক্রান্তের পিছনে কাদের হাত রয়েছে। কিন্তু প্রমাণ বলতে হাতে কিছুই নেই।

সব মিলিয়ে সুলতানের গদি যখন বেজায় টলোমলো, কাকে বিশ্বাস করবেন আর কাকে নয় সেটাই বুঝে উঠতে পারছেন না, ঠিক সেই সময় খবরটা এনেছিলেন আমির আল ফাতাহ। সুলতানের অতি বিশ্বস্ত পারিষদ এবং সহধর্মী। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। একদা তাদের দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা কে জি বি-র ঘাঘু সব স্পেশাল সিক্রেট এজেন্টরা, অনেকেরই চাকরি চলে গেছে। অনেকে আবার নিজেরাই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। এদের মধ্যে এক দল, বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গড়ে তুলেছে দুনিয়ার সবচেয়ে সংগঠিত ক্রাইম কার্টেল। রাশিয়ান মافیয়া। আন্তর্জাতিক অপরাধ মানচিত্রে নবতম এবং নৃশংসতম সংযোজন। অন্য দল, যারা এই অপরাধচক্রে নাম লেখানি, তারা খুঁজে নিয়েছে নতুন কাজ। পৃথিবীর দেশে দেশে বিপুল ধনী সব মিলিয়নেয়ার, সেলিব্রিটি আর রাষ্ট্রপ্রধানদের নিরাপত্তা উপদেষ্টার চাকরি। কে জি বি-র মধ্যেও দুর্ধর্ষতম এলিট কোর গ্রুপ— স্মার্শ। গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। জার্মান প্যানজার ডিভিশনের গোয়েন্দা বাহিনী আর নাজি গেস্টাপোদের মোকাবিলা করার জন্য। তৎকালীন সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান জোসেফ স্টালিনের মস্তিষ্কপ্রসূত এই স্মার্শ। কে জি বি-র সেরা এজেন্টদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হত এদের। প্রযুক্তিগত ভাবে দক্ষতার শীর্ষে, বিনা অস্ত্রে অথবা সশস্ত্র অবস্থায় যে কোনও সমরবিদ্যায় চূড়ান্ত ভাবে সফল এবং একইসঙ্গে রাজনৈতিক ধ্যানধারণাও অত্যন্ত পরিষ্কার। এই এত রকম গুণ বা ক্ষমতার সংমিশ্রণ হল এক জন স্মার্শ সিক্রেট এজেন্ট। স্টালিন জমানার পর সরকারি ভাবে অবলুপ্ত হয়ে গেলেও কে জি বি-র অভ্যন্তরে তা সক্রিয় ছিল বেশ ভালরকমই। এহেন স্মার্শের সেরা এক এজেন্ট, নাম তুর্ঘ বোস। জন্মসূত্রে ইন্দো রাশিয়ান। ওর নাম শুনেলে শিরদাঁড়া বেয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যেত বাঘা বাঘা সব সি আই এ, মোসাদ আর এম আই জি সিন্স এজেন্টদের, আন্তর্জাতিক স্পাই দুনিয়ায় সে পরিচিত ছিল সিউডো ইউডো নামে। সিউডো ইউডো। রাশিয়ান রূপকথার দুর্ধর্ষ, অপরাজেয় এক দানব। যার মৃত্যু নেই! এহেন তুর্ঘ বোস, সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার পর কে জি বি-র চাকরিবাকরি ছেড়ে বিদেশ থেকে ফিরে এসে বসে আছে ঘরে। মাত্র ক'দিন আগে মৃত্যু হয়েছে ওর ক্যানসার-আক্রান্ত মায়ের।

“ইয়োর হাইনেস, আপনার সমস্যা যদি কেউ সমাধান করতে পারে, সেটা একমাত্র ওই সিউডো ইউডো তুর্ঘ বোস,” বলেছিলেন আমির আল ফাতাহ।

“কল দ্যাট বোস ইমিডিয়েটলি। আই ওয়াট হিম অ্যাট এনি কস্ট!” শুদ্ধ অক্সফোর্ড শিক্ষিত ইংরিজিতে তুরন্ত আদেশ দিয়েছিলেন সুলতান আবু বিন হাশেম।

সুলতানের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে তুর্ঘ এসেছিল অফুরান তেল সম্পদে ধনী, আরবের এই ছোট দেশটায়। দু'জনে কথা হয়েছিল দীর্ঘ

ক্ষণ। “তোমার কথা আমাকে অনেক বলেছে আমি। তুমি কি সত্যিই কাজটা করতে পারবে?”

“ডোন্ট গেট টেম্পড, ইয়োর হাইনেস। স্বাভাবিক থাকুন একদম। আমাকে আমার কাজটা করতে দিন। ইয়োর প্রবলেম উইল বি সলভড ইন আ শর্ট স্প্যান,” ঠোঁটের কোণে ভীষণ প্রত্যয়মাখা একটা মুচকি হাসি হেসে জবাব দিয়েছিল তুর্ঘ।

এর পর থেকেই কাজ এগিয়েছিল অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। সুলতানের দুই তুতো ভাইয়ের এক জন, সালে। বসন্তের এক মনোরম নির্জন দুপুরে রাজপরিবারের ব্যক্তিগত সমুদ্র সৈকতে স্নান করতে গিয়ে আর ওঠেনি জল থেকে। খোঁজ মেলেনি দেহেরও। দুর্দান্ত সাতার জানা কেউ এক জন কী করে জলে ডুবে লোপাট হয়ে যেতে পারে? প্রশ্ন উঠেছিল বিস্তর। কিন্তু প্রমাণ মেলেনি কিছুই। মেলেনি নিখোঁজ হয়ে যাওয়া সালের দেহটাও।

ঘটনার মাসছয়েক পর। আর-এক তুতো ভাই হাফিজ। হলিউডে সদ্য উঠতি এক পার্শ্চরিত্রের নায়িকাকে নিয়ে প্রমোদভ্রমণে গিয়েছিল প্যারিস। বর্ষণম্নাত ছিল দিনটা। ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছিল সকাল থেকে। সঁজ্জে লিজেতে ঘুরছিল দু'জনে। হঠাৎই পায়ের গোছে হালকা সূচ ফোটার মতো চিনচিনে ব্যাথা। হোটোলে ফিরতে ফিরতেই ভয়াবহ যন্ত্রণা শুরু। মিনিট দশেকের মধ্যে মৃত্যু তীব্র হৃদরোগে! পরবর্তী কালে জানা গেছিল মৃত্যুর কারণ, মারাত্মক নিউরোটক্সিন বিষ। যদিও কাউকে চিহ্নিত করা যায়নি। তবে একটু খুঁটিয়ে দেখলে হয়তো জানা যেত তথ্যটা। ছাতার ডগায় লুকোনো স্প্রিং সূচ মাথানো বিষ, শিকারকে চিহ্নিত করে শরীরের ইঞ্চিখানেক দূরে ডগাটাকে নিয়ে গিয়ে বাঁটের গায়ে ছোট বোতামটাকে টিপে দেওয়া। ছটকে বেরোয় স্প্রিং-চালিত সূচ। নিশ্চিত মৃত্যু কিছু ক্ষণের মধ্যে। সোভিয়েত কে জি বি, পূর্ব জার্মানির স্টাঞ্জি, এ ছাড়াও বুলগেরিয়া, রুমানিয়ার সিক্রেট এজেন্টদের খুব পছন্দের কৌশল ছিল এটা। অনেকদিন পর গল্পে গল্পে সেটা তুর্ঘর কাছ থেকে জেনেছিলেন সুলতান।

সালে আর হাফিজ কাঁটা দূর হওয়ার পর তুর্ঘ নজর ঘুরিয়েছিল সুলতানের সহোদর ভাই আমির আবু বিন খাদেমের দিকে। খুব তাড়াতাড়ি প্রাসাদের গোপন কনফারেন্স রুমে এক দিন ডাক পড়েছিল আমির খাদেমের। বিশাল কনফারেন্স টেবিলে মুখোমুখি বসা দুই ভাই। ধীরপায়ে খাদেমের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তুর্ঘ। কণ্ঠস্বর অসম্ভব শান্ত এবং নম্র, “আমিরজাদা, হিজ হাইনেসের তরফ থেকে আপনার কাছ থেকে একটা প্রস্তাব আছে। নানা ধরনের অস্বস্তি বা সংকোচের কারণে আপনার বড় ভাই হিসেবে হয়তো নিজে তিনি সেটা আপনাকে বলে উঠতে পারছেন না। ফলে আমাকেই সে দায়িত্বটা নিতে হয়েছে। হিজ হাইনেসের মনে হচ্ছে আপনাদের দু'ভাইয়ের সম্পর্কটা ক্রমাগত খুব তিক্ত হয়ে পড়ছে দিন দিন। সে হিজ হাইনেস ওয়ান্টস আ স্মুদ অ্যান্ড পিসফুল সলিউশন।”

“হোয়াটস দ্যাট?” ঈষৎ বাঁকা গলায় প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছিলেন আমির খাদেম। তাঁর দৃষ্টি কিন্তু নিবদ্ধ টেবিলের উল্টো দিকে বসা স্বয়ং সুলতানের চোখে।

জবাবে আর একটিও কথা না বাড়িয়ে বেশ গোটা কয়েক পৃষ্ঠার হস্তপুস্ত একটা চুক্তিপত্র আমিরের দিকে এগিয়ে দিয়েছিল তুর্ঘ।

“লন্ডনের ওয়ান অব দ্য বেস্ট সলিসিটর ফার্মের হাইলি রেপুটেড কয়েকজন ব্যারিস্টারের খসড়া করা এই লিগাল কনট্রাক্ট পেপারটা। প্রতিমাসে মিলিয়নখানেক আমেরিকান ডলার মাসোহারা। মায়ামি আর বেভারলি হিলসে প্যালেশিয়াল দুটো ভিলা। রোলস, বেঞ্জ, পার্শ, ল্যাক্সরগিনি, বেন্টলি, ফেরারি মিলিয়ে ডজনখানেক সুপার লাক্সারি কারের একটা ফ্লিট। পাঁচ-পাঁচটা অয়েল ফিল্ডের ফুল অ্যান্ড পার্মানেন্ট রাইটস। মনে হয় চুক্তিটা আপনার পক্ষে সম্মানজনক। শর্ত শুধু একটাই। আফটার সাইনিং দ্য পেপার ইউ হ্যাভ টু লিভ দিস কান্ট্রি পার্মানেন্টলি উইদিন ওয়ান উইক। স্টেটসে আপনি আর আপনার ফ্যামিলির গ্রিন কার্ডের ব্যাপারটা... হিজ হাইনেস পার্সোনালি উইল টেক কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট।”

“আর যদি সাইন না করি?” চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন আমির

আবু বিন খাদেম। সুলতানের আজও মনে আছে, হাসির পিছনে মুহূর্তের মধ্যে পাথরের মতো ঠান্ডা হয়ে গেছিল বোসের আধা-নীলচে চোখের মণিজোড়া! কোমর থেকে ওয়েবলি স্কট নাইন এম এম পিস্তলটা বের করে খাদেমের কানের পাশে রগে ঠেকিয়েছিল তুর্ক। আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছিলেন আমির খাদেম। ঠাঁটের কোণে ঠান্ডা মুচকি হাসিটা আর-একটু চওড়া হয়েছিল তুর্কর, “ভয় পাবেন না জনাব, আপনার মাথায় গুলি করব না আমি। ওতে তো এক সেকেন্ডে কাজ শেষ হয়ে যাবে। তার বদলে প্রথমে আপনার কাঁধ আর হাতের দুটো জয়েন্টে, তার পর দু’হাটুতে দুটো দুটো চারটে গুলি করব। ও জায়গাগুলোতে শুধু হাড় আর চামড়া। ফলে ব্লিডিং হবে অনেক কম কিন্তু হাড়গুলো সব ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে পুরোপুরি পঙ্গু হয়ে যাবেন আপনি। অ্যান্ড ইট’স আ হেলওভার পেন। আর সেটা এতটাই বেশি যে প্রতি মুহূর্তে মরে যেতে চাইবেন আপনি। কিন্তু সে মৃত্যু আসবে না অত সহজে। ইট’স আ প্রোলংড অ্যান্ড ডায়াবোলিক্যালি ন্যাস্টি ডেথ। প্রথমে সেপটিক হবে। তার পর গ্যাংগ্রিন সেট করবে। হুইচ ইজ মাচ, মাচ মোর পেনফুল, ওয়ান কুড এভার ইভেন ইমাজিন।” জমাট বরফের মতো এক-একটা কথার টুকরো যেন ছিটকে ছিটকে বেরোচ্ছিল বোসের মুখ থেকে। আর প্রতি মুহূর্তে তীব্র আতঙ্কে গাড় থেকে গাঢ়তর নীলচে খয়েরি বর্ণ ধারণ করছিল খাদেমের গজদন্তের মতো গৌরবর্ণ মুখখানা।

ঠিক এই সময় মদু ছড়ছড় আওয়াজ মহামূল্য পাশিয়ান কার্পেটে। অ্যামোনিয়ার তীব্র ঝঝালো গন্ধ। নীচের দিকে তাকিয়েছিল তুর্ক। বহুমূল্য জোকা, কদারার গদি সব ভিজে সপসপে। সহানুভূতির দৃষ্টিতে আমিরের চোখে চোখ রেখেছিল বোস, “প্লিজ আমিরজাদা, আর নিজেকে বিভ্রম্নায় ফেলবেন না। আপনার দুই কাজিনের ডেস্টিনির ব্যাপারটা ভাবুন দয়া করে একবার। এ বার আপনার সামনে দুটোই রাস্তা খোলা। হয় আপনার কাজিনদের পরিণাম বেছে নেওয়া, নয়তো পিসফুলি এই লিগ্যাল কনসেন্ট পেপারটায় সাইন করে দেওয়া। এর চেয়ে ভাল অফার আপনার কাছে আর কিছু হতে পারে না। বাট আপনার হাতে সময় খুব কম। প্লিজ, ডোন্ট স্পেন্ড মাচ টাইম টু থিংক।” শোনার পর আর একটিও কথা না বাড়িয়ে খসখস করে কলামগুলোয় সাই করে মাথাটা কদরায় হেলিয়ে দিয়েছিলেন আমির আবু বিন খাদেম। টেবিলের তলায় ছোট বোতামটায় চাপ দিয়েছিলেন সুলতান। ঘরে ঢুকেছিল তাঁর অতি বিশ্বস্ত দুই ভৃত্য। ধরাধরি করে কনফারেন্স কক্ষ থেকে বের করে নিয়ে করে নিয়ে গেছিল ব্রাসবিধস্ত আমির খাদেমকে।

এর ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় নিজের বিবিবাচ্চা সমেত সালাতানাতের প্রাইভেট জেটে চড়ে বসেছিলেন আমিরজাদা। মার্কিন মুলুকের উদ্দেশে উড়ান দিয়েছিল বিমান।

পাথের কাটা মুক্ত হওয়ার খুশিতে উদ্বেল সুলতান দু’হাত ভরিয়ে দিয়েছিলেন তুর্কর। মাস মাইনের পরিমাণ আর অন্যান্য সুযোগসুবিধাও বেড়ে গেছিল বহুগুণ।

এই সময় তুর্কর জীবনে এসেছিল মার্খা। সুইডিশ একটা তেলখনি কোম্পানির উচ্চপদস্থ আধিকারিক। কর্মসূত্রে আগমন সুলতানের দেশে। কথায় বলে, লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। তুর্কর ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ঘটেছিল অনেকটা সে রকমই। মার্খার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। ফলে চার হাত জুড়ে গেছিল খুব তাড়াতাড়ি।

দু’জনের বিয়েতে রাজধানীর সেরা সাত তারা হোটেলে রাজকীয় পার্টি দিয়েছিলেন সুলতান। বর-কনের জন্য উপহারের তালিকায় ছিল প্রিমিয়াম ক্লাস একটা বেন্টলি গাড়ি, বহুমূল্য একটা পাল্লাখচিত নেকলেস, স্যাভিল রো-র কাস্টমার ডিজাইনড ওয়েডিং স্যুট, স্কারোভিস্কির ম্যারেজ গাউন, ইওরোপে মাসব্যাপী হনিমুন প্যাকেজ আর শহরের অভিজাততম এলাকায় বিধেখানেক জমির উপর বাগান সহ সুদৃশ্য একটা পেন্টহাউস।

সব মিলিয়ে যখন মসৃণ ভাবে গড়াতে শুরু করেছিল জীবন নামক বলটা, ঠিক তখনই নেমে এসেছিল সেই ভয়ঙ্কর বিপর্যয়! অয়েল ফিল্ডে নিজের দফতরে যাওয়ার পথে হাইওয়ে ধরে উল্টোদিক থেকে ব্রেকফেল হয়ে ছুটে আসা ২৪ চাকার একটা অয়েল ট্যাঙ্কারের তলায় পিষে গেছিল

মার্খার নিজস্ব ছোট ফোন্সওয়ান গাড়িটা। তখন সন্তানসম্ভবা ছিল মার্খা।

মার্খার মৃত্যুর পর বেশ কিছু দিন নিজের বাড়িতে গুম মেরে বসেছিল বোস। তার পর হঠাৎই এক দিন এসে হাজির হয়েছিল সুলতানের দরবারে। হাতে সাদা একটা খামে রেজিগনেশন লেটার। চাকরি ছেড়ে, এমনকি এ দেশও ছেড়ে চলে যাচ্ছে ও। আমির পরিষদের আবেদন নিবেদন, সালতানাতের সমস্ত প্রোটোকল ভেঙে সুলতানের ব্যক্তিগত অনুরোধ উপরোধ, কাজ হয়নি কোনও কিছুতেই। টলানো যায়নি তুর্ককে। ছোট তেলের দেশটাকে আলবিদা জানিয়ে একদিন ভোরের সুইডেনগামী ফ্লাইটে চড়ে বসেছিল সুলতান আবু বিন হাশেমের রাইটহ্যান্ড, ম্যানফ্রাইডে বোস।

দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও তুর্কর খবরাখবর রাখতেন সুলতান। দেশ থেকে দেশে পালভাঙা নৌকোর মতো ভেসে বেড়াচ্ছে সে। উদ্দেশ্যহীন। এর পর হঠাৎই এক দিন ফোন এসেছিল বোসের। ভারতবর্ষে যেতে চায় সে। সেখানে তার বাবার ছেড়ে আসা শহর কলকাতায়। সুলতান যদি ওখানে ওর পাকাপাকি ভাবে থাকার ব্যাপারটা একটু দেখেন। ওই দেশটার সঙ্গে তেলের কারণে সুলতানের সম্পর্ক বেশ ভাল। ফলে সরকারি লালফিতের বামেলা পোয়াতে হয়নি তেমন। ও দেশে তুর্কর থিতু হয়ে বসায় খুশিই হয়েছিলেন সুলতান। কারণ দেশটা বোসের কাজের এলাকা ছিল না কোনও দিনই। ফলে প্রাক্তন শত্রুদের তরফ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা কম। কিন্তু বিধি বামা। বেশ কয়েক বছর পর ফের ফোন এসেছিল বোসের। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই ভয়ঙ্কর সে বার্তা। কে জি বি-তে তুর্কর বেস্ট কমরেড ইন আর্মস সেগেই মিখাইলভ। স্মার্টের আর-এক সেরা এজেন্ট। দুটো পা-ই উড়ে গেছিল কস্ভোভিয়ার মাইন ফিল্ডে। সেগেইয়ের একমাত্র মেয়ে ভ্যালেস্তিনা। বয়েস বছর পঁচিশ। অপরূপ সুন্দরী। নাচতে গেছিল তাইল্যান্ডের এক ন্যুড ক্লাবে। সেখান থেকে রাশিয়ান, চীনা আর জাপানি ইয়াকুজো মাফিয়াদের সংগঠিত কার্টেলের ফাঁদে পড়ে পাচার হয়ে গেছে আফ্রিকায়, নৃশংস শ্বৈরশাসক বোবো স্যাভিসির দেশে। হিংস্র পশুকে দিয়ে মানুষকে খাওয়ানো, পশুতে মানুষে লাড়িয়ে দেওয়া, কোনও নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে তার পর টুকরো টুকরো করে কাটা, এ রকম আরও নানাবিধ ভয়াবহ সব খেলা চলে সেখানে। স্যাভিসির খপ্পর থেকে ভ্যালেস্তিনাকে উদ্ধার করতে ওই দেশটায় পাড়ি দিচ্ছে বোস। শোনামাত্র স্তম্ভিত হয়ে গেছিলেন সুলতান! তার পর বিষয় আর আতঙ্কের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠে প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন। ওই নররাক্ষসের দেশটায় যেন খবরদার না যায় বোস। এখনি নিজের ব্যক্তিগত জেট পাঠাচ্ছেন তিনি। পত্রপাঠ যেন সুলতানের দেশে ফিরে আসে সে। শোনেনি তুর্ক। এর দিনচারেক পর ফের ফোন এসেছিল বোসের। ভ্যালেস্তিনাকে উদ্ধার করে স্যাভিসির পাশের দেশের সীমানার কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে ও। সঙ্গে সাবা নামে আর-একটি রেসকিউড আফ্রিকান মেয়ে। সামনে মাঝারি একটা টিলা পাহাড়। সেটা টপকাতে পারলেই প্রতিবেশী দেশের মাটি। কিন্তু কাজটা আদৌ সহজ নয়। কারণ পেছনে তেড়ে আসছে স্যাভিসির ফৌজ। ইট’স অ্যাবসলিউটলি আ রোগ নেশন। সুলতান ইমিডিয়েটলি যেন ওখানে ইউ এন পিস কিপিং ফোর্স পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

তুর্কর কথাই ঠিক ছিল। কাজটা আদৌ সহজ হয়নি। পাহাড় চড়ার মাঝপথেই শত্রুর একটা গুলি এসে লাগে ভ্যালেস্তিনার পায়ে। ওদের সাহায্য করতে আসা বিদ্রোহী গেরিলা বাহিনীর এক সেনার পাহারায় সাবা নামে বিশালদেহী আফ্রিকান মেয়েটার কাঁধে ভ্যালেস্তিনাকে তুলে সীমানার ওপারে পাঠিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনীর একটা প্ল্যাটুনের বিরুদ্ধে সামান্য দু’চারটে অস্ত্র নিয়ে একা লড়ে গেছিল বোস। শুধুমাত্র উচ্চতা আর বিশাল একটা পাথরের আড়ালকে কাজে লাগিয়ে। রেডিও ট্রান্সমিটারে ওর স্মার্ট ফোনের সিগন্যাল ট্র্যাক করে যখন ওকে প্রথম দেখতে পায় পিস কিপিং ফোর্সের গানশিপ হেলিকপ্টারগুলো, তখন ওর সঙ্গে স্যাভিসির ফৌজের দূরত্ব দশো মিটারেরও কম। হু’-ছটা গানশিপ হেলিকপ্টার ছ’খানা হেভি মেশিনগান থেকে টানা ব্রাশফায়ার চালিয়ে প্রায় আধঘণ্টা পর স্যাভিসির গোটা প্ল্যাটুনটাকে ফৌত করে পিস কিপিং ফোর্সের লোকজন যখন ওর কাছে পৌঁছতে পারে তখন পাঁচ পাঁচটা

বুলেট শরীরে নিয়ে বিশাল পাথরটার নীচে একদম কোণের দিকটায় শিকারি চিতার মতো গুঁড়ি মেরে উপুড় হয়ে রয়েছে বোস। হাতের মুঠোয় চেপে ধরা ছ’-ঘড়ার ম্যাগনাম রিভলবার। শরীরের নীচে গোটা পাথুরে জমিটা ভেসে যাচ্ছে রক্তের বন্যায়। ঘোরলাগা আচ্ছন্ন চোখজোড়া। বারবার প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে সোজা রাখতে চাইছে নুইয়ে পড়তে চাওয়া মাথাটাকে, “হেই বাস্টার্ডস, স্টিল আয়াম হিয়ার! কাম অ্যান্ড কিল মি ইফ ইউ ক্যান।” বলেই চলেছে একটানা। জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে কথাগুলো। চেনন অবচেতনের মধ্যবর্তী অবস্থা। কাছে গেলে ঘোরের মধ্যে গুলি চালিয়ে দিতে পারে। ফলে গানশিপের ছোট মাইক্রোফোন থেকে বারবার অ্যানাউন্সমেন্ট শুরু হয়েছিল— “মিং বোস, উই আর ফ্রম পিস কিপিং ফোর্স...হ্যাভ কাম টু রেসকিউ ইউ” বেশ কয়েক বার বলার পর হঠাৎই হাত থেকে খসে গিয়েছিল ম্যাগনামটা। পরমুহূর্তেই জ্ঞান হারিয়েছিল তুর্বা। পিস কিপিং ফোর্সের তানজানিয়ান যুবক স্কোয়াড্রন লিডারটি এ সব কথা বলেছিল তুর্বাকে নিতে আসা সুলতানের জেটের পাইলটকে।

প্রাইভেট সুইটের জায়ান্ট মনিটর স্ক্রিনে পাঁচ নম্বর বুলেটটা স্টিলের বাটিতে পড়ার খুব মৃদু শব্দ হল— ‘টিং’। ঘণ্টা ছয়েকের দীর্ঘ অপারেশন পর্ব শেষ! ডঃ ক্রিশ্চিয়ানার দিকে থাম্বস আপের ভঙ্গিতে বুড়ো আঙুলটা তুললেন ডঃ ব্রিগেল। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সুলতান। বহুমূল্য লিনেনের জোব্বার হাতা সরিয়ে ওমেগা জুয়েলারি কালেকশন হাতঘড়িটা সময় দেখলেন। দুপুরের প্রাত্যহিক জোহরের নামাজের সময় হয়ে গেছে। নামাজ আদা করে বসতে হবে ডঃ ব্রিগেল আর তাঁর মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে। ঘরের এককোণে ছোট পারসিক কারুকাজ করা একটা ছোট টেবিল। তার উপর রাখা ডেলভেটের জায়নামাজ আসন। এগিয়ে গিয়ে সেটা তুলে নিয়ে সযত্নে মেঝেয় বিছিয়ে বসে পড়লেন হাঁটু মুড়ে। সঙ্গে পারিষদরাও সকলে। সকালেই তাঁর দেশের মানুষের কাছে বার্তা পাঠিয়েছেন সুলতান। আজকের জোহরের নামাজে তারা সবাই যেন বোসের জন্য পরওয়াদিগারের কাছে দোয়া প্রার্থনা করে।

কেবিনের কাচের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল, বেডে শোওয়া ভ্যালেন্তিনা। অপারেশন শেষ হয়েছে অনেক ক্ষণ আগেই। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন অপারেশন সাকসেসফুল। পা থেকে বুলেটটা বার করে ফেলা গেছে নিরাপদেই। এখন অ্যানাস্থেসিয়ার ঘোর কাটতে যেটুকু সময় লাগে।

কাচের এ পার থেকে এক দৃষ্টে সে দিকে তাকিয়ে ছিল ছইলচেয়ারে বসা সেগেই। উরুর নীচ থেকে কাটা পা-দুটো ঢাকা একটা মোটা তোয়ালেয়। পাশেই আর-একটা গদি-আঁটা কাউচে বসা স্ত্রী লিদিয়া। কাচের ও পারে চোখ রাখা সেগেইয়ের চোয়াল পাথরের মতো শক্ত এই মুহূর্তে। অসহায়, অব্যক্ত স্কোভ আর রাগে কাঁপছিল দীর্ঘকায়, ঋজু শরীরটা। বোস, হিজ ডিয়ারেস্ট ফ্রেন্ড! কে জি বি-তে সেই প্রথম দিন থেকে। বহু বিপজ্জনক রাস্তা এক সঙ্গে হেঁটেছে ওরা। সেই বোস, প্রিয়তম বন্ধুর মেয়ে বিপদে পড়েছে খবরটা পাওয়ামাত্র একটুও এদিক ওদিক না ভেবে কলকাতা, হাজার হাজার মাইল দূরের ওই শহরটা থেকে উড়ে চলে এসেছিল মস্কো। নিজেকে ঠেলে দিয়েছিল ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কল একটা রাস্তায়। বন্ধুর মেয়েকে বাঁচাতে একা ঢাল হয়ে লড়ে গেলিছ একটা প্ল্যাটুনের বিরুদ্ধে। আর সেই কারণেই পাঁচ-পাঁচটা বুলেট শরীরে নিয়ে এই মুহূর্তে হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে বোস। নিজেকে তীব্র অভিসম্পাত দিচ্ছিল সেগেই। অভিসম্পাত দিচ্ছিল সেই কবে কাসোভিয়ায় মাইন ফিল্ডে পা-দুটো উড়ে যাওয়ার ওই দিনটাকে। পা-দুটো থাকলে আজ এভাবে নিজের বন্ধুকে ডেকে এনে নিশ্চিত বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হত না। আর যদি বা সেটা করতেই হত, তা হলে অন্তত দু’জনে এক সঙ্গে যাওয়া যেত অভিযানে। বিপদ সে যত বড়, যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, দু’বন্ধু পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়ে যাওয়া যেত দূশমনের মুখোমুখি। তার বদলে স্বার্থপরের মতো শুধুই নিজের কথা ভেবে...“ডাম ইট!” উরুতে সজোরে একটা চাপড় মারল সেগেই। পাশে বসা স্ত্রী লিদিয়া, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দু’হাতে জড়িয়ে ধরল স্বামীকে। “কাম অন ডালিং, ডোন্ট গেট সো মাচ আপসেট!” লিদিয়ার বুকে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল একদা দুর্ধর্ষ সিক্রেট এজেন্ট। কিছু ক্ষণ পর

নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে বসল চেয়ারে। এই কয়েক মিনিটে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে ওর। বোসের যদি কিছু হয়ে যায় তা হলে এখান থেকে বাড়ি ফিরেই নিজের ওয়ারড্রোবের গোপন কুঠুরিতে রাখা লুগার ৭৩৮ ফুললি অটোম্যাটিক পিস্তলটা বের করে আনতে হবে রাতের অন্ধকারে। লিদিয়া, ভ্যালি, ওরা কেউ জানে না অস্ত্রটার কথা। ওরা সবাই ঘুমোবে তখন। লুগার ৭৩৮। স্মল বাট আ ভেরি এফেক্টিভ ওয়েপন। মেক্সিকোর সান সিরোতে এক সিআইএ এজেন্টকে নিকেশ করার পর ওর বুকের হোলস্টারে পাওয়া গেলিছ অস্ত্রটা। সঙ্গে ন’টা তরতাজা বুলেট ম্যাগাজিনে, আজও গ্রিজ মাখিয়ে সযত্নে রাখা আছে আলমারির গোপন কুঠুরিতে। চাকরি চলে যাওয়ার সময় কে জি বি দপ্তরে ওটার কথা জানায়নি সেগেই। কানের রগে চেপে ধরে শুধু এক বার ট্রিগারটা...বন্ধুর ঋণ শোধ হোক না হোক, প্রায়শ্চিত্তটা তো হবে।

হাসপাতালের চারতলায় লম্বা করিডরের একদম শেষপ্রান্তে অপারেশন থিয়েটার। ঢোকান দরজাটার ঠিক মাথার উপর জ্বলছে লাল লাইটটা। পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির বিশালকায় শরীরটা নিয়ে করিডর ধরে ক্রমাগত পায়চারি করে চলেছিল সাবা ইয়েকিনি। অনেক ক্ষণ পর পর এক বার এসে বসছিল এক ধারে রাখা চেয়ারগুলোয়। সে বড়জোর মিনিটখানেকের জন্য। পরমুহূর্তেই লাফ দিয়ে উঠে ফের শুরু হয়ে যাচ্ছিল অস্থির পদচারণা। চোখ অপারেশন থিয়েটারের দরজার মাথার উপর ওই লাল লাইটটার দিকে। কখন সবুজ হবে ওটা? শরীরে পাঁচটা বুলেট নিয়ে ওই ঘরটার মধ্যে একা একা শুয়ে আছে ওর ওই লোকটা। বোস। সাবার জেমস বন্ড। ওফ! একটা মরদের মতো মরদ বটে। ওর দেশের ডিস্ট্রিক্টর, ওই শুয়ারের বাচ্চা স্যাভিস্টার দাসবৃত্তি করতে করতে ও নিজেও যে এক জন মানুষ, ওর আটতিরিশ বছরের জীবনে সেটা ভুলেই গিয়েছিল সাবা। সারা দুনিয়া থেকে ফুসলে আনা অল্পবয়েসি হতভাগ্য গরিবগুর্বো মেয়েগুলোকে খোঁয়াড়ে আটকে রাখা ভেড়ার মতো পাহারা দেওয়া আর সময় এলে দুনিয়ার যত পকেটমোটা বেজম্মাগুলোর হাতে বলির বকরার মতো প্লেটে সাজিয়ে তুলে দেওয়া, এই একই শয়তানের চাকায় পাক খেতে খেতে কেটে যাচ্ছিল জীবন। ঠিক তখনই বোস এল। একটা টাইফুন ঝড়ের মতো। তিন তিনটে মহাদেশ টপকে। সাবার জিম্মায় থাকা ওর প্রিয় বন্ধুর মেয়ে ভ্যালেন্তিনাকে উদ্ধার করতে। আর সেখানেই থামল না লোকটা। স্বপ্ন দেখাল সাবাকেও। ওদের সঙ্গে একটা ফ্যান্টাসি ল্যান্ডে যাওয়ার গল্প। আর কী আশ্চর্য! গল্পটা বিশ্বাস করেও ফেলল এই এতটুকু বয়েস থেকে ‘হয় মরো নয়তো মারো’, এই খেলায় বেবাক অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া কালো কুচ্ছিত মেয়েটা। ওই অতটুকু সময়ে ক’টাই বা কথা হয়েছিল লোকটার সঙ্গে। তবু কেন যেন সাবার মনে হয়েছিল, এই ভয়ঙ্কর দেশটা থেকে পালানোর মতো বেজায় অসম্ভব ব্যাপারটা সম্ভব হলেও বা হতে পারে। আর সেটা যদি নাও হয়, তা হলেও লোকটার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মরবে যাওয়া যেতে পারে স্যাভিস্টির ওই জল্লাদগুলোর সঙ্গে মুখোমুখি লড়ে।

আর বাস্তবে ঘটেছিলও তাই। ওদের ধরতে পিছু ধাওয়া করে এসেছিল স্যাভিস্টির ফৌজ। দেশের সীমানার ওই পাহাড়ি গিরিখাতটায় পুরো একটা প্ল্যাটুনের সঙ্গে সে এক ভয়ঙ্কর ধুকুমার লড়াই! আর সেখানেও হরতনের শেষ টেক্সটা ফেলেছিল বোস। সাবার সঙ্গে ভ্যালেন্তিনাকে সীমানার ও পারে পাঠিয়ে পুরো একটা প্ল্যাটুনের সঙ্গে একা লড়ে গেলিছ বুক চিতিয়ে।

পিস কিপিং ফোর্সের গানশিপ হেলিকপ্টারগুলো বোসকে উদ্ধার করে সীমানার এ পারে নিয়ে আসার পর ওকে দেখে আঁতকে উঠেছিল বহু অভিযুক্ত পাথর হয়ে যাওয়া সাবার মতো মেয়েও। বুলেটে সেলাই হয়ে যাওয়া গোটা শরীর। নিজের রক্তে নিজেই স্নান করে স্ট্রোচারে শুয়ে আছে লোকটা। শ্বাসপ্রশ্বাস খুব ক্ষীণ। সেখান থেকে প্রাইমারি হেল্থ সেন্টার হয়ে সুলতানের প্রাইভেট জেটে সমস্ত রকম মেডিক্যাল সাপোর্টে মুড়ে সোজা এখানে। বিমানে সারাটা পথ ওর ডান হাতটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে বসে থেকেছিল সাবা, “হেই বোস, গ্লিজ ডোন্ট ডাই... ফর হেভেনস সেক!” বলেই গেলিছ টানা...

হঠাৎই হান্সা ‘কৌণ্ড’ যান্ত্রিক একটা শব্দে ঘাড় ঘুরিয়ে সামনে

তাকাল সাবা। সবুজ হয়ে গেছে অপারেশন থিয়েটারের দরজার মাথার উপর জ্বলতে থাকা লাল লাইট। মিনিটখানেক পর খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় দরজাটা। বেরিয়ে এলেন ডঃ ব্রিগেল। ছোটখাটো সৌম্যদর্শন। পিছনে সহকারীরা। থিয়েটারের একটু দূরেই লিফট। বোতামে আঙুল রাখার মুখে ঝড়ের মতো দুমদুমিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল সাবা।

“বোস!” প্রশ্ন করল তীব্র উৎকণ্ঠাপূর্ণ গলায়। বিশালদেহী কালো মেয়ের দিকে শ্রান্ত চোখে তাকিয়ে হাসলেন ডঃ ব্রিগেল। “ইউ হ্যাভ টু ওয়েট সেভেনটি টু আওয়ার্স মোর টু গেট দ্যাট অ্যানসার। সো ডোন্ট স্টপ প্রেরিং, ও কে?” বলে লিফটে ঢুকে গেলেন সহকারীদের সঙ্গে নিয়ে।

আরও মিনিটপাঁচেক পর অপারেশন থিয়েটারের দরজা দিয়ে বেরোল স্ট্রেচারটা। মোটা চাদরে ঢাকা শরীরে শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। ঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। দক্ষ হাতে স্ট্রেচারটাকে লিফটে ঢুকিয়ে নিল কর্মীরা। মুখের উপর বন্ধ হয়ে গেল স্বয়ংক্রিয় দরজা। পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল সাবা। হঠাৎই গালে গরম জলের স্পর্শ। চমকে গালে হাতে দিল সাবা। এবং ভীষণ অবাক হয়ে দেখল অব্যবহার্য ধারায় নোনা জল নামছে গাল গড়িয়ে। চিরটা কাল চোখের জলকে তীব্র ঘেন্না করে আসা কালো মেয়েটা শিশুর মতো কাঁদছে এই মুহূর্তে।

বেলা তিনটে মতো হবে। হাসপাতালে সুলতানের নিজের বিশাল সুইটটায় মুখোমুখি বসা ডঃ রাইনহার্ড ব্রিগেল আর সুলতান আবু বিন হাশেম। ডঃ ব্রিগেলের পাশে তাঁর সহকারী ডঃ ক্রিস্টিয়ানা স্টিলকে। সুলতানের ঠিক পিছনেই কয়েকটা চেয়ারে সেগেই, লিদিয়া, সাবা আর আমির ফাতাহি।

“ডক্টর, আমি খোলা কথার মানুষ,” স্থির চোখে ডঃ ব্রিগেলের দিকে তাকালেন সুলতান। “আপনি আমাকে বলুন, এই পেশেন্ট মানে বোসের সারভাইভ করার চান্স কতটা? আল্লাহর কসম, কিছু লুকোবেন না আমার কাছে, দোহাই আপনার! ত্রুথ, সেটা যতই হার্ট ব্রেকিং হোক না কেন, সহ্য করবার ক্ষমতা মহান পরওয়াদিগার আমাকে দিয়েছেন।”

জবাবে সুলতানের দিকে তাকিয়ে ছোট করে হাসলেন ডঃ ব্রিগেল। “ইংরিজিতে একটা প্রবাদ আছে আর আপনিও সেটা জানেন নিশ্চয়। ক্যাট ও নাইন টেলস। বেড়ালের ন’টা জীবন আর ন’টা জীবনে ন’খানা গল্প বলার থাকে তার। আপনার এই বোস লোকটার বোধহয় আঠারোটা গল্প বলার আছে। নইলে অতগুলো বুলেট, অতখানি ব্রিডিং, কয়েক হাজার মাইল উড়ে আসার ধকল...এত কিছুর পরও বেঁচে আছে লোকটা! জাস্ট আনবিলিভেবল! অ্যান্ড হিজ গ্রেট লাক।” কাঁধ ঝাঁকালেন ডাক্তারবাবু, “আই হ্যাভ টু অ্যাডমিট দ্যাট। কোমরের বুলেটটা, কিডনির মাত্র সিকিটাক ইঞ্চি দূরে এসে থেমে গেছে। একটু এদিক ওদিক হলে...” সেকেন্ডকয়েক চুপ করে রইলেন ডঃ ব্রিগেল। তার পর ফের তাকালেন সুলতানের দিকে, “তবে বাহ্যিকভাবে ঘটনা না কাটলে কোনও কমেস্ট করার জায়গায় আসতে পারছি না আমরা। সো, ইয়োর হাইনেস, উড ইউ প্লিজ...” বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তারবাবু। দেখাদেখি বাকিরাও।

সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর ফের এসে সোফায় বসলেন সুলতান। ডক্টর রাইনহার্ড সম্ভবত ঠিকই বলে গেলেন। বোসের বোধহয় আঠারোটা গল্প বলা বাকি আছে এখনও। সুলতান জানেন, সে যখন নিজের জগতে সক্রিয় ছিল তখন ওর সার্কিটের লোক জন ওকে সিউডো ইউডো নামে ডাকত। রাশিয়ান রূপকথার অজেয়, অমর এক দানব, যার বিনাশ নেই! সোফায় মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে আকাশের দিকে হাত তুললেন সুলতান আবু বিন হাশেম, “ইয়া খুদা, সিউডো ইউডো-র রূপকথাটা যেন মিথ্যে না হয়!”

‘ট্রা ট্রা ট্রা ট্রা...’ গিরিখাতের সরু বাঁকটা থেকে বৃষ্টির মতো টানা ছুটে আসছে বুলেট। বিশাল পাথরটার নীচে আরও আরও বেশি করে ঢুকে যেতে চাইছে তুর্ফ। ‘টিং টাং...’ পাথরে লেগে খালি কার্তুজের খোলগুলো ছিটকে পড়ছে চার পাশে। ছিটকে ওঠা পাথর, পাহাড়ি ধুলো, ধোঁয়ায় ঘোলাটে চার পাশ... দূরে আকাশে অনেকগুলো গুবরে পোকা। তাদের

ডানার ‘ভোঁও’ শব্দটা গুট গুট গর্জনে পরিণত হচ্ছে ক্রমাগত। পোকাগুলো বদলে যাচ্ছে গানশিপ হেলিকপ্টারে। ঘুম নেমে আসতে চাইছে দু’চোখ ভেঙে। ম্যাগনাম ৪৮-টাকে আরও, আরও শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে জেগে থাকার মরিয়া লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তুর্ফ। দূর থেকে মা ল্যুদমিলা বোসের তীব্র চিৎকার, “ডোন্ট ফল অ্যান্সি পাই ব্রেভহার্ট সন! দোজ বাস্টার্ডস কান্ট কিল ইউ!”... হঠাৎ এই সময় তীব্র চমক! গুলিবৃষ্টির মাঝখান দিয়ে খেউ খেউ করতে করতে পুঁচকে ল্যাঙ্গটা নাড়িয়ে ছুটে আসছে ছোট্ট টুকি। “চলে যা, চলে যা এখান থেকে! দে উইল কিল ইউ! গো বেবি, গোওও!...টুকি, টুকি!” উন্মত্তের মতো চিৎকার করছে তুর্ফ... আই সি ইউ ওয়ার্ডে বেডের পাশে বসা ২৪ ঘণ্টার অ্যাটেনডেন্ট শ্বেতাঙ্গিনী নার্স, সামান্য ঝুঁকে পড়ে কান পাতলেন। খুব আবছা, অস্ফুট ঘোর-লাগা গলায় বিড়বিড় করে “টুকি, টুকি” জাতীয় কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে বেডে শোওয়া লোকটা। এখুনি খবরটা দেওয়া দরকার ডক্টর ব্রিগেলকে। ইন্টারকমের রিসিভারটা তুলে নিলেন নার্স ভদ্রমহিলা।

হাসপাতাল চত্বরের মধ্যেই ডঃ রাইনহার্ড ব্রিগেলের সাজানো-গোছানো বাংলা টাইপ কোয়ার্টার। সকালের প্রাতরাশ সারছিলেন শ্রোত্র চিকিৎসক। এমন সময় সেন্টার টেবিলে রাখা স্মার্টফোনটা বেজে উঠল। উঠে গিয়ে কানে তুলতেই ও প্রান্তে ক্রিস্টিয়ানার গলা। বোসের জ্ঞান ফিরছে। গতকাল ৭২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। তার পরও সেন্স না আসায় টেনশন হচ্ছিল। এখুনি যাওয়া দরকার হাসপাতালে। প্রাতরাশ টেবিলে আর ফিরলেন না ডঃ রাইনহার্ড।

৭ দিন পর।

হাসপাতালের এক দিক উঁচু করে দেওয়া স্বয়ংক্রিয় বিছানাটায় বালিশে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে তুর্ফ। আজই সকালে নর্মাল কেবিনে দেওয়া হয়েছে ওকে। দীর্ঘ অপারেশনের ধকল আর চরম ক্লান্তির ছাপ এখনও লেপ্টে রয়েছে চোখেমুখে।

তুর্ফর ডান হাতটা নিজের হাতে নিয়ে মাথার কাছে বসে থাকা সাবা। বেডের চারপাশ ঘিরে চেয়ারে লিদিয়া, সেগেই, আমির ফাতাহি। হুইলচেয়ারে বসা ভ্যালেন্তিনা। শুধু সুলতান আবু বিন হাশেম ফিরে গেছেন দেশে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে পরপর অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং রয়েছে তাঁর।

“সো?” তুর্ফর দিকে তাকিয়ে চোখ নাচাল সেগেই, “সিউডো ইউডো ইজ ব্যাক ইন অ্যাকশন এগেন!”

“নো, সেগেই!” ক্লান্ত চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল তুর্ফ, “নো মোর অ্যাকশন অ্যাট অল। আর যেটাকে তুমি অ্যাকশন বলছ সেটা আদৌ সে রকম কোনও ব্যাপারই নয়। মাই বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড হিজ ফ্যামিলি ওয়াজ ইন এক্সট্রিম ডেঞ্জার। ইন দিস সিচুয়েশন আই হ্যাভ টু গো টু দ্যাট মিশন। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ওয়াজ কোয়ার্টেট ন্যাচারাল, নাথিং এলস। তোমার বদলে আমি হলে তুমিও তাই করত। ও কে? সো ব্রাশ অল দোজ ক্র্যাপস আউট ফ্রম ইয়োর গ্রে ম্যাটার। গো হোম অ্যান্ড স্পেন্ড সাম গুড টাইম উইথ ইয়োর ফ্যামিলি। অনেকদিন পর শান্তি এসেছে তোমাদের সংসারে। এনজয় ইট।” বলে মুচকি হেসে চোখ ঘুরিয়ে তাকালো ভ্যালেন্তিনার দিকে। “সো ভ্যালি, মাই কিউট লিটল স্প্যারো, হাউ ইজ ইয়োর উন্ড?”

“ইট’স ফাইন বোস আঙ্কেল,” জবাবে পাল্টা হাসলো ভ্যালেন্তিনা। “ঘা-টা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। ডাক্তাররা বলেছেন, বুলেটটা বেশি ভেতরে পেনিট্রেট করতে পারেনি, সো ইট বিকেম ইজি টু অপারেট। প্রয়োজনে মস্কোয় ফিরে দু’-এক দিন ড্রেসিং করাতে হতে পারে।”

“দ্যাট’স গ্রেট!” বলে ঝুঁকে পড়ে ভ্যালেন্তিনার কাঁধে হাত রাখল তুর্ফ, “আই টেল ইউ সামথিং, লিসন ভেরি কেয়ারফুলি। সবার জীবনে টাকার প্রয়োজন আছে। আর সেটা থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে সেটা রোজগার করতে গিয়ে ইউ মাস্ট নট চুজ আ ট্র্যাক হুইচ ইজ রানিং ভেরি ফাস্ট টুওয়ার্ডস হেল।”

এইটুকু বলতেই সময় লাগল অনেকটা। গভীর ক্লান্তি জড়িয়ে রয়েছে গলায়। পাশে রাখা সিপার গ্লাস থেকে জল খেল কয়েক চুমুক। ফের চোখ

তুলে তাকাল ভ্যালেন্তিনার দিকে। “আমার কথাটা তোমার পছন্দ নাও হতে পারে তবে মনে রাখলে ভাল করবে।” বলতে বলতে গভীর হয়ে উঠল তুর্বার চোখমুখ, “ইজি, কুইক অ্যান্ড হিউজ মানি ইনকামের রাস্তাটা যে ডে বাই ডে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে, অলরেডি তার একটা এক্সট্রিম পয়েন্ট দেখে ফেলেছ তুমি, এমনকি আমার মতো বহু কিছুর সাক্ষী থাকা এক জনেরও এ ধরনের অভিজ্ঞতা আগে হয়নি কোনও দিন। সো টেক মাই অ্যাডভাইস, রোজগারের অন্য রাস্তা খোঁজো। বলশয় স্কুলের প্রভাক্ট তুমি, সাচ আ গুড আর্টিস্ট, এখনও বেশ কিছু নাচের স্কুল টিকে আছে মস্কোয়। মনে হয় তোমার মতো ক্রাফটি পারফর্মারের আজও ডিম্যান্ড আছে ও সব জায়গায়। এর পর যদি নিজে স্বাধীন ভাবে কিছু করতে চাও, উইদাউট মিনিমাম হেজিটেশন, আমাকে জানিও এক বার। সবাই মিলে চেষ্টাচরিত্র করে কিছু একটা হয়ে যাবে।”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল তুর্বা! চোখমুখের থমথমে ভাবটা কেটে গিয়ে তার বদলে একটা স্নান হাসি ঠোঁটের কোণে। “আসলে কী জানো ভ্যালেন্তিনা, সোভিয়েত মানে আমাদের ওই পুরনো ব্যবস্থাটা টিকে থাকলে আমাকে কোনওদিনই দুনিয়ার কোথাও কোনও চাকরি খুঁজতে যেতে হত না আর তোমার মতো এক জন শিল্পীও ও রকম ভয়ানক একটা চক্রের খপ্পরে গিয়ে পড়তে না। রাষ্ট্রই আমাদের সব দায়িত্ব নিত। নিরাপত্তা দিত আমাদের। কিন্তু সেটা তো আর হল না!” আর-একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল একদা দুর্ধর্ষ স্মার্শ এজেন্টের বুক চিরে। “তাই নিজেদের রাস্তা নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে। আর সেই কঠিন রাস্তায় একে অন্যের হাতটা খুব শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে থাকতে হবে আমাদের সবাইকে। আলগা হতে দেওয়া যাবে না কিছুতেই। ইউ জাস্ট কিপ ইয়ার হার্ট আপ, মাই ডিয়ার...”

তুর্বার কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে এসে ওর কাঁধে হাত রাখল লিদিয়া। থরথর কাঁপছে চোখমুখের পেশিগুলো। “তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি কোনও দিন। সেগেইও বলেনি সম্ভবত। আমার ভাই ইউরি। উই ওয়ার টুইনস। দু’জনেই তখন ফিফথ স্ট্যান্ডার্ড। উইন্টার ভেকেশনের আগের দিন স্কুলে যাওয়ার জন্য স্কেটিংয়ে চড়ে বড়রাস্তা পার হচ্ছিলাম দু’ ভাইবোনে। দূর থেকে ছুটে আসা গাড়িটার স্পিড আন্দাজ করতে পারিনি কেউই। শেষ মুহুর্তে আমাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ির নাগালের বাইরে বার করে দিয়েছিল ইউরি। কিন্তু নিজে আর বেরোতে পারিনি! আজ মনে হচ্ছে আমার সামনে ইউরি বসে আছে এই হাসপাতালের বেড়ে।” বলেই প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল তুর্বার বুক। ছুটে এলেন ডিউটি নার্স।

“প্লিজ, ডোন্ট ডু দ্যাট! পেশেন্ট ইজ সিভিয়ারলি ইনজিওরড। সিচুয়েশন কুড বি গ্রেভ অ্যাট এনি মোমেন্ট!” কণ্ঠস্বরে অনুরোধের সঙ্গে বেশ খানিকটা ধমকও মেশানো। সম্বিত ফিরে পেয়ে দ্রুত উঠে দাঁড়াল লিদিয়া। তার পর টলতে টলতে কোনও মতে নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে মাথা নিচু করে বসে রইল শব্দ হয়ে।

২৩ দিন পর।

হাসপাতাল-লাগোয়া সুন্দর, ছবির মতো সাজানো স্যানিটোরিয়াম আর রিহাব সেন্টার। সামনে বড়সড় লন। নিখুঁত-ছাঁটা ঘাসের কাপেট। মরশুমি ফুলের কেয়ারি। সেপ্টেম্বর মাসের শেষ। বাতাসে হিমেল কামড়। মিহি ধূসর কুয়াশার আন্তরণ চার পাশ জুড়ে। মহা শীত আর সঙ্গে তুষারপাতের আগমন বার্তা ইওরোপের এই ছোট শহরটায়। লনের একধারে ছোটখাটো একটা বাংলা। কাঠের দেয়াল, কাঠের ছাদ, কাঠের পাটাতনের বারান্দার ধারে কাঠের রেলিং। বাংলোর পিছনে একটা বড় চেস্টানট গাছ মাথা ঝুঁকিয়ে ঢেকে রেখেছে ছাদের প্রায় অর্ধেকটা। ফুরফুরে পাতা বারে পড়ার মৃদু শব্দ থেকে থেকে।

সেগেই আর লিদিয়া, ভ্যালেন্তিনাকে সঙ্গে নিয়ে মস্কো ফিরে গেছে কদিন আগেই। বাংলোর হাতায় ওককাঠের একটা চেয়ারে বসা তুর্বা। কোমর থেকে মাথা অবধি ঢাকা ব্ল্যাক ডাবল লেয়ার ফোম অ্যান্ড ফেদার জ্যাকেট আর হুডিতে। নিম্নাঙ্গে জোড়া কটস উলের ট্র্যাকসুট। পায়ে পুরু উলেন সন্ড আর সাদা স্নিকার। সাবার পরনেও ওই একই পোশাক। শুধু মাথা ঢাকবার হুডিটা আলগোছে নামানো ঘাড়ের উপর। গুঁড়ি গুঁড়ি

চুলের ড্রেডলক বিনুনিগুলো ছড়িয়ে রয়েছে কাঁধময়। সাবার হাতে দুধসাদা একটা পোসেলিনের সুপ বোল। বোল ভর্তি ডাক এক্সেরার সুপ উইথ মাশরুম অ্যান্ড ব্যাশু শুটস। পরম যত্নে সুপ স্পুনে তুলে একটু একটু করে খাইয়ে দিচ্ছে তুর্বাকে। একটুখানিও এদিক ওদিক পড়লে সঙ্গে সঙ্গে মুছে নিচ্ছে ন্যাপকিনে। সারা রাত তুর্বার দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ শরীরটাকে একটা পাখির ছানার মতো জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে থাকে নিজের বিশালকায় পর্বতপ্রমাণ, ঘোর কৃষ্ণকায় শরীরটার আড়ালে। মাঝে মাঝেই পরম স্নেহ আর নিবিড় ভালবাসা মাখা চুষন ঐকে দেয় কপালে, বুকে, গালে, ঠোঁটে। অথচ শরীর মিলনের জন্য এতটুকুও জোরা জুরি করেনি কোনও দিন। ঠিক যে ভাবে এক মা জানে তার সন্তান কতটা অসুস্থ। রাতে সামান্য একটু নাড়াচাড়া বা ছোট একটু কাশির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ওই বিশাল শরীর নিয়ে কী অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্ৰতায় লাফ দিয়ে উঠে বসবে বিছানায়, “হোয়াট হাপেন্ড বোস! এনি প্রবলেম, বেবি?”

“ইট’স নাথিং।” এতটুকু ছোট একটা উত্তরের প্রত্যাশা শুধু। সঙ্গে সঙ্গে একটা আলতো চুমু ঠোঁটে। তার পর ফের গড়িয়ে পড়া বিছানায়।

মাঝে মাঝেই মনে প্রশ্ন জাগে তুর্বার। কোন চোখে ওকে দেখে মেয়েটা? স্নেহপরাণ এক পিতা, পুত্র সন্তান, না বিশ্বস্ত প্রেমিক। বয়েসের এতটা ব্যবধান, পরস্পরের বেশিরভাগটাই অজানা দু’জনের কাছেই। হয়তো সময়ই এ সবার উত্তর দেবে।

ভিক্টর তালটা কেটে গেল লনে পায়ের শব্দে। কেয়ারির মাঝখানে মোরাম বিছানো পথটা ধরে এগিয়ে আসছেন আমির ফাতাহি। বাংলোর সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতেই তড়িঘড়ি আর-একটা চেয়ার এগিয়ে দিল সাবা। বসার পর জোব্বার উপর চাপানো ট্রেকিং জ্যাকেটটার পকেট থেকে একটা সাদা লেফাফা বের করলেন ফাতাহি। “আপনাদের দু’জনের ফ্লাইটের টিকিট। গুঁর জন্য টুরিস্ট ভিসা, পাসপোর্ট, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব আছে এতে। পরশু দুপুরের ফ্লাইট আপনাদের।” বলে লেফাফাটা বার করে তুলে দিলেন তুর্বার হাতে। খামটা হাতে নিয়ে ফাতাহির দিকে তাকাল তুর্বা, “হিজ হাইনেস প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকেন। আপনি নিজে একটু সাবার ব্যাপারটা দেখবেন। মাত্র ছ’মাসের টুরিস্ট ভিসা মেয়েটার হাতে। টাইম স্প্যান ইজ ভেরি শর্ট।”

“আপনি চিন্তা করবেন না। প্রসেস শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সুলতান নিজে গোটা প্রসেসটার টেক কেয়ার করছেন। ইভেন ডায়লগ এক্সচেঞ্জও স্টার্ট হয়ে গেছে আপনাদের দেশের হায়েস্ট অফিসিয়াল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লেভেলের সঙ্গে। দ্য জব উইল গেট ডান উইদিন ডিউ টাইম, ইনশাআল্লাহ!”

কথার মাঝখানে তিনটে বড় মাগে আফ্রিকান কায়দায় কড়া কালো কফি বানিয়ে নিয়ে এসে সামনে ছোট সেন্টার টেবিলটায় রাখল সাবা। বড় বড় কয়েকটা চুমুকে মাগটা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন আমির ফাতাহি। “ইজাজত দিন, আমি তা হলে এগোই। কাল আর্লি মর্নিংয়ে আমার ফ্লাইট। তবে জনাব বোস, আপনি আরও কয়েকটা দিন থেকে গেলে পারতেন এখানে। আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে আরও ভাল হত সেটা।”

“আই নো দ্যাট ভেরি ওয়েল, অনারেবল স্যার। বাট আ স্মল পিস অব মাই হার্ট, ওই খুদে চারপেয়েটা আমাকে ছেড়ে অনেক দিন হল পড়ে আছে ওখানে। তাই ফিরতে আমাকে হবেই, অ্যাজ আর্লিয়েস্ট অ্যাজ পসিবল। আই হোপ ইউ’ল আন্ডারস্ট্যান্ড মাই প্রবলেম।”

“ইয়েস, আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্যাট ভেরি ওয়েল।” জবাবে মুচকি হাসলেন আমির ফাতাহি। তার পর দীর্ঘ শরীরটা নিয়ে লম্বা লম্বা পা চালিয়ে বেরিয়ে গেলেন লনের বাইরে।

বেলা এগারোটা নাগাদ এলিয়ট রোডের বাড়িতে প্রথম শীতের হাঙ্কা রোদে বারান্দার ইজিচেয়ারটায় শুয়ে চোখে আই ড্রপ দিচ্ছিলেন মিসেস গোমস। চোখের ডাক্তার বলেছেন, দু’চোখেই ছানিটা পুরু হয়েছে। ফুটদেশে দূরেও সব কিছু ঝাপসা ঠেকে। আপাতত এই ড্রপটা দিয়েছেন ডাক্তারবাবু। বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপারেশনটা করিয়ে নিতে। নয়তো পরে সমস্যা হবে। কিন্তু পুষ্টিগুলোকে ফেলে রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। মেয়ে-জামাই এ বার ক্রিসমাসের ছুটিতে আসবে বলেছে। তখনই

চুকিয়ে ফেলতে হবে বামেলানটা। এ রকমই একটা প্ল্যান ছকা আছে মনে মনে। তার পর সবই প্রভুর ইচ্ছে।

প্রতি চোখে দু'ফোঁটা করে ড্রপ দিয়ে চোখ বুজে আরামকেদারায় মাথাটা হেলিয়ে দিলেন মিসেস গোমস। মিনিটদুয়েক পর ঘরের ভেতর থেকে কুঁইকুঁই একটা আওয়াজ। পরমুহূর্তেই প্রবল খেউ খেউ রবে বারান্দা পেরিয়ে তিরবেগে লন ধরে ছুটে গেল টুকি। টুকিকে অনুসরণ করে লনের শেষপ্রান্তে দরজার দিকে চোখ পিটপিটিয়ে তাকালেন মিসেস গোমস। আবছা দীর্ঘকায় একটা অবয়ব দরজার সামনে। স্পষ্ট ঠাহর না হলেও টুকির এভাবে ছুটে যাওয়ার কারণটা বুঝতে অসুবিধে হল না এতটুকু। অশক্ত শরীরে কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন বৃদ্ধা। দীর্ঘসময় জমে থাকা সমস্ত উচ্চাস আর বিস্ময় এসে জড়ো হয়েছে গলায়, “হোয়াই সো লেট, মাই বয়!”

ইতিমধ্যেই লাফ দিয়ে তুর্যর কোলে চড়ে বসেছে টুকি। ছোট গোলাপি টুকটুকে জিভ দিয়ে চেটে চেটে একশা করে দিচ্ছে মুখখানা। আদরের ধাক্কা খানিকটা সামলে মিসেস গোমসের দিকে তাকিয়ে হাসল তুর্য, “একটা খুব বিচ্ছিরি ধরনের কনজেশন, নিউমোনিয়ার দিকে টার্ন নিয়েছিল সেটা। ফলে হসপিটালে অ্যাডমিটেড হতে হয়েছিল কিছুদিনের জন্য। দ্যাট'স হোয়াই... এনিওয়ে, আয়াম একট্রিমলি সিরি ফর দোজ আনঅ্যাভয়েডেবল সারকামস্ট্যান্সেস।”

“নো, নো মাই বয়, বাই দ্য গ্রেস অব লর্ড, তুমি যে সুস্থ হয়ে ফিরে আসতে পেরেছ, সেটাই অনেক।” চোখ দুটো ছলছল করে উঠল মেমসাহেবের। পরমুহূর্তেই চোখ গেল ফুটপাথের ধারে রাস্তার উপর ভাড়ার ট্যাক্সিটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সাবার দিকে। “ইজ শি উইথ ইউ?” তুর্যর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন মিসেস গোমস।

“ইয়েস।” বলল তুর্য। সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে সাবার হাতটা ধরলেন মেমসাহেব— “প্লিজ কাম ইন, মাই গার্ল।”

বারান্দায় সেন্টার টেবিলে রাখা ফুল ক্রিম মিক্স কফির তিনটে কাপ। প্লেটে পি-নাট কুকিজ আর রিচ প্লাম কেক। মেমসাহেবের নিজের হাতে বানানো। টেবিল ঘিরে তিনটে চেয়ারে মিসেস গোমস, সাবা আর তুর্য। ওর কোল ছেড়ে সাবার কোলে গিয়ে বসেছে টুকি। এই এতটুকু সময়ের মধ্যেই খুব জমে গেছে দু'জনের। পরম স্নেহে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সাবা। মিসেস গোমসের পায়ের কাছে কী রকম একটা বিষণ্ণ মুখে বসে আছে বৃদ্ধো ল্যাব্রাডর রেক্স আর তিনপেয়ে দেশি প্রিন্সি। বন্ধুবিচ্ছেদের সময় হয়ে এসেছে, বুঝতে পারছে সম্ভবত।

কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তুর্য। “বাই মিসেস গোমস, আমরা তা হলে এগোই? এয়ারপোর্ট থেকে সোজা আসছি এখানে। বাড়ি ফিরে এ বার একটু ফ্রেশ হব। হোপ, উই'ল মিট ভেরি সুন, তা ছাড়া ওভার ফোন কন্টাক্ট তো থাকবেই। ইন এনি নিড, জাস্ট মেক আ কল।”

“ওহ শিওর, মাই বয়!” বলমলিয়ে উঠল বৃদ্ধা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেমসাহেবের মুখখানা। “মে গড ব্লেস ইউ পিপল।” জবাবে হেসে বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল তুর্য। পেছনে পেছনে টুকিকে কোলে নিয়ে সাবা।

দু'বছর পর।

কলকাতা শহরতলির নাকটা যেখানে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পেটে গিয়ে সবে গাঁও মেরেছে, আধা-গাঁ আধা শহর জনপদটার নাম ভূতির হাট। অঞ্চলের বুক চিরে যে মূল সড়কটা সোজা ডায়মন্ড হারবার রোডের দিকে চলে গেছে, সেখানে বড়রাস্তার একদম উপরেই উঁচু পাঁচিল ঘেরা একরদুয়েক জমির উপর ছিমছাম দেড়তলা বাংলা ধরনের বাড়িটা। ভিতরে ঢোকার মজবুত লোহার দরজাটার একপাশে ছোট পাথরের ফলকটার গায়ে লেখা ‘হারমনি’। দু'দিক থেকে খুলে যাওয়া বড়সড় দরজাটার ঠিক মাঝখানে দিয়ে মেহেন্দি আর বনতুলসীর বেড়াটাকে দু'পাশে রেখে লাল সুরকি বিছানো রাস্তাটা সোজা গিয়ে শেষ হয়েছে বাংলার প্রশস্ত বারান্দাটায়। যেখানে ছোটখাটো একটা উৎসবের পরিবেশ এই মুহূর্তে। বারান্দার মাঝখানে একটা গোল শ্বেতপাথরের

টেবিলে রাখা ছোট একটা বার্থডে কেক। মাঝখানে গৌঁজা একখানা জ্বলন্ত মোমবাতি। কেকের উপর আইসিংয়ে লেখা— ‘হ্যাপি বার্থডে বোস’। টেবিলের সামনে দাঁড়ানো তুর্য। দীর্ঘকায় শরীরে শার্টের উপর পাতলা হাফহাতা একটা সোয়েটার। হাতে কেককাটা একটা ছুরি। আজ আটান্ন পেরিয়ে উনষাটে পা দিলো তুর্য। পাশে দাঁড়ানো সাবা। পরনে স্কাই ব্লু ট্রাক সুট। ওদের দু'জনকে ঘিরে আরও কয়েক জন। পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে টুকি আর তিনপেয়ে দেশি প্রিন্সি। “গেট রেডি, বার্থডে বয়!” হৈঁকে উঠল সাবা। কেকে ছুরি চালান তুর্য। “হ্যাপি বার্থডে টু ইউ...!” হাল্কা উদাত্ত সুরেলা গলায় গেয়ে উঠল সাবা। গলা মেলাল বাকি সবাই। সাবার পাশে দাঁড়ানো একটা বছর ষোলো সতেরোর রোগাপাতলা চেহারার ছেলে। নাম পালান। হাতে ফোম থ্রোয়ারের স্টিক। আঙুলের চাপে ‘ফট!’ শব্দে খুলে গেল স্টিকের ঢাকনাটা। রংবেরং পোঁজা তুষারের মতো হাল্কা ফোম ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে সবাই গায়ে মাথায়। হেঁচ উল্লাস, টুকি, প্রিন্সির খেউ খেউ, সব থেমে যাওয়ার পর ফের নির্জন চার পাশ।

ঘরে ঢুকে বাকাড়ির একটা লার্জ পেগ বানিয়ে নিয়ে এসে বারান্দায় রাখা ইজিচেয়ারটায় বসল তুর্য। হাতের বাঁ দিকে প্রায় কাঠাদুয়েক জমি জুড়ে পাঁচমিশেলি মরশুমি সবজির চাষ। বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুলো, পাংগ, শালগম। বারান্দার মুখোমুখি সীমানার একদম শেষপ্রান্তে পাঁচিল ঘেঁষে একটা ছোট পুকুর। পরিকার টলটলে জল। বাঁধানো ঘাট। মাছ ছাড়া-তোলা হয় নিয়ম করে। পোলট্রি ঘরে সামান্য কটা মোরগ মুরগি। ডিমটিম সব বাড়িতেই লাগে। বাড়ির পিছনে গোয়ালে একটা জার্সি গাই। এ ছাড়াও দুটো রাজহাঁস। সাবা ওদের নাম রেখেছে জোসেফ আর মেরি।

সৃষ্টি সেন নামে নাসার এক মহাকাশ বিজ্ঞানী শহরের উপগ্রাস্তে বানিয়েছিলেন এই বাড়িটা। একটা খামারবাড়ির আদলে। পরিকল্পনা ছিল অবসরের পর দেশে ফিরে এসে পাকাপাকিভাবে এখানে থাকা। অল্পসল্প কিছু শখের চাষবাস, টুকটাক পুকুরের মাছ, খাঁটি দুধ, এই সব আর কি। সে কারণেই এই মুরগি, গরু, পুকুর ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। এখানে আসার বছরখানেকের মধ্যেই জটিল কোলন ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে মাসছয়েকের মধ্যে মারা যান তিনি। রোগটা ধরা পড়েছিল প্রায় থার্ড স্টেজে।

ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী মার্কিন মুলুকে নিজের ছেলের কাছে ফিরে যাওয়ার সময় তুর্য মহিলার থেকে খানিকটা সন্তাদরেই বাড়িটা কেনে। পোলট্রি, গরু, গোয়াল, পুকুর সব আগে থেকেই ছিল। জোসেফ আর মেরিকে নেপালগঞ্জের হাট থেকে নিয়ে এসেছিল সাবা। সদ্য ডিম ফুটে বেরোনো হানা অবস্থায়। এ দিকে মাত্র মাসআটেক আগে চলে গেলেন মিসেস গোমস। প্রিয় পোষ্য রেজের মৃত্যুর মাত্র মাসদুয়েকের মধ্যে। তীব্র হাট অ্যাটাক ঘুমের ঘোরেই। ডাক্তার ডাকার সময়টুকুও পাওয়া যায়নি। মেয়ে জামাই অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে পৌঁছনো অবধি পিস হেভেনে দেহ রাখা, অন্য আর পাঁচটা বন্ধিবামেলা সামলানো সব প্রায় একা করেছিল তুর্য। সমস্ত পারলৌকিক কাজকর্ম চুকিয়ে মেয়ে জামাই ফিরে যাওয়ার পর তিনপেয়ে দিশি প্রিন্সিকে এই ভূতির হাটের বাড়িতে নিয়ে চলে আসে ও। সেই থেকে টুকির সঙ্গে প্রিন্সিও এখানে।

এই মাত্র দুটো বছরে কীভাবে একটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি হয়ে গেল ও আর টুকির ছোট সংসারটা, মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবে তুর্য। আফ্রিকা থেকে সাবা এল। এর পর আকবর চাচা। তিনকুলে কেউ নেই। চরম দুর্দশাগ্রস্ত। প্রায় দৃষ্টিহীন। অশক্ত শরীর। পড়ে ছিল বন্ধ হয়ে যাওয়া কালান্তর অফিসের অঙ্ককার, জলহীন, বিদ্যুৎহীন, ভাঙাচোরা একতলার খুপরি ঘরটায়, ধসে পড়া সমাজতন্ত্রের একটা বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে। সেখান থেকে তুলে নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, চোখ অপারেশন, এখানেই রয়ে গেল চাচাও। অনেক সুস্থ এখন। লাঠি ঠুকঠুকিয়ে ঘরে বেড়ায় গোটা চত্বর জুড়ে। গোয়ালে, বাগানে খাটতে আসা লোকজন, মুনিষ বাগালদের পিছনে লেগে থেকে কাজ করায়। আছে মালতীদি। রোগাটে চেহারা। স্বামী অন্য মেয়ে নিয়ে ভেগেছিল বিয়ের বছরখানেকের মধ্যেই। পেটে একটা দিয়ে। সেই পেটের ছেলেও

বৌ নিয়ে আলাদা বিয়ের পরপরই। বলতে গেলে এ বাড়িতে ২৪ ঘণ্টার সেক্স ডিক্লেয়ার্ড গার্জেন মালতীদিহি। কেউ কারও ভাষা একবিন্দুও বোঝে না তবু মাঝেমাঝেই বেশ ধমকধামক দেয় সাবাকে। বাধ্য বাচ্চা মেয়ের মতো মাথা নিচু করে শোনে সাবা। ওকে চিতি কাঁকড়ার টক আর গিমে শাক রান্না শেখায় মালতীদি। আর সবার শেষে এসেছিল পালান। পালান শিকারি। বাড়ি সুন্দরবনের গাঁওখালি। বাবা জঙ্গলে মধু ভাঙতে গিয়ে বাঘের পেটে। বছর চোদ্দোর পালান একদিন ভোরবেলা বিছানায় উঠে বসে দেখেছিল পাশে মা নেই! ঘর ছেড়ে রাস্তায় নামতে হয়েছিল ছেলোটাকে। বেহালার দিকে কাজ জুটেছিল একটা মুদি দোকানে। ছুটছুটি ভুল। বেধড়ক পিটত দোকানি। এ রকম চলতে চলতে একদিন পাঁচশো গ্রামের বাটখারাটা তুলে নিয়ে সোজা বসিয়ে দিয়েছিল মালিকের কপালে। তার পর টেনে দৌড়। সে দৌড় এসে থেমেছিল ভুতির হাটে তুর্ঘদের বাড়ির দরজায়। ও কিছু চায় না। শুধু একটু থাকতে চায় আর নিজে কী করে এসেছে সেটাও বলেছিল খোলাখুলি। তুর্ঘরা তখন মাত্র মাসচারেক হল এসেছে এখানে। পুরো ঘটনাটা তুর্ঘর মুখ থেকে শোনার পর আর একটাও প্রশ্ন করেনি সাবা। পালানের হাত ধরে সোজা নিয়ে গিয়ে চুকিয়ে দিয়েছিল স্নানঘরে। বেরোনার পর কর্ন ফ্লাওয়ার, ভুট্টার দানা, এক খামচা নুডলস্ আর অনেকখানি অতিরিক্ত মাংস দিয়ে বড় একবাটি ঘন স্যুপ বানিয়ে এনে টেবিলে রেখেছিল ওর সামনে। খাওয়া শেষ হলে দোতলায় নিয়ে গিয়ে কোণের একফালি ঘরটায় পাতা ছোট শোবার বিছানাটা দেখিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে এ বাড়িতে রয়ে গিয়েছে ছেলেটা। আর আজ, এই দু'বছর পর এ বাড়ির অল পারপাস জব পারসোনেলের নাম— পালান শিকারি। ওকে ছাড়া চোখে অন্ধকার দেখে সাবা আর তুর্ঘ দু'জনেই।

বাকার্ডির প্লাসটা নামিয়ে রেখে পকেট থেকে প্যাকেট বের করে আর-একটা সিগারেট ধরাল তুর্ঘ। বাগানের মাঝখানে খুব কম পাওয়ারের সি এফ এল বাতির মৃদু আলোয় হালকা চিকচিক করছে পালাং পাতাগুলো। ‘ঘুপ’— পুকুরের জলে ঘাই মারল মাছ। আধো অন্ধকারে শীতের ভারী হাওয়ায় খুব ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাওয়া ঝোঁয়ার রিং। মস্কো থেকে খবর আসে। খুব ভাল ভাল সব খবর। ফিরে গিয়ে প্রথমে ওর পুরনো নাচের স্কুলেই পার্ট টাইম জবে জয়েন করেছিল ভ্যালেন্তিনা। মাস ছয় পরই চাকরি ছেড়ে নিজের স্কুল খোলে একটা। দারুণ জমে গেছে সেটা। তিনটে সেশনে প্রায় দেড়শো ছেলেমেয়ে শেখে। আরও অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়ছে রোজ। সেগেই আর লিদিয়া ম্যানেজমেন্টের দিকটা দেখে। আরও বড় একটা জায়গা খুঁজছে ওরা। পুরনো ছোট জায়গাটায় আর কুলোচ্ছে না। মাঝে মাঝেই হোয়াটসঅ্যাপে, ভয়েস কলে অন্তত একবার মস্কো ঘুরে যাওয়ার আবদার জানায় দু'জনকে ঘুরেফিরে। ঠান্ডাটা একটু কমলে যাওয়ার একটা পরিকল্পনাও রয়েছে ও দেশে। ফেলে আসা স্বদেশ! বাবা তমাল আর মা লুদমিলা বোসের সমাজতন্ত্রের ধাত্রীভূমি। সুলতান আবু বিন হাশেমের দেশে চাকরি নিয়ে চলে যাওয়া ইত্তরক আর ফেরা হয়ে ওঠেনি কোনওদিন। ইচ্ছেটা ক্রমাগত লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়ছে মনের কোণে, টের পায় তুর্ঘ। ওখানে গিয়ে সাবাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবে সব। কাতিউশা স্ট্রিটের আবাসন, ওদের ঘরটা, ছেলেবেলার স্কুল, ফুটবল মাঠ, বাস্কেটবল আর ভলিবল কোর্ট, বক্সিং রিং, মার্শাল আর্টের দোজো, রেড স্কোয়ার, লেনিন মসোলিয়াম, মস্কো ডায়নামো স্টেডিয়াম, লুবিয়ান্সা স্ট্রিট ওদের কে জি বি সদর দপ্তরের সেই লাল ইটের বাড়িটা, তাইগা, আমুর, স্তেপভূমির সেইসব দুর্গম ট্রেনিং ক্যাম্পগুলো। এক-একটার ইতিহাস শোনাতে আলাদা আলাদা করে।

সাবা! ফিরে আসার পর ওর মুখেই ওর ইতিহাস শুনেছে তুর্ঘ। ধাপে, ধাপে, দীর্ঘ দু'বছর সময় ধরে। আর যা শুনেছে, তাতে একটা বিশাল সময় জুড়ে ওর নিজের পেশাদার জীবনে বহু ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক রাস্তায় হাঁটার ব্যাপারটাও কেমন যেন খাটো হয়ে গেছে এই কালো মেয়েটার জীবনের সামনে।

মরুভূমি ঘেঁষা মধ্য আফ্রিকার সাভানা প্রান্তরের প্রত্যন্ত গ্রামে জনজাতি সম্প্রদায়ের মেয়ে সাবা। গোচারণ আর গবাদি পশুপালন ওদের গোষ্ঠীর প্রধান পেশা। হতদরিদ্র দেশের এক হতদরিদ্র গ্রাম।

মরুভূমি লাগোয়া আর বৃষ্টি খুবই কম হওয়ার কারণে জমি রুখাশুখা, উষর। জল অপ্রচুর, ফলে চাষাবাস অত্যন্ত কম। নেই বললেই চলে। গবাদি পশু পালা-পোষা আর তাদের মাংস আর দুধে জীবনযাপন। জীবিকা বলো, খাদ্য বলো, সবই ওই। তবে গরু মোষ পাললেই তো আর হবে না। ঘাস খাওয়ানোর জন্য চরাতে নিয়ে যেতে হবে নিয়মিত। তার জন্য শা-জোয়ান, বুকের পাটাওয়ালা লোক চাই। কারণ সাভানা ঘাসজমির বাঁকে বাঁকে ওত পেতে বসে থাকে সিংহের পাল। দল বেঁধে শিকার করে। তাদের মোকাবিলা করা যার তার কন্মো নয়।

গ্রামে ও রকমই লোক ছিল দেখেবে। দেখেবে ইয়েকিনি। সাবার বাবা। সাড়ে ছ ফুটিয়া জোয়ান। পাথরে কোঁদা চেহারা। বড়সড় একটা বেজায় মজবুত বাওবাব ডালের লাঠি নিয়ে গরু চরাতে বেরোতো সাভানায়। ও এবং ওর হাতের লাঠি দেখলে ল্যাজ তুলে ছুট লাগাত সিংহের পাল। ফলে গ্রামের আরও দশটা পরিবার, যাদের ঘরে ওর মতো বুকের পাটাওয়ালা মরদ নেই, তারা নিজেদের পশুগুলোকে চরানোর জন্য নিশ্চিন্তে তুলে দিত সাবার বাপের হাতে। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। ওটা ছিল দেখেবের অতিরিক্ত রোজগার।

সেই দেখেবে। একদিন ভয়ঙ্কর এক ফুটিফাটা গরমের দিনে সন্তর আশিটা গরুমোষের বড়সড় একটা পাল নিয়ে চরাতে বেরিয়েছিল সাভানা জমিতে। প্রখর দুপুরে রোদের তাপ থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছিল একটা অ্যাকাসিয়া গাছের ছায়ায়। সড়াং করে ডাল বেয়ে নেমে এসে ঘাড়ের কাছটায় কামড় বসিয়েছিল আট-ন ফুটের একটা ব্ল্যাক মাশ্বা।

ব্ল্যাক মাশ্বা। শুধু আফ্রিকা মহাদেশ নয়, সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম তীব্র বিষধর সাপ। টেনেটেনে বড়জোর আধ কিলোমিটার মতো যেতে পেরেছিল দেখেবে। তার পর গ্যাঁজলা উঠে মুখ খুবড়ে পড়েছিল মাটিতে। সাবা তখন সবে পনেরো কি ষোলো।

উষর রুক্ষ সাভানা আর মরুভূমির দেশে চাষাবাস খুব কম। শস্য, শাকসব্জি আর ফলের আকাল। ফলে পশুর মাংস আর দুধই মূল খাদ্য। শরীরে অন্যান্য খাদ্য উপাদানের অভাবে একটা রোগ খুব হয় মধ্য আফ্রিকার ওইসব অঞ্চলে। স্কার্ভি। ওই রোগেই মারা গিয়েছিল দেখেবের বৌ। সাবার মা মালিবা। দেখেবের মারা যাওয়ার বছরদেড়েকের মধ্যে। হঠাৎই এই এতবড় দুনিয়াটায় একদম একা হয়ে গেছিল সাবা নামে বছর আঠেরোর একটা কালো মেয়ে। তবে নিয়তিটাকে মেনে না নিয়ে হাতে তুলে নিয়েছিল বাবার লাঠিটা। দেখেবের কাছে যারা গরু চরাতে দিত সেইসব গেরস্তদের ঘরে ঘরে গিয়ে ভরসা জুগিয়েছিল। তার পর এক সকালে আশি একশোটা গাইভয়সের বিশাল পাল নিয়ে চরাতে বেরিয়ে পড়েছিল বিশাল, উন্মুক্ত সাভানা প্রান্তরে। কিছুদিনের মধ্যেই গোটা গাঁয়ের মানুষ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল, বাবা দেখেবের তবু প্রবল তর্জন গর্জন করে লাঠি বাগিয়ে তেড়ে যেতে হত। মেয়ের বেলায় সেটুকুও হচ্ছে না। পর্বতাকার শরীরটা নিয়ে একবার লাঠি ঠুকে পা ধাপিয়ে দাঁড়ালেই হত। ল্যাজ তুলে পালানোর পথ পেত না সিংহের পাল।

তবে সিংহ তাড়ালেই তো শুধু চলবে না, গরুমোষদের ঘাস খাবার উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। হদিশ করতে হবে একটুকরো জলাশয় যেখানে অবলা প্রাণীগুলো একটু গলা ভেজাবে। আর কে না জানে, মরুভূমিতে ও রকম একফালি জায়গা, মানে ওয়েসিস, খুঁজে বের করাটা কতটা ঝকঝক। আবার সেরকম জায়গা খুঁজে পেলেও তার দখল নেওয়াটাও ভয়ঙ্কর ঝামেলার ব্যাপার। সবাই সে জায়গা কবজা করতে চায়। তাগড়াই সব জোয়ান রাখাল ছেলে, তারা তাদের দখলি জমি ছাড়বে কেন? ফলে মুখোমুখি লড়াই। এ বার কথা বলেছিল সাবার হাত। ওর এক-একটা ঘুসিতে মাটি ধরে নিতে হল ওকে চ্যালেঞ্জ নিতে আসা আশপাশের পাঁচ দশটা গাঁয়ের বাঘা বাঘা সব লড়িয়েদের।

সাবার এই ক্ষমতার কথাটা ওর আশপাশের পাঁচ দশটা গাঁয়েই আটকে রইল না। এক দিন কাকভোরে ওর ঘুম ভেঙেছিল গাড়ির হর্ন আর দরজার সামনে ভারী ভারী বুটের আওয়াজে। বাঁশের দরজার আগলটা খুলে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। বাবলা ডালের বেড়াটার ওপারে দাঁড়ানো একটা হুডখোলা জলপাই সবুজরঙা জোঙ্গা। ড্রাইভারের



পাশে বসা লম্বাচওড়া একটা লোক। পরনে ফৌজি ইউনিফর্ম। সম্ভবত দলের নেতা। একদৃষ্টিতে মাপছে ওকে। পেছনের সিট থেকে লাফ দিয়ে নেমে সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল এক জন। একই রকম জলপাই পোশাক। “চল, গাড়িতে ওঠা!” বলেছিল খ্যাড়খেড়ে রুক্ষ, ককর্শ গলায়। “কেন?” ঠান্ডাচোখে লোকটার দিকে তাকিয়েছিল সাবা। “শালি, আবার জবাব চাওয়া হচ্ছে!” গাল লক্ষ করে নেমে আসা চড়টাকে বাঁহাত তুলে আটকেছিল সাবা। পরমুহূর্তেই ডান হাতের একটা মোক্ষম জ্যাংবে মাটিতে ছিটকে পড়েছিল লোকটা। কাঁধের লাইট মেশিনগানটা গিয়ে পড়েছিল হাতখানেক দূরে। হাত বাড়িয়ে সেটাকে তুলে নেওয়ার মুখে ধমকে উঠেছিল গাড়িতে বসা দলের সর্দার ফৌজিটা, “নো, জেমো!” ওর নাম কোলো, পরে জেনেছিল সাবা।

গাড়ি থেকে নেমে ওর দিকে এগিয়ে এসেছিল কোলো। “জেনারেল পাঠিয়েছেন আমাকে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান উনি।” জেনারেল মানে স্যাভিসি, এদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, সেটা জানা ছিল সাবার। একমুহূর্ত ভেবেছিল সাবা। তার পর ঘরে ঢুকে ঘাসের চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে চড়ে বসেছিল গাড়িতে। “চলো।” সাভানার ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে গেছিল ফৌজি জোস্কা।

নিজের বিশাল খামারবাড়িটার পিছনে আস্তাবলে সদ্য কেনা অস্ট্রেলিয়ান ব্রহ্মাম ঘোড়াটার গা চাবড়ে চাবড়ে দেখছিলেন ডিস্টেক্টর জেনারেল বোবো স্যাভিসি। যে ভাবে এক জন পাক্সা জহুরি সদ্য পলকাটা খাঁটি হিরেটাকে দেখে। সাবাকে নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল কোলো। মিনিটকয়েক ধরে সাবাকে আপাদমস্তক জরিপ করলেন

ডিস্টেক্টর। ঠিক যেভাবে ঘোড়াটাকে পরখ করছিলেন। তার পর কুতকুতে চোখজোড়া নাচিয়ে তাকালেন কোলোর দিকে, “এই মাগিটার অ্যাতো সুখ্যত ছড়িয়েছে গোটা দেশ জুড়ে!” বলে দু’-তিন কদম এগিয়ে এলেন সামনে। ফের এক বার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি খুঁটিয়ে নজর করলেন সাবাকে। তার পর চোখ ঘুরিয়ে তাকালেন কোলোর দিকে, “গতরখানা দেখে তো মোটামুটি ভালোই বোধ হচ্ছে। এক কাজ কর, আমার বডিগার্ড ব্যারাক থেকে সবচেয়ে তাগড়া জোয়ানটাকে ডেকে পাঠা এখানে। হাতেনাতে ফয়সালা হয়ে যাক, যা রটে তার কতটা বটে। রিয়েলি হাউ গুড ইজ শি।”

মিনিটপাঁচেকের মধ্যে দৌড়তে দৌড়তে এসে স্যাভিসিকে খাড়া স্যালুট ঠুকে সামনে দাঁড়িয়েছিল ওকোনো। খাড়া ছ’ফুটের দৈত্যাকৃতি চেহারা। ডিস্টেক্টরের দেহরক্ষীদের মধ্যে সেরা রিক্রুট। “স্টার্ট!” স্যাভিসির আদেশ পাওয়া মাত্র পাক্সা পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধার কায়দায় দু’হাতের মুঠো পাকিয়ে এগিয়ে এসেছিল সামনে। সামান্য মাথা হেলিয়ে ওকোনোর বিষাক্ত আপারকাটটাকে এড়িয়েছিল সাবা। পরমুহূর্তেই একটা সপাট লাথি কষিয়েছিল ওকোনোর পায়ের গোছে। টলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা দিয়ে খ্যাপা যাঁড়ের মতো একটা টুঁ ওকোনোর কপালের ঠিক মাঝখানটায়। কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেছিল ওই অত বড় চেহারার শা-জোয়ান মরদটা।

হাঁ করে সে দিকে তাকিয়েছিলেন বোবো স্যাভিসি। বিস্মারিত কুতকুতে চোখজোড়া কোঁটর থেকে ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। চোখের সামনে এইমাত্র যা ঘটে গেল বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে সেটা।

প্রবল বিস্ময়ের প্রাথমিক ধাক্কাটা কাটিয়ে স্বগতোক্তি করলেন ফিসফিস করে। “মাই গড! এ মাগি তো দেখছি খাপে ঢাকা তলোয়ার। না শিখাই এই! ঠিকঠাক ট্রেনিং পেলে তো দিস ফাকিং বিচ উইল ইভেন কিল আ কিবাকো (জলহস্তী)!” তার পর চোখ রাখলেন কোলোর চোখে। “এই হিরেটা এতদিন পড়ে ছিল সাভানার জঙ্গলে! আর তোরা শালা কানা, মাখামোটোর বাচ্চারা, মালটার কোন খবরই রাখিসনি!” বলে ফের একবার জরিপ করেছিলেন সাবাকে। তার পর আবার নজর ঘুরিয়েছিলেন কোলোর দিকে। “কাল থেকেই বেস্ট কন্সট্রাক্ট ট্রেনারদের কাছে পাঠিয়ে দে এটাকে। রোজ দু’বেলা ট্রেনিং। জুডো, বক্সিং, রেসলিং, ফায়ার আর্মস...এভরিথিং। একটা ইংরিজির মাস্টার রেখে দে। কাজ চালানোর মতো দু’চারটে কথাবাতা বলতে শিখুক। সঙ্গে প্রচুর ভাল খাবারদাবার চার বেলা। একটা পার্সোনাল জিম, কসরতের জন্য। আর হ্যাঁ, পার মাছ একটা হ্যান্ডসাম স্যালারি প্যাকেজ। ঘোড়া হোক বা এর মতো লড়েনওয়ালি, বোবো স্যাভিষি সেরা জিনিসটার কদর করতে জানে!” বলে জালার মতো ভুঁটিটা কাঁপিয়ে গুমগুমে গলায় হেসে উঠেছিলেন ডিক্টেটর।

এ সব কিছুই ত্বর্য শুনেছে এই গত দু’বছরে, সাবার কাছে একটু একটু করে। আর দশটা কাজের ফাঁকে। সাবার কথায়— সেই শুরু। মাঝে মাঝেই ডিক্টেটরের দরবারে ডাক পড়ত ওর। প্রথম প্রথম এক জন, দিনে দিনে সেটা বেড়ে দু’জন এমনকি তিন জন। সেরা সেরা সব লড়িয়েও ওর সামনে টিকতে পারেনি। বড়জোর মিনিট পনেরো।

ওকে দেখলে সিংহদের ল্যাজ তুলে পালানোর গল্পটাও শুনেছিলেন স্যাভিষি। বড়লোক সাদাদের দেশগুলো থেকে বেজায় পকেটমোটা সব কোটিপতিগুলো এলে তাদের জঙ্গল ঘুরিয়ে দেখানোর দায়িত্ব বর্তাত সাবার কাঁধে। বিস্তীর্ণ সাভানা প্রান্তর ধরে ধীরগতিতে এগিয়ে চলা ছড়খোলা জোঙ্গা সাফারি গাড়ি। আসনে বসা ধনী দেশের পর্যটকরা। গাড়ির বনেটের সামনে ফিট করা একটা চেয়ার। নিজের প্রিয় রেমিংটন থাটি ফাইভ বা লি এনফিল্ড ডাবল ব্যারেল রাইফেলটা নিয়ে চেয়ারটায় গ্যাট হয়ে বসে থাকত সাবা। দু’হাত সামনে দিয়ে চলে যেত সিংহের পাল কিস্তি ভিড়তে আসার সাহস হত না কারও।

সারা দুনিয়া জুড়ে চোরাকারি নিষিদ্ধ কিস্তি স্যাভিষির মূল্যকে ঠিকঠাক গ্যাটের কড়ি খসাতে পারলে পোচিং, বলা ভাল ট্রফি হান্টিং একেবারে খুল্লামখুল্লা। সাবার খুব খারাপ লাগত যখন সিংহ, হাতি, গভার, বুনো মোষ... ওই সব বিশাল বিশাল জানোয়ারগুলোকে স্রেফ মজা নয়তো শিং, দাঁত বা চামড়ার জন্য গুলি করে মারত ওই শালা বিদেশি পয়সাওয়ালা হারামজাদাগুলো। সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল যেদিন সাভানার সবচেয়ে বড় হাতিটা, জুম্বাকে গুলি করে মেরেছিল একটা ডাচ বিলিওনেওয়ালা। শুয়োরের বাচ্চাটাকে সেদিন ঘাড় মটকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিল সাবার। পরে শুনেছিল, জুম্বার ওই একমানুষ সমান বিশাল দাঁতজোড়াকে স্যাভিষির ব্যক্তিগত জেটে চড়িয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওই হারামিটার নিজের দেশে।

সাবার এ ধরনের কাজগুলো চলেছিল প্রায় বছর বারো, যতদিন না অন্য দেশ থেকে ফুসলে, জোর খাটিয়ে পাচার করে আনা মেয়েগুলোকে দিয়ে আরও ভয়ঙ্কর ওইসব খেলাগুলো শুরু হয়ে যায়। অসহায় মেয়েগুলোকে জোর করে পশুর মতো খাঁচায় আটকে রাখার ব্যাপারটাকে ভয়ঙ্কর থেমা করত নিজে, আর সে কারণেই তারা শাসন না মানলে, পালানোর চেষ্টা করলে ওই থেমাটা উল্টে নিরুপায় ক্রোধ হয়ে ফেটে পড়ত বেচারি মেয়েগুলোর উপর।

পরবর্তী কালে ত্বর্যর মনে হয়েছিল আসলে সাবা নিজেও এই ভয়ঙ্কর দমবন্ধ, নরকের খাঁচাটা ভেঙে বেরোতে চাইছিল বহু দিন ধরেই। ত্বর্যর উপস্থিতিটা ওখানে সেই ইচ্ছের পলতেয় আগুন লাগানোর কাজটা করেছিল মাত্র।

রসুইঘর থেকে মাংস বলসানোর মনকাড়া গন্ধ ভেসে আসছে। রোস্টপ্লেটে ওর দেশোওয়ালি কায়দায় ডাকরোস্ট বানাচ্ছে সাবা। পেটের মধ্যে নুনিয়া শাক, টমাটো পিউরি, ধনেপাতা, পেঁয়াজ, গাজরকুচি আর পাঁচরকম মশলার পুর ভরে দেওয়া হয়েছে ও দেশের শাকসবজির বিকল্প

হিসেবে। আজ সকালেই বছরখানেক হল কেনা এস ইউ ভি-টা ড্রাইভ করে মালতীদির সঙ্গে নেপালগঞ্জের হাটে গিয়ে নিজেহাতে বাজার করে এনেছে সবকিছু। বেকিং ওভেনে কেক বানিয়েছে নিজে হাতে। কাজে হাত লাগাতে গিয়েছিল ত্বর্য। ধমক দিয়ে ভাগিয়েছে। “বার্থডে বয় হ্যাভ নো বিজনেস ইন কিচেন, টুডে।” আসলে সাবা নিজেই একটা পাওয়ার হাউস, তার সঙ্গে মালতীদি, পালান, আকবর চাচার আসার পর এ বাড়িতে ত্বর্যর কাজ বলতে আর বিশেষ কিছুই নেই। শুধু সকালের ওই ঘণ্টাদুয়েক ঘাম ঝরানো শারীরিক কসরতের ব্যাপারটা ছাড়া। সেখানেও এগিয়ে সাবা। শীত, গ্রীষ্ম, বরষা— মরশুম যেরকমই হোক না কেন, রোজ কাকভোরে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বে। ত্বর্যকেও ঠেলে তুলবে। তার পর পুরো বাড়ির চৌহদ্দিটা জুড়ে টানা দু’পাক দৌড়। বাংলোর গায়ে ফাঁকা জমিটায় একটা এ সি, সাউন্ড প্রফ মাল্টি জিম বানিয়ে নিয়েছে সাবা। দৌড় শেষ করে ঘণ্টাদেড়েকের কঠিন মেহনত সেখানে। জিমের একপাশে বর্গাকার একটা ফাইটিং রিং। দীর্ঘ সময় ধরে রপ্ত করা সব নানাবিধ সমরবিদ্যার কৌশল। নিয়মিত সে অভ্যাসগুলোকে ঝালিয়ে নেয় দু’জনে। এইসব ব্যাপারগুলোয় বেজায় উৎসাহ পালানোরও। ওকে সে সব কসরত আর দাঁওপ্যাঁচগুলো শেখায় সাবা। “ইউ নো বোস? যে দিন প্রথম এখানে এসেছিল ছেলেটা, সেদিন একটাও প্রশ্ন না করে ওকে এখানে রেখে দিয়েছিলাম কেন জানো? কারণ ওই অতটুকু বয়সে কোনও এক জনের এই বিশাল দুনিয়ায় হঠাৎ একদম একা হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণাটা যে কী, সেটা আমার থেকে বেশি আর কেউ জানে না!” কথায় কথায় এক দিন ওকে বলেছিল মেয়েটা।

চিন্তার তারটা হঠাৎই ছিঁড়ে গেল মুরগিদের ঘর থেকে ভেসে তীর ‘কঁক কঁক!’ শব্দে। পরমুহূর্তেই মাটিতে লাঠি ধাপকাতে ধাপকাতে সেদিকে ধেয়ে গেল পালান। “ইউ বেলাডি ভামবেড়ালের ছাওয়াল! ফের এয়চিস ইদিকপানে! শালা বেদোর ব্যাটা! আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন...” প্রথম শব্দদুটো সাবার থেকে শোখা ওর। ব্যবহার করে মাঝেমাঝেই। বিশেষত এইসব ক্ষেত্রে। লাঠির আওয়াজ আর তর্জনগর্জনে ধড়মড় শব্দে অ্যাসবেস্টসের চাল কাঁপিয়ে ছুটে পালান কিছু একটা। “শালা, ফের যদি কোনওদিন এ পথ মাইডেচিস...” পরম বিক্রমে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে ফিরে গেল পালান। ফের ঠাণ্ডা নিস্তব্ধতা চার পাশ জুড়ে।

প্যাকেট থেকে বের করে দু’নম্বর সিগারেটটা ধরাল ত্বর্য। অনেকখানি ঝোঁয়া টেনে নিল বুকে। আজ আটম পেরিয়ে উনষাটে পা দিল ও। এই দু’বছরে ওর আর সাবার সম্পর্কটা এগিয়েছে বাঁধভাঙা বন্য়ার মতো। শুধু মানসিক নয়, শারীরিক প্রেমও এই বয়সেও সক্ষমতার তুঙ্গে ত্বর্য। বিছানায় সাবাও এক আগ্রাসী দানবীর মতো। তবু একটা খামতি কি রয়ে গেছে কোথাও? এই দু’বছরে সন্তান আসেনি সাবার গর্ভে। সেটা ত্বর্যর নিজের বয়সের কারণেই কি? মৃত্যুর সময় মার্গা গর্ভবতী ছিল। অথচ সাবা... বয়েসের এতখানি ব্যবধান। তবু কি তীব্র, নিবিড় প্রেমের সম্পর্ক দু’জনের মধ্যে। তার পরও কি আরও গভীরতর সম্পর্কের দিকে এগোতে চাইছে মেয়েটা? অবচেতনে ত্বর্যও? অথচ কেউই মুখে সেটা বলে উঠতে পারছে না। আর পারছে না বলেই সৃষ্টির উৎসমুখটা খুলছে না শত মিলনেও। বহু বার প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছে ত্বর্য। পারা হয়ে ওঠেনি কিছুতেই। শেষ মুহূর্তে জিভের ডগায় এসেও আটকে গেছে। তবে আর নয়। আজ করতাই হবে প্রশ্নটা।

“ডিনার ইজ রেডি! কাম বার্থডে বয়, কাম এভরিওয়ান!” রসুইঘর থেকে হাঁক পাড়ল সাবা। সিগারেটটা ছাইদানিতে নিভিয়ে উঠে দাঁড়াল ত্বর্য। তার পর লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল ডাইনিং হলের দিকে। প্রশ্নগুলোকে বুকের মধ্যে পুষে রেখেই।

মধ্যরাত অতিক্রান্ত। বাংলোর বাইরে চার পাশের ঘাসজমি, চাষজমি, পুকুর, গোয়াল, রাজহাঁস আর মুরগিদের ঘর, গাছ, ফুলের কেয়ারি, সবকিছু জুড়ে থুপথুপে কুয়াশা আর ইতিউতি টিমটিমে জোনাকির আলো। বাংলোর বারান্দা থেকে ড্রয়িং রুমে ঢোকার দরজার উপর টাঙানো রেডিয়াম কোয়ার্টজ দেয়াল ঘড়িটার কাঁটা সময় বলছে বারোটা

বেজে কুড়ি। আজ তুর্ঘর জন্মদিন তাই কালকের দিনটা প্র্যাকটিসে ছুটি দিয়েছে সাবা। বারান্দা থেকে নেমে যাওয়া দ্বিতীয় সিঁড়িটার ধাপে সাবার কোলে মাথা রেখে আধশোওয়া তুর্ঘ। বিশাল আলপাকা কস্মলে ঢাকা দু'জনের শরীর। মালতীদি, পালান, আকবর চাচা, সবাই শুয়ে পড়েছে। টুকি আর প্রিন্সিও। জেগে শুধু ওরা দু'জন। সিঁড়ির অর্ধেকটা জুড়ে নেমে যাওয়া টালির চাল থেকে হিম বরে পড়ার খুব মৃদু টুপটাপ শব্দ।

ডিনারের পর দ্বিতীয় সিঁগারেটটা ধরিয়ে দু'-চার টান দিতে না দিতেই সেটা তুর্ঘর ঠোঁট থেকে তুলে নিল সাবা। “ইউ আর স্মোকিং টু মাচ, বোস। গিভ মি সাম প্যাফ।” পরপর কয়েকটা টান দিয়ে পাশে রাখা ছাইদানিতে টুকরোটা নিভিয়ে হাত রাখল তুর্ঘর গালে। “হোয়াট হ্যাপেন্ড টু ইউ? আজ তোমাকে এত অস্থির দেখাচ্ছে কেন? প্লিজ টেল মি। ফর হেভেনস সেক!” জবাবে দ্বিধাগ্রস্ত একটা দৃষ্টি তুর্ঘর চোখে, “আসলে কী ভাবে ব্যাপারটা শুরু করব সেটাই বুঝে উঠতে পারছি না। আচ্ছা সাবা, তোমার কখনও এ রকম ফিলিং হচ্ছে না তো যে আমি তোমায় ওখান থেকে বের করে নিয়ে এসেছি বলে তোমাকে আমি টেকেন অ্যাজ গ্রান্টেড বলে ধরে নিয়েছি? অথবা তোমার সামনে আর কোনও রাস্তা খোলা নেই বলে তুমি আমার সঙ্গে থাকতে বাধ্য হচ্ছে? দেন প্লিজ বিলিভ মি, আই হ্যাভ নো সাচ ইন্টেনশনস অ্যাট অল। তুমি যদি এই মুহূর্তে আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাও, তার পরেও তোমার রেস্ট অব লাইফ অর বেটার টু সে, ফিউচার যাতে সিকিওরড থাকে তার সব ব্যবস্থা আমি নিজে করব। আর যদি তার উস্টোটা হয়, ম্-মানে...” একটু কঁপে গেল একদা দুর্ধর্ষ স্মার্স সিক্রেট এজেন্টের গলা। “আ-আই মিন, হোয়াট ডু ইউ থিন্ক, শুড ইউ গো ফর আ ফ্যামিলি? ইনস্পাইট অব আ হিউজ ডিফারেন্স অব এজ?” কস্মলের তলায় থরথর কাঁপছিল তুর্ঘর শরীরটা। শোনার পর অন্ধকারে স্থির চোখে মুহূর্তকয়েক তুর্ঘর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো সাবা। তার পর সদ্য কোনও কিশোরীর মতো হেসে ফেলল ফিক করে। “মাই গড, বোস! এ রকম সুন্দর একটা সন্ধে তুমি এই ভাবে নষ্ট করলে! বাই থিংকিং অল দোজ বুলশিটস? তা হলে শোনো।” গাঢ় হয়ে এল কালো মেয়ের গলা, কালো থামের মতো দু'-হাতের বাঁধনে আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল তুর্ঘকে। “এই এক্ষুনি যে সব কথাগুলো তুমি বললে আমাকে, সেরকম কোনও ইচ্ছে কোনদিন যদি জাগে আমার মনে, তা হলে আমি নিজেই তোমায় বলব। সো প্লিজ, এ সব নিয়ে ভেবে অযথা নিজেকে কষ্ট দিয়ো না একদম।” বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সাবা। হাত ধরে টেনে তুলল তুর্ঘকে। গভীর একটা চুমু খেল ঠোঁটে। তার পর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বলল, “রাত অনেক হল। ঘরে চলো এ বার। ঘুম পাড়িয়ে দি তোমাকে।”

সাউথ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রেভারলি হিলস। সাড়ে তিনশো একর জায়গা জুড়ে যেদিকে তাকানো যায়, সবুজে সবুজ চার পাশ। নিবিড় বনরাজি আর কার্পেটের মতো ঘাসজমি। ইতিউতি চরে বেড়াচ্ছে হরিণ। হাজারো রকম জানা-অজানা পাখির কলতান। এ সবের ঠিক মাঝখানে স্বেতপাথরের প্রাসাদোপম ভিলা। তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের বিশাল ড্রয়িংরুমটার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত বহুমুখী, গাঢ় লাল রঙের উপর হলুদ-সাদা সুস্পষ্ট নকশা তোলা পার্শিয়ান গালিচায় মোড়া। ঘরে আর কোথাও কোনও রকম আসবাবপত্র নেই। শুধু মাঝখানে পাতা দুধসাদা নাভুজির বিশাল সোফাসেট আর বার্মা টিকের ছোট একটা সেন্টার টেবিল। সোফার মাঝখানে দু'হাত ছড়িয়ে বসেছিলেন আমির আবু বিন খাদেম। মধ্যবয়সি, মেদহীন একহারা চেহারা। গাত্রবর্ণ পালিশ করা হাতির দাঁতের মতো। পরনে দুবাইয়ের সেরা কারিগরের বানানো পিওর লিনেনের জোকা। তিন হাজার স্কোয়ার ফিটের এই বসার ঘরের ঢোকা বেরোনোর দরজাটুকু বাদ দিয়ে চার দেয়ালের পুরোটা জুড়ে মেরিন অ্যাকোয়ারিয়াম। বিশাল কাচাধারের মেঝেতে বেছানো ধবধবে সাদা বালুর উপর সামুদ্রিক জলজ গাছ আর নানা আকারের চিত্রবিচিত্র কোরালের মেলন। টলটলে স্ফটিক স্বচ্ছ হাল্কা নীল জলে খেলে বেড়াচ্ছে সামুদ্রিক কচ্ছপ, অক্টোপাস, স্কুইড, রিফ শার্ক, স্টিং রে, সি-হর্স আর অসংখ্য প্রজাতির ছোট বড় বিচিত্রবর্ণ সব মাছের বাঁক। মস্তমস্ত চোখে

সেদিকে তাকিয়ে আছেন আমির খাদেম। মাসে মিলিয়নখানেক খরচ হয় তাঁর, শুধু এই শখটার পেছনে। বেভারলির এই ভিলাটা একেবারেই আমিরের নিজস্ব আমোদপ্রমোদের জন্য কেনা। দুই বিবি আলাদা আলাদাভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কচিৎ কদাচিৎ এখানে সময় কাটাতে আসে বটে তবে তাদের পাকাপাকি ভাবে থাকার বন্দোবস্ত মায়ামি সমুদ্র সৈকত ঘেঁষা একরপাঁচেক জমির উপর আলাদা আলাদা দুটো ভূপ্লোতে।

এই মুহূর্তে আমিরের পাশে বসা বছর কুড়ি বাইশের কোস্টারিকান একটি মেয়ে। তেল পিছলে যাওয়া চকচকে তামার মতো গায়ের রং। হিলহিলে, সাপখেলানো চেহারা। তীব্র যৌন আবেদনময়ী ধারালো একজোড়া চোখ। ঘাড় অবধি ঢাকা ঠাস বুনেট ঘন কোঁকড়া চুলে। শরীরে পোশাক বলতে ফিনফিনে সিল্কের স্বচ্ছ একটা রাত পোশাক। অন্তর্বাস বিহীন। খুব আলতোভাবে মেয়েটার কোমল, মসৃণ উরুতে হাত বোলাচ্ছেন আমির খাদেম। ঠিক এই সময় কাচের আধারের উপর থেকে জলে নেমে এল এক জন ডুবুরি। পরনে পুরোদস্তর স্কুবা ডাইভিং-এর পোশাক। হাতে একটা জালকাটা থলেয় অনেকগুলো মাছের টুকরো। একটা চিমটেয় করে হাঙর, অক্টোপাসদের খাওয়াতে খাওয়াতে ক্রমাগত নীচের দিকে নামতে লাগল লোকটা। জলজ গাছ আর ঘন প্রবালপুঞ্জের মাঝখানে একটা গছুর মতো। চিমটের আগায় মাছের বড় একটা টুকরো ধরে গর্তটার মুখে নাচাতে লাগল লোকটা। উত্তেজনায় ফেটে পড়েছিল আমিরের চোখমুখ। মেয়েটার নরম উরুর উপর হাতের চাপ বাড়ছিল ক্রমাগত। মিনিটদুয়েক পর গুহা থেকে উকি দিল মুখটা। বকবকে করাতে মতো ধারালো দু'-সারি দাঁত। সঙ্গে সঙ্গে একটু সরে গেল লোকটা। পরমুহূর্তেই গুহা থেকে সড়াঁত করে বেরিয়ে এল পুরো শরীরটা। অতিকায় একটা মোরে ইল। ভয়ঙ্কর হিংস্র সামুদ্রিক বান মাছ। উজ্জল হলুদ শরীরে গুলবাঘের মতো কালো ছোপ ছোপ। দৈর্ঘ্যে কমসে কম আট-ন'ফুট তো হবেই। চূড়ান্ত অভিজ্ঞ স্কুবা ডাইভাররাও হাঙর, ব্যারাকুডা, স্টোন ফিশের চেয়ে সমুদ্রে অনেক বেশি সন্মীহ করে চলে এই প্রাণীটাকে।

মাছের টুকরোটার দিকে ভীমবেগে ধেয়ে এল ইলটা। চিমটের মুখ থেকে টুকরোটা ছিনিয়ে নিয়েই বিদ্যুৎগতিতে ফের চুকে গেল গুহার অন্ধকারে। জলের মধ্যে হাত তুলে থামস আপের ভঙ্গি করল ডুবুরি। “মারহাবা!” সোল্লাসে ফেটে পড়ে সজোরে মোয়েটার উরুতে একটা চাপড় মারলেন আমির খাদেম। যন্ত্রণায় ‘অঁক!’ করে উঠল মেয়েটা। একটু ঝুঁকে টেবিলের উপরে রাখা ফলের ছোট টুকরিটা থেকে একটা ন্যাসপাতি তুলে নিলেন আমির। ঠিক এই সময় তোলা জোকাবর সাইড পকেটে বেজে উঠলো অ্যাপেলের আই ফোনটা। কানে তুলতেই অন্যপ্রান্তে সেক্রেটারির গলা, “স্যার, দ্য গেস্টস হ্যাভ অ্যারাইভড। এখান থেকে কিলোমিটারদুয়েক দূরে হোটেল বেলিজ, সুইট নাম্বার নাইন্টি থ্রি। আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন গুঁরা।”

আসলে এই বিশেষ অতিথিদের জন্যই এত স্ফূর্ণ অপেক্ষা করছিলেন তিনিও। চোখের ইশারায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা। জোকাবর হাতার ভাঁজগুলো একটু টানটান করে নিয়ে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আমির আবু বিন খাদেম।

মিনিটপঁচিশেক পর। ঘরের মাঝখানে সোফাসেটে আমির খাদেমের মুখোমুখি বসা দু'জন। হাতের ডান দিকে দিয়েগো ‘স্নেক’ সাঞ্চোজ। দিয়েগো, বছর চল্লিশেক, লাল তামাটে বর্ণ, ছোটখাটো বলিষ্ঠ চেহারা। পরিধানে খাটো বুলের সফট লেদার জ্যাকেট, ফুল ফুল ছাপ ফিনফিনে পাতলা হাফহাতা হাওয়াইয়ান শার্ট আর ক্যাজুয়াল চিনোজ ট্রাউজার। শার্টের উপরের বোতামটা খোলা। ফাঁক দিয়ে উকি মারছে কুকুর বাঁধার চেনের মতো ইয়া মোটা প্ল্যাটিনামের একটা হার। সরু পাকানো মোচ আর ঠোঁটের নীচে ত্রিভুজাকৃতি খুব ছোট একচিলতে দাড়ি। ঠোঁটের কোণে সর্বদা লেগে থাকা হাল্কা একটা হাসি। তবে একটু খুঁটিয়ে দেখলে হাসির পেছনে ঠান্ডা নিষ্ঠুর একজোড়া চোখের দৃষ্টিটা নজর এড়াতে না পারও। দিয়েগো, খোদ মার্কিন মুলুকে যে কটা কুখ্যাততম ক্রাইম কার্টেল আছে তারমধ্যে অন্যতম, মেক্সিকান-কিউবান গ্যাংয়ের সদস্য। একদা

আইনি-বেআইনি পথে সীমান্ত টপকানো মেক্সিকান শরণার্থী আর কিউবা বিপ্লবের পর ফিদেল কাস্ত্রোর তাড়া খেয়ে মায়ামিতে পালিয়ে আসা যত মাদক পাচারকারী, এই দুইয়ে মিলে গড়ে তুলেছিল এই সিভিকিট। পরবর্তী কালে যা ছড়িয়ে পড়ে ফ্লোরিডা, ব্রঙ্কস, ম্যানহাটন, ডেট্রয়েটেও। জুরার আড্ডা, তোলাবাজি, পেশাদারি খুন, এ সবকটা কারবারেই উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি থাকলেও এদের ধান্দার মূল ক্ষেত্র—ড্রাগ। কলম্বিয়ার মেডলিনে পাবলো এসকোবার গ্যাং, বোগোটায় কালি কার্টেল, মেক্সিকোয় এল চ্যাপো সিভিকিট, বলিভিয়ার গঞ্জালভেস ব্রাদার্স, আন্তর্জাতিক স্তরে যতই ভয়ঙ্কর আর কুখ্যাত হোক না কেন, ছোট ছোট সি-প্লেন বা শক্তিশালী মোটরবোটে সমুদ্রপথে, ড্রাগ যেভাবে, যে দেশ থেকেই আসুক না কেন, মাল খালাস থেকে শুরু করে বিপণন, সব কিছুই দায়িত্বে এই কিউবান-মেক্সিকান গ্যাং। এক কথায় এদের মায়ামিতে লাতিন আমেরিকান কার্টেলগুলোর সোল এজেন্ট বলা চলে।

সাঞ্চোজের পাশে বসা দ্বিতীয় জন। জেফ ‘গান’ জনসন। বছর পঁয়ত্রিশেক। ঘোর কৃষ্ণকায়, বৃষ্ণক্ক, দীর্ঘদেহী। মাছি পিছলে যাওয়ার মতো কামানো চকচকে গাল। স্যাভিল রো-র জেড ব্ল্যাক কার্টমার ডিজাইনড থ্রি পিস স্যুটের নিচে দুধসাদা আরমানির শার্ট। হাতায় গাঢ় সবুজ দুটো পাল্লার কাফলিং। পায়ে গুচ্চির প্রিমিয়াম ক্লাস মোকাসিন শ্যু। জেফের দাদু জিমি ‘স্কারফেস’ জনসন, আক্ষরিক অর্থেই যুক্তরাষ্ট্রের অপরাধ ইতিহাসে প্রথম আফ্রো-আমেরিকান তথা ব্ল্যাক গ্যাংস্টার। ঘাঁটি ফিলাডেলফিয়া। জিমিই আমেরিকার ব্ল্যাক ক্রাইম ম্যাপে প্রথম পথিকৃৎ যে নিজের চেনা পরিচিত গন্ডিটা থেকে বেরিয়ে পৌঁছে গেছিল সে সময় আমেরিকার অন্ধকার জগতের প্রায় অর্ধেকটা শাসন করা দুই কিংবদন্তি ইতালিয়ান মافیয়া ডন কার্লোস গ্যাভিনো আর স্যাম জিয়ানকানার দরবারে। এদের দু’জনের মধ্যে কার্লোস, অন্য মافیয়া গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে পরিচিত ছিল ‘ডন অব দ্য ডনস’ নামে। অন্য দিকে ফিদেল কাস্ত্রোকে হত্যার প্রচেষ্টা ও ষড়যন্ত্রে সি আই এ-র সহযোগী হিসেবে উঠে এসেছিল স্যাম জিয়ানকানা, এই নামটাও। এই দুই দোদীপ্তপ্রতাপ ডনের সঙ্গে সিভিকিট গড়ে তুলেছিল জিমি। নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি, শিকাগো, ব্রুকলিনের সঙ্গে জুড়ে গেছিল ফিলাডেলফিয়াও। এ হেন জিমির একটি অনন্য কীর্তি মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল মার্কিন মুলুকের অপরাধ জগতের চলতি ধারার।

সেটা ষাটের দশকের একদম গোড়ার দিক। ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলছে। জিমির কাছে খবর এনেছিল ব্ল্যাক যেটোর রনি নামের এক ড্রাগ পেডলার। লাওস, তাইল্যান্ড আর বার্মার সীমান্তবর্তী অঞ্চল জুড়ে মাইলের পর মাইল গহিন বাদাবন, নোনাবাদার কুমির ভর্তি শুঁড়িখাল আর নদী। অঞ্চলটার নাম গোল্ডেন ট্রায়ঙ্গল। ড্রাগ ট্রাফিকারদের স্বর্গ বলা চলে জায়গাটাকে। একরের পর একর জমি জুড়ে বেআইনি আফিমের চাষ আর অসংখ্য হেরোয়িন প্রসেসিং ল্যাবরেটরি। এই বিশাল মাদক সাম্রাজ্য পরিচালনা করে লালফৌজের হাতে পরাজিত চিনের প্রাক্তন শাসক চিয়াং কাই শেকের প্রাক্তন সেনাবাহিনী আর স্থানীয় দুর্ধর্ষ জনজাতি সম্প্রদায়ের লোকজনেরা। হেরোয়িন সেখানে অত্যন্ত সস্তা কিন্তু জায়গাটা ভয়ঙ্কর দুর্গম হওয়ার ফলে ধনী দেশগুলোর ডিলারদের পক্ষে সেখানে পৌঁছনোটা এককথায় অসম্ভব। “আমি যেতে চাই ওখানে। তুমি আমাকে বলো কীভাবে সেখানে পৌঁছনো যায়?” প্রশ্ন করেছিল জিমি। জবাবে তীব্র ব্যঙ্গের একটা হাসি ঠোঁটের কোণে নিয়ে জিমির দিকে তাকিয়েছিল রনি। “শত শত মাইল দুর্গম বাদা জঙ্গল, মানুষখেকো বাঘ আর কুমির, জেক, সাপখোপ, ম্যালেরিয়ার মশা, চোরাপাঁক, ডায়রিয়া, আর এর চেয়েও বহুগুণ মারাত্মক লাওস-কম্বোডিয়ান আর ভিয়েতকং গেরিলা আর্মি—ইফ ইউ বিকাম এবল টু সেভ ইয়োর অ্যাস ফ্রম দেম, দেন ওনলি ইউ ক্যান রিচ ওভার দেয়ার।”

রনির কথা মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছিল। জিয়ানকানা আর গ্যাভিনো ফ্যামিলির হাজারো নিষেধ অগ্রাহ্য করে মাইলের পর মাইল দুর্গম জঙ্গলে ঘেরা চরম বিপদসংকুল সব নোনা জলের খাঁড়ি আর নদী, সাম্পানে পাড়ি দিয়ে গোল্ডেন ক্রিসেন্টে পৌঁছে গেছিল জিমি। ডিল পাকা করেছিল ওখানকার তাবড় তাবড় সব ড্রাগ লর্ডদের সঙ্গে। গোল্ডেন ক্রিসেন্ট থেকে

মার্কিন মুলুক অবধি হেরোইন পাচারের কাজে অবলম্বন করেছিল এমন এক অভিনব পন্থা যা চমকে দিয়েছিল গোটা অপরাধ দুনিয়াকে।

আমেরিকা থেকে ভিয়েতনামে সৈন্য, রসদ, যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে যেত মার্কিন বিমানগুলো, ফিরত হেরোইন নিয়ে। মার্কিন গ্রিন বেরেটস, নেভি সিল আর মেরিনসদের মধ্যে একাংশকে বিপুল পরিমাণ অর্থে বশ করে এই অসম্ভব ব্যাপারটাকে সম্ভব করে তুলেছিল জিমি। খোদ মার্কিন সেনাবাহিনীর বিমান। তল্লাশির কোনও প্রশ্নই নেই। ফলে মূল মার্কিন ভূখণ্ডে অব্যাহত চুকতে শুরু করেছিল হেরোইন। ফুলে ফেঁপে দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল গ্যাভিনো-জিয়ানকানা-জনসন সিভিকিটের সম্পদভান্ডার।

’৭০-এর মধ্যভাগ। ভিয়েতনাম যুদ্ধের ইতি। কৃষকায়, খর্বকায় সব ভিয়েতকং গেরিলাদের হাতে পরাজিত হয়ে দেশে ফিরে এল প্রবল প্রতাপাধিত মার্কিন সেনাদল। হতমান, বিধবস্ত! একইসঙ্গে আমেরিকায় হেরোইন আমদানির উৎসমুখটাও গেল শুকিয়ে। ফলে অন্যদিকে নজর ঘোরাল ইতালিয়ান-আফ্রো আমেরিকান সিভিকিট।

কিউবান-মেক্সিকান গ্যাং মায়ামি থেকে গোটা ফ্লোরিডায় ছড়িয়ে দিত কলম্বিয়া আর মেক্সিকো থেকে আসা কোকেন। এ বার সে ব্যবসার অংশীদার হল স্যাম, কার্লোস, জিমিরা। মুহূর্তে হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল কোকেনের ধান্দা। নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, নিউ জার্সি, ব্রুকলিন, ম্যানহাটন, লাস ভেগাস, ব্রঙ্কস, ডেট্রয়েট, ফিলাডেলফিয়া...এককথায় আমেরিকার সর্বত্র।

’৯০ দশকের শেষভাগ থেকে একটু একটু করে পায়ের তলার জমি হারাতে শুরু করল ইতালিয়ান মافیয়ারা। আর শতাব্দীর গোড়াতেই পরিণত হল প্রায় এক নগণ্য, গুরুত্বহীন শক্তিতে। তাদের ছেড়ে যাওয়া জমির দখল নিল কিউবান- মেক্সিকান আর আফ্রো-আমেরিকান গ্যাং, নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে। সেই ব্যবস্থাই বহাল আছে আজ অবধি।

অতিথিরা বসার মিনিটকয়েকের মধ্যে ছোট একটা ট্রলি ঠেলে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল ধবধবে সাদা উর্দি পরিহিত এক জন বেয়ারা। ট্রলির উপর রূপোর ট্রেতে সাজানো মরোক্কান তামার সুদৃশ্য কফিপট। পোসিলিনের কাপপ্লেট। একটা বড় প্লেটে অ্যাসটেড কটেজ কুকিজ। পট থেকে ঢেলে নিপুণ হাতে পরিবেশন করে সাজিয়ে দিল সোফাসেটের মাঝখানে ছোট সেন্টার টেবিলটায়। তার পর আমির আর তার অতিথিদের বাও করে যেভাবে এসেছিল ঠিক সেভাবেই নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

পিওর জামাইকান ব্ল্যাক কফিতে চুমুক দিয়ে আমির আবু বিন খাদেমের দিকে চোখ তুলে তাকাল জেফ ‘গান’ জনসন। জিমি ‘স্কারফেস’ জনসনের নাতি। “আপনার কাছে আমাদের সিভিকিটের তরফ থেকে একটা প্রস্তাব ছিল, ইয়োর হাইনেস।” বলল খুব মৃদু এবং পরিশীলিত গলায়। পরিবারের তরফ থেকে আমেরিকার অভিজাততম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটিতে পড়তে পাঠানো হয়েছিল জেফকে। সেই শিক্ষার ছাপটা ফুটে বেরোল কণ্ঠস্বরে। তবে আমির খাদেম জানেন ওটাই সব নয়। সাতদিন আগে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সিভিকিট। আমিরের অনুমতি পেলে একটা জরুরি বিষয়ে কথা বলতে চায় খুব তাড়াতাড়ি আর সিভিকিটের তরফ থেকে কারা আসবে, জানিয়ে দিয়েছিল সেটাও।

জানার পর দু’জনের সম্পর্কে দেশের অন্যতম নামী একটি সংবাদপত্রের ঘাঘু এক ক্রাইম রিপোর্টারকে ফোন করে অতিথি দু’জনের সম্পর্কে একটু বিশদে খোঁজখবর লাগাতে বলেছিলেন আমির। দিনদুয়েকের মধ্যে দু’জনের দুটো ডিটেল রেজুমে ফাইল আমিরের মেল ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিল সেই রিপোর্টার।

দিয়েগো সাঞ্চোজ। অসম্ভব ক্রুরবুদ্ধি এবং ততোধিক নিষ্ঠুর। পোকামাকড়ের মতো মানুষ মারতে পারে। কম সে কম দেড় ডজন খুনের মামলা রয়েছে ওর নিজের নামে। বেড়ে ওঠা ক্যালিফোর্নিয়ার দারিদ্রপূর্ণ মেক্সিকান ডাউনটাউনে। পড়াশুনো বলতে মহল্লার আন্ডার প্রিভিলেজড চিলড্রেন স্কুলে দু’-এক ক্লাস পর্যন্ত। চরম খলসভাবের জন্য মার্কিন অপরাধজগতে নামের মাঝখানে জুড়ে গেছে ‘মেক’ তকমাটা। আর উপরোক্ত গুণের সমাহারই ওকে পৌঁছে দিয়েছে মেক্সিকান গ্যাংয়ে

নেতৃত্বের একদম প্রথম সারিতে।

অন্যদিকে জেফ। অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত। আচার ব্যবহারে পরিশীলিত, মার্জিত ও ভদ্র। মৃদুভাষী। কিন্তু এ সবকে শেষ কথা বলে ভেবে নিলে ডাহা ঠকতে হবে। আমেরিকার অন্ধকার দুনিয়ায় ওর মতো দক্ষ বন্দুকবাজ প্রায় নেই বলা চলে। বছরকয়েক আগে এক ধুকুমার গ্যাং ওয়ারে এক রাতে বিপক্ষ গোষ্ঠী খাটি ফোর স্ট্রিট বয়েজের সাত সা তজন বাঘা বাঘা গ্যাংস্টারকে কবরের মাটি ধরিয়ে দিয়েছিল জেফের হাতের পিস্তল। কালো দুনিয়ায় নাম হয়ে গেছিল জেফ ‘গান’ জনসন। বর্তমানে দু’দলের যৌথ সিডিকেটে সর্বোচ্চ স্তরের দু’-তিন জন নেতার মধ্যে এক জন জেফ। ফলে আলোচনায় ওকেই যে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি আমির আবু বিন খাদেমের।

কফির কাপে দ্বিতীয় চুমুকেটা দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল জেফ। পাশে রাখা পেপার ন্যাপকিনের প্যাকেটটা থেকে একটা ন্যাপকিন বার করে ঠোঁটটা মুছে নিল আলতোভাবে। তার পর ফের চোখ রাখল আমিরের চোখে। “আর সে প্রস্তাবটা পুরোপুরি ব্যবসায়িক। আই মিন পিয়োরলি বিজনেস।”

“হোয়াট ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু মিন? আই জাস্ট কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড।” পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন আমির খাদেম। জবাবে স্মিত হাসল জেফ। “ইয়োর হাইনেস, আওয়ার সিডিকেট থিংকস, আপনার নিজের দেশে আপনার নিজস্ব যে সব প্রপার্টিজ, আই মিন ওই অয়েল ফিল্ডগুলো থেকে যথেষ্ট মুনাফা হচ্ছে না আপনার।”

শোনামাত্র বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন আমির! লোকটা কি উম্মাদ! “আপনি জানেন ওই তেলের কুয়াগুলো থেকে আমার আয় কত?” তীব্র বিস্ময়ের সঙ্গে একটা চরম ব্যঙ্গের সুরও মিশে রয়েছে সে প্রশ্নে। জবাবে মুখের একটা রেখাও কাঁপল না জেফের। “কত?” প্রশ্ন করল খুব শান্ত গলায়।

“মোর দ্যান ফাইভ বিলিয়ন ডলার।” চিবিয়ে চিবিয়ে প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণ করলেন আমির খাদেম।

সোফা থেকে সামান্য ঝুঁকে আমিরের দিকে মুখটা এগিয়ে আনল জেফ। “ধরুন সেটা যদি বেড়ে আট বা দশ হয়ে যায়?”

শোনার পর কী রকম একটা থম মেরে গেলেন আমির খাদেম। মনে হতে লাগল উল্টো দিকে বসা লোকদুটো, বিশেষ করে জেফ নামে এই লোকটা সত্যিই বদ্ধ উম্মাদ। তবু “কোন ম্যাজিকে?”

এই কথা দুটো বলতে পারলেন শুধু। জবাবে মৃদু একটা হাসি খেলে গেল জেফের ঠোঁটের কোণে। “নো ম্যাজিক। ওনলি বাই সেলিং আওয়ার প্রডাক্ট।”

“প্রডাক্ট মানে?” জ-জোড়া ধনুকের মতো কুঁচকে গেল আমিরের।

“আজ সিম্পল অ্যাজ ককেন। চাইলে সঙ্গে এল এস ডি, ক্যালিফোর্নিয়ান সানশাইন অ্যান্ড মেনি আদার ভোপস।”

একইরকম শান্ত আর ভাবলেশহীন শোনাৎ জেফের কণ্ঠস্বর। টেবিল থেকে কফির কাপটা তুলে একটা লম্বা চুমুক লাগালেন আমির আবু বিন খাদেম। তার পর জোব্বার অন্য সাইড পকেট থেকে পাঞ্চ ক্লারো মাইল্ড সিগারিলোর লম্বা প্যাকেটটা বের করে একটা ধরিয়ে জেফ আর দিয়েগোর দিকে এগিয়ে দিলেন প্যাকেটটা। “মানে আপনি আমায় এই গল্পোটা দিতে চাইছেন যে আপনার ওই ড্রাগ বেচে আমার রাজগার দেড়া এমনকি দ্বিগুণও হয়ে যেতে পারে।”

“হ্যাঁ, পারে।” এ বার জবাবটা এল দিয়েগোর কাছ থেকে। “ইয়োর হাইনেস, আপনার সম্ভবত জানা আছে ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারওয়ার্ডে সবচেয়ে প্রফিট মেকিং, বলা ভাল লুক্রেটিভ তিনটে বিজনেস হল ড্রাগ, আর্মস অ্যান্ড হিউম্যান ট্র্যাফিকিং। হ্যাঁ, আর-একটা তথ্য— “সিগারিলোয় লম্বা একটা টান দিয়ে অনেকখানি ধোঁয়া বৃকে টেনে নিলো দিয়েগো। “মেডেলিনে পাবলো এসকোবারের এনকাউন্টার কিলিং-এর পর গোটা লাতিন আমেরিকায় ছড়িয়ে থাকা ওর এলাকাগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে বোগোটোর কালি কার্টেল আর সান সিরোর এল চ্যাপো গ্যাং। সি আই এ এবং এফ বি আইয়ের হিসেব অনুযায়ী দ্য অ্যামাউন্ট অব দেয়ার ওয়েলথ ইজ মোর দ্যান এনি

বিজনেসম্যান উইদিন টপ টেন র‍্যাংকিং ইন দ্য হোল ওয়ার্ল্ড।” একটানা বলে থামল দিয়েগো।

“সব তো বুঝলাম, তবে এর মধ্যে আমি আসছি কোথা থেকে?” সিগারিলোর ভগ্নাংশটা ছাইদানিতে পিষে নিভিয়ে দিয়েগোর উদ্দেশে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন আমির খাদেম।

“আসছেন। আসছে ওদেশে আপনার ভাগের অয়েল ফিল্ডগুলো।” ফের মুখ খুলল জেফ। “ওই ফিল্ডগুলোকে আমাদের স্টকিং পয়েন্ট, সিধে কথায় গোডাউন বানাতে চাই আমরা। সেখান থেকে ছড়িয়ে দিতে চাই গোটা আরব দুনিয়ায়। আসলে অনেক দিন ধরে আপনার দেশটাকে খুব নিরামিষ ভাবে চালাচ্ছেন আপনার ভাই সুলতান আবু বিন হাশেম। পৃথিবীর প্রথম যে পাঁচটা দেশে ক্রাইম রেট সবচেয়ে কম তার মধ্যে অন্যতম আপনার ওই দেশটা। সিডিকেট চায় এ বার ওখানে একটু মওজ মস্তি হোক। আপনার, আমাদের, দু’দলেরই সুইস ব্যাঙ্ক লকারগুলো আর-একটু ওজনদার হোক। প্রফিট যা হবে, একদম আধা আধা। আপনার ইনভেস্টমেন্ট বলতে শুধু ওই ফিল্ডগুলোকে গোডাউন হিসেবে আমাদের ব্যবহার করতে দেওয়া।”

শুনতে শুনতে পাকা টমাতোর মতো টকটকে লাল হয়ে উঠছিল আমির খাদেমের ফর্সা মুখখানা। এদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিকতা নিয়ে ফের প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে মনে। “তর্কের খাতির যদি ধরেও নেওয়া যায়, আপনারদের এই প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম তা হলেও একটা প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। মালটা কী করে ঢুকবে ওখানে?” তীব্র অবিশ্বাস আর ব্যঙ্গ মিশে রয়েছে বলার কায়দায়।

“ঠিক যেভাবে এ দেশে হেরোয়িন ঢুকিয়েছিলেন আমার দাদামশাই জিমি স্কারফেস জনসন।” পাশ থেকে খুব মৃদু গলায় বলল জেফ। “নেভি সিল, গ্রিন বেরেটস আর মেরিনসদের একাংশের পকেট ভরে দিয়ে তাদের হাত করে ভিয়েতনাম ফেরত মার্কিন গানশিপ হেলিকপ্টার আর কার্গো প্লেনগুলোয় হেরোয়িন নিয়ে আসা হত এদেশে। ফেরার সময় সেগুলোই নিয়ে যেত অত্যাধুনিক সব বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র, গোয়েন্দা ট্রায়াঙ্গলের গভীর জঙ্গলে, হেরোয়িন প্রসেস ল্যাবরেটরিগুলোয় বড় বড় ড্রাগলর্ডদের প্রাইভেট আমির রসদ হিসেবে। প্রত্যেকটাই খোদ আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিমান। ফলে সিকিওরিটি চেকের প্রশ্নই নেই। বাকিটা তো জলের মতো সোজা। যদিও ভিয়েতনাম যুদ্ধ মিটল, হেরোয়িন আসা বন্ধ হল এদেশে, তত দিনে আমাদের পরিবারগুলো সব মিলিওনেওয়ার থেকে বিলিওনেওয়ার হয়ে গেছে। যাটের দশকে সেটা বড় কম কথা না।” কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা টেবিলে নামিয়ে রাখল জেফ। “আমরা খোঁজ নিয়েছি এখান থেকে অয়েলফিল্ডের প্রয়োজনীয় মালপত্র নিয়ে আপনার ব্যক্তিগত যে সব বিমানগুলো নিয়মিত যাতায়াত করে ওদেশে, সেগুলো চেক করা হয় না কখনোই। সম্ভবত কূটনৈতিক সম্পর্ক আর তেলের স্বার্থের কথা ভেবেই। ও দেশেও সম্ভবত ওই একই ব্যাপার ঘটে। সেক্ষেত্রে পুরনো তিজতার কথাটা মাথায় রেখেই বোধহয় তল্লাশিটল্লাসির মতো ব্যাপারে মাথা গলিয়ে অশান্তি আর বাড়তে চান না আপনার বড় ভাই। আর এই সুযোগটাকেই কাজে লাগাতে হবে আমাদের। আপনার ট্রান্সপোর্ট আর অয়েল ফিল্ডের গোডাউনগুলোর এক পাশে একটু জায়গা। বাকি কাকে কোথায় কিনতে হবে, ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক কীভাবে চলবে, সব দায়িত্ব কার্টেলের। বাট দ্য শেয়ার অব প্রফিট ইজ অ্যাবসলিউটলি ইকুয়াল।”

জেফের কথার পর এই প্রথম বার একটু নরম দেখাল আমির আবু বিন খাদেমকে। তবু দ্বিধাভাবটা পুরোপুরি মুছে যায়নি চোখ থেকে। সেটাই ফুটে বেরোল কথায়, “ধরুন যদি আমি গোয়েন্দা ক্রিসেন্ট মানে ইরান, আফগানিস্তান আর পাকিস্তানের ওইসব ট্রাইবাল ড্রাগলর্ডদের থেকে কোকেনের বদলে হেরোইন আনাই? কোকেনের তুলনায় বাজারসেরা, সবচেয়ে খাটি হোয়াইট হেরোইনের দামও অনেকটাই সস্তা পড়বে। এছাড়াও আমার দেশ থেকে গোয়েন্দা ক্রিসেন্টের দ্রুতও অনেক কম, ফলে ট্রান্সপোর্টেশন কস্ট উড বি মাচ লেসার। একই সঙ্গে মিল রয়েছে ধর্ম আর ভাষাতেও। কাজেরও সুবিধে হবে। ফলে আমার মতো যে কেউ তো সে পথেই ভাববে।” জবাবে এই প্রথমবারের জন্য

অনেকখানি বেশি চওড়া হল জেফের হাসিটা। “হ্যাঁ, আর একইসঙ্গে দুনিয়ার সি আই এ, এফ বি আই, মোসাদের মতো এজেন্সিগুলোকেও নেমন্তন্ন করে ডেকে নিয়ে আসবে পেছনে পেছনে। ওদের সঙ্গে এদেশের সম্পর্কের ব্যাপারটা মাথায় রয়েছে তো আপনার? তাছাড়া আর-একটা কথা দয়া করে একটু মনে রাখবেন। যাদের পকেটে রেশম রয়েছে তারা কেউ ফুটি করতে গিয়ে দামের কথা ভাবে না,” বলতে বলতে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জেফ। “আপনি ভাবুন, যদি মনে হয় আমাদের অফারে পজিটিভ কিছু আছে, জাস্ট গিভ আস আ কল। আওয়ার রেসপন্স উইল বি লাইটনিং ফাস্ট, উই প্রমিস।”

ওরা দু'জন চলে যাওয়ার পর অনেক ক্ষণ ধরে সোফায় বসে বসে ভাবলেন আমির খাদেম। মিথ্যা বলেনি ওরা। সত্যিই এ দেশে কিম্বা ও দেশে কোথাওই কোনও রকম সিকিওরিটি চেকিং হয় না অয়েল ফিল্ডের ট্রাক অথবা ওইসব প্রাইভেট কার্গো প্লেনগুলোয়। এতটুকু ইনভেস্টিমেন্টে রোজগার প্রায় দ্বিগুণ। সত্যিই অফারটা ভাবাচ্ছে রীতিমতো। এদিকে আর-একটা ব্যাপারেও নিশ্চিন্তি। দাদার বডিগার্ড, ওই শালা বোস হারামির বাচ্চা। লোকটা আর নেই ও দেশে। ওই কুস্তার জন্যই তো আজ দেশ ছেড়ে এই বিদেশ-বিভূত হয়ে এসে থাকতে হচ্ছে নিজেকে। শালা দেশের গদি যখন প্রায় হাতের মুঠোয়, সে সময় কোন সেই রুশি মুলুক থেকে দাদা ধরে নিয়ে এল মালটাকে। পাকা ঘুটি কেঁচিয়ে দিল শুয়ারের বাচ্চাটা। তবে বিয়া...দাঁতে দাঁত ঘষলেন আমির! বদলাটা মোক্ষম নেওয়া হয়েছিল বটে। ওর ওই সুইডিশ বোটা। খবর লাগিয়েছিলেন আমির। রোজ গাড়ি চালিয়ে হাইওয়ে ধরে দপ্তরে যায় মাগী। অয়েল ফিল্ডের ওই ট্রাক ড্রাইভারটা। কী যেন নাম? হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মুস্তাফা। বেশ কয়েক গোছা নোট গুঁজে দিতে হয়েছিল পকেটে। তার বদলে ব্রেক শ্যার প্যাঁচটা একটু ঢিলে করে দিয়েছিল শুধু। ওই অতটুকু তো একটা গাড়ি। সেটাকে রুটির ময়দার মতো পিষে দিয়ে রাস্তার ধারে একটা বিশাল গাছের গায়ে ধাক্কা মেরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ২৪ চাকার ডেমলার ট্রাকটা। আগেই শিখিয়ে রাখা কথামতো গাড়ি থেকে নেমে দু'-হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মুস্তাফা। যত ক্ষণ না হাইওয়ে প্যাট্রলিং ভ্যানগুলো আসে। সিম্পল অ্যাকসিডেন্ট ডিউ টু মেজর ব্রেক ফেলো। দু'-চার দিনের রুটিন ইনভেস্টিগেশন আর ডিটেনশন। এর চেয়ে বেশি গড়ায়নি কেসটা।

এর পর বেশ কিছুদিন ঘটনার গতিপ্রকৃতির দিকে সতর্ক নজর রেখেছিলেন আমির খাদেম। হাজার হোক লোকটার নাম তুর্ষ বোস। অনেক জেতা খেলা হারিয়ে দিতে পারে। কেঁচোর গর্ত খুঁড়ে কোন কেউটে বের করে আনবে কে জানে।

না, সে রকম কোনওকিছুই ঘটেনি। বোটা মরার পর থেকেই কেমন যেন ভেবে গেছে মালটা, চুপ করে বসে থাকে ঘরে। প্রাসাদে একান্ত বিশ্বস্ত দু'-চার জনের কাছ থেকে খবর পাচ্ছিলেন খুব গোপনে। এর পর তো একদিন সব ছেড়েছুড়ে বৌয়ের শোকে বিবাগীর মতো হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল দুনিয়া জুড়ে। শেষমেশ নাকি রাশিয়ায় ওর এক প্রাণের বন্ধুর মেয়েকে আফ্রিকার কোন এক মড়াথেকো দেশ থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রচুর গুলিটুলি খেয়ে নিজেই জিয়ন্তে মড়া হয়ে ফিরে এসেছে কোনও রকমে। মোদা কথা ফেরার চাপ আর নেই বললেই চলে। থাক শুয়ে বিছানায়, খানকির ছেলে! দ্যাখ তোর মনিবের পেছনে এ বার কীরকম একহাত ভরি। চোয়ালে চোয়াল ঘষে স্বগতোক্তি করলেন আমির আবু বিন খাদেম। কালই ফোন করতে হবে জাহান্নামের ইবলিশ ওই দুটো ভ্রাগ মাফিয়াকে। তার পর ডিল পাক্কা করতে যেটুকু দেরি। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন আমির খাদেম। ডেরায় ফিরতে হবে। রিসেপশনে ফোন করে লাউঞ্জ ডাকতে বললেন গাড়টাকে।

মিনিটপঁচিশ পর আবার সেই বিশাল বসার ঘর। কাঁচের মতো নীল টলটলে জলে মাছেদের খেলা। ঘরে ঢুকেই জোকাটা ছেড়ে ফেললেন আমির খাদেম। তার পর এসে হাত-পা ছড়িয়ে আয়েশ করে বসলেন সোফায়। টেবিলে রাখা মলাক্কান বেতে বোনা ফলের টুকরিটা থেকে একটা কালো আঙুর তুলে মুখে দিলেন। ফোন করে চলে আসতে বললেন কোস্টারিকান মেয়েটাকে। সোফার এককোণে পড়ে থাকা রিসেপশন টুলে নিয়ে চাপ দিলেন প্লে বাটনে। লুকোনো সাউন্ড সিস্টেমে

বিশাল ঘর জুড়ে বেজে উঠল টুংটাং মৃদু মিঠে রবাবের সুর। তার পর সোফার মখমলি গদির আরামে শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন অ্যাকোয়ারিয়ামের স্ফটিক-স্বচ্ছ নীল জলের দিকে।

মাসছয়েক পর

সন্ধের মুখে নিজের বাড়ির বাগানের লনে আরামকেন্দরায় আধশোয়া হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন আমির ফাতাহি। দিনের তীব্র দাবদাহ কেটে গিয়ে মিঠে আর ঠান্ডা একটা হাওয়া বইছে সন্ধের পর থেকেই। মরুভূমির দেশে দিনের বেলাটা যতই উত্তপ্ত হয়ে উঠুক না কেন, রাতে আবহাওয়া অনেকটা সহনীয় হয়ে যাবেই। কারণ মরুভূমির বালি। গরম আর ঠান্ডা দুটোই হয় খুব তাড়াতাড়ি।

পরিস্কার আকাশে চার পাশে অনেক তারা। মাঝ বরাবর আধফালি বাঁকা চাঁদ। বাগানের সীমানার দু'ধারে সারিবদ্ধ সুদৃশ্য খেজুর গাছ। সরসর শব্দে দুলে চলেছে পাতাগুলো। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম নিয়ে ওপেকের একটা মিটিং হবে সৌদিতে আগামী মাসে। বিষয়টা নিয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং ছিল আমিরিয়তের। আমিররা সবাই উপস্থিত ছিলেন সুলতানের ডাকা সেই সভায়। প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে ফাতাহি তো ছিলেনই। সেই মিটিং সেরে ফিরেছেন এই একটু আগে। আরামকেন্দরার পাশে রাখা সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত একটা রূপো বাঁধানো গড়গড়া। থেকে থেকে তাতে টান দিচ্ছেন ফাতাহি। মিঠে তুর্কি তামাকের গন্ধে ম ম করছে চারপাশ। ঠিক তখনই বেজে উঠল আরামকেন্দরার হাতলে রাখা আইফোনটা। তুলে কানে দিতেই সুরতা (পুলিশ) কমিশনার আল হাবিবির গলা। “হুজুর-এ-আলা, এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত। বাট দ্য সিচুয়েশন ডিমান্ডস ইট। এই মুহুর্তে আপনার সঙ্গে আমার কথা বলাটা ভীষণ প্রয়োজনীয়।” সুরতা প্রধানের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু একটা ছিল, যার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সময় লাগল না ফাতাহির। “চলে আসুন।” নির্দেশ দিয়ে মুখে তুলে নিলেন গড়গড়ার নলটা। কুণ্ঠিত জু-জোড়ায় গভীর চিন্তার ছাপ। কারণটা নিশ্চয়ই অত্যন্ত জরুরি। নইলে এই অসময়ে সুরতা প্রধান নিজে আসতেন না।

মিনিটদশেক পর আমিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন সুরতা প্রধান আল হাবিবি। “বসুন।” মুখোমুখি রাখা চেয়ারটার দিকে ইঙ্গিত করলেন আমিরসাহেব। “এ বার বলুন, কী এমন ঘটল যে আপনাকে নিজে ছুটে আসতে হল? অন্য কাউকে পাঠিয়ে বা ফোনেও তো বলা যেত।” সামান্য বিস্ময়ের সঙ্গে একটা চোরা বিরক্তিও যেন মিশে রয়েছে বলার মধ্যে।

“হ্যাঁ, তা হয়তো যেত, হুজুর-এ-আলা।” জবাবে একটু দ্বিধাযুক্ত শোনা সুরতা প্রধানের গলা, “তবু কেন জানি না মনে হল, বিষয়টা নিজে সরাসরি এসে আপনাকে জানানো দরকার।” সামান্য কেশে গলাটা সাফ করে নিলেন হাবিবি। “বিষয়টা আসলে হিজ হাইনেসের ছোট ভাইকে নিয়ে। আপনি তো জানেন হিজ হাইনেস এ দেশে আমির খাদেমের নিজস্ব সম্পত্তিগুলোর উপর কোনও রকম নজরদারি চলুক, সেটা একদম পছন্দ করেন না। কিন্তু সার্ভেইলেন্সের ব্যাপারটা তো আমাদের খেয়াল রাখতে হয়, তা সে আমাদের দেশটা ভৌগোলিক ভাবে যতই ছোট হোক আর ক্রাইম রেট যতই নীচের দিকে থাকুক না কেন। অথচ সুলতান ব্যাপারটা জানলেই ভয়ঙ্কর রাগারাগি করেন। ফলে আপনিই ভরসা।” বলতে বলতে আরও গম্ভীর হয়ে উঠল হাবিবির ফর্সা মুখখানা। “আসলে সমস্যাটা দেখা দিয়েছে আমির খাদেমের তিন নম্বর ফিল্ডে। ওখানে আমাদের যে সোর্স ওই ফিল্ডটার গোডাউন সিকিওরিটির দায়িত্বে আছে তার চোখে বেশ কিছু দিন ধরে নানা ধরনের আনইউজুয়াল, বলা ভাল অ্যাবনর্মাল মুভমেন্ট ধরা পড়ছে।”

“সেটা কী রকম?” কথার মাঝখানে প্রশ্ন করলেন ফাতাহি।

“এই ধরুন, এমন কিছু লোক, যাদের আচার আচরণ বা কাজের সঙ্গে এক জন অয়েল ফিল্ডের কর্মীর কোনও মিল নেই। তাদের হাত দিয়ে বাইরে থেকে এমন কিছু সন্দেহজনক জিনিসপত্র ঢুকছে গোডাউনে, সেগুলো আর যাই হোক অয়েল ফিল্ডের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু হতে পারে না। তবে ওর সন্দেহটা প্রবল হয়েছে আজ সন্ধ্যেবোলায়। গোডাউনের মধ্যে নিজের লকার থেকে খাবার বের করতে গিয়ে চোখে

পড়ে ওই সন্দেহজনক চেহারার লোকগুলোর মধ্যে কয়েক জন, একটা বড় প্যাকিং বক্স থেকে একের পর এক প্লাস্টিকের প্যাকেট বের করে সাজিয়ে রাখছে ছোট ছোট কার্টনে। প্যাকেটে ধবধবে সাদা রঙের পাউডার জাতীয় একটা কিছু। এক-একটা প্যাকেট কেজিখানেক মতো হবে। প্রায় পনেরো ঘোলা বছর হল ওই গোড়াউন পাহারাদারের ডিউটিতে রয়েছে লোকটা। ওগুলো আর যাই হোক, অয়েল ফিল্ডের প্রয়োজনীয় কোনও কেমিক্যাল যে নয়, সে ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত ও।”

“ইয়া আল্লাহ!” হাবিবির বলা শেষ হওয়ার আগেই আর্নাদ করে উঠলেন আমির ফাতাহি। সঙ্গে সঙ্গে ধক করে উঠল সুরতা প্রধানের চোখজোড়াও।

“এই মুহূর্তে আমি যা ভাবছি, আপনিও কি তাই ভাবছেন, হুজুর-এ-আলা?”

“একদমই তাই!” ক্রুদ্ধ শার্দুলের মতো গরগর করে উঠলেন আমির ফাতাহি। “আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট নয়, আপনি আপনার ফোর্স থেকে কম করে জনাকুড়ি কন্সট্রাক্ট স্পেশালিস্ট কম্যান্ডার একটা স্কোয়াডকে কল করুন এখন। খবর পাওয়ামাত্র যেন ইমিডিয়েটলি চলে আসে এখানে। আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে। কাম অন চিফ, ডু ইট ফাস্ট!”

“ইনশাআল্লাহ!” ঝটিতি ফোনটা কানে তুলে নিলেন হাবিবি।

বিশাল গোড়াউনটার একদম শেষপ্রান্তে একটা ছোট ঘর। নানা রকম ছোটখাটো যন্ত্রাংশ আর টুকিটাকি মালপত্রের ভর্তি। এ সবার মাঝখানে একটা মাঝারি আকারের মজবুত কাঠের টেবিলের উপর বড় একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্সটা থেকে নিয়ে সাদা পাউডারের প্যাকেটগুলো দ্রুতহাতে ছোট ছোট কার্টনে ভরছিল পাঁচ-ছ’জন। দলটার নেতা আলভারেজ। দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে নির্দেশ দিচ্ছিল বাকিদের, “কাম অন ফার্স, মেক ইট কুইক! আজ রাতেই কনসাইনমেন্ট ডেসপ্যাচ...” কথা শেষ করার আগেই জোরালো সার্চলাইটের আলোয় দিন হয়ে গেল বিশাল গোড়াউন চত্বর। কিছু বুঝে ওঠার আগেই মারিও আর তার দলের লোকেরা দেখল, উঁচিয়ে থাকা অনেকগুলো অ্যাসল্ট রাইফেলের পাল্লার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওরা সবাই।

“ক্যামামতা! সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে হুজুর-এ-আলা! চার নম্বর ফিল্ডের গোড়াউনে রাখা পুরো মাল ধরা পড়ে গেছে! সাল্লায়ারদের ছ’জনকে বমাল অ্যারেস্ট করেছে সুরতারা। খোদ আমির ফাতাহি আর কমিশনার দাসারি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করেছে পুরো রেডটা।” হাজার হাজার মাইল দূর থেকে মায়ামির বাড়িতে আমির খাদেমের ফোনে ফিসফিসিয়ে ভেসে আসছিল মুস্তাফার গলা। মুস্তাফা, ব্রেকের প্যাঁচ হাস্তা করে ট্রাকটা চড়িয়ে দিয়েছিল বোসের সুইডিশ বোটার গাড়ির উপর। বহুদিনের বিশ্রুত খবরি। ফিল্ডের সবচেয়ে পুরনো কর্মী। ওর খবর কখনও মিথ্যে হবে না। ফোনটা ছেড়ে দিয়ে বাজপড়া মানুষের মতো সামনে তাকিয়ে রইলেন আমির আবু বিন খাদেম। ফাঁকা, বোধশূন্য দু’চোখের দৃষ্টি! এইমাত্র যেন গোটা আকাশটা মাথার উপর ভেঙে পড়েছে। সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর করে! কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারিলো ধরিয়ে ঘনঘন কয়েকটা টান দিয়ে ছাইদানিতে পিষে নিভিয়ে দিলেন সেটা। তার পর ডায়াল করলেন একটা নম্বরে। কয়েক মুহূর্ত পর ওপারে জেফ জনসনের গলা। “অলরেডি গট দ্য নিউজ। আধঘণ্টার মধ্যে সাফেজ যাচ্ছে। একটু পর ওই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছে কোথায় আপনাদের দু’জনের দেখা হবে।” আমিরকে আর একটিও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ও প্রান্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল লাইনটা।

আধঘণ্টা পর মায়ামি সমুদ্রসৈকতের প্রায় গায়ে লাগা বিলাসবহুল সাত-তারা রিসোর্ট ‘সি-হর্স’। একটা বিশাল সুইটে মুখোমুখি বসা আমির আবু বিন খাদেম আর দিয়েগো ‘স্নেক’ সাফেজ। “আপনাদের চক্রে পড়ে সর্বনাশ হয়ে গেল আমরা!” সাফেজের দিকে তাকিয়ে তীব্র চিৎকারে ফেটে পড়লেন আমির খাদেম। “রেসপেক্টেবল অয়েল ফিল্ড ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট থেকে উইদিন আ সেকেন্ড নটোরিয়াস এক জন

ড্রাগ ডিলার বনে গেলাম!” হিস্টরিয়াগ্রন্থ রোগীর মতো গুঙিয়ে গুঙিয়ে কথাগুলো বেরোচ্ছিল আমিরের মুখ থেকে। আর সে গোড়াউনি থামল উল্টো দিক থেকে ধেয়ে আসা একটা তীব্র ধমকে। “উইল ইউ স্টপ টকিং অল দোজ বুলশিটস!”

তামাটে লাল মুখের পেশিগুলো থরথর করে কাঁপছিল সাফেজের, “অফারটা আপনার কাছে নিয়ে এসেছিলাম আমরা। কিন্তু কোনও রকম জোরাজুরি করিনি। আপনি নিজের ইচ্ছেয় এ ধান্দায় এসেছিলেন বলা ভাল, প্রস্তাবটাকে লুফে নিয়েছিলেন। এই গত ছ-মাস ধরে প্রতিমাসে যখন হাফ বিলিয়ন মতো আপনার সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোয় ঢুকে যাচ্ছিল তখন তো এই কান্নাকাটিটা দেখিনি। আর আজ বিপদে পড়তেই অন্য সুরে গাওয়া হচ্ছে?” গলার স্বর ক্রমাগত চড়ছিল সাফেজের। “একটা ব্যাপার আপনার জেনে রাখা দরকার অনাবেরল আমির, সেই তিরিশের দশক, ইতালিয়ান মافیয়ারদের জমানা থেকে শুরু করে আজ অবধি একটা খুব কড়া কানুন চালু রয়েছে আমেরিকার কালো দুনিয়ায়। ওমের্থা। কোনও অবস্থাতেই মুখ না খোলার কসম খেতে হয় প্রত্যেককে, আন্ডারওয়ার্ল্ডে জয়েন করার আগে। ইতালিয়ানরা প্রথম এটা চালু করলেও কালেদিনে সব কার্টেলই মেনে চলতে শুরু করে এটা। যা আজও বহাল রয়েছে গোটা আমেরিকা জুড়ে। এই ওমের্থার নিয়ম যদি কেউ ভাঙে অর্থাৎ দলের বিরুদ্ধে মুখ খোলে, তা হলে তার পরিবারের সবাইকে সঙ্গে সঙ্গে মেরে ফেলা হয়। আর মুখ না খুললে, মানে ওমের্থা রুল ব্রেক না করলে পুরস্কার হিসেবে তার পরিবারের সারাজীবনের দায়িত্ব কার্টেলের। ফলে নিশ্চিন্ত থাকুন, আমাদের লোকেরা মরে গেলেও মুখ খুলবে না। ফলে আমাদের দুই কার্টেলের ব্যাপারে জানাটা প্রায় অসম্ভব বলতে পারেন। আর তার পরও যদি তর্কের খাতিরে ধরই নিই কেউ মুখ খুলেই ফেলল বা অন্য কোনও সোর্স থেকে ইনফরমেশন বেরিয়ে গেল, এতে আমাদের খুব একটা কিছু এসে যাবে না। বড় জোর জানা যাবে আপনার সঙ্গে ড্রাগের ধান্দা করেছি আমরা।” হো হো করে চরম ব্যঙ্গের একটা হাসি হেসে উঠল সাফেজ। “তাতে কার্টেলের কী ছেঁড়া যাবে? আমরা ছাঁকা ছাঁকা সব গ্যাংস্টার। এক পা গ্রাদার ভেতরে, এক পা বাইরে। আইনকানুন, কোর্ট-কাছারি, থার্ড ডিগ্রি, ইন্টারোগেশন, সব জলভাত আমাদের কাছে। সারা দুনিয়া জানে কোন কালো কারবারের কারবারি আমরা। কিন্তু বিপদটা হবে আপনার।”

হাতে ধরা রথম্যানসের প্যাকেট থেকে বার করে একটা সিগারেট ধরাল সাফেজ। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলা শুরু করল ফের, “কারণ গোটা চালানটা ধরা পড়েছে ওদেশে আপনার গোড়াউন থেকে। ফলে সবার প্রথমেই এফ বি আই এজেন্টরা এসে দাঁড়াবে আপনার দরজায়। আর আমাদের ধারণা সেটা ঘটবে খুব তাড়াতাড়ি। কারণ আপনার বড় ভাই, সুলতান আবু বিন হাশেম ইমিডিয়েটলি কন্সট্রাক্ট করবেন এদেশের অ্যাবজিনিট্রেশনের সঙ্গে অ্যান্ড ইট’স কোয়াইট অবভিয়াস।”

শুনতে শুনতে পেটের ভেতরটা খামচে ধরছিল আমির খাদেমের। বুক বেয়ে উঠে আসা তীব্র ভয়ের একটা কাঁপনি! তবু কাঁপা কাঁপা গলায় শেষ প্রতিরোধের চেষ্টা করলেন একবার, “ধরলেই হোলো? দেশে আইনকানুন নেই? বেস্ট ল-ইয়ারদের অ্যাপয়েন্ট করব আমি...”

“তা করতেই পারেন।” আমির খাদেমের মুখের কথাটা কেড়ে নিল সাফেজ। “তবে একটা কথা মনে রাখবেন দয়া করে। ও দেশে মাল ধরা পড়েছে আপনার কোম্পানির গোড়াউনে আর এ দেশ থেকে তা গেছে আপনারই কার্গো ফ্লাইটে। এ দুটোই ভয়ঙ্করভাবে এগেনেস্টে যাবে আপনার। দু’দুটো রকসলিড প্রফ। এর জোরে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট পেতে কোনও প্রবলেম হবে না ওদের। আর এ রকম দুটো এভিডেন্সের এগেনেস্টে আপনার ল-ইয়ার যতই নামীদামি হোন না কেন, বেল গ্রান্ট করাটা জাস্ট নেক্সট টু ইম্পসিবল। আর তত ক্ষণে এফ বি আই সদর দপ্তরে তুলে নিয়ে গিয়ে হট প্লেটে ল্যাম্ব থ্রিলের মতো করে আপনাকে সেকঁবে। আচ্ছা সে আচ্ছা খলিফা পুডিংয়ের মতো গলে যায় সেই আদরযত্নের সামনে। আর সেখানে আপনি?” ঠোঁটের কোণে ক্রুর একটা হাসি হাসল সাফেজ। “দু’সেকেন্ডও টিকতে পারবেন না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপনার এগেনেস্টে বেশ গাবদাগোবদা একটা কেস ফাইল বানিয়ে

ফেলতে খুব বেশি সময় লাগবে না ওদের। আর আপনি মুখ খুললে আমাদের চেয়ে আপনার সর্বনাশ হবে অনেক বেশি। আমাদের একটা চালান ধরা পড়েছে, বড়জোর আরও দু'এক চালান বাজেয়াপ্ত হবে। ছ'টা সোয়ান জালে উঠেছে, আরও ছ'টা উঠবে। এ সব তো আমাদের ধান্দায় জলভাত। কিন্তু স্যর, আপনি। এদেশের এক সম্মানীয় নাগরিক, সমাজে গণ্যমান্য এক জন হিসেবে মানুষ চেনে আপনাকে। আপনার অবস্থাটা কী হবে, জাস্ট ভাবুন একবার।” প্যাকেট থেকে বের করে আর-একটা সিগারেট ধরাল সাধেজ। তার পর ফের চোখ রাখল আমির খাদেমের চোখে।

“ওদিকে আজকাল আবার এ ধরনের সিরিয়াস ড্রাগ কানেকশানে সান ফ্রান্সিসকোর আলকাতরাজে পাঠানো হচ্ছে কনভিক্টদের। মার্কিন মুলুকের ডেডলিয়েস্ট প্রিজন্। ইটস জাস্ট আ হেল! ওখানে একরাত কাটালেই আপনার মনে হবে এর চেয়ে মরে যাওয়াও ঢের ভাল ছিল।”

“প্লিইইজ স্টপ ইট।” সাধেজের কথা শেষ হওয়ার আগেই তীব্র আত্নানাদে ভেঙে পড়লেন আমির আবু বিন খাদেম। “আই কান্ট টেক ইট এনি মোর! সো মাই ফ্রেন্ড, ইউ বেটার টেল মি, আমার এখন কী করা উচিত।”

ঝুঁকে খাদেমের কাঁধে একটা হাত রাখল দিয়েগো সাধেজ। “অনারেবল স্যর, আপনার সামনে এই মুহূর্তে দুটোই রাস্তা খোলা আছে। যার মধ্যে একটা গিয়ে শেষ হয়েছে আলকাতরাজের দরজায় আর অন্যটা আইনের আওতার বাইরে, মেক্সিকোয় একটা সেফ শেল্টারে।”

“প্লিজ ডু হোয়াটইভার ইউ লাইক, বাট এফ বি আই আর আপনার ওই আলকাতরাজের হাত থেকে বাঁচান আমাকে দয়া করে! ফর হেভেনস সেক!”

জবাবে এ বার অনেকটাই নরম শোনালা সাধেজের গলা। “ও কে। তা হলে আপনাকে রেডি হয়ে নিতে হবে খুব তাড়াতাড়ি। ইমিডিয়েটলি বাড়ি যান। পরিবারের সঙ্গে কথা বলে তাদের কনভিন্স করুন। সবার কাছে যত হার্ড ক্যাশ আর জুয়েলারিজ আছে সব প্যাক করে নিন ইমিডিয়েটলি। এদিকে আপনার সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলোতে এ দেশের সরকার আঙুল ঠেকাতে পারবে না, সে ওরা যতই পাওয়ারফুল হোক না কেন।”

শোনামাত্র হাহাকার করে উঠলেন আমির খাদেম। “অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাউট মাই ইউজ প্রপার্টিজ ওভার হিয়ার।”

“অ্যাট ফার্স্ট, ইউ থিংক অ্যাবাউট সেভিং ইয়োর ওন অ্যাস, মাই বিলাভেড ফ্রেন্ড।” একটু বিরক্ত দেখাল সাধেজকে। “মনে রাখবেন, আপনার হাতে সময় খুব কম। আবার বলছি বাড়ি যান। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ করুন। রাজি থাকলে ফোন করে আমাকে জানান, প্যাক্সিডাম উইদিন হাফ অ্যান অওয়ার। কারণ তার পর আমাকে অনেক কিছু আরেঞ্জ করতে হবে আর সেটা খুব তাড়াতাড়ি। প্রথমেই গোটাছয়ক মজবুত এস ইউ ভি কার। আপনার গাড়ি নয়। ওগুলো ট্রাক করা অনেক সহজ। তাই আমাদের গাড়িগুলো মালপত্র সমেত আপনাদের নিয়ে যাবে মেক্সিকান বর্ডার পর্যন্ত। এ ছাড়াও অনেক কিছু সেটিং করতে হবে এতটা শর্ট নোটিশে। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।”

“হ-হ্যাঁ, যাচ্ছি।” চরম আতঙ্ক আর বিভ্রান্তিমাখা চোখে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেলেন আমির খাদেম।

ঘণ্টাখানেক পর। দু'পাশে রক্ষ উষর বালু আর কাঁকুরে জমি। মাঝে মাঝে আগাছা আর মাথা উচিয়ে থাকা ফণিমনসার ঝোপঝাড়। কাছে দূরে ছোটবড় ন্যাড়া টিলাপাহাড়। মাঝখানে প্রায় নির্জন পাকা রাস্তা ধরে ছুটছিল ছ-ছটা রেঞ্জ রোভার এস ইউ ভি। প্রথম গাড়িটায় খোদ আমির খাদেম আর তাঁর বড়ি বেগম। বাকি গাড়িগুলোয় ছোট বেগম আর পরিবারের বাকি লোকজনেরা। চরম ক্লান্তি আর চোরা একটা আতঙ্কের ছাপ সবার চোখেমুখে। প্রতিটা গাড়িতেই মালপত্র রাখার জায়গাগুলো ঠাসা ঢাউস মাপের সব ট্রাভেলিং সুটকেসে।

কয়েকটা ছোট ছোট বিরতি দেওয়া ছাড়া একনাগাড়ে প্রায় পনেরো ঘোলা ঘণ্টা চলার পর হঠাৎই হাইওয়ে ছেড়ে একপাশে

খোলা এবড়োখেবড়ো জমিতে নেমে পড়ল গাড়িগুলো। এভাবে আরও ঘণ্টাদেড়েক ছুটে একটা জনমানবশূন্য খোলা প্রান্তরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল এস ইউ ভি-র কনভয়।

“নেমে আসুন সবাই।” গাড়ি থেকে নেমে হাঁক পাড়ল কনভয়ের প্রথম গাড়িটার চালক। দ্বিধাগ্রস্ত, সম্ভ্রান্ত পায়ে নেমে এলেন আমির খাদেম আর পরিবারের সদস্যরা। ঠিক তখনই একটু দূরে বড় বড় পাথর আর ফণিমনসার ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল দশ বারোজন রক্ষ চেহারার লোক। প্রায় কিলোমিটারখানেক দূরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে একটা কাঁটাতারের সীমানার দিকে আঙুল দেখাল চালক। “ওরাই আপনাদের নিয়ে যাবে সীমানার ওপারে।”

শোনামাত্র একটু এগিয়ে গেল লোকগুলো। আর পরমুহূর্তেই আমির পরিবারের সবাইকে চরম বিস্মিত করে টেনে তুলে ফেলল জমির একটা বড় অংশ। একটা বাঁশের মাচা। উপরে নিপুণভাবে মাটি আর ঘাসের আস্তরণ। নীচে একটা অন্ধকার গহ্বর। ওদের মধ্যে এক জন রয়েছে সামনে। হাতে বিশাল একটা এল ইউ টিচলাইট। সেটা জ্বালিয়ে সাঁত করে গহ্বরটার মধ্যে সঁধিয়ে গেল লোকটা। বাকি ছ'-সাতজন ছুটে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল গাড়ির পেছনে রাখা সুটকেসগুলো তুলতে।

“সবাই ঝটপট ঢুক পড়ুন ভেতরে! বর্ডার প্যাট্রলিং স্কোয়াড চলে আসবে এখনি।” গহ্বরে নামার মুখে একটা কাঠের সিঁড়ি। সেটা বেয়ে ছড়মুড়িয়ে নেমে পড়লেন আমির পরিবারের লোকজনেরা। দলের বাকি চার-পাঁচজন ফের মাটি আর ঘাসবিচালি ঢেলে অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে ঢেকে দিল গহ্বরটাকে। তার পর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে উধাও হয়ে গেল ঝোপঝাড় আর অমসৃণ পাথুরে পথের বাঁকে। খুব ভালভাবে একবার চারপাশটা জরিপ করে নিল প্রথম গাড়ির চালক। তার পর দ্রুত ফিরে গিয়ে বসে পড়ল স্টিয়ারিংয়ে। ছ-ছটা গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সম্মিলিত গর্জন। এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে গেল কনভয়।

প্রায়াক্ষকার টানেল ধরে হাঁটছিলেন আমির খাদেম। এখানে আলো বলতে সামনে পথপ্রদর্শক লোকটার হাতের ওই জ্বলন্ত টর্চটা। সাঁতস্যাঁতে আর ভয়ঙ্কর ভ্যাপসা গরম গোটা সুড়ঙ্গ জুড়ে। পায়ের তলার মাটি ভেজা হড়হড়ে, কখনও কখনও গোড়ালি অবধি জল উঠে আসছে। কদমাক্ত উঁচুনিচু জমিতে পা পিছলে যাচ্ছে বারবার। সামনে টর্চধারী লোকটার কাঁধ শক্ত করে চেপে ধরে কোনওমতে হাঁচট খেতে খেতে এগোছিলেন আমিরজাদা আর তীব্র অভিসম্পাত দিচ্ছিলেন নিজেকে। কী কুক্ষণে যে ওই ড্রাগ মারফিয়াগুলোর প্রস্তাবে ঘাড় পেতেছিলেন। না হলে আজ এই দূরবস্থায় পড়তে হত না। পিছন থেকে কানে আসছিল দুই বেগম আর ছেলেমেয়েদের চোখা চোখা সব বাক্যবাণ।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এল আমিরের বুক বেয়ে। এরা তাঁর পরিবার, সন্তানসন্ততি। তাঁর অর্জিত অর্থে কাল অবধি বিপুল ভোগবিলাসের জীবন কাটিয়েছে প্রত্যেকে। আর আজ পরিস্থিতি অন্যরকম হতেই চেহারা বিলকুল বদলে গেছে সবার। বিলাসবহুল প্রাসাদ, গাড়ি, অপরিসীম ভোগ আর বৈভবের জীবন। সব মিথ্যে এক প্রহেলিকা মনে হচ্ছে মাত্র ঘণ্টাকয়েকের ব্যবধানে, এই দুর্গম প্রায়াক্ষকার সুড়ঙ্গের মধ্যে.. চিন্তার তারটা ছিঁড়ে গেল মাথার উপর সরসর একটা শব্দে। টর্চের আলোটা সেদিকে তাক করল পথপ্রদর্শক। মাটি ফুঁড়ে বেরোনো একটা গাছের শেকড়ে জড়িয়ে রয়েছে একটা কুচকুচে কালো সাপ। গায়ে ছোট ছোট সাদা ফুটকি। “হাবিয়া দোজখ (অনন্ত নরক)!” পিছন থেকে আত্ননাদ করে উঠলেন আমিরসাহেবের বড়ি বেগম। ঘাড় ঘুরিয়ে মুচকি হাসল পথপ্রদর্শক। “ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ওটা নাইট ভাইপার। পুরোপুরি নির্বিষ। পোকামাকড়, ছোটখাটো চামচিকে, বাদুড়টাদুড় ধরে খায়। আসলি খেল তো যেখানে যাচ্ছেন, সেখানে। ফেরডেল্যান্স, কটন মাউথ, র‍্যাটল মেক— ভয়ঙ্কর বিষধর সব সাপ থিকথিক করছে চারপাশে। শ্রেফ একটা ছোবল। আধঘণ্টার মধ্যে হাসপাতাল পৌঁছোতে না পারলে খেল খতম!”

শুনতে শুনতে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল আমির খাদেমের। ঠিক সেই সময় মিটারবিশেক দূরে একচিলতে একটা আলোর রেখা। একটু একটু করে চওড়া হচ্ছে সেটা। সামনে একফালি আকাশ। একইরকম

একটা বাঁশের মাচা, মাথার উপর খুলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সামনে রাখা কাঠের সিঁড়িটা বেয়ে উঠে গেল পথপ্রদর্শক। পিছনে আমির খাদেম আর তাঁর পরিবারের সদস্যরা। সবার শেষে মালবাহী লোকগুলো।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেই চোখে হাত দিয়ে আলোর বলকানিটা সামলানোর পর খাদেমের চোখে পড়ল একটু দূরে ছোট একটা টিলার গায়ে দাঁড়ানো ছটা পুরনো ইসুজু স্টেশন ওয়াগন। দুর্গম পথে নিয়মিত যাতায়াতের ছাপ স্পষ্ট সারা শরীরে। সামনে দাঁড়ানো বেশ কয়েকজন। সবার মাথায় গোলাকৃতি, ঝুঁচোলো মাথা মেক্সিকান টুপি। ওদের মধ্যে এক জন এগিয়ে এল সামনে। নোংরা ধূলিধূসরিত জামা। গ্যালিস আটকানো প্যান্ট। সমপরিমাণ নোংরা সেটাও। চেবানো তামাকের ছোপ দাঁত জুড়ে। উৎকট গন্ধ ছাড়ছে সারা গা থেকে।

অতি কষ্টে পেট গুলিয়ে উঠে আসা বমির ভাবটাকে সামলালেন আবু খাদেম। দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু একটা বলে গাড়িগুলোর দিকে ইশারা করল লোকটা। ইঙ্গিত অনুসরণ করে এগিয়ে গেলেন আমির সাহেব। পিছন পিছন অন্যান্য।

দুর্গম রাস্তা ধরে ছুটিছিল স্টেশন ওয়াগনগুলো। ক্রমশ ঘন হয়ে আসছিল পাহাড় আর বনাঞ্চল। একসময় তা পরিণত হল ঘন জঙ্গলে। কোথাও কোথাও তা এতটাই নিশ্চিহ্ন যে সূর্যের এতটুকু আলোও তোকার জায়গা নেই। এভাবে ঘণ্টাটিনেক একনাগাড়ে চলার পর হঠাৎই ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। ঘন জঙ্গলের শেষে পাহাড়ের গায়ে বিশাল একটা লেক। দৈর্ঘ্যে কমপক্ষে কিলোমিটারপাঁচেক তো হবেই। সবুজ জলরাশি। পড়ন্ত বিকেলে পাহাড়ের ফাঁকে দ্রুত ঢলে পড়া সূর্য। গরমের লেশমাত্র নেই। তার বদলে হাল্কা শিরশিরে ঠান্ডা হাওয়া বইছে একটা। অজস্র পাখির কলতান। সব মিলিয়ে অপূর্ব এক নৈসর্গিক দৃশ্যপট! এহেন দৃশ্যপটকে পেছনে রেখে লেকের পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা একটা হুডখোলা উইলিস জিপ। গাড়ির বনেটে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো এক অত্যন্ত সুদর্শন যুবক। ছিপছিপে সূঠাম দীর্ঘকায় চেহারা। ক্লিন শেভড। অনেকটা মেগা সোপ অপেরার চকোলেট বয় কোনও নায়কের মতো। বয়েস বড়জোর পঁয়তেরিশ-ছত্রিশ। পরনে গাঢ় তুঁতে রঙের পিওর পেরুভিয়ান সিল্কের ফুলশ্রিত শার্ট আর ক্রিম-রঙা চিনোজ ট্রাউজার। শার্টের হাতাজোড়া কনুই অবধি গোটানো। চেহারা আর পোশাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মুখে ভারি উজ্জ্বল, মিষ্টি একটা হাসি। নাম জোয়াকিম হার্নান্ডেজ। দুনিয়াজোড়া কুখ্যাততম তিনটে ড্রাগ কার্টেলের মধ্যে একটা, এল চ্যাপো গ্যাংয়ের সর্বময় কর্তা এল চ্যাপো গুজমানের অন্যতম শাগরেদ ছিল এই জোয়াকিম। বছরকয়েক আগে অ্যান্টি-ড্রাগ ট্রাফিকিং কন্স্যাট ফোর্সের হাতে গুজমান গ্রেফতার হওয়ার পর স্বাধীনভাবে নিজের গ্যাং খোলে জোয়াকিম। দলের নাম দেয় জাণ্ডয়ার ক্ল। খুব দ্রুত উত্থান ঘটতে থাকে অন্ধকার জগতে। মাত্র বছরকয়েকের মধ্যে উত্তর, দক্ষিণ, মধ্য আমেরিকা মিলিয়ে সেরা দশটা ড্রাগ কার্টেলের মধ্যে একটা হয়ে উঠেছে জোয়াকিমের এই জাণ্ডয়ার ক্ল।

এই মুহুর্তে জোয়াকিমের পায়ের কাছে বসা মিশকালো, ভয়ালদর্শন দুটো পিটবুল কুকুর। গলার চোক চেনদুটো আলগোছে ধরা ডান হাতের মুঠোয়। দু'পাশে দুই দেহরক্ষী। কাঁধে ঝোলানো গ্যারান্ড এম ফিফটিন ফুললি অটোম্যাটিক অ্যাসল্ট রাইফেল। ইসুজুর কনভয়টা এসে দাঁড়ানো মাত্র আরও ঝকঝকে হল জোয়াকিমের মুখে দেবশিশুর মতো মিষ্টি হাসিটা। কুকুরগুলোর দিকে তাকিয়ে হাল্কা ইশারা করতেই লাফ দিয়ে জিপের উপর উঠে বসল দুটোয়। ডান হাত প্রসারিত করে সামনে এগিয়ে গেল জোয়াকিম। উষ্ণ করমর্দন সেরে দু'হাত রাখল আমির খাদেমের দুই বাহুমূলে। “এক্সট্রিমলি সিরি ফর ইয়োর হার্ড লাক, অনারেবল স্যার! আরও খারাপ লাগছে, আপনার মতো এক জনকে এ রকম অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে এই এতটা রাস্তা আসতে হোলো। তবে আর কোনও চিন্তা নেই,” আঙুল তুলে সামনে দেখাল জোয়াকিম, “এই পাহাড় আর দুর্গম জঙ্গল, সোজা চলে গেছে গুয়াতেমালার বর্ডার অবধি। এর মাঝখানে আপনাদের সেফ শেল্টার। এফ বি আই তো দূরের কথা, সি আই এর বাপেরাও খুঁজে বের করতে পারবে না আপনাদের। যাক গে, কথাবার্তা তো অনেক হল। সকাল থেকে তো কিছুই খাওয়া হয়নি আপনাদের!”



শোনামাত্র পেটে দাবানলের মতো একটা তীব্র জ্বালা অনুভব করলেন আমির খাদেম। সারা জীবনে এ রকমটা হয়নি কোনওদিন। সকাল থেকে অল্প দু’চার টুকরো প্যাকেটের শুকনো খাবার ছাড়া আর কিছুই পড়েনি পেটে। খিদের জ্বালা যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, টের পেলেন প্রথমবারের জন্য। সামনেই একটা আটচালা মতো। বাঁশের উপর খড়ের চাল। রং-পালিশবিহীন মজবুত কাঠের বেঞ্চি, কাঠের টেবিল আর কাঠের মেঝে। টেবিলে থরে থরে সাজানো স্যান্ডুইচ, ওমলেট, দুধ, ইয়োগার্ট, নানা ধরনের ফল, ফলের রস, বান, জ্যামলড এগ, রোস্টেড চিকেন, আরও কয়েকটা পদ। বড় বড় দুটো বোলে হাত ধোয়ার গরম জল। বলতে গেলে টেবিলের উপর এক রকম প্রায় ঝাঁপিয়েই পড়লেন আমির পরিবারের সবাই। ডাইভারদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল জোয়াকিম। “তোরাও গিয়ে কিছু খেয়েদেয়ে আয়। আর পোটারগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে যা।”

আদেশ পাওয়ামাত্র আটচালার পিছন দিকটায় একটা সরু জঙ্গুলে পথ ধরে চলে গেল লোকগুলো।

খাওয়া শেষে পকেটে থেকে বেনসন হেজস টুয়েন্টিজের প্যাকেটটা বের করে আমির খাদেমের দিকে বাড়িয়ে ধরল জোয়াকিম। নিজেও নিল একটা। ধরাল লাইটার জ্বেলো। তার পর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকাল আমিরের দিকে। “আপনাদের সেফ হাউসটা এখনও ঘণ্টাভিনেকের পথ। তাই মাঝপথে একটু রিফ্রেশমেন্টের বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম আর কী। চলুন তা হলে এ বার এগোনো যাক।”

“হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।” দেশ থেকে ওই দুঃসংবাদটা এসে পৌঁছানোর পর থেকে এই প্রথম কিছুটা স্বাভাবিক শোনাল আমির খাদেমের গলা। এই জোয়াকিম লোকটাকে তো মোটামুটি ভালই মনে হচ্ছে। অস্তুত বাকিগুলোর তুলনায়। সুন্দর চেহারা। মার্জিত ব্যবহার। ঝরঝরে আমেরিকান অ্যাকসেন্টে ইংরিজি বলে। এর তদারকিতে থাকাটা এই নরকে কিছুটা মন্দের ভাল ধরনের হবে বলে মনে হয়।

“লেট’স গো।” পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গাড়িগুলোর দিকে হাঁটা লাগালেন আমির খাদেম। পাশে জোয়াকিম। দু’কদম যেতে না যেতেই সিন্ধের শার্টের পকেটে বেজে উঠল আইফোনটা।

“এক্সকিউজ মি।” বলে কয়েক পা পিছিয়ে গেল জোয়াকিম। আর ঠিক তখনই ওকে টপকে দলটার পেছনে এসে দাঁড়াল দুই দেহরক্ষী। পরমুহর্তেই চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ‘ট্রা ট্রা ট্রা...’ গ্যারান্ড এম ফিফটিন থেকে ছুটে বেরোনো বাঁকে বাঁকে গুলি। ফিনকি দিয়ে বেরোনো রক্তের ফোয়ারা, ছিটকে যাওয়া ছিন্নভিন্ন মাংসখণ্ড, খুলির টুকরো, তীব্র মরণ আত্নানাদ...কী ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই বুলেটে বুলেটে বাঁঝরা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল আমির পরিবারের সবাই।

একটু পিছনে দাঁড়িয়ে তখন ভিডিও কলে জেফ আর সান্ডেজের সঙ্গে কথা বলছিল জোয়াকিম। মুখে সেই দেবদূত সুলভ হাসি। “কার্নিভালের ধামাকা শুনতে পাচ্ছে দোস্তরা? এখনদের এখনো পরবেপালবনে গরুভেড়া কাটার আগে খাইয়ে নেওয়া হয় ভাল করে। বুলেট খাওয়ার আগে এ গুলোকেও খাইয়েদাইয়ে নিয়েছি পেট ভরে। কোনও রকম খামতি রাখিনি...আরে, কে একটা ওখানে এখনো বাটরপটর করছে মনে হচ্ছে?” বলতে বলতে সামনে এগিয়ে গেল জোয়াকিম। লাশের স্তুপের মধ্যে আমিরের বড় ছেলে। বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ। তখনও থিরথির কাঁপছে ঠোঁট জোড়া। খুব অস্ফুটে বলতে চাইছে কিছু একটা। ঘোলাটে হয়ে আসা চোখের দৃষ্টি! দেবশিশুসুলভ হাসিটা ঝিলিক দিয়ে উঠল ঠোঁটে। কোমর থেকে লুগার নাইন এম এম পিস্তলটা বের করে খুব ঠান্ডা মাথায়ে ছেলেটার বুকে পা রেখে কপালের ঠিক মাঝখানে একটা গুলি করল জোয়াকিম। একটা ঝটকা খেয়েই স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

দেহরক্ষী দু’জনের দিকে ঘুরে তাকাল জোয়াকিম। “তোরা রয়েছিস, ডাইভার আর পোটারগুলোও আছে। দরকারে দলের আরও ছেলেছোকরাকে ডাক। প্রত্যেকটা বডি ছোট ছোট পিস করবি। পাঁচ কিলোমিটারের ঝিল, তাতে দুশোটার বেশি কুমির। আজ অ্যাক্কেবারে গ্রান্ড ফিস্ট। হেবিস জমে যাবে গোটা খেলটা। আর হ্যাঁ, শুধু আঙুলগুলো আলাদা করে রাখবি। মারিয়া বুড়িকে বলবি রাতে যেন হাঙ্ক আর মেডুসার রান্না মিশিয়ে দেয়।”

জিপে বসে থাকা কুকুরদুটোর মাথায়ে পরম আদরে খুব আলতো করে হাত বোলাল জোয়াকিম। তার পর এগিয়ে গেল একটু দূরে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো স্টেশন ওয়ানগনুলোর দিকে। প্রত্যেকটা গাড়ির পেছনের ডিকিতে ঠাসা ট্র্যাভেলিং স্টুকেস।

“খোলা।”

দু’জন দেহরক্ষীর মধ্যে এক জনের দিকে তাকাল জোয়াকিম। ছেলেটার কোমরের খাপে রাখা একটা প্যাঁচানো পুরু তারের টুকরো বা মাস্টার-কি। লক হোলে ঢুকিয়ে সুস্থ একটা মোচড়। খুট করে খুলে গেল লকটা। এল ই ডি টর্চের আলো পড়তেই ঝকঝক করে উঠল পুরো গাড়িটা। নীলকান্তমণি, পান্না, বসরাই মুক্তো, হিরে, আরও শ-কিসিমের রত্নখচিত কারুকাজের সব হার, নেকলেস, চুড়ি, বালা, অমূল্য জুয়েলারি কালেকশনে ঠাসা স্টুকেস।

“ওটা একটু দ্যাখ তো?” ডিকির এককোণে একটা স্টুকেসের দিকে আঙুল দেখাল জোয়াকিম। এগিয়ে গিয়ে ডালা খুলতেই থাক দিয়ে সাজানো আমেরিকান ডলারের বাস্তিল। প্রবল বিস্ময়ে সেদিকে তাকিয়ে রইল জোয়াকিম। “ফাকিং শিট! এত কিছু তো ওই শালা রাজা সেলোমেনের খাজনাতোও ছিল না!” সারাদিনে এই প্রথম দুটো গালাগালি বেরিয়ে এল অত্যন্ত সুভদ্র, মার্জিত ভ্রাগ ব্যারনের মুখ দিয়ে।

“বন্ধ কর ও দুটো। আর খোলার দরকার নেই।” দেহরক্ষী ছেলেটাকে নির্দেশ দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল জোয়াকিম।

আধো অন্ধকার ঘরটা। ঘাম, রক্ত আর পেছাপের বাঁঝালো উৎকট গন্ধে ভারী হয়ে আছে সুরতা সদর দফতরের লক-আপ। পরপর ছ’-ছ’টা চেয়ারে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে ছ’জনকে। প্রত্যেকের গলায় পরানো ছ’খানা হেভি বডি ট্রাকের টায়ার। থেকে থেকে টানা চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সিঙ্গেটিক পলিমার রুলের মার চলছে আগাপাশতলা। জ্ঞান হারালে স্বয়ংক্রিয় পিচকিরিতে তিরবেগে জল ছিটিয়ে জ্ঞান ফিরিয়েই ফের শুরু হয়ে যাচ্ছে মার। প্রায় কুড়ি জন সুরতা সেপাই পালা করে মেরে মেরে হাঁপিয়ে যাচ্ছে। তবু কারও মুখ থেকে একটি কথাও বের হচ্ছে না।

ঠিক ওই একই সময়ে দফতরের আর-একটা হলঘরে স্বদেশি বিদেশি অন্য সব কর্মচারীকে এক সঙ্গে বসিয়ে টানা জেরা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকেই এই অয়েল ফিল্ডের দীর্ঘদিনের কর্মচারী। সবাইই মোটামুটি একই জবাব। ওই লোকগুলো মাত্র মাসছয়কে হল এসেছে। কারও সঙ্গে দু’চারটে হুঁ হুঁ ছাড়া কথাই বলত না একদম, মেলামেশা তো দূরের কথা। প্রায় সারাক্ষণই গোড়াউনের এককোণে ওই ছোট ঘরটায় খুটখাট কী সব কাজকর্ম করত ওরা। আমির খাদেমের কোম্পানি। তারই বিমানে যাতায়াত করছে, অয়েল ফিল্ডেরই স্টাফ মেসে থাকে, ফলে লোকগুলোর আচার-আচরণ একটু অন্যরকম লাগা ছাড়া আলাদা করে কোনও সন্দেহ জাগেনি কারও মনে।

ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে সুরতা অফিসারদের জেরার মুখে সবাই বয়ান শুনছিলেন হাবিবি। দফতরে আসার পর থেকে এই ঘর আর লক-আপ টানা চরকিপাক খেয়ে বেড়াচ্ছেন, কোথাও এতটুকু কোনও সূত্র পাওয়া যায়নি এখনও পর্যন্ত। আমির ফাতাহি অয়েল ফিল্ড থেকেই সোজা চলে গেছেন সুলতানের প্রাসাদে। পুরো আমিরিয়তের জরুরি মিটিং চলছে সেখানে। এ সব ভাবনাচিন্তার মাঝখানেই বেজে উঠল মোবাইল। কানে তুলতেই ও প্রান্তে আমির ফাতাহির গলা, “কোনও ইনফরমেশন?”

“নাঃ!” হতাশ শোনাল হাবিবির গলা। “নিয়ে আসার পর থেকে টানা থার্ড ডিগ্রি চলছে, একটা কথাও বার করা যায়নি কারও মুখ থেকে।”

“ওই থার্ড ডিগ্রিটা আপাতত বন্ধ রাখুন। মরেটরে গেলে সোর্সগুলোও নষ্ট হয়ে যাবে। সেফ কাস্টিডিতে পাঠান ওগুলোকে। আর হ্যাঁ, কাল ঠিক সকাল দশটায় প্যালেসে প্রেস কনফারেন্স ডেকেছেন হিজ হাইনেস। ওনার তরফ থেকে প্রেস মিট করব আমি। আপনি আর কয়েকজন এমিরেটস মেম্বরও থাকবেন। তার পরই সুলতান টিভি-তে ভাষণ দেবেন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে। ও দুটোর ব্যবস্থা করা দরকার সবার আগে।” ও প্রান্তে কেটে গেল লাইনটা।

সকাল দশটা। দেশি-বিদেশি সাংবাদিক আর আর টিভি চ্যানেলের ভিড়ে ঠাসা সুলতান আবু বিন হাশেমের প্রাসাদের প্রেস কনফারেন্স রুম। দেশটা ছোট হলেও বিপুল তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে আন্তর্জাতিক মহলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের নজর এসে পড়েছে দেশটার উপর।

অসংখ্য টিভি ক্যামেরার ভয়েস সাউন্ড ক্যাচার গ্যাজেট, ক্যামেরার জুম লেন্স আর সাংবাদিকের চোখের সামনে লম্বা টেবিলটার উপর দু'হাতে ভর দিয়ে ঈষৎ ঝুঁকে বসে রয়েছেন আমির ফাতাহি। দু'পাশে আমিরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ আরও কয়েকজন সদস্য। একধারে সুরতা প্রধান আল হাবিবি।

টেবিলে একটু সোজা হয়ে বসলেন ফাতাহি। দু'পাশে চোখ চালিয়ে একবার দেখে নিলেন ভিড়টাকে। তার পর বলা শুরু করলেন ধীর গলায়। “আসসালামআলেইকুম প্রিয় বন্ধুরা, যেটা জানানোর জন্য আপনাদের সবাইকে এখানে ডেকেছি, খবর হিসাবে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, শুধুমাত্র এ দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, বর্তমানে সারা বিশ্বজোড়া জটিল পরিস্থিতিতেই এর গুরুত্ব অপরিসীম বলেই মনে করছি আমরা।” এক মুহূর্ত থামলেন ফাতাহি। তার পর ফের যখন বলা শুরু করলেন তখন আরও গম্ভীর হয়ে গেছে কণ্ঠস্বর। “আপনাদের সবাই এই জানা যে এ দেশে কয়েকটা অয়েল ফিল্ডের মালিকানা আমাদের হিজ হাইনেসের সহোদর ভাই আমেরিকা-প্রবাসী আবু বিন খাদেমের কোম্পানির হাতে। অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে গত পরশু রাতে সেই গোড়াউনগুলোর একটা থেকে পঞ্চাশ কেজির উপর পিওর হোয়াইট কোকেন উদ্ধার হয়েছে।” শোনামাত্র প্রবল বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল বিশাল কনফারেন্স হল জুড়ে।

“এ রকম সিরিয়াস একটা ম্যাটার, যে দেশ থেকে এই ড্রাগ এসেছে তাদের, মানে বলতে চাইছি, এ ব্যাপারে রিলেটেড ইউ এস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে কি?” কথার মাঝখানেই প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন নামী এক ইউরোপীয় টিভি চ্যানেলের এক মহিলা সাংবাদিক।

“অবশ্যই,” মহিলার দিকে তাকালেন ফাতাহি। “দেখুন মাদাম, এই গোটা মিডল ইস্ট কভার করার সুবাদে আপনি ভালভাবেই জানেন যে আমাদের দেশে ক্রাইম রেট অতি নগণ্য। বিশেষভাবে ড্রাগের ব্যাপারটা তো জাস্ট বিয়ন্ড থট অব আস। ফলে সেট আপ তৈরি, নারকোটিক কেমিক্যাল টেস্ট...এ সব আরেক্স করতে সময় অনেকটা বেশি লেগেছে। আর সেটা পজিটিভ হওয়ামাত্র আমরা যোগাযোগ করেছি ওদের সঙ্গে। আর পাশাপাশি আপনাদেরও ডেকে পাঠিয়েছি।”

“এখনও পর্যন্ত কাউকে ডিটেন্ট করা গেছে কি?” এ বার প্রশ্নটা এল আন্তর্জাতিক স্তরে বিখ্যাত একটি আরব চ্যানেলের এক সাংবাদিকের কাছ থেকে।

এককোণে বসে থাকা হাবিবির দিকে তাকালেন ফাতাহি। “জবাবটা আমিই দিচ্ছি।” তড়িঘড়ি বলে উঠলেন সুরতা চিফ। “এখনও পর্যন্ত মোট ছ'জন সাসপেক্টকে অ্যারেস্ট করতে পেরেছি আমরা। তারা কেউই আমাদের দেশের নয়। বাট ইন্টেলিভ ইনভেস্টিগেশন ইজ গোয়িং অন।”

বলা শেষ হতে না হতে একঝাঁক প্রশ্নবাণ ছুটে এল হাবিবির উদ্দেশে।

“এনি ফ্লু?”

“স্যর, কোনও তথ্য পাওয়া গেল কি?”

“গট এনি ভাইটাল ইনফরমেশন ফ্রম দেম?”

জবাবে মাথার উপর হাতদুটো তুললেন সুরতা প্রধান। “প্লিজ, বি কোয়ায়েট। তদন্ত এখনও চলছে। সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা সম্ভব না। সো প্লিজ ওয়েট ফর ফিউ ডেজ। কোনও রেজাল্ট এলেই আপনাদের জানাব সঙ্গে সঙ্গে।” আরও কিছু ক্ষণ তুমল হট্টগোল চলার পর একসময় শেষ হল প্রেস মিট।

কনফারেন্স হলের পিছনে নিজের ব্যক্তিগত ছোট ঘরটায় পারিষদদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন সুলতান আবু বিন হাশেম। ওরা এসে পৌঁছোতেই সবার সঙ্গে বেরিয়ে করিডর ধরে হাঁটছেন, হাতের মুঠোয় বেজে উঠল আইফোনটা। কানে তুলতেই লাইনের ওপারে বোসের গলা। “জনাব ফাতাহির কনফারেন্স দেখলাম টিভিতে। আমি কি

রওয়ানা দেব, ইয়োর হাইনেস?”

“নো, নো, মাই ডিয়ার। নো নিড টু হারি। আই হোপ, উই কুড হ্যান্ডেল দিস স্মল প্রবলেম। তবে আজও তুমি আমাদের এই ছোট দেশটাকে এত ভালবাসো জেনে খুব ভাল লাগল। প্রয়োজনে অবশ্যই জানাব, টেক কেয়ার মাই ফ্রেন্ড।” জবাবে বললেন সুলতান।

“ইউ টু।” ওপারে কেটে গেল লাইনটা।

করিডর থেকে বেরিয়ে এসে বাগানে বিশাল রঙিন ছাতাটার নীচে বসলেন সুলতান। দেখা দেখি বাকি আমিররাও। একটু আগেই শেষ হওয়া প্রেস কনফারেন্সই এই মুহূর্তে তাঁদের মূল আলোচ্য। এ সবার মধ্যেও ভুরুজোড়া ঈষৎ কুঁচকে রয়েছে আরব নৃপতির। বোস আসতে চেয়েছিল। ও এলে যে তিনি নিজে কতটা নিশ্চিত হতেন, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু ও রকম ভয়ঙ্কর একটা লড়াইয়ের চোট...অতগুলো বুলেট ইনজুরি! সে সবার রেশ কাটতে না কাটতেই...তার উপর ওই আফ্রিকান মেয়েটা... শুনেছেন, দে হ্যাভ সাম সিরিয়াস রিলেশন। এই অবস্থায় শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভেবে... নাঃ, এটা কিছুতেই হতে পারে না! মনের মধ্যে নিজেকে তীব্র ঝাঁকুনি দিলেন সুলতান। তার পর চেয়ারে সোজা হয়ে বসে বাকিদের সঙ্গে যোগ দিলেন আলোচনায়। দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিতে হবে আর কিছু ক্ষণের মধ্যেই।

ফোনটা ছেড়ে গুম মেরে দাঁড়িয়েছিল তুর্ঘ্য। পাশে দাঁড়ানো সাবা। “হোয়াট হ্যাপেন্ড, বোস?” প্রশ্ন করল উদ্বিগ্ন গলায়।

“হিজ হাইনেস তো না বলে দিলেন!” হতাশ শোনালো তুর্ঘ্যর গলা, “বাট হোয়াট ইউ নো সুইটহাট? কেন জানি না মনে হচ্ছে এখুনি ওখানে আমাদের দু'জনের যাওয়াটা খুব জরুরি ছিল। হিজ হাইনেস ইজ ইন নিড। আমাদের খুব দরকার ছিল সুলতানের।”

“কাম অন বাড়ি।” ভারী হাতের পাঞ্জা দিয়ে তুর্ঘ্যর পিঠে সন্মুখে একটা থাবড়া মারল সাবা। “আই থিংক, হিজ হাইনেস অ্যান্ড হিজ মেন আর কোয়াইট কেপেবল টু হ্যান্ডেল দিস আর সতিই প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই ডেকে পাঠাবেন। চলি, আই হ্যাভ সো মেনি ওয়ার্ক লেফট টু বি ডান।” বলতে বলতে বিশাল শরীরটা নিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে চলে গেল মাটি ধপধপিয়ে। তার পরও অনেক ক্ষণ ফ্র-জোড়া ধনুকের মতো কুঁচকেই রইল তুর্ঘ্য।

ঠিক ওই একই সময় বেভারলি হিলস আর মায়ামিতে আমির খাদেমের বিশাল ভিলা আর ভুল্পে জুড়ে যেন একটা ঝড় বয়ে যাচ্ছিল। প্রতিটি ঘর, বাগান, লন, এক এক ইঞ্চি জমি জুড়ে চলছিল চিরুনি তল্লাশি। এফ বি আই আর পুলিশের গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ পুরো চত্বর। নূনতম সূত্র পাওয়া যেতে পারে এ রকম সবাইকে হেফাজতে নিয়ে তোলা হচ্ছিল গাড়িতে।

প্রায় ঘণ্টাছয়ক পর দীর্ঘ তল্লাশি সেরে আমির খাদেমের মায়ামির বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন এফ বি আইয়ের ইনভেস্টিগেটিং টিমের প্রধান স্টিভেন অ্যাটকিনস। সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে ধেয়ে গেল সাংবাদিকরা। হাত তুলে তাদের নিরস্ত করলেন অ্যাটকিনস। “প্লিজ মাই ফ্রেন্ডস, লিসন মি কেয়ারফুলি। ইনভেস্টিগেশন এখনও একেবারে প্রাইমারি স্টেজে। তবে একটা মোস্ট ইম্পোর্ট্যান্ট ইনফরমেশন। আমির খাদেম বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্যকে এখানে অথবা বেভারলি হিলস, কোনও ঠিকানাতেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।”

“আর দে অ্যাবস্কন্ডিং?” চেষ্টা করে উঠল অনেকগুলো গলা। “সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। আগেই বলেছি ইনভেস্টিগেশন এখন একদম প্রাইমারি স্টেজে রয়েছে। ফলে এখনই কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে। ফারদার কোনও মুভমেন্ট হলে অবশ্যই জানাব আপনাদের। বাই দেন!” বলেই গাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন অ্যাটকিনস।

গুয়াতেমালার সীমান্তবর্তী মেক্সিকোর গভীর জঙ্গল। বিশাল বিশাল সব সাইপ্রেস গাছের ডালপালার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো প্রায় ঢুকতেই পারে না বলা চলে। ফলে একটা আধো অন্ধকারের পরিবেশ

সর্বত্র। “আউউউ...” দূর থেকে ভেসে আসছে হাউলার মাক্সির ডাক। ফ্লাইক্যার, রবিন আর নাইটজার পাখিদের ওড়াউড়ি, কিচিমেচি উচুতে, গাছের ডালে ডালে। একটু দূরে প্রাচীন মায়া সভ্যতার স্থাপত্যের একটা বিশাল ভগ্নস্তূপ। সারা গা জুড়ে গজিয়ে ওঠা শ্যাওলা, মস আর ফার্নের ঘেরাটোপের ফাঁকে ফাঁকে দু’চার টুকরো কারুকাজ উকিঝুঁকি মারছে এখনও, স্থাপত্যের গায়ে।

টিবিটার ঠিক পিছন দিকেই বাঁশের তৈরি লম্বা একটা ব্যারাকবাড়ি মতো। একটা কটু গন্ধ ভেসে আসছে বাড়িটার ভেতর থেকে। সাব মেশিনগানধারী চার জন পাহারাদার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে পুরো চত্বরটা জুড়ে। একটানা লম্বা ঘরটায় ঢোকার মুখেই একপাশে ডাই করে রাখা বস্তা বস্তা কোকা পাতা। বেশ কয়েকটা জ্বলন্ত বার্নার। কোকা পাতা থেকে রিফাইন্ড কোকেন, ধাপে ধাপে প্রসেসিং হচ্ছে। দশ-বারোজন লোক গলদঘর্ম হয়ে কাজ করে চলেছে একটানা।

বাড়িটার ঠিক ডান পাশে হাতদশেক দূরে কুড়িখানা মজবুত পাকা বাঁশের উপর বানানো একটা কাঠের চারচালা আর তারও উপরে একটা চিলেকোঠা ধরনের ছোট ঘর। ওঠার জন্য চওড়া বাঁশের সিঁড়ি। চারচালার মাঝখানে পাতা বেশ বড় আকারের মজবুত একটা কাঠের গোল টেবিল। মাঝখানে স্থানীয় ওয়াইন, টাকিলা আর সিঙ্গল মল্টের বেশ কয়েকটা বোতল, প্রচুর পরিমাণে সেকো মাংস আর ফলমূল।

টেবিলের চার পাশ ঘিরে বসা জেফ জনসন, দিয়েগো সাঞ্জেজ, সঙ্গে আরও দু’জন। মারিও সিলভা আর রবার্তো মন্টানা। সম্ভবতঃ দু’জনেই। মারিও দীর্ঘকায়। খড়্গানাসা। একমাথা ঠাসা নুন গোলমরিচ চুল। হাড়েমাসে চেহারা। আদিতে মেক্সিকো সান ক্রিস্টোবালের বাসিন্দা। মারিওর কৈশোরেই সীমানা পেরিয়ে মার্কিন মূলকে চলে গেছিল ওর পরিবার। ওখানে লাতিন আমেরিকান ডাউনটাউনে খুচরো ড্রাগ পেডলারের কাজ করত ওর বাবা। বাবার হাত ধরেই ড্রাগের ধান্দায় হাতেখড়ি হয় মারিওর। তবে ওই অতটুকু ক্ষুদ্র গম্ভির মধ্যে আটকে থাকার বান্দা ছিল না ও। তার পর সে এক ভয়ানক হিংস্র উখানের ইতিহাস। অনেক রক্তমাখা পথ পেরিয়ে এতটা উপরে উঠে আসতে হয়েছে ওকে। আজ কিউবান-মেক্সিকান কার্টেলে মেক্সিকান শাখার সর্বোচ্চ নেতার আসনটা মারিওর।

অন্য দিকে রবার্তো মন্টানা। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা। মাথাজোড়া চকচকে ঢাক। সরু গাউফ। চেহারায় সর্বদা একটা হাসিখুশি ভাব। যাটের দশকে ফিদেল কাস্ত্রোর তাড়া খেয়ে কিউবা ছেড়ে যারা মায়ামিতে পালিয়ে এসেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম রবার্তোর পরিবার। তবে রবার্তোর উখানের পথটা কখনোই মারিওর মতো কাঁটা-বেছানো ছিল না। কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেওয়ার আগেই মায়ামিতে কিউবান গ্যাঙের সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল রবার্তোর বাবা রেমো “ক্র্যাকশট” মন্টানা। পরবর্তী কালে মেক্সিকান আর ব্ল্যাক আমেরিকান কার্টেলের সঙ্গে সিভিকলে গড়ে তোলার অন্যতম স্থপতিও রেমো। আর এই মুহূর্তে বাকি তিন জনের মতো উসখুস করছিল রবার্তোও। কারণ যার ডেরায় এই জরুরি মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে, খোদ সেই জোয়াকিমই অনুপস্থিত এখনও পর্যন্ত।

এইসব চিন্তাভাবনার মাঝখানেই জঙ্গলের ভেতরে একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ। মিনিটদুয়েক বাদে জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল জোয়াকিম। বাঁ কাঁধে মোটা চামড়ার খাপের উপর নখ আঁকড়ে বসে থাকা বিশালকায় একটা গোল্ডেন ইগল। জোয়াকিমের ডান পাশে একটা অল্‌বয়সি ছেলে। ফর্সা টুকটুকে, মাখনের মতো নরম, কোমল শরীর। গাঢ় লিপস্টিক ঠোঁটো। এক কানে হিরের দুল। নীলরঙা চুল। ঝুঁটি পনিটেল। স্কিন টাইট স্ল্যান্স আর খুব খাটো একটা পাতলা টপ পরনে। হাঁটার ভঙ্গিতে নারীসুলভ ছাপ সুস্পষ্ট। ডান হাতে ছেলেটার কোমর জড়িয়ে ধরে রয়েছে জোয়াকিম। মুখে উজ্জ্বল সেই দেবশিশুসুলভ হাসি। “থর,” মাচার সামনে এসে ঘাড় তুলে ইগলটার দিকে তাকাল জোয়াকিম, “গো টু ইয়ার ওন গ্লেস।” শোনামাত্র বিশাল দুই ডানা মেলে সামনে সাইপ্রাস গাছটার ডালে গিয়ে বসল ইগলটা। ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে উপরে উঠে এল জোয়াকিম। তার পর দীর্ঘ গভীর একটা চুমু খেল

ছেলেটার ঠোঁটে। তার পর নিতম্বে আলতো একটা চাপড় মেরে বলল, “গো টু আপস্টেয়ার্স, সুইটহার্ট। টেক সাম রেস্ট। খুব জরুরি একটা মিটিংয়ে বসছি আমি। সো, নো ফোন কল, নো ডিসটার্বেন্স। ও কে?”

“ও কে, ডার্লিং!” মুচকি হেসে কোমর দুলিয়ে তিনতলায় উঠে গেল ছেলেটা। সামনে এগিয়ে এল জোয়াকিম। “সরি ফ্রেন্ডস, একটু দেরি হয়ে গেল। আসলে ফ্রান্স থেকে এক জন বায়ারের ফোন এসেছিল। তাই...” বলতে বলতে কাঁধ থেকে চামড়ার খাপটা খুলে বসে পড়ল চেয়ারে।

“গুড মর্নিং এভরিওয়ান,” একটা হাভানা সিগার ধরিয়ে প্রথম বলা শুরু করল রবার্তো মন্টানা। ছোটখাটো চেহারা কিন্তু বেশ ভারী, অত্যন্ত ব্যক্তিত্বপূর্ণ কণ্ঠস্বর। “এখানে উপস্থিত আমরা প্রত্যেকেই জানি, ঠিক কী কারণে আমাদের সবাইকে এভাবে একত্রিত হতে হয়েছে। সুলতান আবু বিন কাশেমের দেশে ওর ভাই আমির খাদেমের অয়েল ফিল্ডকে ব্যবহার করে গোটা মিডল ইস্টে ধান্দা ছড়ানোর প্ল্যানটা যে আপাতত বেশ ভালরকম মার খেয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কার দোষে, কী কারণে অয়েল ফিল্ডে স্টক রাখার খবরটা লিক হয়েছে সে আলোচনায় ঢোকার আগে আমার মনে হয় এর ফলে সিভিকলেটের কতখানি লোকসান হয়েছে সেগুলো এক এক করে খতিয়ে দেখা দরকার।” নিভে যাওয়া সিগারটা লাইটার জ্বলে ধরিয়ে ফের বলা শুরু করল রবার্তো। “ফার্স্ট অব অল, সিদ্ধ অব আওয়ার মোস্ট এফিশিয়েন্ট গ্যাং মেম্বারস হ্যাভ গট অ্যারেস্টেড। ওখানকার পুলিশ, পরে এফ বি আইয়ের লোকজন গিয়ে দিনের পর দিন জেরা চালিয়েছে, থার্ড ডিগ্রি মেথডের কোনওটাই অ্যাপ্লাই করতে বাকি রাখেনি ওদের উপর। কিন্তু এতকিছুর পরও আমাদের ছেলেদের কারও মুখ থেকে একটা কথাও বার করা যায়নি। দে আর রিয়েলি হার্ড নার্টস টু ক্র্যাক। বাট মোস্ট আনফরচুনেটলি স্ক্রিটটা আটকানো যায়নি।” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রবার্তো। “মায়ামি আর বেভারলি হিলসে আবু খাদেমের দুই ডাইভার আর ম্যানেজারকে জেরা করে ওখানকার দুটো রিসর্টের সি সি টিভি থেকে আবু খাদেমের সঙ্গে জেফ আর সাঞ্জেজের ছবি পেয়ে গেছে ওরা। যার ফলে আমাদের সবাইকে স্টেটস থেকে অব্যবস্কৃত করে এখানে এসে সেক্ষেত্র হাউসে থাকতে হচ্ছে।” ক্লান্ত চোখে একবার সবার দিকে তাকাল রবার্তো। “বাট এইসব ওঠাপড়া, বলা ভাল প্রফেশনাল হাজার্ডস লেগেই থাকে আমাদের ধান্দায়। আসলে সেটার চেয়ে কার্টেলের অনেক, অনেক বেশি লোকসান হয়েছে ইনভেস্টমেন্ট ফিল্ডে। অতখানি ইম্প্যাক্ট একটা কনসাইনমেন্ট ধরা পড়ে গেছে। শুধু ধরা পড়াই নয়, ওই ছোট দেশটাকে স্টকিং পয়েন্ট অ্যান্ড ট্রানজিট জেন হিসেবে কাজে লাগিয়ে গোটা মিডল ইস্টে ধান্দাটা ছড়িয়ে দেওয়ার যে খোয়াবটা আমরা দেখেছিলাম, ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে সেটাও। আগামী বেশ কয়েক বছর ওই টোটাল জোনটায় আমরা কোনও রকম বিজনেস রান করতে পারব না। হুইচ ইজ রিয়েলি আ ডিজাস্টার টু আস, বেটার টু সে ফর আওয়ার কার্টেল।” ক্লান্ত স্বর আরও ক্লান্ত শোণাল বয়স্ক কিউবান ড্রাগলর্ডের।

রবার্তোর পাশে বসা মারিও সিলভা। অন্ধকারজগতে তার বহু দিনের সঙ্গী। আলতো করে হাতটা রাখল রবার্তোর কাঁধে। “ইউ আর লুকিং টায়ার্ড, মাই ফ্রেন্ড। নাও প্লিজ অ্যালাও মি টু সে সামথিং।” তার পর সোজা চোখে তাকাল বাকি তিন জনের দিকে। বলা শুরু করল কড়কড়ে কাঁকর-চেবানো গলায়। “কার্টেলের ধান্দায় কতটা লোকসান হয়েছে সেটা রবার্তো বলল সবাইকে। আমাদের বয়েস হয়েছে। দু’জনেই যাকে বলে, অলমোস্ট অন দ্য ভার্জ অব রিটায়ারমেন্ট। সে ফ্রেড্রে তোমাদের কাছেই জানতে চাইছি তোমরা ব্যাপারটা নিয়ে কী ভাবছ?”

জবাবে উল্টোদিকে বসা তিন জনের মধ্যে প্রথম মুখ খুলল জেফ। “এতবড় লোকসান অবশ্যই বিশাল একটা ডিজাস্টার। বাট নাথিং ডুয়িং, সেটাকে হার্ড রিয়ালিটি, আই মিন বিজনেসে ওঠাপড়া হিসেবেই ধরে নিতে হবে আমাদের। আর সবার আগে ওখানকার জেল থেকে যে কোনওভাবে বের করে আনতে হবে আমাদের ছেলেগুলোকে। অ্যাট এনি কস্ট। আরবি সুরতা, সি আই এ, এফ বি আই, ওই শালাদের প্র্যাকটিসের স্যান্ডব্যাগ হতে দিতে পারি না আমরা ওদের। নেভার!”

“রাইট!” পাশ থেকে টেবিল চাপড়ে বলে উঠল সাঞ্জেজ। “এখানকার

নিউজ চ্যানেলগুলোর খবরে যা জানতে পাচ্ছি, ওদের হেফাজতে নিতে সুলতানের কাছে অ্যাপিল করেছে ইউ এস গভর্নমেন্ট। ও দেশের সঙ্গে প্রিজনার এক্সচেঞ্জ ট্রিটি রয়েছে মার্কিনদের। তাই আর এতটুকুও সময় নষ্ট না করে এখনই ওখান থেকে বের করে আনতে হবে আমাদের ছেলেগুলোকে।” শোনামাত্র টেবিল চাপড়ে প্রবল সমর্থন জানাল সবাই। ব্যতিক্রম শুধু জোয়াকিম। মাথা নিচু করে টেবিলের কাঠ খুঁটে চলেছিল ফল গাঁথার একটা কটা দিয়ে।

“হোয়াটস আপ প্যাল? ডোন্ট ইউ এগ্রি উইথ আওয়ার পয়েন্ট?” জোয়াকিমের কাঁধে একটা আলতো চাপড় মেরে প্রশ্ন করল পাশে বসা সাফেজ। জবাবে ধীরে মাথা তুলল জোয়াকিম। মুখে সেই বকবকে হাসি। “বিস্ময় বন্ধু, বিস্ময়! আমরা কিউবান-মেক্সিকান আর আফ্রো-আমেরিকান ড্রাগ কার্টেল। দোদুপ্রতাপ রাশিয়ান মাফিয়ারা পর্যন্ত সমঝে চলে আমাদের, সেই আমরা বদলা নেব না!... হাতে ধরে বসে থাকব ঘরে! শুধু ছেলেগুলোকে বের করে এনেই ডিউটি খালাস? এর পরও সারা দুনিয়ার আন্ডারওয়ার্ল্ডে কোনও ইজ্জত থাকবে আমাদের? কী মনে করো তোমরা?”

“তুমি কী মনে করো? সেটাই তা হলে বলো আমাদের।” জোয়াকিমের চোখে চোখ রেখে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল বৃদ্ধ ডন মারিও সিলভা। “আমাদের ছেলেগুলোকেও রেসকিউ করব আর একইসঙ্গে ওই শালা সুলতান আর ওর রাইট হ্যান্ড, দ্যাট বাস্টার্ড আমির ফাতাহি!” দাঁতে দাঁত ঘষল জোয়াকিম, “দুটোকেই যমের দক্ষিণ দুরার দেখিয়ে দেব, অ্যাট দ্য সেম টাইম। ইয়েস, আই ডু মিন ইট! কেউ ভুলে যেয়ো না, যারা আমাদের ধান্দার ক্ষতি করবে উই মাস্ট ডেস্ট্রয় দেম! যুগ যুগ ধরে একটা প্রথার মতো এটা চলে আসছে আমাদের মধ্যে। অ্যান্ড ইটস আওয়ার ফ্যামিলিজ ওয়ে অব লাইফ।” সদাসর্বদা মুখে লেগে থাকা হাসিটা অন্তর্হিত এই মুহূর্তে।

“ওকে, জোয়াকিম। নাউ ইউ টেল আস, অতদূরের একটা দেশ, বলতে গেলে আমাদের অ্যাকশন জোনের একদম বাইরে, সেখানে এক সঙ্গে এ রকম দুটো টাফেস্ট মিশন... হু উইল টেক দ্যাট?” ঙ্ক কুঁচকে প্রশ্ন করল জেফ।

“নেবে বন্ধু, নেবে।” বকবকে হাসিটা ফিরে এসেছে জোয়াকিমের মুখে। “নেওয়ার লোক আছে...সাহারার শেষপ্রান্তে ওই দেশটা। ওখানকার মুরিশ ট্রাইবালস। ইকুয়ালি ডেডলি অ্যান্ড নটোরিয়াস। এই টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরিতেও ওখানে দাসব্যবসা চলে। সাড়ে সাতশো থেকে দেড় হাজার ইউ এস ডলারে বিক্রি হয়ে যায় সোমালিয়া, রোয়ান্ডা, বারকিনা ফাসো, আইভরি কোস্টের কালো কালো মেয়েমরদ। ইটস আ গড ফরবিডন কান্ট্রি। মালি, টিম্বাকটু, মাইল-কে-মাইল দুর্গম মরুভূমি পেরিয়ে আমি গিয়েছিলাম ও দেশে। বেমনতলব খতরনাক সব লোকজন। পয়সার জন্য যে-কোনও কাজ করতে পারে ওরা। এল চ্যাপো কার্টেলে কাজ করার সময় আমাকে একবার পাঠানো হয়েছিল ওখানে। দুবাইয়ে একটা কাজের ব্যাপারে ওদের সঙ্গে কথা বলতে। কাজটা নিখুঁত নামিয়ে দিয়েছিল ওরা। সো, কিপ ফেথ অন মি। আই উইল গেট দ্য জব ডান।”

জোয়াকিমের কথা শেষ হওয়ার পর মিনিটখানেক চুপ করে রইল সবাই। সেই নিস্তব্ধতা ভাঙল রবার্টোর কথায়, “ওকে। জোয়াকিম যখন এতটাই কনফিডেন্টলি বলছে তখন ওর কথাতেই ভরসা করা যাক। আর এটা তো আমাদের পরিবারগুলোর প্রাচীন প্রথা। ধান্দার সর্বনাশ কেউ করলে শাস্তি তাকে পেতেই হবে। তবে একটা কথা সব সময় মনে রাখবে জোয়াকিম।” জোয়াকিমের চোখে চোখ রাখল রবার্টো। “ওই আবু খাদেম আর তার পরিবারের লোকজনরা আমাদের কাছে ভারবোঝা হয়ে গেছিল, ওদের বেশি দিন বয়ে বেড়ানোটা আমাদের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াত, এ সবই ঠিক কিন্তু তার জন্য ওদেরকে ও রকম একটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর কায়দায়...না না, কাজটা মোটেই ঠিক হয়নি। ওরা কেউ সরাসরি জেনেশুনে আমাদের কোনও ক্ষতি করেনি। পরিস্থিতি সেদিকে চলে গিয়েছিল মাত্র। এ ক্ষেত্রে অনেক পিসফুল লিকুইডেট করে দেওয়া যেত ওদের। তা না করে এভাবে...শুধু নিজের শখ মেটানোর জন্য...ইটস নট জাস্ট ওনলি ননসেন্স, অ্যাবসলিউটলি মিনিংলেস টু।” বলতে বলতে উত্তেজিতভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রবার্টো। “এন্ড অব দ্য ডে উই

আর গ্যান্স্টারস, নট আ ম্যানিয়াক বুচার। কথাটা আমাদের সবার মনে রাখা দরকার।”

রবার্টোর পাশে মারিও। হাতে হাত রাখল কার্টেলে দীর্ঘদিনের সঙ্গী। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ল রবার্টো। উল্টোদিকে বসা তিন জনের দিকে তাকাল মারিও। “রবার্টো ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। কাউকে এলিমিনেট করতে যতটুকু করা দরকার ঠিক ততটুকুই করতে হবে, নট আ সিঙ্গেল স্টেপ মোর। কার্টেল কারও পার্সোনাল প্লেজার ফুলফিল করার জায়গা নয়। আর ধান্দায় সুলতানের দেশে সিভিকিটের যা লস হয়েছে সেটা অনেকটাই রিকভার করা গেছে আমির খাদেমের কাছে পাওয়া ক্যাশ আর জুয়েলারি থেকে। ফলে ও নিয়ে অথবা মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। অ্যান্ড অ্যাম কোয়াইট সিওর,” আরও গম্ভীর শোনাল মারিওর গলা, “আসল ধাক্কাটা আসবে জোয়াকিম ডিলটা পাকা করে ফিরে আসার পর। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে তার জন্য। এক সঙ্গে নয় অথবা একজায়গায় কখনোই নয়, মেক্সিকো ছাড়াও গুয়েতেমালা, কোস্টা রিকার সেফহাউসগুলোয় ছড়িয়ে পড়তে হবে সবাইকে। ধান্দা চলবে এ পার থেকে। যতদিন না স্যাম আফেলদের দেশে হাওয়া ঠান্ডা হয়। ওকে? নাউ, লং লিভ কার্টেল!” টেবিলে রাখা রেড ওয়াইনের গ্লাসটা উপরে তুলে ধরল মারিও। দেখা দেখি বাকি সবাই।

টিম্বাকটু। আফ্রিকার এল ডোরাদো। হাজার হাজার বছর আগে সম্রাট কানকানের শাসনকালে সোনা বিছানো থাকত সাহারার এই প্রাচীন জনপদের বালুতে। এই প্রবাদ বা মিথের উপর ভিত্তি করে যাট, সত্তর, আশি এমনকী নব্বই দশকের শেষভাগ পর্যন্ত অসংখ্য ইউরোপীয় অভিযাত্রী সোনার আকর্ষণে ছুটে আসত টিম্বাকটুতে। এ ছাড়াও পর্যটকদের আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল এখানকার অসামান্য সব প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপত্য। বর্তমানে ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদ আর জাতিদাঙ্গায় বিদীর্ণ সাহারা মরুভূমির এই ক্ষুদ্র জনপদ। ফলে পর্যটকদের আনাগোনার পাটও বলতে গেলে চুকেই গেছে প্রায়।

ম্ল্যাব পাথরের পুরনো একটা সরাইখানায় মুখোমুখি বসা জোয়াকিম আর রশিদি। সামনে টেবিলে পোড়ামটির কাপে কাপে রাখা ঘন উটের দুধের কফি। রশিদি ওসোমানু। মুর জনজাতির একটা গোষ্ঠীর অধিপতি। দীর্ঘকায়। লোহার মতো পেটা চেহারা মধ্য পঞ্চাশেও। চ্যাটালো চওড়া কজ্জি। সসেজের মতো মোটা মোটা আঙুল আর পোড়া তামাটে গায়ের রং। বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ নাক আর বড় বড় একজোড়া চোখ। কপালের ডান পাশ থেকে চোয়াল অবধি নেমে যাওয়া গভীর একটা কাটা দাগ। নিচু গলায় কথা বলছিল দুজন। দুজনেরই গায়ে চড়ানো ঢোলা বেদুইন জোকা। দিনের বেলায় ভয়াবহ গরম, রাতে হু হু করে নেমে যাওয়া তাপমাত্রা আর থেকে থেকেই মরুঝড়, এই তিনের হাত থেকে বাঁচতে সর্বক্ষণ এই জোকাবাই ভরসা উষর, রুক্ষ এই মরুপ্রান্তরে।

সরাইখানায় ওদের জানলার ধারে টেবিলটার পাশে রাস্তা ধরে চলে যাচ্ছিল উটের সারি। কুঁজের দু’পাশে ঝোলানো পাথুরে নুনের চাণ্ড আর খেজুরের বস্তা। প্রায় পর্যটকশূন্য হয়ে যাওয়ার পর এই দুই-ই আয়ের মূল উৎস টিম্বাকটুর মানুষের। উটগুলোর গলায় বাঁধা ঘণ্টার টুংটাং, সম্মিলিত খুরের শব্দ আর চালকদের হাঁকডাকে কান পাতা দায়। হাতখানেক দূরের কথাবার্তাও শোনা প্রায় অসম্ভব। এ রকম পরিবেশই সবসময় পছন্দ জোয়াকিমের। গোপনীয়তা বজায় রাখতে এর বিকল্প নেই।

দীর্ঘ আলোচনা শেষ হল একসময়। স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী একে অন্যের গালে হাত ছোঁয়াল দু’জনে। যার একটাই অর্থ, দ্য ডিল ইজ ডান। টেবিলের নীচে রাখা সফট লেদার ব্যাগটা পা দিয়ে রশিদির দিকে ঠেলে দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জোয়াকিম। তার পর হান্সা চালে হেঁটে বেরিয়ে গেল সরাইখানা ছেড়ে।

রাত সাড়ে নটা মতো হবে। নিজের দফতর থেকে বেরিয়ে এলেন আমির ফাতাহি। সারাদিন প্রচুর ধকল গেছে। গ্রেফতার হওয়া সন্দেহভাজন ছ’জনকে একদফা জেরা চালিয়ে ফিরে গিয়ে যে-রিপোর্ট দিয়েছে মার্কিন অ্যান্টি-নারকোটিকস ব্যুরোর লোকজনরা, তার

ভিত্তিতে আর-একটা দল আসছে এখানে, ওদের হেফাজতে নিতে। যদিও মার্কিনদের সঙ্গে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি রয়েছে এ দেশের, তবুও ফোনে প্রচুর কানুনি কথা চালাচালি, মেল, পাল্টা মেল, সুলতানকে পুরো প্রসেসটার রিপোর্ট মিনিটে মিনিটে। এ ছাড়াও এদেশে কিছু আমির পরিবারের সম্ভান নিজেদের মধ্যে গোপন পাটিতে কোকেন সেবনের দায়ে ধরা পড়েছে, সে সবে তদন্তে কী উঠে এল তা নিয়ে সুরতা প্রধানের সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তা চলেছে একটু আগে পর্যন্ত। অবশেষে ফুরসত মিলেছে আজকের মতো।

দফতরের বাইরে দু'পাশে সুদৃশ্য গালিচার মতো ঘাসজমির মাঝখানে ঝকঝকে বাঁধানো রাস্তাটা ধরে এগিয়ে চললেন ফাতাহি। একটু দূরে পার্ক করে রাখা সাদা রঙের পর্শ। গাড়ির সামনে দাঁড়ানো উর্দিধারী চালক। আমিরকে দেখামাত্র দরজা খুলে দিয়ে সসন্ত্রমে সরে দাঁড়াল একপাশে। আমির গাড়ির মধ্যে ঢুকে যাওয়া মাত্র দরজাটা বন্ধ করে দ্রুত এসে বসে পড়ল নিজের আসনে। ড্যাশবোর্ডের কি-হোলে চাবিটা ঢুকিয়ে ঘোরাতেই 'হ্যাঁ আ আম!' হাজারটা বাজ পড়ার মতো শব্দে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! বিশাল আগুনে হলকা। বিস্ফোরণের ধাক্কায় হাতবিশেক আকাশে লাফিয়ে উঠে টুকরো টুকরো হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল গাড়িটা।

রাত ন'টা পঁচিশ। প্রাসাদের অলিন্দে বসা সুলতান আবু বিন হাশেম। পাশে বেগম বারহা আল ফাতমা। ইসলাম ধর্মে বহু বিবাহের প্রচলন আছে। বিশেষত আরব দুনিয়ায় ধনী ব্যক্তি, আমির ওমরাহদের মধ্যে একাধিক দারগ্রহণ অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। ব্যতিক্রম সুলতান আবু বিন হাশেম। তিন কন্যা বিবাহিতা বহুকাল আগেই। একমাত্র পুত্র স্ক্যান্ডিনেভিয়ান একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত। সুলতান নিজেও যাট পেরিয়েছেন গত বছর। কিন্তু এই এতগুলো বছরেও নিজের একমাত্র মোহতর্মার প্রতি অবিচল প্রেম বহুগামী হতে দেয়নি আরব নৃপতিকে। এ নিয়ে আড়ালে আবডালে কিঞ্চিৎ রসিকতাও চলে আমির মহলে।

অলিন্দে বসে বেগমের সঙ্গে দেশের বর্তমান অবস্থা, ফাতাহির পাঠানো রিপোর্ট নিয়ে এদিক-সেদিক আলোচনা করছিলেন সুলতান। এই সময় খেয়াল পড়ল বিন্দুর মতো আকারের তীক্ষ্ণ একটা লাল আলো ঘোরাফেরা করছে দু'জনের গায়ে। হঠাৎই তীব্র বিদ্যুতচমক মাথায়! “বেগমজান!” এক ধাক্কায় তীব্র করে মাটিতে ফেলে দিয়ে নিজেও বাঁপালেন সুলতান। তার আগেই ‘থ্রাড! থ্রাড! থ্রাড!’ একটানা কর্কশ ধাতব শব্দ অনেকগুলো। হাতে ভর দিয়ে উঠতে গিয়ে মেঝেয় মুখ খুবড়ে পড়লেন সুলতান। কোমরের তলা থেকে দু'পায়ের পাতা অবধি অবশ হয়ে গেছে পুরোপুরি। পাশে পড়ে থাকা বেগমের ঠান্ডা নিষ্পন্দ শরীরটা! রক্তে ভেসে যাচ্ছে শ্বেতপাথরের মেঝে। অতিকষ্টে কাঁপা কাঁপা হাতে একবার নাড়া দিয়েই বুঝে গেলেন, ও শরীরে আর প্রাণ নেই। অসাড় হয়ে আসা চৈতন্য, বাপসা হয়ে আসা দু'চোখের দৃষ্টি, ঘোলাটে চোখে খুব আবছা নজরে এল অ্যাসল্ট রাইফেলগুলো উঁচিয়ে অলিন্দের বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে দেহরক্ষীরা, কানে ভেসে আসা অনেকগুলো গলার আওয়াজ...তার পর সব অন্ধকার!

রাত সাড়ে ন'টা। সমুদ্রতট থেকে কিলোমিটারদূরেক দূরে একটা খুব ছোট দ্বীপের মাঝখানে উঁচু পাঁচিল-তোলা জেলখানা। সুলতানের এ এক অভূত খেয়াল। তিনি চান না তাঁর দেশের মূল ভূখণ্ডে কোনও কারাগার থাকুক। ফলে এই ব্যবস্থা।

দ্বীপ থেকে আরও প্রায় এক কিলোমিটার দূরে একটা লম্বা খাঁড়ি। মূল ভূখণ্ডের পাড়ে গিয়ে ঠেকেছে সেটা। দু'ধারে উঁচু বালির বাঁধ। বাঁধের আড়ালে নিঃশব্দে লুকিয়ে থাকা দুটো উচ্চগতি সম্পন্ন স্পিডবোট। বোটের মেঝেয় স্থাপদের মতো গুঁড়ি মেরে শুয়ে থাকা ছ'জন লোক। প্রত্যেকের পরনে জেড ব্ল্যাক স্কিনটাইট ডুবুরির পোশাক। মাথা ঢাকা গোলাকার শিরস্রাণে। পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার আর নলের পাশে জলনিরোধক ব্যাগে স্বয়ংক্রিয় লং রেঞ্জ সাবমেশিনগান আর একটা গ্রেনেড লঞ্চার। খুব সতর্কভাবে মাথা তুলে চারপাশটা একবার ভাল

করে দেখে নিল প্রথম বোটের চালক। তার পর ফের নিচু হয়ে ফিসফিসে গলায় বলল, “চৌকো চার দেওয়ালের জেলবাড়ি। চারকোণে চারটে সেন্টিপোস্ট। প্রত্যেকটা পোস্টে এক জন করে গার্ড। ডান দিকে জেল অফিস। খবর অনুযায়ী সেখানে বড়জোর তিন জন গার্ড থাকে এক-এক খেপে। সেন্টিপোস্টের ওই গার্ডগুলোকে কাত করতে পারলেই বারোআনা কাম তামাম। দেয়ালের গা ঘেঁষে বাঁদিকে প্রথম সেলটাই ওই ছ'জনের। খবর পৌঁছে গেছে। তৈরি থাকবে ওরা। বাকি প্ল্যান তোমাদের জানা। যাও এ বার!” শোনামাত্র প্রায় নিঃশব্দে টুপ টুপ করে জলে নেমে গেল ছ'জন।

জেল পাঁচিলের ডান দিকের পোস্টে খানিকটা টিলেঢালা ভাবে দাঁড়িয়েছিল প্রহরীটা। কাঁধে পুরনো একটা সেক্স লোডিং রাইফেল। সমুদ্র থেকে ভেসে আসা নোনা ঠান্ডা বাতাসে বিমুনি লাগছিল হাঙ্কা হাঙ্কা। আসলে রোজই এ রকম হয়। সেই একঘেয়ে ডিউটি। আসলে ক্রাইমটাইম খুবই কম হয় এই ছোট দেশটায়। মাত্র জনা তিরিশেক কয়েদি দশটা সেল মিলিয়ে। তারমধ্যে তো ছ'টাই ড্রাগ কেসে ধরা পড়া ওই আমরিকিগুলো। আরও গোটাপাঁচেক ওই একই কেসে ফাঁসে যাওয়া আমিরদের ব্যাটা সব...এইসব চিন্তাভাবনার মাঝখানেই পাড়ে ছড়িয়ে থাকা বড় বড় পাথরগুলোর আড়াল থেকে বাতাস কেটে ছুটে আসা ‘সুই’ ‘সুই’ দুটো আওয়াজ। কিছু বুঝে ওঠার আগেই কাটা কলাগাছের মতো ধপ করে পোস্টের মেঝেয় পড়ে গেল প্রহরীটা। প্রায় একইসময়ে ওই একই কাণ্ড ঘটল বাকি তিনটে পোস্টের তিন সেন্সির ক্ষেত্রেও। সঙ্গে সঙ্গে পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক জন। কাঁধে বাগিয়ে ধরা গ্রেনেড লঞ্চার। ছুটে যাওয়া গ্রেনেডের বজ্র গর্জন— ‘ক্রুউম!’ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল জেলখানার পিছনে পাঁচিলের একটা বড় অংশ। সাবমেশিনগান তাক করে দ্রুত জেলের মধ্যে ঢুকে পড়ল বাকি পাঁচজন। জেল অফিসের বাকি তিন প্রহরী বিষ্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে সামলাতে হাত বাড়তে যাবে স্ট্যান্ডে রাখা রাইফেলগুলোর দিকে, তার আগেই লঞ্চারে দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ভরে চত্বরে ঢুকে পড়েছে ছ'নম্বর লোকটা। ট্রিগারে আঙুলের চাপ। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে তাদের ঘরের মতো গুঁড়িয়ে গেল জেল অফিসের ছোট ঘরটা। আগুন, ধোঁয়া আর মরণ আর্তনাদ! দ্রুতগতিতে ছয় কয়েদির শেল্টারের দিকে এগিয়ে গেল বাকি পাঁচজন। গরাদের হুড়কোয় বন্দুকের নল ঠেকিয়ে শ্রেফ একটা গুলি। হাঁ হয়ে খুলে গেল সেলের দরজা। ছুটে বেরিয়ে এল আলভারেজ আর ওর পাঁচ সঙ্গী। পরমুহূর্তেই ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক গলে জেলখানার বাইরে। সেকেন্ডকয়েক পরই তিরগতিতে পাড়ে এসে ভিড়ল স্পিডবোট দুটো। হুড়মুড়িয়ে বোট উঠে পড়ল সবাই। ঢেউ কেটে বেরিয়ে গেল উচ্চ গতিসম্পন্ন জলযান।

রোববার। সকাল আটটা। বারান্দার ইজিচেয়ারটায় আধশোওয়া হয়ে সামনে তাকিয়ে রয়েছে তুর্ঘ। শীতসকালের নরম সূর্যের মিঠে ওম এসে পড়ছে শরীরে। সামনে ছোট টুলে ধোঁয়া ওঠা কফির কাপ, সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার, স্মার্ট ফোন, প্লেটে প্রাতরাশের ভুজাবশেষ।

এক চুমুকে কফির কাপের তলানিটুকু শেষ করে একটা সিগারেট ধরাল তুর্ঘ। এই রোববারের সকালটা খুব প্রিয় ওর। প্র্যাকটিসের জন্য কাকভোরের সাবার তাড়া লাগিয়ে ঘুম থেকে তুলে দেওয়া নেই। অলসভাবে ইজিচেয়ারে বসে বসে শুধু দেখা। দেখে যাওয়া। চারপাশে ছড়িয়ে থাকা ছোট ছোট টুকরো টুকরো দৃশ্যপট। পুকুরের জলে রাজকীয় ভঙ্গিমায় সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে জোসেফ আর মেরি। সামনে বাগানে ছোট্টাছুটি করছে টুকি আর তিনপেয়ে প্রিন্সি। মুরগিদের চালাঘর থেকে ভেসে আসা কোঁক কাঁক আওয়াজ। ভেতরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে ডিম কুড়োচ্ছে আকবর চাচা। পুকুরের পাড়ে ছিপ ফেলে বসে আছে পালান। চোখ ফাতনায়। বলতে বলতেই জলে টিপ টিপ ফাতনার নাড়াচাড়া। সঙ্গে সঙ্গে আড়াআড়ি এক হ্যাঁচকা টান ছিপে। কেজিখানেক ওজনের একটা মুগেল গাঁথে উঠল বঁড়শিতে। গোয়ালঘরে ধলির দুধ দুইতে ব্যস্ত সাবা। গোয়াল আসেনি আজ, তাই নিজেই বসে গেছে। আফ্রিকায় ওদের গোষ্ঠীর মূল জীবিকাই পশুপালন। ফলে জন্মগতভাবেই সে দক্ষ

এ কাজে। ত্বর্যর ভেবে একটু ভালই লাগে ও রকম ভয়ঙ্কর একটা জীবন থেকে বের করে আনতে পেরেছে মেয়েটাকে। হয়তো ফেলে আসা ওর সাভানা-ঘেরা গাঁয়ের জীবনটাকে ফিরিয়ে দিতে পারেনি, পারেনি উপড়ে নেওয়া শেকড়টাকে ফের তার নিজের মাটিতে গেঁথে দিতে। তবু যেটুকু পারা গেছে তাই বা কম কী। সাবার পাশে দাঁড়ানো মালতীদি। হাতে একটা ঢাল খাওয়া বালতি। অপেক্ষা করছে, সাবা উঠলে গোবর কাঁচিয়ে তুলবে। বাগানে সজির বেড়ে সার হবে। দেওয়া হবে ফুলের গাছেও। কোনও রকম নন-অর্গানিক সার ব্যবহার করা হয় না এ বাগানে। পুকুরে ছাড়া হয় না কোনও বিদেশি অথবা হাইব্রিড মাছ। বাগানের লক্ষা আর জিরে ফোড়ন দিয়ে পাতলা করে মুশুরির ডাল রাঁধে মালতীদি। সঙ্গে বাগানেরই গাছের কাগজি লেবু আর পুকুরের সদ্য তোলা মুচমুচে চারাপোনা ভাজা। এই দু'বছরেই যা সাবা আর ত্বর্য দু'জনেরই ভীষণ প্রিয় হয়ে উঠেছে।

মাথার উপর দু'হাত তুলে দশ আঙুল মটকে আড়মোড়া ভাঙল ত্বর্য। হাতে দুধের বালতি নিয়ে পিছনের রাস্তা দিয়ে রসুইঘরের দিকে চলে গেল সাবা। ওকে রাশিয়া নিয়ে যাবে, মাঝেমাঝেই ভাবে ত্বর্য। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে হয়, কোথায় নিয়ে যাবে? সমাজতন্ত্রের জন্মভূমি ভেঙে চুরমার কবেই। এ বার মুঘলপর্বের শুরু। সাম্যবাদ নামে এক অমোঘ শব্দের টানে একদিন এক হয়ে লড়েছিল যারা, আজ তারাই টুকরো টুকরো হয়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। ক'মাস আগেই ইউক্রেনে ঢুকে পড়েছে রাশিয়ান ফৌজ। যুদ্ধবিমান থেকে ফেলো রাসায়নিক বোমায় জ্বলে যাচ্ছে মাইলের পর মাইল ফসলের খেত। পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে সাবের সোভিয়েতের শস্যভান্ডার। ভ্যাসিলি, ওলেগ, ওদের সবার কথা খুব মনে পড়ছে। স্মারশে ত্বর্যর কমরেড ইন আর্মস, দুর্ধর্ষ সহযোগী সাবা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বহু লড়াই লড়েছে এক সঙ্গে। ওরাও কি এখন মস্কোর পাঠানো ট্যাঙ্কবাহিনীকে রুখতে অস্ত্র হাতে নেমে পড়েছে কিয়েভের রাস্তায়? হাউ দে উইল রিয়াক্ট? যদি ত্বর্যর সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে যায় এই মুহূর্তে? এ দিকে সুলতানের দেশেও তো এই অবস্থা! তদন্তে আর কী কী উঠে এল, কে জানে!...মনে পড়তেই হাত বাড়িয়ে তুলে নিল পাশে টুলের উপর রাখা স্মার্ট ফোনটা। এ চ্যানেল সে চ্যানেল সার্ফিং করতে করতে হঠাৎই চোখ আটকে গেল ওই আরবি চ্যানেলটায়। আর পরমুহূর্তেই ঠিক যেন হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল সারা শরীরে! ধনুক থেকে ছিটকে বেরোনো তিরের মতো এক ঝটকায় ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ত্বর্য। একের পর এক ভেসে ওঠা দৃশ্য মোবাইলের স্ক্রিনে। হাসপাতালের করিডর ধরে স্ট্রেচারে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সুলতানকে...প্রাসাদের অলিন্দে রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে থাকা বেগম বারহা আল ফাতমার নিখর মৃতদেহ... বিশাল ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে থাকা আমির ফাতাহির গাড়ি...জেলখানার ভাঙা প্রাচীর...ওয়াচ টাওয়ারের মেঝেয় বুলেটে ছিন্নভিন্ন সেক্সিদের লাশ...মাইক্রোফোনে মহিলা সাংবাদিকের উত্তেজিত গলা... কিছু কানে ঢুকছিল না আর। ঝটিতি চ্যানেলটা কেটে সুলতানের হটলাইনে ফোন করল ত্বর্য। দু'-এক বার রিং হওয়ার পর ও প্রান্তে সুলতানের ব্যক্তিগত সচিব আল হুসেইনির বিমর্ষ গলা। “ইয়েস জনাব বোস।”

“হাউ ইজ হিজ হাইনেস?” হুসেইনির কথা সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই প্রশ্ন করল ত্বর্য। “ফ্লোটিং রিবস আর কোমরের কাছে, সব মিলিয়ে তিনটে বুলেট... অপারেশন চলছে এই মুহূর্তে বাট...” আরও ভারী হয়ে এল সচিবের কণ্ঠস্বর। “মোস্ট আনফরচুনেটলি বেগম সাহেবার ইস্তেকাল হয়ে গেছে।”

“অ্যান্ড হোয়াট অ্যাবাবুট মাই বিলাভেড ফ্রেন্ড জনাব ফাতাহি?” গলা কাঁপছিল ত্বর্যর।

“হি ইজ অলসো...” ও প্রান্তে আটকে আটকে যাচ্ছিল কথাগুলো।

“ওকে, সুলতানের জ্ঞান ফেরা মাত্র বলবেন, আমি আসছি।” লাইনটা কেটে দিয়ে বেশ কিছু ক্ষণ পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ত্বর্য। সেই স্তব্ধতা হঠাৎই ভেঙে চুরমার হয়ে গেল গলা ফাটানো চিৎকারে। “সাবা!”

রামায়ের টিমে আঁচে দুধ ফুটছিল। সেদিকে নজর রাখতে রাখতে সজি কাটছিল সাবা। এই সময় কানে এল গোটা বাড়ি কাঁপানো গর্জনটা। ছুরিটা হাতে নিয়েই দৌড়ে এল বারান্দায়। পেছনে পেছনে বাকিরাও। ইজিচেয়ারটার সামনে পাথরের মতো দাঁড়ানো বোস। হাতের মুঠোয় ধরা স্মার্টফোন। ঘাতকের ঠান্ডা চাহনি দু'-চোখে। ঠোঁটের কোণে ঠিক ত্রেতে পাওয়া মানুষের মতো একটা হাসি! যা আগে কোনও দিন দেখেনি সাবা। স্যাভিসির ফৌজদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময়ও না। একটিও কথা না বলে ফোনটা সাবার হাতে ধরিয়ে দিল ত্বর্য। দেখতে দেখতে স্তব্ধ হয়ে গেল সাবাও। কিছু ক্ষণ পর একটা হাতের চাপ কাঁধে। ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে বোস। বরফের মতো জমাট হিমঠান্ডা গলা। “দে হ্যাভ ডিক্লেয়ার্ড দ্য ওয়ার। দোজ বাস্টার্ডস আর চ্যালেঞ্জিং আস। কাম অন বেবি,” সাবার কাঁধে হাতের চাপটা বাড়াল ত্বর্য। “লেটস গো অ্যান্ড অ্যাকসেস্ট দ্য চ্যালেঞ্জ!”

তিনদিন পর।

বুধবার। সকাল সাড়ে ছ'টা। ভূতির হাটে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে ত্বর্য আর সাবা। ওদের ঘিরে পালান, মালতীদি, আকবর চাচা, প্রিন্সি, টুকি সবাই। এস ইউ ভি-তে বসা এজেন্সির ড্রাইভার। টিকিট, অন্যান্য বৈশ কিছু জরুরি কাজকর্ম সামলে যেতে হচ্ছে বলে এটুকু দেরি হল। তবে সুলতানের ব্যক্তিগত সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে নিয়মিত। অপারেশন সাকসেসফুল। জ্ঞান ফিরেছে সুলতানের। সেমি-লিকুইড ডায়েটও দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে খবর একটু ভালর দিকেই। তবে প্রিয়তমা বেগম, আর বন্ধু ফাতাহির মর্মান্তিক মৃত্যুশোকের ধাক্কাটা কতদিনে কাটিয়ে উঠতে পারবেন সুলতান, তা নিয়ে বেশ ভাল রকম সন্দেহ রয়েছে সচিবের মনে। এই সময় বোসের উপস্থিতি অনেকটাই চান্দা করে তুলবে হিজ হাইনেসকে, এ রকমটাই ধারণা হুসেইনির।

হাত দিয়ে পালানের চুলগুলো একটু ঝেঁটে দিল ত্বর্য। “তোর জিন্মায় রেখে গোলাম সবাইকে। কটা দিন একটু সামলেসুমলে নিবি। আকবর চাচা, মালতীদি, সবার বয়েস হয়েছে। কিছু বললেটললে পাল্টা তক্কো জুড়বি না। ঠিক আছে? ফিরতে হয়তো একটু দেরি হবে আমাদের। তবে চিন্তা করবি না। ফেরার আগে ফোন করব। এজেন্সিতে ফোন করে ড্রাইভার পাঠাতে বলবি। এয়ারপোর্টে আনতে যাবি আমাদের।”

কথার মাঝখানে সামনে এসে দাঁড়াল মালতীদি। “তোমরা নিশ্চিন্তি মনে এসো দিকিনি বাপু, মোদের নে মোটে চেষ্টা করতি হবে নাকে। হেই আমাদের বাংলার গাঁ-গোয়ামে বৌ বিরা এটা কথা খুব জোর বলে। ‘মঙ্গলে উষা বুধে পা/যথা ইচ্ছা তথা যা’ আজ বুধবার। মা বিপত্তারিণীর নাম নে চলি যাও যেথাকে ইচ্ছে। তোমাদের ক্ষেতি করবার সাধি কোনও অটিকুড়ির ব্যাটার হবেনিকো।”

“টেক কেয়ার ম্যালাটিডি,” মালতীকে বুক জড়িয়ে ধরল সাবা। তার পর গাড়ির দিকে এগিয়ে গিয়ে পেছনের সিটে বসতে ইশারা করল ড্রাইভারকে। খানিকটা হকচকিয়ে নেমে গিয়ে পেছনের সিটে বসল চালক। ড্রাইভিং সিটে জাঁকিয়ে বসল সাবা। তার পর পাশের সিটটায় চাপড় মেরে তাকাল ত্বর্যর দিকে। “হেই বোস! কাম অন বয়।”

কি-হোলে চাবি ঢুকিয়ে দু আঙুলের হাক্সা মোচড়। গর্জন তুলে বেরিয়ে গেল এস ইউ ভি।

“ইয়া আল্লা! ইয়া মেরে মালিক!” আকাশের দিকে কাঁপা কাঁপা হাতদুটো তুলল আকবর মিয়া, “মেরে বাচ্চো কো হর বালা, হর খতরা সে মেহফুজ রাকখো।”

বিকেল চারটে। বেশ অনেক দিন পর সুলতানের দেশে নিজের বাড়িটিতে ঢুকল ত্বর্য। সেই অর্কিডের বাগান, লিলিপুল, ঢোকর দরজার দু'পাশে দুটো খেজুরগাছ, নিখুঁতভাবে ছাঁটা সবুজ গালিচার মতো ঘাসজমির মাঝখানে ছোট ছোট নুড়িপাথর বিছানো রাস্তা, পেন্টহাউসের গায়েই গ্যারেজ, সেখানে এখনও রয়েছে সুলতানের উপহার দেওয়া মার্খার বড় শখের সেই বেন্টলি গাড়িটা। ছুটিছাটার দিন বা স্পেশাল কোনও অকেশন ছাড়া বড় একটা বার করত না রাস্তায়। আগাগোড়া নিজের হাতে মনের মতো করে সবকিছু সাজিয়েছিল মার্খা।

সব ছেড়েছুড়ে কোথায় যে... একটা গভীর চাপা দীর্ঘশ্বাস উঠে এল তুর্খর বুক বেয়ে। ঘরের দরজায় টাঙানো টিউনিসিয়ান ব্রাস মেটালের নামফলক। গায়ে লেখা, তুর্খ বোস অ্যান্ড মার্থা ব্রোলিন বোস। নামদুটো জ্বলজ্বল করছে আজও। যত দিন পরই ফিরুক না কেন, বাড়িটার সব কিছু একই রকম থাকবে— এ দেশ ছেড়ে তুর্খর চলে যাওয়ার সময় কথা দিয়েছিলেন সুলতান। আর আজ সেই মানুষটাই কিনা স্ত্রী, বিশ্বস্ত বন্ধু সব হারিয়ে শুয়ে রয়েছেন হাসপাতালের বিছানায়। যেখানেই যাবে, পিছনে তড়া করে বেড়াবে মার্থার স্মৃতি, এই ভেবেই কোনও দিন আর এ দেশে ফেরেনি তুর্খ। আজ সেই আসতেই হল, আর সেটাও এ রকম একটা অবস্থায়। ব্যাপারটা অকল্পনীয় ছিল ওর কাছে।

ঘরের ভেতরে তাকাল তুর্খ। ড্রয়িং রুমের দেয়াল জুড়ে ক্যানভাসের পর ক্যানভাসে মার্থার আঁকা ছবি, ফ্রেমে ওদের দু'জনের ফটো। সদ্য কোনও বালিকার মতো অবাক বিস্ময়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখছে সাবা। পকেটে থেকে ফোনটা বের করে ডঃ রাইনহার্ড ব্রিগেলের নাম্বার ডায়াল করল তুর্খ। বারদুয়েক রিং হওয়ার পর ও প্রান্তে ডঃ ব্রিগেলের গলা। “বলুন মিস্টার বোস।”

“স্যাভিগ্নির দেশ থেকে যখন ও রকম একটা অবস্থায় ফিরে এলাম তখন আপনি বলেছিলেন আমার চান্স অব সারভাইভাল বেশ কম। তার পরেও আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলেন আপনি। পরে সুলতান আর জনাব ফাতাহির মুখ থেকে সেসব কথা শুনেছিলাম আমি। এ বার আপনি আমায় বলুন ডক্টর, হিজ হাইনেসের অবস্থাটা এগজ্যাক্টলি এখন কী রকম?” অত্যন্ত স্বাভাবিক, শান্ত গলায় প্রশ্নটা করল তুর্খ।

জবাবে মুহূর্তকয়েক চুপ করে রইলেন ডঃ ব্রিগেল। তার পর ধীরগলায় বললেন “দেখুন মিস্টার বোস, একটা কথা প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার এ ক্ষেত্রে হিজ হাইনেসের কোনও লাইফ রিসক নেই বললেই চলে। কারণ বুলেটগুলো সবকটাই খুব সাকসেসফুলি রিমুভ করে দেওয়া গেছে। কিন্তু কোমরের গুলি, দুটোই বিঁধেছে স্পাইনাল কর্ডের খুব কাছাকাছি। ও সব জায়গায় প্রচুর নার্ভস অ্যান্ড টিস্যুস থাকে। যেগুলো স্পাইনের সঙ্গে সংযুক্ত। সেগুলো খুব বাজেভাবে জখম হয়েছে। ফলে হিজ হাইনেসের পক্ষে এ অবস্থায় হাঁটাচলা তো বটেই, উঠে দাঁড়ানোটাও সোজা কথায়, অসম্ভব।”

“এই ব্যাপারটা কি পার্মানেন্ট? না কি ইন ফিউচার নর্ম্যাল কন্ডিশনে ব্যাক করার কোনও পসিবিলিটি রয়েছে?”

তুর্খর কথার জবাবে এ বার সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত শল্যচিকিৎসকের কণ্ঠস্বর। “দেখুন মিস্টার বোস, অ্যাজ আ সার্জন, এটা আমার বলবার এজিয়ারের বাইরে। অপারেশনটা যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে করবার চেষ্টা করেছি আমি। এর পরের ট্রিটমেন্টের ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণ ভাবে নিউরোলজিস্ট, টিস্যু স্পেশালিস্ট আর ফিজিওথেরাপিস্টের দায়িত্বে। অ্যান্ড আয়াম সিওর, অল অব দেম উইল ডু দেয়ার জব এক্সট্রিমলি ওয়েল। ফলে কমপ্লিট রিকভারির একটা চান্স থাকছেই। তবে সময় লাগবে। ইটস কোয়াইট আ লং প্রসেস। আর সেই সময়টা কত দিন, কত মাস বা বছর, তা এই মুহূর্তে আমি কেন, বাকি কারও পক্ষেই বলা সম্ভব নয়।”

“থ্যাংক ইউ ডক্টর, থ্যাঙ্কস এগেন ফর ইয়োর ভ্যালুয়েবল ওপিনিয়ন।” ফোনটা কেটেই সাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াল তুর্খ। “লেটস গेट রেডি, সুইটহার্ট। এখনই একটু ফ্রেশ হয়ে হসপিটালে পৌঁছতে হবে আমাদের।”

রাজপরিবারের জন্য বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত হাসপাতালের রয়্যাল কেবিনে রিক্লাইনিং বেডটায় আধশোওয়া হয়ে দূরে রাজধানীর জামা মসজিদের দিকে উদাসী চোখে তাকিয়ে ছিলেন সুলতান আবু বিন হাশেম। এ মরুশহরে সন্ধ্যা নামে বেশ খানিকটা দেরিতে। মসজিদ থেকে ভেসে আসছে শেষ বিকেলের আজান। কেমন যেন বিষণ্ণ করে দিচ্ছিল মনটাকে। পরওয়াদিগারের উদ্দেশে প্রার্থনায় বসার আহ্বান আসছে অথচ সে ডাকে সাড়া দিতে পারছেন না তিনি। এ আফসোস রাখার জায়গা কোথায়! একটু আগেই দেখা করে বিদায় নিয়েছে ছেলেমেয়ে,

নাতিনাতনি, জামাতা, পুত্রবধূরা। চলে গেছেন সচিব হুসেইনি আর বাকি আমির ওমরাহরাও। কেবিনের এককোণে একটা চেয়ার। সেখানে বসা এক জন স্বেতাঙ্গিনী নার্স। ঠিক এই সময় বেজে উঠল চেয়ারের পাশে দেয়ালে ঝোলানো ইন্টারকম রিসিভারটা। হাত বাড়িয়ে সেটা কানে তুলে নিলেন নার্স ভদ্রমহিলা। সেকেন্ডকয়েকের সংক্ষিপ্ত বার্তালাপ। ফোনটা হাতের মুঠোয় ধরে তাকালেন সুলতানের দিকে। “টুরিয়া বোস হাজ কাম টু মিট ইউ।”

শোনামাত্র বিদ্যুৎচুম্বকের মতো একটা ঝিলিক খেলে গেল সুলতানের চোখমুখে, “টেল দেম টু সেন্ড হিম ইমিডিয়েটলি!”

মিনিটদুয়েকের মধ্যে কেবিনের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল তুর্খ। পিছনে সাবা। সামনে এসে দাঁড়ানো মাত্র তুর্খর হাতদুটো চেপে ধরলেন সুলতান, “সে দিন তুমি আসতে চেয়েছিলো। তখনই যদি তোমায় আসতে বলে দিতাম তা হলে আজ এই দিনটা দেখতে হত না আমাকে। আমার দোস্ত এ জিগর, ওয়াজির এ আলা ফাতাহি, আমার বেগম জান ফাতমাকে কি বেরহেম হায়ওয়ানের মতো মেরেছে ওই দারিন্দাগুলো... ইয়া আল্লাহ! মওতের পর ওদের চেহারাগুলো যদি তুমি দেখতে...।” বলতে বলতে চোখ বুজে বিছানায় মাথা এলিয়ে দিলেন সুলতান। ডান হাতটা তুলে দিলেন চোখের উপর। থরথর কাঁপছে পুরো শরীরটা!

চুপ করে দাঁড়িয়ে সুলতানকে ধাক্কা সামলানোর সময় দিল তুর্খ। তার পর খুব নরম গলায় বলল, “প্লিজ, শান্ত হোন ইয়োর হাইনেস। এ ভাবে শুধু শুধু নিজেকে দোষ দেবেন না। আসলে ভুলটা আমারও। ঘটনাটাকে অতটা গুরুত্ব দিইনি আমিও। মনে হয়েছিল একটা পেটি ড্রাগ ট্রাফিকিংয়ের প্রবলেম, এখানকার নর্মাল রুটিন প্রসেসেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আসলে তখনও বুঝিনি এতখানি ডেঞ্জারাস অ্যান্ড নটোরিয়াস একটা সিন্ডিকেট কাজ করছে এর পেছনে।” বলতে বলতে ক্রমাগত গভীর হয়ে উঠছিল তুর্খর গলা, “আমার মনে হয়, আপনার সিকিওরিটি সিস্টেমটাকে আগাগোড়া ঢেলে সাজানো দরকার। আপনি পারমিশন দিলে ইমিডিয়েটলি কাজ শুরু করব। সেটা ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর নিজে ময়দানে নামব। যারা যারা সরাসরি এর পেছনে আছে, প্রত্যেকটাকে খুঁজে খুঁজে গর্ত থেকে টেনে বের করে মারব। বাকিগুলোকে মেসেজ দিয়ে আসব, আমরা নাক বাড়িয়ে রাখলাম। ওরা যেন ওদের নাকটা ঘষতে আসে।”

“কী লাভ হবে এ সব করে, বোস।” হতাশ শোনা সুলতানের গলা। “আমার বেগমজান, বন্ধু ফাতাহি, এদের কি আর ফিরে পাব? মাঝখান থেকে ফের তুমি বিদেশে বিড়ুইয়ে ভয়ঙ্কর ওই সব ড্রাগ মافیয়ারদের সঙ্গে লড়াইতে গিয়ে নিজেকে বিপদে ফেলবে। আর তা ছাড়া মার্কিন মুলুকে ওই সিন্ডিকেটের মোকাবিলা তো ওখানকার এজেন্সিগুলো করবেই। আর এ দেশে এই বিষয়টা যতটুকু বেড়ে উঠেছিল, আমার লোকজনেরা সে চারাটাকে সমূলে উপড়ে ফেলেছে। বেশ কিছু গ্রেফতারও হয়েছে। তার মধ্যে ধনী আমির খানদানের কিছু ছেলেপুলেও রয়েছে। আমার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, কার কী ক্ষমতা, কে কতটা প্রভাবশালী, কোনও রকম বাছবিচার না করে এর সঙ্গে জড়িত সন্দেহ হওয়ামাত্র যেন তাকে গ্রেফতার করা হয়। তাই একান্ত অনুরোধ, তুমি শুধু শুধু আর-এক বার আমার জন্য নিজেকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে না।”

এতটুকু কথা বলার পরিশ্রমেই বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল আরব নৃপতিকে। এগিয়ে এসে রিমোটের চাপে ধীরে ধীরে বালিশটা নামিয়ে দিলেন ভদ্রমহিলা। চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে রইলেন সুলতান। কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করার পর সাবার দিকে এক বার তাকাল তুর্খ। চোখে চোখে মৃদু ইঙ্গিত বিনিময় হল একটা। চেয়ারটা টেনে বিছানার আর-একটুকু কাছে এগিয়ে এল তুর্খ। “অনুমতি দিলে আজ তা হলে আমরা উঠি ইয়োর হাইনেস? কাল না হয় আবার...”

তুর্খর কথা শেষ হওয়ার আগেই ডান হাতটা সামান্য তুলে ওকে নিরস্ত করলেন সুলতান। “প্লিজ, যেয়ো না বোস। মনে হচ্ছে তোমার আরও কিছু বলার আছে।”

শোনার পর স্থির চোখে সুলতানের দিকে তাকাল তুর্খ। “দেখুন ইয়োর হাইনেস, মার্কিনিরা, তাদের সি আই এ, এফ বি আই, অ্যান্টি-



নারকোটিক্স ব্যুরো কীভাবে তাদের দেশে ড্রাগ প্রবলেম সামলাবে, মেক্সিকান ড্রাগ কন্সট্রাক্ট ফোর্স কীভাবে কার্টেলের মোকাবিলা করবে, আপনার এখানে সুরতারা এই বিষয়গোছের চারাকে কীভাবে গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে চাইছে সে সব নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আমার এজিয়ারের মধ্যেও পড়ে না সেটা। আমি শুধু আপনি, বেগম সাহেবা আর জনাব ফাতাহির এই অবস্থার জন্য যারা দায়ী, তাদের প্রত্যেককে বেছে বেছে টার্মিনেট করব, অ্যান্ড দোজ হু আর রেসপন্সিবল ইন্ডিরেস্টলি, তাদেরকে এমন একটা মেসেজ দিয়ে আসব যাতে ওরা এ দেশের দিকে ভবিষ্যতে কোনওদিন চোখ তুলে তাকানোরও সাহস না পায়।” বলতে বলতে বাঘের মতো জ্বলছিল তুর্ঘর চোখজোড়া! “আর এর জন্য ইয়োর হাইনেস, আপনার চার পাশের সিকিওরিটি সিস্টেমটা গ্রানাইট পাথরের মতো মজবুত হওয়া দরকার। চাই এ লাইনে বাছা বাছা সেরা সব পেশাদারদের একটা টিম, যারা সর্বক্ষণ ঘিরে রাখবে আপনাকে। শুধু তাই নয়, কোনও রকম চক্রান্ত, এতটুকু অপরাধ বা দুর্নীতির বিষয়াদি, বেড়ে ওঠার আগেই মূল থেকে উপড়ে ফেলবে তাকে। যদি আপনার অনুমতি পাই, তা হলে খুব তাড়াতাড়ি এ ব্যাপারে কাজ শুরু করতে হবে আমাকে। লাতিন আমেরিকান আর ব্ল্যাক মাফিয়ারা এতে জড়িত সেটা জলের মতো পরিষ্কার এতদিনে। কিন্তু এর পেছনে সরাসরি যাদের হাত রয়েছে তাদের খুঁজে বের করতে আমার পুরনো নেটওয়ার্কের অনেকের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হবে। ইন দিস সিচুয়েশন, আই নিড ইয়োর গ্রিন সিগন্যাল ওনলি।”

শোনার পর এত ক্ষণ পর এই প্রথমবারের জন্য একটুকরো হাসি

ফুটল সুলতানের ঠোঁটের কোণে। “আমার মনে হচ্ছে তোমার কথায় যুক্তি আছে। ওরা ভয় দেখিয়ে থামাতে চাইছে আমাকে। ওদের সামনে এতটুকু খোলা জমি ছেড়ে রাখলে সেই পথ দিয়ে বারবার ফিরে আসবে ওরা। আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর নেক বান্দা! শয়তানের সামনে হাঁটু গেড়ে বসব কেন? খালি একটাই ছোট প্রশ্ন।” ভুরুজোড়া সামান্য কুঁচকে গেল আরব নৃপতির। “আমার সুরক্ষার সব ব্যবস্থা তুমি করে দেবে বলছ। ব্যাপারটা কেমন একটু খোঁয়াটে ঠেকছে আমার কাছে। তার মানে কি, আই মিন, তুমি নিজে এই সিস্টেমটার মধ্যে পার্মানেন্টলি থাকবে না?”

“ইউ আর রাইট, ইয়োর হাইনেস।” জবাবে কিছুটা কুণ্ঠা তুর্ঘর গলায়। “আমার মা ল্যুদমিলা বোস তাঁর মৃত্যুর আগে আমায় বলেছিলেন, তাঁর স্বামী তমাল বোসের দেশে এক বার যেতে। বাবার সম্পর্কে মার বরাবর ভয় ছিল, একবার দেশে গেলে বাবা যদি আর না ফেরেন! বরাবরের মতো যদি আটকে যান ওখানেই। আবার একই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড অপরাধবোধও ছিল মনে। অন্তিমকালে সম্ভবত এ সবই কথা হয়ে উঠে এসেছিল মুখে। ‘মাই সন মাস্ট নো হিজ ওন রুটস্’— এগজ্যাক্টলি হোয়াট দ্যাট পুয়োর স্লাভ লেডি টোল্ড মি।” একটা খুব নরম হাসি খেলে যাচ্ছিল একদা দুর্ধর্ষ শ্মার্শ এজেন্টের চোখে মুখে। “সেই শেকড়টা আমার বাবার দেশে, বাংলার মাটিতে খুঁজে পেয়ে গেছি আমি। সেখানে বেশ বড় একটা থাকার জায়গা আর একটা এক্সটেন্ডেড ফ্যামিলি হয়েছে আমার। সাবা, আমি, আরও অনেক মেম্বার সেই ফ্যামিলিতে। তাই ফিরতে হলে ওখানেই, নো হোয়ার এল্‌স!” ভারী হয়ে উঠল তুর্ঘর কণ্ঠস্বর। “আর ফেরা যদি না হয়! তা হলেও আমি নিশ্চিত, ওখানে আমাদের ওই বড়

পরিবারটার খেয়াল রাখবেন আপনি। গত দু'দিনে আমার ল-ইয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা উইলের খসড়াও তৈরি করে রেখে এসেছি যাতে আমার আর সাবার কিছু হয়ে গেলে ওরা জলে না পড়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনি প্রেসেসটাকে এগজিকিউট করতে..."

“প্লিজ স্টপ টকিং অল দোজ ক্র্যাপস, বোস!” তুর্ঘর বলার মাঝখানেই প্রায় হাহাকার করে উঠলেন সুলতান আবু বিন হাশেম। “নাথিং উইল হ্যাপেন টু ইউ বাই দ্য গ্রেস অব অলমাইটি। আর এখানে তোমার প্ল্যানগুলোর ব্যাপারে যা যা বলেছে সে সব দায়িত্ব আমার। চিন্তা করো না একদম। ইউ জাস্ট গো অ্যাহেড।”

“থ্যাঙ্ক ইউ, ইয়োর হাইনেস। একদম চিন্তা করবেন না আপনিও। সময় হয়তো একটু লাগবে, তবে উঠে দাঁড়াবেন ঠিক। আই বিলিভ ইট ফ্রম দ্য কোর অব মাই হার্ট।” বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তুর্ঘ। “এ বার তা হলে অনুমতি দিন।”

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন সুলতান। “আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, কথায় কথায় ভুলেই গেছিলাম, এতটা পথ জার্নি করে আসতে হয়েছে তোমাদের। প্রবলেম অব জেট ল্যাগ... রাশ টু হোম ইমিডিয়েটলি। বোথ অব ইউ নিড আলং ডিপ স্লিপ।”

“সালাম, ইয়োর হাইনেস।” দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল তুর্ঘ। তার সঙ্গে সাবাও।

মরক্কোর রাজধানী রাবাত শহরের যিঞ্জি বাজার এলাকা। অপ্রশস্ত আধো আঁধারি চোকো চোকো স্ল্যাব পাথরের গলি। দু'পাশে সার সার দোকান। দোকানের সামনে আর তাকে তাকে সাজানো মরক্কো চামড়ার মলাটওয়ালা আরবি বই, সুদৃশ্য কারুকাজ করা রূপো বা তামা-বাঁধানো গড়গড়া, মখমলি গালিচা, চিত্রবিচিত্র পুঁতি আর পাথরের হার, বাজুবন্দ, হিজাব, বোরখা, আতরদান, রকমারি মশলা, আরও অনেক কিছু। দুটো দোকানের মাঝখানে একটা সরু লোহার সিঁড়ি সোজা উঠে গেছে দোতলায়। হাতের ডান দিকে ছোট একটা ঘর। কম পাওয়ারের একটা এল ই ডি বাল্ব জ্বলছে। মেঝেতে দু'ভাগে সাজিয়ে রাখা ডজনখানেক এ কে ফর্টি সেভেন আর বেশ কিছু কার্তুজের ম্যাগাজিন। কালো জোবা পড়া দু'জন লোক ব্যস্ত হাতে চটের বস্তায় মুড়ছিল সেগুলোকে। সামনে দাঁড়ানো হামিদ। বঁটেখাটো বলিষ্ঠ চেহারা। পোড়া তামাটে রং। ঠোঁটের কোণে হাল্কা কাটা দাগ। পরনে ঢোলা চেক-কাটা কোট আর পাতলুন। হামিদ। একসময় আরব-আফ্রিকা জোনে কে জি বি-র ঘাঘু সিক্রেট এজেন্ট। সোভিয়েত পড়ে যাওয়ার পর চাকরি ছেড়েছুড়ে এই আর্মিস ম্যাগলিংয়ের ধান্দায়। স্পিডবোট আর ছোট ছোট সি-প্লেনে মাল যায় লাইবেরিয়া, বারকিনা ফাসো, রোয়ান্ডা, বুরুন্ডি, আফগানিস্তান, ইরাক, সুদান, সোমালিয়া, লিবিয়া, আরও অনেক দেশে। “জলদি জলদি হাত চালা সব! আজ রাতেই কিন্তু শিপমেন্ট!” লোকদুটোকে তাড়া লাগাচ্ছিল হামিদ। তখনই পকেটে বেজে উঠল ফোনটা। ক্রিনে নম্বরটা দেখেই ঝটিতি তুলে নিল কানে, “আসসালামা ওয়ালাইকুম কমরেড বোস।” জবাবে ফোনের ও প্রান্তে সেই চেনা গমগমে গলা, “ওয়ালাইকুম আসসালামা, হামিদ। তুমি নিশ্চয়ই সুলতান আবু বিন হাশেমের ব্যাপারটা জানো।”

“বেশক। খুব খারাপ লেগেছিল খবরটা শুনে,” বলল হামিদ। শোনার পর লাইনের ওপারে গমগমে গলা আরও ঠান্ডা, “শোনো হামিদ, আমার স্ত্রীর মৃত্যুর পর দিশেহারার মতো এ দেশ ও দেশ ঘুরে যেদিন তোমার দেশে এসে উঠেছিলাম, সেদিন আমার কাছে এসেছিলে তুমি, একটা খুব জরুরি ইনফরমেশন নিয়ে। আমার দীর্ঘ চাকরি জীবনে অসংখ্য বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর শত্রুও তৈরি হয়েছে আমার। ওই দ্বিতীয় দলটায় কেউ বিশ্বাসই করছে না আমি অবসর নিয়ে নিয়েছি। এখানে আসার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে আমার, এমনটাই মনে করেছিল সবাই। ওরা চাইছিল না আমি ও দেশে থাকি। এ সবই তুমি বলেছিলে আমাকে। আগাম সতর্ক করে দিয়েছিলে আমায়। না হলে হয়তো আমার প্রাণ সংশয় হতে পারত। সেদিন এই খবরের বিনিময়ে আমার থেকে কোনও পারিশ্রমিক নাওনি তুমি। ধন্যবাদ শব্দটা খুব ছোট তার জন্য। আজ আমার আর-একটা উপকার করো তুমি। এ বার পারিশ্রমিকের

বিনিময়ে। সুলতান আর তার পরিবারের উপর এই হামলার পেছনে কারা, জানাও আমাকে। তুমি আমি দুজনেই জানি, আমেরিকান ওই ড্রাগ কার্টেল যতই শক্তিশালী হোক না কেন এতদূরে এসে হামলা চালানোর মতো তাকত ওদের নেই। আফ্রো-অ্যারাবিক এই জোনটা হাতের তালুর মতো চেনা তোমার, হামিদ। খবর লাগাও, কোন বেজম্মার বাচ্চারা রয়েছে এর পেছনে। ঢাকার ব্যাপারে চিন্তা করবে না একদম। মোদ্দা কথা, খবরটা চাই আমার!”

আঙুনের হলকার মত লাইনের ওপার থেকে ভেসে আসছিল এক-একটা শব্দ। “আমি দেখছি, বোস।” নিচু গলায় বলল হামিদ। ওপারে কেটে গেল লাইনটা।

মস্কোর আরাবাত স্ট্রিট ধরে গাড়ি ডাইভ করছিল লিদিয়া। পাশে বসা সেগেই। পিছনের সিটে ভ্যালেন্তিনা। একটা ট্রাফিক সিগনালে সব এসে থেমেছে, গাড়ির ড্যাশবোর্ডের উপর স্ট্যান্ডে আটকানো মোবাইলটা বেজে উঠল। অন করতেই ক্রিনে ভেসে উঠল তুর্ঘ।

“হাই এভরিবডি, কেমন আছো সব তোমরা?”

“খুব ভাল আছি আমরা সবাই, বোস আঙ্কেল!” কিশোরীর মতো উচ্ছ্বাসে পিছন থেকে চোঁচিয়ে উঠল ভ্যালেন্তিনা। “ডান্স স্কুলের জন্য যে বড় একটা জায়গা খুঁজছিলাম, পেয়ে গেছি সেটা। গত পরশু ফাইনাল ডিল হয়ে গেছে। তোমাকে জানানোর আগেই তুমি ফোন করলে।” খুশিতে চকচক করছিল মেয়েটার মুখখানা।

“আরও একটা ভাল খবর আছে বোস।” মিষ্টি হাসল লিদিয়া, “তোমার বন্ধুকে রিমোট অপারেটেড দুটো পা বানিয়ে দিয়েছেন ডাক্তারবাবুরা। ইট লুকস সো ন্যাচারাল। ট্রাউজারের উপর থেকে তো কিছুই বোঝা যায় না। সেগেইও খুব তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে উঠছে ব্যাপারটা।”

“বাঃ! লিদিয়া, খুব ভাল লাগছে জেনে, আমার বন্ধু এখন নিজেই হাঁটাচলা করতে পারছে।” বলে চোখ ঘুরিয়ে সেগেইয়ের দিকে তাকাল তুর্ঘ। “আই হোপ, সুলতানের ঘটনাটা শুনেছ তুমি?”

“ইয়েস, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। ইটস সো স্যাড অ্যান্ড আনফরচুনেট অ্যাট দ্য সেম টাইম!” একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেগেই। তত ক্ষণে মোবাইল ক্রিনে শক্ত হয়ে উঠেছে তুর্ঘর চোয়ালজোড়া। “লিসন কমরেড, এই মুহুর্তে আমি আর সাবা, সুলতানের এখানে। আমার বাড়িতেই উঠেছি দু'জনে। এখানে তোমাকে আমাদের খুব দরকার। তোমার অ্যানসার পজিটিভ হলে কাল বড়জোর পরশুর মধ্যে তোমার নামে বিজনেস ক্লাসের একটা টিকেট পাঠিয়ে দেওয়া হবে সুলতানের প্রাইভেট সেক্রেটারির অফিস থেকে। নাও ইউ...”

“আমি আসছি!” তুর্ঘর কথা শেষ হওয়ার আগেই বলে উঠল সেগেই। “আই নিউ ইট!” ঠোঁটের কোণে একচিলতে মুচকি হাসি নিয়ে ক্রিন থেকে মিলিয়ে গেল মুখখানা।

রাত প্রায় সাড়ে দশটা। ফোনটা বিছানায় নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল তুর্ঘ। বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে সাবা। সারাদিনের ক্লান্তি! দেখে বড় মায়ী হল। আলতো করে মেয়েটার মুখে হাত বুলিয়ে এসে দাঁড়াল টেরেসে। বাঁক বাঁক তারা মরুশহরের রাতের আকাশে! একটা সিগারেট ধরিয়ে একদৃষ্টে অনেক ক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে। তার পর ঘরে ফিরে এসে গুড়িসুড়ি মেরে শুয়ে পড়ল বিছানায়, সাবার পাশে।

ঠিক তিন দিন পর। সন্দের মুখে মুখে পেন্টহাউসের লনে মুখোমুখি বসা তুর্ঘ আর সেগেই। “জেট ল্যাগ কেটেছে তো কমরেড? ঘুমটুম হয়েছে ঠিকঠাক?” সিগারেটের প্যাকেটটা সেগেইয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রশ্ন করল তুর্ঘ।

“পুরোপুরি। অনেকটা ফ্রেশ এখন।” হেসে জবাব দিল সেগেই।

“সো লেটস কাম টু দ্য পয়েন্ট।” চেয়ারটা টেনে একটু সামনে এগিয়ে এল তুর্ঘ। “সুলতানের এখানে এই কদিনে যা যা ঘটে গেছে, তুমি মোটামুটি জানো সে সব। তাই এ নিয়ে আর ডিটেলে যাচ্ছি না। বরং এই

ক’দিনে এখানে আমার এক্সপেরিয়েন্সের ব্যাপারে একটু বলি।” একটা চোর দৃষ্টিভঙ্গির ছাপ খেলে বেড়াচ্ছে ধূসর নীল চোখের মণিজোড়ায়। “আমি এ দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে সুলতানের নিরাপত্তা ব্যবস্থাতা কী রকম টিলেচালা হয়ে গেছে যেন। হয়তো একদিনে এটা ঘটেনি। সময় লেগেছে। তবে গা-ছাড়া ভাবটা যে রয়েছে, সেটা নজর এড়ায়নি আমরা। আসলে এটাই হওয়ার কথা। এ রকম একটা দেশ, অপরাধের হার একেবারেই নগণ্য। কিন্তু দিনকাল যে কত দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে তার আন্দাজ পাওয়াই হয়তো সম্ভব হয়নি এখানকার অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পক্ষে। ফলে এ রকম একটা তাণ্ডব চালিয়ে বেরিয়ে যেতে পেরেছে ওই বেজমাগুলো। সব দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে, হিজ হাইনেসের সিকিওরিটি সিস্টেমটাকে ঢেলে সাজানো দরকার। মোটামুটি জনাপনেরোর চূড়ান্ত পেশাদার একটা দল। প্রত্যেকেই এক্স কে জি বি। এক্স স্মার্স হলে আরও ভাল হয়। একটা রকসলিড সিকিওরিটি সার্কেল ঘিরে তুলবে সুলতানকে ঘিরে। শুধু নিরাপত্তাই নয়, এ দেশের কোথাও কোনও রকমের গোপন নড়াচড়া হচ্ছে কি না সে ব্যাপারেও কড়া নজর থাকবে এদের। এই টিমটার আন্ডারে থাকবে এখানকার নিরাপত্তা বিভাগের বাছা বাছা সব লোকজন। তাদের সবাইকে গড়েপিটে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের এই টিমটার। আর সব মিলিয়ে এই নেটওয়ার্কটার মাথায় থাকবে তুমি, সেগেই মিখাইআলভ। নো ওয়ান এল্‌সু।”

শোনামাত্র ভীষণ চমকে উঠে ত্বর্যর দিকে তাকাল সেগেই। “আর ইউ ক্রেজি, বোস! একটা লোক, তার দুটো পা নেই। তাকে তুমি এত বড় একটা...”

সেগেইয়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই ওকে একটা প্রবল ধমক লাগাল ত্বর্য, “ডেন্ট টক শিট, ইউ স্টুপিড বাগার! ওটা এখন একটা পাস্ট স্টোরি তোমার কাছে। এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ ধরে সে দিন হেঁটে আসছিলে তুমি, আগে থেকে জানা না থাকলে আমিও কিছু বুঝতে পারতাম না, বাকিরা তো দূরের কথা। আর শুধু পা?...” বলতে বলতে সেগেইয়ের দুই বাহুমূল খামচে ধরল ত্বর্য। “এ দুটো এখনও একটা ভাল্লুকের বাড় ভেঙে দিতে পারে। আর সবার উপরে এই এটা।” ত্বর্যর ডান হাতের তর্জনী উঠে গিয়ে স্থির হল সেগেইয়ের কানের পাশে, “এর মধ্যে ওই যে ঘোলাটেপানা বস্তুটি আছে, তার জোর বাকি দুটোর চেয়ে অনেক বেশি। সো নো মোর ট্রিকি প্লে। আমি দেশ ছেড়েছি বহুকাল। এক্স কলিগদের কে কোথায় আছে, কোন অ্যাসাইনমেন্টে আছে, কিস্যু জানা নেই। তোমার কাজ তাদের মধ্যে সেরাদের বেছে বেছে এখানে নিয়ে আসা। প্রয়োজনে বেশি টাকা কবুল করে। মানি ইজ নট আ প্রবলেম। দেশে লিদিয়া, ভ্যালি ওরা সবাই রয়েছে। ওখানে স্কুলের ব্যাপারটা দু’জনে ভালই ম্যানেজ করে নিতে পারবে। এখানে ইন্টারভিউ, সিলেকশন, টিম বিল্ডিং, সব দায়িত্ব তোমার। পুরো ব্যাপারটা গুছিয়ে তবে মস্কো যাওয়ার জন্য এক মাসের ছুটি পাবে।”

কথার মাঝখানেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো সাবা। হাতে ত্বর্যর ফোন। “হেই বোস, ইয়োর কল বাড়ি।” ফোনটা ত্বর্যর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ফের ঢুক গেল বাড়ির ভেতরে। কানে তুলতেই লাইনের ওপারে হামিদ। সেই পুরনো কে জি বি-র কোড ভাষায় কথা। “সাম মোস্ট ভাইটাল ইনফরমেশনস, কমরেড বোস। সুলতানের দেশে হামলাটা চালিয়েছিল রশিদি। রশিদি ওসোমানু। আ মোস্ট নটোরিয়াস ম্যুরিশ ট্রাইবাল লিডার। টিম্বাকটু, মালি লাগোয়া ওই দেশটার বাসিন্দা। মেনলি চারটে খান্দা। স্নেড ট্রেডিং, কন্ট্রাস্ট কিলিং, মারিজুয়ানা কাল্টিভেশন আর আমারই মতো আর্মস ট্র্যাফিকিং। পুরো আফ্রো-আমেরিকান আর মেক্সিকান কার্টেল এর পেছনে থাকলেও রশিদির সুপারিটা দিয়েছিল জোয়াকিম। পুরো নাম জোয়াকিম হার্নান্ডেজ। আগে এল চ্যাপো কার্টেলে খুব ইম্পোর্ট্যান্ট পজিশনে ছিল। এল চ্যাপো গ্রেফতার হয়ে যাওয়ার পর নিজের গ্যাং খোলে আর অল্প দিনের মধ্যে এই দুই কার্টেলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চলে যায়। মেক্সিকো থেকে শুরু করে সেই গুয়াতেমালার সীমান্ত অবধি একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গভীর জঙ্গল আর ছোটবড় পাহাড়। ওই দুর্গম এলাকা জুড়ে খুব কম করেও তিরিশটা কোকেন প্রসেসিং ল্যাবরেটরি চালায় জোয়াকিম। সীমানা

পেরিয়ে মার্কিন মুলুকে পৌঁছোয় ওর প্রোডাকশন। এর পর গোটা স্টেটস জুড়ে সেটা ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্ব ওখানকার ব্ল্যাক আমেরিকান আর মেক্সিকান গ্যাংদের। এই সিস্টেমে চলে কার্টেলের বিশাল নেটওয়ার্ক। সব মিলিয়ে প্রায় হাজার তিনেক গ্যাংস্টারের একটা প্রাইভেট আর্মি রয়েছে এদের। কার্টেলের আরও চার নেতা— রবার্তো মন্টানা, মারিও সিলভা, দিয়েগো সাঞ্জেজ আর জেফ জনসন। এই চার জনের উপর জোয়াকিমের প্রভাব বেশ ভালরকম। কানাঘুষো যা শোনা যাচ্ছে, মূলত ওর জোরাজুরিতেই নাকি সুলতানের দেশে হামলা চালানোর ব্যাপারে খানিকটা নিমরাজি হতে হয়েছে বাকি চার জনকে। আর হ্যাঁ, আর-একটা খবর মনে হয় তোমার কাছে খুব জরুরি। একটা নাম। জালালি মুস্তাফা। গত বেশ কয়েকদিন ধরে ওর বেশ কিছু ফোন গেছে খাদেম আর রশিদির কাছে। লোকটা আগে সুলতানেরই একটা অয়েল ফিল্ডে ট্যাক্সার ট্রাক চালাত। পরে সে কাজ ছেড়ে দিয়ে আবু বিন খাদেমের ওখানে জয়েন করে লোকটা।”

শোনা মাত্র একটা তীব্র বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গেল সারা শরীরে! দম চেপে মুহূর্তকয়েক নিজেকে সংযত করল ত্বর্য। তার পর খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, “শুক্ৰিয়া হামিদ, আজ আমার হাতে একটা ট্রেজার মাইন তুলে দিলে তুমি। শুধু আর-একটা আন্দাজ দাও, এই রশিদির কাছে পৌঁছানো যায় কীভাবে?”

জবাবে খুকখুক একটা হাসির শব্দ লাইনের ওপারে। “কোনও কিছুই দরকার নেই কমরেড, টিম্বাকটুর সবচেয়ে বড় বাজার এলাকাটায় গিয়ে কেজি বিশেক মারিজুয়ানা বা গোটাকয়েক লেটেস্ট মডেলের অটোম্যাটিক কিনতে চাও, এ কথাটা শুধু একটু ফিসফাস ছড়িয়ে দিতে হবে এ দিক ও দিক। তার পর আর রশিদির খুঁজতে হবে না, ও-ই তোমাকে খুঁজে নেবে।”

“থ্যাঙ্ক ইউ ওয়ান্স এগেন মাই কমরেড। এর বিনিময়ে যা পাবে, আশা করি সেটা খুশি করবে তোমাকে। অ্যামান্ডাটা কোথায় কীভাবে পাঠাতে হবে, জানিয়ে দিও একবার।” বলল ত্বর্য।

“শুক্ৰিয়া কমরেড বোস, খুদা হাফিজ।” কেটে গেল লাইনটা।

ফোনটা ছেড়েই সুরতা প্রধান হাবিবির নম্বর ডায়াল করল ত্বর্য। “হ্যালো”— বারতিনেক রিং হওয়ার পর পুলিশ-কর্তার গলা লাইনের ওপারে। “জালালি মুস্তাফা নামে আবু খাদেমের অয়েল ফিল্ডের এক জন ড্রাইভার। ইমিডিয়েটলি লোকেশন ট্র্যাক করে হেফাজতে নিতে হবে লোকটাকে। লোকেশন ট্র্যাক হওয়া মাত্র আমাদেরও জানিয়ে দেবেন মেহেরবানি করে। আপনাদের পাশাপাশি আমারও ওখানে পৌঁছানোটা খুব জরুরি।”

লাইনটা কেটেই সাবাকে ফোনে ধরল ত্বর্য। “এনি ডে ইউ আর বেটার ড্রাইভার দ্যান মি। অলওয়েজ ইউ সে দ্যাট। খুব তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নেমে এসো নীচে। আমাদের বেরোতে হবে এখনি!” লাইনটা ছাড়তে না ছাড়তেই একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ঢুকল ফোনে: ‘লোকেশন ট্র্যাকড। আবু খাদেমস অয়েল ফিল্ড নাম্বার ফাইন্ড। রাইট সাইড অব দ্য হাইওয়ে। লেন নাম্বার থ্রি। নিয়ার অ্যাবাউট সেভেন কিলোমিটার্স ফ্রম ইয়োর প্লেস। ফর ফারদার কোয়ারিজ, কন্ট্যাক্ট মি।’

পড়া শেষ করেই সেগেইয়ের দিকে তাকাল ত্বর্য। “তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো, কমরেড। তোমার কাজ শুরু হয়ে গেল আজ থেকেই। ফিরে এসে আরও কথা বলার আছে তোমার সঙ্গে।” কথার মাঝখানেই গ্যারাজ থেকে বেন্টলিটা বের করে আনল সাবা। দু’জন গিয়ে বসতেই তিরগতিতে পেণ্টহাউস চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে গেল চারচক্রযান।

হাইওয়ের ধারে বিশাল জায়গা জুড়ে অয়েল ফিল্ড। মূল চত্বরে ঢোকার আগে অনেকখানি খোলা জমিতে সার দিয়ে দাঁড়ানো হেভি ডিউটি গোটাদশেক ভীমকায় ট্যাক্সার ট্রাক। গাড়িগুলোর পিছনেই একটু দূরে ব্যারাক ধাঁচের একটা দোতলা বাড়ি। টানা বারান্দা আর একের পর এক দরজা। ডিউটি থেকে ফিরে ড্রাইভার্স কোয়ার্টারে নিজের ছোট ঘরে বিছানায় শোওয়া মুস্তাফা। মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। ওই আমরিকি বদমাশগুলো আর রশিদির দিক থেকে আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। তার

চেয়েও চিন্তার ব্যাপার যেটা, জনাব খাদেম সাহাবেরও কোনও ফোন আসছে না অনেকদিন। খবরে বলছে, পুরো খানদান নিয়ে মার্কিনদের মূলক্ ছেড়ে পালিয়েছেন আমিরসাহাব। কে জানে কোথায় গেছেন! মানুষটার কাছ থেকে অনেক পেয়েছে মুস্তাফা। বিবিবাচ্চারা সব মার্কিন মুলুকে অনেক দিন হল। খাদেম সাহাবই সব বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। সেই শালা খতরনাক রুশিটার বৌটাকে পিষে মারার পর থেকে সম্পর্কের শুরু। তার পর থেকে যখন যা খবর মিলেছে, পৌঁছে দিয়েছে আমির সাহাবের কানে। নমকহারামি করেনি কোনওদিন। তার বদলে ওর দু’হাত ভরে দিয়েছেন সাহাব। কিন্তু আর না। অনেক হয়েছে। কেন জানি না মনে হচ্ছে, নিজের চারপাশটা কী রকম যেন ছোট হয়ে আসছে দিন কে দিন। চার দিকে কড়া পাহারা। প্রত্যেকটা অয়েল ফিল্ডের দরজায় ২৪ ঘণ্টা মোতায়েন দু’জন করে সুরতা। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে, এ মূলক্ থেকে ফারার হওয়ার সময় এসেছে এ বার। পহেলা মওকাতেই... এ সব চিন্তাভাবনার মাঝখানেই কর্কশ আওয়াজে বেজে উঠল কলিং বেলটা। পরমুহূর্তে একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর— “আফতাহাল বাব (দরজা খোলো)!”

এক ঝটকায় বিছানায় উঠে বসল মুস্তাফা! এ সময় তো কারও আসার কথা নয়! বিছানা ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে নিঃসাড়ে চোখ রাখল আই হোলে। দরজার সামনে এক জন সুরতা। তার পেছনেই দাঁড়িয়ে সুরতা প্রধান হাবিবি, একটা বিশাল চেহারার কাফ্রি মেয়ে, পাশে এক জন সাদা মানুষ। আর সবার মাঝখানে বরফের মতো ঠান্ডা ঘঘা নীলচে একজোড়া চোখ। আজ থেকে অনেকগুলো বছর আগে পিষে দলা পাকিয়ে যাওয়া গাড়িটার সামনে ওই চোখজোড়াই উদভ্রান্ত, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। মুহূর্তের মধ্যে পাথরের মতো জমে গেল মুস্তাফা! আমির খাদেম সাহাবের দুই তুতো ভাইয়ের কী হাল হয়েছিল, কীভাবে নিজের প্রাণ হাতে করে বিবিবাচ্চা নিয়ে মার্কিন মুলুকে পালাতে হয়েছিল খোদ আমির সাহাবকে, সেটা তার জানা আছে খুব ভাল ভাবে। আর এ বার তো খাস নিজের জন্য এসেছে লোকটা। ওর কজায় পড়লে পরবর্তী বেঁচে থাকাটা হাবিয়া দোজখের (অনন্ত নরক) চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।

ছুটে গিয়ে টয়লেটে ঢুকল মুস্তাফা। কমোডের উপর উঠে দাঁড়িয়ে নজর চালাল ঘুলঘুলিটা দিয়ে। পেছনের একফালি জমিটায় দাঁড়িয়ে আছে জনাদশেক সুরতা। হাতের পিস্তলগুলো তাক করা পিছনের জানলার দিকে। ঝটিতি নেমে এসে হাত ঢোকাল বিছানার তলায়। মোটা জাজিমের নীচে শোওয়ানো পুরনো একটা পয়েন্ট থ্রি টু কোন্ট রিভলবার। কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে নিয়েই ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দরজার উল্টোদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়ে। তত ক্ষণে মুহুমুহু ধাক্কা পড়তে শুরু করেছে দরজায়। সে ধাক্কার জোর বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। সেকেন্ডকয়েক পরই প্রবল এক লাথির আঘাতে আগল ভেঙে হাট হয়ে খুলে গেল দরজাটা। সামনে দাঁড়ানো সেই চোখদুটো! মুঠোয় রিভলবার আঁকড়ে ধরা হাতদুটো ঠকঠক করে কাঁপছিল মুস্তাফার। ওর দিকে এগিয়ে আসছে ঠান্ডা নীলচে চোখজোড়া।

“খবরদার! আর এক পাও এগোবে না। আমি কিন্তু গুলি চালিয়ে দেব!” জবাবে মাথার উপর দু’হাত তুলে, এতটুকু না থেমে শান্ত পায়ে এগিয়ে আসতে থাকল তুর্ঘ্য। পদক্ষেপের মতোই শান্ত কণ্ঠস্বর, “ওটা নামাও। আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই। প্লিজ, মুস্তাফা। আমার কথা শোনো। কোনও ক্ষতি হবে না তোমার। আই প্রমিস। প্লিজ, বিলিভ মি, মুস্তাফা! তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।” কাতর আবেদনের মতো শোনাচ্ছিল তুর্ঘ্যের কথাগুলো।

শোনাাত্র উম্মাদের মতো ঘর ফাটিয়ে চৌঁচিয়ে উঠল মুস্তাফা— “আই! আর এক ইঞ্চিও এগোবে না বলে দিচ্ছি। আমি কিন্তু...” বলতে বলতেই আচমকা কানের রগে রিভলবারটা ঠেকিয়ে ঘোড়া টেনে দিল। “থ্রাড!” কর্কশ ধাতব শব্দ একটা। ছিটকে বেরোনো রক্তে লাল হয়ে গেল জানলায় টাঙানো সাদা পর্দাটা। ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল মুস্তাফা। দ্রুত সেদিকে এগিয়ে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল তুর্ঘ্য। ঘোরে পাওয়া মানুষের মতো দৃষ্টি চোখে। কণ্ঠস্বর একই রকম শান্ত।

“কেন এ রকম করলে মুস্তাফা? তোমাকে কত কিছু জিজ্ঞেস করার

ছিল আমার। কেন মারলে মার্খাকে? ও তো কোন দোষ করেনি। বলো, বলো, প্লিজ টেল মি! ইউ মাস্ট হ্যাভ টু সে...” বলতে বলতে মুস্তাফার নিখর শরীরটাকে ধরে কাঁকাতে লাগল বারবার। ঘটনার অভিঘাতে বাকরুদ্ধ সবাই!

মিনিটখানেক পর সামনে এগিয়ে এসে তুর্ঘ্যর কাঁধে খুব আলতোভাবে হাতদুটো রাখল সাবা। “হি ইজ ডেড, বোস। নাউ লেটস গো হোম।”

ঘোরলাগা দৃষ্টিতে সাবার দিকে তাকাল তুর্ঘ্য। “হোয়াই ডিড হি ডু দ্যাট? মার্খা ওয়াজ রিয়ালি ইনোসেন্ট। দেন হোয়াইইই? লোকটা আমায় জবাব দিয়ে গেল না, সাবা!” বলতে বলতে তীব্র হাহাকারে সাবার কাঁধে ভেঙে পড়ল দুর্ধর্ষ সিক্রেট এজেন্ট।

স্যাভিয়ার দেশে ভ্যালেন্তিনাকে উদ্ধার করতে গিয়ে সাবার হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল তুর্ঘ্য, কালো মেয়েটার ভীষণ পাতলা ঘূমের জন্য। সাবার সেই চিরকলে পাতলা ঘূম অনেকদিন পর আজ আবার ভেঙে গেল মাঝরাত্রে। জানলার সামনে দাঁড়ানো বোস। কাচের ওপারে গাঢ় অন্ধকার। “ইউ ওয়্যার রিয়েলি ইনোসেন্ট মার্খা, মাই লাভ। দেন হোয়াই ডিড হি ডু দিস। হোয়াই, হোয়াই!...” “খুব নিচু গলায় ফিসফিস করে বলছি চলেছে বোস। পাথরের মতো শব্দ হয়ে বিছানায় শুয়ে রইল সাবা। শুধু মুখের উপর হাতের চাপটা বাড়ছিল প্রতি মুহূর্তে। যাতে জানলার সামনে দাঁড়ানো লোকটার কানে ফোঁপানোর আওয়াজটা কোনও ভাবেই না যায়।

দুপুরবেলা দেড়টা মতো হবে। পেটহাউসের লনে বড় ছাতাটার তলায় বসা সেগেই। উল্টোদিকে পাশাপাশি সাবা আর তুর্ঘ্য। দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারা হয়ে গেছে বেশ কিছু ক্ষণ আগেই। এই মুহূর্তে ছোট সেন্টার টেবিলটায় সেগেইয়ের সামনে খোলা একটা ল্যাপটপ। কি-বোর্ডে দু’চারবার আঙুল চালিয়ে মিনিটখানেক পর সেটা তুর্ঘ্যদের দিকে ঘুরিয়ে দিল সেগেই। “আমার চেনাজানা সেরা ১৫ জন প্রফেশনালের লিস্ট রয়েছে এখানে। এর মধ্যে ছ’জন, ছটা জায়ান্ট মাল্টিন্যাশনালে সিকিওরিটির টপ পজিশনে আছে। বাকি ন’জনের মধ্যে পাঁচ জন, আফ্রিকা আর আরবের কয়েকটা ছোট দেশে ডিফেন্স অ্যাডভাইসারের দায়িত্ব সামলাচ্ছে। এক জন ইওরোপের একটা নামী ফুটবল ক্লাবের মালিক এক রুশ বিলিওনেয়ারের প্রধান দেহরক্ষী। বাকি তিন জন কিছুদিন হল অবসর নিয়েছে। সবার রেজুমে ফাইল ডিটেলে ডাউনলোড করে রেখেছি তোমার জন্য।”

এক বলক নজর চালিয়ে যন্ত্রটা ফের সেগেইয়ের দিকে ঘুরিয়ে দিল তুর্ঘ্য। “যে লোকটা এদের বেছে নিয়েছে তার নাম সেগেই মিখাইলভ। আর তার বাছাই যে সেরা হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ বার তোমার কাজ, এদের মধ্যে সেরার সেরা দশ জনকে এ দেশে নিয়ে আসা। প্রয়োজনে অনেক বেশি টাকার প্যাকেজ অফার করেও। আজ থেকেই সে কাজটা শুরু করে দাও তুমি। তার আগে আমাকে মেক্সিকোর ওই শালা ড্রাগলর্ড জোয়াকিম হার্নান্ডেজ, মালটার কাছে কীভাবে পৌঁছানো যায় একটু বলো দেখি। ও দেশটা তোমার কাজের এলাকা ছিল বছদিন ধরে, তাই ফেভারটা চাইছি।” শোনার পর বেশ কিছু ক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে চূপ করে বসে রইল সেগেই। তার পর তাকাল তুর্ঘ্যর দিকে। “তার আগে তোমার মেক্সিকোর রাজনৈতিক ইতিহাসটা একটু বলি তোমায়। যদিও কিছুটা হয়তো তোমার জানা, তবুও দু’চারটা বিষয়ে আলোচনা হওয়াটা দরকার।” টেবিলে রাখা প্যাকেটটা থেকে একটা সিগারেট বের করে ধরাল সেগেই। তার পর বলা শুরু করল ধীর গলায়। “আমাদের দেশে, মানে সোভিয়েত বিপ্লবেরও আগে মেক্সিকোতে ওখানকার স্বৈরশাসক আর ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে বিপুল কৃষক অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৯১০ সালে। সেই বিদ্রোহের দুই প্রধান নেতা ছিল এমিলিও জাপাতা আর পাঞ্চো ভিয়া। দেখতে দেখতে মেক্সিকোর বেশিরভাগ প্রদেশই চলে যায় বিদ্রোহীদের দখলে। যেহেতু এ অভ্যুত্থান মূলত ছিল বামপন্থী ঘরানার, ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রমাদ গণে মার্কিনরা। তারা সরাসরি মদত জোগাতে থাকে ওখানকার স্বৈরশাসক আর ভূস্বামীদের। গোটা মেক্সিকো

জুড়ে বেধে যায় ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ। স্বৈরশাসকের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুখোমুখি লড়াইয়ে নিহত হন বিদ্রোহের অন্যতম নেতা জাপাতা। সেটা ১৯১৯ সাল। মার্কিন সরকার, তাদের পেটোয়া মেক্সিকোর শাসকরা ভেবেছিল এতেই বোধহয় এই বিদ্রোহ দমিয়ে ফেলা যাবে। কিন্তু ফল হল ঠিক তার উল্টো। নিজেদের সংহত করে আর-এক নেতা পাঞ্চেগ ভিয়ার নেতৃত্বে আরও প্রবলভাবে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিদ্রোহীরা। ততদিনে রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেবার জায়গায় উঠে এসেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এ বার তারা সরাসরি মদত জোগাতে শুরু করল বিদ্রোহীদের। যেহেতু এই বিদ্রোহীরা সবাই জাপাতার অনুগামী, ফলে এরা সবাই পরিচিত হয়ে যায় জাপাতিস্তা নামে। এর বেশ কিছুকাল পরে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে মেক্সিকোয় ক্ষমতায় আসে ভোটে নির্বাচিত সরকার। তবুও বিদ্রোহ থামেনি। দীর্ঘ আট দশকেরও বেশি এই গৃহযুদ্ধ চলার পর অবশেষে ১৯৯৬ সালে বিদ্রোহীদের সঙ্গে একটা সমঝোতা চুক্তি হয় সরকারের। কিন্তু তাতেও কৃষকদের একাংশের ক্ষোভের আঁচ পুরোপুরি মেটেনি। তার অন্যতম একটা কারণ হল কোকেন। দুনিয়ার মানুষ কোকেনকে একটা মারাত্মক ড্রাগ হিসেবে জানলেও পুরো লাতিন আমেরিকার কৃষক, বলা ভাল গরিব গ্রামীণ মানুষের কাছে কোকেনের মূল উপকরণ কোকা পাতা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়ুর্বেদিক ওষুধ। বছরকমের রোগব্যাধি এতে নিরাময় হয় বলে তাদের বিশ্বাস। কিন্তু সমস্যাটা শুরু হল যখন '৬০-এর দশকের শুরু থেকে ড্রাগ মافیয়ারা কোকা পাতা থেকে কোকেন বানাতে শুরু করল। স্বাভাবিকভাবেই এই বিষের মূল খরিদাররা হল পাশাপাশি মার্কিন মুল্লুকের ধনী মানুষজন। ফলে স্যাম চাচাদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াল এই কোকেন। মেক্সিকোর সেনাবাহিনীকে সরাসরি মদত জুগিয়ে কোকেন যুদ্ধে নামিয়ে দিল তারা। এই সেনারা কোনরকম বাছবিচার করল না গ্রামের কোকেন চাষী আর ড্রাগ মافیয়াদের মধ্যে। নির্বিচারে পুড়িয়ে দিতে শুরু করল মাইলের পর মাইল কোকা ক্ষেত। অন্যদিকে জাপাতিস্তাদের সিংহভাগই যেহেতু আদিবাসী এবং কৃষক সম্প্রদায়ের, ফলে তাদের পুরো রাগটা গিয়ে পড়ল একইসঙ্গে স্যাম আঙ্কেল, মেক্সিকান গভর্নমেন্ট আর ড্রাগ মافیয়াদের উপর। ওই সময়টায় লুবিয়ান্সা স্ট্রিটের কন্তারা কোকা ফার্মারদের মদত জোগাতে পাঠিয়েছিলেন আমাদের একটা টিমকে। বছর পাঁচেক মেক্সিকোতে ছিলাম আমি। তখন ওখানে জাপাতিস্তা মুভমেন্টের বেশ কিছু নেতার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল আমার। আর আজ মেক্সিকোতে ড্রাগলর্ডদের মধ্যে মোস্ট পাওয়ারফুল যেহেতু জোয়াকিমের জাওয়ার কার্টেল, তাই ওর সঙ্গে জাপাতিস্তাদের শত্রুতা থাকাটাই স্বাভাবিক। কানাঘুষোয় শুনেছি মেক্সিকোর জঙ্গল এলাকাগুলোয় এখনও বেশকিছু ঘাঁটি এলাকা রয়েছে ওদের। ওইসব নেতাদের দু'-চার জনের কন্টাক্ট নাশ্বার এখনও রয়েছে আমার কাছে। দেখি কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যায় কি না।" বলে পকেট থেকে ফোনটা বের করে একটা নম্বর মেলাল সেগেই। বেশ কয়েক বার রিং হওয়ার পর ও প্রান্তে একটা গলা— "হ্যালো।"

"হ্যালো, কমরেড হলিয়ানো, আমি..." বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল সেগেই। তার পর কথা বলতে লাগল পায়চারি করতে করতে।

প্রায় আধঘণ্টা পর দীর্ঘ কথোপকথন সেরে ফের চেয়ারে এসে বসল সেগেই। "কথা হয়ে গেছে ওদের সঙ্গে। মেক্সিকোয় তোমার কন্টাক্ট পার্সনের নাম হলিয়ানো তোরেস। অনেকটা সময় ওখানে এক সঙ্গে কাজ করেছি আমরা। ওখানকার বেশ কিছু দুর্গম গ্রামে আজও টিকে থাকা বেশ কয়েকটা গোপন জাপাতিস্তা ঘাঁটির দায়িত্বে রয়েছে এই হলিয়ানো। ওই তোমাদের জোয়াকিমের সুলুক হৃদিশ সব বাতলে দেবে। তবে তার আগে ট্যুরিস্ট ভিসায় মার্কিন মুল্লুকে ঢুকতে হবে তোমাদের। সেখানে পাবে এক মেক্সিকান গাইডকে। নাম এদুয়ার্দো মার্তিনেজ। জাপাতিস্তাদের গোপন সমর্থক। নিয়মিত মেক্সিকোর জঙ্গল আর মায়া সভ্যতার নিদর্শনগুলো দেখাতে নিয়ে যায় ইউরোপিয়ান আর মার্কিন ট্যুরিস্টদের। ওই তোমাদের পৌঁছে দেবে হলিয়ানোদের ঘাঁটিতে। শুধু একটা ব্যাপারেই বড় চিন্তা হচ্ছে কমরেড—" গলায় একটা উদ্বেগের

ছোঁয়া সেগেইয়ের, "স্যামিভির ওই দেশটায় তুমি গেছিলে ভ্যালেন্তিনাকে রেসকিউ করতে। ফলে সুলতানের সাহায্য পেয়েছিলে তুমি। কিন্তু মেক্সিকোয় যাচ্ছ পিওরলি এক জন সিক্রেট এজেন্ট হয়ে। ওখানে তোমার কাজ অ্যাবসলিউটলি লাইক আ প্রফেশনাল অ্যাসাসিন। ফলে তুমি ধরা পড়ে গেলে তোমার দায়িত্ব নেওয়া সুলতানের পক্ষেও সম্ভব হবে না। এটা যে কোনও দেশেই স্পাই বা এজেন্টদের ভবিষ্যৎ। তোমার আমার চেয়ে সেটা আর কে ভাল জানে। আর সি আই এ বা এফ বি আইয়ের হাতে পড়লে বিপদটা আরও কয়েকগুণ বাড়বে বই কমবে না। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকাকালীন ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ছিল সাপে-নেউলে। সোভিয়েত ভেঙে যাওয়ার পরও সেটা বদলায়নি তেমন একটা। সো, বি ভেরি কেয়ারফুল, কমরেড। কোনও রকম স্পোরাডিক ডিশিশন যেন তোমাদের বিপদে না ফেলে।"

"ডোন্ট ওয়রি, কমরেড।" সেগেইয়ের কাঁধে একটা হালকা চাপড় মারল তুর্চ। "আমরা ফিরবই। তুমি শুধু এদিকটা খেয়াল রাখো। সুলতানের জন্য একটা রকসলিড সিকিওরিটি সিস্টেম। তার মাথায় তুমি। হিজ হাইনেসের যেন সবসময় এটা মনে হয়, তুর্চ বোসের সাবস্টিটিউট উনি পেয়ে গেছেন। আমি জানি তুমি সেটা পারবে।"

"থ্যাংক ইউ" জবাবে হাসল সেগেইও, "ওয়ান মোর ইনফরমেশন, হানি ট্রাপ, মানে আমাদের লাইনের সেই পুরনো মেয়ে লেলিয়ে দেওয়ার ফাঁদ কিন্তু জোয়াকিমের ক্ষেত্রে কাজ করবে না। দ্যাট টাইরান্ট ইজ আ হার্ডকোর হোমোসেক্সুয়াল।"

"ইটস ওকে, সেগেই।" এত ক্ষণে পাশ থেকে কথা বলল সাবা। "আগে তো আমরা রশিদিকে একটু দেখি। লেট আস সি, হাউ গুড দ্যাট মাদারফাকার ইজ। ইয়েঃ!" বলেই বিশাল শরীর আর গুঁড়ি গুঁড়ি বিনুনির ঝাঁকড়া ড্রেডলক চুল দুলিয়ে হেসে উঠল গুমগুমিয়ে।

রাতের আকাশ। বাকবকে একটা রূপোর থালার মতো চাঁদ সাঁতার কেটে চলেছে খুব মিহি পঁজা পঁজা মেঘের মধ্যে দিয়ে। আলোয় আলোয় ভেসে যাচ্ছে মরুভূমির ছোট জনপদের বালুপ্রান্তর। অনভিজ্ঞ চোখে যা সোনা বলে ভ্রম হতে পারে।

বালুভূমির মাঝখান চিরে চলে যাওয়া চওড়া বাঁধানো রাস্তা। রাস্তার ধারে জনপদের মূল বাজার এলাকা। সারি সারি একতলা হলদেটে পাথুরে স্রাবের একতলা দোকানঘর। আধা ক্যাপসুলের আকার দরজা, খুব নিচু নিচু তিন ধাপের পাথুরে সিঁড়ি আর দু'-লাঠির ভরে টাঙানো চওড়া পলিথিনের চাদর প্রত্যেকটা দোকানের সামনে। মরুভূমির রাতের ঠান্ডা হাওয়ায় সরসর শব্দে দুলছিল সেগুলো। দোকানে দোকানে বস্তায় বস্তায় সার দিয়ে সাজানো কফি বিন, পাথুরে নুন, শুকনো ফল, আনাঙ্গপাতি... আরও অনেক কিছু।

বাজারের সর সর পাথুরে গিলগুলোতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তুর্চ আর সাবা। তুর্চর পা থেকে মাথা অবধি মোড়া বেদুইন জোকায়া। কপাল বেড় দিয়ে বাঁধা বিড়ে পাকানো রোপটার নীচে চওড়া চোয়ালের মুখটা দেখা যাচ্ছে শুধু। সাবার পরনে কালো বোরখা। মুখটাও ঢাকা এক টুকরো কালো নেটের আড়ালে। কাঁধে ঝোলানো মাঝারি আকারের একটা সফট লেদার ব্যাগ। মাঝে মাঝে থেমে এক-আধটা দোকানে নিচু গলায় কিছু জিজ্ঞেস করছিল তুর্চ। এভাবে আধঘণ্টাটাক এ ধার ও ধার ঘোরাঘুরি করার পর একটা আলো-আঁধারি গলির বাঁকে পিঠে শক্ত একটা কিছুর খোঁচা লাগল দু'জনেরই।

"হান্দস আপ আন্দ মুভ!" ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে হুমকি দিয়ে উঠল কেউ। জবাবে একটাও প্রশ্ন না করে হাঁটতে শুরু করল দু'জন। বাজারের পেছনে রাস্তার ধারে দাঁড় করানো একটা লড়বড়ে ছড়খোলা টয়োটা মালবাহী ভ্যান। ডেকের দু'ধারে আটকানো দুটো লোহার বেঞ্চি। "গো!" "সিতা!" ফের ধমক পেছন থেকে।

এগিয়ে গিয়ে তড়িঘড়ি উঠে বসল দু'জনে। সঙ্গে সঙ্গে দুটো কালো কাপড়ের ঠুলি এঁটে দেওয়া হল দু'জনের মুখে। বালু উড়িয়ে বেরিয়ে গেল টয়োটা ভ্যান।

লোহার বেঞ্চিতে বসে তীব্র ঝাঁকুনির মধ্যেও সময়টা খেয়াল রাখার

চেষ্টা করছিল তুর্ঘ্য। একই ভাবে রাস্তার প্রতিটি বাঁককেও। প্রায় আধঘণ্টা ধরে একনাগাড়ে ছুটেছে গাড়িটা। এর মধ্যেই দু'বার ভাইনে বাঁক নিয়েছে। তবু এত ক্ষণ পরও কোমরের কাছে নলের চাপটা হালকা হয়নি এতটুকু।

আরও মিনিট পনেরো পর প্রচণ্ড গতিতে চলতে চলতেই আচমকা 'কিইচ' শব্দে বাঁয়ে মোড় নিল গাড়িটা। এর মিনিটপাঁচেকের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল ব্রেক কষে। "গেত আপ!" ফের ধমক কানের কাছে। গাড়ি থেকে নেমে কয়েক পা এগোনোর পর থামার নির্দেশ— "স্তুপ!"

পরমুহূর্তেই মুখ থেকে সরে গেল ঠুলির ঢাকনা।

একটা ছোট ঘর। পাথুরে দেয়াল। মাঝখানে একটা অমসৃণ কিন্তু মজবুত লম্বাটেপানা কাঠের টেবিল। মাঝারি পাওয়ারের একটা এল ই ডি আলো জ্বলছে। টেবিলের উল্টোদিকে চেয়ারে বসা এক জন। পোড়া তামাটে রং। কপাল থেকে ডান দিকের চোয়াল অবধি আড়াআড়ি টানা একটা কাটা দাগ। মুখ ছাড়া শরীরের বাকি অংশ জোব্বায় ঢাকা থাকলেও লোহাপেটা গড়নটা আন্দাজ করা যায় খুব ভালমতো। লোকটার দু'পাশে এ কে ফিফটি সিগ্ন হাতে দাঁড়ানো দু'জন। সম্ভবত এরাই নিয়ে এসেছে তুর্ঘ্যদের দুজনকে।

শিকারি ইগলের দৃষ্টিতে ওদের দু'জনকে আপাদমস্তক একবার মেপে নিল লোকটা। তার পর ঘ্যাড়ঘ্যাড়ে গলায় প্রশ্ন করল, "নো ইংলিশ?"

"ইয়া!" ঘাড় নাড়ল তুর্ঘ্য।

"আর্যাবিক?" প্রশ্ন ফের একবার।

"লিতল লিতল।" কথায় ভাঙা ভাঙা ভাবটা হচ্ছে করেই বজায় রাখল তুর্ঘ্য।

"ওকে, তক আর্যাবিক।" বলেই সরাসরি আরবিতে চলে এল লোকটা। "নাম কী?"

"নাজিম সুলেমানভ।" অল্লানবদনে জবাব দিল তুর্ঘ্য।

"সঙ্গে কে?"

"মোহুতর্মা।" তুর্ঘ্যর জবাবটা পাওয়ামাত্র ঘ্যাঁকঘ্যাঁক করে হেসে উঠল লোকটা। "বাপরে! এ তো মেয়ে নয়, একটা হেভিভি ড্রাক। বিছানায় লড়তে পারে?"

জোব্বার আড়ালে থাকা পা দিয়ে সাবার পায়ে আলতো একটা চাপ দিল তুর্ঘ্য। এই সময় মেজাজ হারালে সব গন্ডগোল হয়ে যাবে। তার বদলে একটা কাঠ-কাঠ হাসি হাসল শুধু।

তত ক্ষণে একটু সহজ হয়ে এসেছে লোকটার চোখের ভাষা। "আসসালামু ওয়ালাইকুম। আমি রশিদি।"

"ওয়ালাইকুম আসসালাম," গলায় কাঠ-কাঠ ভাবটা জিইয়ে রাখল তুর্ঘ্য।

"কোন দেশ?" ফের প্রশ্ন উড়ে এল টেবিলের ওদিক থেকে।

"রুশ।" সংক্ষিপ্ত উত্তর তুর্ঘ্যর।

"রুশের কোথায়?" ঞ্জ জোড়া ফের কুঁচকে গেল রশিদির।

"চেচনিয়া।"

জবাবটা শোনামাত্র বিলিক দিয়ে উঠল ঈগল চোখে। "চেচনিয়া! খুব জোর লড়াই দিচ্ছে ওই শালা মস্কোওয়ালাদের সঙ্গে। কিন্তু তুমি রুশি আর এই মাগিটা তো আফ্রিকি। হাতের রং দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কী ভাবে...?"

"ও নাইজেরিয়ান। নাম হাসিবা মুস্তারি—" শেষ করার আগেই রশিদির মুখের কথাটা কেড়ে নিল তুর্ঘ্য। "বোকো হারাম দলের। ওখানে ট্রেনিং দিতে গিয়েছিলাম... তখনই..."

"কেয়া খুবা!" চোঁচিয়ে উঠল রশিদি।

"গোরা আর কালা। শালা লড়াই জমে যাবে অ্যাক্বেবারে।" পরমুহূর্তেই দোতানা ভাবটা ফিরে এল গলায়।

"পাসপোর্ট?"

"এই যে—" জোব্বার ভেতরের পকেট থেকে নিখুঁত দুটো জাল পাসপোর্ট বার করে এগিয়ে দিল তুর্ঘ্য। ভাল করে সেগুলো না দেখেই ফের সামনে ঠেলে দিল রশিদি। "ঠিক আছে, ঠিক আছে। এ বার তোমাদের ব্যাপারটা বলা। বাজার থেকে যতটুকু খবর পেলাম, দু-একটা

খেলনাপাতি খুঁজছ তোমরা। তা কী ধরনের খেলনা চাই তোমাদের?"

"পিস্তল বা রিভলবার নয়, আর-একটু বড় কিছু।" দু'হাত ছড়িয়ে আকারটা দেখাল তুর্ঘ্য। "ফুললি অটোম্যাটিক, সেলফ লোডেড কিন্তু ওজনে হাল্কা। যেন অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে আলাদাভাবে রাখা যায়। একটুও গরম না হয়ে একটানা গুলি চলবে ম্যাগাজিনে শেষ বুলেটটা থাকা পর্যন্ত। আছে এ রকম কিছু তোমার কাছে?"

"হ্যাঁ, তা আছে এ রকম তিনখানা।" পাশে দাঁড়ানো বন্দুকধারীদের মধ্যে এক জনের দিকে ইশারা করল রশিদি। দেয়ালের এককোণে বড় একটা কাঠের আলমারি। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র এগিয়ে গিয়ে লক খুলে তিনটে ফুললি অটোম্যাটিক অ্যাসল্ট রাইফেল বের করে এনে টেবিলে সাজিয়ে রাখল বন্দুকধারী। "এটা টোকোরেন্ড আই সিগ্ন, এটা গ্যারান্ড কুগার ফিফটিন, আর এটা টার্কিশ ওডোস টুয়েলভ। এর মধ্যে কোনটা, কতগুলো নিতে চাও?" জিগ্যেস করল রশিদি।

"আপাতত একটা। স্যাম্পল হিসেবে। রেজাল্ট ভাল পেলে বড় অর্ডার দেব। কোনটার কত দাম পড়বে?" প্রশ্ন করল তুর্ঘ্য।

"গড়ে দেড় হাজার রিয়াল। ক্যাশ এনেছ? আমার এখানে আবার পুরো কারবারটাই নগদে।"

রশিদির কথার জবাবে সাবার দিকে তাকাল তুর্ঘ্য। কাঁধ থেকে চামড়ার ব্যাগটা নামিয়ে সামনে এগিয়ে দিল সাবা। একটানে চেনটা খুলে ফেলল রশিদি। ভেতরে সাজানো বেশ কয়েকটা নোটের বাউল। একটা বাউল তুলে ফরফর শব্দে ফাটিয়ে দেখল বারদুয়েক। তার পর ইঙ্গিত করল টেবিলের বন্দুকগুলোর দিকে। "বেছে নাও যেটা ইচ্ছে।"

বেশ কিছু ক্ষণ বন্দুক তিনটে নাড়াচাড়া করল তুর্ঘ্য। শেষে ফের তুলে নিল ওডোসটা। ম্যাগাজিন খুলে নজর চালাল ভেতরে। লাইন দিয়ে সাজানো বুলেট। "চিন্তা করো না বেরাদার।" চোখ মেরে খ্যাঁকখ্যাঁকিয়ে হেসে উঠল এক বন্দুকধারী। "প্রত্যেকটার পেট একেবারে পোয়াতি মাগির মতো ভর্তি।"

"এটার সাইলেন্সার পাওয়া যাবে?" ম্যাগাজিনটা ফের বন্দুকে লাগিয়ে রশিদির দিকে তাকাল তুর্ঘ্য। "বুঝতেই পারছ, মারোসাঝে ছিপেছাপে কাজ সারতে হয়।"

"পাওয়া যাবে," মুহূর্তে পাকা ব্যবসাদারের মতো হয়ে উঠল রশিদির কথাগুলো, "তবে তার জন্য আলাদা দাম লাগবে।"

"পাবে। তুমি মাল দেখাও।" পাশ থেকে বলল সাবা। শোনার পর তুর্ঘ্যর দিকে তাকাল রশিদি। হাল্কা মাথা নাড়ল তুর্ঘ্য। আলমারির লকার খুলে একটা সাইলেন্সার বার করে এনে সামনে রাখল আর-এক বন্দুকধারী। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভাল করে সেটাকে নলের মুখে আটকাল তুর্ঘ্য। তার পর বন্দুকটা তুলে খুব ঠান্ডা মাথায় পরপর তিনটে গুলি চালাল তিন জনের বুকে। কাটা কলাগাছের মতো ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল দুই বন্দুকধারী। চেয়ারে বসা রশিদি। বুকের বাঁ দিকে একটা ফুটো। রক্ত গড়িয়ে নামছে ফুটোটা দিয়ে। ঠোঁটের কষ দিয়েও চলকে চলকে উঠে আসছে রক্ত। ভিজ়ে লাল সপসপে কালো জোব্বা। প্রবল বিস্ময়মাথা চোখে তুর্ঘ্যর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রশিদি। এই মুহূর্তে যা ঘটে গেছে সেটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যেন। মুচকি হেসে এগিয়ে গিয়ে সেই বিস্মিত চোখে চোখ রাখল তুর্ঘ্য। "এটা একটা ছোট তওফা সুলতানের দেশের তরফে। তোমাকে তাঁর সালাম জানিয়েছেন হিজ় হাইনেস।" বলেই রশিদির কপালে নলটা ঠেকিয়ে গুলি চালাল আর-একবার। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারে এলিয়ে পড়ল মাথাটা।

ঘরটা থেকে মিটারবিশেক দূরে দাঁড়িয়ে ছিল টয়োটা স্টেশন ওয়ানগনটা। ডাইভারের সিটে গা এলিয়ে সিগারেটে সুখটান লাগাচ্ছিল খলিলি। হঠাৎই কানে এল 'থাগ' 'থাগ' ভেঁতা আর চাপা শব্দগুলো। ঝটিতি গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল খলিলি। সিগারেটটা বালিতে পিষে কোমর থেকে বের করে আনল রেমিংটন নাইন এম এম পিস্তলটা। তার পর খুব সন্তুর্পণে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সামনে। এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ভেতরে ঢুকতেই দরজার পাশ থেকে একটা বিশাল কালো প্রাগৈতিহাসিক বাদুড়ের মতো ওকে টেনে নিল সাবা। একটানে পিস্তল ধরা হাতটা তুলে সজোরে ঠুকে দিল পাথুরে দেয়ালে। নিমেষে হাতের

মুঠি আলগা হয়ে মাটিতে পড়ে গেল পিস্তলটা। পরমুহূর্তেই চোয়ালের তলায় সাঁড়াশির মতো চেপে বসল পাঁচটা আঙুল। অন্য হাতে মাথাটা ধরে দানবীয় একটা মোচড়। একটা ঘাড় ভাঙা প্লাস্টিকের পুতুলের মতো ঘরের মেঝেয় নেতিয়ে পড়ে গেল খলিলির শরীরটা।

লাশটাকে পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে বাইরে এসে দাঁড়াল তুর্ঘ। ফাঁকা প্রান্তরে সবচেয়ে কাছের বাড়িটা কম করে হলেও তিনশো মিটার দূরে। ভেতরে মিটমিটে আলো জ্বলছে। কেউ বেরিয়ে আসে কি না দেখার জন্য অপেক্ষা করল মিনিটদুয়েক। তার হাতের ইশারা পেয়ে টেবিল থেকে টাকার ব্যাগটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল সাবা। দরজার ছড়কেটা টেনে দিয়ে সোজা গিয়ে বসল চালকের আসনে। ভাল করে চারপাশটা আর-একবার দেখে নিয়ে দ্রুত গাড়িতে উঠে পড়ল তুর্ঘও। বালি উড়িয়ে বেরিয়ে গেল লজবড়ে স্টেশন ওয়াগনটা।

মেক্সিকোর এল পাসো। ছোট জনপদ সিউদাদ দ্য হুয়ারেজ। সারা দুনিয়া থেকে মেক্সিকোতে ঘুরতে আসা পর্যটকদের এ দেশে ঢোকার মূল প্রবেশপথ। বর্ডার সিকিওরিটি চেকিং অফিসের সামনে এসে থামল বিশাল ডেমলার টুরিস্ট বাসটা। যাত্রীরা প্রায় সবাই শ্বেতাঙ্গ। হয় ইউরোপীয় নয়তো মার্কিনি। সামান্য পাঁচ-ছ'জন জাপানি। খুব নিচু গলায় কথা বলছে নিজেদের মধ্যে।

বাসের সিটে পাশাপাশি তুর্ঘ আর সাবা। সাবার কাঁধে ছোট ব্যাগটায় নিখুঁত দুটো জাল পাসপোর্ট আর টুরিস্ট ভিসা সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র। যেখানে তুর্ঘ হাসল নিসকেনস। ডাচ নাগরিক এবং নৃতত্ত্ববিদ। এখানকার আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে গবেষণার কাজে যুক্ত। সাবা, তুর্ঘর স্ত্রী। নাম ক্লারা নিসকেনস। হাউসমেকার। এই নকল পাসপোর্টেই ওরা এ সফরে আগে তিনটে এয়ারপোর্ট পেরিয়ে এসেছে নির্বিঘ্নে।

থামা মাত্র বাস থেকে নেমে সার দিয়ে চেক পয়েন্টের দিকে এগিয়ে গেল পর্যটকরা সবাই। লাইনে দাঁড়ানো মাত্র হেসে তুর্ঘদের সামনে এগিয়ে এল বছর তিরিশের সপ্রতিভ চেহারার এক যুবক। ঝরঝরে ইয়াক্সি অ্যাকসেন্টে বলল, “হাই, আমি এদু। এদুয়ার্দো মার্তিনেজ। ওয়েলকাম টু মেক্সিকো। এই সফরে আপনাদের গাইড। যান, আপনাদের নথিপত্রের কাজ মিটিয়ে ফের ফিরে আসুন বাসে। এখান থেকে আপনাদের রিসোর্ট ঘন্টাড়েড়েকের পথ। ওখানেই কথা হবে।” কথা শেষ করেই অন্য টুরিস্টদের দিকে এগিয়ে গেল এদুয়ার্দো।

ঘন জঙ্গলের মাঝখানে রিসোর্ট অ্যাজটেক। দোতলা কাঠামোর পুরোটা কাঠ আর বাঁশে তৈরি। দোতলার পুর্বমুখো ঘরটা। এ রকম প্রত্যন্ত জায়গাতেও আধুনিক সুযোগসুবিধা বলতে যা বোঝায়, সেসব রয়েছে মোটামুটি। জানলার বড় কাচটার সামনে মুখোমুখি বসা সাবা আর তুর্ঘ। সামনে টেবিলে রাখা দুটো বড় কফি মাগ। অনেকখানি লম্বা বিমানযাত্রার ধকল কাটাতে দুপূরের লাঞ্চ সেরেই টানা একটা ঘুম দিয়ে নিয়েছে দু'জনে। শরীর অনেকটাই ঝরঝরে এখন। ব্ল্যাক কফিতে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে টেবিলের উপরে রাখা সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল সাবা। একটা সিগারেট বের করে দু'-চারটে টান দিয়ে এগিয়ে দিল তুর্ঘর দিকে। একটা রহস্যময় হাসি খেলে যাচ্ছে ঠোঁটের কোণে। “একটা কথা ভাবছি বলবো তোমাকে—” ঠিক তখনই কলিং বেলের ‘টিং টং’ দরজায়।

“কাম ইন।” স্বভাবসিদ্ধ উচু গলায় বলে উঠল সাবা। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল এদুয়ার্দো। মুখে আন্তরিক একটা হাসি। “গুড ইভনিং, দুপুরে ঘুমটুম ঠিকঠাক হয়েছে তো?”

“ইয়েঃ!” প্রত্যুত্তরে হাসল সাবা। “তা হলে, এ বার একটু কাজের কথা সেরে নেওয়া যাক।” চেয়ারে এসে বসল এদুয়ার্দো। “টুরিস্টদের যে দলটার সঙ্গে ঘুরতে যাচ্ছেন আপনারা, তাদের সঙ্গে আপনাদের প্রোগ্রাম মোট তিনদিনের। এই তিনদিনে আপনাদের এখানকার অ্যাজটেক আর মায়া সিভিলাইজেশনের নিদর্শনগুলো ছাড়াও এখানকার ফ্লোরা অ্যান্ড ফাউনা, ওয়াইল্ডলাইফ ঘুরিয়ে দেখাব আমি। ফোর্থ ডে আর্লি মর্নিংয়ে বাকি টুরিস্টরা সবাই চলে যাবেন। রয়ে যাবেন শুধু আপনারা দু'জন।

টুরিস্টদের বর্ডার পার করানোর কাজকন্মো মিটিয়ে দুপুর নাগাদ আমি ফিরে আসব এখানে। তার পর আপনাদের নিয়ে রওনা দেব সেনর হলিয়ানোর ওখানে। এই যে টুর প্যাকেজটা শেষ হওয়ার পরও আপনারাই শুধু এখানে থেকে যাচ্ছেন, এ নিয়ে যাতে বাকিদের মনে কোনও রকম সন্দেহ না জাগে তার জন্য আমাকে ওই নৃতাত্ত্বিক আর গবেষকের গল্পটা খাড়া করতে হয়েছে।” তুর্ঘর দিকে তাকাল এদুয়ার্দো। “তাই মেক্সিকোর প্রাচীন ইতিহাস, সেখানকার ইনডিজেনাস পিপল আর ওয়াইল্ডলাইফ, এ সব নিয়ে একটু পড়াশোনা করে নেবেন নেটে। আজ তা হলে উঠি, কাল ভোরে উঠে রেডি থাকবেন। শার্প সাতটায় আমরা রওনা দেব এখান থেকে। ওকে?” বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। দরজার দিকে এগোতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়াল ফের। চোখের কোণে কৌতুকের ঝিলিক। “চেক ডেস্কে আপনারা দু'জনে যখন আপনাদের পাসপোর্ট অ্যান্ড ডকুমেন্টস সাবমিট করছিলেন তখন পাশ থেকে সেগুলো দেখছিলাম আমি। জাস্ট ইনফ্রেডিবল! আসল কাগজপত্রও তো এতটা নিখুঁত হবে না!”

এদুয়ার্দোর কথা শেষ হওয়া মাত্র ঘর কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠল সাবা। “ইউ আর রিয়ালি আ ফাকিং জিনিয়াস বোস, মাই বেবি!” বলেই জড়িয়ে ধরে সশব্দে একটা চুমু খেল তুর্ঘর গালে।

“সো, হ্যাভ আ নাইস টাইম, গুড নাইট!” হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এদুয়ার্দো। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তুর্ঘ। বিছানায় রাখা টুরিস্ট ব্যাগটার জিপার খুলে বের করে আনল ল্যাপটপটা। তার পর আলতো একটা চাপড় মারল সাবার পিঠে। “এন্যাব অব ফান বেবি। এ বার ঘন্টাদুয়েক এ দেশটা নিয়ে একটু পড়াশোনা করতে হবে আমাদের। তার আগে রিসেপশনে কড়া করে দু'কাপ ব্ল্যাক কফি উইথ রাম অর্ডার করে দাও না, প্লিজ।”

উঠে গিয়ে বিছানার ধারে ছোট ক্যাবিনেটটার উপর রাখা ইন্টারকমের রিসিভারটা তুলে নিতে নিতে হঠাৎই সাবার মনে পড়ল, এই যাঃ! বোসকে তো বলা হল না কথাটা। বলতে গিয়েও মত বদলাল মুহূর্তে। নাঃ, জরুরি কাজটা সেরে নেওয়া যাক আগে। “টু ডার্ক ব্ল্যাক কফি উইথ রাম।” অর্ডার দিয়ে চুপচাপ এসে বসল তুর্ঘর পাশে।

একটু দেরিতেই, সকাল আটটা নাগাদ ঘুম ভাঙল সাবার। আসলে গত তিন দিন ধরে সেই সকাল থেকে সঙ্গে অবধি টুরিস্ট সেজে ঘুরে বেড়ানোর ধকল। এর পর রাতে রিসোর্টে ফিরে রোজই অন্তত ঘন্টাতিনেক বোসের সঙ্গে বসে এ দেশটার ব্যাপারে কিছুটা জেনেবুঝে নেওয়া ল্যাপটপ খুলে। ফলে প্রচুর ক্লান্তি জমেছিল শরীরে। গতকাল রাতে এসেই স্নানখাওয়া সেরে শুয়ে পড়েছিল দু'জনে। লম্বা একটা ঘুম। এখন ঝরঝরে লাগছে অনেকটা।

আধখোলা চোখে পাশ না ফিরেই সাবা হাত খাবড়াল বিছানায়। বোস বিছানায় নেই। ঘুরতেই চোখ গেল জানলায়। টুরিস্টদের কোলাহল নেই। এদুয়ার্দো বোধহয় বেরিয়ে গেছে ওদের নিয়ে। নিস্তব্ধ চারপাশ। জানলার কাচের ওপারে বাঁশের ব্যালকনিতে হাল্কা পূবের রোদ এসে পড়ছে। একহাতে কফি মাগ, অন্যহাতে সিগারেট। রেলিঙে হেলান দিয়ে একদৃষ্টে বাইরে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বোস। ইন্টারকমের রিসিভার তুলে একটা কফি অর্ডার করল সাবা। তার পর দরজা খুলে গিয়ে দাঁড়াল বারান্দায়।

“গুড মর্নিং!”

“মর্নিং, সুইটহার্ট!” জবাবে চকচকে একটা হাসি তুর্ঘর মুখে। “একটু আগে সেগেইয়ের ফোন এসেছিল। স্কাইপে তিন দফায় পনেরো জন পেশাদারের ইন্টারভিউ নিয়ে তার মধ্যে সেরা দশজনকে বেছে নিয়েছে ও। সবাই কমপ্লিট বায়ো-ডেটা অ্যান্ড আদার ডিটেলসও মেল করে দিয়েছে আমাকে। দশজনের মধ্যে চার জন এর মধ্যেই পৌঁছে গেছে ওখানে। বাকি ছ'জনও এসে পড়বে আজ আর কাল, দু'দিনের মধ্যে। নাউ উই হ্যাভ টু সি, হাউ দোজ বাস্টার্ডস গেট এন্ট্রি ওভার দেয়ার!” রেলিঙে একটা ঘুঁষি মেরে বলে উঠল তুর্ঘ।

দশটা নাগাদ ফিরে এল এদুয়ার্দো। “গেট রেডি ইউ পিপল,

হুলিয়ানোর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে আমার। ও বলে দিয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনাদের দু'জনকে নিয়ে রওনা দিতে। আজ অনেকটা পথ হাঁটতে হবে আপনাদের। চেনা ট্যুরিস্ট রুটে নয়। ফলে রাস্তা বেশ দুর্গম। যদিও পুরোটা আপনাদের সঙ্গে যাব না আমি। একটা স্পট থেকে আপনাদের দায়িত্ব নিয়ে নেবে ওরা। বেশিরভাগ পথটা ওদের সঙ্গেই যেতে হবে আপনাদের। তা হলে স্লিজ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি হয়ে নেমে আসুন। আমি নীচে অপেক্ষা করছি আপনাদের জন্য।” বলেই দ্রুত পায়ে নীচে নেমে গেল এদুয়ার্দো।

প্রায় দুপুর বারোটা। মাঝাকাশ থেকে আগুন ঢালছে সূর্য। মরুভূমির বালি, পাথরের চাঁই, ছোট ছোট টিলাপাহাড় আর দু'-তিন মানুষ সমান উঁচু উঁচু সব ক্যাকটাস গাছগুলোর পাশ কাটিয়ে এঁকেবঁকে হাঁটছিল এদুয়ার্দো। গরম হাওয়ার হলকা থেকে বাঁচতে মুখ, মাথা পেঁচিয়ে বাঁধা মোটা কাপড়। মাথায় বেতের টুপি। চলতে চলতে মাঝেমাঝেই আড়চোখে তাকাচ্ছিল পিছনে তুর্ঘ আর সাবার দিকে। অবাক লাগছিল প্রচণ্ড। একনাগাড়ে প্রায় ঘণ্টাদেড়েকের কাছাকাছি হাঁটা হয়ে গেল, এতটুকুও অস্বাচ্ছন্দ্য বা কষ্টকর প্রয়াসের ছাপ নেই হাঁটাচলায়। প্রবল পশ্চিমের ক্লাস্তি যেটুকু ওর নিজের ক্ষেত্রে, তার চেয়ে বেশি কিছু ধরা পড়ছে না দু'জনের চোখে। মনে হচ্ছে আজীবন যেন এই পথ ধরেই হাঁটছে ওরা।

আরও মিনিট পনেরো পর একফালি ফাঁকা ঘাসজমি। একটু আধটু সবুজ ঝোপঝাড়। মাঝখানে একটা কাপোক গাছ। আদিম মহীরুহের মতোই তার সুবিশাল শরীরটা তুলে আকাশ ছুঁয়েছে ডালপালা ছড়িয়ে। “ওয়েসিস! জাস্ট লাইক আওয়ার্স!” তাত্ক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় দু'-হাত গালে উঠে এল সাবার। বড় বড় দু'চোখে বালিকার বিস্ময়।

“আসুন, একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক। এর পর আবার অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।” বলতে বলতে কাপোক গাছটার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল এদুয়ার্দো। একটু দূরে ছোটবড় কয়েকটা পাথর। জলের বোতলটা খুলে একটা পাথরের উপর বসতে যাবে সাবা, ঠিক তখনি পায়ের কাছে ‘ট্রি র র’ — একটা বুঝবুঝি মতো শব্দ।

“সরে আসুন!” সঙ্গে সঙ্গে তীব্র চিৎকার এদুয়ার্দোর। শোনামাত্র পাথরটার উপর থেকে ছিটকে সরে এল সাবা। দুটো পাথরের খাঁজে আধো অন্ধকার জায়গাটায় আঙুল দেখাল এদুয়ার্দো। আলো-আঁধারি আবছায়ায় শুয়ে রয়েছেন তিনি। ধূসর বাদামি শরীরে অপূর্ব চৌখুপি নকশা। লেজের ডগাটা নড়েই চলেছে অবিরত। “ডায়মন্ড-ব্যাক র‍্যাটলস্নেক!” বলল এদুয়ার্দো। “স্থানীয় আদিবাসীরা একে বুঝবুঝি সাপ নামে ডাকে। বিপদ বুঝলেই এরা ল্যাংজটা নাড়ায় আর ওই আওয়াজটা বেরায়। সতর্ক করে দেয় ওর এলাকায় কোনও অনধিকার প্রবেশকারীকে। ভয়ঙ্কর বিষধর এবং সম্পূর্ণ নিশাচর। রাতের বেলা শিকারে বেরিয়ে ইঁদুর, পোকামাকড় ধরে খায়।”

শোনার পর হাঁটু মুড়ে বসে ভাল করে কিছু ক্ষণ সাপটাকে দেখল তুর্ঘ। তার পর ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল এদুয়ার্দোর দিকে তাকিয়ে, “গ্রাসিয়াস, কম্প্যানিয়েরো! আগে লাতিন আমেরিকার যেসব অঞ্চলে কাজ করেছি সেখানে দেখা পাইনি এদের। ছবিতে দেখলেও সামান্যামনি অভিজ্ঞতা এই প্রথম। সো, থ্যাঙ্ক ইউ এগেন, মাই ফ্রেন্ড!”

“ডোন্ট মেনশন ইট!” প্রত্যুত্তরে হাসল এদুয়ার্দো, “এ বার রওনা দেওয়া যাক তা হলে? বিকেল বিকেল আমাদের পৌঁছতে হবে স্পটটায়।” বালু, পাথর, ছোট ছোট টিলা আর ফণিমনসা গাছগুলোর মাঝখান দিয়ে ফের হাঁটতে শুরু করল তিন জনের দলটা।

বিকেল সাড়ে চারটে মতো হবে। মরুভূমির সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়তে তখনও বেশ কিছুটা দেরি। তবে তাপমাত্রাটা একটু একটু করে কমতে শুরু করেছে যেন। পায়ের তলায় বালুর পরিমাণ কমছে। বাড়ছে ঘাসজমি। ফণিমনসার বদলে অন্য ধরনের সব গাছের উপস্থিতি চারপাশে। খুব মৃদু হলেও ঠান্ডা হাওয়ার একটা ছোঁয়া শরীরে। এক কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে আদিগন্ত বিস্তৃত একটা সবুজের রেখা।

সেদিকে আঙুল দেখাল এদুয়ার্দো। “ওই যে জঙ্গলটা দেখছেন, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটাকে আড়াআড়িভাবে চিরে চলে গেছে মাইলের পর মাইল, সেই গুয়াতেমালার সীমানা অবধি। ওই জঙ্গলের শুরুতেই আমার ডিউটি শেষ। আপনাদের জিন্মা নিয়ে নেবে জাপাতিস্তারা। আশা করছি ওদের কেউ না কেউ ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে ওখানে। চলুন, একটু তাড়াতাড়ি পা চালানো যাক। আমাকে আবার অনেকটা পথ ফিরতে হবে উজিয়ে।”

“কিন্তু এতটা পথ আপনি ফিরবেন কী করে? প্রায় গোটা রাতটাই কাবার হয়ে যাবে। এই ভয়ঙ্কর দুর্গম পথে...” কথাটা শেষ হওয়ার আগেই তুর্ঘকে থামাল এদুয়ার্দো, “এখান থেকে কিলোমিটার তিনেক পশ্চিমে হাইওয়ের ধারে একটা পেট্রোল পাম্পের ম্যানেজার আমার বন্ধু। রাতটা ওখানেই মাথা গুঁজে কাটিয়ে দেব কোনওমতে। কাল সকালে ওখান থেকেই যা হোক একটা কিছু ধরে সোজা সান সিরো। আসলে ইচ্ছে করেই আপনাদের ওই পথ দিয়ে নিয়ে আসিনি আমি। ফলে ঘুরপথ হয়েছে অনেকটা। কারণ ওটা কমন্ ট্যুরিস্ট রুট না। হাইওয়ে ধরে এলে অনেকের নজরে পড়তেন আপনারা। ড্রাগ কন্স্যাট ফোর্সের গার্ড আর ড্রাগ কার্টেল, দু'-পক্ষেরই ইনফর্মারে ছেয়ে আছে গোটা এলাকাটা। খবর পৌঁছে যেত ঠিক।” একটা কুণ্ঠার ভাব এদুয়ার্দোর গলায়। “তবে এর জন্য সময় আর মেহনত, দুটোই অনেক বেশি খরচ হল আপনাদের। সত্যিই দুঃখিত তার জন্য।”

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এদুয়ার্দোর হাতদুটো চেপে ধরল তুর্ঘ। “জানি না এই কাজের জন্য যে টাকা আপনাকে আমরা দিলাম সেটা আদৌ যথেষ্ট কি না। তবে ফিরে যদি আসতে পারি, তা হলে কথা দিচ্ছি, সুলতানকে পার্সোনালি বলব আপনার ট্যুরিস্ট এজেন্সির ব্যাপারটা একটু দেখতে।” ভারী হয়ে এল দুর্ঘর্ষ সিক্রেট এজেন্টের গলা, “যাতে শুধু ডালাস টু এল পাসো নয়, সারা দুনিয়া দেখাতে ট্যুরিস্ট নিয়ে যেতে পারেন আপনি।”

“হোয় হোয়, আমিগো!” কথার মাঝখানেই একটা হাঁক দূর থেকে। ফাঁকা ঘাসজমি ধরে ছুটে আসছে একটা লোক। মাঝবয়েসি। লালচে তামাটে গাত্রবর্ণ। দু'-গালে আড়াআড়িভাবে টানা তিনটে করে উষ্কির দাগ। গলায় বিচিব্রবর্ণ পাথরের হার। কাঁধে ঝোলানো অ্যাপাচে ধনুক। কোমরে গাছের বাকলে বানানো দড়িতে বাঁধা চামড়ার খাপে গোটাকয়েক তির। সারা মুখে অসংখ্য ভাঁজ। গায়ে খুব খাটো ঝুলের একটা বহু পুরনো জামা। নিম্নাঙ্গে ওই একইরকম ঝুলের একটা ঢোলা পাজামা মতো। হাঁটু ছাড়িয়ে ইঞ্চিচারেক নেমেছে বড়জোর। আজানুলম্বিত দুটো হাত। সব মিলিয়ে ইন্ডিয়ান জনজাতির ছাপ চেহরায় সুস্পষ্ট। গোরিলা বা শিম্পানজি মাঝে মাঝে যেমন দু'পায়ের ভরে উঠে দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে, ঠিক সেইভাবে শরীরটাকে অনেকটা ঝুঁকিয়ে থপথপ করে ছুটে আসছে লোকটা। আজানুলম্বিত হাতদোড়াও লটপট করে নাচছে সেই দৌড়ের তালে তালে। ওই একইভাবে সেদৌড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সামনে। কুচকুচে কালো তামাক চেবানো দাঁতগুলো বার করে হাসল সাবার দিকে তাকিয়ে। তার পর খুব ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশে বলল, “সোই মোরি, বিয়েনভেনিদো এন এস্তা আরেয়া।” জবাবে লোকটার দিকে তাকিয়ে হাসল এদুয়ার্দোও। দুর্বোধ্য একটা ভাষায় দু'জনের মধ্যে কথা হল কিছু ক্ষণ। তার পর ঘাড় ঘুরিয়ে সাবা আর তুর্ঘর দিকে তাকাল এদুয়ার্দো। “ওর নাম মোরি। এই এলাকায় আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে ও। এর পর বাকি পথটা ওই নিয়ে যাবে আপনাদের। এখানে প্রবলেম একটাই, মোরি কিন্তু একবিন্দুও ইংরিজি জানে না। আর স্প্যানিশের দৌড় বলতেও সামান্য দু'-চারটে শব্দ মাত্র। তাই কথাবার্তা যা হবে, পুরোটাই ইশারা ইঙ্গিত। তা হলে এ বার আমি আসি। বেস্ট অব লাক!”

“গ্রাসিয়াস আমিগো!” জবাবে হাত নাড়ল সাবা আর তুর্ঘ। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় দূরে মরুভূমি, টিলাপাহাড় আর ফণিমনসা গাছগুলোর বাঁকে দ্রুত মিলিয়ে গেল এদুয়ার্দো।

গহিন জঙ্গলে সঙ্গে নেমে আসছিল খুব দ্রুত। অন্ধকার ছেয়ে ফেলছিল চারপাশ। তুর্ঘ আর সাবা দু'জনেই মোরির দৌড়ের যে ধরনটাকে অত্যন্ত স্নেহ গতির ভেবেছিল, বাস্তবে দেখা যাচ্ছিল ব্যাপারটা আদৌ তা নয়,

বরং ঠিক তার উল্টোটা। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও মধ্য আমেরিকার এই বনভূমির আঁকেবাঁকে মোরির থপথপে দৌড়টার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছিল সাবা আর তুর্ঘ, দু'জনকেই।

প্রায় ঘণ্টাখানেক এভাবে একনাগাড়ে দৌড়ানোর পর জঙ্গলে পথের ধারে একটা গাছের সামনে এসে থামল মোরি। সরু সরু কণ্ঠের মতো দেখতে তার ডালপালাগুলো। এগিয়ে গিয়ে প্রথমে সেগুলোকে একটু জরিপ করল ভালোভাবে। তার পর জামার নীচে কোমরে গোঁজা একটা ছুরি বের করে কোপ বসাতেই ডালের মধ্যে চোঙের মতো ফাঁপা অংশটা দিয়ে তিরতির করে গড়িয়ে নামতে শুরু করল জলের ধারা। এ গাছটার সঙ্গে পরিচিত তুর্ঘ। গোটা লাতিন আমেরিকার বনভূমি জুড়েই দেখা মেলে এরা। কলম্বিয়ার জঙ্গলে বামপন্থী ‘ফার্ক’ গেরিলাদের সঙ্গে কাজ করার সময় এই জল হামেশা খেত ওরা, তুর্ঘও।

খানিকটা জল খেয়ে ডালটা সাবার দিকে এগিয়ে দিল মোরি। সামান্য দ্বিধা সাবার চোখে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল তুর্ঘ। “নিশ্চিন্তে খাও, বারোমাস নিজের শরীরে জল জমিয়ে রাখে এ গাছ। যাতে অরণ্যের মানুষ বছরভর বিশুদ্ধ জল পেতে পারে।”

সবার জল খাওয়া হলে ঢোলা পাতলুনটার পকেট থেকে একটা ছোট চামড়ার বটুয়া বের করল মোরি। সেটা খুলে ছোট ছোট কয়েকটা শুকনো পাতা এগিয়ে দিল দু'জনের দিকে। চিবোনের ভঙ্গি করল চোয়াল নেড়ে। তার পর কোমরে বাঁধা তিরের খাপটা থেকে একটা লাঠি বের করে কী একটা গাছের বাকল ভাল করে জড়িয়ে নিল আগায়। জামার পকেট থেকে বেরোল লিকুইড প্যারাক্রফিনের শিশি আর দেশলাই। বাকলের উপর একটু ঢেলে দেশলাই দিয়ে জ্বালান মশাল। আলোকিত হয়ে উঠল চার পাশ। মশাল মুঠোয় ধরে ফের দৌড় শুরু করল মোরি। পিছনে সাবা আর তুর্ঘ।

মিনিটখানেকের মধ্যে দু'জনেই টের পেল সারাদিনের ওই হাড়ভাঙা পথশ্রমের ক্লাস্তিটা এক নিমেষে যেন উবে গেছে কোথায়। মুঠোয় ধরা মশাল, হাতদশেক সামনে দৌড়ছে মোরি। গতি বাড়িয়ে দিল দু'জনে।

সঙ্গে সাতটা নাগাদ বিস্তীর্ণ একটা ফসলের ক্ষেতের সামনে এসে দৌড় থামল মোরির। মাঝখানে আলপথ, ফসলের ক্ষেতটাকে মাঝ বরাবর চিরে চলে গেছে সোজা। দু'পাশে আখ আর ভুট্টার চাষ। দূরে, ক্ষেতের একদম শেষপ্রান্তে আঙুল তুলে দেখাল মোরি। অনেকগুলো ছোট ছোট আলোর ফুটকি সেখানে। এ বার আর দৌড় নয়, ধীরপায়ে হেঁটে আলপথে নেমে পড়ল সাবা। তার পর ওই একইরকম হাল্কা চালে হেঁটে এগিয়ে চলল আলপথ ধরে। পিছনে পিছনে সাবা আর তুর্ঘ।

একটু একটু করে বড় হচ্ছিল আলোর ফুটকিগুলো। পঞ্চাশ-ষাট ঘরের বন-বসতি। গ্রামে ঢোকান মুখে কাঠ আর বাঁশ দিয়ে বানানো দরজা। মায়া সংস্কৃতির কারুকাঙ্ক্ষ প্রবেশদ্বারের গা জুড়ে। ছড়িয়েছটিয়ে ছোট ছোট ঘর। কাঠের দেয়াল আর শগের চাল। মাঝখানে একটা আটচালা। বাঁশে টাঙানো চে গেভারা, জাপাতিস্তা বিদ্রোহের দুই নেতা পাঞ্জে ভিয়া আর এমিল জাপাতার ছবি। মাঝখানে কাঠের একটা টেবিল। মাথার উপর বোলানো কালো রঙের জাপাতিস্তা ফ্ল্যাগ। মাঝখানে উজ্জ্বল লাল তারা। টেবিলে বসা এক জন দীর্ঘদেহী মানুষ। একগাল দাড়ি। দোহারা চেহারা। বহু অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া ছাপ মুখে। পরনে আ-কাচা মলিন ঢোলা জামা আর পাতলুন। প্যান্টটা গ্যালিস দিয়ে কাঁধের সঙ্গে আটকানো। ঠোঁটে একটা কড়া গন্ধওয়া স্থানীয় চুরুট। ওদের দেখামাত্র ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে সহাস্যে এগিয়ে এল সামনে ডান হাতখানা বাড়িয়ে। “বিয়েনভেনিদো কম্প্যানিয়েরো! বিয়েনভেনিদো কম্প্যানিয়েরো! সেই হলিয়ানো তোরেস। আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। আসুন অনুগ্রহ করে।” টেবিলের চার দিকে পাতা চেয়ারগুলোর দিকে ইঙ্গিত করল হলিয়ানো। “এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এলেন দু'জনে। খুব কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়ই। মোরি আপনাদের কোকা দিয়েছিল তো?”

শোনামাত্র হলিয়ানোর দিকে তাকাল তুর্ঘ “কোকা?” জবাবে কোণে চেয়ারে বসা মোরির দিকে তাকাল হলিয়ানো। দুর্বোধ্য ভাষায় জিগেস করল কিছু একটা। শোনামাত্র কালচে দাঁতগুলো বের করে মুচকি হাসল

মোরি। বললও কিছু একটা। সঙ্গে সঙ্গে আটচালা কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠে তুর্ঘদের দিকে তাকাল হলিয়ানো। “আরে, রাস্তায় যে পাতাগুলো ও চিবোতে বলেছিল আপনাদের, ওগুলোই তো কোকা।”

“কী বলল লোকটা? আর হাসছেই বা কেন?” পাশ থেকে তুর্ঘর গায়ে কনুইয়ের ঠেলা মেরে ফিসফিসিয়ে প্রশ্ন করল সাবা। জবাবটা শোনার পর বিস্ময়ে ফেটে পড়ে বলল, “কোকেন! ওই লোকটা কোকেন দিয়েছিল আমাদের!” সাবার কথাটা ধরতে পারল হলিয়ানো। বিষম হেসে বলল, “বাইরের দুনিয়ার মানুষ ওটাই জানে কমপ্যানিয়েরো! তারা ভাবে কোকা আর কোকেন দুটোই এক। আসলে কোকা পাতা জঙ্গল আর পাহাড়-ঘেরা আমাদের এই গ্রামগুলোর মানুষদের কাছে, যেখানে জাতজন্মেও ডাক্তারের পা পড়ে না, হাজারটা আধিবাখির ওষুধ। অমৃত। এই অমৃতই বিষ হয়ে যায় যখন ড্রাগ মাক্ফিয়ারা নিজেদের ল্যাবরেটরিতে তাকে কোকেনে পরিণত করে। এটা না বুঝল সভ্য মানুষ, না বুঝল এদেশের স্বৈরশাসকরা আর ওপারের ওই গ্রিংগো (মার্কিন) সরকার। অবশ্য শুধু কোকেন নয়, সেই বহুকাল আগে থেকেই আমাদের গ্রামীণ ফসলের ক্ষেতগুলোকে ধ্বংস করে সেখানে অভূত সব বিদেশি ফলের চাষাবাদ করতে চেয়েছিল ও পারের সব জায়ান্ট কর্পোরেট—ফল আর খনিজ জলের কোম্পানিগুলো। দখল নিতে চেয়েছিল বিশুদ্ধ জলের বরনাগুলো। এ কাজে ওদের প্রধান অস্ত্র ছিল এখানকার হোসেনডাস অর্থাৎ ভূস্বামীরা। পেছনে মদতদাতা এ পার ও পার দু'দেশের সরকার। এর বিরুদ্ধে আমাদের মতো কৃষকদের বিদ্রোহ শুরু হয় সেই ১৯১০ সালে। সে লড়াইয়ের নেতা ছিলেন এরা দু'জন।” হাত তুলে বাঁশের খুঁটিতে টাঙানো পাঞ্জে ভিয়া আর এমিল জাপাতার ছবিদুটোর দিকে আঙুল দেখাল হলিয়ানো। নিভে যাওয়া চুরুটটাকে ভাল করে জ্বালিয়ে নিয়ে পরপর টান দিল দু'-চারটে। বলল, “সে সব ইতিহাস আপনাদের অবশ্য অজানা থাকার কথা নয়। তার চেয়ে বরং কোকেনের কথায় ফিরি। জাপাতার মৃত্যুর পরও লড়াইয়ের বাঁধা এতটুকু কমেনি, উল্টে বেড়ে গেছিল। কিন্তু কৃষকদের সামনে নতুন বিপদটা এল '৬০ দশকের গোড়ার দিকে। যখন কোকা থেকে কোকেন বানানোর কায়দা আবিষ্কার করে ফেলল দুষ্কৃতীরা। পরিচিত হয়ে উঠল ড্রাগ মাক্ফিয়া নামে। গরিব চাষিদের ভয় দেখিয়ে ওদের কাছেই কোকা পাতা বেচতে বাধ্য করতে শুরু করল মাক্ফিয়া গ্যাংগুলো। ফলে জাপাতিস্তা আন্দোলনকারীদের সামনে লড়াইয়ের আর-একটা ফ্রন্ট খুলে গেল। একটার বদলে দু'-দুটো দৃশমন। একদিকে জায়ান্ট কর্পোরেট, হোসেনডাস, পেছনে দু'-দুটো দেশের সরকার। অন্যদিকে ড্রাগ কার্টেলগুলো। দুই সরকার আর কর্পোরেট, দু'দলই প্রমাণ করতে চাইল, আমরাও আসলে ওই কোকেনেরই কারবারি। আমাদের সঙ্গে ড্রাগ মাক্ফিয়ারের রীতিমতো দহরম মহরম রয়েছে। ফলে ড্রাগ কন্সট্রাক্ট ফোর্স আর সি আই এ-র লোকজন একজোট হামলা চালাতে লাগল আমাদের ফসল ক্ষেতগুলোর উপর। পুড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল মাইলের পর মাইল আবাদি জমি। অন্যদিকে ড্রাগ মাক্ফিয়ারা চাষিদের হুমকি দিতে শুরু করল, কোকা চাষের জমিগুলো দাদন চুক্তিতে ওদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। জাপাতিস্তাদের লড়তে হচ্ছিল এই দুই ভয়ঙ্কর শক্তির মুখোমুখি।”

এক নাগাড়ে এতখানি বলে একটু থামল হলিয়ানো। নিভে যাওয়া চুরুটের শেষাংশটা ধরাল দেশলাই জ্বেলে। তার পর ফের শুরু করল, “এভাবে একটানা লড়াই চলতে চলতে ১৯৯৬ সালে স্বৈরশাসকদের জমানা খতম হয়ে দেশের ক্ষমতায় এল একটা নির্বাচিত সরকার। তাদের সঙ্গে একটা শান্তি চুক্তি হল আমাদের দলের। তার পর থেকে মোটামুটি একটা স্থিতিবস্থা বজায় রয়েছে, কিন্তু আমাদের উপর এখনও কড়া নজর রয়েছে এখানকার সরকার আর স্যাম চাচার দেশের। এলাকায় নিয়মিত টহল দেয় ড্রাগ কন্সট্রাক্ট ফোর্স আর জঙ্গলের আঁতেঘাতে গন্ধ শূঁকে বেড়ায় সি আই এ-র টিকটিকিরা। অন্য দিকে গোদের উপর বিসফোড়ার মতো রয়েছে ড্রাগ মাক্ফিয়ারা। এখনও এসে ভয় দেখায় চাষিদের, কোকার চাষ বাড়াতে চাপ দেয়। পুরো প্রোডাকশনটাই কিনে নেওয়ার জন্য অগ্রিম দাদন শূঁজে দেয় হাতে। সেই লোভের ফাঁদেও পা দিচ্ছে অনেকে। অন্য চাষ বন্ধ করে শুধুই কোকা ফলাচ্ছে জমিতে। অথচ আমাদের তো কোকা

পাতার প্রয়োজন বলতে হার্বাল মেডিসিন আর সামান্য য়েটুকু উদ্ভূত সেটা গ্রামের হাটগুলোয় নিজেদের মধ্যেই কেনাবেচা করা। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এই সামাজিক প্রথা, এই পরস্পরকেই ধ্বংস করতে চাইছে কার্টেলগুলো। অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে জোয়াকিমের জাওয়ার কার্টেল এই অঞ্চলে ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে ওঠায়। ওর এক্স বস এল চ্যাপো গুজমান বছরকয়েক হল জেলে। পুরো এলাকা এখন জোয়াকিমের নিয়ন্ত্রণে। কদিন আগে এখান থেকে মাইলপাঁচেক দূরে একটা গ্রামে এক কৃষক পরিবারের সবাইকে খুন করেছে জাওয়ার কার্টেলের গুন্ডারা, ওদের দাবিমতো কোকা চাষে রাজি না হওয়ার জন্য। এ সব আমরা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি যথাসাধ্য। কিন্তু ওদের হাতে প্রচুর টাকা আর লেটেস্ট মডেলের সব ওয়েপনস, এঁটে ওঠা ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমাদের পক্ষে।” কেমন যেন হতাশ শোনালা বহু যুদ্ধের পোড় খাওয়া জাপাতিস্তা নেতার গলা!

অতঃপর বেশ কিছু ক্ষণ চুপচাপ সবাই। সেই নীরবতা ভাঙল তুর্ফর কথায়। “কম্প্যানিয়েরো হলিয়ানো, আপনার কথায় এটা পরিষ্কার, আওয়ার মিশন ইজ সেম। ওনলি দ্য মোটিভ ইজ ডিফারেন্ট। ইউ ওয়ান্ট টু ডেবিল জোয়াকিম অ্যান্ড হিজ কার্টেল ফর ইয়ার কমিউনিটিস ইন্টারেস্ট। আর আমাদের ক্ষেত্রে সেটা অব্যবসলিউটলি পার্সোনাল।” পাশে বসা সাবার কাঁধে হাত রাখল তুর্ফ। “ইউ’স ভেজেন্স!”

শোনামাত্র চকচক করে উঠল হলিয়ানোর চোখজোড়া! একটু আগে গলায় চোরা হতাশার ভাবটা উধাও একমুহূর্তে। “ইউ আর রাইট অ্যামিগো! আমার দু’জন খুব বিশ্বস্ত লোককে জোয়াকিমের খোঁজখবর লাগাতে পাঠিয়ে দিয়েছি আজ দুপুরেই। আশা করছি, কাল বিকেলের মধ্যেই কিছু একটা খবর নিয়ে আসতে পারবে ওরা। তবে এখন আর কোনও কথা নয়। সারাদিন অনেক ধকল গেছে আপনাদের দু’জনেরই। সামান্য খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করেছে। খেয়েদেয়ে রাতটা ভাল করে ঘুমিয়ে ফ্রেশ হয়ে নিন। কাল সকালে আমাদের আশপাশের এলাকাগুলো একটু ঘুরিয়ে দেখাব আপনাদের। তত ক্ষণে খবর একটা কিছু এসে যাবে মনে হয়,” বলতে বলতে হেসে চোয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল হলিয়ানো। “এ বার তা হলে আমাকে অনুমতি দিন। কাল সকালে দেখা হবে।” বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল আটচালা ঘর ছেড়ে।

তখন দুপুর বারোটা। চৌকোমতো একটা বড়সড় পাথরের উপর দাঁড়িয়েছিল হলিয়ানো আর তুর্ফ। একটু দূরে একটা ছোট টিলা পাহাড়ের উপর থেকে জল পড়ছে অঝোরে। নীচে একটা দিঘি। কাচের মতো স্বচ্ছ জল। নীচে জলজ গাছ, ছোট ছোট মাছদের আনাগোনাটুকু পর্যন্ত চোখে পড়ছে স্পষ্ট। দিঘির একধারে সরু একটা নাল। সেখান থেকে জল বেরিয়ে সোজা চলে যাচ্ছে গ্রামের দিকে। নালার একধারে বিপেপাঁচেক জায়গা জুড়ে কোকা পাতার চাষ। গ্রামা দুই বয়স্ক মহিলা। গলায় ঝোলানো গোলাকার বেতের চুবড়িতে পাতা তুলে জড়ো করে চলেছে একমুহূর্তে।

আঙুল তুলে বরনটার দিকে দেখাল হলিয়ানো— “মায়ের বুকের দুধের মতোই খাঁটি আর বিশুদ্ধ এই বরনার জল। প্রচণ্ড গরমেও শুকিয়ে যায় না কখনোই। এই বিশাল জঙ্গলে ঘেরা গ্রামগুলোর লাখ লাখ মস্তিজো, ব্ল্যাক মেক্সিকান আর ইন্ডিয়ান জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষদের বেঁচে থাকার ভরসা, হাজার হাজার বছরের জল জঙ্গল জমির অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে জায়ান্ট কর্পোরেট আর মافیয়ারা। আর এই চক্রের বড় একটা হাতিয়ারের নাম জোয়াকিম হার্নান্ডেজ।” মুখ ঘুরিয়ে তুর্ফর দিকে তাকাল হলিয়ানো। “আপনারা এসেছেন ওকে নিকেশ করতে। কাজটা শুধু কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভব। ওর সঙ্গে লম্বা সময় ধরে টঙ্কর চলছে আমাদের। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কথাগুলো বলছি। অন্য কেউ হলে কখনোই রাজি হতাম না এই প্রস্তাবে। কিন্তু কম্প্যানিয়েরো সেগেইয়ের মতো এক জন মানুষ আপনাদের দু’জনের সম্পর্কে যা বলেছে তাতে আশা জাগছে, ব্যাপারটা সম্ভব হলেও বা হতে পারে। তবে...” শব্দ হয়ে উঠল পোড়া তামাটে মুখটা। “আপনাদেরও তো একটু তৈরি থাকা প্রয়োজন তার জন্য। আসুন আমার সঙ্গে।” বলেই পাথরটা থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল জোয়াকিম। তার পর সোজা হাটা

লাগাল গ্রামের দিকে। সঙ্গে তুর্ফ। সাবা নেই। সকালে কিছু ক্ষণ ওদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করেই মোরির কাঁধে একটা থাবড়া মেরে ওকে নিয়ে চলে গেল কোথায় যেন। কেউ কারও ভাষা একবর্ণও বোঝে না। তবু এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দিবি জমে গেছে দু’জনের। হাতের ইশারায়, হুঁ হাঁ শব্দে অনর্গল কী সব বলে চলেছে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু গেলটা কোথায় ওরা? ভাবনাটা মাথায় নিয়েই হলিয়ানোকে অনুসরণ করলো তুর্ফ।

গ্রামে ঢোকার আগেই হাতের বাঁ দিকে এবড়োখেবড়ো একটা সরু মোঠো পথ। একটু এগোতেই রাস্তার ধারে একটা ছোট ঘর। ভেতরে মেঝেয় পাতা একটা মোটা একটা আলপাকার কম্বলের উপর শোওয়া এক জন। বাঁ হাতটা কব্জির উপর থেকে কাটা। বেঁটেখাটো পেটা চেহারা। বয়েস আন্দাজ সত্তরের কোঠায়। হলিয়ানোদের দেখে উঠে বসল বিছানায়। “এ পাওলো, আমাদের লড়াইয়ের বহু পুরনো সাথী।” বলল হলিয়ানো। জবাবে ওদের দু’জনের দিকে তাকিয়ে হাসল পাওলো। উঠে দাঁড়িয়ে একটানে কম্বলটা সরিয়ে ফেলতেই একটা কাঠের তক্তা। তার নীচে একটা লম্বাটে বাস্ত্রের মধ্যে গ্রিজ মাখানো পলিথিনের মোড়কে শোওয়ানো গোটাচারেক পুরনো বাঁটহীন কালাশনিকভ অ্যাসল্ট রাইফেল, দুটো টোকারেভ নাইন এম এম পিস্তল, পাশে কয়েকটা ম্যাগাজিন, কার্তুজের প্যাকেট আর চার পাঁচটা জেলিগনাইট গ্রেনেড। “সব সেই ’৮০-র দশকে আপনাদের সোভিয়েত জমানায় সাপ্লাই করা পুরনো জিনিসপত্র। তবে আজও কাজ করে ভালই। খুব যত্ন করে রেখেছি আমরা। এ মিশনে কাজে লাগবে আপনাদের। বেছে নিন যেটা ইচ্ছে।” জবাবে হলিয়ানোর দিকে তাকিয়ে হাসল তুর্ফ। “তিসা। লুবিয়ান্সা স্ট্রিটে আমাদের থিওরটিকাল ক্লাসগুলোয় খুব জোর দেওয়া হত কৌশলটার উপর। রাশিয়ান বুলিতে তিসা কথাটার মানে পাখি। পাখি যেমন বাসা বাঁধার খড়কুটো নিজের চারপাশ থেকেই জোগাড় করে নেয় ঠিক সময়মতো এক জন দক্ষ সিক্রেট এজেন্টকে প্রয়োজনীয় জিনিসটা খুঁজে নিতে হবে সেভাবেই। এ জাতীয় কোনও মিশনে যাওয়ার সময় মালপত্র যতটা সম্ভব কম নেওয়া যায়, খেয়াল রাখতে হবে সেদিকে। তাই কিছু মনে করবেন না কম্প্যানিয়েরো। আপাতত এ সবের দরকার নেই আমাদের। উই শ্যাল ডু ইট ইন আওয়ার ওন ফ্যানশন। সো, ডোন্ট মাইন্ড, কমপ্যানিয়েরো। আপনার এই আন্তরিক প্রস্তাবটা মানা সম্ভব হচ্ছে না আমাদের পক্ষে।”

“ওকে, কম্প্যানিয়েরো। অ্যাজ ইউ উইশ। তবে এই জিনিসটা কাছে রাখুন। এটা গিফট আমার तरफে।” বলে বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা পুরনো কম্পাস বার করে আনল হলিয়ানো। “সাবেক সোভিয়েতে তৈরি। চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও একশোভাগ সঠিক পথ দেখাবে।” হাতে নিয়ে ভাল করে কম্পাসটা দেখল তুর্ফ। রেডিয়াম কোটেড কাঁটা দুটো। প্রশ্ন মেটালের বডি। অক্ষরগুলো খয়ে অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তবু পেছনদিকে ‘জেনিথ’ নামটা পড়া যাচ্ছে অবছা। প্রত্যেক স্মার্ম এজেন্টের কাছে থাকত একটা করে। সাইবেরিয়ার মাইনাস ষাট ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যাওয়া তাপমাত্রা থেকে সাহারার প্রাণঘাতী মরুঝড়। আলবেনিয়ার অমসূণ পাথুরে গলি থেকে আমাজনের গহিন অরণ্য। দিকনিশানার কাঁটা একচুলও ভুল রাস্তা দেখাবে না। চাকরি থেকে ইস্তফা দেওয়ার সময় জমা দিয়ে এসেছিল সদর দপ্তরে। আবেগরুদ্ধ চোখে হলিয়ানোর দিকে তাকাল তুর্ফ। “আজ আপনি আমার অনেক স্মৃতি, অনেকখানি অতীত ফিরিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ দিয়ে অকারণে ছোট করব না আপনাকে।”

কথার মাঝখানে হই হই করে ঘরে ঢুকে পড়ল সাবা। হাসিতে বলমল করছে কালো মুখখানা। “ওফ বোস! একটু আগে মোরির সঙ্গে গিয়েছিলাম ওর বাড়িতে। ওর তিনটে বৌ আর তিনটে তির-ধনুক। জাস্ট আনইমাজিনেবল! তার মধ্যে থেকে একটা ও গিফট করেছে আমাকে। চামড়া শুকিয়ে তৈরি পুরোটা। গুটিয়ে ঝোলায় ভরে ফেলা যায় এক মুহূর্তে। সঙ্গে পাঁচটা তির আর এগুলো।” বলেই ঝোলা থেকে এক মুঠো গাছের বাকল, দুটো ছোট লাঠি আর একটা বোতল বের করে আনল সাবা। ভেতরে সেই তরল জাতীয় বস্তুটা। “বোতলে মেশানো খাঁটি চাকভাঙা মোম। এই লাঠির ডগায় বাকল পেঁচিয়ে ঢেলে দিতে হবে

একটুখানি। নিজে থেকে না নেভালে নিভবে না। আবার দরকারে এটাই তিরের কাজ করবে। ছিলেয় জুতে নিয়ে স্রেফ একটা টান। মালতীদির কাছে শোনা সেই লক্ষ্যকাণ্ড বেধে যাবে একেবারে!”

সাবার বলার ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল, শোণামাত্র না বুঝেও ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন হলিয়ানো। সঙ্গে যোগ দিল বাকি সবাই। হাসি থামার পর গাছের ছালে মোড়া প্যাকেট থেকে একটা চুরট বের করে ধরালেন হলিয়ানো। তার পর মুখ তুলে তাকালেন তুর্ঘর দিকে। “মনে হয়, বিকেলের মধ্যেই ইনফরমেশন চলে আসবে। খবর পাওয়ামাত্র আমি পৌঁছে যাব আপনাদের কাছে। দেন উই শ্যাল মেক আওয়ার নেক্সট প্ল্যান অব অ্যাকশন। ওকে?” বলতে বলতে দরজার দিকে পা বাড়ালেন জাপাতিস্তা নেতা। সঙ্গে বাকি সবাই।

বিকেল চারটে নাগাদ খবরটা নিয়ে এলেন হলিয়ানো। “এখান থেকে মাইলপাঁচেক দূরের একটা কোকেন প্রসেসিং ল্যাবরেটরি কাম ট্রানজিট পয়েন্ট। খুব তাড়াতাড়ি ওখান থেকে বেশ বড়সড় একটা কনসাইনমেন্ট বর্ডার উপক্রে চুকবে স্যাম আঙ্কেলদের দেশে। কাল বিকেল নাগাদ জোয়াকিম নিজে আসবে ব্যাপারটা তদারকি করতে। এমনিতে সুলতানের দেশে ওই ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ার পর ওদের পালের গোদাগুলো সব গা চান্দা দিয়েছে। তবে একসাথে নয়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে। জোয়াকিম নিজ সিনালোয়ার গভীর জঙ্গলে যে আড্ডাটায় থাকে সেটাকে ওর দুর্গ বলা চলে। গ্যাংয়ের কমসে কম দুশো শাপশুটার পাহারা দেয় গোটা এলাকাটাকে। ওখানে ঢোকান চেষ্টা করাটা এককথায় আত্মহত্যার সামিল। ফলে ওই ল্যাবরেটরিটাকেই টাগেট করতে হবে আপনাদের। সব মিলিয়ে মোট চার জন সশস্ত্র গার্ড। ২৪ ঘণ্টা পাহারায় থাকে ওখানে। আর জনাপাঁচেক ল্যাবরেটরির লোক। আমার সোর্সের ইনফরমেশন বলছে, এই কনসাইনমেন্টটা খুব ইম্পোর্ট্যান্ট না হলে জোয়াকিম নিজে ওখানে আসত না। আর একমাত্র ওখানেই ওকে সবচেয়ে কম সুরক্ষার মধ্যে পাওয়া সম্ভব। তাই কাল খুব ভোরে এখান থেকে রওনা দিতে হবে আপনাদের। গ্রাম থেকে বেরিয়ে বাদিকে সোজা কিলোমিটারখানেক হাঁটার পর জঙ্গলের শুরুতেই একটা বিশাল সাইপ্রেস গাছ। এই গোটা অঞ্চলে এবড় গাছ আর নেই। গাছটাকে বেড় খেয়ে উত্তরমুখো প্রায় ছ’ কিলোমিটার গভীর জঙ্গল ধরে হাঁটার পর একটা নদী। নদীর উপর একটা বাঁশের সাঁকো। সাঁকোর ঠিক গা ঘেঁষেই উল্টোদিক থেকে আসা গাড়ি চলার মতো একটা রাস্তা। এসে শেষ হয়েছে ওই সাঁকোটীর সামনেই। ওই পথ দিয়েই আসবে জোয়াকিম। তার পর সাঁকো পেরিয়ে চুকবে বড় জোর আধ কিলোমিটার দূরে ওই ল্যাবরেটরিটায়। এ বার আপনারা কীভাবে গোটা ব্যাপারটা সামলাবেন সেটা নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে আপনাদের দু’জনের উপরেই।” খানিকটা অসহায় শোণাল জাপাতিস্তা নেতার কণ্ঠস্বর। “এভাবে আপনাদের দু’জনকে একা ছেড়ে দিতে খুব খারাপ লাগছে। বাট নাথিং ডুইং! জাপাতিস্তারা আবার কোনও রকম লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ছে, এ রকম কোনও এভিডেন্স রাখতে চাই না আমরা। এমনিতেই প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হচ্ছে আমাদের। চাই না সেটা আরও বাড়ুক। আশাকরি আপনারা সমস্যাটা বুঝবেন।”

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই এগিয়ে এসে হলিয়ানোর হাতদুটো চেপে ধরল তুর্ঘ। “ও সব নিয়ে একদম ভাববেন না বন্ধু, আপনাদের সাহায্য না পেলে এতদূর এসে পৌঁছনো কখনোই সম্ভব হত না আমাদের পক্ষে। আর আমাদের নিয়ে চিন্তা করবেন না একদম। এ সবেই অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে আমাদের।”

জবাবে হাসলেন হলিয়ানো। “আমি জানতাম, আপনারা ঠিক এটাই বলবেন। এ বার আপনাদের রাস্তায় কয়েকটা বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দিই আগে থেকেই। সাপের ভয়ানক উপদ্রব এই গোটা এলাকাটা জুড়ে। তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ফেরদেলাস। গোটা মেক্সিকোয় বছরভর সবচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় এই সাপটার কামড়ে। আধঘণ্টার মধ্যে অ্যান্টিভেনম না পেলে মৃত্যু নিশ্চিত। এছাড়াও জাণ্ডয়ার, আপনাদের লেপার্ডের জ্ঞাতি ভাই। লেপার্ডের মতোই হিংস্র। আড়াল থেকে হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে শিকারকে কজা করতে জুড়ি নেই।

তবে সবচেয়ে বড় বিপদ অ্যান্টি-ড্রাগ ফোর্সের লোকজন আর কার্টেলের গুন্ডারা। ওদেরও নিয়মিত আনাগোনা এই সব রাস্তায়। ফলে এত সবকিছু সামলে আপনাদের পৌঁছাতে হবে নদীর ধারে ওই সাঁকোটীর কাছে। নদীটা খুব চওড়া নয়। কিন্তু ভুলেও সাঁতরে পার হওয়ার চেষ্টা করবেন না। নদীর জল থিকথিক করছে কেমন কুমিরে। তাই যা কিছুই হোক, প্রয়োজনে সাঁকোটাই ব্যবহার করবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সেরেই বেরিয়ে আসবেন এলাকা ছেড়ে। আর মোড়ের মাথায় ওই সাইপ্রেস গাছটাই কিন্তু আপনাদের ল্যান্ডমার্ক। বাঁয়ে ঘুরলেই আমাদের গ্রাম। নিশানাটা ভুল করবেন না একদম। তা হলেই সর্বনাশ। এ বার আর-একটা ইনফরমেশন। জানি না কীভাবে সেটা নেবেন আপনারা,” একটু অন্য রকম শোণাল জাপাতিস্তা নেতার গলা। “আমার সোর্সের খবর অনুযায়ী, সুলতানের ভাই আমির আবু বিন খাদেম আর তার পরিবারের প্রত্যেককে খুন করেছে জোয়াকিম। আর শুধু খুন করেই ক্ষান্ত হয়নি, লাশগুলোকে টুকরো টুকরো করে কুমিরদের দিয়ে খাইয়েছে। এই বিকৃত মানসিকতার জন্য নিজের দুনিয়াতেও ভয়ানক কুখ্যাতি রয়েছে ওর। অকারণে নিষ্ঠুর কায়দায় মানুষ মেরে আনন্দ পায় ও। তাই কোনও রকম হেজিটেশন নয়, পয়লা বাটকাতেই সাবাড় করবেন ওটাকে। গ্রামের মানুষদের তরফে অনুরোধ আপনাকে।”

ক্রোধে ফুটছিলেন হলিয়ানো। মৃদু হেসে হলিয়ানোর কাঁধে একটা হাত রাখল তুর্ঘ। “চিন্তা করবেন না কম্প্যানিয়েরো। ওর পাওনা আমরা মিটিয়ে দেব। খালি প্রচণ্ড খারাপ লাগছে এটা ভেবে, আবু খাদেমকে শাস্তিটা নিজের হাতে দিতে পারলাম না!” হতাশ শোণাল প্রাক্তন সিফ্রেট এজেন্টের গলা। “তবে ওটাই বোধহয় ওর ডেস্টিনি ছিল।”

জবাবে বিষণ্ণ হাসলেন হলিয়ানোও। উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। “তা হলে আমি আসি। আপনারা একটু গুছিয়েগাছিয়ে নিন বরং। কাল তো আবার খুব ভোরে রওনা দিতে হবে। সো, বেস্ট উইশেস ফর বোথ অব ইউ, অ্যামিগো।” দরজার দিকে পা বাড়ালেন জাপাতিস্তা নেতা।

হলিয়ানো চলে যাওয়ার পর তুর্ঘর সামনে এগিয়ে এল সাবা। চোখে প্রশ্ন। “হেই বোস, আর ইউ কোয়ায়েট শিওর, সঙ্গে কোনও ওয়েপন নিয়ে যাচ্ছে না তুমি?” উত্তরে ভারি আত্মবিশ্বাসী একটা হাসি চোখে নিয়ে সাবার গালে হাত রাখল তুর্ঘ। “আমার সেরা অস্ত্রটাই তো আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আলাদা করে কিছু নেওয়ার কোনও দরকার আছে কি?”

শোণামাত্র সদ্য কিশোরীর মতো বলমল করে উঠল সাবার মুখটা। “তা হলে আমি তির ধনুক তো নেবই, আর সঙ্গে এইটা। কাল তাড়াহুড়ায় দেখাতে ভুলে গিয়েছিলাম।” বলেই ব্যাগে হাত বের করে আনল ফুটদেড়েক লম্বা একটা গাছের ডাল। আগার দিকটা গোলাকার। হাতে একবার নাচিয়ে ছুড়ে দিল তুর্ঘর দিকে। “আমাদের সাভানা গাঁয়ে এটাকে বলা হয় রুংগু। উইল্ডবিস্টের হাঁটুর হাড় দিয়ে তৈরি হয় হাতিয়ারটা। ঘুরিয়ে ঠিকঠাক তাক করে ছুড়ে মারতে পারলে বুনো মোষের খুলি পর্যন্ত ভেঙে দিতে পারে। মোরির বাড়ির সামনে একটা গাছ। সাইথ্রেস না কী একটা নাম বলল যেন। ভীষণ মজবুত ডালগুলো। হাড়ের বদলে ডাল দিয়েই বানিয়ে ফেললাম দু’খানা। মোরিকে একটা দিলাম তির-ধনুকের রিটার্ন গিফট হিসেবে। ব্যবহারটাও শিখিয়ে দিয়েছি। এটা দিয়ে ফসল ক্ষেতে বুনো শুষোর মারবে বলেছে ও। ভাল হয়েছে না জিনিসটা?”

“ইউ আর রিয়্যালি আ জিনিয়াস, বেবি!” বিস্ময় তুর্ঘর চোখে।

“থাক, আর তোলাই দিতে হবে না।” ছদ্মকোপে চোখ পাকাল সাবা।

“নাউ গিভ মি আ টাইট হাগ অ্যান্ড ভেরি সুইট কিস।” বলেই আরও কাছে এগিয়ে এসে কালো থামের মতো হাত দুটো দিয়ে তুর্ঘর গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল ঠোঁটে।

দুপুর একটা নাগাদ ঘন জঙ্গলের ডালপালার ফাঁক দিয়ে নদীর উপর বাঁশের সাঁকোটাকে দেখতে পেল ওরা দু’জন। দু’পাড়ে এদিক ওদিক ছড়িয়েছিটিয়ে রোদ পোয়াচ্ছে অনেকগুলো কেমন কুমির। “এখানেই জোয়াকিমের জন্য অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। খুব কাছে অথচ কারও নজর এড়িয়ে ওত পেতে থাকার জন্য এই জায়গাটা একেবারে পারফেক্ট।” সাবার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল তুর্ঘ।

তার পর গুঁড়ি মেরে বসে পড়ল মাটিতে। দেখাদেখি সাবাও। এ ভাবেই কটল ঘন্টাখানেক। হাজার হাজার জঙ্গলে মশা পাক খাচ্ছিল ওদেরকে ঘিরে। আসার সময় একটা ভেজ তেল দিয়েছিল মোরি। বেরোনোর আগে ভাল করে সারা গায়ে মেখে নিয়েছে দু'জনেই। ফলে হল ফোটাতে না পারলেও কানের কাছে 'পৌওওও' শব্দের সম্মিলিত কনসার্টটা থামছে না কিছুতেই। ঠিক তখনই ওদের মিটার পঞ্চাশেক দূরে একটা হলুদ ঝলক বিদ্যুতের মতো ছিটকে বেরোল জঙ্গলের ভেতর থেকে। পাড়ে রোদ পোয়ানো একটা কেম্যানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘাড়টা কামড়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে ফের ঢুকে গেল জঙ্গলে। নদীতে আলোড়ন তুলে জলে ঝাঁপ দিল বাকি কুমিরগুলো। পাশ থেকে সাবার কাঁধে হাত রাখল তুর্ষ। গলার আওয়াজ একই রকম নিচু। “এটাই সেই জাণ্ডুয়ার। যার কথা হুলিয়ানো বলেছিলেন আমাদের। ইন্ডিয়ান জনজাতির মানুষরা দেবতা জ্ঞানে পূজা করে প্রাণীটাকে। এত কাছে অথচ এত চুপিসারে ওত পেতে বসেছিল, কিছু টেরই পাইনি আমরা। ভাগ্য ভাল আমাদের দিকে নজর পড়েনি। তা হলে পরিস্থিতি অন্য রকম হতে পারত।”

বিস্ময়ের ঘোরটা তখনও কাটেনি সাবার চোখ থেকে। “জঙ্গলের দেশের মেয়ে আমি। অনেক দেখেছি জীবনে। কিন্তু বাঘে জলে নেমে কুমির টেনে নিয়ে যায়, এরম অনাছিটি কাণ্ড আগে দেখিনি কখনও।” বলে উঠল ফিসফিসে গলায়। তত ক্ষণে নদীর জলে থেমে গেছে কুমিরদের আলোড়ন। ফের নিস্তর্র চার পাশ! কানের কাছে মশককুলের নিরন্তর কনসার্ট আর মাঝে মাঝে জঙ্গলের গভীর থেকে ভেসে আসা হাউলার বাঁদরদের ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই চরাচরে।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ নিস্তর্র জঙ্গলে দূর থেকে শোনা গেল গাড়ির আওয়াজটা। মিনিট দশেক পর সাঁকোর সামনে এসে দাঁড়াল জোয়াকিমের হুডখোলা উইলিস জিপটা। পেছনে বসা একটা ছেলে। হাতের মুঠোয় এম ফিফটিন অটোম্যাটিক। দ্রুত এসে খুলে দিল দরজাটা। ড্রাইভারের পাশের সিটটা থেকে নেমে এল জোয়াকিম। “তোরা দু'জন এখানেই অপেক্ষা কর। খোয়াল রাখ চারপাশে। আমি আধঘন্টার মধ্যে ঘুরে আসছি।” ড্রাইভার আর দেহরক্ষী ছেলেটাকে নির্দেশ দিয়ে সোজা সাঁকো পেরিয়ে ঢুকে গেল জঙ্গলে। সতর্ক দৃষ্টিতে চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে নিল ছেলেদুটো। তার পর দুটো সিগারেট ধরিয়ে বসে পড়ল যে যার সিটে। যাতে রাস্তার দু'দিকেই নজর রাখা যায়।

মিনিট দশেক কটল। সামনের সিটে বসা ড্রাইভার ছেলেটার কোলের উপর শোওয়ানো একটা থম্পসন এল এম জি। ঠোঁটের সিগারেটটা নিভে যাওয়ায় পকেট খাবড়ে দেশলাইটা খুঁজল প্রথমে। না পেয়ে ঘাড় না ঘুরিয়েই হাতটা বাড়াল পেছনে। “লাইটারটা দে তো।” কোনও সাড়াশব্দ নেই পেছন থেকে। চকিতে মুখ ঘোরাতেই তীব্র চমক! পিছনে সিটে বসা সঙ্গী। শরীরটা হেলে পড়েছে সিটের একদিকে। একটা তিরা। ঘাড় ভেদ করে বেরিয়ে রয়েছে কণ্ঠনালী ফুঁড়ে। কোলে শোওয়ানো এল এম জি-টা হাতে তুলে নেওয়ার আগেই সাদাটে মতো একটা কী উড়ে এল মাথা লক্ষ করে। পরমুহুর্তেই চোখের সামনে পৃথিবীর সব আলো দপ করে নিভে গেল।

শিকারি বাঘের মতো গুঁড়ি মেরে জঙ্গলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সাবা আর তুর্ষ। পা টিপে এগিয়ে গিয়ে ড্রাইভার ছেলেটার সামনে ঝুঁকে রুগুটা কুড়িয়ে নিল সাবা। তার পর ঘুরে তাকাল তুর্ষর দিকে। “খুলি ফেটে চৌচির। সাইথ্রেসের ডাল ভালই কাজ করেছে।” বলেই নিঃশব্দ পদক্ষেপে গিয়ে দাঁড়াল পেছনের সিটে হেলে পড়ে থাকা ছেলেটার সামনে। তার পর হ্যাঁচকা টানে তিরটা খুলে নিয়ে এগিয়ে এল তুর্ষর সামনে। চোখ আগ্নেয়াস্ত্র দুটোর দিকে।

“তুমি কোনটা নেবে?” জিগোস করল ফিসফিসিয়ে।

এই পরিস্থিতিতেও হাসি পেয়ে গেল তুর্ষর। “যা করার তো আপনিই করলেন সেনোরিটা। তাই দিন যেটা আপনার আঞ্জা হয়।”

শোনা মাত্র চকচক করে উঠল কালো মুখখানা। “তুমি তা হলে এল এম জি-টাই নাও। আমার আবার একটু ভারী যন্ত্রপাতিই পছন্দ।” বলেই ঝটিতি গিয়ে নিয়ে এল অস্ত্রদুটো। ইতিমধ্যেই শীত-সন্ধে দ্রুত

নামতে শুরু করেছে গভীর জঙ্গলে। সাঁকো পেরিয়ে গাছপালা আর চাপ চাপ কুয়াশা ঘেরা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল দু'জনে।

শ'খানেক মিটার দূরে চোখে পড়ছিল ঘরটাকে। মাথার উপর টানা টিনের ছাদ। ধোঁয়া বেরোনোর একটা সরু চিমনি। আর একধারে আয়তক্ষেত্রের মতো সোলার প্যানেল। জানলা দিয়ে আলো এসে পড়ছে বাইরে। সেই হাল্কা আলোয় দেখা যাচ্ছে সামনে দু'জন গার্ড। হাতে সাবমেশিনগান। পায়চারি করছে খোলা জায়গাটায়। “মনে হচ্ছে বাকিদুটো পেছনে আছে।” সাবার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল তুর্ষ, “তুমি এদিকটা একটু সামলাও। আমি ওদিকটা দেখছি। কাজ সারা হয়ে গেলে ডেকে নেব তোমাকে।” জবাবে বুড়ো আঙুল তুলে থামস আপের ভঙ্গি করল সাবা। বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে ঝোপঝাড়ের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল তুর্ষ।

পায়চারি করতে করতে একটু থামল রক্ষীদের দু'জনের মধ্যে এক জন। আগ্নেয়াস্ত্র কাঁধে বুলিয়ে বের করে আনল কোমরের বটুয়ার রাখা তামাক গুঁড়োর ছোট কৌটোটা। একচিমটে ঢেলে নিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজতে বাবে, কানে এল সামনে ঝোপঝাড়ে একটা কিছু নড়াচড়ার মৃদু খসখস আওয়াজ। মেশিনগানটা বাগিয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল রক্ষীটা। ঘর থেকে ভেসে আসা হাল্কা সোলার লাইটের আলোয় সে দেখল সামনে দাঁড়ানো পাহাড়ের মতো একটা মেয়ে। যোর কৃষ্ণকায়। উর্ধ্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নিরাবরণ। বিশালকায় দুই স্তন। মুখে মোহিনী হাসি। আমন্ত্রণ স্পষ্ট সে হাসিতে। বজ্রহত মানুষের মতো সেদিকে তাকিয়ে ছিল প্রহরীটা! দু'পায়ে যেন দুটো বিশ মনি পাথর চাপিয়ে দিয়েছে কেউ। হাতের আগ্নেয়াস্ত্র জমে গেছে হাতেই। আর ঠিক তখনই খুলি আর বাঁ কানের সংযোগস্থলে রুগু রুগু দানবিক আঘাত! পড়ে যাওয়ার আগেই থামের মতো দু'-হাতে প্রহরীটাকে ধরে ফেলল সাবা। তার পর খুব সাবধানে মাটিতে শুইয়ে দিল শরীরটাকে। এতটুকু শব্দ হল না কোথাও। নাকের সামনে দুটো আঙুল ছোঁয়াল। নিঃশ্বাস থেমে গেছে পুরোপুরি। লোকটার আলগা হয়ে যাওয়া মুঠো থেকে বন্দুকটা তুলে নিল সাবা। একটা পুরনো মডেলের এম ফিফটিন। কোমরে তামাকের বটুয়ার পাশে চামড়ার খাপে গোঁজা ভাঙা চাঁদের মতো বাঁকানো কাতান। একটানে খুলে নিল সেটাও। তার পর লাশটা শুইয়ে রেখে আবার গিয়ে দাঁড়াল বিশালকায় মেক্সিকান ব্যানিয়ান গাছটার বুড়ি নামিয়ে দেওয়া মোটা গুঁড়িটার আড়ালে।

আর-একপ্রান্তে টহল দেওয়া অন্য প্রহরীটা, নাম রদ্রিগেজ, মিনিটকয়েক পর মুখ ঘুরিয়ে দেখল সঙ্গী ছয়ান নেই। গেল কোথায় মালটা? দ্রুত এগিয়ে ঝোপঝাড়ের ভেতর দু'-চার কদম একটু এগোতেই দেখতে পেল সামনে চিত হয়ে পড়ে থাকা ছয়ানের লাশ। ও শরীরে যে আর প্রাণ নেই সেটা এক নজরেই বোঝা যায়। মুহূর্তের প্রতিক্রিয়ায় বাড়িটার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠার আগেই গাছের গুঁড়ির আড়াল থেকে তার ঘাড় লক্ষ্য করে নেমে এল কাতানের কোপ। পাকা ফলের মতো ধড় থেকে আলাদা হয়ে মাটিতে ছিটকে পড়ল রদ্রিগেজের মাথাটা। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সাবা। অন্ধকারে প্রায় মিশে যাওয়া ঘোরকালো অর্ধনগ্ন শরীর জুড়ে রক্তের ছিটে। কালো বাঘিনী চিতার মতো ধকধক জ্বলছে চোখজোড়া। বোসের কাছে শেখা এই কৌশলটা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসি বাহিনীকে রুখতে অস্ত্র হাতে যে যার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে পড়েছিল মস্কোর মেয়েরা। সেই সময় এই কায়দাটা খুব কার্যকরী হয়েছিল। চোখের সামনে হঠাৎ এভাবে এক নগ্ন নারীকে দেখলে সে শত্রু যতই নিষ্ঠুর, ধূর্ত আর ক্ষিপ্ত হোক না কেন, মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বেই। জমে বাবে বরফের মতো। আশু কর্তব্য বোধ লোপ পাবে তার। এভাবে সে সময় প্রচুর জার্মান সৈন্যকে নিকেশ করেছিল মস্কোর মেয়েরা। এটাকে ওরা বলত ‘খোয়াদিনকা’ বা ফ্রিজিং টেকনিক। বহু পুরনো সেই কৌশলটা কাজে লেগে গেল আজ। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। এ বার অপেক্ষা বোসের সিগন্যালের জন্য। গাছের ডালে ঝোলানো ব্রেসিয়ার আর জংলা ছোপ ছোপ কম্যান্ডো জামাটা পেড়ে এনে চটপট গায়ে চড়িয়ে নিল সাবা। তার পর ফের নিঃসাড় মিশে গেল গাছের গুঁড়িটার আড়ালে।

ঘরটার ও ধারে খোলা জমিতে অপর দু'জন রক্ষীর মধ্যে এক জন, হাতের ওয়ালথার অটোম্যাটিকের ট্রিগারে আঙুল রেখে টহল দিচ্ছিল টানা। একটা বেঁটেমতো ঝুপসি ডালপালা ছড়ানো গাছের তলা দিয়ে যাওয়ার সময় উপর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল দুটো হাত। যেন গাছেরই দুটো ডাল। হাতের মুঠোয় ধরা থম্পসনের নলটা প্রহরীটার ব্রহ্মতালুতে ঠেকা মাত্র গোটাভিনেক গুলি। খুলি ফুটো করে শরীর বেয়ে নামা বুলেটগুলোয় ভোঁতা 'ভুগভুগ' আওয়াজ উঠল বার দু'-তিন। রক্ষীটা মাটিতে পড়ামাত্র সরীসৃপের মতো গাছ বেয়ে নেমে এল তূর্য। তার পর সরীসৃপের মতোই বৃকে হেঁটে এগিয়ে চলল সামনে।

বাড়িটার পেছন দিকে ঘটনাস্থল থেকে পঞ্চাশ মিটার দূরে হাঁটছিল আর-এক পাহারাদার। আচমকই জঙ্গলের ভেতর থেকে উড়ে এল ছ'ফুটের শরীরটা। দু'পায়ের আইকিডো পাঁচটে অজগরের মতো রক্ষীটার ঘাড় পেঁচিয়ে ধরে শূন্যেই ঘুরে গেল একপাক। সার্ভাইকাল স্পাইনের হাড় ভাঙার শব্দ— 'মটা' মাটিতে পড়ার আগেই মরে কাঠ হয়ে গেল রক্ষীটা। শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে চার হাতপায়ের ভরে স্থাপদের মতো মিনিটদুয়েক অপেক্ষা করে রইল তূর্য। বাড়িটার ভেতর থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া ভেসে আসে কি না। তার পর ঠোঁট সরু করে হব্ব রাতচরা নাইটজার পাখির মতো 'ট্রিইই' শব্দে লম্বা শিস দিল একটা। আওয়াজটা শোনামাত্র বাড়ির ও ধার থেকে সামনে এগিয়ে এল সাবা। হাতেরটা ছাড়াও কাঁধে দুই রক্ষীর দুটো বন্দুক। বাকি রক্ষীদুটোর আগ্নেয়াস্ত্রগুলোও কাঁধে তুলে নিল অবলীলায়। একচোখ টিপে হাসল তূর্যর দিকে তাকিয়ে। "কেল্লা মজবুত করে নিলাম। নাও, লেটস গো ফর ওয়ার!" বলল ফিসফিসে গলায়। চিতার মতো পা টিপে টিপে সদর দরজাটার দিকে এগিয়ে চলল দু'জন।

অনেকখানি জায়গা জুড়ে টানা লম্বাটে ঘরটা। হাস্কা কটু একটা গন্ধ ছড়িয়ে ঘরময়। মোবাইলে জোড়া স্পিকারে স্থানীয় গান বাজছে চড়া সুরে। চারটে উজ্জ্বল সোলার লাইটের আলো। ঘরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত জোড়া বিশাল লম্বা একটা কাঠের মজবুত টেবিল। এক দিকে থরে থরে সাজানো কোকেনের প্যাকেট। টেবিলের দু'ধারের মেঝে কোকা পাতার বস্তায় ঠাসা। অন্য দিকে চার-চারটে গ্যাস বার্নারের বসানো বড় বড় পাত্রে কোকেন প্রসেস হয়ে চলেছে অবিরত। চার জন কর্মীর চরম ব্যস্ততা। টেবিলের বিপরীত প্রান্তে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসা জোয়াকিম। একটা পা অন্য হাঁটুর উপর তোলা। সিগারিলোয় টান দিতে দিতে নজর রাখছিল গোটা প্রক্রিয়াটার দিকে। পাশে দাঁড়ানো সাবমেশিনগানধারী দেহরক্ষী। ঠিক এই সময় হঠাৎই বিকট 'ধড়াম' শব্দে ছড়কো ভেঙে হাট হয়ে খুলে গেল দরজাটা। একটা পাহাড়ের মতো মেয়ে। ঘোর কালো। হাতে বাগিয়ে ধরা এম ফিফটিন অটোম্যাটিক। নলটা সরাসরি তাক করা জোয়াকিমের কপালে। কাঁধে আরও চারটে বন্দুক।

"হেই গাইজ! পুরো ফিল্ডিং সাজিয়ে এসেছি, দেখতেই পাচ্ছ সেটা। সো, নো ফাকিং ট্রিক। লক্ষ্মী ছেলের মতো হাতদুটো মাথার উপর তুলে ফেলো সবাই।" বলতে বলতেই সাবার পাশ ঘেঁষে ঘরে ঢুকল আর-এক জন। ছ'ফুট ছাড়ানো টানটান পেটা চেহারা। ঘষাটে নীল চোখের মণিজোড়া। থম্পসন এল এম জি-র নলটা একই ভাবে তাক করা সামনে। জোয়াকিমের দিকে তাকিয়ে বরফের মতো ঠান্ডা একটা হাসি হাসল লোকটা। "হাতদুটো মাথার উপর রেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এসো, জোয়াকিম। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।" আড়চোখে দু'পাশে তাকাল জোয়াকিম। কাজের চারটে ছেলে, ওর পাহারাদার, সাবার হাত মাথার উপর। বুটের ডগায় টেবিলের পায়ার গোপন বোতামটায় খুব সন্তুর্ণণে চাপ দিচ্ছিল জোয়াকিম। একটু একটু করে হাতের সামনে খুলে আসছিল টেবিলের ছোট ড্রয়ারটা। সেখানে শোওয়ানো একটা ফুললি লোডেড কোল্ট পাইথন নাইন এম এম। আর-একটু খুলতেই অসম্ভব ক্ষিপ্ৰগতিতে পিস্তলটা তুলে নিয়ে সে গুলি চালান সাবাকে লক্ষ করে। 'অঁক!' আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল সাবা। বিদ্যুৎগতিতে টেবিলের আড়ালে ঝুঁকে পড়ল তূর্য। ওর দিকে তাকিয়ে যন্ত্রণাক্লিষ্ট চোখে হাসল সাবা। "ডোল্ট ওয়রি, বাড়ি। বুলেট

ভেতরে ঢোকেনি। হাতের মাংস খুবলে বেরিয়ে গেছে শুধু। তুমি ও দিকটা দেখ। আমি হাত লাগাচ্ছি এফুনি।"

তত ক্ষণে চারটে কাজের ছেলে, দেহরক্ষী, সাবার হাতে উঠে এসেছে আগ্নেয়াস্ত্র। টেবিলের ও প্রান্ত থেকে ফোয়ারার মতো ছুটে আসছে বুলেট। এ বার এদিক থেকে গর্জাতে শুরু করল তূর্যর থম্পসন এল এম জি। কাঁধের বন্দুকগুলো মেঝেয় নামিয়ে রেখে যোগ দিল সাবাও। লম্বা ঘরটা জুড়ে বুলেটের বাড় বয়ে যাচ্ছিল যেন। বারুদের ধোঁয়ায় প্রাণাঙ্ককার চারপাশ। একের পর এক বন্দুকগুলো তুলে নিয়ে ম্যাগাজিন খালি করে দিচ্ছিল সাবা আর তূর্য। এক-এক করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিল কাজের ছেলেগুলো। পরপর দুটো বুলেটের ধাক্কায় ছিটকে গিয়ে সজোরে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে মুখ খুবড়ে পড়ল পাহারাদারটা। সবশেষে জোয়াকিম। দু'ধার থেকে টানা ছুটে আসা একঝাঁক বুলেটের মারে ছটফট করতে করতে চিত হয়ে পড়ে গেল মেঝেয়। বেশ কিছু ক্ষণ টেবিলের আড়ালে ওত পেতে বসে অপেক্ষা করল দু'জন। ধোঁয়াশা ভাবটা একটু কাটার পর নিশানা তাক করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল টেবিলের উল্টোদিকে। কাজের লোকগুলো মরে ঠান্ডা অনেক ক্ষণ। দেহরক্ষী ছেলোটা মুখ খুবড়ে পড়ে রয়েছে মেঝেয়। শরীরটা থরথর কাপছে তখনও। হাতের বন্দুকটা ছিটকে পড়ে রয়েছে ফুটতিনেক দূরে। ছেলোটার পিঠে পা রেখে মাথার পেছনে একটা গুলি চালান তূর্য। সব কাঁপুনি ঠান্ডা এক মুহূর্তে। দেয়ালে ঠেস দিয়ে পড়ে থাকা জোয়াকিম, ভয়াবহ যন্ত্রণার ছাপ চোখেমুখে। ঘাড়, বুকের পাজর, আর হাতদুটো সেলাই হয়ে গেছে বুলেটে বুলেটে। হাতের সামনে পড়ে থাকা পিস্তল। তোলার ক্ষমতা নেই।

এগিয়ে গিয়ে জোয়াকিমের তীব্র যন্ত্রণাক্লিষ্ট চোখে চোখ রাখল সাবা। "চলো সুইটহার্ট, তোমার সঙ্গে আবার কি সব কথাটখা আছে বোসের।" তার পর ওর রকস্টারের মতো চেউখেলানো চুলগুলো বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে চলল দরজার দিকে। দরজার সামনে পৌঁছে চুল ধরে শূন্যে তুলে একটা পাখির ছানার মতো ছুড়ে ফেলল হাতপাঁকে দূরে। "ওহ্ নোওও!" ভয়াবহ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল জোয়াকিমের গলা চিরে। সামনে এগিয়ে এল তূর্য। ঠান্ডা নীলচে চোখের মণিজোড়া ধকধক জ্বলছে ছড়ারের মতো! গলার আওয়াজ তার চেয়েও ঠান্ডা। "ওঁর দেশে তোমার পাপের কারবার রুখতে চেয়েছিলেন হিজ হাইনেস। এটা ছিল মানুষটার অপরাধ। তার জন্য তাঁকে, তাঁর বেগমসাহেবা আর প্রিয়তম বন্ধু জনাব আমির ফাতাহিকে এত বড় সাজা দিলে তুমি! তোমার জন্যই আজ বিছানায় পঙ্গু হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন সুলতান। সুতরাং তোমার শাস্তির পরিমাণটা তো অনেকটা বেশি হবেই। তোমার ভাড়াটে কুস্তা ওই রশিদি আর ওর শাকরেদদের চেয়েও অনেক বেশি।"

"ইউ বাস্টার্ড!" তূর্যর কথা শেষ হওয়ার আগেই কানামেশানো গলায় ফের আর্তনাদ করে করে উঠল জোয়াকিম। "প্লিজ কিল মি ফর থাউজ্যান্ড হেভেনস সেক! প্লিজইইইজ!" জবাবে মুচকি হাসল তূর্য। "এত তাড়াতাড়ি তো সেটা হচ্ছে না স্যাঙাত। তবে শাস্তিটা আমি নিজে হাতে দেব না তোমাকে। তোমার জন্য অন্য ব্যবস্থা।" বলে সাবার দিকে ঘুরে তাকাল তূর্য। একটু দূরে বাহুমূলের কাছে মাংস খুবলে যাওয়া জায়গাটায় খুব মনোযোগ দিয়ে মোরির বানানো একটা জড়িবিটির ক্লাথের প্রলেপ লাগাচ্ছিল সাবা। ন্যাকড়া দিয়ে ক্ষতস্থানটা ভাল করে বেঁধে নিয়ে হেলতেতুলতে এগিয়ে এলো সামনে। হাতে খোলা কাতান। গুহার মতো মুঠোয় জোয়াকিমের গলাটা টিপে ধরতেই খাবি খাওয়া মাছের মতো হাঁ হয়ে গেল মুখটা। ন্যাকড়ার বাকি অংশটা জোয়াকিমের মুখে ভাল করে ঠেসে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সাবা। পরমুহূর্তেই নেমে আসা কাতানের কোপে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ডান হাতখানা। হাড়িকাঠে বলি দেওয়া পশুর মতো ধড়ফড় করছিল জোয়াকিমের শরীরটা। তীব্র যন্ত্রণামাখা রক্তলাল চোখদুটো কোটর ফাটিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছিল যেন। "এটা জনাব আমির ফাতাহির তরফে।" বলেই খুব ঠান্ডা মাথায় জোয়াকিমের বাঁ বাহুমূলে কাতানের দ্বিতীয় কোপটা বসাল সাবা। "এটা বেগমসাহেবার উপহার।" তার পর ঘুরে গিয়ে বাঁচিতি পরপর দুটো কোপ

বসাল দু’-পায়ে।

হাত-পা বিহীন একটা কেঁচোর মতো মাটিতে ঘষটাচ্ছিল জোয়াকিমের শরীরটা। ফের ঘুরে গিয়ে ওর ঘোলাটে হয়ে আসা চোখদুটোয় চোখ রেখে ফিক করে হেসে উঠল সাবা। “আর শেষদুটো আমার আর হিজ হাইনেসের উপর গুলি চালানোর রিটার্ন গিফট। তোমার বন্ধুরা এসে পৌঁছোতে পৌঁছোতে শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে গিয়েও উপরওয়ালার মেহেরবানিতে যদি টিকে থাকে তা হলে বন্ধুদের বোলো, সুলতানের দেশে ফের তাদের নেমন্তন্ন জানিয়ে গেছে তুর্ক বোস আর সাবা ইয়েকিনি। একবার যেন আঙুল ঠেকিয়ে দেখে।” ফোঁস করে একটা আক্ষেপের শ্বাস বেরিয়ে এল কালো মেয়ের নাক থেকে। “তবে এত ক্ষণ এই অবস্থায় একা একা পড়ে থেকে বোর হয়ে যাবে তো? দাঁড়াও, যাওয়ার আগে তোমার জন্য একটু এন্টারটেনমেন্টের বন্দোবস্ত করে যাই। আ গ্রেট বার্নিং শো!” বলেই মিটারবিশেক পিছিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা বোলাটা থেকে বার করে আনল পাকানো চামড়ার ধনুকটা। পাক খুলে, ছিলে পড়িয়ে নিল শব্দ বাঁধুনিতে বেঁধে। পাশে খাপে রাখা ন্যাকড়া প্যাঁচানো তির। বোতলে প্যারারফিন। ভাল করে ন্যাকড়ায় মাখিয়ে ছিলেয় জ্বুতে নিল টানটান করে। এগিয়ে এল তুর্ক। হাতে দেশলাই। ন্যাকড়ায় আগুন ঝুঁইয়ে সরে যেতেই ধনুকটা কানের সামনে তুলে নিল সাবা। পরমুহূর্তেই কালো মেয়ের হাত থেকে ছিটকে বেরোনো জ্যা-মুক্ত আগুন তির হাউইয়ের গতিতে ঢুকে গেল খোলা দরজা দিয়ে। এতটুকু দেরি না করে পেছন ঘুরে টেনে দৌড় লাগাল দু’জন।

সেকেন্ড তিরিশেক পর শোনা গেল প্রথম গ্যাস সিলিন্ডার ফাটার ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দটা! তার পর প্রায় গায়ে গায়ে লেগে আরও তিনটে। বিস্ফোরণের আওয়াজ পরিণত হল সহস্র বজ্রনির্ঘোষে! আকাশ ঝুঁয়ে লাফ দিয়ে ওঠা দাবানল সম লেলিহান অগ্নিশিখা! ছিটকে যাওয়া টিন, বাঁশ, লাশের টুকরো... নদীর সাঁকোটা পেরিয়ে এসে একবার পিছনে ফিরে তাকাল সাবা। বুনো গোরিলার মতো বুক চাপড়ে হেসে উঠল গুমগুমিয়ে। তার পর ফের ছুট লাগাল তুর্ক পিছুপিছু।

গভীর জঙ্গল। আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে রাখা বিশাল সব মহীরুহর প্রহরা ভেদ করে এতটুকু চাঁদের আলোও এসে পড়ছে না মাটিতে। একফালি রাতের আকাশ, ইতিউতি দু’-একটা চিকিমিকি তারা, উধাও অনেক ক্ষণ। থুপথুপে কুয়াশা আর নিশ্চিদ্র অন্ধকারে অভিজ্ঞ, সতর্ক পায়ে পথ হাঁটছিল দু’জন। কিলোমিটার দুয়েক পথ পেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই। মাঝেমাঝে কমান্ডো উর্দির প্যাচ পকেট থেকে রেডিয়াম কোটেড কম্পাসটা বার করে দেখে নিচ্ছিল তুর্ক। সেই ’৮০-র দশকে তৈরি। এখনও নিখুঁত দিশায় পথ দেখিয়ে চলেছে। এই সময় হঠাৎই দাঁড়িয়ে পড়ল সাবা। “মেরেছে!” শোনামাত্র ঝটিতি ঘুরে তাকাল তুর্ক। এত ক্ষণে একটুকরো ফিকে জোছনা। রাতের কুয়াশা আর ডালপালার অন্ধকার ভেদ করে এসে পড়ল অরণ্যের মাটিতে। সেই মায়াবী আলোয় কালো মেয়ের চকচকে মুখখানায় সলাজ একটা হাসি। “সেদিন রিসোর্টে তাড়াহুড়োয় তোমাকে কথাটা বলা হয়নি। বাসে সীমানা পেরিয়ে ঢোকার সময়ই প্রথম টেনে লাথি কষিয়েছিল বিচ্ছুটা। ঠিক এখনটায়।” তুর্কর হাতটা টেনে নিয়ে পরম মমতায় নিজের তলপেটে রাখল সাবা।

হাঁ করে সাবার দিকে তাকিয়ে ছিল তুর্ক। তীব্র বিষ্ময়, আনন্দ আর

রাগের মিশ্র অভিব্যক্তি দুটোখে। “ইউ আর রিয়েলি ইম্পসিবল বেবি!... শরীরের এই অবস্থায় এভাবে... এক বার জানাতে পারলে না আমাকে? তখনই এ মিশন ক্যানসেল করে দিতাম আমি!” আটকে আটকে যাচ্ছিল তুর্কর কথাগুলো। শোনার পর খুব আলতো করে তুর্কর গালে হাতটা ছোঁয়াল সাবা। “তাতে তো হিজ হাইনেস, তোমার পরম বন্ধুর উপর অন্যায়ের বদলাটা নেওয়া হত না।”

আরও গভীর হয়ে এল কালো মেয়ের গলা, “লিসন বোস। তুমি আমার হিরো। তুমি সিউডো ইউডো। তোমার মায়ের দেশের রূপকথার সেই দানব। হু ইজ আনবিটেবল। যার মৃত্যু নেই! সে তার লক্ষ্য থেকে সরে এলে সেটা আমার পক্ষেও কি খুব সম্মানের হত?” বলে মুহূর্তকয়েক মুখটা নামিয়ে চুপ করে রইলো সাবা। তার পর মুখ তুলে সরাসরি চোখ রাখল তুর্কর চোখে। “তোমার কাছে কী চাই আমি? আসার কয়েক দিন আগে ভুতির হাটের বাড়িতে আমাকে জিগেস করছেছিলে তুমি। জবাবে বলেছিলাম, সময় হলে নিজেই চেয়ে নেব। আজ সেটা চাইছি। দেবে?”

“বলো, গ্লিজ!” গলা কাঁপছিল তুর্কর।

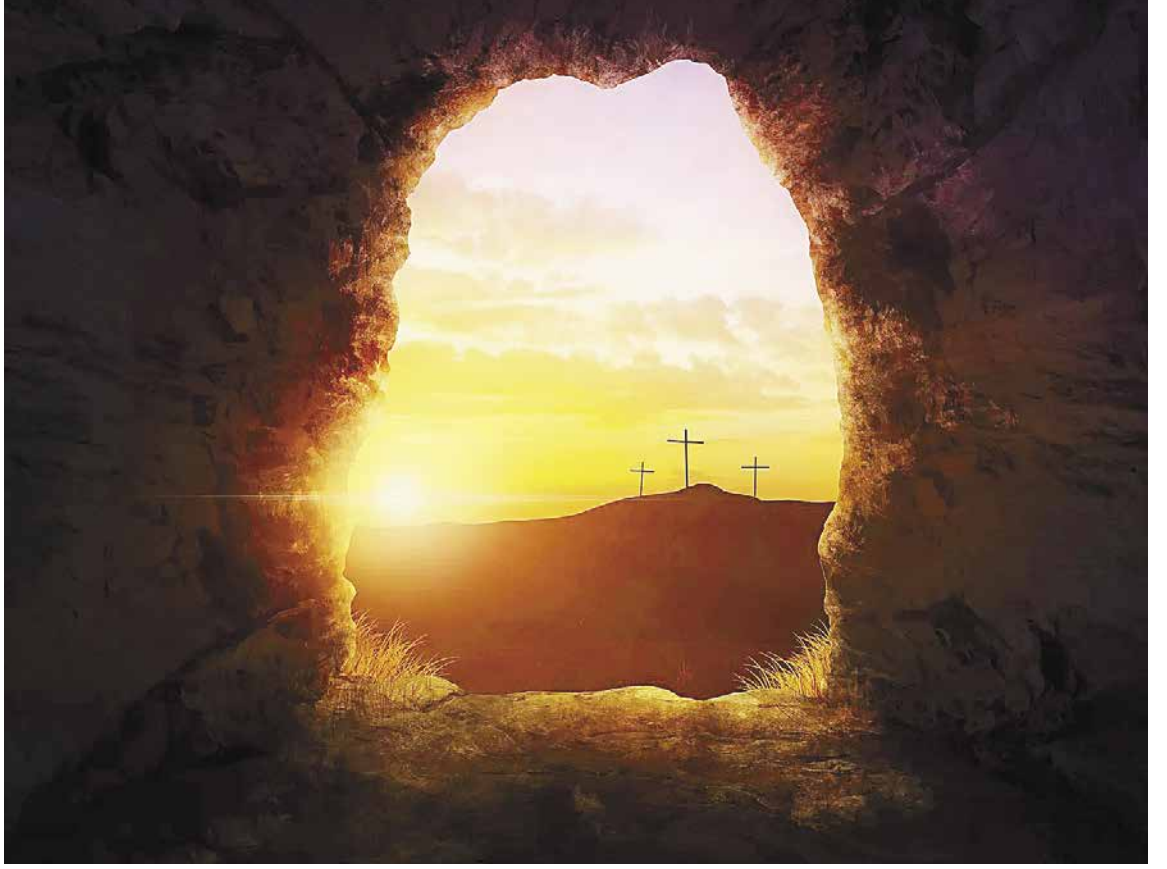
“সুলতানের দেশে তোমার বাড়ির দরজায় একটা নেমপ্লেট দেখেছিলাম আমি। সেখানে তুর্ক বোস, নামটার পাশে লেখা মার্খা ব্রোলিন বোস। ভুতির হাটের বাড়ির সদর দরজাতেও ঠিক ও রকম একটা নেমপ্লেট চাই আমি। যেখানে তুর্ক বোসের পাশে লেখা থাকবে সাবা ইয়েকিনি বোস, এই নামটা। নেমপ্লেটটা পাব?” তুর্কর চোখ থেকে এতটুকু চোখ না সরিয়ে প্রশ্ন করল কালো মেয়ে।

“পাবে!” জবাবে খুব নরম অথচ দৃঢ় শোনা দূর্ধ্ব সিফ্রেট এজেন্টের কাঠখোঁটা গলা। “তবে তার জন্য সবার আগে ভুতির হাটে পৌঁছনোটা দরকার।”

এই একফালি চাঁদের আলো তো পরমুহূর্তেই কুয়াশা আর ঘন অরণ্যের অন্ধকার। টুকরো টুকরো ক্যালাইডোস্কোপ। আলোআঁধারির খেলায় জঙ্গলে আঁকাবাঁকা পথ ধরে হাঁটছিল দুই মানব-মানবী। দূর থেকে ভেসে আসছিল স্ত্রী জাণ্ডয়ারের ডাক। সঙ্গীকে মিলনের আহ্বান জানাচ্ছে সে। তুর্ক একহাতে কম্পাস। অন্য হাতে শব্দ মুঠোয় ধরা সাবার হাত। মনে একের পর এক চিন্তার লাবডুব...বাড়ি ফিরেই একটা ভাল মেটারনিটি হোমের খোঁজ... ডাক্তারের দেওয়া ডেট...ওষুধপাতি... কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে থোড়ের ছেঁচকি রাঁধবে মালতীদি...গ্রচুর আয়রন ওতে... ছিপে পালানের গাঁথে তোলা তাজা কালবোসের জিরেবাটা ঝোল... মেরি আর জোসেফের রাজকীয় সঁতার দিখির জলে...মুরগির চালাঘর থেকে আকবর চাচার কুড়িয়ে আনা ডিম... ভোরবেলা গাড়ি নিয়ে কসরতে বেরোনো...ফেরার পথে বাইপাসে দুলালের বুপড়ি দোকানে কড়া লিকারের স্পেশাল চা... বাগানে ছোট্ট ছানার জিলিপির মতো লেজখানা টুকটুক করে নেড়ে খেলছে টুকি, সঙ্গে তিনপেয়ে পিন্ডি...ওদের দেখে হই হই করে ছুটে আসবে সবাই...ভুতির হাটের বাড়িটা আর কদুর?...সাবার হাতখানা আরও শব্দ মুঠোয় চেপে ধরে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল তুর্ক।

শিল্পী: প্রসেনজিৎ নাথ





শিল্পীর কল্পনায় পর্বতকন্দর থেকে জিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান

মায়া রহিয়া গেল

ঈশানী দত্ত রায়

জ্যোৎস্না রাত কী?

— ওই যে, যে রাতে নেকড়েগুলো চাঁদের দিকে তাকিয়ে হু হু করে ডাকে। আমিও ডাকি।

চাঁদের রাতে মফস্সলের এক বহুতলের বারান্দায় মেয়েকে চাঁদের দিকে তাকিয়ে হৌ-উ-উ-উ করে ডাকতে শুনেছিল মা।

বালিকা ইংরেজি গল্পে, কার্টুনে ওই ভাবেই দেখেছে চাঁদকে। সে এখনও পড়েনি গৃহত্যাগী জোছনার কথা, হুমায়ুন আহমেদের কবিতা, যে চাঁদ ঢুকে পড়বে ঘরে আর ডাকবে আয় আয় আয়...

— সে চাঁদ তবে কী, যে জ্যোৎস্না প্রাণিত করে চরাচর, আর পুত্রহারা

পিতার মনে হয় সব কিছুর মধ্যেই সমস্ত কিছু রহিয়া গিয়াছে।

— রহিয়া গিয়াছে! থাকে নাকি সব? তুমি থাকবে, আমি থাকব?

— ছোটবেলায় পুজোয় একটা গান শুনতে না, কিশোরকুমারের? ‘আমি নেই আমি নেই, ভাবতে ব্যথায় ব্যথায় মন ভরে যায়’। ওই যে আমরা বলি— আমি যখন থাকব না, তখন দেখিস কী হয়! আসলে আমি থাকতে চাই, আকুল হয়ে থাকতে চাই।

মেয়েটি তো তাই মোবাইল ফোনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ হঠাৎ চিৎকার করে উঠছিল, সারা পাড়া শুনছিল তার চিৎকার— ‘আমি অফিস যাই আর বাড়ি ফিরি, কোনও দিকে তাকাই না আর তুমি? আজ এক মাস হল!’ চাঁদের আলোয় সে পায়চারি করছিল রাস্তায়। এলোচুল।



জ্যোৎস্নায় প্লাবিত আকাশ

রাস্তার দু'দিকে বাড়ি। আলো জ্বলছে কোনও কোনও জানলায়।

মধ্যরাতে নিয়মিত চিৎকার চলে, ফোনও কাটে না।

— মেয়েটি কি অমরত্ব প্রত্যাশী?

অমরত্ব? যার মন ভেঙেছে, সে কি অমরত্ব চায়?

— চায়, সে তো তাই চেয়েছিল, তার চিৎকার থেকে ছিটকে আসা শব্দাবলি খানখান হয়ে বলে, সে মুহূর্তের অমরত্ব চেয়েছিল। রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে, ষেতে গিয়ে, অফিসের পথে, বাড়িতে ফিরে ছেলেটির তাকে মনে পড়াকে যদি অমরত্ব বলো, তা হলে তাই। মেয়েটি ভোলেনি, হয়তো ছেলেটিও পুরোটা ভোলেনি। নইলে রোজ চিৎকার, রোজই ফোন মধ্যরাতে, যে কথা ফ্ল্যাটের পরিসরে বলা যায় না অথচ মধ্যরাতের পথের প্রকাশ্যে ফেটে পড়তে দ্বিধা করে না।

— তবু মনে রেখো? যদি জল আসে আঁখিপাতে, মনে রেখো আর জল যদি না-ও আসে, যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায়, মনে রেখো তা-ও।

— এই তো প্রত্যাশা তাঁর। বেঁচে থাকবে না যখন, মুহূর্তের অমরত্ব আর যখন থাকবে না, তখনও সে মনে থাকবে বলে ভেবে নেওয়া, সরাসরি বা প্রচ্ছন্ন ভাবে। কেউ যখন থাকল না আমার জীবনে বা এই পৃথিবীর জীবনেই, কিন্তু থাকল, হঠাৎ খুঁজে পাওয়া রুমালে, অন্য কারও চাহনিতে, উড়ে যাওয়া চুলে, হঠাৎ কথার ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়ানোয় বা কথায়। কোনও গানে, কোনও ঘরে। কোনও একান্ত কোণে।

যেমন রতনবাবুর সেই একতলার ঘরটা।

রতনবাবু বন্ধু হারিয়েছিলেন।

রতনবাবু এক জন বাড়িওয়ালা।

জয় গোস্বামী তাঁর প্রবন্ধে লিখেছিলেন রতনবাবুর কথা। জয় গোস্বামী যে বাড়িতে থাকতেন, তার বাড়িওয়ালা ছিলেন রতনবাবু। ওই বাড়ির একতলায় থাকতেন এক জন পণ্ডিত, বয়স্ক মানুষ। তাঁর সঙ্গে রতনবাবুর বন্ধুত্ব। রতনবাবুর অভিভাবকত্ব ও বকুনি মেনে নিতেন মানুষটি। সন্ধ্যায় টেপ রেকর্ডারে রমা মণ্ডলের গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতেন। তিনি মারা যাওয়ার দিন কয়েক পর জয় গোস্বামী এক সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরছেন, ওই মানুষটির ঘর থেকে ভেসে আসছে রমা মণ্ডলের গান। গিয়ে দেখলেন, যে চেয়ারে মানুষটি বসতেন, ধূপদানিতে ধূপ জ্বালিয়ে সেখানে বসে রয়েছেন রতনবাবু। টেপ রেকর্ডারে চালিয়ে দিয়েছেন রমা মণ্ডলের গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। এত দিন বাইরে থেকে যে ভাবে ধ্বনিত হত একতলার ঘরটি, সেই ভাবেই যেন রয়ে গিয়েছে।

জয় গোস্বামী এই আখ্যানটি লিখেছিলেন শঙ্খ ঘোষের একটি কবিতার লাইন— ‘ছিল, নেই, মাত্র এই...’ নিয়ে ভাবনা বিস্তারে, লিখেছিলেন, এই যে ছিল, আর এই নেই, তা যেমন সত্য, তেমন ঘরটিকে সেই আগের মতো অনুভব করছেন রতনবাবু এই মাত্র, সে-ও তেমনই সত্য।

যেমন রমা নেই, কিন্তু তাঁর কণ্ঠ রইল। আবার রতনবাবুর বন্ধুর অমরত্ব রয়ে গেল ওই ঘরটিতে, রমার গাওয়া সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতে এবং রতনবাবুর একলা হয়ে বসে থাকায়।

আমরা সাধারণ মানুষ তো টুকরো টুকরো এমন যাপনেই অমরত্ব খুঁজে পাই, হয়তো অমর হতেও চাই। অমরত্ব মানে থেকে যাওয়া, মুহূর্তের অমরত্ব, সারা জীবন ধরে অমরত্ব, যুগের পর যুগ অমরত্ব। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন শাপমোচন গীতিনাট্যে, ‘যখন চাঁদ উঠল তখন তার মালাখানি রইল, সে রইল না।’ সে তো ছিল বিরহের অমরত্ব, ছিল ফিরে আসার লুকোনো আশ্বাসও।

এই আশ্বাসটুকু চেয়েই কেউ যদি বলে, ‘আমি তো মানুষটার অমরত্ব চাই না, আমি রক্তমাংসের মানুষটাকে চাই। ছুঁতে চাই। কথা বলতে চাই।’

আমরা তো তাই বলি, বলি না? পাই না বলেই হাহাকার। পায় না বলে মানুষ আজকাল সিলিকনের মূর্তি গড়িয়ে বাড়িতে রাখে। কী মনে হয় তাদের, মানুষটা বাড়িতে রয়েছে? একটা শরীর ছোঁয়া যায়, হয়তো একতরফা কথা বলা যায়। হয়তো সামনে খাবার রাখেন রোজ।

ভেসে ওঠে দশমীর দিন। প্রতিমার মুখে পানপাতা বোলানো, আদর, মিষ্টি খাওয়ানো, কান্না। দর্পণে বিসর্জন তো হয়ে গিয়েছে আগেই, প্রতিমায় তখন আর প্রাণ নেই, কিন্তু তা কে মনে রাখে? প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে যাকে ঘরে এনেছ, সে তো রক্তমাংসেরই মানুষ। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন—

‘বিদায় দেবার আগে

দু-গালে দুটো পানের পাতা বুলিয়ে দিতে দিতে

ঠাকুমা বলেছিলেন: এসো আবার।

বিদায় নেবার আগে

কলসভরা জলে নিজেরই মুখচ্ছবি দেখতে দেখতে

বলেছিলেন: আবার আসব।

তারপর যুগের পর যুগ ধরে

লগি ঠেলতে ঠেলতে আসছি তো আসছিই, আসছি তো আসছিই



কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে কি মানুষ ফিরবে নতুন অবয়বে

তার আর শেষ হয় না—...’

ঠাকুর প্রতীক্ষা যেমন অনন্ত, তেমন আসছি তো আসছিই, এ সেই দিন-বছর-কাল-যুগ পেরিয়ে আসা, যার অন্ত নেই। পথ চেয়ে থাকার, ভালবাসার, না-পাওয়ার, অপেক্ষার এ-ও তো অমরত্ব। যে থাকবে না, কিন্তু আসবে ফিরে ফিরে।

‘নিউ আমস্টারডাম’ ওটিটি সিরিজে হাসপাতালের মেডিক্যাল ডিরেক্টর আচমকাই এক রোগীর সন্ধান পান, যিনি তাঁর অকালপ্রয়াত দিদির হৃৎপিণ্ড পেয়েছিলেন। সেই হৃৎপিণ্ডের বয়স হয়েছে, তেমন কাজ করছে না, ডাক্তারেরা দেখে রায় দিলেন, নতুন হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করতে হবে। মেডিক্যাল ডিরেক্টর তোলপাড়, দিদির হৃৎপিণ্ডকে কী ভাবে সচল রাখা যায়। একটি ভিডিওয়ে দেখেছিলাম, মৃত ভাইয়ের মুখের অংশ নিয়ে নতুন মুখ পেয়েছেন যিনি, তাঁর মুখে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন দিদি। ভার্জিনিয়ার বাসিন্দা রিচার্ড নরিস ১৯৯৭ সালে শটগানের গুলিতে নিজের মুখের একাংশই উড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রায়। ২১ বছরেই জীবন শেষ হয়ে যাওয়া এক তরুণের মুখ প্রতিস্থাপনের জন্য দেয় পরিবার। ২০১২ সালে ৩৬ ঘণ্টার অস্ত্রোপচারে নতুন মুখ পান নরিস। ২০১৫ সালে ওই যুবকের দিদি রেবেকা অ্যাভার্সনো যান নরিসের সঙ্গে দেখা করতে। মুখে হাত বুলিয়ে বলেন, এই তো সেই মুখ, ছোটবেলা থেকে এই মুখই তো দেখেছি আমি। নরিসের, দাঁত, চোয়াল, জিভ, বিভিন্ন মাংসপেশি, স্নায়ু প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। এখন অনেকেই দিয়ে দেন, বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, অকালপ্রয়াত সন্তানের অঙ্গ অন্যকে— ‘ও তো বেঁচে থাকবে’।

এ-ই তো বেঁচে থাকা, বাঁচিয়ে রাখা। জন্মান্তর। পুনর্জন্ম।

আধুনিক প্রযুক্তিতে এই বেঁচে থাকাটাই যে অন্য রকম হয়ে উঠতে চলেছে। যা জানাতে গিয়ে প্রতিবেদনের শিরোনামে লেখা হচ্ছে, মৃত্যুর

ভবিষ্যৎ। আমার কথা, আমার ভাবনা যখন শোনা যাচ্ছে মৃত্যুর পরও, কথা বলা যাচ্ছে আমার সঙ্গে, মৃত্যু কোথায়?

আমেরিকার একটি স্টার্ট আপ সংস্থা অর্থের বিনিময়ে মানুষের ত্রিমাত্রিক প্রতিমূর্তি (হেলোগ্রাম) তৈরি করেছে, মৃত্যুর পর যার সঙ্গে প্রিয়জন কথা বলতে পারবেন। যিনি নিজের সেই ত্রিমাত্রিক প্রতিমূর্তি চান, বিশেষ প্রযুক্তির অন্তত ২৯টি ক্যামেরা দিয়ে তাঁর ছবি তোলা হয়। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়, যেখানে মৃত্যুর পর প্রিয়জনরা জিজ্ঞাসা করতে পারেন এমন সম্ভাব্য সব প্রশ্ন থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ধারণা, তাঁর পছন্দ, তাঁর ছেলেবেলা নিয়ে প্রশ্ন। ছবি, উত্তর জমা হলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তাঁকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়। এমন হতেই পারে যে, এমন কিছু প্রশ্ন এল, যার উত্তর আগে সঞ্চয় করা হয়নি। তখন বলা হবে অন্য প্রশ্ন করতে। ওই সংস্থার সিইও স্টিফেন স্মিথের মা মেরিনা স্মিথই এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলেন, ফলে তাঁর শেষকৃত্যের পর মেরিনা আবার এলেন তাঁদের সামনে, দিলেন অনেক প্রশ্নের উত্তর।

এ তো শুরু। শুধু ছবি নয়, কথা, সমাজমাধ্যমে যাবতীয় ছবি, লেখা, চিঠিপত্র, লেখালিখি, কথোপকথন সব কিছু একত্র করে, বিশ্লেষণ করে বোঝার চেষ্টা হচ্ছে এক জনের মন, ভাবনা, মগজ। যাকে পরিভাষায় বলা হচ্ছে, ডিজিটাল অমরত্ব। ব্যক্তিত্ব, মনন, ভাবনা সব কিছু সঞ্চয় করে গচ্ছিত থাকবে কম্পিউটার, রোবট বা সাইবারস্পেস-এ। যা থেকে তৈরি হবে আপনার নতুন ‘অবতার’, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে বিকশিত হবে দিনের পর দিন বা গচ্ছিত গুণাবলির সমন্বয়ে তৈরি অবতারেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। কিন্তু এ কাজ কঠিন, খুবই কঠিন, মানুষের পুরো ভাবনাকে ধরে রাখা এবং বোঝার জন্য, এক জন মানুষ কোন পরিস্থিতিতে কী কাজ করবে, কী ভাবে ভাববে, কী উত্তর দেবে, তা তাঁর মৃত্যুর পর নিখুঁত বোঝানোর জন্য, নিখুঁত আচরণের জন্য যে তথ্য দরকার এবং যে পরিমাণ তথ্য বিশ্লেষণ করা দরকার, তার জন্য সময় তো বটেই, দরকার অনেক বেশি শক্তিশালী প্রযুক্তি, যা মানবমস্তিস্কের



মানুষের ভস্ম থেকে জেগে ওঠে ফুল

মতোই শক্তিশালী এবং দ্রুতগামী। আর এ কাজ পূর্ণ হলেই পৌঁছে যাবেন ডিজিটাল স্বর্গে, যেখানে আপনি অমর। শরীরে আপনি নেই, কিন্তু রোবট, অবতার, ডিজিটস্পেসে আপনার মগজের, মনের বিকশিত বিচরণ, যা বাড়ছে মৃত্যুর পরেও।

— এই কি তবে, বাংলায় লেখা বাইবেলে যা পড়েছিলাম, তিনি মাংসে হত, কিন্তু আত্মায় জীবিত হইলেন? জিশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে যা লেখা হয়েছিল।

— আত্মায় জীবিত তো অনেকেই। ডিজিটালি কেন? তুমি তো শোনো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান, পড়ো মাইকেল মধুসূদনের কবিতা, ভাবো গান্ধীজির মতো কেউ যদি সারা ভারত হেঁটে মানুষের কথা শুনত! আত্মায় জীবিত তো একেই বলে।

— এ তো বড় মানুষদের কথা, ডিজিটাল অমরত্বে তো প্রিয়জন কথা বলতে পারবেন প্রিয়জনের সঙ্গে, আর কষ্ট থাকবে না?

— দূর পাগল? ছোটবেলা থেকে শোনানি মা বলত, আমি যখন থাকব না, আমায় পাবে, রাতের আকাশে তারা হয়ে থাকব, ওই খানে একটা নতুন তারা দেখবে, বা তোমার ভিতরেই আমি থাকব! তুমি কি কথা বলো না রোজ মৃত প্রিয়জনের সঙ্গে? রোজ সকালে উঠে ছবির কাছে টকটক করে আওয়াজ করে শব্দ করে জানান দাও না, ‘উঠে পড়ো’ বলে। বৃদ্ধা বান্ধবী কি অভ্যাসের বশে রোজই কথা বলেন না বান্ধবীর সঙ্গে, যেমন আগে বলতেন।

— একাই বলেন?

— না, দু’জনে বলেন। একা কথা বলে দেখো, উত্তরগুলো বুকের

ভিতর থেকে ঠিক উঠে আসবে। তুমি কি রাখোনি ছাই, ছড়িয়ে দাওনি মাটিতে? যেখানে অজস্র সাদা ফুল ফোটে প্রতি বছর? দুঃখ পাবে, কাঁদবে, তার পর এক সময় দেখবে তুমি মৃতের সঙ্গে জীবন কাটাচ্ছ। না মৃতদেহ আঁকড়ে ধরে নয়, তোমার জীবন হয়তো এগিয়ে যাবে, কিন্তু সে থেকে যাবে তোমার সঙ্গে।

এই শোক পেতে পেতে, দুঃখ পেতে পেতে তুমি এক দিন বুঝতে পারবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কী বলতে চেয়েছিলেন, ‘প্রথম শোক’-এ যখন লিখেছিলেন—

‘বনের ছায়াতে যে পথটি ছিল সে আজ ঘাসে ঢাকা।

‘সেই নির্জনে হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল, “আমাকে চিনতে পার না?”

আমি ফিরে তার মুখের দিকে তাকালেম। বললেম, “মনে পড়ছে, কিন্তু ঠিক নাম করতে পারছি নো।”

সে বললে, “আমি তোমার সেই অনেক কালের, সেই পঁচিশ বছর বয়সের শোক।”... বললে, “যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।”

— এ তো আমার দুঃখ প্রিয়জনকে নিয়ে, কিন্তু আমি নিজে যখন থাকব না? আধুনিক যযাতিরা তো অমর হওয়ার জন্য সন্তানের রক্তের প্লাজমা নিচ্ছে, নিজের প্রবীণ রক্তকে তাজা করবে বলে...

— বিমল করের ‘অসময়’ পড়ানি? সেখানে বাড়ির জেঠামশায় গাছ লাগাতেন বৃদ্ধ বয়সে, বাগানের কোন গাছ কে, কবে কোথা থেকে নিয়ে এসে লাগিয়েছিল, সব ছিল তাঁর মুখস্থ। দেখে অবিনের মনে হয়েছিল, এ গাছ যখন বড় হবে, তখন উনি তো থাকবেন না। তা হলে? অবিন নিজেই বলে তার পর, এই বাড়িটার প্রতি মায়া জেঠামশায়ের নাড়িতে জড়ানো। ‘আমাদের মধ্যে একটা হাত বাড়ানোর ইচ্ছে রয়ে গেছে বরাবর, জীবাজীবের ভেদ করে না।’

— হাতটা কিন্তু থেকেই যাবে। লেখক, সঞ্চালক ওপরা উইনফ্রি এক বার সাহিত্যিক, কবি, মানবাধিকারকর্মী মায়া অ্যাঙ্গেলুকে বলেছিলেন, যে স্কুলটা মেয়েদের জন্য করেছি, সেটাই আমার সেরা উত্তরাধিকার হবে। তা শোনার পরও মায়া দু’বার পাল্টা প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার উত্তরাধিকার কী? ওপরা উত্তর দিতে পারেননি, মায়া বলেছিলেন, তোমার জীবন যদি একটি জীবনকেও ছুঁয়ে থাকে, সেটাই তোমার উত্তরাধিকার।

— হুমম। তবে একে তুমি কী বলবে? এক বালক দাদুর হাতের উপরে হাত দিয়ে ফুলে ওঠা শিরাগুলোকে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, তার খুব অস্বস্তি হচ্ছে, দাদুর হাতের উপরের শিরাগুলো কেন উঁচু উঁচু? বলছে, আমি এগুলো সব ঠিক করে দেব আর বৃদ্ধ বলছেন, “তুমি কবে ডাক্তার হয়ে বুড়ো মানুষের হাতের শিরাকে ঠিক করবে, সেই জন্যই বেঁচে থাকতে হবে দেখছি।” এ কি অমরত্বের ইচ্ছা?

— না, এ হল মায়া। ‘অসময়’-এর জেঠামশায়ের মতো। জড়িয়ে ধরতে চায়।

কিছু তো রহিয়া যায়।



সিলিং ফ্যান

সায়ন্তনী পূততুণ্ড

দু’মাসের শিশু হঠাৎই ঘুম ভেঙে কেঁদে ওঠে! তার কচি স্বর তীব্র সাইরেনের মতো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হল চতুর্দিকে। আচমকাই যেন অজানা কোনও বিপদের আঁচ পেয়েছে সে। একটা অদ্ভুত নিরাপত্তাহীনতা, ভীষণ ব্যথায় কেঁদে চলেছে ছোট্ট শিশুটি! ছোট্ট হৃদয়টার মধ্যে বুঝি জমে আছে অনেক আশঙ্কা, অনেক আতঙ্ক! সে আতঙ্ক প্রতি মুহূর্তে তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাকে।

অথচ এমন কিস্তি হওয়ার কথা নয়। বাচ্চাটা জানে না, এই কিছুদিন আগেও অতিমারির প্রকোপে মারা গিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। কিছু মরেছে রোগে, কিছু মরেছে রোগের ভয়ে! ওর বোঝার ক্ষমতা নেই যে জীবন মানেই লড়াই! ব্যথা, যন্ত্রণা, রোগ, শোক, ক্ষুধা, এবং মৃত্যুর বিরুদ্ধে সব সময়ই জেহাদ করে চলতে হবে। ছলনাময়ী নারীর মতো মৃত্যু মাঝেমধ্যেই নানা রূপে সামনে এসে বলবে—‘আর লড়াই করিস না। জীবন তোকে ক্লান্তি ছাড়া আর কী-ই বা দেবে! তার

চেয়ে ঘুমিয়ে পড়। দেখবি দুনিয়ার কোনও দুঃখ, কোনও কষ্ট তোকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। ঘুমই যে চিরশান্তি! বিশ্বের সমস্ত সুখী মানুষই তো আসলে মৃত। আয় ঘুম... আয় ঘুম...’

বাচ্চাটা জোরালো চিৎকার করে উঠে ঘুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সমস্ত বিশ্বের অসহিষ্ণুতা বোধ হয় তাকেও স্পর্শ করেছে। অথচ সুমনার বড়ই ঘুম পাচ্ছে! আজ নয়, বেশ কয়েক বছর ধরেই নিবিড়, শীতল ঘুম হাতছানি দিয়ে ডেকে যাচ্ছে তাকে। একটা বড় সুন্দর, শান্ত নীলাভ ঘুম! এই ভাবে জেগে থাকার চেয়ে টুপ করে ঘুমিয়ে পড়লেই তো হয়! কোনও লড়াই নেই, স্কোভ নেই, অশান্তি নেই— অদ্ভুত নির্বিকার ঘুম! স্লিপিং বিউটির মতো নিষ্পাপ নিস্তরঙ্গ নিদ্রায় ডুবে যাওয়ার চেয়ে বড় শান্তি আর কী হতে পারে? প্রেম বা চুম্বনের অভিশাপ জীবনে এলেই যে আবার জেগে উঠতে হবে! তার চেয়ে ঘুমই ভাল!

মাঝেমধ্যে তার মনে হয়, চোখের সামনে হয়তো

সব সময়ই কুয়াশার একটা পাতলা চাদর ভেসে বেড়াচ্ছে। যত অনুভূতি তার ছিল, সবটাই বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। কোথাও আজ কিছুই নেই। ঘন ধোঁয়াশার পর্দা চিরে কখনওই আলো এসে পড়ে না। কিছু কিছু অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা কানে এসে পৌঁছায় বটে। কিন্তু তাতেও আজকাল কিছুই মনে হয় না তার। শব্দগুলো চেনা, অর্থও অজানা নয়— তবু মনে হয় ওরা বুঝি অন্য ভাষায় কথা বলছে। টুকরো টুকরো কিছু সংলাপ আজও মনে পড়ে তার। অথচ সত্যিই কি সেই সংলাপগুলোর কোনও মানে আছে?

‘তুমি তো খাদের ধারে পৌঁছে গিয়েছ! এর পর তোমায় ডিপ্রেসনের ওষুধ খেতে হবে সুমনা! কাম অন! তুমি একজন শিক্ষিতা মেয়ে। এটা কোনও সলিউশন নয়!’

সুমনাও জানত যে, ডিপ্রেসনের ওষুধ তার কোনও সমস্যারই সমাধান করতে পারবে না। হয়তো বা এই অসুখের কোনও নিদানই নেই! তিন বছর ধরে যত বিযাক্ত ছেঁবল সে খেয়ে এসেছে, তার জ্বালার উপশম একমাত্র চিরনিদ্রাই করতে পারে। ডাক্তারবাবু কত সহজে মনে করিয়ে দিলেন যে সুমনা এক জন শিক্ষিতা মেয়ে! কিন্তু আদৌ কি শিক্ষা একটি মেয়ের ভবিষ্যৎ বদলাতে পারে! পারে কি জ্বলন্ত সিগারেটের ছাঁকার জ্বালা ভুলিয়ে দিতে? মারের যন্ত্রণা, কালশিটের দাগ ডিগ্রির সার্টিফিকেট দিয়ে ঢাকা যায় না, আটকানোও যায় না। শিক্ষার সঙ্গে নারীর আসল জীবনের কোনও যোগাই নেই— এ কথা কে বোঝাবে! কাছেই বা বোঝাবে!

সুমনা আস্তে আস্তে তার অলস দৃষ্টি সিলিং ফ্যানের ওপরে বোলায়। বিয়ের পর থেকে বহু বার সে এই বস্তুটির দিকে তাকিয়েছে। বহু বার ভেবেছে একটা বেডকভারের শক্ত ফাঁস আর দেহের ভার সহিতে পারবে কি এই দামি, অথচ ফ্যানি ফ্যানটা? দু-এক বার তো চেষ্টাও করে দেখেছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই প্রচেষ্টা, তা কোনও দিন সফল হয়নি। কারণ, প্রত্যেক বারই তার মনে হয়েছে, এক নারীর জীবন-মরণের ভার বওয়ার মতো ক্ষমতা এ বাড়ির দুর্বল সিলিং ফ্যানগুলোয় নেই!

তবে এই মুহূর্তে যে সিলিং ফ্যানটার দিকে সে তাকিয়ে আছে, সেটা তার স্বশ্রুতবাড়ির নয়! বাপের বাড়িরও নয়। একটা ছোট্ট ঘুপচি পুরনো আমলের বাড়ির সস্তা ভাড়ার একটা ঘর। সুমনার মতোই ছাল-চামড়া ওঠা, পলন্তারা খসে পড়া আশ্রয়। তবে সুবিধে একটাই। সিলিং ফ্যানগুলো অত হালকা-পলকা নয়। বরং মোটা মোটা ব্লেড, জগদল চেহারা দেখলে ভরসা হয়। হয়তো বা একটা মানুষের ভার সে নিতে পারবে।

বেশ কিছু ক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে অবশেষে সুমনা আশ্বস্ত হল। হ্যাঁ, ঠিকই ভেবেছে। এই পাখাটার উপর ভরসা রাখা

যায়। অন্যদের মতো সে অন্তত এক ঝটকায় মাটিতে ফেলে দেবে না কাউকে। এ পাখা ওজন নিতে জানে!

সে এবার আস্তে আস্তে বেডকভারটা সযত্নে ফ্যানের ব্লেডে বাঁধতে শুরু করল! গিট যেন কিছুতেই না খোলে! কোথায় কে যেন খুব নরম সুরে বলে চলেছে—‘আয় ঘুম... আয় ঘুম... আয় ঘুম...’

১২

“আর যাবি না মানে! কেন যাবি না!”
মাকে দেখে মনে হচ্ছিল সিলিং ফ্যানসুদ্ধ গোটা ছাতটাই বুঝি হুড়মুড় করে তাঁর মাথায় ভেঙে পড়েছে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন সুমনার দিকে। যেন সামনে ওঁর নিজের সন্তান নয়, ভিনগ্রহবাসী কেউ এসে দাঁড়িয়েছে! তার কথাগুলো হয় তিনি বুঝতে পারছেন না, অথবা বুঝতে চাইছেন না!
সুমনার মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। সে দৃঢ়স্বরে জানায়, “যাব না মানে—আর ফিরব না। ও বাড়িতে আর থাকতে পারব না আমি মা! অনেক সহ্য করেছি, আর পারছি না!”

“এ আবার কী কথা!” এ বার বাবাও ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে উঠলেন, “নিজের সংসার, নিজের ঘরবাড়ি সব কি এ ভাবে ফেলে চলে আসতে হয়! লোকে কী বলবে!”

সুমনা জানত এই প্রশ্নটা উঠবেই। আজও এ দুনিয়ায় কন্যাসন্তানের জীবনের চেয়ে ‘লোকের কথা’ অনেক বেশি দামি। মুশকিল হল, এই তথাকথিত ‘লোকেরা’ কখনওই তার অসুস্থতায় রাত জাগেনি! যত বার সে কঁদেছে, কোনও বার ‘লোকেরা’ তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে আসেনি। বিপদে-আপদে, সুখে-দুঃখে কোনও দিনই এই সব ‘লোকের’ দেখা পাওয়া যায় না! তবে এরা কারা! শুধু একটি অপদার্থ ভিড়— যারা একটি মেয়ের দিকে সব সময়ই আঙুল তুলে আছে! সুমনার জীবনে যাদের কোনও রকম ভূমিকাই নেই, তাদের কথায় কী আসে-যায়!

একটা শক্ত কথা কোনও মতে গিলে ফেলে নিজেকে সংযত রাখল সে। কোনও মতে বলেছিল, “ও আমায় মেরে ফেলবে মা! আমি ও বাড়িতে আর কিছুতেই যাব না!”

মা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন, “অমন বলে না। ওটা যে তোর নিজের সংসার! দাঁতে দাঁত চেপে একটু সহ্য করে নিতে হয়। ঝগড়া, মন কষাকষি, ঠোকাঠুকি তো সব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকে। ওটাই স্বাভাবিক। সহ্য করাটাই যে মেয়েদের নিয়তি!”

সুমনা বুঝতে পারে যে, এ বার দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাচ্ছে। সে রাগে, দুঃখে প্রায় গর্জনই করে ওঠে, “কোনটা স্বাভাবিক মা! রোজ রাতে টচার করাটা! পুরুষদের বৌকে ধরে পেটানোটা! বাবা জীবনে কত বার তোমার গায়ে হাত তুলেছে! তোমার মনে হয়

এগুলো স্বাভাবিক! আমার তো মনে হয় না। আশা করি ইন্ডিয়ান পিনাল কোডেরও তা মনে হবে না।”

মা কী জবাব দেবেন বুঝে উঠতে পারেন না। কোনও মতে ডুকরে ওঠেন, “তুই এই অবস্থায় থানা-পুলিশ করবি! কী কলেঙ্কারি! যে আসছে, তার কথাটা এক বারও ভাববি না? তাকে জন্মের আগেই পিতৃহীন করবি?”

এ বার যেন আশ্বেয়গিরির বিস্ফোরণ হল, “কিসের বাবা! যে নিজের পিতৃহীন অস্বীকার করে, সে নিজের সন্তানকে ভালবাসবে বলে মনে হয় তোমার!”

“মানে!”

মা-বাবার অসহায় দৃষ্টি দেখে রাগের পাশাপাশি একটা কষ্টও বাজল তার বুকে। মনে হল, দুটো হৃদয় চোখ বুজে গর্তে মাথা ঢুকিয়ে একটু আশ্রয় খুঁজছে। যারা সব কিছু জেনেও না জানার ভান করে, তাদের এ সব কথা বলার কি আদৌ কোনও অর্থ আছে!

অন্যমনস্ত ভাবে নিজের ফুলে ওঠা পেটে আলতো হাত বোলায় সুমনা। এই বিয়েটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য কত কিছুই না সহ্য করেছে সে! বিয়ের দিন মা-বাবার আনন্দিত, গর্বিত মুখ এখনও চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। বড় ঘরে মেয়ের বিয়ে হওয়াটা যেন নোবেল প্রাইজ পাওয়ার চেয়েও বেশি গর্বের। যখন সুমনা কেমিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিল, তখনও তো কই এমন আনন্দের আলো ওঁদের মুখে দেখা যায়নি! মেয়ে কেমিস্ট্রিতে পিএইচ ডি কমপ্লিট করেছে, গোল্ড মেডেল পাওয়া ছাত্রী— তা নিয়ে তাঁদের কোনও মাথাব্যথা নেই। বরং সমস্ত আত্মীয় পরিজনের সামনে গর্বে বুক ফুলিয়ে বলেছিলেন, “আমাদের জামাই একটা বিরাট মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সিইও! যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনই গুণী!”

গুণী বটে রজত! ফুলশয্যার দিনই সুমনা টের পেয়েছিল যে, ওর স্বামী প্রয়োজনে আস্ত একটি জানোয়ারের রূপ ধরতে পারে। পাকস্থলিতে মদ পড়লে তো কথাই নেই! দুনিয়ায় এমন কোনও পাশবিক অত্যাচার নেই, যা সঙ্গমের সময় সে করতে পারে না। দেহে ও মনে অত্যন্ত নরম মেয়েটার তার জান্তব ক্ষুধার সঙ্গে মানিয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। মাঝেমধ্যে মনে হত, রজতকে তৃপ্ত করার ক্ষমতা হয়তো কোনও প্রাগৈতিহাসিক রাক্ষসীরই আছে। স্বামীর সঙ্গে রাত কাটাতে হবে ভাবলেই সে ভয়ে গুটিয়ে যেত। আবার সেই যন্ত্রণা! নরম মোমের মতো শরীরে নিষ্ঠুর নখের আঁচড়! গায়ের জায়গায় জায়গায় কালশিটে! ফের রক্তাক্ত আরও একটা রাত! এই অদ্ভুত যন্ত্রণাদায়ক দৈহিক মিলনের কথা ভাবলেই ঠান্ডা হয়ে যেত সুমনা। ফলস্বরূপ কপালে জুটত আরও গালাগালি। রজত গা ঘিনঘিনে কতগুলো গালাগালি দিয়ে বলত, “তুমি জাস্ট একটা ঠান্ডা মাংস! দেখতেই যা

সুন্দর। আর কোনও কোয়ালিটি নেই। একটা পুরুষকেও সম্ভ্রষ্ট করতে পারো না। অপদার্থা”

সুমনার গানের গলা ভারী মিষ্টি ছিল। সে খুব সুন্দর আবৃত্তিও করতে পারত। রজতের তা অজানা ছিল না। অথচ কোনও দিন সে তার স্ত্রী-র গান বা কবিতা শুনতে চায়নি। সত্যি বলতে, আসল সুমনাকে কোনও দিন আবিষ্কারই করেনি ও। স্ত্রী তার কাছে একটা খেলার পুতুল মাত্র। প্রচুর হিরে জহরতে তার দেহ সাজিয়ে দিয়েছে, সবার সামনে সুসজ্জিতা, উচ্চশিক্ষিতা সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে বড়াই করেছে। কিন্তু প্রতি রাতে সেই পুতুলটাকেই ক্ষতবিক্ষত করতে ছাড়েনি। যখন তার এই বিকৃত কামনার প্রত্যুত্তর পায়নি, তখন অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে। বেড়েছে গালাগালির বহরও।

লজ্জা-ঘোমার মাথা খেয়ে এক দিন মাকে সে কথা বলেও ফেলেছিল সুমনা। মা শুনে প্রায় এক হাত জিভ কেটে ফেলেছিলেন, “এ রকম বলিস না। পুরুষমানুষের আদর সোহাগ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। রজত তোকে খুব ভালবাসে। একটু অ্যাডজাস্ট করে নে।”

এই নাকি পুরুষের ভালবাসা! তবুও অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছিল সে। প্রতি রাতে রক্তাক্ত, আহত হতে হতে মেয়েটা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত এই অত্যাচারের এক মাত্র সাক্ষী সিলিং ফ্যানটার দিকে। ভাবত, এ ভাবে আর কত দিন! রজত যখন তাকে আঁচড়ে-কামড়ে, ছিঁড়ে-খুঁড়ে বেশ তৃপ্ত হয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোত তখন মনে হত, কাঁটার মতো একটা অপমান তার সারা গায়ে ফুটছে। কে যেন বারবার বলছে, “আয় ঘুম...আয় ঘুম...আয় ঘুম...”

...শিশুকন্যা আবার তারস্বরে কেঁদে ওঠে! তার তীক্ষ্ণ কর্ণের চিন্তার ঘুম ঘুম যোরটাকে যেন ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দিল। তত ক্ষণে অবশ্য সিলিং ফানে বেডকভারটাকে কষে গিঁট দিয়েছে সুমনা। এ বার সন্তানের দিকে অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাল করে বেশ কয়েক বার টেনে দেখল।

টান লাগলে খুলে যাবে না তো!

১১ ও ১১

“তোর নাগরটা কে?”

“তুমি” থেকে ‘তুই’-তে নেমে আসতে খুব বেশি দিন লাগেনি রজতের। দৈহিক আকর্ষণ মোটামুটি মিটে যেতেই শুরু হল অবর্ণনীয় অত্যাচার! সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ। শ্বশুর-শাশুড়ি ছেলেকে কিছুই বলতেন না। কারণ, কোনও রকম বাধা পেলে সে হয়ে উঠত আরও হিংস্র! তাঁরা নির্বাক দর্শকের মতোই দেখতেন, তাঁদের পুত্রসন্তান বৌকে জন্মর মতো মারধর করছে, নানা অশ্লীল কথা বলছে, কিন্তু কেউ কখনও পুত্রবধূকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসেননি। উল্টে

বলেছেন, “রাজু ভুল কী বলেছে? তোমাকে দিয়ে তো কোনও কাজই হয় না! অন্তত নিজের স্বামীকে কী করে বশ করে রাখতে হয়, সেটাও শেখোনি। যদি জানতে, তা হলে রাজু অন্য মেয়ের কাছে যেত না। আমাদের ছেলে আর যা-ই হোক, দুশ্চরিত্র নয়।”

রজতের চরিত্র আসলে কী, তা কোনও দিনই বুঝে উঠতে পারেনি সুমনা। পাটিতে গিয়ে অন্য মহিলাদের সঙ্গে ফ্লার্ট করতে তাকে অনেক বারই দেখেছে। এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করলেই সে বলত, “এ সব হাই সোসাইটির ব্যাপার। তোমার মিডল ক্লাস ব্রেনে এ সব ঢুকবে না।”

হাই ক্লাসের সঙ্গে মিডল ক্লাসের সেই দূরত্ব অতিক্রম করার সাধ্য সুমনার ছিল না। বহু বার তার মনে হয়েছে, এত দিনের অধ্যবসায়, শিক্ষা, পরিশ্রম— সবটাই আসলে বিরাট ভুল। কেমিস্ট্রি নয়, কামসূত্রে পিএইচ ডি করা উচিত ছিল তার।

অনেক লাফালাফি, বাঁপাঝাঁপির পর শেষ পর্যন্ত রজত এক রকম হাল ছেড়ে দিয়ে এক বিধবা মহিলার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ল। এই প্রথম বার সুমনা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, ঝড়টা এ বার অন্য দিকেই বইবে। অন্তত তাকে তছনছ করে দিতে আর আসবে না। সচরাচর স্বামীর অ্যাফেয়ারের কথা শুনলে সতীসাবধী স্ত্রী-র বুক ভেঙে যায়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সুমনা দৃষ্টিত হতে পারল না। যে সম্পর্ক সুস্থ ভাবে গড়েই ওঠেনি, তা ভেঙে গেলেও কোনও অনুভূতি হওয়ার কথা নয়।

তবে মানতেই হবে, রজতের অভিনয়ক্ষমতা অসাধারণ! বাইরে থেকে দেখে এক চুলের জন্যও কারও সন্দেহ হবে না যে, ওদের মধ্যে আসল রসায়নটা ঠিক কী! বাইরের জগতে রজতের মতো ভদ্রলোক আর হয় না! সে সকলের চোখে আদর্শ ছেলে, আদর্শ স্বামী এবং আদর্শ জামাই। চূড়ান্ত রসিক ও রোম্যান্টিক পুরুষ, যার প্রতি কয়েক মুহূর্তেই যে কোনও মানুষ আকৃষ্ট হবে। মাঝেমধ্যে সুমনা নিজেরই অবাক হয়ে যেত। যে লোকটা এখন হাসছে, মজার মজার কথা বলছে, সে কি আদৌ তার স্বামী! নাকি রজতেরই মতো দেখতে অন্য কেউ!

এ পর্যন্ত সবই ঠিক ছিল। কিন্তু ছেলেকে বেলাগাম হয়ে যেতে দেখে শাশুড়ি বৌমাকে হুকুম করলেন, “অনেক দিন তো হয়ে গেল বৌমা। এ বার নাতিপুত্রির মুখ দেখাও।”

সুমনা বিপন্ন বোধ করেছিল। তাদের নিজেদের মধ্যেই সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। রজত প্রায় রাতেই বাড়ি ফেরে না। ফিরলেও তার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। সে যেন সুমনার অস্তিত্ব সহ্যই করতে পারে না! শাশুড়ি খুব ভাল করেই ভিতরের পরিস্থিতির কথা জানেন। তা সত্ত্বেও তিনি কী করে এমন বিপজ্জনক কথা বলতে পারেন! এই চরম দুঃসময়ের মধ্যে

নতুন একটা প্রাণ আনা এক রকম মুখ্যমি! কিন্তু ভদ্রমহিলা কিছুতেই তা বুঝবেন না। তাঁর ধারণা, পুরুষেরা একটু বারমুখো হয়ই। তাকে ঘরমুখো করতে হলে সন্তানের প্রয়োজন। একটা বাচ্চা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মেয়েটা ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে। ফোনে মাকে সমস্যার কথা জানাতেই তিনি বললেন, “ঠিকই তো বলেছেন উনি। মেয়েরা মা হলেই সংসারে শিকড় বসে। সন্তানই তো স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অটুট বন্ধন।”

অগত্যা সবাই মিলে উঠে পড়ে লাগল সুমনা ও রজতের মাঝখানে একটি ছোট্ট হাইফেন লাগানোর জন্য। রজত আবার সুমনাকে অত্যাচার করার ছুতো পেল। কেউ জানতেই চাইল না যে, আদৌ সুমনা নিজে মা হওয়ার জন্য প্রস্তুত কি না। আবার ফিরে এল সেই নৃশংস রাতগুলো! অসহায় মেয়েটি কোনও মতে চোঁট কামড়ে সহ্য করে গেল সব কিছু। রজতের বিকৃত চাহিদাকে বাধা দিতে গেলেই সে তাকে সপাতো এক থাণ্ডড় মেরে বলত, “কেন? বাচ্চা চাই না তোরা? আমাকে যদি ছুঁতেই না দিস, তবে বাচ্চা কি আকাশ থেকে পড়বে? না তোরা নাগর দেবে?”

মিলন প্রেমজ না হলেও অনেক সময় সন্তান আসে। অনেক ধর্মিতা মেয়েও অনিচ্ছাসত্ত্বে গর্ভবতী হয়। সুমনাও হল। বাকি সকলেই খুশি হল, কিন্তু স্বয়ং হবু মায়ের মনেই সুখ নেই। সে তখনও বিভ্রান্ত। আদৌ কি ও সন্তান চেয়েছিল? যে শিশু তার গর্ভে তিলে তিলে বাড়ছে, সে কি আকাজক্ষিত? মেয়েরা গর্ভবতী হলে আনন্দের শেষ থাকে না। অথচ তেমন কোনও আনন্দ সে অনুভব করতে পারছে না কেন? তবে কি ওর বোধগুলো সব ভোঁতা হয়ে গিয়েছে! নয়তো

‘মা’ হওয়ার সুখের বদলে সে এক অদ্ভুত বন্দিত্বের দমচাপা ভাব অনুভব করছে কেন! মনে যতই সংশয় থাক, প্রকৃতি নারীত্বের সৌন্দর্যে সব ব্যথা চাপা দিয়ে দেয়। সুখ নেই, স্বামীর ভালবাসা নেই, ভবিষ্যতের কোনও ঠিক নেই— তা সত্ত্বেও মাতৃত্বের লাভবান যেন তার শরীর চুইয়ে পড়তে লাগল। সুন্দরী সে আগেই ছিল। এখন যেন সেই সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে গেল এক পবিত্র অলৌকিক আভা।

রজতের যেন তাও সহ্য হল না! যে নারীকে সে কখনও অত্যাচার ছাড়া কিছু দেয়নি, সে এমন লাভবানময়ী হয়ে ওঠে কোন সাহসে? তা হলে কি অন্য কোথাও সুখের খোঁজ পেয়েছে সুমনা! নয়তো এমন পরিপূর্ণ সৌন্দর্য সে পেল কোথা থেকে?

“এ বাচ্চাটা আমার? না তোরা নাগরের?” এই আঘাতটা সম্পূর্ণ আকস্মিক! এ দিক থেকেও আক্রমণ আসতে পারে, তা সুমনা অতি বড় দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি। সে কিছু বলার আগেই লোহার মতো হাতে তার গলা টিপে ধরল রজত, “খুব যে আনন্দে আছিস! এত আনন্দ কিসের তোরা? আমার সঙ্গে ঠিকঠাক

শুভে তো পারিস না। তবে এই মালটা তোর পেটে এল কী করে! বল...বল... কার সঙ্গে শুয়ে এ পাপ নিয়ে এসেছিস...”

পুরুষালি শব্দ হাতের চাপে দমবন্ধ হয়ে আসে সুমনার। এই প্রথম নিস্তব্ধ ঘরে একটা অদ্ভুত জোরালো শব্দ কানে এল তার। সিলিং ফ্যানটা ঘুরতে ঘুরতেই জোরে জোরে আওয়াজ করছে। যেন কিছু বলার চেষ্টা করছে। অথবা চিৎকার করে প্রতিবাদ করছে... ‘জা-নো-য়া-রা!’

সর্বশক্তি দিয়ে রজতকে একটা ধাক্কা মারল সুমনা। এত দিনের বিবাহিত জীবনে এই প্রথম সে চিৎকার করে উঠল, “নোংরা একটা পশু! ইন ফ্যাক্ট, জন্তু-জানোয়াররাও তোমার থেকে ভাল! ব্লা-ডি সো-য়া-ই-না!”

রজত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। সে চিরকালই ভেবেছে, সুমনা একটা বোবা খেলার পুতুল মাত্র। যাকে ইচ্ছে মতো যেমন খুশি সাজানো যায়। যার জামাকাপড় যে কোনও সময়ে টেনে খুলে নেওয়া যায়। যে পুতুলটার ঘাড় যখন তখন মটকে দেওয়া যায়! এ রকম যে কিছু ঘটতে পারে, সে ভাবতে পারেনি।

সুমনার প্রতিবাদের সমর্থনেই হয়তো, সিলিং ফ্যানটা ঘুরতে ঘুরতেই হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ মেঝেতে আছড়ে পড়ল!

॥ ৪ ॥

নাঃ! কেউ তার কথা শোনেনি। কেউ তার পাশে দাঁড়ায়নি। কেউ জানতে চায়নি সে ঠিক কী চায়! মা-বাবা ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠেছিলেন তাকে রজতের কাছে ফেরত পাঠানোর জন্য। বারবার বলেছেন, “এখন ওটাই তোর ঘর, ওটাই তোর সব।”

সুমনার ভীষণ কান্না পেয়েছিল। জন্মের পর থেকে যে ঘরে সে আঠাশটা বছর কাটিয়েছে, সে ঘরটা ওর নিজের নয়? মেয়েদের বোধহয় কোনও ঘর থাকে না। চিরকালই উদ্বাস্তর মতো এক এক জন পুরুষের অধীনে তাদের মনিয়ে নিতে হয়। কখনও বাবার বাড়িতে, কখনও স্বামীর বাড়িতে। আবার কখনও বা পুত্রসন্তানের

সংসারে! সে যেন একটা সিলিং ফ্যান! যেখানে খুশি লাগিয়ে দিলেই হল। ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, বাড়িতে লাগানো হোক কী পাঁচতারা হোটেল— একটা সুইচ টিপে দিলেই কর্তার ইচ্ছেমতো বাঁহিবাঁহি করে ঘুরতে হবে তাকে। তার নিজস্ব কোনও বক্তব্য থাকতে পারে না। দিন নেই রাত নেই, সব সময়েই শীতল হাওয়া দিয়ে যেতে হবে। নৈঃশব্দ্যই তার ভাষা। কোনও ভাবে যদি খটখটিয়ে ওঠে, তা হলেই সে আর ব্যবহারযোগ্য নয়!

বাবা-মায়ের শত প্রচেষ্টাতেও আর ফিরে যায়নি সুমনা। ফেরার প্রয়োজনও ছিল না। রজত আপাতত সেই বিধবা মহিলার ঘাটে নৌকো বেঁধেছে। স্বীকে তার দরকার নেই। সম্ভানকেও না! তবু মা-বাবা চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুমনা নিজেকে আর অপমান করতে রাজি নয়। কারও কাছে সে বোঝাও হতে চায়নি। শুধু সন্তানের জন্ম দেওয়া অবশিষ্টদের কাছে ছিল। নিজের যেটুকু গয়না নিয়ে দৈত্যপুরী থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল, সেটুকু সম্বল করে খুঁজে নিয়েছিল একটা মাথা গোঁজার সস্তার ঠিকানা! আর ফিরে যায়নি!

বেডকভারের অন্য দিকে আরও একটা শব্দ গিট পড়ল। এ বার আর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনাই নেই। সিলিং ফ্যানটাও বিশেষ নড়েচড়ে প্রতিবাদ করছে না। বরং প্রাচীন শব্দ বাহু দিয়ে ধরে রেখেছে ভারী বেডকভারটাকে। এ বার সুমনা এবং তার ইচ্ছের মধ্যে কেউ বাধা হয়ে আসতে পারবে না। এখন সে স্বাধীন। যা খুশি তাই করতে পারে। আগে তো তার বাঁচার কিংবা মরার স্বাধীনতাটুকুও কেউ দেয়নি। এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না! যে কোনও সিদ্ধান্ত সে নিতেই পারে।

মেয়েটা প্রাচীন অন্ধকূপের মতো ঘরের অন্ধকার জমা কোণের দিকে তাকাল। কোনও ভবিষ্যৎ সে দেখতে পাচ্ছে না। কে জানে, মাসখানেক পর সামান্য ঘরভাড়া দেওয়ার অর্থটুকুও তার কাছে থাকবে কি না! হয়তো কিছু দিন পরই ফের নিরাশ্রয় হতে হবে দু’টি প্রাণীকে। এই মুহূর্তে গোটা পৃথিবীতে তার

যাওয়ার কোনও জায়গা নেই। সব দরজা বন্ধ! এখন চাকরি পাওয়াও প্রায় দুঃসাধ্য। তা সত্ত্বেও আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কবে রোজগারের রাস্তা বেরোবে, ঈশ্বরই জানেন!

সুমনার দৃষ্টি মুক! চোখে অন্ধকার জমেছে। কপালে অসময়ের বলিরেখার মতো চিন্তার ভাঁজ। মন দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব তোলপাড়। ছোট্ট প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখার মতো রসদই বা কী? গত সাত দিন ধরে সে নিজে আলুসেদ্ধ আর ভাত খেয়ে কোনও মতে ক্ষুধিবৃত্তি করেছে। আজ সকালেই দেখেছে চাল বাড়ন্ত! হয়তো কাল আর সেটুকুও জুটবে না।

কী করবে সে তখন!

মোটামুটি তার কাজ শেষ। এখন আর একটা সাপোর্ট দরকার। একটা শব্দপোক্ত চেয়ার বা টেবিল থাকলে বড় ভাল হত। এই ঘুপচি ঘরে তার কোনওটাই নেই। সে অস্থির দৃষ্টিতে তেমনই কিছু একটা খুঁজছিল। তার মধ্যেই ফের বাচ্চাটা কেঁদে উঠেছে। হয়তো সবটাই বুঝতে পেরেছে ওই অবোধ শিশু। এত দিন যে মায়ের দেহের উষ্ণ নিরাপত্তায় ছিল, এখন সেই মায়েরই শীতল নীরবতায় বুঝি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে সে। চিৎকার করে কেঁদে উঠে মাকে কাছে ডাকছে।

সুমনা সে দিকে তাকাল না। তার চোখে পড়েছে জানলার মোটা মোটা শিক। সে আস্তে আস্তে সে দিকে এগিয়ে যায়। তার পর...

“আয় ঘুম...আয় ঘুম...আয় ঘুম...”

সিলিং ফ্যানের ব্লেন্ড থেকে নীচের দিকে বুলছে বেডকভারটা। কিন্তু মেঝে স্পর্শ করেনি। বরং তার অন্য প্রান্তটা জানলার লোহার শিকে বাঁধা! সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে বড় স্নেহ এবং মজবুত দোলনা! তার মধ্যে শুয়ে আছে দু’মাসের শিশু। তার মায়ের মুখে অন্ধকার জমলেও চোখে অদ্ভুত একটা জ্যোতি। সে আস্তে আস্তে দোলনাটাকে দোলাচ্ছে আর নরম সুরে বলছে, “আয় ঘুম... আয় ঘুম...”

শিশু পরম আরামে, আশ্বাসে চোখ বুজল। সে জানে, সিলিং ফ্যান তার ভার ঠিকই বহিতে পারবে!

শিল্পী: মহেশ্বর মণ্ডল



মণিপূরের বিখ্যাত নৃত্য-সংস্কৃতি ‘লাই হারোবা’

মণিপূরের মণিকোঠায়

গৌতম চক্রবর্তী

মণিপুরি শাড়ির জন্মের উপকথাটি দিয়েই শুরু করা যাক। মণিপুর গত কয়েক মাস ধরে অশান্ত বলে তো মুর্শিদাবাদ বা রাজস্থানি কোটার শাড়ির তুলনায় তার চাহিদা বিন্দুমাত্র কমেনি!

মায়ানমারের কাবাও রাজ্যের রাজকন্যা মণিপুরের এক সাধারণ চাকপা যুবকের প্রেমে পড়েছিলেন। কাবাও মায়ানমারের সীমান্তবর্তী প্রদেশ। সেখানে আজও প্রচুর তামিল, কুকি এবং মণিপুরি মেইতেই বাস করেন। নেপিত, ইয়াঙ্গন তো চিরকাল মায়ানমারের রাজধানী ছিল না। আঠেরো-উনিশ শতকেও তার রাজধানী ছিল আভা। সেই অঞ্চলের রাজকন্যা। মণিপুরের সীমান্তবর্তী মোরে শহরটি এই কাবাও অঞ্চলের তামু শহরের কাছাকাছি, দুই শহরেই হাট, বাজার বসে। তখন সীমান্ত পেরিয়ে স্থানীয়রা এ দেশ থেকে ও দেশে যাতায়াত করেন। চাকপারা আজও আছেন, তবে তাঁদের চাকপা ভাষাটি লুপ্ত। এখন জনগোষ্ঠী ও ভাষাটির নাম মেইতেই। কাবাও এবং মণিপুরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ বাধত, মণিপুরিরা এক বার বার্মিজদের সেই রাজধানী আভা দখল করেও নিয়েছিল, পরে ইংরেজ আমলে কাবাও মায়ানমার বা বার্মায় ঢোকে।

কিন্তু এই উপকথা মোগল, ইংরেজ আমলের ঢের আগের। শত্রু দেশের যুবকের প্রেমে পড়ে রাজকন্যা পালাচ্ছেন, রাজাই বা ছাড়বেন কেন? সেই মেইতেই যুবক ছিল ইক্ষলের কাছে খুকরুল গ্রামের বাসিন্দা। প্রেমিকাকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরতে ফিরতে সে মাকে ডাকল, ‘মা, বার্মিজরা তাড়া করছে।’

গ্রামবাসীরাও বর্মী সেনা ঠেকাতে ছুটে এল। যুবকের মা আসলে ডাইনি। সে এমন এক ঝড় সৃষ্টি করল যে, চার দিক প্রায় অন্ধকার। কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। রাজার সেনা বাধ্য হয়েই ফিরে গেল। মা এর পর জিজ্ঞেস করলেন, মেয়েটি কে। ছেলে রাজকন্যার পরিচয় দিল। মা নববধূকে গ্রহণ করে বললেন, ‘বেশ, আজ থেকে ওর নাম হোক লিমা। রাজকন্যাকে তো চাকপা ভাষায় আমরা লিমা-ই বলি।’

লিমা স্বামী, শাশুড়ির সঙ্গে সংসার করে। গরিবের সংসার। ছেলে আর মা ঝুঁড়েঘরের সামনে ফলানো যৎসামান্য আনাজপাতি নিয়ে বিক্রি করতে রোজ হাটে যায়, বেলাশেষে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে। এক দিন লিমা স্বামীকে বলল, ‘আমাকে আলাদা একটা ঘর বানিয়ে দেবে? সে ঘরে যেন জানলা না থাকে, আর বিছানায় মশারি খাটানো থাকে। রাতে আমি একা ও ঘরেই থাকব, তুমিও ঢুকবে না।’

স্বামী বেচারী কী আর করে? স্ত্রীর কথায় রাজি হতে হল। প্রত্যেক সকালে স্বামী, শাশুড়ির সঙ্গে লিমাও এখন জঙ্গলে যায়, আর দু’হাত বোঝাই তুঁত গাছের পাতা নিয়ে বাড়ি ফেরে। রাতে মশারি-খাটানো সেই অন্ধকার ঘরে একাই থাকে। শর্ত মেনে কেউ কোনও প্রশ্ন করে না।

এক ভোরে লিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এল, হাতে বহুমূল্য এক কাপড়। সে রকম মসৃণ, দামি কাপড় এই অঞ্চলে কেউ কপিনকালেও দেখেনি। স্বামীকে বলল, ‘রাতে এটা বুনেছি। আজ হাটে গিয়ে বিক্রি করে এসো।’

হাটে সকলে হতবাক। তাদের চেনা সুতিবস্ত্রের মতো মোটেও নয়,



‘সাদাই ডিয়ার’ বা নাচুনে হরিণ

শাড়িটা আরও নরম, উজ্জ্বল। তারা নাম দিল রেশম। ভাল দামেই সেটা বিক্রি হল। ওই যুবক আর তার মা এতটা আশাও করেনি।

তার পর প্রায়ই এক ঘটনা। লিমা সকালে তুঁত পাতা জোগাড় করে, রাতে অন্ধকার ঘরে একা থাকে। সকালে একটা রেশমবস্ত্র এনে স্বামী, শাশুড়িকে হাতে যেতে বলে। কালে কালে আশপাশের গ্রাম ছাড়িয়ে নগরে, রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ল খুকরুল গ্রামের সেই রেশমবস্ত্রের খ্যাতি। তার দৌলতে লিমার স্বামী, শাশুড়ি এখন বড়লোক।

কিন্তু ডাইনি শাশুড়ির কৌতূহল রুখবে কে? লিমা রোজ রাতে অন্ধকার ঘরে কী করে, ওই রেশমবস্ত্র তাকে কে দিয়ে যায়, সে সব জানতে ছেলেকে প্রায়ই তাড়ায় সে। ছেলে বিশেষ গা করে না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়ের উস্কানি এড়াতে পারে না। স্বামী এক দিন অন্ধকার ঘরে উকি মারার চেষ্টা করল, কিছু দেখতে পেল না। দরজা ঠেলে আস্তে আস্তে সে জানলাহীন ঘরে ঢুকে এল, নিশ্চিহ্ন অন্ধকার। ক্রমে ধাতস্থ হয়ে সে অন্ধকারে দেখল, মশারির নীচে তুঁত পাতার শয্যায় শুয়ে বিশাল এক পোকা, মুখ থেকে সুতোর মতো লাল গড়াচ্ছে। ঘেমায়ে চলে এল সে।

পরদিন ভোর। লিমা আর ঘর থেকে বেরোল না, রেশমি বস্ত্রও এল না। স্বামী, শাশুড়ি ঘরে ঢুকে দেখল, বিছানায় মরে পড়ে আছে এক গুটিপোকা। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে লিমার জাদু শেষ হয়ে গিয়েছিল, গুটিপোকা থেকে সে আর মানুষ হতে পারেনি। মা আর ছেলে প্রায় কান্দতে কান্দতে লিমার দেহ সমাধিস্থ করল।

কয়েক দিন পর দেখা গেল, সেই সমাধিতে উড়ে বেড়াচ্ছে এক বাঁক গুটিপোকা। মা আর ছেলে বাঁশের ট্রে বানিয়ে, সেখানে তুঁত পাতা রেখে সযত্নে পোকাগুলিকে নিয়ে এল ঘরে। পোকাগুলি ক্রমে বড় হতে লাগল, গ্রামের অন্যরাও তাদের দেখাদেখি সেই সব পোকা পালন করতে লাগল। আর খুকরুল গ্রামে লিমার সমাধি থেকে আনা সেই পোকাগুলি মুখ থেকে নিঃশব্দে লাল বের করতে লাগল। লিমার মতোই! কেউ শব্দ করলে পোকাগুলি আর লাল বের করে না, এই জন্য ওদের নাম ‘আখুংবা টিল’ বা নিঃশব্দ পোকা। বিরক্ত না করলে খুকরুল গ্রামের জন্য লালানিঃসৃত রেশম রেখে ওরা রাজকন্যার মতো প্রজাপতি হয়ে উড়ে যায়। কাবাওয়ের রাজকন্যার উপহার বলেই তো রেশমকে মেইতেই ভাষায় আজও বলা হয় ‘কাত্রাং’।

কুকি জনজাতি বার্মা থেকে গাঁজা, আফিং এনে সম্ভ্রাস চালায় কি না, জানি না। কিন্তু মেইতেইদের এই উপকথা জানায়, বার্মা বা মায়ানমার না থাকলে মণিপুরি সিন্ধুও থাকত না। মেইতেইদের হিন্দু হওয়া, মৃতদেহ দাহ করা অনেক পরের গল্প। আগে তারা সমাধি দিত।

বিবরবাসী কুকি

কুকি জনগোষ্ঠী মেইতেইদের মতো সকলে এক রকম বা সমজাতীয় নন। মেইতেইরা যেমন মণিপুরে প্রধান, কুকিদের তেমন নিজস্ব রাজ্য নেই। মণিপুর থেকে নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং

মায়ানমারের পার্বত্য কাচিন অঞ্চলে ছড়িয়েছটিয়ে আছেন তাঁরা। সাঁওতাল, মুন্ডাদের মতো কুকি নামে কোনও জনজাতি নেই, তাঁরা কুকি-চিন জনগোষ্ঠীর অন্যতম। এলাকা অনুসারে কোথাও বোরো ভাষা বলেন, কোথাও নাগামিজ। মূল ভারতীয় ভূখণ্ডে ভাষা অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্য তৈরির কথা আমরা জানি, কিন্তু কুকি-চিনভাষীদের সে রকম নিজস্ব রাজ্য নেই। সেখান থেকেই কি আজকের বৃহত্তর কুকিল্যান্ডের কথা ওঠে? সাম্প্রতিক মেইতেই-কুকি সংঘর্ষকে তাই নিছক হিন্দু বনাম খ্রিস্টান সংঘর্ষের একমুখী বয়ানে দেখলে চলবে না, ঢুকতে হবে গভীরে।

চোকা যাক উপকথার দেশে। সে দেশ ভূপৃষ্ঠে নয়, গর্তের নীচে। নোইমাংপা সেখানকার রাজা। তাঁর আত্মীয় চোংথু এক দিন পোষা কুকুর নিয়ে শজারু শিকারে বেরোলেন। দেখলেন ভূপৃষ্ঠে একটা অন্ধকার গর্ত। সেখানে কেউ থাকে না, সাত দিন, সাত রাত ধরে অন্ধকার বা ‘খিমজিন’। চোংথু ভাবলেন, তিনি এখানকার রাজা হবেন। চোংথু সঙ্গী ভান্ডলপা, খুপনাগামদের নিয়ে নতুন বিবরে চলে এলেন। তাঁরাই আজকের মণিপুরি, নাগা ও বার্মিজদের পূর্বপুরুষ।

উপকথার রাজ্যে আরও চমকপ্রদ, সর্পিল কাহিনি আছে। ভূপৃষ্ঠের অন্ধকার গর্ত থেকে চোংথু ও তাঁর সঙ্গীরা যখন বেরিয়ে আসছেন, দেখা গেল গুলহেইপি নামে এক বিশাল সাপ। লেজের ঝাপটায় দু’-এক জনকে মেরে ফেলল সে, চোংথু সেই সাপকে তরবারি দিয়ে সাত টুকরো করে দিলেন। মেইতেই উপকথাতেও ৭ সংখ্যাতি গুরুত্বপূর্ণ। তারা বলে, সাতটি আদি গোষ্ঠী বা ‘সালাই’ থেকে তারা এসেছে।

গুলহেইপি নয়, পাখাম্বা নামে এক সাপ মেইতেই লোককথায় গুরুত্বপূর্ণ। মণিপুর রাজাদের পতাকা এবং প্রতীক সবচেয়ে ছিল ওই সাপের প্রতীক। প্রবাদ, দেবতাস্বরূপ ওই সাপই মণিপুর রাজবংশের পূর্বসূরি। উইকিপিডিয়া পাখাম্বাকে ভ্রাগন বলছে, কিন্তু এতে বিভ্রান্ত হবেন না। সব মণিপুরি লেখক পাখাম্বাকে সাপই লিখছেন, মহাভারতেও তক্ষক, কর্কটিক ইত্যাদি অনেক নাগের কথা আছে! উইকিপিডিয়া স্থানীয় উৎস এবং জনজাতির উপকথা ঘাঁটে না, তাই জানে না, চিনা ভ্রাগন মোটেই ভারতীয় সাপের থেকে বেশি সম্মানজনক নয়!

সে যাক! মেইতেই লোককথায় আছেন আমাদের দুর্গার মতো ব্যাঘ্রবাহিনী এক দেবী। পাছোইবি। তিনি সভাতার দেবী, ফসলের দেবী, প্রেমের দেবী। এখনও মেইতেইরা ফি বছর ধুমধামের সঙ্গে তাঁর পূজো করেন। পাছোইবি আসলে রাজকন্যা, বাবাকে এক দিন মাটি পুড়িয়ে, জুম চাষে সাহায্য করছিলেন। পাহাড়ে জুম চাষ করেই ফসল হয়। ভাষাতাত্ত্বিকরা অবশ্য বলছেন, জুমচাষ আদৌ মেইতেই শব্দ নয়, কুকিদের ভাষা থেকে এসেছে।

গল্পে ফিরি। মণিপুরের নংমাইজিং রাজ্যের রাজা নিংথু চাষে ব্যস্ত রাজকন্যাকে দেখেই প্রেমে। রাজকন্যাও তথৈবচ। কিন্তু পাছোইবিকে তার বাবা আগেই খাবা গোষ্ঠীর রাজার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। প্রেমিক ও বিবাহিত প্রেমিকা দু’জনে পালিয়ে গেল, কাংলা নামক স্থানে মালাবদল ও মিলন। এই কাংলাইপেক রাজ্যেরই নাম আজ মণিপুর, তার ভাষার নামও সেই কাংলা। রাজকন্যা পাছোইবি সাধারণ মানুষ ছিলেন না, তিনি ‘লাই’ বা দেবী। তাঁর প্রেমিক ও দ্বিতীয় স্বামী নিংথু দেবত্বে উত্তীর্ণ হয়ে এখানকার মাটিতে সাপ হয়ে শুয়ে আছেন। এই কাংলা প্রাসাদেই তাঁদের উত্তরসূরি রাজাদের অভিষেক হয়। মণিপুরের বিখ্যাত ‘লাই হারোবা’ নাচে এখনও এই গল্প ঘুরেফিরে আসে। মেইতেইরা হিন্দু বৈষ্ণব, কুকিরা খ্রিস্টান— এটুকুই শেষ কথা নয়। আদি লাইদের নিয়ে উৎসব ও লোককাহিনি মণিপুরের গ্রামগঞ্জে আজও জনপ্রিয়। খ্রিস্টান বনাম হিন্দু সংঘর্ষের আখ্যানটিই সব নয়। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট যাই বলুক না কেন!

মায়ানমার ও মণিপুর

মণিপুরকে তাই বুঝতে হবে অন্য ভাবে। দরকারে জাতিরাষ্ট্রের সীমানার ছক ভেঙে। ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট সারা দেশ যে একসঙ্গে স্বাধীন হল, এমন নয়। কাশ্মীরের মতোই মহারাজ বোধচন্দ্র ভারতভুক্তির চুক্তি করেন ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। সেই চুক্তির বয়ান, ১৫ অক্টোবর



দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম মিষ্টি জলের হ্রদ লোগতাক ও তার ভাসমান ভূগভূমি

মহারাজা ডোমিনিয়ন গভর্নমেন্টকে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। তিনি রাজন্যভাভা হিসেবে ফি বছর করমুক্ত তিন লক্ষ টাকা পাবেন। অতঃপর ১৯৫৬ সালের সংবিধান সংশোধনের বলে সে কেন্দ্রশাসিত এলাকা। মুখ্যমন্ত্রীশাসিত রাজ্য হল ১৯৭২ সালে।

কাশ্মীরের রাজা হরি সিংহের মতো বোধচন্দ্র ভারত, পাকিস্তান না স্বাধীন দেশ এ নিয়ে দোনেদোনে করেননি। সেই সুযোগ তাঁর ছিল না। কারণ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানি বোমারু বিমানের হানায় বার্মা এবং মণিপুর তখন প্রায় বিধ্বস্ত। আজকের মায়ানমারে মান্দালয় ছেড়ে মাইতিকানার রাস্তায় কাচিন প্রদেশের মোগুয়াং শহর। ছবির মতো সাজানো এই শহরও জাপ বোমায় ধসে গিয়েছিল। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে মার্কিন সমরনায়ক সিটওয়েলের বুদ্ধিতে ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনার ৭৭ নম্বর চিড্‌টি ব্রিগেড সেই শহরে তিন সপ্তাহ ধরে আক্রমণ শানায়। মোগুয়াং, মাইতিকানা মুক্ত হয়। সেটাই বার্মায় প্রথম জাপমুক্তি। এই যুদ্ধে সিন্ধু গোখা বাহিনীর ক্যাপ্টেন মাইকেল আলমন্ড নিহত হন। তিনি পরে মরণোত্তর ভিক্টোরিয়া ক্রসে সম্মানিত হন। তাঁর সঙ্গে রাইফেলম্যান তুলবাহাদুর পান-ও প্রবল বীরত্ব দেখান, ৩০ জন জাপ সেনাকে কুকুরি হাতে একাই ধরাশায়ী করেন। তিনিও ভিক্টোরিয়া ক্রসে সম্মানিত হন। তুলবাহাদুর তাঁর নেপালের বাড়িতে ২০১১ সালে মারা গিয়েছেন।

পাহাড়ি সীমান্তের এই মোগুয়াং অঞ্চলটা প্রথম থেকে বার্মার শান এলাকায়, নাম ছিল পোং। শান ইতিহাস বলে, ৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে পোঙের রাজকুমার সামলং পাশের কাংলা উপত্যকায় গিয়েছিলেন, সেটিই ইতিহাসে আজকের মণিপুরের প্রথম উল্লেখ। কখনও বার্মার তৎকালীন রাজারা মণিপুর দখল করছেন, কখনও আবার উল্টো। বার্মায় চিন জাতি বলতে যাদের বোঝায়, ভারতে তাঁরাই কুকি এবং মিজো।

মেইতেই কাহিনি

মোরে, চুড়াচন্দ্রপুর, সেনাপতি, খুকরুল এ গুলিই তো ইফল উপত্যকার একমাত্র জায়গা নয়। ইফলের অদূরে আছে শান্তিপুর, বিষ্ণুপুর ইত্যাদি নামের হরেক এলাকা। মেইতেইরা যে কতটা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রভাবিত, এই সব বসতির নাম থেকেই বোঝা যায়। তবে গুঁরা পুরো নিরামিষাশী নন, মাছমাংস খান।

মাছমাংস যে কত গুরুত্বপূর্ণ, বোঝা যায় সৃষ্টিতত্ত্বের মেইতেই উপকথায়। তখন দুনিয়ায় মানুষ ছিল না, রোগভোগ ছিল না। আকাশের

দেবতারা ছিলেন চিরজীবী। সেই সময়েই সৃষ্টির দেবতা সোয়ারেন জীব সৃষ্টির কথা ভাবলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিবাকে নির্দেশ দিলেন, ‘তুমি গিয়ে পৃথিবী সৃষ্টি করো। সেখানে যেন পাহাড়, নদী, জল, গাছপালা, ফুলফল থাকে। দরকার হলে তোমার ভাই হারাবা-র সাহায্য নিয়ো।’

আসিবা বাবার বাধ্য সন্তান। কিন্তু হারাবা রীতিমতো বদমাশ ছোঁড়া। আসিবা যা কিছু গড়ে, হারাবা তা উল্টোপাল্টা করে দেয়। আসিবা পৃথিবী বানাল, হারাবা সেটি বালি আর ধুলোয় উড়িয়ে দিল। আসিবা নদীতে জল সৃষ্টি করেছিল, হারাবা সেটিকে কখনও মেঘ বানিয়ে আকাশে উড়িয়ে দিল, কখনও বা বরফ বানিয়ে থমকে দিল। আসিবা ফলস্তু গাছ তৈরি করেছিল, হারাবা সেই ফলগুলিকে করে দিল বিষাক্ত। আসিবা পাহাড়, উপত্যকা তৈরি করেছিল, হারাবা নিয়ে এল ভূমিকম্প।

আসিবা কী আর করে, বাবাকে গিয়ে নালিশ জানাল। সোয়ারেন বললেন, ‘আচ্ছা, অন্য ব্যবস্থা করছি।’

হারাবার তৈরি বালি থাকল নদী আর সমুদ্রের তলদেশে, মেঘ থেকে ফের বৃষ্টি নেমে পৃথিবীর নদীনালা ভরিয়ে দিল। ভূমিকম্পে পৃথিবীপৃষ্ঠ বদলে নতুন ভাবে গড়ে উঠল, কিন্তু ধ্বংস হল না। জঙ্গলের বিষাক্ত ফল খাওয়া যাবে না ঠিকই, কিন্তু সেগুলিকে আপদ-বিপদে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। ছোট ছেলেকে এ বার থামানোর ব্যবস্থা করলেন সৃষ্টিদেবতা। বাঁ উরুতে বাঁ হাত ঘষতে ঘষতে চালের দানার মতো একটু ছালচামড়া উঠে এল। সেখান থেকে জন্মাল এক সুন্দরী নারী। তাকে সোয়ারেন বললেন, ‘তুমি আমার মেয়ের মতো। তোমার নাম দিলাম নোমথাং লিমা। তুমি বজ্রবিদ্যুৎ হয়ে বিশ্বপ্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করো।’

বিদ্যুৎঝলকের সেই নারীকে দেখে হারাবা এতটাই মুগ্ধ, সে-ও মহাশূন্যে চলে গেল। সুন্দরী নোমথাং লিমা তখন শুরু করল নাচ। সেই নাচে হারাবা এতটাই বিবশ যে, মর্তে ফিরে আসিবাকে বিরক্ত করার কথা আর মনে পড়ল না। মেইতেইরা বলেন, এখান থেকেই মণিপুরি নৃত্যকলার উদ্ভব। সেটি স্বয়ং দেবতার দান। সবচেয়ে উল্লেখ্য, সৃষ্টিকর্তা নিজেই সৃষ্টি করেছেন এই কন্যাকে তাঁর হাত থেকে। কোনও পুরুষের পাঁজর থেকে নয়। মণিপুরী চিত্রাঙ্গদাদের স্বাধীনতা নিয়ে আমরা অনেক কথা শুনি। যেখানে সৃষ্টিতত্ত্বের উপকথাটি এ রকম, সেখানে মেয়েদের তো স্বাধীন হওয়ারই কথা!

নদীতে জল, গাছে ফুলফল। সোয়ারেন এ বার আসিবাকে প্রাণসৃষ্টির কথা বললেন। সৃষ্টি হল পোকামাকড়, উদ্ভন্ত পাখি। তুষ্ট সোয়ারেন এ

বার আসিবাকে মানুষ তৈরি করতে বললেন।

কিন্তু আসিবা কোনও দিন মানুষ দেখেনি। সে একটা জিনিস তৈরি করে বাবার কাছে নিয়ে এল। সোয়ারেন বললেন, ‘এটা মাছ, আসিবা। ঠিক আছে, এ জলে থাকবে, আমি একে প্রাণ দিচ্ছি।’ বাঙালির সৃষ্টিকর্তা শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়েন, মেইতেইদের স্রষ্টা মানুষ গড়তে মাছ।

মাছ গড়ার পর আসিবা ফের মানুষ গড়তে গেল। বাবার কাছে নিয়ে এলে সোয়ারেন বললেন, ‘এটা ব্যাঙ। ঠিক আছে, যখন বানিয়েছে, একেও প্রাণ দিচ্ছি। যাও, এ বার মানুষ বানিয়ে আনো। আর যেন ভুলচুক না হয়।’ আসিবা ধুলোমাটি দিয়ে ফের একটা জিনিস তৈরি করে আনল, বাবা বললেন, ‘কিছু হয়নি। এর নাম বানর। ঠিক আছে, তোমার পরিশ্রম বিফলে যাবে না, একেও প্রাণ দেব।’

এই বানর তৈরির পর আসিবা সরাসরি বাবার কাছে স্বীকার করল, ‘কী ভাবে মানুষ বানাব? আমি তো কখনও মানুষ দেখিনি, বাবা।’

সোয়ারেন বললেন, ‘আমার চোখের দিকে তাকাও।’

আসিবা বাবার চোখের মণিতে দেখল নিজের প্রতিচ্ছবি। মানুষ কি তা হলে এই রকম, তাদের মতোই দেখতে? আসিবা ফের ধুলোমাটি দিয়ে সে রকম একটা জীব তৈরি করে আনল, সোয়ারেন খুশি, ‘হ্যাঁ, এত ক্ষণে ঠিকঠাক মানুষ বানাতে পেরেছ। এ বার প্রাণ দেব একে।’

মানে, মণিপুরি, কুকি, নাগা, বার্মিজ, হিন্দুস্থানি, পাকিস্তানি যাই হোক না কেন, মেইতেই উপকথা বলে, মানুষ আসলে দেবতার আদলেই সৃষ্ট। সে দেবতার মতোই সৃষ্টিশীল।

এই উপকথাগুলি এখনও আছে। আমাদের লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী, ভিখির শিব-অন্নপূর্ণা মিথের মতো। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম এই প্রাচীন উপকথাগুলি জনজীবন থেকে মুছে দিতে পারেনি। আজও মণিপুরে প্রধান উৎসব লাই হারোবা। কোনও মূর্তি নেই। উৎসবের দিন বাঁশে বা মুখোশে কাপড় বেঁধে দেবতাকে সকালবেলায় জল থেকে তোলা হয়, উৎসবের প্রধান অঙ্গ পাখায়া, নিংথু-পাছোইবির প্রেম স্মরণ করে সমবেত নাচ। মণিপুরি রাজাদের নিজস্ব ইতিহাস ‘কেইথেরোল কুন্সাবা’ জানাচ্ছে, ১১০০ খ্রিস্টাব্দে যিনি মেইতেই রাজা ছিলেন, সেই লোইয়াস্বার আমলে চাঁদের আলোয় এই নাচের উৎপত্তি। লোইয়াস্বা চমৎকার রাজা ছিলেন, রাজ্যকে ছ’টি বিভাগে বিন্যস্ত করেন, প্রতিটি পরিবারকে কোনও-না-কোনও দায়িত্ব দেন, রাজ্যশাসনের লিখিত নিয়মকানুন তৈরি করেন। তাঁর আমলেই মণিপুরি শালের সম্মান। জনজাতির সেরা শিকারিদের সেই সূক্ষ্ম কারুকার্যমণ্ডিত শাল উপহার দিতেন রাজা। ‘হিস্টি’ ব্যাপারটা শুধু পাশ্চাত্যের একচেটিয়া নয়, আমাদেরও অনেক রাজাবলি ছিল।

মণিপুরের এই সব রাজকাহিনি চমকপ্রদ। ‘কেইথেরোল কুন্সাবা’ এখন ইংরেজি অনুবাদেও পাওয়া যায়। ইফলের মেয়ে সরোজনলিনী আরাম্হাম মেইতেই মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্নাতক এবং এম এ পাশ। দর্শনশাস্ত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি পেয়েছিলেন। পরে লন্ডনে থারার সময় নৃতাত্ত্বিক, ধর্মতত্ত্ববিদ জন পারাটকে বিয়ে করেন। বিয়ে-থার পর লন্ডনে ভারততত্ত্ববিদ এ এল বায়াশামের ছাত্রী সরোজনলিনী ‘রিলিজিয়ন অব মণিপুর: বিলিফস, রিচুয়ায়ালস অ্যান্ড হিস্টোরিকাল ডেভেলপমেন্ট’ নামে এক গবেষণাপত্র লেখেন। সেই গবেষণাপত্রের অন্যতম পরীক্ষক ছিলেন মণিপুর-উৎসাহী, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলার সঙ্গে মণিপুরের চমৎকার শিক্ষা-যোগাযোগ ছিল। এখন সবই ধূসর ইতিকথা!

বৈষ্ণব জনকথা

ইফল উপত্যকার সর্বপ্রাণবাদী, লাই-উপাসক মেইতেই জনগোষ্ঠী হঠাৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, কীর্তন, রথযাত্রায় शामिल হতে গেল কেন? ‘কেইথেরোল কুন্সাবা’ বা ‘বামন খুন্তক’-এর মতো প্রাচীন মণিপুরি পুঁথি জানাচ্ছে, ব্রাহ্মণরা অনেক দিনই একটু একটু করে মণিপুরে আসছিলেন। ১৬২৮ সালে চাকপেরেম চানু নামে এক মেইতেই রমণী সে বছরেই বাইরে থেকে আসা এক যোগীকে বিয়ে করেন। মানে, ব্রাহ্মণরা অনেকে দল বেঁধে উর্বর উপত্যকাভূমে আসতে শুরু করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ মানে কী? পৈতে থাকবে। ১৭০৬ সালে মণিপুরের রাজা

চোড়াই রোংবা প্রথম পৈতে নেন। মানে, লাই-উপাসক মেইতেই রাজা নিজেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রতিপন্ন করলেন। প্রাচীন মণিপুরি পুঁথিতে রাজার এই উপনয়নের বর্ণনাও আছে, ‘সাজিবু (মার্চ-এপ্রিল) মাসের এক বুধবার রাজা ও তাঁর সঙ্গে যে আত্মীয়রা পৈতে নেন, সকলে উপোস করে থাকলেন। পরদিন তাঁরা উপনয়ন গ্রহণ করলেন।’ পৈতের আগের দিন উপোস করা ভুভারতে নেই, চোড়াই রোংবা এখানেই ব্যতিক্রমী। কিন্তু তাঁর সদ্যপ্রাপ্ত ‘হিন্দুত্ব’ প্রজাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেননি। পাছোইবির মন্দিরে এক বার আগুন লাগে, সেটি নতুন করে গড়ে দেওয়া হয়। পাশাপাশি তৈরি হয় মণিপুরে প্রথম বিষ্ণুমন্দির এবং মা কালীর মন্দির। শান্ত-বৈষ্ণব লড়াই তখন মণিপুরে ছিল না।

বরং কোন মত রাজপ্রাসাদে প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে বিভিন্ন বৈষ্ণবদের মধ্যে ইগোর লড়াই ছিল। বস্তুত, চোড়াই রোংবা পৈতে নেওয়ার দু’বছর আগে ১৭০৪ সালে মণিপুরে নিম্বার্কপন্থী বৈষ্ণব সাধুরা আসেন। নিম্বার্ক মতের সম্মাসীরা কৃষ্ণ এবং রাধাকে গুরুত্ব দেন। নিম্বার্কদের পর শ্রীহট্ট থেকে আসেন শান্তিদাস নামে এক সম্মাসী। তিনি মণিপুরে প্রথম শ্রীরামচন্দ্র এবং হনুমানের পূজা প্রচলন করেন। সম্ভবত, তিনি রামানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন। রামানন্দী সাধুরা জাতপাত মানেন না, কৃষ্ণ এবং রাধার পরিবর্তে রাম ও সীতাকে তাঁরা প্রধান উপাস্য মনে করেন। আজকের অযোধ্যায় রামমন্দিরের প্রধান সেবায়েত তাঁরাই।

এঁদের পর গৌড়ীয়রা। তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কীর্তন। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধাকে প্রধান উপাস্য করা, তিলক কাটা ও কীর্তন গাওয়া আজও মণিপুরিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাজ-অনুশাসনে কীর্তনই তো জনতাকে একত্র করবে। অতঃপর রাজা হলেন গরিব নিয়াজ। তিনি প্রবল পরাক্রমী, তিন বার বার্মা আক্রমণ করে ছারখার করে দেন। এ নিয়ে দু’রকম কাহিনি আছে। মেইতেইরা বলেন, চোড়াই রোংবার মেয়ের সঙ্গে বার্মার রাজার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু রাজা তাঁর স্ত্রীকে মারধর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। চোড়াই রোংবা ছেলেকে সেই অপমানের শোধ তুলতে বলেন। বার্মিজদের বক্তব্য, গরিব নিয়াজ উগ্র ধর্মান্ধ। ইরাবতী নদীতে স্নান করলে পুণ্য হয় জেনে তিনি বার্মা আক্রমণ করেছিলেন।

এই যুদ্ধবাজ গরিব নিয়াজই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে প্রায় রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করলেন। গোমাংস ভক্ষণ এবং বাড়িতে শুয়ার পালন নিষিদ্ধ হল। গৌড়ীয় গুরু গোপাল দাসের কাছে দীক্ষা নিলেন, নিম্বার্ক আর রামানন্দীদের মেরেধরে তাড়িয়ে দিলেন। এই সব বৈষ্ণব সাধুও ধোয়া তুলসীপাতা ছিলেন না, পুরনো ‘কেইথেরোল কুন্সাবা’ জানাচ্ছে, ‘সব রামানন্দীদের বিতাড়িত করা হল। রাজপুত্রদের পদচ্যুত করে কারারুদ্ধ করা হল।’ সরোজনলিনী সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন, রামানন্দীরা প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রে না থাকলে রাজপুত্রদের কারারুদ্ধ করা হবে কেন?

রাজার আদেশে আর সমাধি নয়, এ বার থেকে মৃতদেহ দাহ করতে হবে। মেইতেই গোষ্ঠীগুলিকে ঢেলে হিন্দু গোত্র-প্রবরে সাজানো হল। যেমন, নিংথুজা মানে শাঙিল্য, আঙ্গাম গোত্র ভরদ্বাজ, চাংলৌই হল বৈষ্ঠ। গরিব নিয়াজের রাজতন্ত্র ছাড়া মেইতেইরা কখনওই এত গভীর ভাবে হিন্দু হতে পারত না। গরিব নিয়াজ শেষ জীবনে সম্মাসী হয়ে গিয়েছিলেন, পুত্র চিৎ সিংহের হাতে খুন হন। দিল্লির সুলতানি তখনই বাবাকে বন্দি বা হত্যা করা হত না, মেইতেই হিন্দুত্বেও একই ইতিহাস!

নাচুনে হরিণ, পোলো খেলা আর রথ

মণিপুরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী? সেখানে লোগতাক হুদের ভাসমান ‘কেইবুল লামজাও’ জাতীয় অরণ্যে আজও পাওয়া যায় সাদ্দাই বা নাচুনে হরিণ। ভুটান ছাড়া অন্যত্র যেমন ‘টাকিন’ নামক পশুটি পাওয়া যায় না, নাচুনে হরিণও সে রকম একমাত্র মণিপুরের ওই ভাসমান অরণ্যের বাসিন্দা। লোগতাক দক্ষিণ এশিয়ায় মিষ্টি জলের বৃহত্তম হুদ, সেখানে ভাসমান দ্বীপে ঘাসপাতা ও বিভিন্ন জৈব বর্জ্য মিলেমিশে ফুঁমদি নামে এক ধরনের ঘাসমাটি তৈরি হয়, সেটাই নাচুনে হরিণদের একমাত্র খাদ্য। হরিণ কেন ধান খায় না, শুধুই এই সব ঘাসমাটি ও পাতা খায়, তা নিয়েও হরেক মেইতেই উপকথা আছে। আকাশের দেবতা সোয়ারেন তাঁর চার কন্যাকে চার রকম নির্দেশ দিয়েছিলেন। নারিমাকে বলেছিলেন



মণিপুরের ঐতিহ্য পোলো খেলা নিয়েও আছে চমকপ্রদ উপকথা

মাছদের দেখভাল করতে, যাতে মানুষের মাছ খাওয়ার অভাব না হয়। থুলিমাঝে বলেছিলেন, লবণ দেখতে। তাঁর সৃষ্ট প্রাণিরাজ্যে যেন নুনের অভাব না হয়। ইরিমাকে বলেছিলেন, জলের ওপর নজর রাখতে, প্রাণীদের যাতে জলাভাব না হয়। ফোউ ওবিকে বলেছিলেন পৃথিবীতে ধান তৈরি করে মানুষকে শিখিয়ে দিতে। ফোউ ওবি তাই করলেন, কিন্তু ফেরার পথে পাহাড়ি নদী। দেবী সাঁতার জানেন না। নদীর ধারে এক হরিণকে তাই পথ দেখাতে বললেন। কিন্তু সেই হরিণ অতি বদ। নদীর যেখানে বেশি জল, সেই জায়গা দেখিয়ে দেবীকে বলল, ‘খুব কম জল। হেঁটেই পেরিয়ে যাবে।’ বাস, নদীতে নেমে ফোউ ওবির হাবুডুবু অবস্থা। ফলুই মাছের মতো দেখতে এক নামাই মাছ কোনওক্রমে তাঁর প্রাণ বাঁচাল। প্রসঙ্গত, মণিপুর ছাড়া অন্যত্র এই মাছ দেখতে পাওয়া যায় না। ফোউ ওবি বর দিলেন, নামাই মাছ জলে সবসময় চকচকে ওজ্জ্বল্য নিয়ে অধিষ্ঠান করবে। হরিণকে দিলেন অভিষাপ, সে কোনও দিন ধান খেতে পারবে না। ঘাসমাটি, পচা পাতা খেয়ে দিন গুজরান করতে হবে। হাল আমলে মণিপুরের সন্তান এল সোমি রায় এই সব মিথ ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। একদা দার্জিলিঙের মাউন্ট হারমন স্কুলের ছাত্র সোমি এক অর্থে মণিপুরের রাজরক্তের উত্তরাধিকারী, তাঁর মা বিনোদিনী দেবী মণিপুরের রাজকন্যা, লেখিকা এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। সেখানে তিনি ছিলেন রামকিঙ্কর বেজের প্রিয় শিষ্যা।

সোমি মণিপুরে জনপ্রিয় পোলো খেলার উপকথাটিও বলেছেন। কোনথুজাম গ্রামের টাম্পা নামে এক সুন্দরী মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হলেন আকাশচ্যুরী সৃষ্টির দেবতা সোয়ারেন। টাম্পাকে তিনি আকাশে এসে তাঁর সঙ্গে সংসার করতে ডাকলেন। টাম্পা মা-বাবাকে ছেড়ে যেতে নারাজ। সোয়ারেন তখন মেয়েটিকে ইলোপ করে তাঁর সঙ্গে কোউরু পাহাড় হয়ে স্বর্গে নিয়ে এলেন। দেবতার অধিষ্ঠান, স্বর্গের পথ বলে কোউরু পাহাড় আজও মেইতেইদের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান।

সোয়ারেন ও টাম্পার একটাই ছেলে, তার নাম খোরিপোভা। খোরিপোভার তিন বছর বয়সে টাম্পা স্বামীকে বলল, ‘এ বার অনুমতি দাও, কতদিন মা বাবাকে দেখিনি! দেখেই চলে আসব।’ সোয়ারেন অনুমতি দিলেন, শুধু একটাই সতর্কতা থাকল, ‘তুমি এখন দেবী। মর্তের মানুষদের সঙ্গে একত্র খাওয়াদাওয়া করো না।’ স্বর্গ থেকে সোনার সিঁড়ি নামিয়ে দিলেন তিনি, টাম্পা সেই সিঁড়ি বেয়ে গ্রামে ফিরে এল। মা, বাবা থেকে গ্রামের লোকজন সকলেরই আনন্দের অবধি থাকল না।

আনন্দিত গ্রাম টাম্পার জন্য ভোজ দেবে, ঠিক হল। টাম্পার মা সোয়ারেনের নিষেধের কথা জানালেন, সে এখন সকলের সঙ্গে বসে

খেতে পারবে না। গ্রামবাসীরা জানাল, কোই পরোয়া নহি। তারা সাতটি পুরু কাপড়ে ঘিরে ভোজসভা বসাবে। গগনবিহারী সোয়ারেন কিছু জানতে পারবেন না। কিন্তু দেবতার দৃষ্টিকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়! সোয়ারেন সব দেখতে পেলেন এবং রেগে গিয়ে স্বর্গের সিঁড়ি তুলে নিলেন। টাম্পার আর ফেরা হল না, কোনথুজাম গ্রামেই থাকতে হল।

আর শিশু খোরিপোভা? অন্য দেবদেবীদের সাহায্যে সোয়ারেন তাকে বড় করে তুললেন। খোরিপোভা প্রায়ই মায়ের কথা জিজ্ঞেস করে, সোয়ারেন নীরব থাকেন। ক্রমে বালক বড় হয়ে উঠল, মায়ের খোঁজে সে এক দিন স্বর্গ থেকে মর্তে চলে এল। নামল এসে লোগতাক হ্রদের সবুজ ভাসমান দ্বীপে। দ্বীপে সুন্দর এক মেয়ে ঘোড়া। সে আসলে মৈরাং রাজ্যের রাজকন্যা নাইরুংবি। খোরিপোভা তার পিঠে চেপে মায়ের খোঁজে বেরোল। খুঁজতে খুঁজতে এক দিন এসে পৌঁছোল নোনমাইজিং পাহাড়ে। সেখানে তখন নিংথু আর পাছেইবিকে নিয়ে হলকর্ষণ, খাওয়াদাওয়ার উৎসব। খোরিপোভা সেখানে নিজের পরিচয় দিয়ে জানাল, সে সোয়ারেনের ছেলে। উৎসবে যোগ দেবে।

দেবদেবীরা আপত্তি তুললেন, ‘খোরিপোভা, এই অনুষ্ঠান শুধু বিবাহিতদের। তোমার তো বৌ নেই, তাই অনুষ্ঠানে আসতে পারবে না।’ খোরিপোভা বলল, ‘বেশ, এখানে দেবীদের মধ্যেই কেউ আমার বৌ হোক!’ দেবতারা বললেন, চোখ বাঁধা অবস্থায় তাকে বেছে নিতে হবে। ঘোড়সওয়ার খোরিপোভার হাতে হকিস্টিকের মতো একটা লাঠি, চোখ বাঁধা অবস্থায় সে এগিয়ে গেল। লাঠির মাথা চানিংখোংবি নামে কুমারী এক দেবকন্যাকে ছুঁয়ে দিল। দেবতারা ভারী খুশি! উৎসবশেষে বর-বৌ দু’জনে বৌয়ের বাড়ির দিকে রওনা হল। দেবকন্যা চানিংখোংবির বাড়ি কোনথুজাম গ্রামের কাছেই। সেখানে এসে হারিয়ে-যাওয়া মাকে খুঁজে পেল খোরিপোভা। কিন্তু মা ফিরলেন না, বললেন, ‘আমি গেলে তোমার বাবা রুষ্ট হবেন। আমি কাবুই নাগাদের কাছে আছি, সেখানেই থেকে যাব।’ খোরিপোভা আর চানিংখোংবি সেই গ্রামের কাছে ঘর বাঁধল, আজও সেখানে মেইতেইদের তীর্থস্থান।

নাইরুংবি নামের সেই মেয়ে ঘোড়া? লোগতাক হ্রদের সেই অরণ্যে ছিল বুনা ঘোড়া সামাদন। স্বভাবে হিংস্র, ডানায় ভর করে উড়তে পারত। এক সময়ে দেবতারা তাই তার ডানা কেটে দিয়েছিলেন। নাইরুংবি আর সামাদন তৈরি করল তাদের অশ্বসংসার। সানাবি, কারু, কোনো এ সব নামের অনেক ঘোড়ার জন্ম দিল তারা। শুধু দেবতা এবং রাজারাই সেই সব ঘোড়ার পিঠে উঠতে পারে।

খোরিপোভার দাদা পাখাস্বার বিয়ে। সেই কাংলা প্রাসাদের নীচে সাপ হয়ে আছে যে, মণিপুরের রাজারা সকলে যাঁর উত্তরসূরি। খোরিপোভার বিয়েতে হকিস্টিকের মতো একটা জিনিস ছিল, মনে আছে? সেই সব হাতে নিয়ে পাখাস্বার বিবাহ-উৎসবে ওই সব সানাবি, কারু নামের ঘোড়াদের পিঠে চেপে পৌঁছালেন দেবতা ও রাজারা। ঠিক হল, সাতজন-সাতজন করে টিম বানিয়ে দু'দলের মধ্যে ঘোড়ার পিঠে, এই সব লাঠি ও একটা বল নিয়ে খেলা হবে। পৃথিবীতে সেটাই প্রথম 'সাগোল কাংজেই' বা হকিখেলা। মণিপুরই তার জন্মস্থান।

কিন্তু খোরিপোভার মা? কাবুই নাগাদের গ্রামে থেকে গেল টাম্পা। মিথের যুগে তা হলে মণিপুরের মেইতেইদের সঙ্গে কাবুই নাগাদের বিরোধ ছিল না? কুকিরাও তো নাগাদের মতোই উপজাতি। বছর কয়েক আগেও উত্তর-পূর্বে কুকি বনাম নাগা লড়াই বাধত। রাস্তা বন্ধ থাকত।

মণিপুরে শান্তি ফেরাতে মেইতেই বৈষ্ণব সমাজে অন্তর্লীন এই মিথগুলির কথাও জানা জরুরি। এই মিথগুলি বলে, পুরনো মণিপুরের সমস্ত কিছু উৎখাত করে বৈষ্ণব ধর্ম সেখানে আসেনি। 'কাং' বা রথযাত্রা মেইতেইদের খুব জনপ্রিয় উৎসব। ১৮২৫-১৮৩৪ সালে রাজা গম্ভীর সিংহের আমলে এর শুরু। রথে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তির পাশে চামর হাতে দুই ব্রাহ্মণ ও দুই মণিপুরী কন্যা। নৈবেদ্য হিসেবে ফুল, ফলা। সঙ্গে ঘি-তে তুলো জড়ানো প্রদীপ বা 'বার্তি'। সারা পথ ঢাকঢোল, শাঁখ, কাঁসর বাজা। জন্মষ্টমী, দোলযাত্রাও জনপ্রিয়। জন্মষ্টমীর দিন মন্দিরে কৃষ্ণের জন্মকথা পাঠ করা হয়, দু'টি দলের মধ্যে নারকেল ছিনিয়ে রাগবির মতো 'ইউবি লাকপি' খেলা হয়। হোলি বা 'ইয়াওসাং' উৎসবের দিন রং খেলার পাশাপাশি ছোট ছোট কুঁড়েঘর বানিয়ে সেখানে শ্রীচৈতন্যের মূর্তি রাখা হয়। এ দিন চৈতন্যের আবির্ভাবতিথি যে! সন্ধ্যায় চৈতন্যের মূর্তিটি বের করে এনে আমাদের নেড়াপোড়ার মতো কুঁড়েঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরে গৃহস্থের মঙ্গলকামনায় সেই ছাইয়ের টিপ বাড়ির দরজায় লাগিয়ে দেওয়া হয়। হোলিতে রং খেলা থাকল, রইল দরজায় ছাইয়ের টিপ লাগানোর দেশজ প্রথাও। রথে থাকল প্রাচীন প্রথার বার্তি। আছে জনপ্রিয় নৌকোযাত্রা। লাই বা দেবদেবী-সহ রাজা, রানি এই নৌবিহার করতেন। প্রাচীন পুঁথি জানাচ্ছে, অষ্টাদশ শতকে এক দিন রাজা, রানির সঙ্গে বৈষ্ণব গুরুদেবও উঠে বসলেন সেই নৌকোয়। মানে, লাই প্রথা থাকল, সঙ্গে রইলেন বৈষ্ণব গুরু।

মণিপুর এখানেই চমৎকার। প্রাচীন দেশজ প্রথা ও নতুন বৈষ্ণব ধর্মের চমৎকার মিলমিশ। হিন্দু, খ্রিস্টান ইত্যাদি বড় ধর্মের বড় ইতিহাস অনেক হল। কিন্তু এই সব উপকথা, উৎসবের ছোট ছোট অনুপঙ্খই বুঝিয়ে দেয়, বৈষ্ণব ধর্মের বিজয়কেতনই সব নয়। ইক্ষলের জনজীবনে সংঘাত ও সমন্বয় একই সঙ্গে চলেছে।

খ্রিস্টান কুকি

সমতলের মেইতেই আর পাহাড়ি কুকিদের মধ্যে কি শুধুই হিন্দু বনাম খ্রিস্টান বিরোধ? সেই যে মেইতেইদের লাই হারোবা উৎসবে দেবতা বা লাই-এর প্রতীক মুখোশ বা বাঁশকে জল থেকে তোলা হয়, এটা কুকিদেরও প্রথা। সাবেক লাইরা অধিষ্ঠান করেন বাড়ির বাইরে, জঙ্গলে জায়গায়। বার্মাতেও এই জিনিস। বৌদ্ধ ধর্মের বাইরে সেখানকার কার্চিন জনজাতির দেবদেবী বা 'নাট'রা থাকেন জঙ্গলে। উপকথা তো নিছক গল্প নয়, সে 'ইতিহাস', তার মানে এই রকম ছিল।

এত যদি মিল, তা হলে কুকিরা খ্রিস্টান হল কী করে? বস্তুত, কুকি একটা আলগা শব্দ, ওই নামে মণিপুরে কোনও জনজাতি নেই। বিভিন্ন পাহাড় পেরিয়ে এই যোদ্ধা জনজাতিটি বিভিন্ন বার, বিভিন্ন ভাবে মণিপুরে পৌঁছেছে। উপনিবেশিক আমলেও ত্রিপুরা থেকে মণিপুর সর্বত্র রাজপরিবারের লোকেরা কুকিদের ভাড়াটে সৈন্য হিসেবে ব্যবহার করতেন। ১৭৯৯ সালেই কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় কুকিদের সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে, 'শিকারি ও যোদ্ধা জাতি। এরা মুখ্যত বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত, প্রতিটি গোষ্ঠী কোনও না কোনও মোড়লের অধীনে।' কারা কবে এসেছেন, তার ভিত্তিতে নৃতাত্ত্বিকরা মণিপুরের কুকিদের পুরনো ও নতুন কুকি নামের দুই দলে ভাগ করেন। আলমোল,

আনাল, চিরু, পাইতে গোষ্ঠীরা যেমন আগে এসেছে, তারা পুরনো কুকি। থারো, মিসাও গোষ্ঠীরা পরে এসেছে, তারা নতুন কুকি।

ইক্ষল থেকে ৯০ কিমি দূরে উখরুল। শিলং-এর মাউসমাই বা আরাকুর বোরা গুহার মতো এখানেও চুনাপাথরের গুহা আছে, আছে মনোরম শিরই খাশোং পাহাড়ের চূড়া। উপনিবেশিক আমলে এই উখরুল বেয়েই মণিপুরের পাহাড়ে খ্রিস্টধর্মের প্রবেশ। ১৮৯৪ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শিলচর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে পেটিগ্রা নামের এক যাজক প্রথম ইক্ষলে এসে পৌঁছোন। সমতলের মেইতেইরা ভাবল এ বুঝি তাদের খ্রিস্টান করার চক্রান্ত। বিরক্ত পেটিগ্রা দু'বছর বাদে চলে গেলেন উখরুল, সেখানে তৈরি করলেন স্কুল, হস্টেল। তৈরি হল প্রথম ব্যাপটিস্ট চার্চ। মণিপুরের কুকি সম্ভান, দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সের ছাত্র, ফুলব্রাইট বৃত্তিতে সম্মানিত চূড়াচন্দ্রপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা থাংকোমাং গ্যাংতে তাঁর 'কুকিজ অব মণিপুর' বইয়ে জানাচ্ছেন, এই উখরুল স্কুলের ছাত্র নুলহাও তামসং প্রথম ধর্মান্তরিত কুকি। তুংজাংভাইচং গ্রামে তিনি প্রথম কুকি ব্যাপটিস্ট গির্জা স্থাপন করেন, বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট অনুবাদ করেন। ১৯১২ সালে উখরুল গির্জাতেই আরও ন'জন কুকি ছাত্র খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর ইক্ষল-চূড়াচন্দ্রপুর এলাকায় সোনগেল, মোলনোম, লাংঝোলের মতো ছোট ছোট গ্রামে গড়ে উঠতে থাকে গির্জা এবং স্কুল। গ্যাংতের স্পষ্ট কথা, এই মিশনারি প্রচারকদের বাদ দিয়ে মণিপুরে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাস লেখা অসম্ভব।

ধর্মপ্রচারক পেটিগ্রা মণিপুরে আসার তিন বছর আগে, ১৮৯১ সালে মণিপুরি রাজকুমার টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ। মণিপুরিরা পাঁচ ইংরেজকে কোতল করে। ইংরেজরাও সমুচিত উত্তর দেয়। কোহিমা, শিলচর, তামু থেকে তিন কোম্পানি সৈন্য আসে, টিকেন্দ্রজিৎ ও তাঁর থঙ্গল সেনাপতিকে ফাঁসিতে লটকানো হয়। গ্যাংতে জানাচ্ছেন, এই যুদ্ধে টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে অনেক কুকি ছিলেন। তখনও সমতল-পাহাড় জনজাতির মধ্যে ভাগাভাগি হয়নি। ১৯১৭ থেকে ১৯১৯ সালে ইংরেজ-কুকি যুদ্ধের পর সমতল ও পাহাড়ের বাসিন্দাদের মধ্যে ফাটল ধরল।

কুকি বিদ্রোহ

মূল ধারার ভারতে এই বিদ্রোহ নিয়ে প্রায় পাঁচ দশক আগে কাজ করে গিয়েছেন বাঙালি ইতিহাসবিদ গৌতম ভদ্র। তখন তিনি জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসা উৎসাহী তরুণ। বিশ্ববিদ্যালয় তখন ইক্ষলে সবে একটি শিক্ষাকেন্দ্র খুলেছে। সেখানে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন গৌতম। সেখানে থাকতে থাকতেই এই অনালোচিত বিদ্রোহের দিকে দৃষ্টি পড়ে তাঁর। মণিপুর রাজদরবার, শিলং থেকে ব্রিটিশ আমলের প্রচুর নথি উদ্ধার করে নৃতত্ত্বের পত্রিকা 'ম্যান ইন ইন্ডিয়া'র ১৯৭৫ সালের মার্চ সংখ্যায় বেরোয় সেই গবেষণা-নিবন্ধ। 'ওটাই আমার প্রথম অ্যাকাডেমিক লেখা,' আজও বলেন তিনি। নৃতত্ত্বের ওই পত্রিকার সম্পাদকও তখন এক বাঙালি, সুরজিৎ সিংহ।

তার আগে কুকি বিদ্রোহটা জেনে নেওয়া দরকার। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা ফ্রান্সের রণাঙ্গনে শক্তসমর্থ কুলি পাঠানোর জন্য মণিপুরের রাজা চূড়াচন্দ্র সিংহকে হুকুম দেয়। ১৯১৭ সালেই মণিপুর থেকে ২০০ জন পাহাড়ি নাগা ও কুকিকে কুলি হিসেবে ফ্রান্সে পাঠানো হয়। আলওয়ার, ময়ুরভঞ্জের দেশীয় রাজাদেরও তখন ব্রিটিশরা একই নির্দেশ দিয়েছিল, সেখানে বিদ্রোহ হয়নি। কিন্তু মণিপুর দরবারে তখনও 'পোথাং' নামে একটি প্রথা চালু। এই প্রথায় সরকারি অফিসারেরা পাহাড়ে গেলে নিখরচায় তাদের বোঝা ও মালপত্র বয়ে দিতে হবে, পাহাড়ে রাস্তা ও বোরার উপর সেতু নির্মাণের সময় বেগার শ্রম দিতে হবে। ফলে বিদেশিদের কুলির প্রয়োজনে রাজদরবার পাহাড়ি জনজাতির শ্রম নিতেই পারে!

গৌতম ভদ্রের এই প্রথম গবেষণা-সন্দর্ভে তিনি দেখাচ্ছেন, সব কুকি নয়, থারো জনজাতিই ছিল এই বিদ্রোহের অন্যতম চালিকাশক্তি। কুকিদের অন্য গোষ্ঠীগুলিতে কিঞ্চিৎ গণতন্ত্র, সকলের কথায় শুনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে জাতীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু নতুন-আসা থারো কুকিদের জীবনে গ্রামের মোড়লের সিদ্ধান্তই সব। থিতু নয়, তারা জুম



প্রথম ব্যাপটিস্ট চার্চ, উথরুল

চাষ করে। জমি নষ্ট হয়ে গেলে কয়েক বছর পর অন্যত্র গ্রাম বসায়। তাদের পারিবারিক গঠনেও এই ব্যাপারে প্রশ্রয় আছে। থারো জনজাতির কুকিরা তাই কাচ্চা, কাবুই নাগাদের আক্রমণ করে কয়েক বছরের জন্য নিজেদের গ্রাম বসাত।

এ হেন যাযাবর যোদ্ধা বলেই ইংরেজরা কাছাড় ও লুসাই পাহাড়ে নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বার্থে এক সময় এই থারো কুকিদের বসিয়েছে। মেইতেই প্রাসাদও এদের কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু পরে ইংরেজ চাইল, কেউ যাতে যাযাবর না থাকে, সকলে থিতু এবং ‘সভ্য’ হয়। থারোদের নিয়েও সেই চেষ্টা হল, ছোট গ্রাম চলবে না বলা হল। সবাই আগের বড় গ্রামে গিয়ে জুটলে সেখানকার মাটি জুম চাষে অনুর্বর হল। বাড়ির কর বাড়িয়ে দেওয়া হল। জনজাতির পারিবারিক গড়ন ও সামাজিক নিয়ম ভেঙে গেল।

থারোরা এই সময় থেকেই ইংরেজ ও ইফলের রাজপ্রাসাদের উপর একযোগে ক্ষুব্ধ। মণিপুর রাজ পরিবারের সেনা চৌবা সিংহ এই সময় সিংহাসনের অন্যতম দাবিদার। থারো গ্রামগুলিকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, রাজা হলে এই নতুন কর কমিয়ে দেবেন। মেইতেই রাজারা যেহেতু এই থারো কুকিদের বসিয়েছেন, তাদের ভাড়াটে সেনা হিসেবে ব্যবহার করেছেন, তারা অন্য নাগা গ্রাম আক্রমণ করলেও চোখ বুজে থেকেছেন, থারোরা ভাবে, তারা অন্য উপজাতির থেকেও মেইতেইদের ঘনিষ্ঠ। ফলে প্রাসাদ-সংঘর্ষে তাদের দাবিদাওয়ারও অধিকার আছে। সেনা চৌবা সিংহের সেই বিদ্রোহ অবশ্য কয়েক মাস পরেই নির্মম ভাবে দমন করা হল। থারোদেরও ভাগ্য পুড়ল।

তাই কুলি হিসেবে ফ্রান্সে যাওয়ার হুকুম অন্য কুকিরা তামিল

করলেও থারোরা পরিস্কার জানিয়ে দিলেন, তাঁরা এতে নারাজ। গেরিলা যুদ্ধের কায়দায় এর পর তাঁরা রাতের অন্ধকারে দু’বছর ধরে মাঝে মাঝেই গ্রামে আসা ব্রিটিশ অফিসার ও দরবারি আড়কাঠিদের ওপর হামলা চালায়। ৮৬টি গ্রামকে ব্রিটিশরা নিকেশ করে দেয়, থারো কুকিরাও পাল্টা আক্রমণে ৩৪৮টি গ্রাম পুড়িয়ে ২৮৯ জনকে হত্যা করে। তারা একই সঙ্গে ব্রিটিশ ও ইফল দরবারের বিরুদ্ধে।

শেষ কথা

সেই যে মেইতেই-কুকি সম্পর্কে চিড় ধরল, আর জোড়া লাগল না। সাতের দশকের শেষে গৌতম ভদ্রও ইফল ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। ৭৫ বছরের ইতিহাসবিদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জীবনের ওই প্রথম গবেষণা-সন্দর্ভ নিয়ে কী মনে হয়? তিনি হাসলেন, ‘এখন হলে নতুন করে লিখতাম। ধরো, যে পেটিগ্রাফ সাহেব কুকিদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করছেন, এশিয়াটিক সোসাইটিতে মেইতেই ও কুকি ভাষা নিয়ে দিনের পর দিন লিখছেন, তিনিই কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে কুলি পাঠানোর প্রধান কারিগর। পরে এ জন্য তিনি কাইজার-এ-হিন্দ পদকে সম্মানিতও হবেন। এই নথিগুলি সব লন্ডনে আছে। তখন জানতাম না।’ এখন কী মনে হয়? পেটিগ্রাফ বেশ ধুরন্ধর ছিলেন?

‘এই সব বিশেষণ দিয়ে ইতিহাস বুঝতে চাইছ? লেখাপড়া তো কিছুই করোনি,’ ইতিহাসবিদ বললেন, ‘পড়লে বুঝবে, মণিপুরের ইতিহাস ত্রিপদী, তিন ধারায় প্রতিচ্ছদিত। মেইতেই, কুকি ছাড়াও ৩২টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত নাগা জনগোষ্ঠী তাদের ঐতিহ্যের ভাবনায় ব্যস্ত। কাছাড়, মণিপুর থেকে মায়ানমার, ব্রহ্মদেশে তাঁরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছেন।’

হ্যাঁ, ওঁদের পোলো খেলার মিথে কাবুই নাগা, সিন্ধু তৈরির মিথে বার্মার কথা আছে।

‘থাকবেই। কিন্তু নাগাদের গ্রামবিন্যাস ও গোষ্ঠীবিন্যাস আলাদা। এঁদের স্বপ্ন ‘নাগালিম’ বা সংহত নাগারাষ্ট্র তৈরি করা, ভারতের রাজ্যভাগে এঁদের কোনও আগ্রহ ছিল না।’

মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করলাম, নাগা মানে তো সেই ফিজো, মুইভা এই সব বিদ্রোহী গোষ্ঠী, সার। তাই না?

‘এই জটিল ইতিহাস আজও ঠিকঠাক লেখা হয়নি। মণিপুর-মায়ানমারের পার্বত্য মালভূমির ইতিহাস তো ঠিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ইতিবৃত্ত নয়। নানা জনগোষ্ঠীর বসতি ও অধ্বয়ের ইতিবৃত্ত, পারস্পরিক ভারসাম্য, বোঝাপড়া ও বিসংবাদের ইতিবৃত্ত। এর উপরে রাষ্ট্রকথা বা জাতিগত সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদ চাপালেই ভারসাম্য ভেঙে পড়বে, বিপর্যয় হবে। সে ১৯৯৩ সালের নাগা-কুকি সংঘর্ষ হোক বা আজকের কুকি-মেইতেই। নাগা-কুকি-মেইতেই এই ত্রিপদের গ্রন্থিমাচন না করলে অতীত বা বর্তমানের কোনও সন্ধি বা বিবাদ, বিগ্রহকে বোঝা যাবে না।’

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে দিয়ে বাংলার বিদ্বৎ-সমাজে যে বিপুল মণিপুর-চর্চা শুরু হয়েছিল, তা আপাতত এখানেই সমাপ্ত। এর পর অন্য বুঝদারির কাহিনি।



নিষ্কটক

জয় সেনগুপ্ত

তাগড়াই চেহারার তপন মাইতি মারামারিতে ওস্তাদ। বাবা মারা যাওয়ার পর বাবার কারখানায় কাজে ঢুকেছিল এইট পাশ তপন। কিন্তু কয়েক মাস পরই সুপারভাইজারের সঙ্গে কী নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি হয়। বদমেজাজি তপন বেধড়ক মেরেছিল সুপারভাইজারকে। নাক-মুখ দিয়ে রক্ত বেরোতে শুরু করেছিল তার। অন্য কর্মচারীরা সে দিন তপনকে ধরে না ফেললে মরেই যেত লোকটা।

মাস ছয়েক জেলের ঘানি টেনে বেরোনোর পরই পাড়ার কাউন্সিলর বাদল ব্যানার্জির নজরে পড়ল তপন। জেল থেকে বাড়ি ফেরার পর থেকে সে বাইরে বিশেষ বেরোত না। শুয়ে-বসে থাকত, টিভি দেখত আর মোবাইল ঘাটত। এক দিন সকাল আটটার সময় বাদলের দলের মান্দ এসে ডাকল তপনকে।

মান্দকে দেখে একটু অবাক হল তপন। তপনের জিজ্ঞাসু মুখের সামনে গলায় কর্তৃত্ব ফুটিয়ে মান্দ বলল, “চল, তোকে বাদলদা ডেকেছে।”

“বাদলদা ডেকেছে! কেন?” তপন প্রশ্ন করল।

“সে আমি জানি না। আমাকে পাঠাল তোকে ডেকে আনতে,” মান্দ হাত দুটো ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে বলল।

“ঠিক আছে মান্দদা, তুমি যাও। আমি জামা-প্যান্ট পরে একটু পরে যাচ্ছি,” তপন বলল।

“বাদলদা ন’টার সময় বেরিয়ে যাবে। তার মধ্যে যাস...” বলে বেরিয়ে গেল মান্দ।

ঘরে ঢুকে তপন ভাবতে লাগল, ওকে কেন ডাকছে বাদলদা! পাটির ছত্রছায়ায় অনেক ঘাপলা হয়, জানে তপন। সেই জন্যই বাদলদার কি ওকে দরকার পড়ল!

সাইকেলটা বের করল তপন। তার বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে বাদলের বাড়ি। সাইকেলে উঠে প্যাডেলে চাপ দিল সে।

বাদলের বাড়ি গিয়ে তপন দেখল, তার আগে থেকেই সাত-আট জন বসে আছে ওখানে। এদের চেনে তপন। এই পাড়ারই লোকজন। সমস্যার কথা বলতে

এসেছে নিশ্চয়ই।

তপন ঢুকতেই বাদলদা দেখল তাকে। বলল, “বোস তপন, তোর সঙ্গে আমার দরকারি কথা আছে। এদের ছেড়ে দিই আগে, তার পর বলছি।”

বাদলের ডান হাত বান্টু বসে আছে বাদলের পাশে। বাদল, বান্টুকে নিজের মোবাইলটা দিয়ে বলল, “নিকুঞ্জপুর থানার ওসি সুরত চ্যাটার্জিকে একটা ফোন লাগা তো! শুয়োরের বাচ্চাটা তিন বার ফোন করেছিল আজ। ধরিনি এক বারও।”

ওসির সঙ্গে কথা বলার পর একে একে উপস্থিত সবাইকে বিদেয় করে তপনের দিকে তাকাল বাদল। বলল, “তুই তো এখন কিছু করছিস না, বেকার! বসে আছিস বাড়িতে!” “হাঁ বাদলদা, জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আর কাজ পাইনি কোথাও,” মাথা নিচু করে বলল তপন।

“তোকে আমার কাজে লাগবে। তোর গায়ে শক্তি আছে। সাহসী ছেলে তুই। আমাদের পার্টিতে ভিড়ে যা। আমার সঙ্গে থাক। কাজকর্ম আমি দেব। তোর মতো হারামি ছেলেই আমার দরকার।”

তপন অবাক হয়ে তাকাল।

বাদল ভুরু কুঁচকোল, “হাঁ করে দেখছিস কী? রাজি আছিস কি না বল!”

“ঠিক আছে। কী করতে হবে আমাকে?” জিজ্ঞেস করল তপন।

“সে সব বলে দেব। আগে আমাদের পার্টিতে জয়েন কর, তার পর।”

আর সেই যে বাদলের দলে ঢুকল তপন, তার জীবনের মোড় ঘুরে গেল অন্য দিকে। বাদলের ছত্রছায়ায় বেড়ে উঠতে লাগল সে।

ধীরে ধীরে বাদল প্রোমোটোরিতে নামাল তপনকে। গায়ের জোর দেখানো আর মুখে কাঁচা খিস্তি দিতে তপনের জুড়ি ওই তল্লাটে আর কেউ ছিল না। এই রকম ছেলে যে প্রোমোটোরিতে উন্নতি করবে তা বুঝতে দেরি হয়নি বাদলের। তপন প্রথমে ছোটখাটো কাজ করত, তার পর বড় বড় ফ্ল্যাট তৈরি করতে শুরু করল। মোটা কমিশন খেত বাদল।

এই ‘মাস্তান-প্রোমোটোর’ তপনের ভিতরেই কিন্তু আর-একটা তপন লুকিয়ে আছে এবং ওর পেশার লোকেদের মধ্যে এই তপনকে খুঁজে পেতে হলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের প্রয়োজন হবে। তপন যতই কথায় কথায় খিস্তির ফোয়ারা ছোটাক, মাস্তানি করে প্রোমোটিং করুক, ওর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক আছে। এখন না-হয় তপন বড়লোক হয়েছে, কিন্তু একটা সময় তো গেছে, যখন কষ্টেসুস্টে দিন চালাতে হত তার পরিবারকে। তখন এমনও অনেক বার হয়েছে, নিজে না খেয়ে সেই খাবার তুলে দিয়েছে পাড়ার কোনও ভিখিরিকে। আবার কখনও-বা বাড়ির জন্য চাল কিনে ফেরার পথে “বাবা, ক’দিন

ধরে না খেয়ে আছি,” বলে হাত পাতা কোনও বৃদ্ধাকে সেই চাল দিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরে এসেছে তপন। সেদিন হয়তো তার বাড়ির কারও ভাত জোটেনি।

এখনও তপন আপদে-বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায়। টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করে। আর, এত বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও সকলের সঙ্গে সমান ভাবে মেশে। পাড়ার চায়ের দোকানে চা খায়, রকে বসে আড্ডা মারে। টাকার অহঙ্কার তপন দেখায় না কখনও।

॥ ২ ॥

“ইদানীং তোকে এত মনমরা লাগে কেন রে? সব সময় কিছু একটা চিন্তা করিস বলে যেন মনে হয়!” কেঁপের দোকানে চা খেতে খেতে তপনকে বলল ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সলিল।

তপন মাথা নিচু করে বসেছিল। অন্যমনস্ক ভাবে চা খেতে খেতে সলিলের দিকে তাকাল সে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মাথা নামিয়ে ঘন ঘন চুমুক দিয়ে চা-টা শেষ করে টেবিলের ওপর রাখল।

পাঁচ ফুট ন’ইঞ্চি লম্বা সলিলকে হ্যান্ডসাম বলা যায় স্বচ্ছন্দে। মাথা ভর্তি কালো চুল। খুব একটা ফর্সা না হলেও, কালো বলা যায় না। চোখের দৃষ্টি খুব মায়ারী। সলিল পড়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত। তপনের একেবারে ছেলেবেলাকার বন্ধু সে। তপন কত বার বলেছে ওকে বাদলদার পার্টিতে যোগ দিতে, তার পর প্রোমোটোরি শুরু করতে। সলিল রাজি হয়নি। বলেছে, “আমাকে দিয়ে প্রোমোটোরি হবে না রে?”

“কী রে, বললি না কিছু?” সলিল ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে তপনের দিকে।

“কী বলব বল! একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার,” মাথা নিচু করেই বলল তপন।

“তোর সব ব্যক্তিগত ব্যাপারই তো আমাকে বলিস! এটা আবার কী রকম ব্যক্তিগত যে, আমাকে বলা যাবে না! আর এখন তো আমরা দু’জন ছাড়া কেউ নেই এখানে,” বলে সলিল।

“না, তা নয়। তোকে বলা যেতেই পারে!” “বল, কী হয়েছে!”

“আসলে বিষয়টা হল... মানে... বাচ্চা-কাচ্চার বিষয় আর কী!”

“বাচ্চা-কাচ্চার বিষয় মানে?” সলিলের কোঁচকানো ভুরু আরও কুঁচকে গেল।

“মানে... আমাদের বিয়ে হয়েছে তো অনেক দিন, এখনও...”

তপনের কথা শেষ হওয়ার আগেই সলিল বলল, “বুঝতে পেরেছি, আর বলতে হবে না। তা, ডাক্তার দেখিয়েছিস?”

“বেশ কয়েক জন ডাক্তারকে দেখিয়েছি। কিন্তু আসল ব্যাপারটা অন্য...”

“আসল ব্যাপারটা অন্য মানে?”

“মানে, ডাক্তার বলে দিয়েছে আমি

কোনও দিন বাচ্চার বাবা হতে পারব না। এ দিকে মিলি দিন দিন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। যে দিন জানতে পেরেছে ওর কোনও সমস্যা নেই, গন্ডগোলটা আমারই, ভীষণ অশান্তি শুরু করেছে। আমার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করেছে। মুশকিল হল, সারোগেসি বা অন্য কোনও রকম পদ্ধতিতে বাচ্চা নিতে রাজি নয় ও।”

“তা, এ সব আমি শুনে কী করব? এ তো ডাক্তারের কাজ।”

“অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি। কিন্তু কিছু লাভ হয়নি।”

“তা হলে একটা দত্তক নিয়ে নে। এ রকম অবস্থায় তাই তো করে অনেকে।”

“বলেছিলাম। কিন্তু তাতে মিলি একেবারেই রাজি নয়। পরের বাচ্চাকে মানুষ করতে পারবে না, বলে দিয়েছে।”

“তা হলে তো আর কোনও রাস্তা নেই...”

“তার ওপর আমাদের কাজের মাসি মিনতির কাছ থেকে মিলি শুনেছে, কারা নাকি ওকে বাজা বলেছে। শুনে কেঁদেছে হাউহাউ করে।”

“বুঝতে পারছি, খুবই সমস্যায় পড়েছিস। কিন্তু এ সব পারিবারিক ব্যাপার তোকে মাথা ঠান্ডা করে মোকাবিলা করতে হবে, অর্ধেক হলে চলবে না,” বলল সলিল।

“নাহ্, ঠান্ডা মাথায় মোকাবিলার বাইরে চলে গেছে সব কিছু। এতটাই নিরীক্ষণ হয়ে গেছে যে, বলে কিনা প্রয়োজনে অন্য কারও সঙ্গে শোবে। বাচ্চা ওর চাই-ই। এক বার ভয় দেখাল, বাপের বাড়ি চলে যাবে,” খুব কষ্ট করে কথাগুলো বলল তপন। রগচটা মাস্তান বলে তাকে আর চেনাই যাচ্ছে না এই মুহূর্তে।

সলিল একটু চুপ করে থাকে, তার পর বলে, “এরকম কথা যে বলতে পারে, তার বাপের বাড়ি চলে যাওয়াই তো ভাল। চলে যাক। ছেড়ে দে ওকে!”

“ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না রে... ভীষণ ভালবাসি ওকে,” বলতে বলতে কেঁদে ফেলল তপন।

সলিল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। বেপরোয়া, মারকুটে তপনের মধ্যে এ রকম কোমলতা, ভালবাসাও থাকতে পারে! সত্যিই, সকালে তপন বেরিয়ে গেলে খাঁ খাঁ ফাঁকা বাড়ি যেন গিলতে আসে মিলিকে। কেউ নেই ওকে সঙ্গ দেওয়ার। পাড়াপড়শির বাড়ি সব দূরে দূরে। আত্মীয়স্বজনও কেউ আসে না তেমন। এ এক ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা। তপনের বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত সাড়ে নটা-দশটা বেজে যায়। তত ক্ষণ নিঃসঙ্গতার চোরাবালিতে ডুবতে থাকে মিলি।

“ওর ভালর জন্য, ও যাতে মনের আনন্দে শান্তিতে থাকতে পারে, তার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি,” হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বলল তপন।

ওর অসহায় ভাব দেখে খারাপ লাগছিল সলিলের। কিন্তু ওর কী-ই বা করার আছে।

“যাক গে ছেড়ে দে এ সব কথা।

সবই আমার কপাল! মেসোমশাইয়ের অপারেশনের কী হল?” তপন পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সলিলকে দিয়ে নিজে ধরাল একটা।

“বাবার হার্টের অবস্থা এতটাই খারাপ যে, খুব তাড়াতাড়ি অপারেশন করতে না পারলে বাবাকে বাঁচানো যাবে না। আর অপারেশনে প্রচুর টাকা লাগবে, যা জোগাড় করা অসম্ভব। কী যে করব!” সলিল মাথা নিচু করল।

তপন একদৃষ্টে সলিলের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মাথায় ঘুরছে একটা অন্য চিন্তা।

সলিল একটা ছোট প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ করে। মাইনে সামান্য। মালিক মারোয়াড়ি। বাড়িতে সলিলের আইবুড়ো বোন। তার কী করে বিয়ে দেবে, ভেবে পায় না। বাবা-মায়ের ওষুধপত্র কিনতে গিয়ে প্রতি মাসেই অনেক টাকা ধার হয়ে যায়। এ দিকে হার্ট অপারেশনেও প্রচুর টাকার প্রয়োজন।

তপন তার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছে দেখে সলিল জিজ্ঞেস করে, “কী দেখছিস ও ভাবে!”

“নাঃ, কিছু না,” চোখ সরিয়ে নিল তপন, তার পর বলল, “মেসোমশাইয়ের অপারেশনে মোটামুটি কত টাকা লাগবে?”

“লাখ চারেক তো বটেই...” সলিল বলল।

“তুই একটা কাজ কর, আজ রবিবার, তুই মঙ্গলবার মানে পরশু দিন এক বার আমার সঙ্গে দেখা কর। দেখি, টাকার কোনও ব্যবস্থা করতে পারি কি না। এখানে চায়ের দোকানেই আয়, সকাল ন’টা নাগাদ,” বলল তপন।

হঠাৎ বেশি থেকে উঠে পড়ে দু’জনের চায়ের দাম মিটিয়ে, তপন মোটরবাইকে উঠে স্টার্ট দিয়ে সলিলকে বলল, “মনে রাখিস, পরশু সকাল ন’টা।”

সলিল একটু অবাক হল। কী রকম যেন অস্থির ভাবে চলে গেল তপন। এ রকম তো কখনও করে না। জিজ্ঞেস করে, “আজ তোর অফিস ছুটি, কোথায় যাবি এখন? বাইকে বোস, পৌঁছে দিয়ে আসি।” কিংবা বেশ কিছু ক্ষণ গল্পগুজব করে, তার পর ওঠে। আজ যেন একটু অন্য রকম লাগল তপনকে।

মঙ্গলবার ন’টার আগেই তপন এসে বসে ছিল কেঁটার চায়ের দোকানে। সলিল এল ন’টার একটু পরে।

তপনের দিকে তাকিয়ে হাসল সলিল।

তপন বলল, “বোস। চা খাবি তো!”

সলিলকে দেখে মনে হল, ও অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে এসেছে।

“এখান থেকেই সোজা অফিস চলে যাবি? নাকি বাড়ি যাবি আবার?” তপন জিজ্ঞেস করল সলিলকে।

“হ্যাঁ। একবারে রেডি হয়েই বেরিয়েছি।”

সলিল বসল তপনের পাশে। কেঁট দারুণ চা বানায়। এখন থেকেই বেশ ভিড় শুরু হয়ে

গেছে দোকানে।

“কেঁট, দুটো চা দে,” তপন বলল।

সলিল উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তপনের দিকে।

“কিছু ব্যবস্থা করতে পারলি?” সলিল জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ, ব্যবস্থা একটা ভেবেছি। চা-টা খেয়ে নিই, তার পর বলছি।”

দু’জনের চা খাওয়া হয়ে গেলে দাম মিটিয়ে তপন, সলিলকে বলল, “একটু এ দিকে আয়।”

চায়ের দোকান থেকে একটু এগিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়াল দু’জনে। তপনের হাবভাব একটু অদ্ভুত লাগছিল সলিলের।

সলিলকে সিগারেট দিয়ে নিজে একটা ধরাল তপন। তার পর বলল, “শোন সলিল, তোকে আমি মোট পাঁচ লাখ টাকা দেব। এক সঙ্গে। ওটা আর ফেরত দিতে হবে না। কিন্তু একটা শর্ত আছে।”

সলিল একটু অবাক হল। বলল, “আমার তো লাগবে লাখ চারেক। পাঁচ দিবি কেন?”

তপন ঘন ঘন কয়েক বার টান দিল সিগারেটে, তার পর বলল, “এক লাখ একস্ট্রা। কিন্তু ওই যে বললাম, একটা শর্ত আছে। একটা কাজ করতে হবে তোকে। তবেই পুরো টাকাটা পাবি তুই। অবশ্য টাকাটা আমি তোকে আগেই দিয়ে দেব। বলিস তো আজই। কিন্তু কাজটা তোকে করতে হবে।”

“কী কাজ?” সলিলের ঝুঁকুচে গেল তপনের কথা শুনে। মনে মনে ভাবল কী এমন কাজ, যার জন্য পাঁচ লাখ টাকা দেবে ওকে তপন! এবং তা আর ফেরতও নেবে না কোনও দিন! কাউকে খুন টুন করতে বলবে নাকি? বলতেও পারে। তপনের যা পেশা, তাতে কাউকে খুন করতে বলা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু যত টাকাই দিক, খুন-জখম সলিলের দ্বারা হবে না। সেটা সলিল নিজেও ভাল করে জানে। সে রকম কিছু বললে, পরিষ্কার না বলে দেওয়া ছাড়া রাস্তা নেই।

তপন বোধহয় আন্দাজ করতে পারল সলিলের মনের কথা। হাসল, “কাউকে মারতে-টারতে হবে না। তবে কাজটা খুব গোপন এবং এটা আমার আর তোর মধ্যেই থাকবে। আর শুধু এক জন জানবে, সে হল আমার বৌ মিলি।”

সলিল বড় বড় চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তপনের দিকে।

তপন বলল, “দেখ, ব্যাপারটা শুনতে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।”

একটু বিরতি দিয়ে আবার বলতে শুরু করল তপন, “তোকে তো সে দিন সবই বলেছি। আমি কোনও দিন বাবা হতে পারব না। একটাই রাস্তা, অন্য কারও মাধ্যমে...” পুরো কথাটা শেষ করতে পারল না তপন।

সলিল বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল

তপনের দিকে।

“তুই পাঁচ লাখ টাকা পাবি।

মেসোমশাইয়ের অপারেশনের পরেও কিছু টাকা তোর হাতে থাকবে। তোকে তো বোনটারও বিয়ে দিতে হবে! বয়স তো কারও বসে থাকবে না! তাই বলছি, এই কাজটা তোকে করতে হবে। একবারে নিঃশব্দে। আমি মিলির সঙ্গে কথা বলেছি। ও রাজি আছে।”

সলিল একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল তপনের দিকে, এবার মাথা নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল, “এটা কী করে সম্ভব?”

“কেন সম্ভব নয়? তোর সঙ্গে মিলির যথেষ্ট ভাল পরিচয় আছে। আমার বাড়িতে বহু বার গেছিস তুই। এ-ব্যাপারে মিলির সম্মতি আছে। এ বার তুই রাজি হয়ে যা। সম্ভান ছাড়া ওর সারাটা জীবন দুঃখে ভরে থাকুক, এটা আমি সহ্য করতে পারব না। লোকে ওকে বাঁজা বলবে... তার চেয়ে আমার আত্মহত্যা করা ভাল।”

এক অদ্ভুত প্রস্তাব, অদ্ভুত মানসিকতা। স্ত্রীকে এতটাই ভালবাসে তপন যে, নিজের স্ত্রীকে অন্যের শয্যাসঙ্গিনী করতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ নেই। এই রকম প্রস্তাবে রাজি হওয়ার মতো মানসিকতা সকলের থাকে না। একটা দ্বিধাবোধ, ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা ছাড়িয়ে, যুক্তি আর যুক্তিহীনতার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে রইল সলিল। কিন্তু বাবার অপারেশন? তার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা দেবে তপন। প্রস্তাবে রাজি না হলে, বাবাকে হয়তো তিলে তিলে মৃত্যুর মুখে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত এই ‘ভয়ানক’ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় রইল না সলিলের।

॥ ৩ ॥

এক বছর পর

সলিল যে বীজ বপন করেছিল মিলির শরীরে, তা বিফলে যায়নি। এক ফুটফুটে কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছিল সে। তার জন্মের পর তপনের বাড়ির পরিবেশই পাল্টে গেছে। আনন্দে ছল্লোড়ে সারা দিন কেটে যায় মিলির। মিলির বাবা মেয়ের নাম দিয়েছেন স্নেহাশ্রী। ডাকনাম স্নেহা।

তপনের দেওয়া টাকায় সলিলের বাবার হার্টের অপারেশন নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে। তিনি এখন সুস্থ শরীরে হাঁটাচলা করছেন।

স্নেহা জন্মানোর পর থেকে তপনের জীবনটাও অন্য রকম হয়ে গেছে। একেবারে অন্য রকম। ও বাদলদার ওখানে আর বিশেষ যায় না এখন। মাঝে মাঝে বুড়ি ছোঁয়ার মতো মুখ দেখিয়ে আসে। তবে সেটাও আর বেশি দিন করবে না। তপন ঠিক করেছে, প্রোমোটরি করবে না আর। মারপিট, গুন্ডামি, পার্টি পলিটিক্সের মধ্যে থাকবে না। এই

ক'বছরে সে যা টাকা করে নিয়েছে, তাতে পায়ের ওপর পা দিয়ে আরও দু'পুরুষ কেটে যাবে। সে এখন মেয়ের সঙ্গে খেলা করে, বৌয়ের সঙ্গে গল্প করে। মেয়ের জন্য নানা রকম খেলা, রঙিন বইপত্র কিনে আনে।

সলিল প্রায়ই আসে তপনের বাড়িতে। স্নেহকে কোলে নেয়, খেলা করে। তপন লক্ষ করেছেন স্নেহকে যখন কোলে নেয় সলিল, তার চোখে রীতিমতো অপত্য স্নেহ ফুটে ওঠে। সলিলের এই ঘন ঘন আসা, স্নেহকে কোলে নেওয়া মিলি তো বটেই, তপনেরও চূড়ান্ত বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সলিলকে বুঝিয়েছে তপন, “শোন সলিল, তোর কাজের জন্য তাকে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়েছি। কাজ হয়ে গেছে। এবার ভুলে যা সব। আমার বাড়িতে আর আসিস না। আমরা যেমন বন্ধু ছিলাম, থাকব। কিন্তু সেটা বাইরে, বাড়িতে একেবারে নয়।”

সলিল সরল ভাবে তাকাল তপনের দিকে। বলল, “কিন্তু স্নেহ তো আমারই মেয়ে, বল! আমার ওকে দেখতে ইচ্ছে করবে না? কোলে নিতে ইচ্ছে করবে না? মাঝে মাঝে তো আমাকে যেতেই হবে আমার মেয়েকে দেখতে, তাই না? তুই-ই বল?”

তপনের বারণ শোনেনি সলিল। তার এই পিতৃত্বের অধিকার ফলানো, বরদাস্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না তপনের পক্ষে।

এর কয়েক দিন পর সলিল যখন বোনের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে বলে তিন লাখ টাকা চাইল তপনের কাছে, তখন সলিলের ব্যাপারে চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা মাথায় এসেছিল তপনের। টাকা চাওয়ার মধ্যে ব্ল্যাকমেলিংয়ের গন্ধ পেয়েছিল সে।

মাসখানেক হয়ে গেল বাদলের কাছে যায় না তপন। কিন্তু এ ভাবে যে পুরনো জীবনকে হঠাৎ ছেড়ে আসা যায় না, তা বুঝতে পারেনি। তার জীবন এখন অভিন্নরূপে চক্রব্যূহের মতো, সেখানে ঢোকা যায়, কিন্তু বেরোনোর রাস্তা দেখানোর জন্য পাশে কেউ থাকে না।

আর ঠিক যোলো দিনের মাথায়, খুব সকালে পিন্টু এসে কড়া নাড়ল তপনের বাড়িতে। তপন ঘুমচোখে দরজা খুলতেই পিন্টু বলল, “তোকে বাদলদা ডেকেছে। তুই আজকাল যাচ্ছিস না কেন বাদলদার কাছে?”

“সে কৈফিয়ত তোকে দেব না। যা বলার বাদলদাকে বলব। বাদলদাকে গিয়ে বল, দশটা নাগাদ আমি যাব বাদলদার অফিসে।”

পিন্টু, তপনের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল তাকিয়ে। তার পর কোনও কথা না বলে, পিছন ঘুরে বাইকে উঠে পড়ল।

বাদলের ঘর ফাঁকাই ছিল। কেউ আসেনি তখনও পর্যন্ত। ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সিগারেটের কটু গন্ধ।

“কী রে, তুই আর আসছিস না কেন?”

থমথমে মুখে বাদল প্রশ্ন করল তপনকে।

“আমি আর কিছু করব না। কোনও কাজই নয়। আমার আর ভাল লাগছে না। আমি আগেও এক বার বলেছি তোমায়। আমার আর এ সব কাজ করার ইচ্ছে নেই,” তপন মাথা নিচু করে বলল।

“ভাল লাগছে না? কী ভাল লাগছে না?” বাদল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

“এই পার্টি-পলিটিক্স, প্রোমোটরি এ সব কিছুই আর করব না।”

“তুই কী লাখখোর ছেলে রে! তোকে আমি রাস্তা থেকে তুলে এনে দাঁড় করলাম। আজ তুই বিশাল টাকার মালিক হয়েছিস! আর এখন বলছিস এ সব ভাল লাগছে না! এ ভাবে সব কিছু ছাড়া যায় নাকি!”

বাদলের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল তপন। আজ এত বছরে এই প্রথম তপনকে রাগতে দেখা গেল বাদলের সামনে, “বাদলদা, জীবনটা আমার। সে জীবন আমি কী ভাবে কাটাব না কাটাব, সেটা আমার মজি। তুমি এখানে আমাকে বাধ্য করতে পারো না।”

বাদল অপলক তাকিয়ে রইল তপনের দিকে। তার পর বসে পড়ল চেয়ারে। বাদলের চোখমুখ রাগে থমথম করছে। বলল, “এটা ই তোর ফাইনাল সিদ্ধান্ত?”

“একদম।”

কিছুক্ষণ চুপ করে নিজেকে সামলাল বাদল। যে-কোনও বিষয়ে খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে সে। চোখমুখ যথাসম্ভব স্বাভাবিক করে বলল, “ঠিক আছে। তোর যা ভাল মনে হয় তাই কর। যা, তোকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমার একটা শেষ অনুরোধ রাখবি?”

“কী?” ছোট করে বলল তপন।

“তোকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। তবে আমার শেষ একটা কাজ করে দে। তার পর তুই তোর নিজের মতো করে জীবন কাটা।

সেখানে আমার কিছু বলার নেই। কাল রাত ন'টার সময় মনোজিৎ বালা দশ লাখ টাকা দিতে আসবে আমাদের কাছে। সেটা একটু ঝট্টুর সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। বালা আমার এখানে আসবে না। কারণ, এখানে তখন সবাই থাকবে। ও আসবে চরার মাঠে। ওই সময় ওখানটা ফাঁকাই থাকে। কেউ দেখতে পাবে না। এই কাজগুলো তো তুই আর ঝট্টুই এত দিন করেছিস! এই মুহূর্তে আর কেউ নেই, যাকে এই দায়িত্ব দিতে পারি। এই শেষ কাজটা করে দে। তার পর তুই একেবারে মুক্ত। নিজের ইচ্ছেমতো থাকবি। কিন্তু এটা করে দে শেষ বারের মতো।”

“ঠিক আছে। এ বারই শেষ। ঝট্টুকে বলবে, আমি পৌনে ন'টা নাগাদ কেষ্টর চায়ের দোকানে থাকব।”

তপন আর কথা না বাড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। তার পর বাইকে স্টাঁট দিল।

তপন বেরিয়ে যাওয়া মাত্র বাদল তার সব খারাপ কাজের সঙ্গী, শার্প শুটার ঝট্টুকে

ফোন করল। বলল, “এফুনি আমার কাছে আয় ঝট্টু। জরুরি দরকার।”

মিনিট দশেকের মধ্যে ঝট্টু এসে ঢুকল বাদলের ঘরে।

“বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দে,” থমথমে মুখে বলল বাদল।

ঘরের একেবারে কোণে যে-আলমারিটা আছে সেটা খুলল বাদল। তার পর লকার খুলে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসনের পয়েন্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের একটা রিভলভার বের করল। চেষ্টার খুলে দেখ নিল ছটা গুলি আছে কি না। তার পর ঝট্টুর হাতে দিয়ে বলল, “এটা রাখ। তপন আমাদের পার্টি ছেড়ে দিচ্ছে। প্রোমোটরিও। মানে, আমাদের সঙ্গে ওর আর কোনও সম্পর্ক রইল না। পার্টির এবং আমার অনেক গোপন ব্যাপার জানে ও। এমন কিছু বিষয় আছে, যেগুলো ও আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। সেগুলো বাইরে প্রকাশ হয়ে গেলে ভয়ানক বিপদে পড়ে যাব আমি। জানি, তপন তোর খুব ঘনিষ্ঠ। কিন্তু কিছু করার নেই। কাল রাতেই হারামিটাকে টপকে দিতে হবে। গ্ল্যানটা তোকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ভাল করে শোন...”

এর পর বাদলদা যা যা বলল, ঝট্টুর কানে ঢুকলেও মাথায় ঢুকল না। বাদলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছেলে ঝট্টু এর আগেও বাদলের হয়ে দু'জনকে খুন করেছিল। পুলিশ কোনও প্রমাণ পায়নি। কিন্তু এই কাজটা ঝট্টু করতে পারবে না। তপনের সেই উপকারের কথা এখনও মনে রেখেছে ঝট্টু। কয়েক বছর আগে ঝট্টুর বৌয়ের ক্যানসার ধরা পড়ার পর অপারেশন থেকে শুরু করে যাবতীয় খরচ সব তপনই করেছে। কয়েক লক্ষ টাকা তো বটেই। সেই টাকা এখনও পর্যন্ত তপন চায়নি ঝট্টুর কাছে।

সেই রাতেই তপনকে বাদলের সব গ্ল্যান বলে দিল ঝট্টু। তপন কিছু ক্ষণ ভাবল, তার পর বলল, “তুই একটা কাজ কর, কাল সকালে বাদলদাকে বল, ফুড পয়জন্স হয়ে গেছে তোর। বার বার পায়খানা আর বমি হচ্ছে। সঙ্গে জ্বরও রয়েছে। তুই বেরোতে পারবি না বাড়ি থেকে।”

ঝট্টু একটু অবাক হল তপনের কথা শুনে। বলল, “কিন্তু তাতে কী হবে?”

তপন হাসল, “ওস্তাদের মার শেষ রাতে— কথাটা শুনেছিস?”

“হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু...”

“তোকে আর কিছু ভাবতে হবে না। যা, বাড়ি যা, আর যে রকম বললাম, করিস। তোর এই উপকারের কথা কোনও দিন ভুলব না।”

পরদিন বেলা দশটা নাগাদ তপনকে ফোন করল ঝট্টু। বলল, “শোন তপন, এইমাত্র বাদলদার সঙ্গে ফোনে কথা হল। বাদলদাকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি যে, আমি যেতে পারছি না আজ। বাধ্য হয়ে বাদলদা গ্ল্যান পাল্টেছে। এই কাজের দায়িত্ব আমি ছাড়া আর কাউকে

দেবে না বাদলদা। তাই বাদলদা তাকে একাই যেতে বলবে চরার মাঠে। কাজটা বাদলদা নিজেই করবে। তাই বাদলদা অনেকটা আগে থেকেই ওখানে ঝোপের আড়ালে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকবে। তুই আসামাত্র গুলি করবে তোকে। সব বলে রাখলাম। আজ আর বাড়ি থেকে বেরোস না যেন।”

তপন হাসল, বলল, “আমি জানতাম, ঠিক এটাই হবে।”

এর ঠিক আধঘণ্টা পরেই বাদলের ফোন এল। বাদল বলল, “তপন, একটা সমস্যা হয়েছে। বাস্তু হঠাৎই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ও যেতে পারবে না তোর সঙ্গে। তোকে একাই যেতে হবে চরার মাঠে। যাবি আর টাকাটা নিয়ে চলে আসবি। এটাই তোর শেষ কাজ। করে দে ভাই।”

তপন হাসল মনে মনে। বলল, “ঠিক আছে তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমি ঠিক সময়ে টাকা এনে তোমাকে দিয়ে দেব। শেষ কাজটা ভাল ভাবেই করব বাদলদা।”

একটু পরে জামা-প্যান্ট পরে বাড়ি থেকে বেরোল তপন। কেব্রের চায়ের দোকানে এসে সলিলকে ফোন করল। বলল, “এক বার কেব্রদার চায়ের দোকানে আয়। খুব দরকার।”

কিছুক্ষণের মধ্যেই সলিল চলে এল সাইকেলে চেপে।

তপন সলিলের হাত ধরে বলল, “ভাই,

তোর বোনের বিয়ের জন্য যে তিন লাখ টাকার কথা বলেছিলি, সেটার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আজকেই। আজ একটা পার্টি টাকা দিতে আসবে আমাদের। তার থেকেই তোকে দিয়ে দিতে পারব।”

সলিলের চোখ চকচক করে উঠল, “আজই দিবি?”

“হ্যাঁ, কেন নয়? পার্টি পেমেন্ট করবে সাড়ে তিন লাখ টাকা। তার থেকে তিন লাখ নিয়ে নিস তুই।”

“বাঃ, খুব ভাল হয় তা হলে।”

তপন বলল, “তুই একটা কাজ কর, আজ সঙ্গে সাড়ে সাতটা নাগাদ আমার সঙ্গে চল। লোকটা চরার মাঠে আসবে। হাতে হাতে টাকা দিয়ে দেবে। তখনই নিয়ে নিস টাকাটা।”

“চরার মাঠে কেন? সে তো এখান থেকে অনেকটা দূরে!” সলিল অবাক হল।

“ব্যাপারটা সিক্রেট। বাদলদা যেন না জানতে পারে। তা হলে ওকেও ভাগ দিতে হবে। সেই জন্যই বেছে নিয়েছি জায়গাটা— চরার মাঠ। রাতে ওখানটা একেবারে ফাঁকাই থাকে। কেউ ও দিকে ঘেঁষে না।”

“ঠিক, ঠিক। ঠিক বলেছিস। প্রত্যেক বার বাদলদাকে ভাগ দিতে হবে কেন?”

তপন বলল, “আমার নীতি হল সব সময় অপরকে ভাগ দিয়ে খেতে নেই, মাঝে মাঝে পুরোটাই নিজেকে খেতে হয়, হাঃ হাঃ।”

সন্ধ্যাবেলা ঘরের লুকোনো জায়গা থেকে ওয়েবলি স্কটের রিভলভারটা বের করল তপন। ছ’টা গুলি ভরে নিল চেম্বারে। আরও ছ’টা গুলি নিল সঙ্গে। তার পর কোমরে গুঁজে নিল রিভলভারটা। এই আগ্নেয়াস্ত্রটা ওকে বাদলদা দিয়েছিল, গুলিও। কোনও দিন এটা কাজে লাগানোর প্রয়োজন হয়নি।

তবে আজ এটা কাজে লাগবে। খুবই।

পরদিন ভোরবেলা চরার মাঠে প্রাতঃকৃত্য করতে আসা এক জন লোক বাদল আর সলিলের ডেডবডি পড়ে থাকতে দেখে সকলকে খবর দেয়। দু’জনের শরীর একে অপরের চেয়ে অনেকটাই দূরে পড়ে ছিল। মাঠের ধারে ঝোপের আড়ালে পড়ে থাকা বাদলের শরীর গুলিতে প্রায় ঝাঁঝা হয়ে গিয়েছিল। বাদলের মতো মানুষের এ রকম পরিণতি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

কিন্তু সলিল, যাকে বলা যেতে পারে একেবারে অজাতশত্রু, তাকে কে এ ভাবে মারতে পারে— ভেবে আশ্চর্য হল সবাই। পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছে সলিলকে। কপালে দুটো, বুকে আর পেটে দুটো করে। তার শরীরটা পড়েছিল মাঠের একেবারে মাঝখানে।

শিল্পী: সৌমেন দাস



দা লিটল বোট, শিল্পী: মুকুল দে

সৌজন্য: অনুরাধা ঘোষ ও শমীন্দ্রনাথ মজুমদার

উপন্যাস

কে ভাসালে নৌকাখানি

অভিনন্দন সরকার



১০/১১/২০



মুঙ্গেরিলাল ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে।
ঘন ঘন ঘড়ি দেখা উৎকণ্ঠার লক্ষণ। যাঁরা ভীষণ কাজের মানুষ, হরেক
ব্যস্ততায় যাঁদের নান্দিশ্বাস ওঠার উপক্রম, যাঁদের মনে হয় দিনটা
চব্বিশ ঘণ্টার না হয়ে আটচল্লিশ ঘণ্টার হলে ভাল হত, তাঁদেরই ঘন
ঘন ঘড়ি দেখতে হয়। মুঙ্গেরিলাল তাঁদের দলে পড়ে না। কাজের চাপ
তার প্রায় নেই বললেই চলে। তবুও সে ঘনঘন ঘড়ি দেখছে আর উসখুস করছে।

অশান্ত মানসিক অবস্থায় পায়চারি করলে কিছুটা আরাম পাওয়া যায়। অথচ
মুঙ্গেরিলাল চাইলেও হট করে উঠে যেতে পারছে না। কারণ, জোনাকি নামের
একটি মেয়ে মুঙ্গেরিলালের সামনে উঠোনে থেবড়ে বসে আছে। তার মুখেচোখে
সামান্য অসন্তোষ। কিছু ক্ষণ আগে সে মুঙ্গেরিলালের জন্য বাটিতে করে বেগুনি
নিয়ে এসেছে। বেগুনি মিইয়ে যেতে বসেছে, অথচ মুঙ্গেরিলালের হাঁশ নেই।

জোনাকি ভার গলায় বলল, “মুঙ্গেরিবুড়ো, সাধ করে বেগুনি নিয়ে এলাম।
মুখে তুলে দেখো! তেলেভাজা কি রেখে রেখে খাওয়ার জিনিস! তেলেভাজা
খেতে হয় আগুন-গরম, মুখে দেওয়ার পর হাঁ করে ধোঁয়া ছেড়ে ছেড়ে...”

“সে তো বুঝলাম। लेकिन এই বয়সে অত গরম সহ্য হয় না রে বিটিয়া!”

মুখে এই কথা বললেও মুঙ্গেরিলাল বেগুনি তুলে মুখে দিল। নড়বড়ে
দাঁত আর মাড়ি দিয়েই চিবোচ্ছে তেলেভাজা, চোখ বন্ধ। একটু পরে সে
বলল, “কেয়াবাত জোনাকি! তোর হাতে তো জাদু আছে রে পাগলি!”

জোনাকি উচ্ছল হয়ে উঠল, “থ্যাঙ্ক মুঙ্গেরিবুড়ো, থ্যাঙ্ক ভেরি
ভেরি মাচ!”

মুঙ্গেরিলাল চোখ বড় করে বলল, “হায় রাম! আবার আংরেজি!”

“অবশ্যই আংরেজি, একশো বার আংরেজি। কত বড় কাজ
করলে তা যদি জানতে মুঙ্গেরি বুড়ো! ছোট দাদাবাবু বলেন,
বিলেতে চা টেস্ট করার, মাল টেস্ট করার জন্য মাইনে দিয়ে
লোক রাখা হয়, তাদের কী বলে জানো? টি টেস্টার...

ওয়াইন টেস্টার। সে রকমই তুমি হচ্ছে আমার বেগুনি
টেস্টার। তাও আবার ফ্রি-তে। ওই গরম বেগুনিই
তোমার বেতন।”

দ্বিতীয় বেগুনি চিবোতে চিবোতে আবার ঘড়ি
দেখল মুঙ্গেরিলাল। এই মেয়ে তাড়াতাড়ি বিদায়
নিলে সে খুব খুশি হয়।

জোনাকি তেমন কোনও লক্ষণ দেখাচ্ছে না।
বরং সে হাসি মুখে সরে এল মুঙ্গেরিলালের কাছে,
তার পর নিচু গলায় বলল, “এই মুঙ্গেরিবুড়ো,
তোমার লাভস্টোরিটা আর এক বার শোনাও
না গো।”

মুঙ্গেরিলাল এ বার চিড়বিড়িয়ে উঠল, “যা
তো এখান থেকে! হর রোজ এক কথা। রঙের
বয়স তোর থাকতে পারে, আমার নেই। কামকাজ
কর গিয়ে, যা।”

জোনাকি খিলখিলিয়ে হাসল, ওই প্রসঙ্গ এলেই
বুড়োটার ভাঙাচোরা গালেও যেন আবিঁর-আবিঁর ভাব
আসে। লাজুক মুখে গল্পটা শুরু করে তার পর। কিন্তু
প্রতিবারই একটা বিশেষ জায়গায় এসে গল্প বলা
থামিয়ে দেয় মুঙ্গেরিলাল।

এত দিন কম চেষ্টা তো করল না জোনাকি।
বাবা-বাছা বলে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে,
এমনকি চোটপাট করতে পর্যন্ত বাকি রাখেনি
জোনাকি, কিন্তু শত অনুরোধেও আর একটুও
এগোয় না গল্প।

জোনাকি শুধু জানতে পেরেছে সমস্তপুরে

সেই যুবক বয়স থেকেই একটা মেয়ের সঙ্গে আশনাই ছিল মুঙ্গেরিলালের। যেমন তেমন আশনাই নয়, যাকে বলে একেবারে আকাশপাতাল ভালবাসা। তবে শেষমেশ সব ভালবাসা তো আর বিয়ে অবধি গড়ায় না, আকাশপাতাল ভালবাসা তো একেবারেই না।

মেয়েটার নাকি বিয়ে হয়ে যায় কলকাতা শহরে। সেই বিয়ে সুখের হয়নি। সমস্তিপুরে বসেই মুঙ্গেরিলাল খবর পায় স্বশ্রববাড়ির অত্যাচারে নাকি সেই মেয়েকে ঘর ছাড়তে হয়েছিল। মেয়েটার বাপ এ দিকে দারুণ কঠিন মেজাজের। শ্বশুরাল থেকে পালানো মেয়েকে বাড়িতে জায়গা দিলে বিরাদির লোকদের তিনি মুখ দেখাবেন কী করে?

তাই শেষমেশ ঘরে ফেরা হয় না মেয়েটার। বেচারা মুঙ্গেরিলাল এ দিকে প্রেমিকার বিরহের সঙ্গে সবে ধাতস্থ হচ্ছিল, কিন্তু তারও তো ছিল সাচ্চা প্রেম। এই খবরে কি সে চুপ করে বসে থাকতে পারত? সুতরাং মেয়েটার খোঁজে এক সুন্দর সকালে সমস্তিপুর থেকে কলকাতার ট্রেনে চেপে বসে মুঙ্গেরিলাল।

ব্যস, এটুকুই।

এইখানেই বারবার নানা বাহানায় থেমে যায় মুঙ্গেরিলাল।

হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল জোনাকি, “দাঁড়াও বুড়ো। আজ ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমায় চেনো না। এক দিন তোমার পেট থেকে তোমার লাভস্টোরি যদি বার না করেছি তো আমার নামও জোনাকি নয়।”

জোনাকি এখন যাবে বাড়ির অন্য প্রান্তে। সেখানে সম্প্রতি সে নিজের হোম ডেলিভারি খুলেছে।

এই বাড়ির নাম সোনার তরী। বাড়ির মালকিন মহাশ্বেতা রুদ্র। ডাকসাইটে মহিলা। বয়স আশি পেরিয়েছে কিন্তু পুরনো দাপট এখনও তাঁকে ছেড়ে যায়নি। তাঁরই দৌলতে জোনাকি এই পরিবারের এক জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। পাঁচ জনের পরিবার, তাদের রান্না, কাপড় কাচা আর এই প্রকাণ্ড বাড়ি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা... খুবই পরিশ্রমের কাজ। এই কাজ জোনাকি করে খুবই সহজে। সোনার তরী-র সব কাজ সামলেও তাই সে নিজের হোম ডেলিভারির ব্যবসাটা দাঁড় করাতে পেরেছে।

একবেলার কাজ। বিকেল থেকে রান্নাবান্নায় ব্যস্ত হয়ে থাকে জোনাকি। সহজ সরল মেনু, তিনরকমের মিল— ভেজ, এগ আর চিকেন। মিল না নিতে চাইলে হাতে গড়া রুটি আর তিন রকমের তরকারির মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া যেতে পারে।

এই হোম ডেলিভারি মহাশ্বেতা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বানিয়ে দিয়েছেন জোনাকিকে, বাড়ির সামনের কিছুটা অংশ ছেড়ে দিয়ে। জোনাকির কৃতজ্ঞতার বেশ নেই। এই বাড়ির জন্য, এই পরিবারের জন্য তার জ্ঞান কবুল। মহাশ্বেতার পাশাপাশি তাই তাঁর ছেলে, বোমা আর নাতি-নাতনির প্রতিও প্রগাঢ় আত্মীয়তা অনুভব করে জোনাকি। বুড়ো দারোয়ান মুঙ্গেরিলালের সঙ্গেও এক অদ্ভুত বন্ধনে জড়িয়ে গেছে সে।

এমন মালকিন পেলে, এমন চমৎকার কাজের পরিবেশ পেলে আর এমন রমরমিয়ে চলা হোম ডেলিভারির ব্যবসা পেলে যে কোনও মেয়ের মন ফুরফুরে থাকার কথা। তবু মাঝে মাঝে সব অর্থহীন লাগে জোনাকির কাছে। কারণ, ভদকাই।

ভদকাই জোনাকির বিয়ে করা বর। আড়াই বছর আগে যখন দত্তাবাদ বস্তির ভদকাইয়ের সঙ্গে জোনাকির বাবা তার বিয়ে ঠিক করে, তখন জোনাকি জানত সেই ছেলে টোটো চালায়। তা বলতে নেই বিয়ের পরে ভদকাইয়ের সঙ্গে গোলাপি রঙের কয়েকটা দিন মন্দ কাটায়নি জোনাকি।

কাজে বেরনোর সময় টোটো নিয়ে বস্তির মোড়ে দু’বার চক্রর কাটত ভদকাই। কলার তোলা ভদকাই, চোখে ঘন কালো রোদচশমা পরা ভদকাই, পুরু গোঁফ আর লক্কা পায়রার লেজের মতো ঘাড় ছাপানো তার চুল। শেষ চক্রর কাটার সময় টোটো দু’আঙুল ঝুঁইয়ে উড়ন্ত চুমু ছুঁত জোনাকির দিকে আর তার পর হুশ করে বেরিয়ে যেত ভাড়া খাটতে। তাকে দেখাত যুবক বয়সের অভিনেতা অনিল কপুরের মতো। ভাল লাগায় একটা বিবশ ভাব নামত জোনাকির শরীর বেয়ে।

ভদকাই স্বরূপ দেখাল বিয়ের বছর ঘোরার পর। জানা গেল ভদকাইয়ের চরিত্রের হাজার গোষ। হেন নেশাভাঙ নেই যা সে করে না। বিয়ের পর পর জোনাকির নেশায় ক’দিন একটু চাপা ছিল, বৌ একটু

পুরনো হতেই পুরনো নেশারা ফের চাগাড় দিয়ে উঠল। এটুকু অবশ্য মানিয়ে নিত জোনাকি, আর তা ছাড়া মেনিমুখো ব্যাটাছেলে তার পছন্দও নয়। মাঝে মাঝে বাসায় ফিরবে চোখ লাল করে, খাবারে নুন কম হলে কষে ধমক লাগাবে বৌকে, মুখে মুখে কথা বললে ঠাট্টিয়ে চড় কষাবে। ব্যাটাছেলের হাতের চড়, ঘণ্টাভর মাথা ঝিমঝিম করবে জোনাকির। আবার নেশা কমে গেলে গায়ে জড়াবে পোষা বেড়ালের মতো, আদরে আদরে ভরিয়ে দেবে জোনাকিকে... তবে না পুরুষ মানুষ!

ঘটনা এত সহজ ছিল না। ভদকাইয়ের শুধু নেশাভাঙ নয়, মেয়েমানুষের দোষও আছে। খারাপ পাড়ায় প্রায় নিত্য যাতায়াত। একটা কুখ্যাত অ্যান্টিসোশ্যাল গ্যাং-এর নাকি সে সদস্য, তাদের সঙ্গে মিশে চুরি, ছিনতাই, রাহাজানিতেও নাকি ভালই হাত পাকিয়েছে ভদকাই।

ইদানীং একটা বাজে কেস-এ ফেঁসে ভদকাই গা ঢাকা দিয়ে আছে। থানা থেকে এসে ভদকাইকে না পেয়ে জোনাকিকেই তুলে নিয়ে গেছিল। মেয়ে কনস্টেবলটা অবশ্য লোক খারাপ না। মামুলি জিজ্ঞাসাবাদ আর চুলের মুঠি ধরে কয়েকটা চড় চাপড় দেওয়া ছাড়া আর কিছু বলেনি। শুধু ছেড়ে দেওয়ার আগে শীতল স্বরে বলেছিল, “শোন! খানকির ছেলেরা যদি কোনও ভাবে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে, আমাদের জানাবি সঙ্গে সঙ্গে। কথাটা মনে রাখিস। না হলে এই ডাভা দেখছিস তো। বারো মাস তেল মাখানো থাকে। যা পাল।”

থানা থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে পথ হাঁটছিল জোনাকি। অন্ধকারেই একটা অসহায় রাগে চোখে জল এসে গেছিল তার। কাঁদতে কাঁদতেই অবাক হয়েছিল জোনাকি। সে আবিষ্কার করেছিল এই কান্না তার নিজের অপমান বা লাঞ্ছনার জন্য আসছে না। তার সামনে ভদকাইকে খিস্তি দিল ওই মেয়েছেলে পুলিশটা, অথচ সে কিছু করতে পারল না। হত তাদের খালপাড় বস্তির কোনও মাগ, খাল খিঁচে নিত জোনাকি।

ভদকাই ফিরে আসেনি। জোনাকিও এক সময় বস্তির ঘর ছেড়ে সোনার তরী-তে সর্বক্ষণের কাজের লোক হয়ে গেছে। আর এখন তো তার নিজের হোম ডেলিভারিও আছে। শুধু ভদকাই যদি তাকে ভালবাসত, খারাপ লাইন ছেড়ে ভদ্রলোক হয়ে যেত... তার সঙ্গে বস্তির ঘরে কাটানো দশটা মাস কুহক মায়ায় বার বার পিছু ডাকে জোনাকিকে।

সোনার তরী-তে ধীরে ধীরে মন বসে গেছে জোনাকির। মানুষ নতুন জগতে মানিয়ে নেওয়ার পর সেই জগতের সব কিছুই তার অভ্যাস হয়ে যায়। জোনাকিরও এই প্রকাণ্ড বাড়ির সব কিছু আজকাল বড় চেনা চেনা মনে হয়। শুধু সম্প্রতি একটা ছোট্ট কাঁটা তার মনে ফুটে আছে, একটা অজানা অস্বস্তি। কাঁটা ছোট হলে কী হবে, অস্বস্তিটা বড়সড়, বেশে ভোগাচ্ছে জোনাকিকে। কয়েক দিন ব্যাপারটা লক্ষ্য করার পর জোনাকি সিদ্ধান্ত নিল এই বিষয়ে সে কারও সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু কার সঙ্গে?

মহাশ্বেতার সামনে এমন তরল বিষয় উত্থাপন করা যাবে না, মহাশ্বেতার ছেলে প্রভঞ্জন উদ্বায়ী প্যাটার্নের লোক, তাঁর সঙ্গে কথা বললে সুবিধে হওয়ার সম্ভাবনা কম, প্রভঞ্জনের স্ত্রী মঞ্জুষা নাটুকে মহিলা, হয়তো টেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় করবে। প্রভঞ্জনের মেয়ে বিদিশাকে বলা যেত, কিন্তু সে কলেজের এক্সক্যারশনে কলকাতার বাইরে।

অগত্যা প্রভঞ্জনের ছেলে সাগরনীলকে পাকড়াও করল জোনাকি। সাগরনীল বেশ কয়েক বছর হল এমএস পাশ করেছে। সে টেবিলে ‘বেলি অ্যান্ড লাভ’-এর সার্জারি বইয়ে মুখ গুঁজে বসে ছিল।

জোনাকি সাগরের ঘরের চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল, “ছোড়দাবাবু, একটা কথা ছিল।”

সাগর বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, “বলে ফেল।”

জোনাকি বেশ কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, “ছোড়দাবাবু, এই বাড়িতে কিছু একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে বলে মনে হয় না আপনার?”

“কিছু একটা নয়, এই বাড়ির গোটা ব্যাপারটাই আমার অস্বাভাবিক মনে হয়। আর প্রতিটি মানুষকে অ্যাবনর্মাল... ইনক্লুডিং ইউ।”

জোনাকি হাসার চেষ্টা করে, “হে হে, কী যে বলেন দাদাবাবু। ওই যে পিছন দিকের যে টানা বারান্দা, সেখানে গেলে আপনি গায়ের ভিতর কিছু ফিল করেন না?”

সাগর এ বার বই থেকে মুখ তোলে, কিছু ক্ষণ এক দৃষ্টে জোনাকির

দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, “হুম। ফিল করি তো। পশ্চিম দিকের ওই নিমগাছটা আছে না? ফার্স্ট ক্লাস হাওয়া দেয় বিকেলের দিকে।”

জোনাকি এ বার একটু এগিয়ে আসে, “দাদাবাবু, আপনি বুঝতে পারছেন না। যখনই বারান্দায় যাই, গায়ে কেমন শিরশির করে, যেন খুব কাছে কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে, যেন কেউ কিছু বলতে চাইছে আমাকে...”

ঘটনা হল, বিচিত্র এই অভিজ্ঞতা সাগরেরও হয়েছে। পশ্চিমের বারান্দায় মাঝে মাঝেই এমন আশ্চর্য বাতাস চলে, মনে হয় কেউ গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এই মানসিক দুর্বলতাকে জোনাকির মতো মেয়ে প্রশ্রয় দিতে পারে, এক জন সার্জেন কেন দেবে?

সাগর চোখ সরিয়ে নিয়ে বলে, “রাত্রে ঘুম হয়?”

জোনাকি ক্ষীণ স্বরে বলেছিল, “ওই আর কি!” ভদকাইয়ের চিন্তা যখন আসে, সেই রাতগুলো তার এক রকম বিনীত কাটে, এই কথা কি ছোট দাদাবাবুকে বলা যায়?

“হজম হচ্ছে ঠিকমতো? খাটাখাটনি বেশি করে ফেলছিস না তো?”

এই কথার উত্তর জোনাকি সময় নিয়ে দিতে থাকে। তার কথা ফুরায় না, সাগর তার হাতে একটা কাগজের টুকরো ধরিয়ে দেয়, “মোড়ের মাথার লোকনাথ মেডিকেল থেকে আমার নাম করে এই ওষুধটা নিয়ে আয়। রাত্রে শোওয়ার আগে দশ দিন খাবি। তোর ওই শিরশির লাগা-টাগা সব হাওয়া হয়ে যাবে। এ বার যা, লেখাপড়া করতে দো!”

জোনাকি মানে মানে সবে এসেছে। ওষুধ খেয়েছে নিষ্ঠাভরে। সেই ওষুধ কাজ দেয়নি। সমস্যা প্রায় রোজই বেড়ে চলেছে। আজকাল সন্দের আগে পশ্চিমের বারান্দার সব কাজ সেবে নেয় জোনাকি।

এই মুহূর্তে যেমন, সন্দের নামার আগে সোনার তরী-র দিকে তাকিয়ে অকারণেই গা ছমছম করে উঠল জোনাকির।

জোনাকি চলে যাওয়ার পরে উঠে দাঁড়াল মুঙ্গেরিলালও। তার পরনে চলচলে কালচে নীল ট্রাউজার্স, হালকা আকাশি নীল জামা, জামার বুকের কাছে হলুদ সুতো দিয়ে ইংরেজিতে লেখা, ‘সিকিওরিটি’। অর্থাৎ নিরাপত্তা। সোনার তরী-র নিরাপত্তা দেখার দায়িত্ব গত কয়েক বছর ধরে মুঙ্গেরিলালের উপর ন্যস্ত। তবে এই মুহূর্তে তাকে দেখে মনে হচ্ছে, অন্য কেউ তার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিলে ভাল হয়। ক্ষয়াটে দেহে জামা চলচল করছে, পাকানো দড়ির মতো চেহারা, হাঁটুতে ক্ষয়রোগ, হাঁটতে চলতে ব্যথা, সামান্য ক্রেশে খুকখুক করে কেশে ওঠে মুঙ্গেরিলাল। পালতোলা নৌকোর মতো দুলে দুলে হাঁটে।

এই বাড়ির গ্যারাজে আগে একটা নয়, তিন তিনখানা গাড়ি ছিল। এখন অবস্থা পড়েছে। শূন্য গ্যারাজে আস্তানা গেড়েছে মুঙ্গেরিলাল। গত কয়েক দশকে সোনার তরীর অধঃপতনের গল্পই বেশি, তারই মধ্যে সোনালি রেখা বলতে গাড়িবারান্দার শেষ প্রান্তে এই মন্দির, আর মন্দিরের দেবীমূর্তি প্রায় এক হাত লম্বা খাঁটি সোনার মূর্তি পদ্মফুলের উপর বস। দ্বিভুজ। এক হাতে আশীর্বাদের ভঙ্গি, অন্য হাতে একটি পদ্মফুল। মুখে হাসি। কেউ বলেন দেবী লক্ষ্মী, কেউ বলেন মা মঙ্গলা। আশপাশের এলাকায় জাগ্রত মন্দির বলে নামডাক হয়েছে এই মন্দিরের।

সন্দের দিকে মন্দিরের ঘণ্টা বেজেই চলেছে। দর্শনার্থীর ভিড়ে মন্দিরপ্রাঙ্গণ জমজমাট। পূজো দেওয়ার লাইনের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মুঙ্গেরিলাল নিয়মমাফিক গলা তুলে বলল, “মন্দিরের বিগ্রহের সামনে কেউ প্রণামী দিবেন না, প্রণামী দিবেন বাজের মধ্যে। ফুল বেলপাতা মিঠাইউঠাই সব মন্দিরের অন্দর, কিন্তু দিয়া আর আগরবাতি লিয়ে মন্দিরে ঢুকবেন না, বোঝা গেছে কি না!”

ধীর পায়ে সে মন্দির পেরিয়ে চলে এল বাড়ির পিছন প্রান্তে। জায়গাটা বেশ নির্জন। এখানে কয়েকটা বড় বড় গাছ আর অযত্নে গজিয়ে ওঠা ঝোপঝাড় ছাড়া কিছু নেই। মুঙ্গেরিলাল মাথা উঁচু করে বাড়ির পিছনের দোতলার টানা বারান্দার দিকে তাকাল। অন্ধকার নেমেছে সন্দের পরে। বারান্দার একটা কোণে যেন আরও জমাট রহস্যময় আঁধার।

মুঙ্গেরিলালের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তার আসার সময় হয়ে এসেছে। অন্ধকার নামলেই সে মুঙ্গেরিলালের কাছে আসবে। মুঙ্গেরিলালের মন বলছে আজ সে আসবেই, আসতেই

হবে তাকে। দোতলার টানা বারান্দার জমাট বাঁধা অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফোকলা দাঁতে হেসে ফেলল মুঙ্গেরিলাল, ঘষা কাচের মতো চশমার পিছনে চোখ দুটো হঠাৎই উজ্জ্বল। বুড়ো মুঙ্গেরিলাল বিড়বিড় করল, “আয় অহল্যা, আয়...”

॥ ২ ॥

প্রভঞ্জন থমথমে গলায় বললেন, “চাকরিটা আমি ছেড়ে দিয়েছি।”

প্রভঞ্জনের বয়স আটাল। আর বছরদুয়েক পর তাঁর অবসর নেওয়ার কথা। যে কোনও চাকুরিজীবীর পক্ষে এই দু’বছর গুরুত্বপূর্ণ। শেষবেলায় বাকি জীবনের হিসেব গুছিয়ে নিতে হয়। সেইমতো সঞ্চয়, বিনিয়োগ, খরচের পরিকল্পনা... অথচ এখনই তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলেন!

স্বাভাবিক নিয়মে এই কথায় মঞ্জুষার আঁতকে ওঠা উচিত। শুধু আঁতকে উঠেই তিনি থামবেন না, বাড়ির প্রতিটি ঘরে গিয়ে প্রায় বিলাপের স্বরে এই খবর জনে জনে জানাতে থাকবেন। বাড়িতে তৈরি হবে শোকাবহ পরিস্থিতি। অতিনাটকীয়তা মঞ্জুষার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মেয়ে ক্লাস টেস্টে দু’নম্বর কম পেলে অথবা ছেলে বৃষ্টিতে ভিজে বাড়ি ফিরলে পর্যন্ত তিনি তুলকালাম করতেন। গত মাসে পাশের বাড়ির মিনতির মা মারা গেলেন। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে মঞ্জুষা নিজেই কাতর হয়ে পড়লেন সবচেয়ে বেশি। তাঁর স্মৃতিচারণা আর বিলাপের ঠেলায় শোকের বাড়ি জমজমাট। শেষমেশ মিনতিকেই বাধ্য হয়ে বলতে হল, “আপনি ভেঙে পড়বেন না কাকিমা। শক্ত হোন। এই দেখুন আমি কেমন সামলে নিয়েছি। বাবা মা কি কারও চিরদিন থাকে?”

এহেন মঞ্জুষা পর্যন্ত প্রভঞ্জনের কথা শুনে সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও দেখালেন না। মঞ্জুষার এই আচরণের নেপথ্যে কারণ আছে। কারণ এই নিয়ে একশতম বার চাকরি ছাড়লেন প্রভঞ্জন।

প্রথম বার খুব অবাক হয়েছিলেন মঞ্জুষা। বিয়ের বয়স তখন মাত্র কয়েক মাস। বাবু দিব্যি অফিস কাছারি করছেন। সকাল সকাল ধোপদুরন্ত শার্ট-প্যান্ট, চকচকে জুতো পরে বেরোচ্ছেন, ফিরতে সেই রাত আটটা। মাঝে মাঝে অফিসের বস, সহকর্মী আর ওয়ার্ক কালচারের ভূয়সী প্রশংসা করছেন মঞ্জুষার কাছে। সেই লোক এক দিন বাড়ি ফিরে নির্বিকার বলে দিলেন, “চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি মঞ্জু।”

নতুন বৌ, খবরের কাগজ দেখে বিয়ে, কাগজের বিজ্ঞাপনে এই চাকরিরই উল্লেখ ছিল ফলাও করে। রমরমা ফরাসি কোম্পানির চাকরি দেখেই তো আর অন্য জায়গায় খোঁজখবর করেননি মঞ্জুষার বাবা। সেই চাকরি কেউ এ ভাবে হেলায় ছেড়ে দিয়ে আসে!

বিস্মিত মঞ্জুষা কিছু বলে উঠতে পারেননি, কিন্তু তাঁর মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়েছিল। প্রভঞ্জন নতুন বোয়ের থুতনিতে হাত দিয়ে আদর করে বলেছিলেন, “ঘাবড়ে যেয়ো না, প্রভঞ্জন রত্নর বোয়ের এত ছোটখাটো ঘটনায় ঘাবড়ালে চলে! একটা ছাড়ব আর একটা ধরব, তবে না উন্নতি!”

কথাটা প্রভঞ্জন বিশেষ ভুল বলেননি। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি আর একটি চাকরি জুটিয়ে নিলেন। সেই চাকরিও বছর খানেকের বেশি টিকল না। বলা ভাল, সেই চাকরিতে প্রভঞ্জন নিজেই টিকলেন না। তখন মোবাইল ফোনের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়নি, বাড়ির ল্যান্ডফোনেই মায়ের সঙ্গে কথা বলার সময় যথেষ্ট বিলাপ করলেন মঞ্জুষা। আবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন চাকরি জুটিয়ে ফেললেন প্রভঞ্জন।

এরই মধ্যে প্রভঞ্জনের বাবা মারা গেলেন, মঞ্জুষার কোল জুড়ে সাগরনীল এল, কয়েক বছর পরে এসে গেল বিদিশাও। সব মিলিয়ে ভরা সংসার। দেখা যায় বাউন্ডুলে পুরুষের মাথার উপর থেকে বাবার ছায়া চলে গেলে সে ঘরমুখো হয়ে যায়, পিতৃত্ব পেলে সংসারী হওয়াও বিরল ঘটনা নয়। দেখা গেল প্রভঞ্জন এই নিয়মের ব্যতিক্রম। ক্রমাগত চাকরি ধরা আর ছাড়ার এই প্রক্রিয়া তিনি সমানে বজায় রেখে গেলেন।

বিষয়টা অস্বস্তিকর, কারণ যে সময়টা প্রভঞ্জন কর্মহীন থাকতেন সেই দিনগুলোয় তিনি হয়ে উঠতেন প্রচণ্ড বেখেয়ালি। সকালে ওঠার ঠিক নেই, নাওয়া খাওয়ার ঠিক নেই, এক বার বাড়ি থেকে বেরোলে ফেরার ঠিক নেই। সব মিলিয়ে এক বিচ্ছিন্ন অবস্থা। নিজের মনেই

শুন্মরে মরতেন মঞ্জুষা। এক দিন কাজের মাসি চম্পার মা গুজগুজ করে মঞ্জুষাকে বলল, “বংশের দোষ, বোঝালেন না বৌদিমণি। দাদাবাবুর বাবারও তো এই একই সমস্যা ছিল। মাঝে মাঝেই কাজ কাম ফালাইয়া বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াইতেন। দাদাবাবুর মা পিছন পিছন গিয়া তারে ঘরে লইয়া আইত। এই সব কথা আবার আপনার শাশুড়ির কইবেন না য্যান, আমার চাকরি লইয়া টানাটানি পইড়া যাব গিয়া।”

মঞ্জুষা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। শ্বশুরের অবর্তমানে সংসারে শাশুড়ির দাপট আরও বেড়েছে। আর তা ছাড়া সেই সময়ও চুটিয়ে প্র্যাকটিস করছেন মহাশ্বেতা। জেনারেল সার্জেন হিসেবে শহর জোড়া নাম। দৌদগুপ্রতাপ শাশুড়ির ব্যক্তিত্বের সামনে গুটিয়ে থাকতেন মঞ্জুষা। তাঁর মুখের উপর গিয়ে এই কথা জিজ্ঞেস করার সাহস মঞ্জুষার ছিল না।

সময় পাট্টেছে দ্রুত। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে। সাগরনীল এম এস পাস করা সার্জেন, বিদিশা ইকনমিক্স-এ মাস্টার্স করছে। মহাশ্বেতা আর মঞ্জুষার সম্পর্কেরও সেই প্রাথমিক সমীহের আড়াল কমে এসেছে, আজকাল বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শাশুড়ি-বৌমার কথা হয়, মতান্তর আর মনোমালিন্যও। মহাশ্বেতার দাপট থাকলেও বয়সের কামড় এড়াতে পারেননি, ফলে বাড়িতে মঞ্জুষার ছায়া এখন একটু হলেও দীর্ঘতর।

একশতম চাকরি ছাড়ার খবর পেয়ে মঞ্জুষা শীতল ভাবে বললেন, “কাল সাগরের খুব ভোরে বেরোনো। রাতে সাড়ে নটার মধ্যে খেতে দিয়ে দেওয়া হবে, তুমি ফ্রেশ হয়ে নাও।”

প্রভঞ্জন সামান্য ব্যথিত হলেন। এই যে তিনি চাকরি ছেড়ে চলে এলেন, মঞ্জুষার মধ্যে সামান্যতম হেলদোলও তো দেখলেন না। তিনি কি এতটাই অকিঞ্চিৎকর! বেশি বয়সের অভিমান বড় প্রখর হয়। খেতে যাওয়ার সময় পর্যন্ত প্রভঞ্জন বাড়ির কারও সঙ্গে কথা বললেন না।

মঞ্জুষার নিলিঙ্গি অবশ্য শুধুমাত্র প্রভঞ্জনের সামনেই। রাতে খাওয়ার টেবিলে যখন সবাই একসঙ্গে হল তত ক্ষণে মঞ্জুষা শাশুড়ি আর মেয়েকে এই কথা জানিয়ে ফেলেছেন। বিদিশা তেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। ছেলের চাকরি ছাড়ার ঘটনায় বিচলিত হননি মহাশ্বেতা। তবে যত বার মঞ্জুষা তাঁকে এই ঘটনা জানান, তত বার তাঁর মনে হয় বৌমা এই ঘটনার জন্য তাঁকেই দায়ী করছে।

মহাশ্বেতা বললেন, “সব কিছুই একটা ভাল দিক আছে।”

“ঘন ঘন চাকরি ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে ভাল কী দেখলেন মা?”

“বাবলু এমনিতেই যা টাকা উপার্জন করত, তার বেশির ভাগ বন্ধুদের আড্ডায় আর নাটকের গ্রুপে ঢেলে আসত। এখন যদি চাকরিটা না থাকে তবে ওই আজবাজে নেশা কিছুটা কম হবে। যতটা মাইনে সে পেত, তার খুব সামান্য অংশই তো সে বাড়িতে নিয়ে আসত।”

খুব একটা জোরালো যুক্তি নয়, তবু কিছু বলে উঠতে পারলেন না মঞ্জুষা। কথাটা পুরোপুরি ভুল নয়। সংসারের সিংহভাগ খরচ এখনও মহাশ্বেতাই চালাত। সাগর আর বিদিশার পড়াশোনার দায় নিজে থেকেই নিয়েছেন তিনি। এর ফল প্রভঞ্জনের পক্ষে খারাপই হয়েছে। আরও বেশি করে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াতে পেরেছেন তিনি। প্রতিবার তাঁর চাকরি ছাড়ার পর এ বাড়িতে একটা মজার ব্যাপার ঘটে। প্রভঞ্জনের উডু উডু স্বভাবের জন্য পরস্পরকে দায়ী করেন মহাশ্বেতা আর মঞ্জুষা।

মঞ্জুষাকে চুপ দেখে মহাশ্বেতা বললেন, “কী আর করা যাবে? বিয়ের পরই যখন ঘরের বাঁধন মজবুত হল না, তখন এত বছর পরে আর কপাল চাপড়ে লাভ কী? তবু ঘরের ছেলে ঘরে আছে, গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাবনি, এটাই অনেক। তা ছাড়া বংশের ধারা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। এ বাড়ির পুরুষরা কবেই বা ঘোর সংসারী ছিল।”

কথায় স্পষ্ট শ্লেষ। এই সব সময় মঞ্জুষার ইচ্ছে করে বেশ দু'কথা শুনিয়ে দিতে। শ্বশুরমশাইয়ের অতীত সম্পর্কে যা তথ্য তাঁর কাছে আছে তা এক কথায় ভয়াবহ। সেই প্রসঙ্গ তুলে এনে যদি গল্পচ্ছলে একটু ঠেস দিয়ে দেন মঞ্জুষা, তবে এই ভদ্রমহিলা পালানোর পথ পাবেন না।

অথচ বলি বলি করেও বলা হয়ে ওঠা হয় না মঞ্জুষার। কারণ এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর একটা অনেক পুরনো অংশীদারি কারবার চলছে। কালে কালে সেই ‘কারবার’ ফুলে ফেঁপে উঠেছে। মঞ্জুষার ধারণা সেই

অংশীদারিতে তাঁর থেকে মহাশ্বেতার অবদানই বেশি। তাঁর মনে হয়, এই বৃদ্ধা রাশ আলগা দিলে দু'জনের এত দিনের প্রোজেক্ট মুখ খুবড়ে পড়বে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে মঞ্জুষা প্রসঙ্গ পাট্টালেন, “কাল সাগরের ভোরবেলা বেরনো। আজ ডিনার একটু তাড়াতাড়ি, সেটাই বলতে এসেছিলাম।”

মহাশ্বেতা কপালে ভাঁজ ফেলে বললেন, “ভোরবেলা বেরনো বলে রোজকার রুটিন কেন পাট্টাতে হবে? ছেলেকে আঁচলে বেঁধে রাখা স্বভাবটা তোমার গেল না মঞ্জু। তিরিশ বছর বয়স হতে চলল, আজ বাদে কাল বিলেত যাবে, তাকে এত আতুপুত করলে চলবে?”

মঞ্জুষা মেঝের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করলেন, “ছেলে মানুষ করাও এখন ওঁর থেকে শিখতে হবে!”

মহাশ্বেতার কপালে ভাঁজের সংখ্যা বাড়ল, “কিছু বললে?”

মঞ্জুষা ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে বললেন, “আমি জোনাকিকে দিয়ে খবর দেব মা। আজকের দিনটা না হয় একটু আগেই খেয়ে নিলেন।”

মায়ের কাছে খবর পেয়ে পড়ার টেবিল থেকে উঠে দাদার ঘরে ঢুকল বিদিশা। সাগর সারাদিন লেখাপড়া নিয়ে থাকে। এমএস করে নার্সিং হোমে ঘুরে ঘুরে অপারেশন করায় তার ঘোর অনীহা ছিল। এমআরসিএস ক্লিয়ার হয়ে গেছে, রেজিস্ট্রার পোস্টে বিলেতের একটা নামী হসপিটালের সঙ্গে কাজ শুরু শুধু সময়ের অপেক্ষা। ডাক এলেই সাগর বিলেত পাড়ি দেবে। তার স্থির ধারণা এই শহর মনুষ্যবাসের অযোগ্য, খুব বেশি হলে আর পঞ্চাশ বছর পরই শিক্ষিত সভ্য মানুষেরা এই শহর ছেড়ে উন্নততর আশ্রয় বেছে নেবে, পরিত্যক্ত এই শহর পরিণত হবে ঘন জঙ্গলে। সভ্যতার ন্যূনতম চিহ্নটুকুও মুছে যাবে।

তাই তার বন্ধুরা যখন বড় বড় কর্পোরেট নার্সিং হোমের সঙ্গে টাই আপ করছিল, সেই সময়টায় এমআরসিপি-র প্রস্তুতি নিচ্ছিল সাগরনীল। আইএলটিএস উত্তরে গেছিল একবারেই। কাজ তো সহজ নয়, প্রচুর সাধনার পাশাপাশি কাঠখড় কম পোড়াতে হয় না।

তবে সাগরনীলও ভেবে রেখেছে সে শেষ দেখে ছাড়বে, এক বার এই পোড়া দেশ ছেড়ে পালাতে পারলে সে আর ফিরছে না।

বিদিশা ঘরে ঢুকে বলল, “পারিসও বটে দাদাভাই। সারাদিন বই মুখে বসে থাকতে তোর টায়ার্ড লাগে না?”

সাগর উত্তর দিল না, সে খুব মন দিয়ে কিছু পড়ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে ছোট একটা খাতায়। মুখে চোখে নিমগ্ন ভাব।

বিদিশা নিচু গলায় বলল, “বাবা আবার চাকরি ছেড়েছে জানিস?”

সাগর লেখা থামাল। মাথা তুলে মৃদু হাসল, “ভূই অবাক হয়েছিস?”

“না, এত দিন পরে আর অবাক হওয়ার কী আছে? শুধু মাঝে মাঝে ভাবি বাবা এটা কেন করে? তোর কী মনে হয় দাদাভাই?”

“পৃথিবীতে চিন্তা করার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে মামন। ওই ভদ্রলোকের ব্যাপারে ডিসকাস করে সময় নষ্ট করতে চাইছি না।”

দাদাভাইয়ের দিকে তাকাল বিদিশা। দাদাভাই বাবার সম্পর্কে এ ভাবে কথা বললে তার মন খারাপ হয়ে যায়। দাদাভাইটা যেন দিন দিন কেমন একটা হয়ে যাচ্ছে। মানুষকে মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না। বাবাকে বিদিশা একটু বেশিই ভালবাসে। সেই বাবাকে ‘ভদ্রলোক, ভদ্রলোক’ করে কথা বলে দাদাভাই। বিদিশার তখন দাদাভাইকে অসহ্য লাগে।

সাগর বলল, “অবাক অবশ্য আমি হয়েছি, প্রতিবারই হই, তবে ওই ভদ্রলোকের কথা ভেবে নয়। যারা ওই রকম একটা কেয়ারলেস, ক্যাডাভেরাস লোককে কাজে নেয়, তাদের কথা ভেবেই অবাক লাগে। এই লোক অতগুলো চাকরি পায় কী করে।”

“বাবা কিন্তু একজন পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার, এটা ভুলে যাস না দাদাভাই!” বিদিশা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

“চুপ কর তো!” মুখ বিকৃত করল সাগরও, “নামেই ইকনমিক্স পড়িস। চাকরির বাজার সম্পর্কে কোনও আইডিয়া আছে তোর? শিবপুর থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার অ্যাপক্যাব চালাচ্ছে, বিজনেস স্কুলের মাস্টার্স চায়ের দোকান করছে, চাকরি কোথায় রে এই পোড়া দেশে? সেখানে এক জন ইনকনসিস্টেন্ট বুড়ো লোককে...”

বিদিশা আর সহ্য করতে পারে না। সে এগিয়ে এসে সাগরের পিঠে

শুন্ম করে একটা কিল বসিয়ে দেয়।

গভীরমুখে রাতের খাওয়া সারলেন প্রভঞ্জন। তাঁকে দেখে মনে হল তিনি নিজে চাকরি ছেড়ে আসেননি, বরং বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক মন্দার অজহাতে কোম্পানি তাঁকে ছাঁটাই করেছে। মহেশ্বের আহার সামান্যই, সে জন্য ডাইনিং টেবিল অবধি আসার দরকার হয় না, তবু তিনি আসেন। ছেলেমেয়ে দুটো সারাদিন ছুটছে। এই রাতটুকুই তাদের চোখের দেখা দেখতে পান তিনি।

খেতে বসে রোজকার মতো এক-আধটা নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি করলেন মঞ্জুষা। বিদিশা কতটা ভাত কোন পদ দিয়ে খাবে সেটা নিজে হাতে আলাদা করে রাখলেন, সাগর সামান্য বিষম খেতেই তার মাথায় ফুঁ দিয়ে, জলের গ্লাস মুখের সামনে ধরে দারুণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। প্রতিবারের মতো ভুরু কুঁচকে গোটা ঘটনা জরিপ করলেন মহেশ্বের।

খাওয়া শেষে ব্যালকনিতে সিগারেট ধরালেন প্রভঞ্জন। বিকেল থেকে মনের মধ্যে একটা পুরনো অসুখ চাগাড় দিচ্ছে তাঁর। তাঁর অসুখের নাম বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের টান দীর্ঘ দিন উপেক্ষা করে আছেন প্রভঞ্জন। আর মনে হয় পারবেন না। সময় হয়েছে এই সুখী সুখী বেঁচে থাকার মুখে সপাটে চড় কষিয়ে দেওয়ার।

সংসার ত্যাগ করার পাকাপাকি সিদ্ধান্তটা নিয়েই ফেললেন তিনি।

গুরুতর কোনও সিদ্ধান্ত নিলে রাতে তাঁর ভাল ঘুম হয়, এ ক্ষেত্রে দেখা গেল শুয়েও অনেক রাত পর্যন্ত এ পাশ ও পাশ করতে লাগলেন প্রভঞ্জন। পাশে মঞ্জুষাও অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইলেন, তাঁর মোবাইলের আলোয় মশারির একটা অংশ আলোকিত। সন্দের একটা বাংলা সিরিয়াল মিস গেছে, অ্যাপে তার টেলিকাস্ট দেখছেন তিনি।

পুরনো অফিস, সহকর্মী, বন্ধ হয়ে যাওয়া নাটকের গ্রুপ, অকালে চলে যাওয়া দু'এক জন বন্ধুর এলোমেলো চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখল প্রভঞ্জনকে। তার পর এক সময় গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলেন প্রভঞ্জন।

পরদিন বেশ বেলা করেই ঘুম ভাঙল। আজ তাঁর কোথাও যাওয়ার নেই, সকাল সকাল শেভ করে, শাওয়ার নিয়ে বাস ধরার তাড়া নেই। তিনি আয়েস করে বারান্দায় এসে বসলেন। উদ্বেগহীন, আয়েস করে কাটানোর উপযুক্ত সুন্দর দিন। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল গতকাল রাতে তিনি গৃহত্যাগের পরিকল্পনা করেছেন। আশ্চর্য! এমন একটা সংকল্প, অথচ সকাল থেকে মনেই ছিল না তাঁর। মনে পড়তেই মনটা তেতো হয়ে গেল। গাড়ি বারান্দা খোলা হয়েছে, মন্দিরে লোক যাতায়াত শুরু হয়েছে, বন্দুকের ওপর মাথা রেখে টুলের ওপর বসে সাতসকালেই বিমোছে মুগ্ধেরিলাল। নির্বাক্সাট রবিবার, তবু প্রভঞ্জনের অস্থির লাগছে।

অস্থিরতা কাটাতে প্রভঞ্জন এ ঘর ও ঘর পায়চারি করলেন খানিক ক্ষণ। তার পর নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ঘরের মাঝামাঝি রাখা ইঞ্জিচেয়ারে বসে চোখ বুজলেন প্রভঞ্জন। এক সময় বুঝলেন বিদিশা ঘরে এসেছে। নিঃশব্দে এসে বিদিশা বাবার গলা জড়িয়ে ধরল, “কী ব্যাপার বলো তো? তখন থেকে জোন্সের মতো বাড়িময় ঘুরে বেড়াচ্ছে...”

প্রভঞ্জন বললেন, “ও কিছু নয়। মাথাটা একটু ব্যথা করছে...”

বিদিশা বলল, “এই ব্যাপার? আমি মাথায় ট্যাপেটি ট্যাপ করে দিচ্ছি। এখন ঠিক হয়ে যাবে...”

ট্যাপেটি ট্যাপ। এই শব্দের অর্থ প্রভঞ্জন জানেন না। শুধু জানেন বিষয়টি চমৎকার। দু'হাতের দশ আঙুল দিয়ে আশ্চর্য কায়দায় কপাল আর মাথা ম্যাসাজ করে দেয় মেয়ে। তারই পোশাকি নাম ট্যাপেটি ট্যাপ। বিদিশা ট্যাপেটি ট্যাপ শুরু করেছে। প্রভঞ্জন বললেন, “আমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছি মানন। তোর মা বলেছে?”

“বেশ করেছে। পোষায়নি, ছেড়ে দিয়েছে। আমার বাবা কি আর পাঁচ জনের মতো নাকি যে, অপছন্দের কাজ দিনের পর দিন করে যাবে!”

“মানে, তোর এই ব্যাপারটা নিয়ে কোনও খারাপ লাগা নেই!”

“খারাপ লাগা কেন থাকবে? তুমি এখন ফিফটি এইট। দু'বছর পরে তুমি রিটায়ার করে যেতে। দু'বছর আগে আর দু'বছর পরে। ভাল হয়েছে। এবার মন দিয়ে নাটক লেখো, আগেরটা শেষ হয়েছিল, বাবা?”

প্রভঞ্জন উত্তর দিতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ধীরে ধীরে ঘুমের

অতলে তলিয়ে গেলেন তিনি।

আরও কিছু ক্ষণ মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বিদিশা। যাওয়ার আগে জানলার পরদা টেনে দিয়ে গেল।

শুধু বিদিশাই নয়, দেখা গেল সারাদিন ধরে বাড়ির প্রায় সবাই আশ্চর্য রকম ভাল আচরণ করতে লাগল। কেউ এক বারও প্রভঞ্জনের অপছন্দের কাজ করল না। সবাই যেন তাঁর মন জুগিয়ে চলতেই ব্যস্ত।

দুপুরের খাওয়ার টেবিলে প্রভঞ্জন দেখলেন কচি পাঁঠার ঝোল হয়েছে, জোনাকি রেঁধেছেও তরিবত করে। তুলতুলে নরম মাংস, সোনালি ঝোল, ঝাল ঝাল রান্না, লোভে পড়ে কিছুটা ভাত বেশিই খাওয়া হয়েছে গেল প্রভঞ্জনের। খেয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে তিনি অ্যালার্ম সেট করলেন ঠিক আড়াই ঘট্টা পরে। চমৎকার ঘুম হল তাঁর। গভীর, স্বপ্নহীন ঘুম। বহু দিন পরে ঘুমের ওষুধ ছাড়া এমন সুন্দর ঘুমোলেন তিনি।

প্রভঞ্জন গৃহত্যাগ করলেন ঠিক রাত্রি আটটার সময়।

একবস্ত্রে গৃহত্যাগ। সহজ ভাবে তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। এই বাড়িতেই তাঁর জন্ম, এত বছরের বন্ধন, অথচ বেরিয়ে যাওয়ার সময় এক বারও ফিরে তাকালেন না পর্যন্ত। হনহন করে হেঁটে অনেকটা পথ পেরিয়ে গেলেন তিনি। পাড়ার মোড়ে শ্রীকৃষ্ণ মিস্ট্রি ভান্ডার। আগের বার গৃহত্যাগের সময় এই দোকান পেরিয়ে যেতে পারেননি প্রভঞ্জন। তখন শীতকাল। ফুলকপির শিঙাড়ার মোহময় গন্ধ তাঁকে টেনে নিয়েছিল। ঠোঙা ভরে শিঙাড়া কিনে বাড়ি ফিরেছিলেন প্রভঞ্জন।

আর এক বার গৃহত্যাগের মুহূর্তে একদম বাড়ির সামনে থেকে নাটকের গ্রুপের বন্ধুরা প্রায় হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছিল প্রভঞ্জনকে। এয়ারপোর্টের কাছে এক পানশালা থেকে টলমল পায়ে গভীর রাতে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন প্রভঞ্জন।

সে সব কথা ভাবলেও হাসি পায় আজকাল প্রভঞ্জনের, কয়েক বছর আগেও কী ছেলেমানুষ যে ছিলেন তিনি! পুরনো কথা ভাবলে একটা ঘোরের মতো আসে, কে যেন ডেকে চলেছে তাঁর নাম ধরে। প্রভঞ্জন শুনতেও পেলেন না।

পার্থ দাস একেবারে তাঁর গায়ের কাছে এসে বললেন, “কী বাবলুদা! এত আনমাইন্ডফুল! কত ক্ষণ ডাকছি, শুনতে পাচ্ছেন না!”

প্রভঞ্জন বিরক্ত হলেন। গৃহত্যাগের মুহূর্তে এই ধরনের বাধা বিঘ্ন একেবারেই কাঙ্ক্ষিত নয়। তিনি বললেন, “না পার্থ, একটু ব্যস্ত আছি, তুমি না হয় পরে বাড়িতে এসো।”

“আরে একটু দাঁড়ান। ব্যাপার গুরুতর। বাড়িতে না হয় এক দিন যাব, কিন্তু এখন আমার কথাটা মন দিয়ে শুনুন।”

পার্থ দাস নিজের কথা বললেন, দেখা গেল বিষয় সত্যিই গুরুতর। কয়েক মাস ধরে ভিআইপি রোডের ধারে একটা অন্ধকার জায়গায় কিছু বাইক আর গাড়ি জমা হচ্ছে। অধিকাংশই নাকি অবাঙালি ছোকরা, টাকাপয়সার মা বাপ নেই। সেই গাড়িতে নেশাভাং, আরও নানা অনেক অসামাজিক কাজকর্ম হতে থাকে। আজকাল ইভ টিজিং-এর ঘটনা এত বেড়ে গেছে যে, নাগরিক কমিটি নড়েচড়ে বসেছে। পার্থ দাস সেই কমিটির সেক্রেটারি, জনসংযোগের দিকটা তাকেই দেখতে হচ্ছে।

কথা শেষ করে পার্থ দাস বললেন, “নেকট রবিবার, ক্লাবের দোতলায় নাগরিক মিটিং ডাকা হয়েছে। একটা তো বিহিত করতে হয় বাবলুদা। এ ভাবে তো চলতে দেওয়া যায় না, তাই না!”

চিন্তিত মুখে মাথা নাড়লেন প্রভঞ্জন। বিদিশাকে মাঝে মাঝেই রাতের দিকে টিউশন সেরে ওই পথে ফিরতে হয়। কিংবা হয়তো তেমন চিন্তার কোনও ব্যাপার নেই, পার্থ দাস রাজ্য সরকারি দপ্তরে চাকরি করে, অফিসে কাজকর্ম বিশেষ নেই, দুটোয় নাগাদ বাড়ি চলে আসে। সময় কাটাতে পুজো কমিটি, নাগরিক মঞ্চ পোস্ট হোল্ড করে বসে আছে। ওভাররিঅ্যাক্ট না করলে সেই সব পদে টিকে থাকা যায় না।

তবু একটা অস্থিতি নিয়েই হাঁটা শুরু করলেন প্রভঞ্জন।

ঘটনাটা ঘটল বড় রাস্তা পেরনোর ঠিক আগে। একটা আর্তনাদ শুনে প্রভঞ্জন পিছন ফিরলেন। দেখলেন উদ্ভাস্তের মতো ছুটে আসছে বিদিশা। নাইটির ওপর কোনও মতে ওড়না জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে সে, পায়ে

হাওয়াই চটি। সে শৌখিন মেয়ে। লাখ টাকা দিলেও এই পোশাকে সে রাস্তায় বেরোবে না। অর্থাৎ বড় কলেঙ্কারি কিছু বেঁধেছে।

আলো আঁধারি রাস্তার মোড়, মেয়েকে এ ভাবে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখে চাঁটের কোণে একটা হাসি খেলে গেল প্রভঞ্জনর। তিনি অস্ফুটে বললেন, “হল না, এ বারোও হল না।”

বিদিশা বাবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল, তার চোখেমুখে আতঙ্ক, কোনও মতে দম নিয়ে সে বলল, “এক্ষুনি বাড়ি চলো বাবা, এক্ষুনি! সর্বনাশ হয়ে গেছে, প্লিজ তাড়াতাড়ি চলো!”

১৩

পুরনো দিনের খাটা। মহাশ্বেতার বিয়ের সময়কার। ভারী সেগুন কাঠের, মাথার দিকে শৌখিন কারুকাজ। মহাশ্বেতা শুয়ে আছেন সেই খাটের মাঝখানে। ঘণ্টাখানেক আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ শ্বাসকষ্ট, বৃকে ব্যথা, চার দিক অন্ধকার হয়ে আসা... এই সব। অসুখ-বিসুখ তো আজকাল আর বয়স মেনে আসে না, তিরিশে কোমরে বাত, সাঁহিতিরিশে ব্রেন স্ট্রোক... আকছার শোনা যায়। আর চুরাশি বছর বয়সে তো সামান্য উপসর্গও ভয় ধরিয়ে দেয়।

মহাশ্বেতার ফরসা মুখে কালচে ছোপ, চোখের নীচে মসীরেখা, দেখে মনে হচ্ছে এ বারের অসুস্থতা তাঁকে ভালই কাবু করেছে। খাটের এক কোণে বসে আছেন ডক্টর সরখেল। ডক্টর সরখেলকে চা খেতে দেওয়া হয়েছে, চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি চিন্তিত মুখে বলেছেন, “বিউটিফুল!” ‘বিউটিফুল’ বলা হয়েছে চা-প্রসঙ্গে। খাঁটি দার্জিলিং চায়ের লিকার। চিন্তিত মুখের কারণ মহাশ্বেতার সিম্পটম তাঁর ভাল ঠেকছে না।

ঘরে ঢুকে মহাশ্বেতাকে দেখে চমকে গেছিলেন তিনি। তাঁর মনে হয়েছিল পেশেন্টকে তিনি ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। পেশেন্টের নাতনি জিভের নীচে সরবিট্টেট দিয়েছে, তবু মহাশ্বেতার রক্তচাপের বহর দেখে তাঁর চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। চটজলদি দুটো ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন পুশ করেছেন তিনি। আশা করেছিলেন এতেই কাজ হবে। কিন্তু মহাশ্বেতা সময় লাগিয়ে দিচ্ছেন, এত সময় কেটে গেলেও তাঁর ভাইটালস স্টেবল হচ্ছে না। তবে এখন কিছুটা নিশ্চিত বোধ করছেন ডক্টর সরখেল, রোগীর হাবভাব দেখে তাঁর মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা আর নেই।

তিনি বললেন, “এ বারের মতো বিপদ কেটে গেল ম্যাডাম। কিন্তু এখন কয়েক দিন অনিয়ম আর স্ট্রেস নেওয়া একদম চলবে না।”

মহাশ্বেতার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিদিশা আর প্রভঞ্জন। মহাশ্বেতা যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন বিদিশা তার বান্ধবী পারিজাতের সঙ্গে নিজের ঘরে গ্রুপ স্টাডি করছিল। নামেই গ্রুপ স্টাডি। আসলে রাজ্যের গল্প আর হাস্য হাসি। তারই মধ্যে মহাশ্বেতার ঘরে ভারী কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিল দু'জনে। ছুটে এসে তারা দেখেছিল মেঝেতে পড়ে আছেন মহাশ্বেতা। দু'চোখ বিস্ফারিত, শরীর কাঁপছে থরথর করে। তাঁর কী করা উচিত সেটা বিদিশা ঠিক বুঝতে পারল না। প্রথমেই সে বাবার খোঁজ করল, বাড়িতে বাবাকে খুঁজে পেল না। বিদিশা তখন সাগরের ফোনে ফোন করে। সাগর ফোন তুলল না। পাড়ার মোড়ের ডাক্তার আউট অব স্টেশন, বাবার ফোন বিছানায় পড়ে, মুন্সেরিলাল জানাল প্রভঞ্জন কিছু ক্ষণ আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন।

এই সময় আশ্চর্য সক্রিয় হয়ে উঠল পারিজাত। সে বিদিশাকে বলল, “কাঁপছিস কেন? এ দিকে আয়। ঠান্ডিকে তুলি আগে।”

দুই বন্ধু মিলে বারকয়েকের চেষ্টায় খাটের ওপর তুলতে পেরেছিল মহাশ্বেতাকে। পারিজাত বলেছিল, “ঠান্মির ওষুধের বাক্সটা থেকে একটা সরবিট্টেট দে। দেখ, কাকু কোথায়। ডাক্তারের ব্যাপারটা আমি দেখছি।”

বিদিশা বেরিয়ে গেলে পারিজাত ফোন করে ডেকেছিল ডক্টর সরখেলকে। উনি তার বাবার বন্ধু, তাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ান।

পৃথিবীর সব ডাক্তারই কোনও না কোনও ভাবে পরস্পরের পরিচিত। দেখা গেল মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় গেস্ট লেকচারার মহাশ্বেতার সার্জারির ক্লাস করেছেন ডক্টর সরখেল। তার পর থেকে

তিনি একটু বেশিই যত্ন নিয়ে রোগীর দেখভাল করছেন। ডক্টর সরখেল চায়ের কাপে একটা বড় চুমুক দিয়ে বললেন, “কিন্তু অনিয়ম তো একটা কিছু হয়েছিল, প্রশ্ন হল, সেটা কী?”

বিদিশা বলল, “ঠান্মি কাল সারারাত জেগে ছিল, ঘরের আলো জ্বলছিল, আর আজ অনেকটা মার্টিন খেয়েছে।”

ডক্টর সরখেল আঁতকে উঠলেন, “এ কী ম্যাডাম! শরীরের এই অবস্থায় রাত জাগা, রেড মিট, তাও আবার ওভার ইটিং!”

মহাশ্বেতা বাচ্চাদের মতো হাসছেন, ধরা পড়ে যাওয়ার হাসি। তিনি তর্জনী তুলে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জোনাকিকে দেখালেন, “ওই মেয়েটির দোষ। ওর কি উচিত হয়েছে অত সুন্দর রান্না করা?”

ডক্টর সরখেল চশমার ওপর দিয়ে জোনাকিকে দেখলেন। জোনাকিও মাথা নিচু করে হাসছে। লজ্জা আর কুণ্ঠা মেশানো হাসি। বড়মা অভিযোগ করছে না প্রশংসা, বুঝে উঠতে পারছে না সে।

ডক্টর সরখেল বললেন, “না ম্যাডাম, তা বললে তো হবে না। আপনাকে সেধুরি করতে হবে, আর মাত্র পনেরো রান। সেধুরির কাছে এসে ব্যাটসম্যানরা এক রান, দু'রানের ওপর খেলে, ঝুঁকি নিয়ে চার ছয় মারতে যায় না। আপনাকেও এগোতে হবে সাবধানে, নো লেট নাইট, নো রেড মিট, নো স্ট্রেস... ব্যস! আপনার সেধুরি ঠেকায় কে?”

আরও কিছু ক্ষণ কথাবার্তা বলে উঠে পড়লেন ডক্টর সরখেল। তাঁর মতে মহাশ্বেতা এখন আউট অব ডেঞ্জার, তবু কোনও সমস্যা হলে যেন অবিলম্বে তাঁকে ফোন করা হয়।

ডাক্তারকে বাড়ির গেট পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে এলেন প্রভঞ্জন। ডক্টর সরখেল গাড়িতে ওঠার আগে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “ডাক্তারবাবু, ভয়ের কিছু নেই তো?”

প্রশ্নটা তিনি ঘরেও করেছেন। তবে এই প্রশ্ন দু'বারই করতে হয়। এক বার রোগীর সামনে, আর এক বার আড়ালে।

ডক্টর সরখেল গাড়িতে উঠে বলেছেন, “একটা বয়সের পরে সামান্য পেট ব্যথা, বৃকে ব্যথাই ভয়ের কারণ। ম্যাডামের ওভারঅল কন্ডিশন সুবিধের নয়। পেসমেকার আছে, হাইপারটেনশন, ফ্যাটি লিভার, এত বছর ধরে ইনসুলিন। এই শরীর নিয়ে ম্যাডাম যে এখনও লড়ে যাচ্ছেন, সেটাই বড় কথা। কোনও ওষুধ মিস করা যাবে না আর থাকতে হবে খুব সাবধানে। জানেন তো, উই ডক্টরস আর ভেরি ব্যাড পেশেন্টস।”

প্রভঞ্জন যখন ফিরে এলেন তখন ঘরে রীতিমতো তর্কবিতর্ক চলছে। শুধুমাত্র বিদিশা আর মঞ্জুস্বাই নয়, দেখা যাচ্ছে সেই তর্কে পারিজাতও যোগ দিয়েছে। ডাক্তার চলে যাওয়ার পর তাদের মনে পড়েছে যে, মহাশ্বেতার ডায়েট কী রকম হবে সেটা জিজ্ঞেস করা হয়নি। তার ফলে সবাই যে যার নিজের মতো করে ডায়েট চার্ট তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে।

পারিজাতের মতে, পাকা পেসে এই অবস্থায় একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বিদিশা কোথায় পড়েছে পাকা পেসে লিভার ভাল রাখলেও হার্টের পক্ষে ভাল নয়। তার মতে ঠান্মির নিয়ম করে ছানা খাওয়া দরকার। মঞ্জুস্বার বক্তব্য যে মানুষের পেটে দুধ সহ্য হয় না, তাকে ছানা কী করে দেওয়া যাবে! এরই মধ্যে জোনাকি বলে উঠল, “আমি বড়মার জন্য হালেঞ্চা শাক আর ঘ্যাটিকোল বাটা করে দেব রোজ। আমার রান্না পাঁঠা খেয়ে প্রশার বেড়েছে, প্রশার কমও আমিই করব।”

পরিস্থিতি দেখছিলেন মহাশ্বেতা। পারিজাত তাকে রেখেছে আধশোয়া করে। পিঠ আর মাথার নীচে চারটে বালিশ। পারিজাতের ধারণা এই ভাবে কিছু ক্ষণ শুয়ে গভীর শ্বাসপ্রশ্বাস নিলে শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি তাড়াতাড়ি পূরণ হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত দুই বন্ধু তাঁর ডায়েট নিয়ে ঐকমত্যে আসতে পারেনি। এই দু'টি মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতেও ভাল লাগে মহাশ্বেতার। দু'টিতে সারাক্ষণ এক সঙ্গে, আজ থেকে নয়, সেই এগারো ক্লাস থেকে। অথচ কী ভীষণ আলাদা দু'টি মেয়ে। বিদিশা জলের মতো গভীর, নীরব, শান্ত। অন্য দিকে পারিজাত যেন আগুন। আগুনের মতো গায়ের রং, আগুনের মতোই মেজাজ, এবং এই মুহূর্তে আগুনের মতোই পারিজাত আলো ছড়াচ্ছে মহাশ্বেতার ঘরে।

শরীর বেশ ক্লান্ত লাগছে মহাশ্বেতার, কিন্তু মন প্রশান্তিতে ভরে যাচ্ছে। তাঁর মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে অসুখ বিসুখ করা ভাল। বোঝা

যায় বাড়ির লোকগুলোর কাছে তিনি এখনও পুরোপুরি মূল্যহীন হয়ে পড়েননি। এমনকি মঞ্জুষাকে পর্যন্ত শাশুড়ির কারণে চিন্তিত মনে হচ্ছে।

নিজের শাশুড়ির সঙ্গে অবশ্য মহাশ্বেতার সম্পর্ক ছিল আরও বেশি সহজ। তাঁর আমলে এই বাড়ির কী আশ্চর্য রূপই না দেখেছেন মহাশ্বেতা। রুদ্র পরিবার এলাকার বনেদী বড়লোক। মহাশ্বেতা যখন এই বাড়িতে বিয়ে হয়ে এলেন তখন তাঁর প্র্যাকটিস সবে শুরু হয়েছে। মহাশ্বেতা কিছুটা সময় চেয়েছিলেন, কিন্তু এমন পরিবারে বিয়ের সম্বন্ধ আসায় তাঁর বাবা আপত্তি করতে পারেননি।

বিয়ের পর বেশ কিছু দিন চুপচাপ থাকতেন মহাশ্বেতা। কাজকর্মও বেরোতেন না। দু'বেলা শাশুড়ির সঙ্গে রান্নাবান্না আর ঘরকন্নার কাজ করতেন। আরতি সিনেমা ছিল বাড়ির কাছাকাছি, রিকশা করে শাশুড়ি-ননদকে নিয়ে নতুন ছবি দেখে আসতেন সেখানে গিয়ে। প্র্যাকটিস প্রায় শিকয়ে উঠেছে, এমন সময় এক দিন দুপুরে মলিনা ছেলের বৌকে বললেন, “এটা আমি কী দেখছি? এত কষ্ট করে বাবা ডাক্তারি পড়ালেন, সারা দুপুর জেগে সিনেমার পত্রিকা পড়বে বলে?”

পত্রিকা ভাঁজ করে বিছানায় উঠে বসেছিলেন মহাশ্বেতা। তাঁর পাশে শাশুড়ি এসে বসেছিলেন, “বিয়ের জন্য ক’দিন তো অফ গেল কাজকর্ম। এ বার নতুন করে শুরু করলেই তো হয়। তুমি অন্য কিছু চাইলে আলাদা কথা। সে ক্ষেত্রে আমি আর জোর করব না।”

মহাশ্বেতা অন্য কিছু চাননি। ক্রমে ক্রমেই ব্যস্ত থেকে ব্যস্ততর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। মলিনা যত দিন বেঁচে ছিলেন একটি বারের জন্যও তা নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেননি। বুক দিয়ে আগলেছিলেন সংসারটাকে। এই যে প্রভঞ্জন পৃথিবীতে এল, কী করে যে সে স্কুল কলেজ অবধি গেল মহাশ্বেতা বুঝতেও পারলেন না। মলিনা নিজে দায়িত্ব না নিলে কি এত সহজে কাজ আর সংসার ম্যানেজ করতে পারতেন মহাশ্বেতা?

মহাশ্বেতা শুনেছেন আগে এ বাড়িতে পূজোআচার চল ছিল না। মলিনার হাতেই এ বাড়িতে ঠাকুরের আসন বসেছিল প্রথম বার। আর তার পরেই ঘটেছিল এক আশ্চর্য ঘটনা। যার প্রভাব সারাজীবনের মতো থেকে গেছে ‘সোনার তরী’ নামের এই বাড়ির ইতিহাসে।

পুরো ঘটনা আজও চোখে ভাসে মহাশ্বেতার। সে দিন একটু তাড়াতাড়িই চেষ্টার থেকে ফিরেছিলেন তিনি। বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে ছিলেন উদ্বিগ্ন মলিনা। তিনি বলেছিলেন, “রোগী দেখা কাপড় ছাড়ার আগে এক বার আউট হাউসে চলো তো।”

আউট হাউসে গিয়ে মহাশ্বেতা দেখেছিলেন, বিছানায় একটি অল্পবয়সি বৌ শুয়ে আছে। ব্যথায় তার সারা শরীর কঁপে কঁপে উঠছে, কষ্টে রীতিমতো কাতরাচ্ছে। অভ্যস্ত হাতে রোগীকে এগজামিন করতে করতে মহাশ্বেতা প্রশ্ন করেছিলেন, “কে এ? কী নাম?”

মলিনা নাম বলেননি, শুধু বলেছিলেন, “পরে সব বলছি, আগে এর একটা ব্যবস্থা করো।”

ব্যবস্থা মহাশ্বেতা করেছিলেন। কিন্তু রোগীর অবস্থা তিনি ভাল বোঝেননি। দীর্ঘ অপুষ্টির ছাপ সারা শরীরে, লিভারের বারোটো বেজে গেছে, সম্ভবত না খেয়ে খেয়ে গ্যাস্ট্রিক আলসার বাঁধিয়েছে, তার উপর অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিসের মতো মেডিক্যাল এমার্জেন্সির সিম্পটম। এই মেয়েকে বাঁচিয়ে তোলা মুখের কথা নয়।

তবে কয়েক দিন পরে দেখা গেল মেয়েটি অনেকটাই ভাল বোধ করছে। সুস্থ হওয়ামাত্র মেয়েটি কিন্তু এই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল না। বরং আউট হাউস ছেড়ে বাড়ির অন্দরমহলে তার যাতায়াত শুরু হল। মলিনার সঙ্গে হালকা সখ্যও গড়ে উঠল দেহাতি মেয়েটার।

তবে ব্যাপারটা অস্বস্তির। অসুস্থ হয়ে বাড়ির গেটের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকা একটা মেয়ে, মলিনার দয়ায় আউট হাউসে থেকে চিকিৎসা পাওয়া অচেনা অজানা একটা মেয়ে সারাদিন পিঠে বিরাট একটা বস্তা নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবাক বিস্ময়ে চার পাশটা দেখছে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে... দেখলেই মাঝে মাঝে গা হুমহুম করে উঠত মহাশ্বেতার। পরিস্থিতি হয়ে গেল তার থেকেও অনেক বেশি জটিল। এক সকালে বাড়িময় হলস্থল ফেলে দিল মেয়েটি।

মেয়েটিকে ঠাকুরঘরে একটি দেবীমূর্তি বসিয়ে একমনে তার পূজো

অর্চনা করতে দেখা গেল। বাড়িসুদ্ধ লোক জড়ো হল ঠাকুরঘরে। মূর্তি দেখে সবার ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। এক হাত উঁচু দেবীমূর্তি, দেখে মনে হচ্ছে খাঁটি সোনার। পদ্মাসনা। দ্বিভুজা। এক হাতে আশীর্বাদের ভঙ্গি, অন্য হাতে পদ্মফল।

মলিনা ছুটে এসে বললেন, “এই মূর্তি তুই কোথায় পেলি অহল্যা?” অহল্যা মৃদু হেসেছিল, “চারি নেহি কিয়ে হ্যায় মাজি।”

শুধু মলিনা নয়, জনে জনে প্রায় সকলে এসে অহল্যার কাছে একই কথা জানতে চাইল, কেউ নরম সুরে, কেউ গলায় উদ্বেগ ভরে, কেউ কেউ ধমক দিয়ে। কিন্তু অহল্যা তার মুখের মৃদু হাসি বজায় রেখে চলল।

সিদ্ধান্ত হল যে, সেই মূর্তি অবিলম্বে সরিয়ে ফেলা হবে ঠাকুরঘর থেকে। মলিনার এক দূর সম্পর্কের দেওর পরীক্ষিৎ তখন পুলিশ কমিশনারের পিএ, তাঁকে তলব দেওয়া হল।

এরই মধ্যে অহল্যা মহাশ্বেতার ধারেকাছে ঘুরঘুর শুরু করেছে। এই দিদির নাকি তার সবচেয়ে ভাল লাগে। এক দিন সকালে অহল্যা এসে বলল, “দিদি, দবাই দিন, পেট দর্দ আবার শুরু হয়েছে।”

মহাশ্বেতা দেখলেন শুধু পেট ব্যথা নয়, গায়ে প্রবল জ্বর। তিনি ওষুধ দিলেন। কয়েকটা দরকারি ইনভেস্টিগেশনও করিয়ে নেবেন ভাবলেন। মহাশ্বেতা কাজে বেরনার সময় দরজায় দাঁড়িয়ে অহল্যা জিজ্ঞেস করল, “কখন ফিরবে দিদি?”

মহাশ্বেতা বলেছিল, “সন্ধে সাতটা বাজবে।”

মহাশ্বেতা চলে গেলেন। অনেকটা সময় কেটে গেলেও সুস্থ হল না অহল্যা। শুয়ে শুয়ে রইল, জ্বর কমল না ওষুধ খেয়েও।

বিকেলের দিকে অহল্যা অনেকটা ভাল বোধ করল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল বাড়ির পিছনে, পশ্চিমের টানা বারান্দায়।

তাকে হাঁটাচলা করে বেড়াতে দেখে মলিনা বললেন, “ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক অহল্যা। এই শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন?”

অহল্যা হাসল, “ঘরে হাওয়া কম লাগছে মাজি, বারান্দাতে গিয়ে একটু বসে আসি।”

মলিনা অহল্যার চলে যাওয়াটা দেখলেন। দিব্যি সুস্থ, সুঠাম নারীর হেঁটে যাওয়া। মহাশ্বেতার ওষুধ সম্ভবত কাজ করতে শুরু করেছে।

অহল্যা মারা গেল সন্ধে ছ’টা নাগাদ।

পশ্চিমের বারান্দায় তখন চৈত্র বিকেলের অপূর্ব হাওয়া বইছে। টানা বারান্দার এক কোণে চাদর জড়িয়ে নিশ্চিন্তে শুয়ে ছিল অহল্যা। প্রশান্ত, নির্লিপ্ত মুখাবয়ব। দেখলে কে বলবে সেই ঘুম আর ভাঙবে না।

মলিনার দেওর পরীক্ষিৎ এলেন অহল্যা মারা যাওয়ার দু’দিন পরে। মূর্তি দেখে তিনি তো অবাক। তার পর খুব হাসলেন, “কী কেলেক্সারি ব্যাপার, তোমাদের কমিউনিষ্ট বাড়িতে শেষমেশ দেবীর আগমন! একেই বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।”

কথাটা ভুল নয়। মলিনা এ বাড়িতে বৌ হয়ে আসার আগে পূজোআচার চলই ছিল না। এ বাড়ির দু’জনই আরাধ্য দেবতা। কার্ল মার্ক্স আর রবি ঠাকুর। তাঁদের পোর্ট্রেট সদর দরজার ওপর ঝোলে। দু’জনের মুখই থমথমে। তাঁদের দেখায় যমজ ভাইয়ের মতো।

মলিনার রাশভারী স্বশুর বললেন, “তোমাকে এখানে তামাশা করার জন্য ডাকা হয়নি পরীক্ষিৎ। এখন কী করণীয় সেটা বলো।”

ধমক খেয়ে পুলিশ কমিশনারের পিএ বলেছিলেন, “একটা খুব সহজ সমাধান আছে জেঠুমনি, তবে সেটা এখনই বলব না। একটু সময় দিন। দেখে নিই এই অহল্যার হিষ্টি কিছু পাওয়া যায় কি না, সোনার মূর্তি চুরির কোনও কেস ফাইল হয় কি না, তার পর ব্যবস্থা করা যাবে’খন।”

কয়েক মাস কেটে গেল, অহল্যা নামে কোনও মেয়ের মিসিং রিপোর্ট জমা পড়ল না, অমন দামি সোনার মূর্তি হারানো নিয়েও কোনও ডায়েরি নেই কোনও পুলিশ স্টেশনে। অহল্যার বর্ণনা দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপনও দেওয়া হল, বিজ্ঞাপনে সাড়া দিল না কেউ। মলিনার দেওরও হাজার কাজে ব্যস্ত হয়ে এই প্রসঙ্গ ভুলতে বসলেন। এ দিকে সেই দেবী ‘সোনার তরী’-র নাস্তিক পরিবারে পূজো পেয়ে যেতে লাগলেন মলিনার হাতে।

বছর ঘুরে যাওয়ার পর বাড়ির ছোটখাটো কোনও আনন্দ অনুষ্ঠানে এসে পরীক্ষিৎ বললেন, “নাহ, ও কেস ধামাচাপা পড়ে গেছে। এখন তোমাদের হাতে অপশন দুটো। প্রথম অপশন, সোনা গলিয়ে জুয়েলারকে বেচে দাও। নিরেট মাল, সোনার যা দাম পাবে তাতে ফুল ফ্যামিলি বিলেত ঘুরে আসতে পারবে।”

দেওরকে কটাক্ষ করে মলিনা বললেন, “তোমার কথার কোনও ঠিক নেই ঠাকুরপো। এতদিন মা আমাদের পূজো নিলেন আর তাঁকে নাকি গলিয়ে বেচবে! এ কী অলুক্ষুনে কথা!”

পরীক্ষিৎ হো হো করে হেসে উঠেছিলেন, “সেই তো বোঁঠান। তুমি আসার আগে এই বাড়ি একটা এথিস্ট মিশন ছিল কি না, তাই মাঝে মাঝে গুলিয়ে যায়।” তার পর সিরিয়াস গলায় বলেছিলেন, “আমি একটা ট্রাস্টের ব্যবস্থা করতে পারি। তোমাদের বাড়ির পাশের জমিতে একটা ছোটখাটো টেম্পল এস্টাবলিশ করে ফেলো। মূর্তিটা ওখানে স্থাপিত হোক, ট্রাস্টের টাকায় এক জন নিয়মিত পুরোহিত রাখো। আর এই মন্দিরে জমা পড়া সমস্ত টাকা, দান, দক্ষিণা এই ট্রাস্টের মাধ্যমে চলে যাক কোনও একটা ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে। এটা কিন্তু সবার পছন্দ হওয়ার মতো কথা বলেছি। ঠিক কি না?”

কয়েকদিন এ বাড়ির সবাই চিন্তা করল, ঘন ঘন গোল টেবিল বৈঠক করল, শেষমেশ পরীক্ষিতের দেওয়া প্ল্যানটাই পাশ হয়ে গেল। মন্দির তৈরি হল, দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল, ট্রাস্ট গঠন হল। মলিনা হলেন ম্যানেজিং ট্রাস্টি, সেক্রেটারি হলেন মহাশ্বেতা, ঘাড় ধরে ট্রেজারারের দায়িত্ব দেওয়া হল পরীক্ষিৎকেই। সব পোস্ট অবৈতনিক। ঠিক হল মন্দিরের খরচা বহন করবে ‘সোনার তরী’র রুদ্র পরিবার, কিন্তু মন্দিরে আসা সমস্ত দর্শনার্থী আর ভক্তদের দানের অর্থ চলে যাবে একটা অনাথ আশ্রমে। ট্রাস্টের নাম মলিনা রাখলেন, ‘অহল্যা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’।

মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন আড়ম্বর কিছু কম হল না। এথিস্ট মিশনের পুরুষরা ধূতি পাঞ্জাবি পরে সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিল। মলিনা ছিলেন সবচেয়ে খুশি। মহাশ্বেতা জীবনে শাশুড়িকে সে দিনের থেকে বেশি খুশি আর কখনও দেখেননি।

শালপাতার প্লেটে চেটেপুটে প্রসাদ খেয়ে পরীক্ষিৎ বলেছিলেন, “কী বোঁঠান, এখন খুশি তো?”

মলিনা বলেছিলেন, “বেশি সুখ আমার নয় না ঠাকুরপো। ভয় হচ্ছে, সব ঠিক থাকবে তো?”

পরীক্ষিৎ বলেছিলেন, “আমি যত দিন বেঁচে আছি, তত দিন কোনও চিন্তা নেই। আর আমার লাইফলাইন তো তুমি জানোই, কজিরও নীচে নেমে গেছে। এই দ্যাখো।”

পরীক্ষিৎ চাকরিজীবন শেষ করতে পারেননি। অফিসের কাজে বাঁকুড়া যাওয়ার পথে গাড়িতেই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে চলে গেছিলেন। একে একে মলিনা চলে গেছেন, মহাশ্বেতার স্বশ্রমশাহী, প্রভঞ্নের বাবা... সোনার তরীর পুরনো মানুষরা সবাই চলে গেছেন একে একে। শুধু একা তিনিই থেকে গেছেন। আজকাল মহাশ্বেতার মনে হয় আবছা একটা ডাক যেন তিনি শুনতে পান। ধূসর কুয়াশা মাখা একটা ঘাট দেখতে পান মাঝে মাঝে, ঘাটে একটামাত্র ডিঙি নৌকা... মহাশ্বেতার অপেক্ষায়।

অতীত স্মৃতির টান সাজঘাতিক। মহাশ্বেতা চোখ বুজলেন, তাঁর চোখের কোল বেয়ে জলের একটা ফোঁটা নেমে এল।

চোখ বুজে থাকতে থাকতেই মহাশ্বেতা বুঝলেন ঘরের কলরব ধীরে ধীরে কমে এসেছে। জোনাকি তার হোম ডেলিভারির কাজ সামলাতে গেল, উঠে গেলেন মঞ্জুবাও, তাঁর প্রিয় সিরিয়ালের সময় হয়েছে। পারিজাত আর বিদিশা শুধু বসে রইল মহাশ্বেতার বিছানার পাশে।

চোখ বুজেই মহাশ্বেতা এক সময় বুঝলেন সাগর ঘরে ঢুকেছে।

সাগর এসে প্রথমই যন্ত্রের মতো মহাশ্বেতার কপালে হাত ছোঁয়াল। তার পর অ্যাটাচি থেকে যন্ত্রপাতি বার করে প্রেশার মাপল ঠাকুমার, স্টেথো দিয়ে হার্ট সাউন্ড শুনল সময় নিয়ে নিয়ে... মোট কথা ডক্টর সরখেল যা যা করেছিলেন সাগর নিজের হাতেই সবটা আবার করল। অবশেষে ডক্টর সরখেলের প্রেসক্রিপশন টেনে নিয়ে চোখ বোলাতে

লাগল। তার মুখেচোখে দুনিয়ার বিরক্তি। এম এস পাশ করার পর থেকে সে কোনও ডাক্তারকেই ডাক্তার বলে মনে করে না। এই কাজগুলো করার পাশাপাশি সাগর যথারীতি মহাশ্বেতার রোজকার হাজার অনিয়মের নিন্দা মন্দ করতে লাগল বিধিমতো।

পারিজাত হাসিমুখে বলল, “দেখ বিদিশা, তোরা যদি সামলাতে না পারিস আমাকে বলে দে। ঠান্ডিকে আমি আমার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি, কয়েক দিন কড়া শাসনে রেখে পুরো ফিট করে তোদের ফিরিয়ে দিয়ে যাব। কি ঠান্ডি, যাবে তো আমার সঙ্গে?”

মহাশ্বেতা হাসিমুখে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে সাগর, “তাই নাকি? তা পারিজাত, ঠান্ডিকে সামলাতে পারবে তো? নিজে কতটা ডিসপ্লিনড তুমি? চুলে লাল হাইলাইট, হাজারটা টাটু... এ সব দেখেই তো বোকা যায় তুমি কতটা অর্গানাইজড?”

পারিজাত অবাক হয়ে বলল, “এ আবার কী কথা? চুল কালার করলে, টাটু করলে বুঝি ডিসপ্লিনড হওয়া যায় না?”

সাগরের উত্তর তৈরি ছিল, “বেশ, তা হলে বলো, সকালে ক’টার সময় ঘুম থেকে ওঠো? ইউনিভার্সিটির ক্লাস বান্ধ করে সিনেমায যাও কি না বলো। বলো গত সপ্তাহে বৃষ্টি ভিজে চৌরঙ্গীর ফুটপাথ ধরে কেন হটছিলো? নাকি এগুলোরও ডিসপ্লিনের সঙ্গে কোনও রিলেশন নেই?”

পারিজাত চোখ বড় করে বিদিশার দিকে তাকাল। খুব নিচু গলায় বলল, “তোরা দাদাকে সামলা। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করতে আসছে। ঠান্ডি আছে তাই, না হলে এমন ঝড় ঝড়তাম পালাতে পথ পেত না।”

সাগর বলল, “কী বিড়বিড় করছ! আমাকেও বলো, পারিজাত।”

বিদিশা বলল, “আহ! দাদাভাই, তুই থামবি! তোর কি পিছনে লাগা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই! এসেই শুরু করলি!”

এটা বিদিশার কাছে একটা হেঁয়ালি। সে জানে না কেন দাদাভাই আর পারিজাত পরস্পরের কাছে এলেই নেপথ্যে কেউ বারুদ ঠাসা মশলায় আগুন ধরিয়ে দেয়, গোলাগুলি শুরু হয়ে যায় অশান্ত সীমান্তে।

অথচ দাদাভাইয়ের জন্মদিনে পারিজাত নিজের হাতে দাদাভাইয়ের পছন্দের পায়ের সন্দেশ আনে। এই যে দাদাভাই স্ট্রাগল করছে প্রফেশনে, কয়েক দিন পর পর নিজের পরিচিত বৃত্ত থেকে রোগীর রেফারেন্স পারিজাত পাঠিয়ে দিচ্ছে দাদাভাইয়ের চেষ্টায়। আর তার পর দু’জন সামনাসামনি এলেই টম অ্যান্ড জেরির মতো ফাইটিং মোডে চলে যায়। অথচ পারিজাত যখন রবি ঠাকুরের গান গায়, দাদাভাই দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিদিশা জানে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলেও দাদাভাইয়ের ভাল লাগে। না হলে কেউ অমন যোর লাগা চোখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে?

পারিজাত উঠে দাঁড়াল, “চলি রে বিদিশা, চলি ঠান্ডি। রাত হল।”

প্রভঞ্জন ঘরে ঢুকে বললেন, “না পারিজাত। রাত অনেক হয়েছে, একা যেয়ো না। সাগর, একটু এগিয়ে দিয়ে আয় মেয়েটাকে।”

সাগর শীতল স্বরে বলল, “সারাদিন চেষ্টার থেকে সবে ফিরলাম, কেন ফালতু কাজে ইনভলভ করছ আমাকে?”

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই পারিজাত বলে উঠল, “কাকু, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি চলে যাব। আমার জন্য পাহারাদার পাঠাতে হবে না। আমি বরং দু’তিনটে অমন পাহারাদারকে প্রোটেকশন দিয়ে দিতে পারি। আর তা ছাড়া আপনাদের মধ্যে যে স্টাউট ব্যাপারটা ছিল এই জেনারেশনের পুরুষদের মধ্যে সেটা আসবে কোথা থেকে?”

প্রভঞ্জন তবু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। সন্ধ্যাবেলা পার্শ্ব দাসের বলা কথাগুলো তাঁকে চিন্তায় রেখেছে। সত্যিই পাড়ায় অসামাজিক কাজকর্ম বেড়ে গেছে, অন্ধকার রাস্তায় মেয়েটাকে একা ছাড়া ঠিক নয়। তিনি ডক্টর সরখেলের প্রেসক্রিপশন তুলে নিয়ে বললেন, “আমাকে ওষুধগুলো আনতে বেরোতেই হত, চলো তোমাকে অটোয় তুলে দিয়ে আসি।”

পারিজাত চলে গেলে সাগর বলল, “কথার ধরন শুনলি? নেহাত তোর বন্ধু তাই, না হলে আমি ওকে এ বাড়িতে অ্যালাও করতাম না।”

তবে তার মত পান্ডা পেল না। দেখা গেল মহাশ্বেতা আর বিদিশা দু’জনেই পারিজাতের পক্ষ নিল। সাগর অবাক হয়ে চুপ করে গেল। তার ভাবলে অবাক লাগছে, বিদিশা না হয় ইমম্যাচিওর একটা মেয়ে, ঠান্ডি

কী করে ওই উড়নচণ্ডী মেয়েটার সমর্থনে গলা ফাটাচ্ছে!

রাতে মহাশ্বেতাকে একা ছাড়ল না বিদিশা। সে নিজের বালিশ চাদর নিয়ে ঠান্মির বিছানায় চলে এল।

ডিনারের পরে মহাশ্বেতার চার রকমের ওষুধ নিয়মিত চলে। আজ তার সঙ্গে সরখেলের দেওয়া আরও তিন রকম যোগ হয়েছে।

আলো নিবলে মহাশ্বেতা জানতে চাইলেন, “তোর মাস্টারমশাই আজ এলেন না?”

“স্যরের তো আজ আসার ডেট নয়। মঙ্গল আর শুক্রবার।”

“তুই স্যরকে জানিয়েছিস যে, আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি?”

বিদিশা উত্তর দিল না।

মহাশ্বেতা আবার বললেন, “কী রে, বলেছিলি?”

“না ঠান্মি, ফোনে কথা হয় না তো।”

“ও, তা তোর স্যর পড়াচ্ছেন ঠিকঠাক?”

বিদিশা আবার চুপ।

মহাশ্বেতা বললেন, “মামন, ঘুমিয়ে পড়লি?”

“না ঠান্মি, বেলো।”

“স্যর পড়াচ্ছেন ঠিকঠাক?”

“হ্যাঁ, ঠান্মি।”

কিছু ক্ষণ নীরব থেকে মহাশ্বেতা বললেন, “তোর স্যরকে বলিস পরদিন যেন আমার সঙ্গে দেখা করে যায়।”

বিদিশা আবার নীরব।

মহাশ্বেতা সামান্য চিন্তিত। মাস্টারের প্রসঙ্গ উঠলেই মেয়ে গুম মেয়ে যাচ্ছে আজকাল। নাতনিকে নিয়ে দৃশ্চিন্তা হয় তাঁর। চাপা স্বভাবের মেয়ে। সমস্যা হলেও জানাবে না। মহাশ্বেতা ভেবেছিলেন তাঁর আজ রাতেও ঘুম আসবে না। কিন্তু একবেলার রোগ ভোগই তাঁকে কাবু করে ফেলেছে। তার উপর ডক্টর সরখেল হালকা ডোজের একটা ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন। বিদিশার জন্য আবছা একটা আশঙ্কা নিয়েই মহাশ্বেতা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

১১ ৪ ১১

পৃথিবীতে দু’ধরনের মানুষ আছে। এক ধরনের মানুষের মুখ দেখে তাদের মনের ভাব বুঝে ফেলা যায়, আর এক ধরনের মানুষ আছে, যাদের মুখ দেখে মনের ভাবের সামান্যতম ধারণাও পাওয়া যায় না।

অয়ন দ্বিতীয় ধরনের দলে পড়ে। এই মুহুর্তে তার মানসিক অবস্থা শোচনীয়। সে চাইছে এখনই প্রচণ্ড খারাপ একটা কিছু ঘটে যাক, ধাপার মাঠ থেকে আগ্নেয়গিরির মতো লাভা বেরিয়ে ঝলসে দিক শহরটাকে, সাগরের জল ফুঁসে উঠে গ্রাস করে নিক যাবতীয় জনপদ, অথবা ভূকম্প, রিখটার স্কেলে আঠাশ উনত্রিশ... পৃথিবী কয়েক মিনিটে হয়ে যাক ধ্বংসস্তূপ। অথচ তার মুখ দেখে কিছুটা বোঝার উপায় নেই। সে গালে হাত দিয়ে বসে আছে, ভাবুক দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে প্রশান্ত হাসি।

অবশ্য আজ দিনটা যে এরকম যেতে পারে, তা অয়ন সাত সকালেই বুঝে গেছিল। মর্নিং শোজ দ্য ডে।

আজ অয়নের একটা চাকরির ইন্টারভিউ ছিল। প্রথম প্রথম ইন্টারভিউ-এর দিনগুলোয় অয়ন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পড়ত। যোগব্যায়াম, প্রাণায়াম ইত্যাদি সেরে নিজেকে তৈরি করত সে। দিনের পর দিন এ ভাবেই কেটে গেছে। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অয়নের নিষ্ফল ইন্টারভিউ-এর সংখ্যা। আজকাল অয়ন সকালে ওঠে না, ওঠে বোকা করে। কোনওমতে স্নান সেরে, পোশাক পরে ইন্টারভিউ দেওয়াটা মিটিয়ে ফেলতে পারলে সে বেঁচে যায়।

এই পরিবর্তন অয়নের এক দিনে আসেনি। লেখা পরীক্ষাগুলোয় তার পারফরম্যান্স দুর্দান্ত। তার সমস্যা পার্সোনাল ইন্টারভিউ আর গ্রুপ ডিসকাশনে। যে ছেলে পরীক্ষার খাতায় দারুণ উত্তর লিখে আসে, অঙ্ক, অ্যাপ্টিটিউড, জি কে সবকিছুতে যার হাঁকা নম্বর, সেই ছেলে গ্রুপ ডিসকাশনের টেবিলে ঘাড় গোঁজ করে বসে থাকে। এই সব অবস্থায়

সবাই নিজেদের জ্ঞানের ভান্ডার দেখাতে চায়, কিন্তু অয়ন নীরব, কখনও কখনও বাকি ক্যান্ডিডেটদের কেউ বলে উঠত, “আপনার কি কিছুই বলার নেই মিস্টার রায়চৌধুরী?”

অয়ন ঢৌক গেলে, উত্তর দেয় না। ইন্টারভিউ কিছুটা এগোতে না এগোতে প্যানেলের লোকেরা বুঝে যান কোথাও একটা গোলমাল হচ্ছে। এত ব্রাইট ছেলে, ঘনঘন ঘাম মোছে কেন? তাঁরা জানতে চান, “আর ইউ অলরাইট? প্লিজ ফিল কমফোর্টেবল।”

‘কমফোর্টেবল’ হওয়ার কথা শুনে অয়ন আরও অস্বস্তিতে পড়ে যায়, রুমালে ঘাম মুছে দু’-একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। সেই উত্তর হয় টু দ্য পয়েন্ট, যেন বন্দুকের নল সামনে ধরে ক্যান্ডিডেটকে ইন্টারভিউ-এ বসানো হয়েছে। চাকরির বাজার কোনও কালেই সহজ ছিল না, আজকাল প্রতিযোগিতা আরও সাস্থ্যাতিক। সেই বাজারে এ রকম লাজুক, মুখচোরা ছেলের চাকরি হওয়ার কথা নয়। হয়ওনি।

অয়ন অবশ্য হাল ছাড়েনি। রেল, পোস্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, এলআইসি, এসএসসি... হেন পরীক্ষা নেই যাতে সে বসে না। বসে রীতিমতো আটঘাট বেঁধে। অয়ন জানে তার হাতে সময় কম। আর কিছু দিন এ ভাবে চললে বাবা ঘাড় ধরে নিজের ব্যবসায় ঢুকিয়ে নেবে। চেষ্টা অবশ্য বাবা এখনও কম করছে না, কিন্তু বাবার ব্যবসা অয়নের পছন্দ নয়। তবু তার বাবা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এক দিন তিনি অয়নকে ডেকে বললেন, “এ ভাবে তো চলতে পারে না। তোমার দাদা একা ব্যবসার পিছনে খেটে মরছে আর তুমি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ! এ ভাবে কত দিন চলবে?”

অয়ন মৃদু প্রতিবাদ করে, “বাবা, সামনে বেশ কয়েকটা পরীক্ষা আছে, এবার নিশ্চয়ই কিছু একটা লেগে যাবে।”

“গেলেই ভাল। না হলে দাদার পাশাপাশি তুমিও লেগে পোড়ো।”

অয়ন জানে তার সবচেয়ে বড় সমস্যা তার লাজুক স্বভাব। সে ঠিক লাজুক নয়। সব সময় একটা অজানা ভয় তার মধ্যে কাজ করে। মায়ের একেবারে কোলপোঁছা ছিল ছোট্ট অয়ন। হঠাৎ একটা কার্ডিয়াক স্ট্রোকে মায়ের চলে যাওয়ার পর থেকেই সে এমন। চুপচাপ, সব সময় ভিত্তি খরগোশের মতো ভাব, বেশি চাপ নিতে গেলে হঠাৎ হঠাৎ জ্ঞান হারানো... এই সব উপসর্গ মা চলে যাওয়ার আগে ছিল না অয়নের।

আজ সকালেও বেরনোর ঠিক আগে বাবা ধরলেন অয়নকে, “একবার শুভাশিস পালের ওখান থেকে ঘুরে আসবে। অনেক দিনের লেন, একটুও উপড়হস্ত হচ্ছে না। একটু কড়কে দিয়ে এসো। হয় টাকা নিয়ে ফিরো, না হলে অন্তত ফাইনাল ডেট নিয়ে এসো, বুঝেছ?”

অয়নের মতো ছেলের পক্ষে কাউকে ‘কড়কে দেওয়া’ কতটা সম্ভব, সেটা অয়নের বাবা ভালই বোঝেন। তিনি ঘাণ্ড ব্যবসায়ী, ছোটছেলেকে লাইনে আনতে এর থেকে ভাল উপায় তাঁর জানা নেই। তাঁর বিশ্বাস, কেউ সাঁতার শিখতে না চাইলে তাকে অথৈ জলে ফেলে দেওয়া উচিত। হাবুডুবু খেতে খেতে ঠিক শিখে যাবে।

অয়ন বলেছিল, “কিন্তু বাবা, আজ আমার একটা ইন্টারভিউ আছে।”

অয়নের বাবা শান্ত স্বরে বলেছিলেন, “ইন্টারভিউ এর পরেই যেয়ো। শুভাশিস পাল সারাদিন তার অফিসেই থাকে।”

অসহ্য একটা দিনের সেই শুরু। অয়নের অটো মাঝপথে বিগড়ে গেল, অনেকটা হেঁটে মেট্রো স্টেশনে এসে টিকিট কেটে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখল ট্রেন বেরিয়ে যাচ্ছে। পরের ট্রেন এলো পনেরো মিনিট পর। ইন্টারভিউতে অবশ্য আজ একটা নতুন ব্যাপার ঘটল। একটা বড় মাপের কনসালটেন্সি ফার্ম পার্ট টাইম এগজিকিউটিভ চাইছিল। অয়ন তাদের অফিসে গিয়ে দেখল ইন্টারভিউ-এর টাইম হয়ে গেলেও ক্যান্ডিডেট প্রায় নেই। তবু সেই হাতে গোনা ক্যান্ডিডেটদের বসিয়ে রাখা হল আড়াই ঘণ্টা। তার পর আশ্চর্যজনক ভাবে পাঁচ জন ক্যান্ডিডেট এর ইন্টারভিউ হয়ে গেল ঠিক সতেরো মিনিটের মধ্যে।

ইন্টারভিউ প্যানেল বলে কিছু নেই, চিমসে টাইপের চেহারার একটা লোক বসে ছিল টেবিলের ও দিকে। নীল শার্টের ওপর ক্যাটকেট লাল টাই পরে আছেন ভদ্রলোক। দেখে বোঝা যাচ্ছে এই সাহেবি পোশাকে

অনভ্যস্ত। লোকটি বেশি সময় নেয়নি, কিন্তু সেটুকু সময়ের মধ্যেই অয়নকে বিচিৎর সব প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অয়নের সিঁড়ি দেখতে দেখতে তিনি বলেছিলেন, “আচ্ছা, আপনি পাহাড়ে গেছেন?”

অয়ন চমকালেও সাধ্যমতো স্মার্টনেস নিয়ে বলেছিল, “নিশ্চয়ই।”

গন্ডাখানেক চাকরির ইন্টারভিউ দেওয়ার ফলে অয়ন কোনও কিছুতেই অবাক হয় না। সওদাগরি অফিসে চাকরির ইন্টারভিউ-এর সঙ্গে পাহাড় বেড়াতে যাওয়ার গভীর যোগসূত্র থাকলেও থাকতে পারে।

ইন্টারভিউয়ার বলেছিলেন, “পাহাড়ে তো আমিও গেছি, কিন্তু ওই সিমলা কুলু মানালি ধর্মশালা যা-ই বলুন, বর্ষাকালে আমাদের নর্থ বেঙ্গলের যা বিউটি তা আর কোথাও নেই মশাই। আপনি কী বলেন?”

ভাল ব্যাপার হল ভদ্রলোক বেশি ক্ষণ জ্বালাননি অয়নকে। বেরিয়ে এসে ওয়াশরুমে গিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে নিল অয়ন, তাকে এখন শুভাশিস পালের অফিসে তাগাদায় যেতে হবে। বেরিয়ে দেখল পরের ক্যান্ডিডেটেরও ইন্টারভিউ শেষ। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সেই ক্যান্ডিডেট বলল, “শালা! একটা ধুর মাল বসিয়ে রেখেছে। আসলে ক্যান্ডিডেট সব সেট, ইন্টারভিউ-টিউ সব আইওয়াশ বুঝলেন না?”

টি-বোর্ডের সামনে থেকে বাস ধরে বিচ্ছিরি যানজট কাটিয়ে অয়ন যখন শুভাশিস পালের গদিতে এসে পৌঁছাল তখন বেলা পড়ে এসেছে। শুভাশিস পাল অয়নকে দেখে চিনতে সময় নিলেন। এক সময় তার কঁচকে থাকা ভুরু সোজা হতে শুরু হল। আধশোওয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসে শুভাশিস পাল বললেন, “আরে কী সৌভাগ্য! একেবারে ছোট কত্তা যে! এই হারান, একটা টুল এনে দে। ছোটকত্তা প্যান্ট পরে আছেন দেখছেন না? গদিতে বসতে পারেন?”

অয়ন জুতো খুলে শুভাশিস পালের অফিসে ঢুকল। হারান নামের একটা বঁটেখাটো ছেলে টুল এনে দিয়েছে। অয়ন সেখানে বসল না। সে গলার স্বরে সাধ্যমতো কর্তৃত্ব এনে বলল, “আমি বসতে আসিনি শুভাশিসবাবু। বাবা পাঠালেন, একটা পেমেন্ট অনেক দিন ডিউ পড়ে আছে। সেটা নিয়েই উঠব।”

শুভাশিস পাল যেন শুনেও শুনলেন না, তিনি বললেন, “আপনাকে দেখে আপনার বাবার জোয়ান বয়সের কথা মনে পড়ে যায় ছোটকত্তা। তখন ব্যবসায় এত রমরমা হয়নি গুঁর। মার্কেটে দেখা হয়ে যেত কয়েক বার, তখনই বুঝতাম এই লোক রাজা লোক আছে, এক দিন বহুত বড় ব্যবসা করবে। দেখুন, যা ভেবেছিলাম তাই হল।”

বাবা তাকে পাওনা আদায়ের জন্য মাঝে মাঝেই এ রকম লোকদের কাছে পাঠায়। পয়সা ফেরত চাইলে তারা কেউ কেউ রাগারাগি করে বসে, তাদের দাপট দেখে শামুকের মতো নিজের খোলসে গুটিয়ে যায় অয়ন। কেউ বা আবার হাতে পায়ে ধরার উপক্রম করে। এ ক্ষেত্রেও ফল হয় একই। শামুকের মতোই গুটিয়ে যায় অয়ন।

শুভাশিস পাল অয়নকে চুপচাপ দেখেই বললেন, “আরে ছোটকত্তা, ব্যবসা করে তো আমরাও খাই। রাজ কত মানুষ চরাতে হয় জানেন? মুখ দেখে পেটের কথা বলে দিই। শুনবেন? শুনুন তা হলে। আমি বলছি, আজ সকাল থেকে আপনার পেটে কিছুটা পড়েনি। সেই কোন সকালে বাড়ি থেকে ভাত খেয়ে বেরিয়েছেন, ঠিক কি না?”

অয়ন অবাক হল, লোকটা একদম ঠিক বলছে। তার বিস্ময় ভাব কাটার আগেই সে দেখল হারান নামের ছেলেটা বড় ট্রে-তে হরেক খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকেছে। যাবতীয় ভাজাভুজি, জাম্ব ফুড একথলা ভর্তি, পাশাপাশি একটা প্লেটে চার পাঁচ রকমের মিষ্টি।

অয়ন টুলে বসে বিব্রত স্বরে বলল, “আশ্চর্য! এ সবেই কী দরকার? আমি এসেছি জাস্ট পেমেন্টের ব্যাপারে কথা বলতে, আর আপনি প্রায় আমার বাবার বয়সি, আমাকে ‘ছোটকত্তা’ বলে ডাকছেন কেন?”

শুভাশিস পাল হাসিমুখে বললেন, “তার কারণও বলছি, আগে কিছু মুখে দিন। রোদে ঘুরে ঘুরে মুখ আপনার শুকিয়ে গেছে।”

অয়ন কথা বাড়াল না, চুপচাপ একটা প্যাটিস তুলে নিয়ে মুখে দিল। শুভাশিস পালের মুখের হাসি চওড়া হল, তিনি বললেন, “আপনার বাবার ফান্ডিং না থাকলে আজ এই ব্যবসা দাঁড় করাতে পারতাম না। তিনি হলেন আমাদের বড়কত্তা। আর আপনি সেই বড়কত্তার ছেলে, তা

হলে হলেন কি না আপনি ছোটকত্তা?” এই কথা বলে শুভাশিস পাল খুব একটোটা হেসে নিলেন, তাঁর সঙ্গে গলা মেলায় হারান নামের ছেলেটাও।

কাজের কথা কিছুই হল না। শুভাশিস পাল তাঁর আর অয়নের বাবার নানা মজার গল্প বলতে লাগলেন, খেতে খেতে সেই গল্পগুলো শুনতে হল অয়নকে। অয়ন চলে আসার আগে শুভাশিস বললেন, “আমার ছেলেরও আপনার মতোই বয়স হবে ছোটকত্তা। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড-এ ফিন্যানশিয়াল অ্যাডভাইসর। বিয়ের জন্য হাতে বাতি নিয়ে মেয়ে খোঁজা হচ্ছে, তবে সেই হারামজাদার আর মেয়ে পছন্দই হয় না। হবে কেন? সে মহা ত্যাগি ছেলে। এই দেখুন আপনার মাথায় কেমন পাতলা, নরম চুল। পাতলা চুলের মানুষ হয় নরম মনের, আর সেই ছেলের চুল হল শনের মতো, যত মোটা চুল তত ঝামেলার মানুষ।”

অয়ন উঠে পড়ল, তার মনে কুণ্ঠা এখন অনেক বেড়ে গেছে, সেই কুণ্ঠা নিয়েই অয়ন বলল, “বাবা বলছিলেন যদি একটা ডেট অন্তত বলতে পারতেন... মানে, অনেক দিন টাকাটা আটকে আছে তো।”

শুভাশিস পাল বিগলিত হয়ে হাসলেন, “আপনি আপনার বাবাকে বলবেন টাকাপয়সা সব হাতের ময়লা, আজ আছে কাল নেই। কিন্তু মানুষ মানুষে এই যে ভালবাসা, এই যে সম্পর্ক, তার ভালু সবচেয়ে বেশি। টাকাপয়সা বুকে নিয়ে তো আর চিতায় উঠব না ছোটকত্তা, গুঁর পয়সা গুঁর কাছেই ফিরিয়ে দিয়ে যাব... আচ্ছা, রওনা হয়ে যান।”

সন্দের মুখে শুভাশিস পালের গদি থেকে বেরিয়ে এল অয়ন। তার বেশ হালকা লাগছে। ইন্টারভিউ-এর নামে একটা প্রহসনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাকে, টাকা আদায় করতে গিয়ে প্লেট ভরে প্যাটিস পেস্তি খেয়ে এসেছে, বাড়ি ফিরে বাবার মুখোমুখি হতে হবে— তবু তার মনের বিরুদ্ধে করতে যাওয়া কাজগুলো যে শেষ হয়েছে এতেই সে খুশি।

এই হল অয়নের জীবন। তবে ভগবান যাকে মারে, তাকেও ঠিক পুরোপুরি মারে না। সব জানলা-দরজা বন্ধ করে দিলেও ঘরে কয়েকটা ঘুলঘুলি তিনি ঠিকই রেখে দেন। সেখান থেকে যে আলো আসে তা পর্যাপ্ত না হলেও আঁধারের দমবন্ধ ভাব কিছুটা কেটে যায়।

টিউশনিগুলো অয়নের তেমনই ঘুলঘুলি। নিতান্তই শখে টিউশন শুরু করেছিল সে। তখন ভাবেনি শিক্ষক হিসেবে তার খ্যাতি এত তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে যাবে। এখন তার কাছে বেশ কয়েকটা ব্যাচ ইকনমিক্স পড়তে আসে। উচ্চ মাধ্যমিক, অনার্স-এর ছেলেমেয়েই বেশি, হাতে গোনা কিছু মাস্টার্স-এর ছাত্রও আসছে আজকাল। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় বাড়ির বাইরের একটা ঘর এখন অয়নের টিউটোরিয়াল। নামেই টিউটোরিয়াল, আসলে এসকেপ রুট। বাবার ব্যবসা থেকে চোখ সরিয়ে রাখার একটা মাধ্যম। অয়ন ভেবে রেখেছে, যদি সে কোনও দিন চাকরি না পায়, সারাজীবন টিউশনি করেই কাটিয়ে দেবে।

আর তা ছাড়া অয়নের দায়দায়িত্ব তো তেমন কিছু নেই। নিজের ভুলভাল, অজানা ভীতি, চাকরির পরীক্ষা আর টিউশন ক্লাস...সব মিলিয়ে মোটামুটি একটা অভিযোজন করে নিয়েছিল অয়ন। বাবা-দাদার ছত্রছায়ায় আপাত ভাবে মনের আনন্দে দিনগুলো কাটিছিল তার।

হঠাৎ একটা মেয়ে এসে অয়নের সবকিছু গোলমাল করে দিল।

ঘটনাটা শুরু হয়েছিল অত্যন্ত সাদামাটা ভাবে। সকালের ব্যাচ পড়ানোর সময়েই ফোনটা পেয়েছিল অয়ন। মহাশ্বেতা রুদ্র এলাকার জাঁদরেল মহিলা বলে পরিচিত, এক সময়কার কলকাতা কাঁপানো জেনারেল সার্জন, এই পাঁচশি বছর বয়সেও এলাকার নানা সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, সব মিলিয়ে বেশ প্রভাবশালী ফিগার। সেই মহাশ্বেতা রুদ্র যখন নিজের নাতনিকে পড়ানোর প্রস্তাব দিলেন, আপত্তি করার কথা ভাবেইনি অয়ন। তবে তাঁর নাতনি ব্যাচে এসে পড়বে না, তাকে পড়াতে হবে বাড়িতে গিয়ে।

কাণ্ডটা ঘটে গেল সোনার তরী-তে অয়ন হাজির হওয়ার প্রথম দিনেই। দেখা গেল মহাশ্বেতা রুদ্র সামান্য রাশভারী হলেও আলাপী। অয়নের সঙ্গে প্রথম দিনই দীর্ঘ সময় তিনি হাজারো গল্প করলেন, অয়নের সম্পর্কে জানতে চাইলেন খুব খুঁটিয়ে আর তার পর তিনি গলা তুলে ডাকলেন, “মামন, এক বার এ দিকে এসো।”

ঘরের পর্দা সরিয়ে বিদিশা ঘরে ঢুকেছিল। একটা পুরনো নাইট পরে ছিল বিদিশা, বাইরের লোকের সামনে আসবে বলে ওপরে একটা হাউজকোট জড়িয়ে এসেছে। গুচ্ছের তেল দিয়ে টান করে বাঁধা চুল, ন্যূনতম প্রসাধনের ছাপ ছিল না কোথাও। তবু তার দিকে তাকানোমাত্র অয়নের সর্বনাশ হয়ে গেল। মহাশ্বেতা আবিষ্কার করেছিলেন এই মাস্টার ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় তোতলাচ্ছে। আশ্চর্য! এত ক্ষণ তাঁর সঙ্গে ছেলের গল্প করল এক বারও তো খেয়াল করেননি!

সে দিন সোনার তরী থেকে বেরনোর সময়ই পৃথিবীটা অন্য রকম লেগেছিল অয়নের। চেনা ফুটপাথ, চেনা চায়ের দোকানের গজল্লা, ভিআইপি রোডের উদ্ভাদপ্রায় ছুটে যাওয়া অফিস টাইমের ট্রাফিক সব যেন প্রথম বার দেখল সে। তার হঠাৎ মনে হতে লাগল পৃথিবী এক আশ্চর্য সুন্দর জায়গা। সেই রাতে অয়ন ঘুমোতে পারল না। অয়ন ভেবেছিল এটা একটা সামান্য ঘটনা, কিন্তু দেখা গেল রাতের পর রাত একটা রঙ ওঠা হাউজকোট পরা মেয়ের চিন্তা তাকে ঘুমোতে দিচ্ছে না।

অয়নের অবস্থা হল পাগলপারা। পড়ানোয় মন নেই। কোনও মতে টিউশন চালাচ্ছে, এমনকি তার প্রিয় কাজ অর্থাৎ ইন্টারভিউ দিতে পর্যন্ত যায় না আজকাল। ক্লাস চলাকালীন ছাত্রছাত্রীরা জিজ্ঞেস করতে লাগল, “স্যর, আপনার কি অসুখ করেছে?”

ছেলের এই অবস্থা অম্বরীশ রায়চৌধুরীরও চোখ এড়ায়নি। অয়নের চোখের তলায় পুরু কালি পড়ায় এবং ওজন প্রায় সাত আট কেজি কমে যাওয়ার পর তিনি ছেলেকে জোর করে ডাক্তারের কাছে পাঠালেন।

ডাক্তারের কাছে গিয়ে অয়ন নিজের সমস্যা ঠিকঠাক বলে উঠতে পারল না। সে শুধু বলল, তার আজকাল চুপচাপ থাকতে ভাল লাগে, অকারণে বুক ধড়ফড় করে, আর দৈনন্দিন কাজে দ্রুত আগ্রহ হারাচ্ছে।

ডাক্তারকাকু সেই ছোটবেলা থেকে অয়নকে দেখছেন। মা মারা যাওয়ার পরে ছেলের আশ্চর্য রকমের অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে, এটা তিনি জানতেন কিন্তু এ বারের উপসর্গ অন্য রকম। তিনি সমস্ত রকম পরীক্ষা করেও অয়নের মধ্যে সামান্যতম শারীরিক বিচ্যুতি পেলেন না।

অয়নের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তাঁর মনে সামান্য দুষ্টু এক চিন্তার উদয় হল। তিনি মুচকি হাসলেন। এই হাসি ডাক্তার দু’রকম পরিস্থিতিতে হাসেন— যখন রোগের সমস্তটা তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, আর যখন রোগের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি প্রেসক্রিপশন লেখা শুরু করলেন।

অয়ন প্রেসক্রিপশনের উপর ঝুঁকে পড়ে বলল, “কী বুঝলেন ডাক্তারকাকু? এনিথিং সিরিয়াস?”

ডাক্তারকাকু লঘু স্বরে বললেন, “সিরিয়াস বলে সিরিয়াস! এই সমস্যা নিয়ে কবি সাহিত্যিকদের কাছে গেলে তাঁরা চিটে গুড়, কাঁঠালের আঠা ইত্যাদি উপমা দিয়ে সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু ভায়া, আমি তো কবি নই, আমি নীরস ডাক্তার। আমার ধারণা কোনও বিষয় নিয়ে দীর্ঘ দিন গুমরে আছ তুমি, মনে চেপে রেখে দিয়েছ। দু’টো ভিটামিন দিলাম। জলে দ্রবীভূত ভিটামিন নয়, ও ভিটামিন পেছাপের সঙ্গে বেরিয়ে যায়, তোমাকে দিয়েছি তেলে দ্রবীভূত ভিটামিন, গায়ে লাগবে বুঝলে! গায়ে বল পেলে মনেও বল পাবে, আর হয়তো তুমি মনের কথাও বলে ফেলতে পারবে।”

অয়নের তো ধরনী-দ্বিধা-হও দশা। প্রেসক্রিপশন নিয়ে কোনওমতে চেষ্টার থেকে পালিয়ে আসতে যাচ্ছিল, তখনই ডাক্তারকাকু বলে উঠেছিলেন, “যত দিন যাবে এই অসুখ কিন্তু ততই ক্রমিক হয়ে যাবে। যাকে যা বলার খোলাখুলি বলে দাও ইয়ং ম্যান। এই তো বয়স।”

ওষুধ কাজ করেনি। মনের কথা বলা হয়ে ওঠেনি অয়নেরও। এমনতেই সে মুখচোরা। তার ওপর অতীত প্রেমের অভিজ্ঞতা প্রায় নেই বললেই চলে। তার থেকে বড় কথা, বিদিশা তার ছাত্রী, তার থেকেও বড় কথা সে মহাশ্বেতা রুদ্রের নাতনি।

ওষুধ তেমন কাজ দিল না। খারাপ ব্যাপার হল আজকাল অয়ন ঘুমের ওষুধ খাওয়া ধরেছে। কাঁহাতক আর রাত জেগে জেগে পারা যায়। পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার ক্ষীণ চেষ্টা অয়ন করছিল কিন্তু এরই মধ্যে ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেল।

সেদিন সোনার তরী-তে নির্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই পৌঁছে গেছিল অয়ন। মহাশ্বেতা বলেছিলেন, “যান মাস্টারমশাই, তাড়াতাড়ি হয়েছে তো কী? মামন ওর ঘরেই আছে, আপনি চলে যান।”

বিদিশার ঘরের দরজা ভেজানো। প্রথা অনুযায়ী অয়নের উচিত ছিল সেই দরজায় হালকা টোকা মারা। বেখেয়ালে অয়ন দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল। ঘরের কোণে পোশাক পাল্টাচ্ছিল বিদিশা। দরজার দিকে পিঠ করে। তার পরনে তখন শুধুই কালো রঙের লেগিংস, চওড়া অনাবৃত পিঠে ছড়িয়ে আছে বাদামি চুলের গোছা।

মুহূর্ত্থানেকের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গেল অয়ন। সে যা দেখছে তা যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না তার। মানুষ এত সুন্দরও হয়! কয়েক সেকেন্ড মাত্র, সংবিৎ ফিরে অয়ন প্রায় ছিটকে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল, দরজায় শব্দ হল খট করে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে প্রায় কাঁপতে লাগল অয়ন।

একটু পরে বিদিশা বাইরে এসে শীতল স্বরে বলল, “আসুন স্যার।” অয়ন কাঁপতে কাঁপতেই চেয়ারে গিয়ে বসল।

বিদিশা কোনও প্রশ্ন করল না। সরাসরি বই খুলে জিজ্ঞেস করল, “আগের দিন মাল্টি-কো-লিনিয়ারিটি শেষ হয়েছিল, আজ টাইম সিরিজ ধরবেন বলেছিলেন।”

অয়ন কাঁপতে কাঁপতে বলল, “স্যরি, আমার নক করা উচিত ছিল।” বিদিশা বই থেকে মুখ না তুলেই বলল, “ঠিক আছে স্যর, আমি বুঝতে পেরেছি।”

অয়ন এবার প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, “আই অ্যাম রিয়েলি স্যরি বিদিশা।”

বিদিশা মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল, অয়নের মুখ রক্তহীন, চোখে দারুণ বিপন্নতা। সে বলল, “স্যর, আপনার শরীর খারাপ লাগছে? নিন, একটু জল খান।”

অয়নের হাত কাঁপছে, সেই কাঁপা কাঁপা হাতেই সে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল। বিদিশার ভয় হল, স্যর এ বার অজ্ঞান না হয়ে যায়। তার আশঙ্কা সত্যি প্রমাণ করতেই যেন অজ্ঞান হয়ে চেয়ার থেকে মেঝেতে পড়ে গেল অয়ন।

বাড়িময় তুলকালাম পড়ে গেল। সবাই জমায়েত হল বিদিশার ঘরে। অয়ন যখন চোখ মেলল তখন সে বিদিশার বিছানায় শুয়ে আছে, তার চোখেমুখে জলের ছিটে দিচ্ছে সাগরনীল।

সবার শেষে এলেন মহাশ্বেতা, তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, “কী ব্যাপার, এত হইচই কিসের?”

জোনাকি ফিক করে হেসে বলেছিল, “মাস্টার আছাড় খেয়েছে বড়মা। মুগী আছে মনে হচ্ছে।”

লজ্জায় গ্লানিতে অয়নের মরে যেতে ইচ্ছে করেছিল। ছোটবেলার অসুখটা এখনই অ্যাটাক করল? এই বাড়ির সবার মাঝখানে, এই সময়ে? বিদিশার সামনে? অয়নের ইচ্ছে করেছিল সে আবার অজ্ঞান হয়ে যাক, তার চোখের সামনে থেকে করুণা আর উৎকণ্ঠা ভরা বিদিশার মুখটা মুছে যাক চিরতরে।

এ ভাবেই চলছে। অয়ন নিয়ম করে পড়াতে যাচ্ছে বিদিশাকে। তার বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা, ঘুমের ওষুধ একই রকম ভাবে চলছে। বিদিশাকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি অয়ন, সম্ভবত কোনও দিনই পারবে না।

আজ শুভাশিস পালের গদি থেকে বেরিয়েই বিদিশার ফোন পেয়েছিল সে। বিদিশা জানিয়েছে মহাশ্বেতা এক বার তার সঙ্গে দেখা করতে চান। অয়ন কি আজ এক বার আসতে পারবে?

অয়ন এসেছে। মহাশ্বেতা এ কথা সে কথা বলার পরেই তার দরকারি কথা বলেছেন যা শুনে অয়ন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। তার মুখ দেখে কিছুই বোঝার জো নেই অথচ তার বুকের ভিতর একটা রোডরোলার সব স্বপ্ন, আশা গুঁড়িয়ে তছনছ করে ফেলেছে।

মহাশ্বেতা কিছুক্ষণ অয়নের দিকে তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, “মাস্টার, গত কয়েক মাসে আপনি আমাদের পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছেন। তাই আজ যখন আমরা বিদিশার বিয়ের কথা ভাবছি, তখন মনে হল ব্যাপারটা আপনারও জানা দরকার।”

অয়ন সামান্য ঘাড় নাড়ল।

মহাশ্বেতা বললেন, “ওই ম্যাট্রিমনি সাইটগুলোয় চেষ্টা তো হচ্ছেই, তবে আপনাকে বলি মাস্টারমশাই, পুরনো দিনের মানুষ তো, ও সব খুব একটা আস্তা নেই। আমি নিজেই কয়েক জনকে বলছি, তাই ভাবলাম আপনার তো অনেক জায়গায় যাতায়াত, দেখুন না, আপনার ছাত্রীর জন্য কোনও স্যুটেবল ম্যাচ খুঁজে পান কি না?”

অয়নকে নীরব দেখে মহাশ্বেতা বললেন, “জানি না আপনি খারাপ ভাবছেন কি না, তবে এই অল্প সময়ে যে কারণেই হোক আপনাকে আমার বেশ আপন মনে হয়েছে। আর এমন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তো আপনজনের কথাই আগে মনে আসে, কি মাস্টার, তাই তো?”

অয়ন মুষড়ে পড়া গলায় মিনমিন করল, “না না, অসুবিধের কী আছে। ভালই লাগল, আপনি নিজে বললেন...”

মহাশ্বেতা নরম স্বরে বললেন, “শরীরটা ভাল যাচ্ছে না মাস্টার। যাওয়ার আগে যদি মেয়েটার বিয়েটা অন্তত দেখে যেতে পারি...”

“না না, এ রকম বলবেন না। আপনি এখনও অনেক দিন থাকবেন আমাদের মধ্যে।”

মহাশ্বেতা হাসলেন, “আমার বয়স তো আপনার অজানা নয়, তবুও এ কথা বলছেন? যাই হোক, বলুন, পারবেন তো ছাত্রীর জন্য একটা রাজপুত্রের মতো ছেলে খুঁজে আনতে?”

অয়নের বুক চিরে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। হাজার ওয়াটের হ্যালোজেন আলোর মতো অন্য যুবাযুগ্মদের সামনে সে এক টিমটিম করে জ্বলা প্রদীপ মাত্র। বীরভোগ্যা এ বসুন্ধরায় তার মতো এক কাপুরুষের জীবনে বিদিশার মতো রাজকন্যা পা রাখবেই বা কেন?

মলিন হাসল অয়ন। তার পর মাথা নাড়ল, “অবশ্যই পারব ম্যাডাম। আপনি দেখবেন, আমি ঠিক পারব।”

১৫

জোনাকি হনহন করে হাঁটছে রাস্তা দিয়ে। তার পায়ে লাল হাওয়াই চটি, পরনে হলুদ সালাওয়ার, গাঢ় গোলাপি কামিজ। সালাওয়ার ঢলঢলে, কামিজ গায়ে এঁটে আছে। এটা জোনাকির পছন্দের কামিজ। জিনিসটা বিদিশা দিদিমণির উচ্চ মাধ্যমিকের সময়কার। এখন আর বিদিশা দিদিমণি এই ড্রেস পরে না। জোনাকির কাছে এটা একটা সম্পদ, তুলেই রাখে বেশিরভাগ সময়। তার ধারণা এই কামিজে তাকে আবেদনময়ী দেখায়। শরীরের ভাঁজ, খাঁজ ফুটে ওঠে বেশি। আজ একটা বিশেষ দিন, তাই এই কামিজ পরে বেরিয়েছে সে।

বেরোনোর সময় মঞ্জুষার কাছে গিয়ে জোনাকি বলেছে, “ছোটমা, একটু বাইরে থেকে আসি। কাজ আছে।”

জোনাকির দিকে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে থেকে মঞ্জুষা জানতে চেয়েছিলেন, “এত সেজেগুজে চললি কোথায়?”

জোনাকি বলেছিল, “রেশন কার্ডের বামেলা হচ্ছে ছোটমা। আজ দালালের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করেই ফিরব। কত আর লাগবে, ধরো এই দু’-আড়াই ঘণ্টা।”

মঞ্জুষা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, সুড়ত করে বেরিয়ে এসেছে জোনাকি। ছোট মা একবার ধরলে লম্বা সময়ের জন্য আটকে যেত সে। হাজার প্রশ্ন, কেন যাচ্ছি, সমস্যা কোথায়, আবার চোখে কাজল পরা হয়েছে, দেখিস, ফিরবি তো? অন্য কাজ ধরলি নাকি?...

জোনাকির মাথা একটা ক্যাটকেটে লাল ওড়না দিয়ে ঢাকা। আকাশে মধ্যদিনের সূর্য তাপ ছড়াচ্ছে যথারীতি। তবে মাথায় ওড়না দেওয়া সেই কারণে নয়। রোদ, বৃষ্টির অভোস জোনাকির ভালরকম আছে। আসলে জোনাকি চাইছে নিজের মুখ আড়াল করতে। ওড়নার ফাঁক দিয়েই মাঝেমাঝে শঙ্কিত চোখে চারপাশ তাকাচ্ছে সে। ভেবেচিন্তেই এই দুপুরের সময়টা বেছে নিয়েছে জোনাকি, তবু ভয় যাচ্ছে না। জোনাকি চায় না এই সময় তাকে কেউ দেখতে পাক।

পিচ রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকের মাটির পথে নেমে গেল জোনাকি। এখন তার ডান দিকে একটা মাঝারি খাল আর বাঁ দিকে ছোট ছোট বুপড়ি

টাইপের ঘর। জায়গাটার নাম খালপাড় বস্তি। বস্তির মধ্যে একটা ফাঁকামতো জায়গায় এসে কিছুক্ষণ দাঁড়াল জোনাকি। চারপাশ আর এক বার দেখে নিয়ে সে একটা বুপড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

মাটির বুপড়ি, মাথার ওপর টালির ছাউনি। বেঁটে দরজা দিয়ে মাথা নিচু করে বুপড়ির ভিতরে ঢুকল জোনাকি। ঘরে একটামাত্র জানলা তাও অর্ধেক বন্ধ। বাইরে এখন চড়া রোদ্দুর, ঘরের ভিতর চোখ সইয়ে নিতে সময় লাগল জোনাকির। ছোট ঘরে আরও ছোট একফালি খাট, খাটের ওপর মাদুর পাতা, তার ওপর খুব ছোট পাতলা তোষক, জায়গায় জায়গায় তোষক ছিঁড়ে গিয়ে তুলো বেরিয়ে এসেছে।

খাটের কোণে পা ঝুলিয়ে বসে আছে ভদকাই।

তার পরনে নোংরা একটা চেক চেক লুঙ্গি ছাড়া আর কিছুই নেই। একমনে বিড়ি ফুঁকছিল সে, জোনাকিকে দেখে তার মুখ আলো আলো হয়ে উঠল। একটা বড় টান দিয়ে বিড়ির শেষটুকু জানলার বাইরে ছুড়ে ফেলল ভদকাই, বিহ্বল স্বরে বলল, “জোনাকি, তুই এসেছিস!”

তাদের দু’জনের শেষ দেখার পর প্রায় বছর ঘুরতে চলল। জোনাকির ইচ্ছে করছে দু’চোখ ভরে মানুষটাকে এক বার দেখতে, কিন্তু এই সময় বোঝাপাড়ার, নরম হলে চলবে না।

জোনাকি সরাসরি তাকাল না ভদকাইয়ের দিকে, “ডেকেছ কেন, তাই বোলা।”

ভদকাই বলল, “কেন রে? তোকে ডাকতে আমার কারণ লাগবে! বিয়ে করা বো না? রেজিস্ট্রি কাগজ আছে, সতেরো জন কন্যাত্রী খাইয়ে ঘরে তুলেছিলাম তোকে, ভুলে গেছিস?”

জোনাকি প্রভাবিত হল না। সেই ঘর আর নেই, সময়টাও ফুরিয়ে গেছে সেই কবে। পুলিশের তাড়া খাওয়া ভদকাই নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে একটা বন্ধুর বস্তিঘরে এসে আছে এখন। বন্ধুর মোবাইল ফোন থেকে কাল একটু বেশি রাতেই ফোন করেছিল জোনাকিকে। জোনাকি তখন হোম ডেলিভারির বেঁচে যাওয়া খাবার ফ্রিজে তুলে বাসন মাজতে বসেছিল। বাড়ির সবার রাতের খাওয়া হয়ে গেছিল। ওই সময়টা জোনাকি একলাই থাকে।

প্রথমে ভদকাইয়ের গলাটা শুনে চিনতে কয়েক মুহূর্ত লেগেছিল জোনাকির। ফোন পেয়ে অবাক তো হয়েছেন, আরও অবাক সে নিজেই নিজেকে করেছে। কত দিন হয়েছে তাদের যোগাযোগ নেই? বছরও পেরোয়নি। এরই মধ্যে সে ভদকাইয়ের গলার স্বর ভুলে গেল!

ভদকাই অবশ্য সে সবার তোয়াক্কা করেনি। হাউমাউ করে কেঁদে ককিয়ে একসা করেছিল। তার নাকি দারুণ বিপদ, ছোটবেলার বন্ধু এই বিপদের দিনে তাকে মাথা গোঁজার আশ্রয়টুকু না দিলে এতদিনে শয়তান লোকেরা তাকে নিকেশ করে দিত। জোনাকিকে এক বার দেখতে তার বড় ইচ্ছে হচ্ছে, বন্ধুর জায়গাটা তো জোনাকি চেনেই, এক বার কি সে ভদকাইয়ের কাছে আসতে পারে না! জোনাকি কি নিজের স্বামীকে একেবারে ভুলে গেছে... এমন সব আদিখ্যেতার কথা।

জোনাকি কথা বলতে পারেনি, ভদকাই নিজেই একতরফা বকবক করে গেছিল। কথার শেষে কাতর ভাবে আবার আসতে বলেছিল জোনাকিকে। জোনাকি পান্ডা দেয়নি, নীরবে ফোন রেখে দিয়েছিল। পুরুষের কত রূপ যে দেখবে! এই ভদকাই একটা রাতও জোনাকিকে ছেড়ে থাকতে পারত না। দু’দিনের জন্য বাপের বাড়ি গেলেও রাতের দিকে টোটো গ্যারেজ করে সেই বাড়িতে গিয়ে হাজির হত ভদকাই। বলত, “তোকে পাশে না পেলে রাতে ঘুম আসে না রে জোনাকি!”

আহা! কী প্রেম!

আবার এই লোকই বাজে পাড়ার মেয়ের চক্রে পরে রাতের পর রাত বাড়ি ফেরেনি। জোনাকি বাধা দিলে শোনেনি, এক বার তো জোনাকিকে মাজায় লাথি মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছিল ভদকাই। তার পর পুলিশ কেসে ফেঁসে এক বছর বৌ ছেড়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে, তার জন্য জোনাকিকে বস্তির ঘর থেকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। জীবনে প্রথম বার থানা-দর্শন, মেয়েপুলিশের চড়-থাপ্পড় খাওয়া।

এত সহজে সে সব কথা ভুলে যাবে জোনাকি!

সারা রাত গুম মেরে থেকেছিল সে। ভোর থেকে কোনও কাজে মন

বসেনি। বেলা বাড়লে অবশ্য জোনাকি সময় নিয়ে স্নান করেছে, সুগন্ধী সাবান মেখেছে সারা গায়ে। ভদকাইয়ের সোহাগের কথা মনে পড়ে কলপাড়ে ভিজে গায়েই কাঁটা দিয়েছে তার। পরিপাটি পছন্দের পোশাক পরে, কাজের বাড়িতে মিথ্যে অজুহাত দিয়ে তারপর জোনাকি হাজির হয়েছে ভদকাইয়ের কাছে।

এখনও সরাসরি ভদকাইয়ের দিকে না তাকিয়েও জোনাকি বুঝতে পারছে তার ওজন অনেক কমে গেছে। মুখে চোখে কেমন একটা চোর চোর ভাব। অবশ্য হবে নাই বা কেন, চুরি চামারি করেই তো শুনেছে আজকাল দিন কাটে।

ভদকাই বলল, “একটু বসবি না জোনাকি? কত দিন দেখি না তোকে। এক বার দেখব বলেই তো এত রিস্ক নিয়ে এই ঘরে এলাম। বেশি কিছু চাই না। এক বার পাশে এসে তো বোস।”

জোনাকি তাও কাছে এল না, ঝাঁঝিয়ে উঠল, “কেন? সেই যে মেয়েছেলেটার কাছে পড়ে থাকতে, সে আর কাছে আসতে দেয় না যে, বৌ এর দিকে মন এসেছে?”

বলেই থমকে গেছে জোনাকি। কথাটা হঠাৎ মনে করিয়ে দিয়েছে যে তারও একটা বর আছে, সেই বর পুলিশের থেকে লুকিয়ে বেড়ায়, সেই বর বাঁধা মেয়েমানুষ ফেলে তার কাছে আশ্রয় চাইতে এসেছে।

ভদকাই মাথা নাড়ছে, “কত বড় যে ভুল হয়েছে! ও আমার সর্বনাশ করে ছেড়েছে। ও যে কত বড় ডাইনি মাগি ছিল তা যদি আগে জানতাম।”

জোনাকি ভুরু কঁচুঁক করে তাকাল, তার পর খাটের এক কোণে বসল, ভদকাই এর সঙ্গে দূরত্ব রেখে। তারপর বলল, “কী হয়েছে?”

ভদকাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, “সেই কবে থেকে আফজল ভাইয়ের দলে কাজ করি। শালা শুধু খাটিয়ে মারে, পেমেণ্ট খুব কম, এ দিকে যন্ত রিস্কের কাজ সব করবে এই ভদকাই। তা আমিও চূপ ছেলাম। পয়সা তো কিছু পাওয়া যায়, আর তা ছাড়া আফজল ভাই মাগনায় খাটানোর লোক নয়। কানাঘুষো শুনি এ বার নাকি স্পেশ্যাল প্ল্যানে আমাকে নেওয়া হবে। পেমেণ্ট, রেসপেক্ট শালা সব তিনগুণ হয়ে যাবে।”

“রেসপেক্ট! তোমাদের ওই দু'নম্বরী ধান্দায় আবার রেসপেক্ট! হাসিও পায় সত্যি। বাঁটা মারি অমন রেসপেক্টের মুখে!”

ভদকাই গুটিয়ে গেল, কিছু ক্ষণ গোঁজ হয়ে বসে রেখে একটা বিড়ি ধরাল ভদকাই, তার পর বলল, “আফজল ভাইয়ের লোকেরা একটা মেয়েকে তুলেছিল। এই এতটুকু প্যান্ট, কাঁধ খোলা ড্রেস, শালি মাত্র যোলো বছর বয়সে তার কী রোয়াব! কিডন্যাপ করে এনে তো আমাদের পুরো গ্রুপের মাথায় হাত! এই মেয়েকে সামলানো কি মুখের কথা! বাঁকেই মরে যাচ্ছি আমরা। তুই বল জোনাকি, তুইও তো যোলো বছরের ছিলা। এত রঙটঙ কি জানতিস বল তো ওই বয়সে!”

“আহ! যা বলছ তাই বলো। আমাকে টানছ কেন?”

ভদকাই থতমত খেয়ে আবার বলল, “তা একটা ব্যাপার ভাল জানিস তো। মেয়েটার বাড়ির লোক ঝামেলা করেনি। এক কথায় টাকা দিতে রাজি হয়ে গেল। পুলিশের ঝঞ্ঝাট নেই, ফালতু বাওয়াল নেই। কোথায় পয়সা রাখতে হবে বলুন, রেখে দিচ্ছি। মেয়ে যেন ঠিকঠাক ঘরে আসে। তা, যেমন কথা তেমনি কাম। টাকা পেয়ে গেলে আফজল ভাই বলল, ‘যা ভদকাই, মালটাকে বাড়ির পাশের গলিতে নিয়ে গিয়ে হাত পা মুখ বেঁধে ফেলে আয়। বাড়ির লোক ঠিক খুঁজে নেবে।’ তো আমি গেলাম। আফজল ভাই-এর ড্রাইভারের পাশে আমি, পিছনের সিটে চিড়িয়াটাকে হাত পা মুখ বেঁধে ফেলে রেখেছি। নামাবার একটু আগে দেখি মেয়ে গোঁগোঁ শব্দ করছে। মুখের বাঁধন খুললে বলে, ‘আঙ্কল, জল দাও, তেষ্টা লেগেছে।’ তো আমি মেয়েটাকে জল দিয়ে আবার মুখ বাঁধতে যাচ্ছি, বলল, ‘আমার মুখ বাঁধতে হবে না আঙ্কল, হাতটাও খুলে দাও, আমি চূপচাপ নেমে যাচ্ছি।’ আমার কেমন মায়া হল জানিস, দিলাম হাত খুলে। তখন কী জানি ওই মেয়ে কী কৃষ্টি চিজ! নামানোর আগে সে কৃষ্টি দিল আমার মুখের কাপড় ধরে টান। তিন-চার সেকেন্ড কিন্তু তারই মধ্যে যা দেখার দেখে নিয়েছে। আমি তো গাড়ি নিয়ে তখুনি হাওয়া কিন্তু সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছিল। সব ক’টা থানায় আমার ছবি বুললেছে। পার্মানেন্ট তাড়িপার হয়ে গেলাম রে জোনাকি।”

“বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে। হাত খোলার কী দরকার ছিল? মেয়েছেলে দেখলে তোমরা মন্দাব্যাটার সব টাইট হয়ে যাও, তাই না? শালা সবক’টার নোলা স্কসক করে ওঠে।”

ঘাড় বুলিয়ে বসে আছে ভদকাই। তার মুখের চোর-চোর ভাব প্রতি সেকেন্ডে একটু একটু করে বেড়ে চলেছে। তার কথা এখনও শেষ হয়নি। এটুকু শুনেই জোনাকি রেগে আশুন। বাকিটুকু শুনে কী করবে ভাবতেও পারছে না ভদকাই। তবে আজ সবটা বলবে সে। ভদকাইয়ের আসল দূরবস্থাটা জানা প্রয়োজন জোনাকির।

ভদকাই মাথা নিচু করেই বলল, “সমস্যা আরও আছে জোনাকি, আমার ইয়ে আটকেছে ফাটা বাঁশের মাঝখানে।”

জোনাকি বলল, “এর পরেও আছে? পুলিশের খাতায় পাকাপাকি ভাবে নাম উঠে গেল, তার পরেও আবার কী বাকি থাকে?”

“থাকে রে জোনাকি, থাকে। মেয়েটার কিডন্যাপিং-এর পর থেকেই আফজল ভাই আমার ওপর একটু খচে ছিল। তার ওপর একটা বিরাট মালের দায়িত্ব নিতে হল। তুই এল-এস-ডি চিনিস জোনাকি?”

“কী!”

“চিনিস না তো, জানতাম। আমেরিকা থেকে আসে। নেশার মাল। আমরা যেমন বাবার প্রসাদ পাই সে রকমই। তবে নেশার গুণে সব নেশার ঠাকুরদা। আন্ধেক ডোজ পড়লেই মনে হবে পৃথিবীতে ব্যাখা দুঃখ কিসসু নাই, শুধু হাওয়ায় উড়ছি। হরিপদ কেরানিদের চিজ নয় রে, এর কাস্টমার হচ্ছে শহরের রইস লোকদের বিগড়ে যাওয়া ছেলেমেয়েরা। পলিটিশিয়ান, বিজনেসম্যান, বড় ফিল্মস্টার... এই সব ঘামা ঘামা পাবলিকগুলা। ঠিক ছিল পর দিনই ডিস্ট্রিবিউট করা শুরু করবে আফজল ভাইয়ের লোকেরা। আমার এ দিকে অনেক রাত হয়ে গেছে, ওই জিনিস নিয়ে তো আর নিজের বাসায় যাওয়া যায় না, তাই আমি...”

“মালটা হারিয়ে ফেলেছিস?”

“আমি রাত পর্যন্ত ডালিমের ঘরে ছিলাম। চলে আসার সময় বললাম, খুব দামি জিনিস আছে প্যাকেটে, সামলে রাখিস। কিন্তু পরদিন গিয়ে দেখি...”

“ডালিম হাওয়া, তাই তো?”

“হ্যাঁ জোনাকি, ডালিমের ঘরে তাল। ফোন করলে ফোন কেটে দিচ্ছে। সে যে কী বাজে অবস্থা। এ দিকে আফজল ভাই তো কষিয়ে লাথি মারল আমায়, বলল, ‘শালা রেন্ডি কা আউলাদ, একটা কাম ঠিক সে হোয় না তোকে দিয়ে! একবার কিডন্যাপ করতে গিয়ে মুহ দিখায়ে আসিস, এক বার এল-এস-ডি গায়েব করে দিস! কিতনেকা মাল থা পাতা হায়? চালিস লাখ... কৌন চুকায়েগা, তেরা বাপ?’”

জোনাকি হতভম্বের মতো তাকিয়ে আছে ভদকাইয়ের দিকে।

ভদকাই বলল, “আফজল ভাই হাতের কাছে পেলে আমাকে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে বলেছে। আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি জোনাকি, এক দিকে পুলিশ আর এক দিকে আফজল ভাইয়ের লোকেরা।”

ভদকাই দু’হাতে মাথার চুল খামচে ধরে মাথা নিচু করল।

জোনাকি বুঝল লোকটার ওপর একটু একটু মায়া হতে শুরু করেছে তার। আবার অসহায় রাগে গা-ও জ্বলছে। সে ভদকাইয়ের কাছে সরে এসে বলল, “এত বিশ্বাস করতে মেয়েটাকে? তার হাতে চল্লিশ লাখের মাল দিয়ে এলে?”

ভদকাই মুখ তুলে তাকাল, চোখে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি।

জোনাকি আবার বলল, “পিছনে দম নাই তো ওই সব কাজ কেন করতে গেছিলে তুমি? টোটে চালিয়ে তো আমরা খারাপ ছিলাম না।”

“আমি বড় হতে চেয়েছিলাম রে জোনাকি, মস্ত বড় মানুষ। অনেক পয়সা, অনেক ক্ষমতা...”

কথাটা পুরো ঠিক নয়। কাজগুলো শুধু পয়সা কামানোর জন্য করেনি ভদকাই। সকাল থেকে শুরু করে সারাদিন গা-গরম করা বাতাবরণ, একে চমকাও, ওকে ঠুকে দাও, এখানকার মাল পুলিশের চোখ এড়িয়ে ওখানে নিয়ে তোলো... এ সবার একটা আলাদা উত্তেজনা পেয়ে বসেছিল তাকে। আর সন্ধে হলে বিলিতি মাল আর ডালিমের নরম শরীরটা তাকে মাদকের মতো টানত। মনে মনে কখন যেন এই

জীবনটাকে ভালবেসে ফেলেছিল ভদকাই।

জোনাকি কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “রোজ যেতে তুমি ওই মেয়েছেলেটার ঘরে!”

ভদকাই নীরবে তাকিয়ে রইল, উত্তর দিতে পারল না।

জোনাকি আবার বলল, “বলো, রোজ যেতে?” এ বার তার গলার স্বর সামান্য দুলে গেল।

ভদকাই উঠে জোনাকির হাত দুটো ধরে নিজের গালে এলোপাখাড়ি চড় মারতে লাগল, “তুই আমায় মার জোনাকি, মেরে শেষ করে দে, কিন্তু আমায় ফিরায়ে দিস না। তুই ছাড়া আমার কেউ নেই রে, কেউ নেই।”

জোনাকি হাত ছাড়িয়ে নিল আর তার পর দ্বিগুণ প্রতাপে কিল চড় ঘুসি আছড়ে ফেলতে লাগল ভদকাইয়ের ওপর। মারতে মারতে তার হাতে ব্যথা হয়ে গেল। ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল জোনাকি।

ভদকাই তাকে বিছানায় নিয়ে ফেলল। জোনাকির বৃকে পাগলের মতো মুখ ঘষতে লাগল ভদকাই, তার দু’হাত তখন দারুণ ব্যস্ত। বহু বহু যুগ পরে যেন নিজের পুরুষের মুখের চেনা বাড়ির স্বাদ, ঘামের কড়া গন্ধ পেল জোনাকি। সেই গন্ধ, সেই পুরনো চেনা স্পর্শে একটু একটু করে ডুবতে লাগল সে। যখন সংবিৎ ফিরল তত ক্ষণে জোনাকি বুঝল তার শরীরে একটি সুতোও অবশিষ্ট রাখেনি ভদকাই।

ভদকাইয়ের শরীরের নীচে পিষে যেতে যেতে তার পিঠে নখের দাগ ঐক্যে দিল জোনাকি, বারবার কান্নাজড়ানো গলায় বলতে লাগল, “কেন তুই গেছিলি ওই মেয়েছেলেটার কাছে? কী পেয়েছিস ওখানে যা আমি দিতে পারিনি!”

ঝড় থামার পরের পৃথিবী বেশ সুন্দর হয়ে যায়। সুন্দর আর শান্ত। বিছানায় শুয়ে ভদকাইকে দেখছিল জোনাকি। ভদকাই বাড়ির প্যাকেট খুঁজে পাচ্ছে না। ঘরময় তল্লাশি চালাচ্ছে। তার পরনে এই মুহূর্তে কোনও পোশাক নেই। আদর সোহাগের সময় নগ্নতাকে মোহময় মনে হয়। কিন্তু আদর শেষে সেই দামড়া নগ্ন পুরুষ যদি উবু হয়ে বসে খাটের নীচে বাড়ির প্যাকেট খোঁজে, তবে একটা কুৎসিত দৃশ্য তৈরি হয়। জোনাকি চোখ সরিয়ে নিল।

অবশেষে বিড়ি খুঁজে পেয়েছে ভদকাই। দেশলাই ঠুকে বিড়ি ধরিয়ে সটান শুয়ে পড়েছে জোনাকির পাশে। চিন্তিত মুখে বিড়ি টানছে।

জোনাকি পাশ ফিরে ভদকাইয়ের বৃকে মাথা রাখল, “আমাকে এক বার তোমাদের আফজল ভাইয়ের কাছে নিয়ে যাবে?”

ভদকাই মুখ বিকৃত করল, “তুই তার কাছে গিয়ে কী করবি?”

“বলব আমি আর তুমি হোম ডেলিভারি চালিয়ে ওর সব পয়সা একটু একটু করে শোধ দিয়ে দেব, ও যেন তোমার ক্ষতি না করে।”

জোনাকির মুখের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল ভদকাই। তার মধ্যে আধঘণ্টা আগের অপরাধী ভাব চোখে পড়ার মতো কমে এসেছে। নারী নিজের শরীরের রাশ আলগা দিয়েছে, পুরুষ এখন আর চোর নয়, অপরাধীও নয়, সে এখন প্রভু। ভদকাই বলল, “এই কথা তুই আফজল খানকে গিয়ে বলবি!”

“হ্যাঁ। ব্যবসাটা খারাপ চলছে না জানো। তুমি একটু রান্নায় জোগাড়ের কাজ করে দিয়ো আর সাইকেলে করে হোম ডেলিভারিগুলো বাড়ি বাড়ি দিয়ে এসো, তা হলেই হবে, দেখো এক দিন আমি এই ব্যবসাটা...”

ভদকাই হো হো করে হেসে উঠল, “শালা, এইজন্য বলে মেয়েমানুষের বুদ্ধি। বাড়ি বাড়ি খাবার পাঠিয়ে উনি চল্লিশ লাখ টাকার লোন শোধ করবেন!”

জোনাকি দমে গেল, বলল, “পুরোটা না হোক কিছুটা তো হবে। তুমি আমাকে ওঁর কাছে নিয়ে চলো, আমি ওঁর হাতে পায়ে ধরে রাজি করিয়ে নেব।”

ভদকাই পাশ ফিরে শুয়ে জোনাকির কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে এল, “পুরোটাই শোধ হতে পারে, তুই চাইলে পুরোটাই শোধ হতে পারে।”

“আমি চাইলে? মানে?”

ভদকাই চাপা গলায় বলল, “ওই ডাক্তার-বুড়ির বাড়ির মন্দিরে একটা এক হাত লম্বা সোনার মূর্তি আছে না?”

জোনাকি এতটাই অবাক হল যে, কথা বলতে পারল না।

ভদকাই বলল, “একটা বুড়ো দারোয়ান ছাড়া তো কেউ থাকে না পাহারায়, তাই না?”

জোনাকি আঁতকে উঠল, “এ সব কী বলছ তুমি? জানো কেন এত দামি মূর্তি কোনও পাহারা ছাড়া এত বছর রাখা আছে? ওই মূর্তি জীবন্ত গো, যে যা চায় তাই পায়, ও কথা ভাবাও পাপ।”

ভদকাই আবার হেসে উঠল, “এই পাপ পুণ্য সব শালা বড়লোকদের ন্যাকড়া। পেটে ভাত না পেলে তোর দেবী বাঁচতে আসবে?”

জোনাকি চুপ করে রইল।

ভদকাই বলল, “কাজ কিছু নেই রে জোনাকি। একটা ওষুধ দিয়ে দেব তোকে। ও বাড়ির লোকদের রাতের খাবারে একটুসখানি মিশিয়ে দিবি, ব্যস! বাকিটা আমি সামলে নেব। কী রে পারবি না?”

জোনাকি কিছু ক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল। তার পর নেমে এল বিছানা থেকে। নিস্তব্ধ হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা পোশাক পরে নিচ্ছে ধীর ভাবে।

ভদকাই কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসল, “কী রে! কিছু বলছিস না কেন?”

জোনাকি কাপড় পরে কয়েকটা পাঁচশো টাকার নোট রাখল বিছানার ওপর, “যে দিন নিজের বৌকে ফেলে চলে গেছিলে, সে দিন ওই বাড়ির বুড়িটাই মাথায় ছাদ দেখিল, বুঝলে! না হলে শেয়াল কুকুরের নেই দেশে। এই টাকারটা রাখো। দরকার পড়লে যোগাযোগ করো, আরও দেব, কিন্তু ওই বাড়ির দিকে চোখ তুলে তাকালে ওদের আগে এই জোনাকির লাশ পেরিয়ে যেতে হবে, বুঝলে?”

শেষ বাক্যটা বেশ দাপটের সঙ্গে বলল জোনাকি। আর তার পর হতবাক ভদকাইয়ের সামনে দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

বেলা পড়ে এসেছে। বস্তির টাইম কলে মেয়ে বৌদের লম্বা লাইন। জোনাকি এ বার আর মুখ ঢাকল না, সহজ ভাবে হেঁটে যাচ্ছে বস্তির রাস্তা দিয়ে। চরম বিষণ্ণতায় হাসি পাচ্ছে তার। কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও সে ভেবেছিল ভদকাই নিজের ভুল বুঝে তার কাছে ফেরত এসেছে, বৌটার জন্য হয়তো বা মন পুড়ছে লোকটার। ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন যে বুনতে শুরু করেছিল জোনাকি।

সূর্য ডুবছে ভিআইপি রোডের ও পারে। এই সময়টায় মনটা রোজ কেমন খারাপ হয়ে যেত জোনাকির, ভদকাইয়ের কথা ভেবে আনন্দান করতে শরীর। আজ তা হচ্ছে না। লোকটা তাকে ছুঁয়েছে ভেবেই বরং গা জ্বলে যাচ্ছে তার, যত তাড়াতাড়ি হয় বাড়িতে ফিরে ভাল করে স্নান করতে হবে তাকে। স্নেহের হাসি ফুটে উঠল জোনাকির মুখে, তার ধারণাই ঠিক, সবক’টা ব্যাটাছেলে জাত শয়তান, সব শালা এক নম্বরের হারামি। থুঃ!

বিড়ির কষটে স্বাদ এখনও লেগে আছে মুখে, রাস্তায় একদলা থুথু ফেলল জোনাকি।

॥ ৬ ॥

রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে সাগর। সে যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে লম্বা একটা ক্লক টাওয়ার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ক্লক টাওয়ারের চার দিকে চারটে ঘড়ি। চারটে ঘড়িতে চার রকম সময় দেখাচ্ছে। সাগরের স্মার্টফোনে এখন সময় ছ’টা বেজে দু’মিনিট। ক্লক টাওয়ারের চারটে ঘড়ি চার রকম সময়ে ঢং ঢং করে ছ’টা বাজছে। কিছু ক্ষণ পর পর এক একটা ঘড়িতে ছ’টা বাজছে। ফলে গত পাঁচ মিনিট ধরে জায়গাটা ক্লক টাওয়ারের শব্দে মুখরিত।

চারপাশে জমজমাট ফাণ্ডনের বিকেল। কাছাকাছি তেলেভাজার কোনও দোকান থেকে অপূর্ব সুগন্ধ আসছে। লোকজন হামলে পড়ে কিনে নিচ্ছে শিঙাড়া বেগুনি, শালপাতার প্লেট খাচ্ছে থেকে কচুরি। পাশেই একটা মন্দিরে লোক থিকথিক করছে। প্রণামী বাস্কে কয়েন পড়ছে টুপটাপ। হাত জোড় করে দাঁড়ানো লোকদের প্রায় গায়ের ওপর দিয়ে অটো চলে যাচ্ছে। তারা চুপচাপ সরে যাচ্ছে। ঠাকুর প্রণামের সময় এ সব ছোটখাটো বিষয়ে মন দিচ্ছে না কেউ।

এই শহরটার ওপর বিশেষ ভাল লাগা কখনও জন্মায়নি সাগরের, তবু তার মনে হল এই সম্ভ্রান্ত তার বেশ ভাল লাগছে। গত প্রায় দশ মিনিট ধরে সে একই জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে। সাগর সব কাজই করে ধীর স্থির ভাবে। তার বিশ্বাস, যে মানুষ স্থির হয়ে থাকতে না পারে তার সঙ্গে মনুষ্যতর প্রাণীর পার্থক্য নেই। সাগরের প্রতিটি দিনের প্রতিটি ঘটনা হিসেব করা। সম্ভব হলে একটা মিনিটও সে অকাজে নষ্ট করতে চায় না। সেই সাগর উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এটা বিশ্বয়কর। আরও বিশ্বয়ের ব্যাপার, তার হাতে গীতবিতান। সাগরকে যারা চেনে, তারা জানে ভর সন্ধ্যাবেলা হাতে গীতবিতান নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকার ছেলে সে নয়।

আসলে আজ কাজটা মিটে গেল তাড়াতাড়ি। যে সিনিয়রের সঙ্গে আজকাল সাগর কাজ করছে, সেই ডক্টর দেবকুমার ইভনিং অফ নিয়েছেন, তাই সাগরেরও তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে। কাছাকাছি একটা মাঝারি মানের কর্পোরেট হাসপাতালে একটু আগেই একটা ওটি সেরে এসেছে সাগর। গল-স্টোন ওটি, রেগুলেশন কাজ, ডক্টর দেবকুমার জীবনে হাজার খানেক ল্যাপারোস্কোপি করে ফেলেছেন। তিনি অভ্যস্ত হাতে পেশেন্টের অ্যাবডোমেন পিয়ার্স করেই চমকে গেছিলেন। সাগরকে বললেন, “অ্যাপেন্ডিক্স-এর ইনফ্লেশনটা দেখেছ সাগর? ইউ এস জি তে ক্লিয়ার পিকচার পাওয়া গেল না কেন তাই ভাবছি। এ তো কয়েক দিন পরেই ব্যথা হবে। উড়িয়ে দেব নাকি এখনই?”

সাগর নির্লিপ্ত গলায় বলেছিল, “থাকতে দিন স্যার। আপনারই তো পেটোয়া পেশেন্ট। ব্যথা উঠলে আপনার কাছেই আসবো।”

মাস্কের আড়ালেই হেসেছিলেন দেবকুমার, “তাই! এ দিকে পেশেন্টের দু'বছর আগে সিজারিয়ান সেকশন হয়েছে, এ বার হচ্ছে গল রিমুভ, আর কত বার কাটাকাটি হবে শরীরে? আর তা ছাড়া ওই অ্যাপেন্ডিক্স রেখে দিয়েই বা হবেটাই বা কী?”

সাগর উত্তর দেয়নি। দেবকুমার ওটির বাইরে অপেক্ষারত পেশেন্টের রিলেটিভদের কাছে গিয়ে পরিস্থিতি জানিয়েছেন। সাগর জানে এ সব ক্ষেত্রে পেশেন্টের বাড়ির লোকের প্রতিক্রিয়া, “আমরা আর কী বলব ডাক্তারবাবু, আপনি যা ভাল বোয়েন তাই করুন।”

ডক্টর দেবকুমার তাই করেছেন। গল ব্লাডারের পাশাপাশি পেশেন্টের অ্যাপেন্ডিক্সও বাদ দিয়ে দিয়েছেন তিনি।

ওটি শেষে বেরনোর আগে তিনি সাগরকে বলেছেন, “যাও, আজ তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। এনজয় ইয়োরসেল্ফ। তবে আই মাস্ট সে, সাগর, তোমার মধ্যে একটা রাফ অ্যান্ড টাফ ভাব আছে। আমরাই কিছু শিখতে পারলাম না। যাক গে, তুমি তো বিলেতেই সেটল করবে বলে ভেবে রেখেছ। এক দিক দিয়ে ভাল। ওরা আমাদের অনেক লুটেছে, ময়ূর সিংহাসন-টন লুটে ফাঁক করে দিয়েছে। ইউস ইয়োর টার্ন নাউ। ও দেশের লোকদের এ বার তুমি লুটবে, হা হা হা।”

মজা করে বলা কথা। কিন্তু সাগরের গায়ে লেগেছে। ডক্টর দেবকুমারের সেরা ছাত্র সাগর, ছাত্রকে তিনি খুব পছন্দ করেন, এটাও জানে সে। একটু একটু করে সাগরকে চিকিৎসা শিখিয়েছেন দেবকুমার, শুধু নিজের জীবনবোধ শেখাতে পারেননি। আজই তো, মাসির মেয়ের পাকা দেখা, তাই তাড়াতাড়ি চলে গেলেন দেবকুমার। কোনও ডাক্তার যে মাসির মেয়ের পাকা দেখা উপলক্ষে ওটি ক্যানসেল করতে পারে, এটা ভাবতে পারে না সাগর।

দেবকুমার বেরিয়ে যাওয়ার কিছু ক্ষণ পর সাগর হসপিটাল থেকে বেরিয়েছে। তার পর কাছাকাছি একটা মোড়ের মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে। সাগরের মনে হচ্ছে দেবকুমারের আজকের সিদ্ধান্তের কথা, কেমন সহজে পেশেন্ট পার্টির সঙ্গে কথা বলে নিয়ে গোটা ব্যাপারটা সহজ করে ফেললেন। সাগর জানে সে এমন ভাবে চিন্তা করতে পারবে না। সাগর চশমখোর নয়, কিন্তু অপারেশনের সময় তার সমস্ত মনোযোগ হয়ত থাকত গলব্লাডারের দিকে, ফোকাস সেরে অ্যাপেন্ডিক্সের দিকে সে মনোযোগ দিত কি?

সাগরের মন খারাপ হয় না। আজ হয়েছে। অনেক অনেক দিন পর। সাগর জানে ছোটবেলা থেকেই তার ভাল লাগা, মন্দ লাগা, সে কী

করবে, কী ভাবে করবে... জীবনের প্রতিটি ঘটনা-মিনিটকে রুটিনে বেঁধে দিয়েছিল মা আর ঠাম্মি। সাগর জানে, সে তার মা আর ঠাম্মির একটা অংশীদারি কারবার ছাড়া আর কিছুই নয়, সে একটি মিলিত প্রোজেক্ট।

মধ্যবিত্ত বাড়ির ছেলেরা আদরে, শাসনে মানুষ হয়। সাগর বেড়ে উঠেছে মিলিটারিসুলভ নিয়মানুবর্তিতায়। বাড়ির সব ছেলেমেয়ের জন্যই এই নিয়ম ছিল না। বিদিশা জন্ম থেকেই পেয়েছে অচল স্বাধীনতা। নিজের মতো করে একটু একটু করে বেড়ে উঠেছে সে।

সাগর যখন খুব ছোট, একবার কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ম্যাডাম ডেকে পাঠালেন মঞ্জুশাকে। তিনি নাকি লক্ষ্য করেছেন সাগর মাঝেমাঝেই বাকি ছেলেমেয়েদের থেকে একটু হলেও বিচ্ছিন্ন থাকে, ক্লাসের জানলা দিয়ে উদাস চোখে লোক জন দেখে রাস্তায়। ম্যাডাম কথাটা হালকা ভাবেই বলেছিলেন, কথা শেষে এও বলেছিলেন, “দেয়ার ইজ এ গুড পসিবিলিটি দ্যাট সাম ডে হি উড বিকাম এ পোয়েট।”

মঞ্জুশা আঁতকে উঠেছিলেন শুনে। চিন্তায় পাগল হয়ে ওঠার জোগাড় তাঁর। এক দিন স্কুল ছুটির সময় মঞ্জুশা দেখলেন সব বাচ্চা বেরিয়ে এলেও সাগর এল না। অনেক খোঁজার পর দেখা গেল সাগর দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ক্লাসরুমের জানলার সামনে।

বাড়ি ফেরার পথে মঞ্জুশা জানতে চাইলেন, “তুমি একা একা ওখানে কী করছিলে পাপান?”

সাগর ভাবুক স্বরে বলেছিল, “ওই জানলাটা দিয়ে অনেকটা আকাশ দেখা যায় মা। আকাশে কালো মেঘ আর গাছের ডালে একটা হলুদ পাখি, কী সুন্দর যে লাগছিল! আমার ইচ্ছে করছিল সারাদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি। আমি বড় হয়ে পাখি হব, মা।”

মঞ্জুশার শরীর খারাপ লেগেছিল। তিনি আর দেরি করেননি। সে দিনই মহাশ্বেতার সঙ্গে এ নিয়ে দীর্ঘ ক্ষণ কথা বলেছিলেন। মহাশ্বেতাকে সহসা বিচলিত হতে দেখা যায় না, কিন্তু মঞ্জুশার কথা শুনে তিনিও হতবাক হয়ে রইলেন। এ কী কথা! এই বাড়ির পুরুষদের সেই চিরাচরিত বৈরাগ্যের ভাব ফুটে উঠেছে সাগরের মধ্যেও! মঞ্জুশা প্রভঞ্জনকে নিয়ে নাকানিচোবানি খাচ্ছেন, প্রভঞ্জনের বাবাও কম ভোগাননি মহাশ্বেতাকে।

প্রভঞ্জনের বাবা পরেশকুমার পারিবারিক ব্যবসা দেখতেন। ছুটহাট ব্যবসা ছেড়ে হয়তো কোথাও হাওয়া হয়ে গেলেন। পথে পথে এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ গলি, সে গলি ঘুরে গায়ের রং পুড়ে যেত। এক বার তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পুরুলিয়া বেড়াতে গিয়ে আর ফিরছিলেনই না পরেশকুমার। বন্ধুরা সব ফিরে এলেও দেখা গেল তাদের সঙ্গে পরেশকুমার ফেরেননি। ক্লিনিক, অপারেশন সব মূলত্ববি করে মহাশ্বেতা ছুটলেন পুরুলিয়া। পরেশকুমার সাফ জানিয়ে দিলেন এই জায়গা তাঁর এত ভাল লেগে গেছে যে বাকি জীবন এখানেই কাটিয়ে দেবেন বলে মনস্থির করে ফেলেছেন। মহাশ্বেতা প্রায় হাতে পায়ে ধরে সে যাত্রা ফিরিয়ে এনেছিলেন পরেশকুমারকে, কিন্তু আজীবন স্বামীর এই উড়ু উড়ু স্বভাব নানা ভাবে বামেলায় ফেলেছিল তাঁকে।

কিছু ক্ষণ চূপচাপ থেকে মঞ্জুশাকে মহাশ্বেতা বলেছিলেন, “এ ভাবে চললে এ বাড়িতে আর একটা পরেশকুমার বা প্রভঞ্জন তৈরি হবে মঞ্জু।”

“তা হলে এখন কী হবে মা? এ কী সর্বনাশ হল আমাদের!”

“আহ! সব ব্যাপারে কপাল চাপড়ে কাঁদতে বোসো না মঞ্জু। ঠিকঠাক ট্রেনিং দিলে সব সম্ভব।”

“ট্রেনিং!”

“হ্যাঁ, ট্রেনিং। সার্কাসে দেখো না, বাঁদর সাইকেল চালাচ্ছে, হাতি ফুটবল খেলছে, এ সব কি তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি? জঙ্গলে ফুটবল, সাইকেল এসব পাওয়া যায়? আসলে তাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। মানুষও তো আসলে জানোয়ার, তাই না? উন্নততম জানোয়ার। তাকে ট্রেনিং দিলে তারই বা বৈরাগ্য, বারমুখো ভাব দূর হবে না কেন?”

মঞ্জুশা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন শাশুড়ির দিকে।

মহাশ্বেতা বলেছিলেন, “চেষ্টা করেই দেখি। তবে এই কাজে তুমি ছাড়া আমার চলবে না মঞ্জু। তুমি যদি রাজি থাকো তা হলে তোমার ছেলেটাকে নিয়ে একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে, একটা

অংশীদারি কারবার বলতে পারো। তাতে তুমি-আমি তো বাঁচবই, ভবিষ্যতে আর একটা মেয়ের জীবন জ্বলে পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবে না।”

মঞ্জুরার বিস্ময় সীমা ছাড়া, তাঁর চোখে মহাশ্বেতা সৈরাচারী প্যাটার্নের মহিলা। পরিবার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় তিনি মঞ্জুরার সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন মনে করেন না। সেই মহিলা আজ তাঁর দিকে অংশীদারি কারবারের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন!

মঞ্জুরা রাজি হয়েছিলেন। ফল হয়েছিল ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। ছোট সাগরের জীবনটা পরদিন থেকে অনেকটাই পালটে গেছিল। ওইটুকু ছেলের জন্য জাঁদরেল টাইপের তিন তিন জন গৃহশিক্ষক এসে গেল, তাদের ওপর নির্দেশ রইল কোনও রকম মায়াদয়া যেন সাগরকে দেখানো না হয়, প্রতি সপ্তাহে টেস্ট আর অ্যাসাইনমেন্টে যেন ছেলে ঘাড় তোলার সুযোগ না পায়। বিকেলে মাঠে খেলতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, তার জায়গায় বাড়িতে হাজির হলেন বিশালদেহী যোগব্যায়ামের স্যার। বাইরের পৃথিবীর দরজা বন্ধ হতে হতে, আর মঞ্জুরা-মহাশ্বেতার শাসনের সাঁড়াশি চাপে সাগরও পরিণত হল এক রোবট-মানবে। সে ক্লাস টপার, বন্ধুর সংখ্যা নগণ্য, বই-ই তার বন্ধু।

মেডিকেল কলেজ যেতে নতুন একটা দিগন্ত খুলে গেল সাগরের সামনে। তার মাথায় ঢুকে গেল, ডাক্তাররা এক উন্নততর প্রজাতি। সাগর নিজের সবটুকু দিয়ে সেই উন্নততর প্রাণীদের সেরা হয়ে উঠে লাগল। সঙ্গে তার মধ্যে এল বাকি লোকদের আর এই শহরের প্রতি তাম্বিল আর বিতৃষ্ণা। নিয়মের সামান্যতম বিচ্যুতিও তার সহ্য হয় না। আত্মীয়রা বলে, ভালই হল। সাগরটা যা খুঁতখুঁতে আর ঘড়ি-বাঁবু, ওর জন্য ওই বিলেতই ঠিক জায়গা।

শুধু এই শেষ বয়সে এসে মহাশ্বেতার মাঝে মাঝে আফসোস হয়। সাগরের ব্যাপারে কি তিনি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন? ছেলেটা স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠলে কি আর একটু হাত পা ছড়িয়ে বাঁচতে পারত। অংশীদারি কারবার সফল হওয়ার হাসি দুই পার্টনারের মুখেই দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মঞ্জুরাও জানেন সাগর কয়েক দিনের মধ্যেই দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বুড়ো বয়সে দীর্ঘ সময় ছেলের অদর্শনে কাটাতে হবে তাকে।

আরও কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও সাগর বুঝল তার মনের উচাটন ভাব কম হচ্ছে না। বিদিশা আজ বেরোনোর সময় সাগরকে গীতবিতানটা দিয়ে বলেছে, “দাদা, ওই পথেই তো যাবি। মৌরিফুল এই বইটা চেয়েছে। ওদের বাড়িতে একটু দিয়ে দিস না রে।”

মৌরিফুল অর্থাৎ পারিজাত। বিদিশা ইদানীং তাকে মৌরিফুল বলে ডাকা শুরু করেছে।

সাগর স্বভাবসিদ্ধ স্বরে বলেছে, “এই ফালতু কাজের জন্য আমার সময় আছে? জানিস আজ তিন তিনটে ওটি আছে?”

“আহা! আগে যেন যাসনি। তুই গেলে মৌরিফুল আর ওর বাবা-মাও কত খুশি হয় বল তো?”

“ভাজরভাজর করিস না। বইটা দে। আর ওই আদিখ্যেতার নাম আমার সামনে উচ্চারণ করবি না। নামের কি বাহার! মৌরিফুল!”

সাগর বই নিয়ে বেরিয়েছে এবং যথারীতি সেখানে যেতে ভুলে গেছে। এই ভুলে যাওয়া ইচ্ছাকৃত কি না তা সাগর নিজেও জানে না। আসলে পারিজাত বিষয়ে সাগর অনেক কিছুই জানে না। পারিজাতের বাড়ি গেলে কিছুটা সময় দারুণ কাটে, কাকু কাকিমা দু’জনেই বেশ আলাপী লোক। সাগরই বরং চুপচাপ থাকে, তবু সেই বাড়ির পরিবেশ খারাপ লাগে না সাগরের।

তবে শুধু বাড়ির পরিবেশ পছন্দ হলে তো হবে না, সেই বাড়ির মেয়ে সাগরের কাছে মূর্তিমান প্রহেলিকা।

সাগরের দৃঢ় ধারণা এই মেয়ে প্রকৃতিস্থ নয়। তার আচার আচরণে ভাল রকম গোলমাল আছে। অথচ বিদিশার কাছে শুনেছে যে, পারিজাতের অ্যাকাডেমিক্স নাকি দুর্দান্ত। মাস্টার্স এর যে বিষয় আটকে যায় সেটা নাকি পারিজাতই বিদিশাকে পড়িয়ে বুঝিয়ে দেয়। ইদানীং অবশ্য ঠামি একটা ক্লাউন টাইপের ছেলে বাড়িতে আমদানি করেছে বিদিশাকে টিউশন দিতে, মাঝে মাঝে নাকি পারিজাতও সেই ক্লাসে ঢুকে

পড়ে। এই দুই ধানিলক্ষা মেয়ের পাল্লায় পড়ে ক্লাউন মাস্টারের কী অবস্থা হয় ভাবলে করুণাই হয় সাগরের।

তবে পারিজাত যে ইউনিভার্সিটির সেরা ছাত্রীদের এক জন, এটা মেনে নিতে পারে না সাগর। তার মনে হয় বিদিশা অন্ধের মতো ভালবাসে তার বন্ধুকে। সব কিছুই সে বাড়িয়ে বলে। যে মেয়ে এই বয়সেও বৃষ্টির জমা জলে কাগজের নৌকো ভাসায়, যে মেয়ে উম্মাদের মতো খাটের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে রক মিউজিকের সঙ্গে নাচে, সেই মেয়ে টপার হয় কী করে!

সে দিন পারিজাত আর বিদিশা ছাদে ব্যাডমিন্টন খেলছিল। সাগর দেখেছিল পারিজাতের কোমরের কাছে জিপ্সের নীচ থেকে উকি মারছে ড্রাগন আঁকা ট্যাটু। আশ্চর্য! ট্যাটু করানোর আর জায়গা পায়নি! সাগর রীতিমতো বিব্রত বোধ করেছিল, চোখ সরিয়ে নিয়েছিল সে, আবার তাকিয়েছিল! আচ্ছা অসভ্য মেয়ে! আর সেই সময়েই নেটের কাছে লাফিয়ে স্ম্যাশ মেরে গেম জিতে নিয়েছিল পারিজাত। তার পর অদ্ভুত কায়দায় দু’দিকে হাত ছড়িয়ে ছুটে বেরিয়েছিল ছাদ জুড়ে। সাগর আবার চোখ সরিয়ে নিয়েছিল, তার পর তাকিয়ে থেকেছিল আবার।

ছোটবেলা থেকে যে ভাবে সাগর বড় হয়েছে, যা যা ধ্যান ধারণা তার মধ্যে শিকড় গেড়েছে, সব কিছুর দিকে যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় পারিজাত। সাগরের সঙ্গে তাই নিত্য খটামতি লেগেই থাকে পারিজাতের। সাগর কথা শোনায়, ছাড়ে না পারিজাতও। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে আবাক হয়ে যায় সাগর। এমন এমন কথা বলে দেয় মেয়েটা যে, সাগর নিজেই নড়ে যায় ভিতর থেকে।

সে দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। ছাতা মাথায় বাড়ি ঢুকতে গিয়েও থমকে গেছিল সাগর। সামনের রাস্তায় জল বইছে খরস্রোতা নদীর মতো। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বিদিশা আর পারিজাত। বিদিশার হাতে বেশ কয়েকটা কাগজের তৈরি নৌকো, পারিজাত বসে আছে হাঁটু মুড়ে। সে একটা একটা করে নৌকো ভাসিয়ে দিচ্ছে জলের ধারায়। দেখা গেছে বিদিশা ভাসালে নৌকো ডুবে যাচ্ছে, কিন্তু পারিজাত ভাসালে ভেসে যাচ্ছে তরতরিয়ে। বিদিশার এক হাতে সেলফি স্টিক, গোটা ঘটনাটার বেশ কিছু ছবি তুলে রাখছে সে। প্রতিবার ছবি তোলার সময়ে দুই বন্ধু বিচিত্র একটা মুখভঙ্গি করছে। নৌকো ভাসানোর সঙ্গে সেই অভিব্যক্তির কোনও সম্পর্ক নেই।

সাগর দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিল, “কী হচ্ছে এ সব? ঠান্ডা লেগে জ্বরে পড়বে তো। যাও ভিতরে যাও।”

বিদিশা বলেছিল, “নৌকো ভাসাচ্ছি দাদা, তোর কী সমস্যা হয়েছে?” “সমস্যা হয়েছে। তোমরা অ্যাডাল্ট মেয়ে, মাস্টার্স পড়ছ, আমার চোখের সামনে চাইল্ডিশ আচরণ করে যাবে, এটা আমাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে?”

পারিজাত এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, “একশো বার ছবি তুলব। সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় দেব। এই নৌকো দেশ বিদেশের কত জলধারা দিয়ে বয়ে যাবে বলো তো!”

“এই কাগজের নৌকো দেশ বিদেশের জলধারা দিয়ে বয়ে যাবে!” “অবশ্যই বয়ে যাবে। কবিগুরু তো বলে গেছেন, ‘কোন পথে যাবে কিছু নাই জানা/ কেহ তারে কভু নাই করে মানা/ ধরে নাই রাখে, ফিরে নাই ডাকে/ ধায় নব নব দেশে/ কাগজের তরী, তারি’ পরে চড়ি/ মন যায় ভেসে ভেসে।”

সাগরের যেন বিশ্বাসই হয় না, একটা মেয়ে ভর সন্ধেবেলায় মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে উদাত্ত স্বরে রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করছে!

সেই বিস্ময়ে সাগর বলেছিল, “আটার নন সেন্স! যা খুশি করো!”

পারিজাত এবার কোমরে হাত দিয়ে বলেছিল, “তোমার প্রবলেমটা কী জানো তো সাগরদা! তুমি লাইফটাকে খুব বেশি সিরিয়াসলি নিয়ে ফেলেছ। যার ফলে ছোট ছোট মজা বুঝতে পারো না। টু বি ফ্র্যাঙ্ক, তুমি তো সাগর, গভীরতায় তোমার প্রকাশ। কিন্তু তুমি চাইছ পর্বত হতে। তোমার পরিচয় উচ্চতায় নয় সাগরদা, তোমার পরিচয় গভীরতায়। এই সিম্পল ফ্যাক্টটা তুমি বুঝে উঠতে পারছ না।”

সাগর চলে যেতে গিয়েও ফিরে আসে, “তুমি কি জানো বিখ্যাত



ভূতত্ত্ববিদ স্টিফেন অল্টার ‘বিকামিং এ মাউন্টেন’ বইয়ে লিখেছেন যে, হিমালয়ও আদিতে সমুদ্রই ছিল। দুটো টেকটোনিক প্লেটের কলিশন হল আর তার পর...”

“টেকটোনিক প্লেট থিয়োরি আমিও কিছুটা জানি সাগরদা। হিমালয় যে সাগর ছিল সেটা বোঝা গেছে কী করে তাও নিশ্চয়ই জানো তা হলে? হিমালয়ের গায়ে সামুদ্রিক প্রাণীদের জীবাশ্ম দেখে। সমুদ্রকে পাহাড় হতে হলে তার গভীরের অনেক সম্পদের মৃত্যু ঘটাতে হয়। মানুষেরও তাই, সাগর যদি পাহাড় হতে চায় তবে, ভালবাসা, আনন্দ, বেখেয়ালি স্বাধীনতা এ রকম অনেক ক্যারেক্টার বেঘোরে মারা পড়ে ফসিল হয়ে যায় সাগরদা।”

কথা শেষ করে পারিজাত সবজান্তা একটা হাসি হাসে। সাগর কথা বলতে পারে না। ধারালো কথা বলা মেয়ের সঙ্গে সাধারণ অবস্থায় তর্ক করা গেলেও চুপচুপে ভিজে পোশাকে থাকা মেয়ের সঙ্গে তর্ক চলে না। বারবার ফোকাস নড়ে যায়।

সাগর ছাতা মাথায় বাড়ির দিকে এগোয়। পারিজাত একছুটে এসে তার হাত জড়িয়ে ধরে, “এই বিদিশা। এই মোমেন্টটা মিস করিস না। একটা ছবি তোলা। সাগরদা, জানি তুমি হাসতে পারো না, অন্তত মুখটা একটু হাসি হাসি করার চেষ্টা তো করো।”

সেই ছবি বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিদিশার কভার ফটো হয়ে আছে। ছবিতে তার প্রিয়তম দুই মানুষ। ভিজে চুপচুপে এক উচ্ছল যুবতী আর ছাতা মাথায় রাগী মুখের এক যুবক।

অথচ এই মেয়েকেই আমূল বদলে যেতে দেখেছে সাগর। জন্মদিনের সকালে নিয়ম করে টিফিনবক্স হাতে সাগরের ঘরে ঢোকে পারিজাত। টিফিন বক্সে পায়ের, সাগরের যেমনটা পছন্দ, মিষ্টি একটু কম কিন্তু কাকু কিসমিসে ঠাসা।

সাগর হাসে, “আরে, এত কি আমি একা খাব? সবাইকে দাও।”

“সবার জন্য আলাদা করে এনেছি। এটা শুধু তোমার। এখন খাবে, সঙ্গে নিয়ে বেরোবে, টিফিনেও খাবে।”

সাগর চামচে করে পায়ের মুখে তোলে। যথারীতি অপূর্ব স্বাদ। সাগর

বলে, “কাকিমাকে থ্যাঙ্কস বলে দিয়ো পারিজাত। ফাটাফাটি হয়েছে।”

পারিজাতের ঘাড়ের কাছটা সামান্য শক্ত হয়, সে থমথমে মুখে বলে, “মাকে যতদূর চিনি, মনে হয় না অন্যের ক্রেডিট নিজে নিতে পছন্দ করবে বলে।”

সাগর পায়ের খেতে খেতে বলে, “তবে নিশ্চয়ই কাকু বানিয়েছেন। সত্যি, ছেলেরা রান্নাটা মন দিয়ে করলে মেয়েদের মাত দিয়ে দিতে পারে। কাকুকে আমার রিগার্ডস জানিয়ে, পায়ের ইজ্ঞাসাম।”

পারিজাতের দারুণ একটা কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়, একটু অ্যাগ্রেসিভ কিছু একটা। মুঠো করে পায়ের তুলে লোকটার মুখে মাখিয়ে দেবে? তার ইচ্ছে করে সাগরের ব্যাকব্রাশ চুল এলোমেলো করে ঘেঁটে দিতে, মন চায় এই ছেলের সাদা জামায় ফাউন্টেন পেনের কালির ছিটিয়ে দেয়... মোট কথা এমন কিছু করতে যাতে এই কেরিয়ারিস্ট, কুচুটে লোকটা উচিত শিক্ষা পায়।

এ সবার কিছুই করে ওঠা হয় না। মগ্ন হয়ে পায়ের খাচ্ছে সাগর। দৃশ্যটা ভারী পছন্দ হয় পারিজাতের। এই দৃশ্য অন্তহীন সময় ধরে চলবে না এটা মনে হতেই এমন সুন্দর দিনেও মনটা খারাপ হয়ে যায় তার।

সব মিলিয়ে পারিজাত একটা অজানা ভয়ের নাম, খুব সাবধানে তাই তাকে এড়িয়ে চলে সাগর। তার কাছে গেলেও মনে হয় এই মেয়ে তার এতদিনের সযত্নে লালিত বর্ম ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়বে। এক নয়, দুই নয়, সাত গোল দিয়ে দু’পাশে হাত ছড়িয়ে উড়োজাহাজের ভঙ্গিতে নিজের জয় সেলিব্রেট করবে।

সাগর ফেরার পথেও গীতবিতান দিতে পারিজাতের বাড়ি গেল না। তার হাতে অনেক সময়, সেই সময় সে শহরের পথে ঘাটে ঘুরে কাটাল। মাঝে মাঝে আজও হলুদ পাখি দেখা একটা বাচ্চা ছেলের কথা মনে পড়ে তার।

আজও সাগর ভাবল শিয়ালদা স্টেশনে যাবে, তার পর যে ট্রেনটা সামনে পাবে তাতেই উঠে চলে যাবে অনেক, অনেক দূর। ফিরবে একেবারে লাস্ট ট্রেনে। অথবা হয়তো ফিরবেই না, নাম না জানা কোনও

স্টেশনের ফাঁকা বেঞ্চে শুয়ে রাত কাটিয়ে দেবে।

সাগর এ সবের কিছুই করল না। দীর্ঘ দিন ডানা মেলার অভ্যেস না থাকলে পাখি আর উড়তে পারে না। সাগর জানে তার বেহিসেবি ডানা মেলার ক্ষমতা হারিয়ে গেছে বহু দিন।

অনেক রাত পর্যন্ত গীতবিতান হাতে পথে পথে ঘোরে সাগর, অজস্র বার ফুটপাথ পালটায়। শুধু বাড়ি ফেরা হয়ে ওঠে না তার।

১১ ৭ ১১

মুঙ্গেরিলাল আজ সকাল সকাল একটা আশ্চর্য জিনিস হাতে পেয়েছে।

ভোর রাত থেকে উঠে তার ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। মন্দিরের দরজা খুলে দিতে হয়। তারপর বাড়ির সামনের একফালি বাগানের পরিচর্যা করে সে। স্থলপদ্ম, জবা, মাধবীলতা আর কয়েকটা গোলাপের চারাও রয়েছে সেখানে। এই সামান্য বাগানের জন্য মালীর প্রয়োজন পড়ার কথা নয়, তবু সেই কাজে নিজেকে নিযুক্ত করে নিয়েছে মুঙ্গেরিলাল।

আজও রুটিন কাজগুলো সেয়ে নিয়ে অভ্যেসমতো মুঙ্গেরিলাল লেটার বক্সটা খুলেছিল, আর খুলেই চমকে উঠেছিল। চিঠি আসার চল প্রায় উঠেই গেছে, এই বাড়িতে এখন ইলেকট্রিক বিল ছাড়া আর কোনও কিছুই লেটার বক্সে জমা হয় না। মাঝে মাঝে মহাশ্বেতার নামে কয়েকটি বিদেশি মেডিক্যাল জার্নাল এসে পৌঁছায়, সেগুলো এত দিনের অভ্যেসে দেখলে চিনতে পারে মুঙ্গেরিলাল।

আজ কোনও জার্নাল ছিল না, ইলেক্ট্রিসিটি বিলের নীল সাদা কাগজও পড়ে নেই লেটার বক্সে। তার জায়গায় আছে একটা ইনল্যান্ড লেটার। প্রাপকের নামের জায়গায় মুক্তোর মতো হরফে মহাশ্বেতা রুদ্রর নাম। প্রেরকের নাম খামের উপর লেখা নেই।

বেলা একটু বাড়লে বুড়ো মুঙ্গেরিলাল সেই চিঠি হাতে নিয়ে পায়ে পায়ে মহাশ্বেতার ঘরের দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, “ভাবিজি, একটো চিঠি এসেছে।”

মহাশ্বেতা বললেন, “ঘরে এসে কথা বলো মুঙ্গেরিলাল।”

মুঙ্গেরিলাল ঘরে ঢুকল। ইঞ্জিয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন মহাশ্বেতা। তাঁর পরনে আকাশি রঙের শাড়ি। অতি সামান্য দৃশ্যটুকু দেখেই মন ভাল হয়ে গেল মুঙ্গেরিলালের।

বহু বছর আগে কাগজে অহল্যার নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল সোনার তরী-র তরফ থেকে, সেই সময় উদ্ভাস্তের মতো অহল্যার খোঁজে শহরে ঘুরে মরছে মুঙ্গেরিলাল, পত্রপাঠ সে এসে হাজির হয়েছিল এই বাড়িতে। বোকা বোকা সেন্টিমেন্ট। যে বাড়িতে জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছে অহল্যা, সেই বাড়িতে যদি কয়েক দিন থাকা যায়। তাকে তাকে থেকে প্রথমে মুঙ্গেরিলাল ড্রাইভারের চাকরি নিল। সেই সময় মহাশ্বেতার রমরমা পসার, প্রভঞ্জন ছটফটে টিন-এজার। মহাশ্বেতাকে নিয়ে এই চেষ্টার, ওই হাসপিটাল কম ছুটোছুটি করেনি মুঙ্গেরিলাল। কোনও দিন মুঙ্গেরিলালের মুখ শুকনো হলে তা চোখ এড়াতে না মহাশ্বেতার। নিজে রাস্তায় কিছু কিনে খেলে সেই একই জিনিস কিনতেন মুঙ্গেরিলালের জন্যও।

সদ্য অহল্যাকে হারিয়ে তখনও ব্যথার ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি মুঙ্গেরিলাল। সেই অবস্থায় বয়সে বছর পনেরোর বড় মহাশ্বেতা মুঙ্গেরিলালের কাছে ছিলেন স্বপ্নের নারী।

এরপর তো অহল্যাও আসতে লাগল পিছনের বারান্দায় সময়ে সময়ে... যেন শুধু মুঙ্গেরিলালের জন্যই।

দিনটা এখনও স্পষ্ট মনে আছে মুঙ্গেরিলালের। সেই সন্ধ্যায় যেন কেমন একটা আনন্দান করছিল মুঙ্গেরিলালের ভিতরটা। সেই উচাটন কাটাতে বাড়িময় পায়চারি করছিল, অবস্থা সামান্য সহনীয় হল বাড়ির পশ্চিমদিকের জংলা জমিটা অবধি গিয়ে। মনের অস্থিরতা যেন অনেক শান্ত। তবে ওই আবছায়া জঙ্গলে জায়গায় বসে কে আর মশার কামড় খেতে চায়! মুঙ্গেরিলালও বেরিয়ে আসছিল, আর তখনই গলার স্বরটা শুনতে পেয়েছিল সে।

“কেমন আছ মুঙ্গেরি? চিনতে পেরেছ আমায়?”

কত দিনের পুরনো স্বর, অথচ কত পরিচিত!

স্বরটা আসছে দোতলার পশ্চিমের বারান্দা থেকে। মুঙ্গেরিলালের বাতে কাবু হাঁটু কাঁপতে লাগল। সে ঘাড় তুলে অস্ফুটে বলল, “অহল্যা!” আর বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুয়াশা মাথা ধোঁয়াটে অবয়ব নিয়ে অহল্যার আবছা আভাস দেখেছিল মুঙ্গেরিলাল।

সে বলল, “তুই আছিস! তুই আছিস অহল্যা!”

“আছি না তো কী? এই বাড়ির মানুষগুলো এত ভালবাসা দিয়েছে যে, আর যেতে মন চাইল না। আর তা ছাড়া একটা নাল্যক পাগল আমার জন্য ঘর-বার ছোড়কে এই বাড়িতে এসে পড়ে আছে। এত মায়া ছেড়ে যায় কী করে অহল্যা!”

যে যায় সে চিরতরে চলে যায়, মৃত মানুষ ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে খোশগল্প করে না, এ সত্য বুড়ো মুঙ্গেরিলাল জানত না তা হতেই পারে না। তবু তার বিশ্বাস অহল্যা এসেছিল। এক দিন হলে না হয় মনের ভুল, কিন্তু বারবার হলে তা মনের ভুল থাকে না।

মুঙ্গেরিলাল তাই বিশ্বাস করে অহল্যা আছে, এই বাড়িতেই আছে। পশ্চিমের বারান্দা যে তার খুব প্রিয় জায়গা ছিল।

তার পর আর এই বাড়ি ছেড়ে দেশে ফেরার কথা ভাবতেও পারেনি সে। তাই গাড়ি বিক্রি হয়ে গেলেও মুঙ্গেরিলাল থেকে গেল, শুধু পাল্টে গেল তার জব-প্রোফাইল। আগে সে ছিল ড্রাইভার, এখন হল গेटকিপার কাম সিকিউরিটি পার্সোনাল। গালভরা নাম তবু কাজ তেমন বিরাট কিছু নয়, বেতনও বড় মুখ করে বলার মতো কিছু না। তবে মুঙ্গেরিলাল তো অহল্যার স্মৃতিতে বিয়ে-থা করেনি, সংসার নেই, দেশের বাড়িতেও টাকা পাঠাবার দায় নেই তার। মুঙ্গেরিলাল এই মাইনেতেই সোনার তরী-তে থেকে গেছে।

অহল্যার আনা দেবীমূর্তি পাহারা দিচ্ছে মুঙ্গেরিলাল এত বছর ধরে, জীবনের বাকি দিনগুলোও এ ভাবেই কাটিয়ে যেতে চায় সে।

মুঙ্গেরিলাল হাত বাড়িয়ে ফ্যাকাশে নীল রঙের ইনল্যান্ড লেটার মহাশ্বেতার হাতে দিল।

মহাশ্বেতার ভুরু কঁচকে গেল, “কোথায় পেলে?”

“লেটার বক্সে ভাবিজি।”

মহাশ্বেতা চিঠিটা খুললেন না, হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলেন। তার পর চিঠিটা টেবিলে রেখে আবার কাগজ হাতে তুলে নিলেন। মনের ভিতর কিঞ্চিৎ উত্তেজনা অনুভব করছেন তিনি, সামান্য হলেও আশান্ত বোধ করছেন। তিনি জানেন এটা ঠিক হচ্ছে না, সে দিন শরীর খারাপ হওয়ার আগেও এমনই আশান্ত লেগেছিল তাঁর। তিনি নিরাসক্ত গলায় মুঙ্গেরিলালকে বললেন, “তুমি এখন এসো। আর জোনাকিকে রান্নাঘরে বলে যাও আমাকে এক কাপ চা দিয়ে যেতো।”

মুঙ্গেরিলাল অক্ষরে অক্ষরে হুকুম তামিল করল। তবে জোনাকির সঙ্গে কথা খুব একটা হল না। আজকাল মেয়েটা কেমন যেন হয়ে গেছে। সারাদিন চুপচাপ থাকে। যে মুখে সারাদিন কথার ফুলবুরি ফুটত, সেই মুখে যেন কুলুপ এঁটে দিয়েছে কেউ।

মুঙ্গেরিলালের কিছুই ভাল লাগে না। কয়েক দিন আগে অহল্যা তাকে বলেছিল যে, এই পরিবারের খারাপ সময় আসতে চলেছে। সেই থেকে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে মুঙ্গেরিলাল। অথচ সে তুচ্ছ মানুষ, কী-ই বা করতে পারে। ফিরে আসতে আসতে তার কেন যেন মনে হল ওই চিঠির ভিতরেই এমন কিছু আছে যা, এই পরিবারে একটা ঝড় তুলবে। অজানা আশঙ্কায় তার বুক কঁপে উঠল।

মহাশ্বেতা একটু সময় নিয়ে খবরের কাগজ পড়লেন। এক সময় মানসিক অস্থিরতা কমে এল কিছুটা হলেও, ধীর হাতে মহাশ্বেতা খাম ছিঁড়ে চিঠি খুললেন।

প্রভঞ্নের আজকাল সকালের দিকে তেমন কোনও কাজ থাকে না। ইদানীং বৈরাগ্য ব্যাপারটাও আর অনুভব করছেন না তিনি। দিবি খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা শোনা এই সব নিয়ে সারাদিন মেতে আছেন।

তার উপর বিদিশা তাঁকে সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছে। তার পর থেকে প্রভঞ্নের সময় কেটে যাচ্ছে বাড়ির বেগে। কত পুরনো দিনের লোকের সঙ্গে আবার আলাপ হচ্ছে, রকমারি মজার ছবি, ভিডিও সব মিলিয়ে এক জমজমাট দুনিয়া। এক দিন তো প্রভঞ্জন ফোন হাতে নিয়েই খেতে বসে গেছিলেন, ছেলেমেয়ের সামনেই মায়ের ধমক খেতে হয়েছিল তাঁকে।

আজও তিনি মোবাইলে বুঁদ হয়ে ছিলেন, ঠিক তখনই জোনাকি ঘরে এসে বলল, “বড়দাবাবু, বড়মা এক বার আপনাকে ডাকছে।”

প্রভঞ্জন মায়ের ঘরে ঢুকলেন। মহাশ্বেতা ইঞ্জিচেয়ারে বসে আছেন, তাঁর একটা হাত আড়াআড়ি ভাবে চোখের ওপর চাপা দেওয়া। প্রভঞ্জন একটু অবাকই হলেন। চিরকাল মা এই ভঙ্গিকে অপছন্দ করে এসেছেন। ছোটবেলায় প্রভঞ্জন যদি কখনও এ ভাবে বসতেন বা শুতেন, তৎক্ষণাৎ মহাশ্বেতা তাঁর হাত সরিয়ে দিতেন, বলতেন, “হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রাখা হতাশার লক্ষণ।”

সেই মহাশ্বেতা কপালে হাত দিয়ে ইঞ্জিচেয়ার বসে আছেন। তাঁর শরীরী ভাষাও বেশ অবসন্ন। চশমা খুলে পাশের টেবিলে রাখা। সেই চশমার নীচে একটা খোলা চিঠি চাপা দেওয়া। ফ্যানের হাওয়ায় চিঠির কোণগুলো ফরফর করে উড়ছে।

প্রভঞ্জন বললেন, “কী হয়েছে মা? শরীর খারাপ লাগছে?”

মহাশ্বেতা সামান্য চমকে উঠলেন। তার পর টেবিলের ওপর থেকে চশমা নিয়ে চোখে পরে চিঠিটা ছেলের হাতে দিলেন।

একটা চেয়ার টেনে বসলেন প্রভঞ্জন। তার পর চিঠি খুলে পড়তে শুরু করলেন।

শ্রীমতী (ডক্টর) মহাশ্বেতা রুদ্র মহাশয়া সমীপেয়,

অধীনের শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করিবেন। বাটীস্থ সকলকেই আমার শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও স্নেহশিষ্য জানাইবেন। আমি শ্রীশুভপ্রসন্ন মজুমদার। আমি বিখ্যাত কেহ নহি, সুতরাং নাম শুনিতে পারিবেন না। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিষয়ে অধ্যাপনা করিয়া আমি মাত্র গত বৎসর ভারতবর্ষে আসিয়াছি। জীবনের একটি দীর্ঘ অধ্যায় বিলেতে অতিবাহিত করিবার পরে সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি এবং কিয়ৎ দিবস পূর্বে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় একটি সংবাদ দেখিয়া যারপরনাই বিচলিত বোধ করিতেছি।

জনৈক রিপোর্টার আপনাদের বাটীসংলগ্ন একটি মন্দির এবং তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি দেবীমূর্তির উল্লেখ চিত্রসহ পরিবেশন করিয়াছেন। সেই চিত্র আমার এবং আমার পরিবারের বাকি সদস্যদের মনে প্রবল বিশ্বাসের জন্ম দিয়াছে। আপনাদের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মাতৃমূর্তি প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের গৃহদেবীর মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে সেই মূর্তি অদ্য হইতে বিয়াল্লিশ বৎসর পূর্বে আমাদের মন্দির হইতে চুরি যায়।

আজ, এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পরে আমাদের গৃহদেবী কী উপায়ে এত দিবস ধরিয়া আপনাদের মন্দিরে পূজা পাইতেছেন, ইহা অনুগ্রহ পূর্বক জানাইলে বাঞ্ছিত হইব।

বর্তমানে আমি এবং আমার পুত্র শ্রীমান সাগ্নিক ভারতবর্ষে আসিয়াছি। আপনাদের পরিবার নিপাট ভদ্রলোক বলিয়া অঞ্চলে পরিচিত, এই সংবাদ পাইলাম। তাই অযথা বাদ-বিসম্বাদ এবং আইনি জটিলতায় যাইতে চাহিতেছি না।

এক বার যদি আপনার সঙ্গে এই বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা যাইত, তাহা হইলে বাঞ্ছিত হইতাম। পত্রের সঙ্গে আমি আমার দূরভাষ্য নাম্বার প্রেরণ করিলাম। আপনি যোগাযোগ করিবেন এই প্রত্যাশায় এবং আপনার মতো বিদূষীর সাক্ষাতের অভিলাষে দিন গুণিতেছি।

নমস্কারান্তে,

শুভপ্রসন্ন মজুমদার

নৈহাটি, উত্তর চব্বিশ পরগনা।

প্রভঞ্জন চিঠিটা পড়লেন পরপর তিন বার, তার পর গম্ভীর মুখে

বসে রইলেন।

মহাশ্বেতা বললেন, “কী বুঝলে, বাবলু?”

প্রভঞ্জন চিন্তাঘ্রিত স্বরে বললেন, “অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত লইয়া পঠনপাঠন চলিতেছে ইহা নিঃসন্দেহে কৌতুহলোদ্দীপক।”

মহাশ্বেতার ভুরু কঁচকে গেল, “বাবলু। সিরিয়াস হও। গুঁর বক্তব্যটা যদি সত্যি হয়...”

প্রভঞ্জন হো হো করে হেসে উঠলেন, “আরে দূর! কেউ আজকের দিনে এভাবে চিঠি লেখে? ওই নামের আসলে কেউ নেই। আমার তো মনে হয় কেউ প্রাণ্টিকাল জোক করেছে। তবে খুবই নিম্নমানের রসিকতা।”

মহাশ্বেতা নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না, “বাবলু, ঠিকানা, ফোন নাম্বার সব দিয়েছেন ভদ্রলোক। এটা কি প্রাণ্টিকাল জোক হতে পারে?”

“আরে, ওইটাই তো জোক। যেই ওই নাম্বারে ফোন করবে তখনি জানতে পারবে আসলে কে এই জোক করেছে। দাঁও নাম্বারটা দাঁও তো, এক বার কল করে এখনই বামেলা মিটিয়ে ফেলি।”

“থাক। একটু সময় দাঁও আমাকে। আমি দেখি কী করতে পারি।”

প্রভঞ্জন বললেন, “দেখো যা ভাল বোঝো, শুধু এই নিয়ে ভেবে আবার শরীর খারাপ কোরো না। কিন্তু মা, একটা কথা ভাবো, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে সংস্কৃত?”

“বাবলু, তুমি এখন এসো।”

প্রভঞ্জন ঘর থেকে চলে গেলে জানলার সামনে দাঁড়ালেন মহাশ্বেতা। ছেলে তাঁকে চিন্তা করতে বারণ করেছে, কিন্তু এখন তিনি সেটাই করতে চলেছেন। জরা শুধুমাত্র তাঁর শরীরের দখল নিয়েছে, তাঁর মনন, মস্তিষ্ক, চিন্তাশক্তি আছে প্রায় যৌবনের মতোই। তিনি প্রভঞ্নের সঙ্গে একমত নন। তাঁর বিশ্বাস শুভপ্রসন্ন মজুমদার বলে সত্যিই কেউ আছেন এবং মূর্তি এ বাড়িতে আসার সময়কালও ঠিক মিলিয়ে দিয়েছে।

সে ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা আসছে। কী করে সেই সমস্যা মেটানো যায় সেটাই চিন্তা করতে হবে তাঁকে। আর যাই হোক, এই মন্দির প্রতিষ্ঠা যে একেবারে সরল পথে হয়নি, সেটা তাঁর থেকে বেশি আর কে-ই বা জানে। মহাশ্বেতা তাই চিন্তা করতে শুরু করলেন, খাওয়ার সময়টুকু ছাড়া ঘরের বাইরে বেরোলেন না। সন্ধ্যা নাগাদ তিনি ফোন তুলে নিয়ে চিঠিতে দেওয়া ফোন নাম্বারে ডায়াল করলেন।

মায়ের সামনে ক্যাজুয়াল ভাব দেখালেও প্রভঞ্জন সারা দুপুর ছটফট করছেন। চিঠির বক্তব্য ফেলে দেওয়ার মতো তা নয়। এপাশ ওপাশ করতে করতে তিনি বুঝলেন বিকেল হয়ে গেছে, প্রভঞ্জন বাইরের বারান্দায় এসে চেয়ারে বসলেন।

মুঙ্গেরিলালকে সচরাচর এই সময় দেখা যায় না। আজ সে বসে আছে টুলের ওপর, বন্দুকের নলের ওপর হাত, সেই হাতের ওপর মাথা রেখে বিমোহে। গাড়িবারান্দার দরজা খোলা, সন্দের মুখে মন্দিরে কিছু লোকের আনাগোনা লেগেই থাকে, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে থেকে থেকেই।

প্রভঞ্জনকে বসে থাকতে দেখে মুঙ্গেরিলাল তার দিকে এগিয়ে এল, “কী বেপার বাবলুবাবু, বহুত চিন্তাউস্তা করছেন দেখছি?”

প্রভঞ্জন মুঙ্গেরিলালকে দেখল। এই বাড়িতে দেবীমূর্তি নিয়ে অহল্যা নামের রহস্যময়ী উপস্থিত হওয়ার কিছু দিন পরেই এই লোক এসে হাজির। দরজার সামনে এসে প্রভঞ্নের বাবা-ঠাকুদাকে ডেকে ডেকে অস্থির, তার নাকি চাকরি চাই। সোনার তরীর তখন বিরাট অবস্থা। প্রভঞ্নের ঠাকুরদা বললেন, “ড্রাইভার সেই যে দেশের বাড়ি গেল আর দেখা নেই, একে দিয়ে দেখা যাক কাজ হয় কি না।”

কাজ হয়েছিল। মহাশ্বেতা ড্রাইভিং শিখেছিলেন কিন্তু গাড়ি চালাতেন না। সারাদিন মাথায় রোগী আর অপারেশনের চিন্তা নিয়ে গাড়ি চালানো ঠিক নয়। যুবক মুঙ্গেরিলাল বহাল হল মহাশ্বেতার ড্রাইভার হিসেবে, মাঝে মাঝে স্কুল-কলেজ যাওয়ার সময়ও প্রভঞ্জনকে আনা-নেওয়া করেছে মুঙ্গেরিলাল। লোকটাকে দেখলে মন ভাল হয়ে যায় প্রভঞ্নের।

প্রভঞ্জন ঢুলু ঢুলু চোখ করে বিজ্ঞের মতো গাঢ় স্বরে বললেন, “যা

হচ্ছে ভালই হচ্ছে, যা হবে তাও ভালই হবে। তোমার কী হারিয়েছে, যে তুমি কাঁদছ? তোমার আজ যা আছে, কাল তা অন্য কারও ছিল, পরশু সেটা অন্য কারও হয়ে যাবে। পরিবর্তনই সংসারের নিয়ম। কী বুঝলে মুঙ্গেরি চাচা?”

মুঙ্গেরিলাল চিন্তিত মুখে বলল, “ইয়ে তো ধর্মের কথা আছে।”

“রাইট। এটা গীতার সারাংশ। গীতা পড়ানি মুঙ্গেরি চাচা?”

মুঙ্গেরিলাল লজ্জার হাসি হাসল, “আমি পড়াই লিখাই আর করলাম কোথায়? তবে আমার বাবুজি গীতা পড়তেন। সির্ফ পড়তেন না, সকালে বেরোনোর সময় জামার পকেটে গীতা নিয়ে বেরোতেন। গীতা প্লাস্টিকের প্যাকেটে ভরে রাখতেন। পিসাবখানা যেতে হত তো, গন্দা পানির একটু ছিটাও যেন কিতাবে না লাগে...”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে। যেটা বললাম তার মানে বুঝেছ কি?”

শেষ চার লাইন বলার সময় প্রভঞ্জনের নিজেরই অস্থির লাগছিল। চির-নাস্তিক তিনি, সারা জীবন অতি-বাম রাজনীতি করেছেন, শেষ কবে তিনি নিজের বাড়ির মন্দিরে পা রেখেছেন তাও বলতে পারবেন না। তবু আজ তাঁর মন অত্যন্ত নরম হয়ে আছে।

মুঙ্গেরিলাল প্রভঞ্জনের কথা শুনে দুঃহাত কপালে ঠেকিয়ে বলল, “জয় স্যারাম, এর একটাই মতলব আছে। ওনার মর্জি বিনা দুনিয়ায় একটা পান্ডাও হিলবে না বাবলুবাবু।”

ঠিক তখনই বাগানের ও পাশে দরজা খুলে বিদিশা আর অয়ন বাড়িতে ঢুকল।

আজ বিদিশাকে বিশেষ কাজে এক বার ইউনিভার্সিটি যেতে হয়েছিল, বেচারি ঘাবড়ে ছিল বেশ। মহাশ্বেতার কথায় তাই অয়নকেও যেতে হল তার সঙ্গে। মনে হয়েছিল কাজ সহজে হয়ে যাবে, কিন্তু তা হয়নি। প্রায় সারাদিন কাটিয়ে ফিরেছে দু’জন। সারাদিন পথে ঘাটে ঘোরার ক্লান্তির ছাপ তাদের মুখেচোখে।

অয়ন বাড়ির সদর দরজার কাছে এসে বলল, “আমি আজ বিদেয় হই বিদিশা, মঙ্গলবার আসব।”

বিদিশা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, “আপনি এ ভাবে কথা বলেন কেন? বিদেয় হই আবার কী ভাষা! ঘরে এসে একটু বসে যান। জাস্ট দুটো মিনিট।”

বিদিশার ঘরে বসে আছে অয়ন। নিজের ওপর আজ সারাদিনে তার চরম বিতৃষ্ণা জন্মেছে। আয়না ছাড়া নিজের মুখ দেখা যায় না এই যারক্ষা। নাহলে অয়ন নিজেকেই নিজে মুখ দেখাতে পারত না এই মুহুর্তে।

মহাশ্বেতা খুব বিনয়ের সঙ্গে ফোনে জানতে চেয়েছিলেন অয়ন যদি একটু সময় করে যেতে পারে বিদিশার সঙ্গে। চার লাইনের অ্যাডমিট কার্ডে তিনটে ভুল টাইপ করেছে বিশ্ববিদ্যালয়। সেটা কারেকশন করিয়ে আনা আজকাল বিশেষ ঝামেলার ব্যাপার। ডিসারটেশন আর এগজাম ফিজ-এর কাজগুলোও তা হলে একই সঙ্গে সেরে আসত বিদিশা।

অয়ন প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল। যেতে পারবে না মানে? অবশ্যই পারবে। কেউ না জানুক সে তো জানে, সারাদিন বিদিশার সঙ্গেই থাকে অয়ন। কখনও সে অয়নকে দেখে লাজুক হাসে, কখনও অয়নের দিকে হানে প্রশ্রয়ের কটাক্ষ। আবার কখনও ইচ্ছে করে চোখের আড়াল হয়ে কষ্ট দেয় অয়নকে। অয়ন তাই এই সুযোগ হারাতে চায়নি।

বহু বার চেষ্টায় যে কথা বিদিশাকে সে বলতে পারেনি আজ সে বলবেই বলবে।

আর তা ছাড়া কথা তো কঠিন কিছু নয়। প্রতিদিন পৃথিবীতে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পরস্পরকে এই কথা বলছে। এক জন যুবা পুরুষ কোনও সুন্দরী নারীকে এ কথা বলতেই পারে।

যেটুকু গ্লানি ছিল সেটাও ধুয়ে মুছে গেছে। ছাত্রী-শিক্ষকের সম্পর্কেও যে প্রেম ভালবাসাবাসি জগতে ঘটেনি, এমনটা নয়। অয়ন তো প্রথম পুরুষ নয় যে ছাত্রীকে এমন পাগলপারা ভালবেসে ফেলেছে!

বিশ্ববিদ্যালয়ে লম্বা লাইন। দাঁড়াতে হল অনেকটা সময়। অয়ন উসখুস করতে করতে বলেই ফেলল, “বিদিশা, তোমায় একটা কথা বলার ছিল।”

কাঠফাটা রোদ, লম্বা লাইন, তেতে থাকা জনতা... প্রেম নিবেদনের পক্ষে একেবারেই আদর্শ সময় নয়। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। কথা পৌঁছেছে বিদিশার কানে। বিদিশা দাঁড়িয়ে ছিল অয়নের সামনে, তার মাথায় বেগুনি ছাতা, তাতে সাদা ববি ছাপ। বিদিশা ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, “কী বলবেন স্যর, বলুন?”

ওই চোখের দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে গেল অয়ন, তার মনের জোর যে কোথায় উধাও হয়ে গেল। অয়ন কপালের ঘাম মুছে বলল, “বলছি, লাইনটা একটু এগোক।”

“আচ্ছা স্যর।”

লাইন একটু নয়, অনেক এগিয়ে গেল। অয়ন তবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে তার গালে কপালে বিদিশার ছাতার শিকের খোঁচা লাগছে, তাতেও তার এতটুকু অস্বস্তি নেই, বরং ভারী ভাল লাগছে।

একটু পরে বিদিশা বলল, “স্যর, লাইন এগিয়ে এসেছে। কী বলছিলেন বলুন?”

অয়ন আবার ভেবলে গেল, রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল, রুমাল পকেটে রাখল তার পর বলল, “একটু রোদটা পড়ুক বিদিশা, বলছি।”

বিদিশা কয়েক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। লাইন এগোল, রোদ পড়ে এল। ম্যাট্রিমনি অফিসে বিদিশার অ্যাকাউন্ট রিনিউ করার কাজ ছিল, সেখানেও ডকুমেন্টস ভ্যালিডেশনে সময় গেল কিছুটা। এক সময় সেই কাজও সারা হয়ে গেল, তবু অয়নের কথা বলা হয়ে উঠল না। দু’জন শিয়ালদা স্টেশনের কাছে একটা রেশুরায় ঢুকল, মোটামুটি পরিচ্ছন্ন, এসি চলছে, নরম হাওয়া... কোণের দিকের একটা টেবিল দেখে বসল অয়ন।

দেখা গেল খিদে পেলেও বিদিশা খেল খুবই সামান্য। খেতে খেতে বিদিশা বলল, “আপনি এ রকম কেন স্যর? ঠান্ডি আপনাকে যে কাজ বলে, আপনি অমনি চলে আসেন!”

“তাতে কী হয়েছে, উনি বয়স্ক মানুষ, ভরসা পান বলেই তো...”

“তবু আপনি আসবেন না। আপনি কি বেকার মানুষ? কাজকর্ম নেই আপনার? ক’টা ব্যাচ কামাই হল আজ আমার সঙ্গে আসবেন বলে?”

ভাল লাগা আর অস্বস্তি একই সঙ্গে আঁকড়ে ধরল অয়নকে। বিদিশা তাকে বেকার ভাবে না... এ যে কত বড় আনন্দ। কিন্তু বিদিশা চায়, ডাকলেই যেন অয়ন চলে না আসে... এর অর্থ সে আসায় বিদিশা খুশি হয়নি।

মাথা নিচু করে খাচ্ছিল অয়ন। দোলাচল কাটছিল না। বিদিশা বলল, “আপনি তখন কী যেন বলবেন বলছিলেন?”

অয়ন তাড়াতাড়ি বলল, “হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো। বলছি। একটু জল খেয়ে নিই। এই ভাই, শুনছ? এখানে এক গ্লাস জল দিয়ে যাও না।”

অয়ন হাত তুলে বেয়ারাকে ইশারা করল।

বিদিশা বলল, “কী আশ্চর্য স্যর! জল তো টেবিলেই আছে।”

“ও ইয়েস, রাইট। ঠিকই তো!”

অয়ন ঢকঢক করে গ্লাসের জল শেষ করল। তার পর বেয়ারাকেও ডেকে পাঠাল, এবং পরপর আরও দু’গ্লাস জল খেল। কিন্তু কথাটা তার আর বলা হয়ে উঠল না।

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল অয়নের। তার মনে হচ্ছে পৃথিবী এক নিষ্ঠুর জায়গা। জল তেঁষ্টা পেলে তেঁচিয়ে একঘর লোকের সামনে বলা যায় ‘আমাকে জল দিন, তেঁষ্টা পেয়েছে।’ অথচ এই যে অয়ন প্রেমহীনতায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, এই করে করে এক দিন বুক ফেটে হয় তো সত্যি মরে যাবে তবু একটি বার বলতে পারবে না, “বিদিশা, তোমাকেই ভালবেসেছিলাম। তুমি কি কিছুই বোঝানি!”

সারাদিনের গ্লানিতে অয়নের বিধবস্ত লাগছে। সে ক্লান্ত পায়ে চেয়ার ছেড়ে বইয়ের তাক থেকে একটা বই নিয়ে এসে টেবিলে বসল। কবিতার বই। দু’এক পাতা পড়ে দেখা যাক, যদি মন ভাল হয়।

বিদিশা ঘরে এল। তার হাতে এক গ্লাস জল আর প্লেটে মিষ্টি।

প্লেট আর গ্লাস টেবিলে রেখে বিদিশা বলল, “একটু মিষ্টি আর জল খেয়ে যান স্যর, রোদে ঘুরে ঘুরে কাহিল হয়ে গেছেন। কী পড়ছেন?”

“ও কিছু নয়, কবিতার বই।”

বিদিশা নড়েচড়ে বসল, “সার, একটা কবিতা পড়ে শোনান না প্লিজ। লাস্ট ইয়ার বিজয়া সম্মিলনীতে আবৃত্তি করেছিলেন সুমনাদিদের বাড়িতে। দ্যাট ওয়াজ জাস্ট অসাম।”

“না বিদিশা, আজ টায়ার্ড, আর এক দিন হবে।”

কিন্তু বিদিশার চোখে চোখ পড়তেই থেমে গেল অয়ন। ওই দু’চোখে অভিমানের মেঘ ঘনাক, সেটা অয়ন চায় না। এই মেয়ের বলা কোনও কথাই কোনও দিন ফেলতে পারবে না অয়ন।

একটা কবিতাতে শেষ হল না। পরপর তিনটে কবিতা শোনাতে হল অয়নকে। তার পরও বিদিশা ছেলেমানুষের মতো বলল, “আর একটা সার, আর একটা, এটা ই লাস্ট, প্লিজ।”

অয়ন কিছু ক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে রইল বিদিশার দিকে, তার পর শুরু করল :

সন্ধ্যা হয় - চারিদিকে মৃদু নীরবতা

কুটা মুখে নিয়ে এক শালিখ যেতেছে উড়ে চুপে

গোরুর গাড়িটি যায় মেঠো পথ বেড়ে ধীরে ধীরে

আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালী খড়ের ঘন স্তূপে...

হঠাৎ অয়ন আবিষ্কার করল বিদিশা তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। তার চোখে সন্দের আঁধার জমা হচ্ছে, জমা হচ্ছে পৃথিবীর যাবতীয় না বলা কথার নিবিড় মায়া।

অয়ন চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার শুরু করল :

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে

পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে

পৃথিবীর সব প্রেম...

অয়নকে থেমে যেতে হল। কারণ তার হাতের উপর হাত রাখল বিদিশা। অয়নের হাতে এই মুহূর্তে পৃথিবীর কোমলতম, কবোষ হাতখানি রাখা। দু’জনের হাত ঝুঁয়ে যেতেই বাগানের কদম গাছের মগডাল কাঁপিয়ে একঝাঁক টিয়াপাখি উড়ে গেল। পৃথিবীতে আজ হঠাৎ যেন অকাল বসন্ত। মরা হেমন্তে না হলে এমন রঙের বাহার কেন উপচে পড়ছে গাছগাছালিতে? বিকেল জুড়ে যেন সোনা রঙের ছটোপুটি শুরু হয়ে গেল।

সেই সোনা রং কারনিশ বেয়ে নামল বিদিশার ঘরের শার্সিতে। আরও কিছু রং ঝুঁয়ে ঢুকল তার পড়ার টেবিলে। বিদিশার চোখভরা অপার্থিব হাসি। সেই হাসিতেও অবশ্য কুষ্ঠা। হাসি ভেবে পাচ্ছে না চোখের পাতায় আটকে থাকবে, নাকি ছড়িয়ে পড়বে মুখময়।

দিশাহারা অয়নের তীব্র এক ভাল লাগায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে। একই সঙ্গে তার ভয় হল এত উত্তেজনা তার দুর্বল বুক নিতে পারবে না, একটা বড়সড় অঘটন ঘটতে চলেছে, অয়ন সম্ভবত এখনই আবার অজ্ঞান হয়ে যাবে।

তেনন কিছু হল না। বিদিশার চোখের গভীরে চোখ রাখল অয়ন। বাইরে অপূর্ব সন্ধ্যা নেমে এল। আকাশে বেলাশেষের মায়া, না বলা কবিতার শেষ লাইন ডানা মেলে উড়ছে হাওয়ায়, ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে আকাশে।

॥ ১১ ॥

আবার একটা ঘুসি মারল কেউ। ব্যাথায় ককিয়ে উঠল ভদকাই। ঘরের ভিতর আবছায়া ভাব, ওরা দলে মোট পাঁচ জন, যে যার মতো হাত-পা চালাচ্ছে, ঘুসিটা কে মারল বোঝা গেল না। সব কটা লোকের গায়েই সাতঘাতিক শক্তি, এক একটা ঘুসিতে ভিত কেঁপে যাচ্ছে ভদকাইয়ের। দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে কাজ করেছে, তবু এদের কাউকেই চিনতে পারছে না ভদকাই। একটা লোকের আদল সামান্য স্পষ্ট, তার মারেই জোর সবচেয়ে বেশি। এই জোর আসছে পুরনো রাগ থেকে।

ট্যাবলো। ভদকাইয়ের বন্ধু ট্যাবলো। বর্তমান নয়, প্রাক্তন। একটি

বিশেষ কারণে ভদকাইয়ের উপর ট্যাবলোর তুমুল ক্ষার।

প্রায় আধঘণ্টা হয়ে গেল তার উপর এই অমানুষিক নির্যাতন চলছে। খোলাই শুরু হওয়ার সময় একটু বেশিই ছটফট করেছিল ভদকাই, দু’-এক বার ‘বাবাগো, মাগো’ বলে চিৎকার করেও ফেলেছিল। ভদকাইয়ের বন্ধুর ডেরার চারপাশে বসি, গায়ে গায়ে ঘর, এ ভাবে চেষ্টা নিয়ে ফেলে ঠিক করেনি ভদকাই। ভিড় জড়ো হয়ে গেলে ফালতু বাওয়াল হয়ে যেত। লোকগুলো তাই বেডকভার ছিঁড়ে তার মুখে গুঁজে দিয়েছে, তার পর যথারীতি প্রহার শুরু করেছে, এই বার দ্বিতীয় রাউন্ড।

প্রথম রাউন্ডে তারা শুধুই পেটাচ্ছিল, ভদকাইয়ের কথা শুনছিল না কিছুই। দ্বিতীয় রাউন্ডে একটু আলাদা। মুখে কাপড় গুঁজে দেওয়ার পর থেকে তারা মারের পাশাপাশি প্রশ্ন করতে শুরু করেছে। ভদকাই গোঁ গোঁ শব্দ করছে। মুখ বেঁধে রেখে প্রশ্ন করার কোনও মানে হয়!

আর প্রশ্নও তো সব গতে বাঁধা। ভদকাই নেশার মাল কোথায় লুকিয়েছে, লুকিয়েছে নাকি বিক্রি করে দিয়েছে। বিক্রি করলে কাকে বিক্রি করেছে, টাকা কোথায় লুকিয়েছে...এই সব।

আর কথার ফাঁকে ফাঁকে চলছে তুমুল খিস্তি। ভদকাইয়ের শরীর অসাড় হয়ে আসছে। তার মনে হচ্ছে প্রাণটা বেরিয়ে গেলে ভাল হয়। কিন্তু লোকগুলোর মারের হাত ভাল, পরিমাণ বোঝে। এমন ভাবে মারছে যাতে ভদকাই মরে না যায়। বড়জোর জ্ঞান হারাতে পারে।

কোন কুক্ষণে যে ভদকাই ডালিমের ঘরে গেছিল! আজও সেই সঙ্কেটার কথা স্পষ্ট মনে আছে ভদকাইয়ের।

সারাটা দিন পোস্তা এলাকায় তোলা তুলতে তুলতে কেটে গেছিল ভদকাইয়ের। ফেরার পথে ট্যাবলো বলল, “ওস্তাদ, চলো একটা দারুণ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।”

কথার মধ্যে এমন কিছু নিষিদ্ধ সুর ছিল যে, ভদকাই সেই আবেদন অস্বীকার করতে পারেনি। ট্যাবলো তাকে নিয়ে গেছিল ডালিমের ঘরে। পাড়াটা খারাপ, রাস্তার ধার দিয়ে লাইন করে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের মুখে চড়া রঙ মাখা, চোখে মন্দির কটাক্ষ।

পাড়া খারাপ হলেও ডালিমকে প্রথম দেখতেই পছন্দ হয়ে গেছিল ভদকাইয়ের। সে নিজেও জানে পছন্দ হওয়া উচিত হয়নি, বাড়িতে বৌ আনার তখনও বছর যোরেনি, সেই বৌ ভাত বেড়ে তার পথ চেয়ে বসে থাকবে... এ সব কথা যে ভদকাইয়ের মনে আসেনি তা নয়। তবে এর পরেই ডালিম দুই বন্ধুকে মদের পেগ বানিয়ে দিয়েছিল। ভদকাইয়ের অপরাধবোধের পারদ এক ধাক্কায় তিন-চার ঘাট নেমে গেছিল। আর তার পর যখন ডালিম বৃকের আঁচল সরিয়ে দিল, তখন ভদকাই বুঝল সে ডুবতে বসেছে।

দু’দিন বাদে ভদকাই একাই আবার গেছিল ডালিমের ঘরে। ডালিম মধুর হেসে দরজা খুলে দিয়েছিল। পরের সপ্তাহে আবার গেল ভদকাই, পরদিন আবার। আর সে দিন ভদকাইকে পুরোপুরি গ্রাস করে নিল ডালিম। ব্যাপার বাড়তে বাড়তে এমন জায়গায় গেল যে, ঠিক তিন মাসের মাথায় এক একান্ত সন্ধ্যায় ডালিমের পাশে শুয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ভদকাই বলেছিল, “আর লোক বসাবি না ঘরে, ডালিম। মাসে কত লাগবে তোর, আমাকে বল।”

ডালিমের উপর যে ট্যাবলোর একটা টাল ছিল, সেটা বুঝতে দেরি হয়েছিল ভদকাইয়ের। ভদকাই ছাড়া অন্য পুরুষের জন্য ডালিম দরজা বন্ধ করায় ট্যাবলো খচে বোম। ভদকাইয়ের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল ট্যাবলোর।

ট্যাবলোই আফজল খানের দলে নিয়ে এসেছিল ভদকাইকে। ডালিমের সুখের আস্তানার পথও তো ট্যাবলোরই দেখানো। সেই ট্যাবলোর সঙ্গে বন্ধুত্ববিচ্ছেদ হয়ে গেল, ভদকাই গা করল না। মোহ বড় বিষম বস্তু।

সেই যে ডালিমের মোহে বাঁধা পড়ল ভদকাই, আর বেরোতে পারল না। এ সব নেশা সাধারণত বেশি দিন টেকে না, কিন্তু দেখা গেল ডালিমের ছলাকলা আঠার মতো আটকে রাখল ভদকাইকে। সারাদিন আফজল খানের দলের হরেক অসামাজিক কাজ সারা হলেই সন্ধ্যা নামতে না নামতে বি কে পাল অ্যাভিনিউ-এ ডালিমের ঘরে হাজির হয়ে

যেত ভদকাই। কখনও কখনও রাতে বাড়িও ফিরত না। দিনের কাজের ফাঁকে ঘন্টাখানেকের বিরতি পেলেও এক বার ঘুরে আসত ডালিমের কাছ থেকে।

সেই ডালিম যে এমন দিন দেখাবে ভদকাইকে তা কে জানত? অথচ কী সরল মুখ করেই না ভদকাইয়ের কথা শুনেছিল সে দিন ডালিম। ভদকাই নিচু স্বরে বলেছিল, “ডালিম, রাত অনেক হয়েছে, এই প্যাকেটটা তুই রাখ। এই প্যাকেট নিয়ে রাতে রাস্তায় ঘোরা সেফ নয় বুঝলি!”

ডালিম অবাধ চোখে প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, “কী আছে গো ওতে?”

ভদকাই হেসেছিল, “ওষুধ। শরীর মন ফুরফুরে করে দেওয়ার ওষুধ। প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা দাম!”

“প ন চা শ! এই, আমায় একটু দাও না গো।”

“কেন রে ডালিম? তোর শরীর মন ফুরফুরে করার ওষুধ দরকার নাকি? আয়, আমি তোরে ফুরফুরে করে দিচ্ছি।”

ভদকাই ডালিমকে কাছে টানতে চায়। ডালিম হাত ছাড়িয়ে নেয়। সে বহুভোগ্য। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় পুরুষের পছন্দ অপছন্দ তার নখদর্পণে। সে জানে এই সব সময়ে সরাসরি ধরা দিতে নেই। লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যায় ডালিম, “ইস! কী অসভ্য গো তুমি! ছাড়ো। ছাড়ো আমায়!”

ভদকাই ছাড়ে না, পিছন থেকে জাপটে ধরে ডালিমকে। ডালিমের চুলে লেবুতেলের গন্ধ মুহূর্তে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, “ছাড়ার জন্য কি ধরেছি নাকি? আয়।”

কপট অনুযোগ দেখায় ডালিম, প্রশ্রয়ের সুরে বলে, “ডাকাত একটা! এই তো একটু আগেই... এই! এই!”

তার কথা শেষ হয় না, ভদকাই এমন কিছু কার্যকলাপ করে যাতে ডালিম চুপ হয়ে যায়।

অনেক রাতে পুরোপুরি নিঃশেষিত হয়ে ঘরে ফেরে ভদকাই।

পরদিন বিকেলের দিকে ডালিমের ঘরে গিয়ে ভদকাইয়ের চক্ষুস্থির। ডালিমের ঘরের দরজায় তালা। তালা নতুন, ঝকঝকে সেভেন লিভারের। পাগলের মতো আশপাশের ঘরের মেয়েদের কাছে ছুটে গেছিল ভদকাই। না, কেউ কিছু জানে না।

তাকে নাকি শেষ বার দেখা গেছিল সকালবেলা। মগ-গামছা নিয়ে গঙ্গার ঘাটের দিকে যাচ্ছিল। তার পর বেলার দিক থেকে তাকে আর কেউ দেখেনি। তারা নাকি ভদকাইয়ের কাছেই জানতে পারল যে, ডালিমের ঘরে তালা।

উদ্ভাস্তের মতো সারা শহর ভদকাই চষে ফেলেছে ডালিমের সন্ধানে। কোথাও তার চিহ্নমাত্র নেই। জলজ্যান্ত একটা মেয়ে যেন এই শহর থেকে একবেলার মধ্যে উবে গেছে। শুধু উবে যায়নি, ভদকাইকে ফেলে গেছে গভীর সমস্যার মধ্যে। কোনও মতে পালিয়ে এই বস্তিতে গা ঢাকা দিয়ে ভেবেছিল কয়েক দিন শান্তিতে থাকতে পারবে, কিন্তু আফজল খানের লোকেদের ক্ষমতার ধারণা করে উঠতে পারেনি ভদকাই।

একটা লোক এগিয়ে এসে তার মুখ থেকে কাপড়টা টেনে বার করল। ভদকাই প্রাণ খুলে শ্বাস নিল অনেক ক্ষণ পরে। হাপরের মতো হাওয়া নিচ্ছে ফুসফুস ভরে। আর একটা লোক এগিয়ে এসে তার পিছমোড়া করে বাঁধা হাতও খুলে দিল। ভদকাই অবাধ হইল। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ভদকাই বুঝল তার পা টনটন করছে। আধ ঘন্টা ধরে পাঁচটা লোক দূরমুশ করেছে তাকে। এর পরেও সে বেঁচে আছে এটা বড় কথা। ভদকাই বসেই রইল।

দুটো লোক এগিয়ে এসে হাত টেনে তাকে দাঁড় করাল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভদকাই দেখল ছোট ঘরটার দরজা খুলে গেল।

লম্বা দোহারা চেহারার মানুষটাকে এই আলো আঁধারেও চিনতে এতটুকু অসুবিধে হল না ভদকাইয়ের। লোকদুটোর হাত এক ঝটকায় ছাড়িয়ে সে ছুটে গিয়ে আফজল খানের পা জড়িয়ে ধরল।

আফজল খান হালকা একটা লাথি মেরে সরিয়ে দিল ভদকাইকে। আফজল খানের পরনে থিয়ে রঙের পাঠানি সালোয়ার সুট। সে ঘরে ঢুকতেই একটা মিঠেকড়া আতরের গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। এটা আফজল

খানের ট্রেডমার্ক। বাগদাদ থেকে এই আতর আসে। আতর না মেখে সে কোথাও বেরায় না।

আফজল খান ধীরেসুস্থে বিছানায় বসল। ভদকাই আবার ছিটকে এসে আফজল খানের পা জড়িয়ে ধরল। এ বারও পা ছাড়িয়ে নিতে চাইল আফজল খান, পারল না। ভদকাই তার পা আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

বিকারগ্রস্ত মানুষের মতো ডুকরে উঠল ভদকাই, “আফজল ভাই। আমি মাল সরাইনি আফজল ভাই, আপনাকে তো বলেছি কত বার, আপনি আমায় ক্ষমা করে দেন।”

“এক মুখে কত কথা বলবি ভদকাই? এক বার বলছিস মাল সরাসনি, আবার মাফও চাইছিস! তাজ্জব কী বাত!”

“আফজল ভাই, আপনি তো আমারে চেনেন। আমি কোনও দিন আপনার সঙ্গে দাগা করতে পারি বলেন?”

“আবে চোপ সালা! যে ধান্দায় আছিস সেখানে বাপ বেটাকে বিশ্বাস করে না, সওহর জরুকে বিশ্বাস করে না তো, তোকে আমি বিশ্বাস করব কী করে? আর ভদকাই, তোকে চিনি বলেই এত দিন তুই জিন্দা আছিস। আফজল খানের মাল খেয়ে কেউ হজম করতে পারে না।”

ভদকাই বিড়বিড় করল, “কী সর্বনাশ যে হল, কী সর্বনাশ...”

আফজল খান শুনতে পেয়েছে, সে বলল, “সর্বনাশ সব শুরুরাত হয়েছে ভদকাই। সর্বনাশের কিছুই দেখিনি এখনও। তবে কী জানিস! আল্লাহ যেমন এই জমিন আসমান বানিয়েছেন, তেমনই সব সমস্যার সমাধানও বানিয়েছেন। কিন্তু তিনি তো সব কিছু নিজ বলতে পারেন না, তাই মানুষকে সেই সমাধান নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়।”

ভদকাই বেশ কিছু ক্ষণ ধরে কেঁদে ফেলার চেষ্টা করছিল, এত ক্ষণে তার চোখে জল এসেছে। গাল, চিবুক একেবারে ভেসে যাচ্ছে চোখের জলের তোড়ে। সে ভাঙা গলায় বলল, “আমায় ফিরিয়ে নেন, আফজল ভাই। সারাজীবন গোলাম হয়ে থাকব, যা বলবেন করব, কখনও একটা পয়সা চাইব না, দয়া করেন আফজল ভাই, দয়া করেন।”

ঢাবলোর হাত নিশপিশ করছিল। সে ফুঁসে উঠল, “এই শুয়ারটাকে দয়ামায়া দেখাবেন না আফজল ভাই। মেয়েছেলে পেলে শালা আপনাকে দাগা দিতেও ভাববে না। শিওর সব মাল এ আর এর চামেলিটা হড়পে নিয়েছে। এক বার হুকুম করুন এখানেই কুণ্ডটাকে শেষ করে দিই।”

ভদকাই ঢাবলোর দিকে তাকিয়ে রইল। ঘরে আবছা অন্ধকার তাতেও তার মনে হল ঢাবলোর চোখজোড়া চকচক করছে। হঠাৎই ভদকাই বুঝতে পারল ভুলটা কোথায় হয়ে গেছে। তার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে ঢাবলো আর ডালিমের রীতিমতো মাখামাখি ছিল, ভদকাই তাদের মাঝখানে এসে পড়েছিল। কিন্তু তা বলে এত দূর! এত দিনের দোস্তকে জানে মেরে দিতে পর্যন্ত হাত কাঁপবে না ঢাবলোর? মেয়েমানুষ যে কী চিঁজ, হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছে ভদকাই।

আফজল খান বলল, “পিস্তল জায়গায় গুঁজে রাখ ঢাবলো। বহুত দিন আমার কাজে এসেছে এই ভদকাই। আর একটা চাপ দিয়ে দেখাই যাক। শোন, কাল থেকে রেড লাইট এরিয়া পুরো ছেনে ফেলবি। ডালিম নামের ওই মেয়েছেলে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় গেছে, সব ইনফর্মেশন আমার চাই, বুঝলি?”

সাগরেদরা কলের পুতুলের মতো ঘাড় নাড়ল। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঢাবলো।

আফজল খান বলল, “শোন ভদকাই, তুই এখন রিস্কি চিঁজ। তোকে ছেড়ে দিলেও মুশকিল, আবার শালা তোকে নিজের দলে রাখতেও পারছি না। আমি দু’মাস সময় দিলাম। এর মধ্যে আমার টাকার অন্তত ফিফটি পারসেন্ট ওয়াপস করে দিলি তো জানে বেঁচে গেলি তুই। বাকি গ্যাং-এ ফিরে শোখ করিস। কিন্তু এই আমার লাস্ট টাইম। শালা পয়সা দিতে না পারলে সিধা জাহান্নাম পাঠিয়ে দেব বুঝলি হারামের পিছা?”

কথাগুলো বলার পরে আর অপেক্ষা করল না আফজল খান। বেরিয়ে গেল বস্তির ঘরটা ছেড়ে।

ঢাবলো তার কাছে এসে চাপা গলায় হাসল, “খুব উড়ছিলি না? লে, তোর ডানা কেটে দিয়ে গেলাম। ডালিমের ঘরে, আফজল ভাইয়ের দলে, সব জায়গায় তোকে আমিই এনেছিলাম ভদকাই, আর শালা

সব জায়গায় আমার মাথায় পা রাখিস তুই? তোর ওপর নজর রইল ভদকাই। একটা চাপ্স পাই, গুনে গুনে দানা পুরে দেব হারামি, কোনও সাদা তোকে বাঁচাতে পারবে না।”

তার সাগরেদরা বিদায় নিলে গোটা ঘরে ভদকাই একা। পাশের ঘরে হিন্দি সিনেমা চলছে, বাড়পিটের শব্দ, চড়া মিউজিক। ভদকাই অবসন্ন শরীর বিছানায় এলিয়ে দিল, ঘরময় এখনও আফজল খানের আতরের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সারারাত জেগে রইল ভদকাই। জোনাকির দেওয়া টাকা এখনও কিছু বাকি আছে, সেই টাকা দিয়ে ব্যথা কমানোর ওষুধ কিনে খাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেই ব্যথার জন্যই এক পাও হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই ভদকাইয়ের। অদ্ভুত অনুশোচনায় রাতভোর জ্বলতে লাগল ভদকাই। সেই টোটো চালানোর দিনগুলোর কথা মনে পড়ল তার। কত খাটাখাটনি ছিল, অভাব ছিল! তবু কত যত্নে সেই অভাবের সংসার সামলে চালাত জোনাকি। একবারের জন্যও তার মুখ ভার দেখেনি ভদকাই।

হতাশায় আবার চোখে জল এসে গেল ভদকাইয়ের। হারিয়ে যাওয়া সময়ে কেউ ফিরে যেতে পারে না কিন্তু নতুন সময় তো বানাতে পারে। যে সময় শুধু ভদকাই আর জোনাকির। চোখ মুছে চিত হয়ে গুল ভদকাই। এক বার, আর একবার শুধু সে অসং হবে। হয়তো তার জন্য জোনাকির চোখে আরও একটু নীচে নেমে যাবে, কিন্তু প্রাণই যদি না থাকল মান ধুয়ে কি জল খাবে ভদকাই? আর তা ছাড়া এই বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্য উপায় জানা নেই তার।

প্রবল ব্যথা উপেক্ষা করে ভদকাই তার আগামী কর্মপদ্ধতি ভাবতে লাগল। এক সময় তার মনে হল ঘর থেকে কড়া আতরের গন্ধটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে সাগরের বিলেত যাওয়ার দিনটা এসে গেল। ব্যাপারটা খুব অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। বাড়ির সবাই জানত এক দিন সাগর এই দেশ ছেড়ে যাবে। তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সে বেশ কয়েক বার খাওয়ার টেবিলে পরিকল্পনা করে দিয়েছিল।

সেই মতে জি এম সি রেজিস্ট্রেশন জোগাড় করেছে, অনলাইন চাকরির অ্যাপ্লাই করেছে, শর্টলিস্টেড হয়ে এক বার ইন্টারভিউ দিয়ে এল। অপেক্ষা ছিল চাকরির কনফার্মেশন আসার। কনফার্মেশন অবশেষে এসেছে। ভিসা কনফার্ম হলেই সাগর রওনা হবে।

দেশে কেরিয়ার গড়ার কথা সে ভাবেওনি কোনও দিন। এই জঘন্য ট্রাফিক ঠেলে চেষ্টার থেকে চেষ্টারে ছুটে মরা, রোগী পাওয়া নিয়ে সমসাময়িক ডাক্তারদের সঙ্গে খেয়োখেয়ি, কমিশন নিয়ে হাসপাতাল আর ওষুধের কোম্পানির আকচাআকচি... এ সব কথা ভাবলেও তার জ্বর আসে।

সুপার চামচ মুখে তুলে মহাশ্বেতা বলতেন, “কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয় পাপান। এখানে কেরিয়ার অপশন নেই তা নয়। আমার কলেজের অনেক স্টুডেন্ট-এর সঙ্গে তো এখনও যোগাযোগ আছে, দে আর ডুয়িং কোয়াইট ওয়েল ফর দেমসেলভস।”

“তারা কি এম এস এর পর আর কোনও কোর্স পারসু্য করেছে ঠাম্মি? এনি ফরেন ডিগ্রি...”

মহাশ্বেতা বুঝতে পারেন সাগর কোন লাইনে কথা নিয়ে যেতে চাইছে, তিনি প্রসঙ্গ সামান্য পাল্টে বলেন, “অ্যাকাডেমিক্স লাইনে ট্রাই করতে পারো, এর চেয়ে নোবেল প্রফেশন কি আর আছে? আমাদের সময়ে ডক্টর সায়ন্তন সরকার এনআরএস-এ সার্জারি ক্লাস করতেন, স্তব্ধ হয়ে শুনতে হত। শুধুমাত্র ওঁর ক্লাস করবে বলে কত ছেলেমেয়ে যে সার্জারি নিয়েছিল...”

সাগর ক্যাসেরল থেকে একটা রুটি নিজের থালায় নিয়ে বলে, “তুমি বুঝতে পারছ না ঠাম্মি, সেটা ওঁর ইন্ডিভিজুয়াল ক্যারিয়ার ছিল, আর তা ছাড়া সিকিউরেশন কি আর সে রকম আছে? ভেবে দ্যাখো, লন্ডন থেকে পাশ করা ডাক্তার ক্লাস নিচ্ছে, ছাত্ররা লাস্ট বেঞ্চে নিজেদের মধ্যে গজল্লা করছে, ডাক্তার খাতা খুলে রোল কল করছে মাথা নিচু করে, এ

দিক ও দিক থেকে ডুব দেওয়া ছেলেদের হয়ে প্রক্সি দিচ্ছে লোকজন... স্যারি ঠাম্মি, দিস ইজ নট দ্য লাইফ আই ওয়ান্ট।”

মহাশ্বেতা চুপ করে যান। বেশ কয়েক দিন তিনি রহস্যজনক চিঠি নিয়ে দৃষ্টিভ্রম পড়েছিলেন। শুভপ্রসন্ন মজুমদারের দেওয়া নাম্বারে বারবার ফোন করেও লাভ হয়নি, যান্ত্রিক কণ্ঠ বলেছে : দিস নাম্বার ইজ টেম্পোরারিলি আউট অফ সার্ভিস।

প্রভঞ্জন শুনে লাফিয়ে উঠেছেন, “দেখেছ! বলেছিলাম না কেউ ফাজলামি করছে! ফোন করতেই সব ভেঁ ভাঁ, তুমি সব কিছুতে ওভার থিঙ্ক করাটা এবার কমাও তো মা।”

পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেন নি মহাশ্বেতা। কেউ যে এই ব্যাপার নিয়েও ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে পারে, তাও আবার মহাশ্বেতা রুদ্রের সঙ্গে, এ যেন তিনি ভাবতেই পারছেন না।

মঞ্জুষা সচরাচর সাগর আর মহাশ্বেতার কথোপকথনে ঢোকেন না। মহাশ্বেতার সঙ্গে এক বার চোখাচোখি হয়ে যায় তাঁর, কয়েক সেকেন্ড পরস্পরের দিকে ভাবলেশহীন তাকিয়ে থেকে চোখ সরিয়ে নেন দু’জনেই। বহু বছর আগে তাঁরা দু’জনে একটা এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছিলেন। আজ সেই এক্সপেরিমেন্টের প্রোডাক্ট তাঁদের চোখের সামনে। কিন্তু তাঁদের মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে সেই

সাক্ষ্য তাঁদের সুখী করতে পারেনি। তাঁরা চেয়েছিলেন সাগর যেন এই বংশের বাকি পুরুষদের মতো সংসারবিমুখ না হয়ে পড়ে, কিন্তু আজ তাঁদের দু’জনেরই মনে হচ্ছে এই সাগরকে তাঁরা চাননি।

মঞ্জুষা নিজেকে সংযত করলেও কথার মাঝে আচমকাই ঢুকে পড়েন প্রভঞ্জন। যেন কোনও গভীর চিন্তা থেকে জেগে প্রভঞ্জন বলে ওঠেন, “আচ্ছা পাপান, তুই তো নিজের সেটআপ করার কথাও ভাবতে পারিস, মানে বলছি নিজের একটা নার্সিং হোম টাইপ কিছু...”

প্রভঞ্জন এক অজানা অস্বস্তিতে কথা শেষ করে উঠতে পারেন না। সাগর খাওয়া থামিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে দেওয়ালের দিকে। বাবার সঙ্গে শেষ কবে বাক্যালাপ হয়েছিল তা মনে নেই সাগরের, লোকটাকে সে এড়িয়েই চলে।

একটা নার্সিং হোম সেটআপ করার মিনিমাম এস্টিমেশন জানে লোকটা? সাগর কেরিয়ারের শুরুতেই অত টাকা পাবে কোথায়? কে দেবে টাকা? প্রভঞ্জন রুদ্রই বা কী এমন ট্যাকের জোর? পারবে আস্ত একটা নার্সিং হোম ফাইনাল্স করতে!

সাগর দেওয়ালের দিকে তাকিয়েই গলা চড়ায়, “জোনাকি! অ্যাই জোনাকি! আজ আবার এত ঝাল দিয়েছিস রান্নায়! সত্যি তোকে বলে বলে আর পারা যায় না।”

বিদিশা চুপ করেই ছিল তবে একেবারে নিলিঙ্গিত দেখায়নি। সে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে সবার ভাবভঙ্গি স্টাডি করেছে। তার জীবনদর্শন খুব পরিকল্পিত— যে যে ভাবে চললে আনন্দ পায় তাকে সে ভাবে চলতে দাও। তাই সাগরের চলে যাওয়ার খবরে সে আনন্দিতই হয়েছে। হ্যাঁ, দাদাভাইকে হয়তো সে রোজ রোজ দেখতে পাবে না, তবে এখানে থেকেও কি দাদাভাই সবার সঙ্গে ছিল! যে সময়গুলোতে দাদাভাই ধ্যানমগ্ন হয়ে নিজের কাজে বা পড়ায় ব্যস্ত থাকত, শত ডাকাডাকিতেও কি তার সেই ধ্যান ভাঙতে পারত বিদিশা! তার থেকে এই ভাল, অন্তত এটুকু জেনে বিদিশা খুশি হবে যে দাদাভাই যেমন ভাবে বাঁচতে চেয়েছিল তেমন ভাবেই বাঁচবে।

খাওয়া শেষে শুতে যাওয়ার আগে তবু এক বার দাদাভাইয়ের ঘরে ঘুরে যায় বিদিশা।

সাগর খাওয়া সেরে নতুন করে বইখাতা নিয়ে বসেছিল। বিদিশা এসে তার টেবিলের সামনে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। এক বার তাক থেকে বই নিচ্ছে, এক বার টেবিলের ওপর রাখা কাগজপত্র ঘেঁটে দেখছে।

কিছু ক্ষণ চোখের কোণ দিয়ে তার কার্যকলাপ দেখার পর সাগর বই ভাঁজ করে রাখল, “কী রে, কিছু বলবি?”

“বলব বলেই তো এসেছি, কিন্তু এত মন দিয়ে বই পড়ছিস, কিছু বলতেই হচ্ছে করে না।”

“বই তো রেখে দিয়েছি। এখন বলা।”

বিদিশা কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, “তোমার মনখারাপ লাগে, দাদাভাই?”

“মানে?” সাগর চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল, “মন খারাপ লাগতে যাবে কেন?”

“না, মানে, এই যে এতদিনের শহর, পাড়া, তার পর আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি...”

“ওয়েট আ সেকেন্ড। আমার মনে হত এ বাড়িতে শুধু তুই-ই আমাকে কিছুটা বুঝিস। অন্তত বাকিদের থেকে বেটার। কিন্তু তুই পর্যন্ত এই সব ন্যাকা ন্যাকা কথা বলতে শুরু করেছিস!”

বিদিশা বলল, “আমার কথা বাদ দে, তুই একশো জন লোককে জিজ্ঞেস করে দেখ, দেশ ছেড়ে, ফ্যামিলি ছেড়ে যাওয়ার সময় তাদের মধ্যে নিরানব্বই জনেরই মন খারাপ করে।”

সাগর হাসল, “তা হলে, আমি ওই শততম পুরুষ। না, আমার কোনও মনখারাপ নেই। মন খারাপ থাকলে অবশ্যই বলতাম যে, মনখারাপ, কিন্তু জোর করে মনখারাপ আমদানি করব কোথা থেকে?”

বিদিশা উত্তর দেয় না, সে এমনি এমনিই বসে আছে দাদার বিছানায়, পা দোলাচ্ছে।

সাগর নিজেই বলল, “তোমার বন্ধুটার খবর কী রে? অনেক দিন দেখা যাচ্ছে না।”

“কে মৌরিফুল! সে এখন খুব ব্যস্ত।”

“ব্যস্ত মানে? তার আবার কিসের ব্যস্ততা? কাজের কাজ কি সে করে একটাও? সারাদিন ভুলভাল কাজ...”

“হ্যাঁ, সে রকম একটা ভুলভাল কাজেই ব্যস্ত। একটা বৃদ্ধাশ্রমে সেক্ষ হেল্প গ্রুপের তরফ থেকে মেন্টাল রিহাব-এর কাজে ঢুকেছে। ওর তো সাইকোলজি আছে, জানিস তো?”

সাগর বই খুলেছে আবার, অন্যমনস্ক স্বরে জানতে চাইল, “কাজের নেচারটা কী রকম?”

“ওই, বয়স্ক মানুষ যারা আশ্রমে আছে, তাদের সাইকোলজিক্যাল কাউন্সেলিং করে। ওদের একটা টিম আছে।”

“টাকা পয়সা পায়?”

“টাকার জন্য তো মৌরিফুল এই কাজ করে না। পায়, খুব সামান্য। সেটাও আবার ওই ওল্ড এজ হোমের ওয়েলফেয়ারে দিয়ে আসে। কিন্তু...” বিদিশা চুপ করে গেল।

সাগর এ বার বই বন্ধ করে বোনের দিকে তাকাল, “কিন্তু কী?”

“না, বাদ দে।”

“আরে, বলই না।”

“আশ্চর্য! তুই হঠাৎ আজ মৌরিফুলের ব্যাপারে এত ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছিস কেন?”

সাগর খেঁকিয়ে উঠল, “এই যা তো! পালা এখন থেকে। খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই ওর মৌরিফুলের ব্যাপারে ইন্টারেস্ট দেখাতে যাব! বলতে হলে বল, নাহলে ফোট এখন থেকে।”

বিদিশা কৌতুক ভরে দাদার প্রতিক্রিয়া দেখল কিছু ক্ষণ, তার পর বলল, “এক জন স্পেশ্যাল লোক জুটেছে। মৈনাক তরফদার। ফুড ডিপার্টমেন্ট-এর ক্লার্ক। ওই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার গ্রুপেই আলাপ। সে তো মৌরিফুলকে প্রথম দেখতেই টোটাল ফিদা। তার পর থেকে নাকি মৈনাক তাকে চোখে হারাচ্ছে একেবারে। না রে দাদাভাই, ঠিক প্রেম প্রেম খেলা নয়, এ দারুণ সিরিয়াস। মৌরিফুল রাজি থাকলে কালই নিজের বাবা মাকে ওদের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়, কেস এতটাই সিরিয়াস। এক দিন কী হয়েছে জানিস...”

এক দিন যে কী হয়েছে সেটা বলা হল না। সাগরের ফোন এসেছে। দরকারি ফোন। প্রায় মিনিট পাঁচেক কথা বলতে হল। বিদিশা চলে যাচ্ছিল, সাগর হাতের ইশারায় তাকে বসতে বলল।

ফোন রেখে সাগর বলল, “ঠিক আছে, এ বার যেতে পারিস।”

“কী আশ্চর্য! আগেই তো যাচ্ছিলাম তখন যেতে দিলি না কেন?”

“এমনি, মেরি মজি।”

পায়ে ধুপধাপ শব্দ করে বিদিশা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যাচ্ছিল, সাগর বলল, “তোমার মৌরিফুল কী বলছে?”

“কী বলছে মানে? কোন ব্যাপারে?”

“ওই যে ভদ্রলোক, কী নাম শৌনক না কী যেন।”

“ও, মৈনাক? এমন পাগল-পাগল ভালবাসা হ্যালোজেন নিয়ে খুঁজলেও পাওয়া যায় না দাদাভাই। দেখা হলে রোজ একটা করে গোলাপ দেয় ওকে, জানিস! রেড রোজ। আড়ালে আবডালে দিলে তাও বোঝা যেত, এ দেয় সবার সামনে। লুকিয়ে চুরিয়ে ভালবাসার লোক হাজারটা আছে, কিন্তু যে ছেলে সবার সামনে বুকুর ভিতরটা দেখিয়ে দিতে পারে, তাকে কি ঠেকিয়ে রাখা যায়, না ঠেকিয়ে রাখা উচিত? আমি তো বলেছি মৌরিফুল, তুই রাজি হয়ে যা। কিন্তু সে মেয়ে রাজি হলে তো।”

“কেন? এমন চমৎকার ছেলে, রাজি না হওয়ার কী হল?” সাগর টেবিলের ওপর থেকে জলের গ্লাস তুলে চুমুক দিল।

বিদিশা সহজ ভাবে বলল, “কে জানে? আমি তো জানি না। তুই জানিস, দাদাভাই?”

সাগর হঠাৎ বিষম খেল। কাশির দমক এল জোর। তার কাশি আর থামতেই চায় না।

পারিজাত এ বাড়িতে এল আরও দিন সাতেক পরে। সে এলেই কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বাড়ির বাতাবরণ পালটে যায়। কেউ যেন একটা ঘুমন্ত পুরীকে জাগিয়ে দেয় অদৃশ্য জাদুকারির ছোঁয়ায়। সে এসে পৌঁছানোর পিছু পিছু বৃষ্টি নামল। বড় ফোঁটার বৃষ্টি, এমন ভাবে ঝরতে শুরু হল যেন সৃষ্টি রসাতল না করে থামবে না।

এ বার পারিজাত এসেছে অনেক দিন পর। কিছু ক্ষণ বিদিশার সঙ্গে গজল্লা করে সে গোটা বাড়ির একটা চক্কর কেটে এল। তার একটা সুবিধে আছে, সে সবার সঙ্গে তার নিজের মতো করে মিশে যেতে পারে। মঞ্জুরার সঙ্গে সিরিয়ালের গল্প, মহাশ্বেতার সঙ্গে পুরনো কলকাতার কড়া আবার প্রভঞ্জনের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো নিয়ে আড্ডা দিতে পারে সে।

মুশকিল হয় সাগরনীলের কাছে এসে। কোনও এক অজানা কারণে সে তাকে দু'চক্ষু দেখতে পারে না।

আজ পারিজাত সাগরকে কিছু বলবে বলে ভেবে এসেছে। খুবই সহজ কথা, তবে সেই কথা সে নিজের মুখে বলবে না। রাত জেগে পারিজাত একটা চিঠি লিখেছে, সেই চিঠিতেই লেখা আছে সবটুকু। মুশকিল ওই তাঁদড় লোকটাকে নিয়ে। সারাক্ষণ রামগরুড়ের ছানার মতো মুখ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ কী আশ্চর্য কিউট একটা লোক। মস্ত বড় ডাক্তার হয়েছে, বিলেত পাড়ি দেবে... এ দিকে কেন পারিজাত এ বাড়িতে ঘনঘন আসে, কেনই বা এলে খালি এক জনের ঘরের আশেপাশে ঘুরঘুর করে তা কি ওই গোমড়াথেরিয়ামটা জানে?

তবে পারিজাতের বিশ্বাস সাগর যতটা দেখায়, ততটাও অপরূপ করে না তাকে। বরং ভিতরে ভিতরে তাকে সাগরদা বেশ পছন্দ করে। আজ বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে। পারিজাত চায় না সাগরদা ও দেশে গিয়ে কোনও বিলিতি মেমের পাল্লায় পড়ুক।

তবে তার আগে বিদিশার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাল পারিজাত। তার হঠাৎ দেখায় মনে হল বিদিশা যেন অনেকটাই পাল্টে গেছে, ব্যাপারটা চোখে পড়ার মতো। পারিজাত বন্ধুকে বেশ ভাল রকম চেনে, তার বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না। এই বাদলা দিনেও তার মুখে এক নরম আলো এসে পড়েছে যেন, পারিজাত জানতে চাইল, “তোমার ব্যাপার কী রে! দিনকে দিন সুন্দর হয়ে যাচ্ছিস! কেসটা কী? কেউ জুটল নাকি?”

পারিজাত লক্ষ করল বিদিশার মুখে একটা লালচে আভা এল। ঘটনা মোটেই সুবিধের নয়। পারিজাত সম্ভাব্য বিভিন্ন বিপর্যয়ের উৎস খুঁজতে লাগল।

বিদিশা বলল, “কী যে বলিস! আমি কি পারিজাত মল্লিক যে ছেলেরা আমার পিছনে ঘুরঘুর করবে?”

“উহু! কথা ঘুরিয়ে আমাকে কাবু করতে পারবি না। বল কী হয়েছে? এনি গুড নিউজ? আমাকে বলবি না?”

বিদিশা ঠোট চেপে হাসল, কিন্তু একটি কথাও বলল না।

পারিজাত বলল, “ঠান্মি বলল, তোর বিয়ে নিয়ে হেবি যোগাড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ক’দিনের মধ্যে নাকি বাড়িতে পাত্রপক্ষের আনাগোনা শুরু হবে, সেই কারণেই নাকি? তুই যে এত ওল্ড ফ্যাশনের মেয়ে, তা তো আমি জানতাম না বিদিশা। লোকের পরিবর্তন হয় বিয়ের জল গায়ে পড়লে, আর তোর পরিবর্তন শুরু হল বিয়ের কথা কানে আসতেই!”

বিদিশা বলল, “আচ্ছা তোর কি আর অন্য কোনও কথা নেই, সিঙ্গল ট্র্যাকেই আটকে আছিস!”

আরও কিছু বলতে গিয়ে বিদিশা থেমে গেল। সে জানে না কেন সে কাউকে বলতে পারে না। ভালবাসা সম্ভবত এ ভাবেই আসে। নিকটের মানুষদের পর্যন্ত বলা যায় না সেই গভীর অনুভব। যে পারিজাতের কাছে তার কিছুই গোপন নেই, সেই পারিজাতকেও মন খুলে বলতে পারল কি কিছু?

বলতে পারল না কী ভাবে দুকূল ভাসিয়ে ভালবাসা এসেছে, কী ভাবে সেই হৃদপা বানে সবটুকু ভেসে গেছে, বিদিশা নিজেই আর আগের বিদিশা নেই, আজকাল তার নিজেকে এক নতুন বিদিশা মনে হয়। সেই মানুষকে ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা হচ্ছে, এই চিন্তা তাকে রাতে ঘুমোতে দেয় না।

এত কথাই কিছুই পারিজাতকে বলতে পারল না সে।

পারিজাত আর একটু চেষ্টাচরিত্র করে রণে ভঙ্গ দিল। তার মনে একটা ছোট চিন্তার কাঁটা খচখচ করছে। বিদিশা তার দেখা সরলতম মানুষগুলোর এক জন। খুব সহজে সে মানুষকে বিশ্বাস করে। পারিজাত যতটা পারে এই বোকা মেয়েকে আগলে রাখে, তবে সব সময় তো আর বিদিশা পারিজাতের চোখের সামনে থাকে না। কী বামেলা বাঁধিয়ে তুলবে কে জানে! পারিজাতের মনে হল সবকিছু ঠিকঠাক নেই। তবে আজ নয়, আর এক দিন সে বিদিশাকে নিয়ে বসবে। আজ তার নিজেরই একটা খুব দরকারি কাজ আছে।

উঠে পড়ল পারিজাত। বিদিশা বলল, “কোথায় যাচ্ছিস আবার? খুবই চঞ্চল হয়ে গেছিস তো।”

পারিজাত হাসল, “আসছি একটু।”

বিদিশার ঘর থেকে বেরিয়ে টানা করিডরে এসে পড়ল পারিজাত। এই করিডরের শেষ ঘরটা সাগরের। রুমবামিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। শহুরে হাওয়ায় হঠাৎ জলজ দ্রাণ। বর্ষা বড় মায়াবী ঝড়। আকাশের চোখেও মায়াকাজল। কাজল-ছায়ায় অকালে আঁধার নেমেছে। পারিজাত ধীর পায়ে সাগরের ঘরের দিকে হাঁটছে। করিডরের এক পাশে কাচের স্লাইডিং উইন্ডো, জলের ছাঁট এসে লাগছে পারিজাতের মুখে চোখে। পারিজাত বৃষ্টিবিলাসী মেয়ে, তবু তার মন সামান্য হলেও উদাস। সাগরদা বাইরে চলে যাবে, এমন শহর-ডোবানো বৃষ্টি আরও কত বার হবে, সেই বৃষ্টি দেখে বিরক্ত হওয়ার মতো একটা লোক কমে যাবে শহরে।

পারিজাত সাগরের ঘরে ঢুকল। সাগর আজকাল দারুণ ব্যস্ত। পরশু তার লন্ডনের ফ্লাইট। যথেষ্ট হিসেবি আর গোছানো হওয়া সত্ত্বেও দেখা গেছে শেষ মুহূর্তে একগাদা কাজ এসে হাজির। সেই সব কাজ সামলাতে সামলাতে সাগরের নাভিস্বাস উঠছে।

পারিজাত ঘরে ঢুকে বলল, “অল সেট, সাগরদা? রেডি টু ফ্লাই?”

সাগর চোখ তুলে তাকাল, “ও। পারিজাত, তুমি?”

“হ্যাঁ, আমি। তুমি কি অন্য কাউকে এক্সপেক্ট করছিলে?”

সাগর হেসে বলল, “বলো, হঠাৎ কী মনে করে?”

পারিজাত জানে সাগর অকাজের কথায় সময় নষ্ট করার ছেলে নয়, সে প্রসঙ্গে এল, “তোমায় একটা দরকারি কথা বলার আছে সাগরদা।”

সাগর কেজো স্বরে বলল, “হ্যাঁ, বলো পারিজাত।”

কাজটা যতটা সহজ হবে ভেবেছিল, দেখা গেল কাজ তার থেকে ঢের কঠিন। পারিজাত হঠাৎ আবিষ্কার করল তার মুখে কথা ফুটছে না।

সাগর ভুরু কুঁচকে বলল, “পারিজাত, বলো!”

পারিজাত খুব কুণ্ঠাভরে এক বার ঘরের বাইরে তাকাল, এই পরিস্থিতিতে কেউ এসে হাজির হলে লজ্জার ব্যাপার হবে। সে ক্ষীণস্বরে বলল, “সাগরদা, কথাগুলো আমার পক্ষে নিজের মুখে বলা সম্ভব নয়।



জানি তুমি আমাকে খুব ফাজিল, অগভীর একটা মেয়ে ভাবো, তবু নিজে বলতে পারব না। তুমি বরং পরে এটা পড়ে নিয়ো।”

ওড়নাসমেত হাত সাগরের টেবিলে রাখল পারিজাত, সেই হাতে কুসুম রঙের খাম।

সাগর সে দিকে তাকিয়ে বিস্মিত স্বরে বলল, “হোয়াট ইজ দ্যাট? হোয়াট ইজ দ্যাট?”

“আরে, আস্তে! চোঁচাচ্ছ কেন তুমি! অদ্ভুত লোক তো!”

সাগরের অভিযুক্ত হঠাৎ পাল্টে গেল। সে মুদু হেসে বলল, “তোমার ভয় করছে পারিজাত? এতে ভয়ের কী আছে? ক্রাইম কিছু তো করছ না। তবে কী জানো তো, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে না, বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো, তুমি ঠিক সেই কাজই করছ।”

“কী বলছ সাগরদা?”

সাগর পারিজাতের দিকে তাকাল। মেয়েটির দু’চোখ ভরা মায়া, একটা আশ্চর্য ঘোরের মধ্যে থেকে কথা বলছে। পারিজাতের আচরণে নিজের প্রতি দুর্বলতা হয়তো কদাচিৎ বুঝতে পেরেছিল সাগর, কিন্তু এই মেয়ে যে চিঠি এনে হাজির করবে এতটাও ভাবেনি। ঘোর থেকে মেয়েটিকে বার করে আনা প্রয়োজন। সাগর শান্ত স্বরে বলল, “ঠিকই বলছি পারিজাত। আমি বহু দিন আগে মনে মনে তোমাদের এই শহরটা ছেড়ে চলে গেছি। সেখানে এইসব চিঠি লেখা, ন্যাকা ন্যাকা নরম কথা, এ সব আমায় টাচ করতে পারবে না পারিজাত। আমার এমন পার্টনার চাই, যে ঠিক আমারই মতো হবে। সেম অ্যাকাডেমিক, ফাইন্যানশিয়াল গোলস, আ হেভিলি প্রোডাক্টিভ লাইফ টুগেদার। এই জায়গায় যে হুল্লোড় করে জীবন কাটায়, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায় কোন এক ওল্ড এজ হোমে, তাও ফাইনাল পরীক্ষার পড়া জলাঞ্জলি দিয়ে... ইউ নো পারিজাত, ইটস নট এগজাক্টলি মাই টাইপ অব গার্ল। সোজা কথা সোজা বলে দেওয়াই ভাল, তাই না। নো আনডিউ এক্সপেকটেশনস, রাইট?”

পারিজাতের চোখ মুখ আঁধার হয়ে এসেছে। সে মাথা নিচু করল, সাগর বলল, “মুখ কালো করলে যে! আরে তোমারও ভাল হল, আমি এক জন কাঠখোঁটা মানুষ, রোজ আর যা-ই হোক তোমার জন্য গোলাপ ফুল নিয়ে আসতে পারব না। হা হা হা।”

পারিজাত বিষয়টা বুঝতে সময় নিল, তার পর হঠাৎ বলল, “আমি চলি সাগরদা।”

“আরে চলি মানে? দেখি দেখি কী লিখেছ দেখি। চিঠিটা দাও...” সাগরের স্বরে কৌতুক।

পারিজাত এক বাটকায় চিঠিটা তুলে নিল টেবিল থেকে, “দরকার নেই সাগরদা। আমরা ছোট মানুষরা যেমন বড় বড় কথা বুঝতে পারি না, তুমিও তেমনি আমাদের এই ছোট কথাগুলো বুঝতে পারবে না। চলি। হ্যাঁপি জার্নি। নতুন দেশে নিজের খেয়াল রেখো।”

সাগর বিব্রত মুখে বলল, “বাইরে অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে পারিজাত। একটু পরে বেরোও।”

“তুমি তো জানো সাগরদা, বৃষ্টিতে ভেজার অভ্যাস আছে আমার।”

পারিজাত এক মুহূর্তে বাড়ির বাইরে চলে এল। বাইরের ঝড়-বৃষ্টি গায়ে লাগতে যেন সামান্য স্বস্তি হল তার।

নিজের ঘরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পারিজাতের চলে যাওয়া দেখছিল সাগর। বৃষ্টি মাথায় বেরিয়ে গেল মেয়েটা! উম্মাদ নাকি! নাকি সাগরই একটু কঠিন কথা বলে ফেলেছে! হঠাৎ চমকে উঠল সাগর। সদর দরজার সামনে থেমে গেছে পারিজাত। ওড়নার ভাঁজ থেকে চিঠিটা বার করে খুব যত্নে একটা নৌকো বানাল সে। হাঁটু মুড়ে বসে অঝোরে বয়ে যাওয়া রাস্তার জলধারায় ভাসিয়ে দিল নৌকোটা। তার পর মোড় ঘুরে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল পারিজাত।

পারিজাত অদৃশ্য হলেও নৌকোর চলে যাওয়া দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সাগর। কী আশ্চর্য নির্লিপু চলে যাওয়া। চিঠিটা জানলও না যে, কেউ তাকে পড়বে না কোনও দিন। সাগরও জানবে না কী লেখা ছিল সেই চিঠিতে। প্রতি সেকেন্ডে সাগর আর চিঠি-নৌকোর দূরত্ব বাড়ছে। কোনও দিন আর তাদের দেখা হবে না।

বৃষ্টির বেগ হঠাৎ বেড়ে গেল। ঝাপসা হয়ে এল চার দিক। পারিজাতের

মতো তার নৌকোও মিলিয়ে গেল দূরে কোথাও।

সেই যে বৃষ্টি শুরু হল আর থামার নাম নেই। প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা কাটিয়ে রাতের দিকে বৃষ্টি একটু ধরল। তত ক্ষণে সাগরদের পাড়া বানভাসি। কোমর পর্যন্ত জল রাস্তাঘাটে, জনজীবন প্রায় স্তব্ধ। তাদের বাড়ি থেকে ভি আই পি রোড পর্যন্ত পথ জলমগ্ন। পায়ের হেঁটে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই, জলে বিষাক্ত সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে জোর গুজব রটে গেল। আর তা ছাড়া ঝড়ে কোথায় যে বিদ্যুতের তার পড়ে আছে, তাই বা জানে কে!

প্রভঞ্জন এয়ারপোর্টে ফোন করে জানলেন সাগরের লন্ডন যাওয়ার ফ্লাইট ঠিক সময়েই ছাড়বে। তাঁর এবং পরিবারের বাকি সবার কপালের ভাঁজ গভীর হল। পাড়ার কেল্টো, বিলু, লাটাই... নৌকো নিয়ে হাজির হল সঙ্কে নামতে না নামতে। যেমন তেমন নয়, কাঠের একটা আস্ত ডিঙি নৌকো। কেঁপুপূরের মেছোপট্টির কার কাছে নাকি পড়ে ছিল, সেটাকেই একটু সারিয়ে টারিয়ে নিয়েছে তারা।

ফলে সেই নৌকোই হয়ে গেছে আপাত ভাবে জনজীবন সচল রাখার একমাত্র মাধ্যম। বাজার হাট, অফিস কাছারি সব চলছে ওই নৌকোর ভরসাতেই। সাগর দেখল সেই নৌকোর ওপর দাঁড়িয়ে বাবা তাকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে, বাবার প্যান্ট হাঁটু অবধি গোটানো, “আয়, পাপান, উঠে আয়।”

সাগরের টাউস ব্যাগ হাতে-হাতে নৌকায় তুলে নিল বিলু আর লাটাই। বাবার হাত ধরে সাগর উঠে বসল নৌকোয়।

“হেঁইয়ো মারো হেঁইয়ো... চলো পানসি বেলঘরিয়া...” ইত্যাদি শ্লোগান দিতে দিতে মনের সুখে লগি ঠেলছে পাড়ার ছেলেরা। সাগর অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। এই ছেলের দিকে কোনও দিন ফিরে তাকায়নি গর্বিত সাগর, অথচ আশপাশে তারা বেড়ে উঠছিল, কোনও এক দারুণ দুর্যোগে সাগরের বিদেশ যাওয়ার কান্ডারি হয়ে উঠবে বলে। কিছু দূরে ভি আই পি রোড। নাগরিক যান চলাচলের কোলাহল ভেসে আসছে, কতখানিই বা পথ! তবু এ যেন সভ্যতার এ পার আর ও পার।

সাগর পিছন ফিরে তাকাল। বাড়ির দোতলার বারান্দায় তিনটে বিন্দুর মতো দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে তিন জন। বিদিশা, মা আর ঠাম্মি। সাগর হাত নাড়ল, হঠাৎ বৃকের ভিতর কঁপে উঠল তার। সাগরের মনে হল এই তার শেষ চলে যাওয়া। এই বাড়িতে, এই শহরে আর কোনও দিন ফেরা হবে না তার।

সাগরের নৌকো চোখের আড়াল হতেই মহাশ্বেতা শুনলেন তাঁর ফোন বাজছে। অচেনা নাম্বার। আবেগবিহীন দশা যতটা সম্ভব কাটিয়ে উঠল তুললেন তিনি। উল্টো দিকে অত্যন্ত আন্তরিক এক পুরুষকণ্ঠ, “ফোনের মহাশ্বেতা রুদ্রর সঙ্গে এক বার কথা বলতে পারি? আমি নৈহাটি থেকে শুভপ্রসন্ন মজুমদার কথা বলছি।”

১১ ১১

অয়ন দূর থেকে হেঁটে আসছে। তার পরনে ঘন নীল জিনস আর সাদা শার্ট। শার্টের হাতা কনুই পর্যন্ত গোটানো। বেশ কয়েক দিন মেঘ-বৃষ্টি নিয়ে কাটার পর আজ ঝলমলে রোদ উঠেছে শহরে। বিদিশা খুব মন দিয়ে অয়নকে দেখছিল। আশ্চর্য! লোকটা যে কত হাজার রকমের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, কত অনাবশ্যক ভয়ভীতি লালন করে নিজের ভিতর, সেটা তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই। তার হাঁটাচলা রীতিমতো সপ্রতিভ, কথা বলায়ও এমনভাবে কোনও জড়তা নেই, কিন্তু দরকারের সময় তার মুখে কথা জোগায় না।

সেই আশ্চর্য সুন্দর সঙ্কেটায় যখন বিদিশা অয়নের হাতে হাত রেখেছিল, সেই মুহূর্ত থেকে অবশ্য অয়নের জীবন পালটে গেছে।

বিদিশাকে প্রথম দেখার পর থেকে শয়নে-স্বপনে সারাক্ষণই বিদিশা ঘিরে থাকত তাকে। সেই মেয়ে যে নিজেই অয়নকে মনে মনে এতটা চাইতে শুরু করেছে, এই সত্য বুঝে উঠতে সে বেশ কিছু দিন

কাটিয়ে দিয়েছিল।

যে কোনও সত্যি, তার অভিঘাত যতই গভীর হোক না কেন, এক সময় কাটিয়ে ওঠে মানুষ। অয়নের ঘোর এখনও কাটেনি। মানুষ হিসেবে অয়ন শুধু কিছুটা বদলে গেছে। ইদানীং তার উদাস ভাব গায়েব। টিউটোরিয়ালের ছাত্রছাত্রীদের কাছে আজকাল এক ঝকঝকে চেহারার যুবক ক্লাস নিতে হাজির হয়। ছেলেমেয়েরা ক্লাস করবে কী, স্যরের ভোলবদলে তারা হাঁ হয়ে থাকে। অয়ন এর আগে কখনও আয়নার সামনে এত বেশি সময় কাটায়নি। নিজেকে কেমন দেখতে লাগছে এই চিন্তাও সে এর আগে কখনও করেনি। আজকাল নিজের খুব খেয়াল রাখছে।

কোনও যুবকের মনে ভাবের উদয় হলে সবার আগে তার নাপিত সেই খবর পায়।

সেদিন চুল কাটাতে বসে অয়ন বলল, “পদা ভাই, নতুন কিছু ট্রাই করলে হয় না?”

পদার এর বেশি উৎসাহের দরকার পড়েনি, সে হালফ্যাশানের চুল কেটে দিয়েছিল ঠিক পনেরো মিনিটে। তার পর নিজের হাতের কাজে নিজেই মুগ্ধ হয়ে পদা বলেছিল, “কী মাস্টারমশাই! কেমন দেখছেন?”

পদা ভুল বলেনি, সেই চুলের ছাঁটে প্রথমটায় নিজেই নিজেকে চিনতে পারেনি অয়ন। শুধু কি তাই? এক দিন এরই মধ্যে লজ্জার মাথা খেয়ে অয়ন জীবনে প্রথম বার ফেসিয়াল পর্যন্ত করিয়ে ফেলেছে। আয়নার নিজের মুখ দেখতে দেখতে অয়ন বলেছিল, “তোর তো রমরমা রে পদা। চুল কাটার পাশাপাশি আবার ফেসিয়াল টেসিয়াল শুরু করেছিস!”

পদা বলেছিল, “সবই হাতের কাজ আর মানুষের ভালবাসা মাস্টারমশাই, না হলে আমি সামান্য মানুষ...”

অয়ন কিঞ্চিৎ আগ্রহ দেখাল, “ধর, আমি যদি ফেসিয়াল করাই, কী রকম চার্জ করবি?”

আগ্রহের গন্ধ পেয়ে পদা বলল, “ভ্যারাইটি আছে। চারশো টাকায় ইন্ডিয়ান ক্রিম ফেসিয়াল, আটশো টাকায় ফরেন প্রোডাক্টের ফেসিয়াল আর পনেরোশোয় যেটা হয়, সে আর কী বলব মাস্টারমশাই, নিজের মুখে বলতেও কেমন লাগে, ক্লায়েন্টরা বলে ওটা ফেসিয়াল নয়, প্লাস্টিক সার্জারি। সেলুন থেকে ফিরলে বাড়ির লোক পর্যন্ত চিনতে পারে না। অটোগ্রাফের খাতা এগিয়ে দেয়, সেলফি তোলে, ভাবে সিরিয়ালের অ্যাক্টর-ফ্যাক্টর কেউ এসে গেছে।”

এই কথা বলে মাথা নিচু করে লাজুক হাসে পদা। অয়ন আঁতকে উঠে বলে, “না না, অত সব দরকার নেই, ওই চারশো টাকারটাই এ বার করে দেখি, ফার্স্ট টাইম তো...”

অয়ন ফেসিয়াল করেছে। তার ভোলবদল দেখে চমকে গেছে বিদিশা নিজেও। মনে মনে হেসেছে সে। এই ছেলেটা জানে না সেই কবে থেকে একে দেখে বিদিশার বুকের ভিতর ধামসা মাদল বেজে উঠত। খুব বেশি কী-ই বা চাওয়ার আছে তার জীবনে? সে সামান্য এক মেয়ে। সে শুধু চেয়েছিল এক জন আদ্যন্ত ভাল মানুষকে। অয়নের মতো স্বচ্ছতা সে আর কারও চোখে দেখেনি কখনও। এর সঙ্গে যদি বিদিশা সারাজীবন কাটাতে চায়, খুব বেশি কিছু চাওয়া হবে কি সেটা? সে মনে মনে বলেছে, ‘আমার কিছুটা চাইনা, তুমি শুধু পাল্টে যোনা না। যেমন আছ, তেমন থাকো। চুলের ছাঁট পাল্টাক ক্ষতি নেই, ভিতরের মানুষটা যেন জীবনভর এমনই থাকে।’

সমস্যা হচ্ছে সেখানেই। অয়নের এত পরিবর্তনের পরেও ভিতরে ভিতরে সে একই রকম থেকে গেছে। তার আর বিদিশার স্বপ্ন দিনের সম্পর্ক বেশ গভীর হয়ে উঠেছে, তবুও মহাশ্বেতার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার সাহস জুটিয়ে উঠতে পারেনি অয়ন।

এ দিকে মহাশ্বেতা হাত গুটিয়ে বসে নেই, তিনি বিদিশার জন্য সম্বন্ধে দেখতে উঠে-পড়ে লেগেছেন। ফি-দিন ডিনার টেবিলে একটা না একটা নতুন ছেলের প্রোফাইল খুলে বসছেন মহাশ্বেতা। এই ব্যাপারে জোনাকি তাঁর ডেপুটি, সে জানে বড়মার মোবাইলের কোন ফোল্ডারে, কোন পাত্রের ছবি সেভ করা আছে। মহাশ্বেতা বলেন, “জোনাকি, ওই যোধপুর পার্কের ছেলেটার ছবি দেখা সবাইকে।”

জোনাকি পাঁচ সেকেন্ডে ছবি দেখিয়ে দেয়।

কোনও দিন হয়তো মহাশ্বেতা বললেন, “জোনাকি, সল্টলেকের ছেলেটার ছবি দেখা ওদের।”

জোনাকি জিজ্ঞেস করে, “কোনটা বড়মা, রেলেরটা? নাকি টাটা স্টিল?”

সেই সব পাত্রের ছবি খুবই মন দিয়ে দেখেন প্রভঞ্জন আর মঞ্জুষা। কোনও কোনও প্রোফাইল দেখে রীতিমতো আশ্বত হয়ে পড়েন মঞ্জুষা, প্রভঞ্জন হ্যাঁ-হ্যাঁ ছাড়া বিশেষ কথা বলেন না।

মহাশ্বেতা বলেন, “বাবলু, চুপচাপ কেন? মেয়ের বিয়ের বয়স হল, এ বার তো একটু দায়িত্ব নিতে হবে।”

প্রভঞ্জন বলেন, “এত তাড়া কিসের? সব তো মাস্টার্স দিচ্ছে।”

মহাশ্বেতা বলেন, “তা বললে তো হবে না বাবলু। বিয়ের কথাবার্তা এখন থেকে শুরু না করলে পরে হাবুডুবু খেতে হবে। তোমার বেলায় মেয়ে খুঁজতে খুঁজতে আড়াই বছর লেগে গেছিল, ভুলে গেলে!”

বিদিশা এ সবার মধ্যেই নিঃশব্দে নিজের খাওয়া সেরে উঠে যায়।

এক দিন বিদিশা ক্লাসের সময় অয়নকে ধরল, “স্যর, এরা তো বিয়ে নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছে। এ বার তো লোকজন বাড়িতে মেয়ে দেখতে চলে আসবে। আপনি ঠান্মির সঙ্গে কথা বলুন প্লিজ।”

অয়ন খতমত খেয়ে গেল, “কিন্তু বিদিশা, আমি ম্যাডামকে কী বলব? এখনও চাকরি হল না একটা...”

“তাতে কিছুই যায় আসে না। চাকরি আজ নয় কাল ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু কনফিডেন্সটা আসল। আজকাল যোলো বছরের ছেলেরা নিজের গার্লফ্রেন্ডকে বৌ বলে ডাকে, জানেন! সোজা যাবেন, গিয়ে ঠান্মিকে আমাদের ব্যাপারটা জানিয়ে দেবেন স্যার।”

এটা দু’জনের অলিখিত চুক্তি। ক্লাসের সময় অয়নকে ‘স্যর’ বলে ডাকবে বিদিশা, অন্য নামে ডাকা যেতেই পারে, তবে সেটা বাইরে দেখা হলে। বিদিশা তবু কুণ্ঠায় আছে কিছুটা, সে এখনও স্যরকে নাম ধরে ডাকতে পারেনি।

বিদিশার কথা শুনে অয়ন আমতা আমতা করে বলল, “সে হবে খন, আপাতত না হয় হেকম্যান’স সিলেকশন মডেলটা একটু ক্লিয়ার করে নেওয়া যাক।”

বিদিশা শব্দ করে বই বন্ধ করে, খানিক তীব্র স্বরে বলে, “হেকম্যান কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না স্যর, আর একটুও পড়া নয়। প্লিজ যান, ঠান্মির সঙ্গে কথা বলে আসুন। আপনি জানেন না, বাড়িতে রোজ রোজ সম্বন্ধ দেখা চলছে, দুটো ছেলে যে কোনও দিন আমাদের দেখতে হাজির হবে... এ সব ভাল লাগে আপনার?”

বিদিশার এই রূপ অয়ন আগে দেখেনি, বিদিশা খুবই মৃদুভাষী মেয়ে, এই বাড়িতে কারও উপরেই ধমকধামক করার ক্ষমতা তার ছিল না, অয়ন এসে সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে। শাসন করার একটা লোক জুটেছে বিদিশার।

ধমক খেয়ে অয়ন কাঁপতে কাঁপতে মহাশ্বেতার ঘরে যায়। মহাশ্বেতা হাসিমুখে বলেন, “আসুন মাস্টারমশাই। কী ব্যাপার বলুন?”

“না না, ব্যাপার আবার কী? এই তো আপনাকে দেখতে এলাম একটু। সব ভাল তো?”

“আর ভাল কী এই বয়সে। ছেলেটাও চলে গেল। একটা মানুষ অন্য দেশে চলে গেলে যে কী ভয়াবহ শূন্যতা তৈরি হয়...”

অয়ন বলে, “সাগরদা আছেন কেমন ও দেশে?”

“সে আছে তার মতো। পুরোদমে ডিউটি শুরু হয়েছে। মাথা তোলার সময় নেই।”

“বাহ বাহ, ভাল ভাল।”

কিছু ক্ষণ সব চুপচাপ, তার পর মহাশ্বেতা বলেন, “আপনার তা হলে কিছুই বলার নেই মাস্টারমশাই? শুধুই কেমন আছি জানতে এলেন?”

অয়ন আমতা আমতা করতে থাকে, মহাশ্বেতা তখন নিজেই কপট অনুযোগের সূরে বলেন, “আচ্ছা, কত দিন হয়ে গেল আপনি আপনার ছাত্রীর জন্য একটা ভাল পাত্র খুঁজতে পারলেন না মাস্টারমশাই? বুড়ি

মানুষের কথা বলে কি নেগলেস্ট করলেন?”

অপ্রস্তুত অয়ন বলে বসে, “এ কী বলছেন ম্যাডাম! খোঁজ করছি তো। আমার বাবার বিজ্ঞানস লাইনের লোক। শুভাশিস পাল। তাঁর ছেলে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড-এ চাকরি করে। বাবার বিরাট ব্যবসা। সানি পার্কে তিনতলা বাড়ি। তার জন্যই তো মেয়ে খোঁজা হচ্ছে।”

মহাশ্বেতা আগ্রহী স্বরে বলেন, “বেশ তো! আপনি আমার কথা বলুন ঠিক। তার পর না হয় ফোনে কথা বলে নেওয়া যাবে, কেমন?”

অয়ন ঘাড় নেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। এসেই থমকে যায়, দরজার বাইরে কোমরে হাত দিয়ে বিদিশা দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখচোখে রাগ ছাপিয়ে ফুটে উঠছে বিস্ময়। এ কেমন লোক? নিজের প্রেমিকার জন্য কেউ পাত্র খুঁজে আনে!

অয়ন সে দিন পালিয়ে বেঁচেছিল, কিন্তু আজ আবার তাকে বিদিশার সামনে আসতে হয়েছে। সে দিনের ঘটনার পর বিদিশা নীরব ছিল। বেশি বামেলা করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। তবে তার থমথমে ভাব দেখে অয়ন ভেবেছিল আগামী দিনে সে চাপে পড়তে চলেছে।

বিদিশার সামনে আসতেই অবশ্য তার ভয় দূর হয়ে গেছে। ভয়ের জায়গা নিয়েছে মুগ্ধতা। বিদিশা পরে আছে লালপাড় সাদা শাড়ি। কী অপূর্ব যে তাকে দেখাচ্ছে!

অয়ন কিছু ক্ষণ কোনও কথা বলতে পারল না।

বিদিশা চোঁট চেপে লাজুক হাসল, “শাড়ি পরেছি বলে তাকিয়ে আছেন, অয়নদা? আজ একটা স্পেশ্যাল দিন, তাই ভাললাম... ঠান্ডির শাড়ি, সুন্দর না?”

অয়ন মোহাবিষ্ট স্বরে বলল, “তোমাকে আশ্চর্য সুন্দর লাগছে বিদিশা।”

বিদিশার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল না, তবে সে মাথা নিচু করল, সম্ভবত সে লজ্জা পেয়েছে। লজ্জা পাওয়া মেয়ে জানতে পারে না তার সেই লজ্জা কী প্রবল সুনামি হয়ে আছড়ে পড়ে পুরুষের বুকে। অয়নও হয়তো এ ভাবেই মোহিত হয়ে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকত আজীবন।

বিদিশা বলল, “চলুন। এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি? অনেক কাজ আছে। সময় নিয়ে এসেছেন তো? আজ কিন্তু সহজে ছাড়ব না।”

দু’জনে অটোয় উঠেছে। আলোময় শহরের পথ বেয়ে চলেছে ত্রি-চক্রযান। বিদিশার চুল উড়ে আসছে অয়নের চোখেমুখে, সে বসেছে বিদিশার একদম গা ঘেঁষে। অয়ন বুঝল তার এই মুহূর্তটাকে খুব ভাল লাগছে।

অটো থেকে নেমে স্টেশনের পথে হাঁটতে শুরু করল বিদিশা। অয়ন বলল, “আজ কী স্পেশ্যাল ডে সেটা তো বললে না?”

বিদিশা নরম করে হাসল, বলল, “দেখতেই পাবেন, এত তাড়া কিসের?”

অয়ন সহজ ভাবে বলল, “আমরা মেট্রো ধরে কোথায় যাচ্ছি সেটা তো বলো।”

বিদিশা চুল ঝাঁকিয়ে বলল, “এ মা! খামোখা মেট্রোয় উঠতে যাব কেন? আমরা ট্রেনে করে যাব।”

ট্রেনে চেপে ঠিক তিনটে স্টেশন। ট্রেনের কামরা দুপুরের আলোয় ভরে রইল, অয়নের ভাল লাগা প্রতি মুহূর্তে বেড়েই চলেছে। এই মেয়ের সঙ্গে তার পিছু পিছু কোনও প্রশ্ন না জিজ্ঞেস করে অনায়াসে কোথাও যাচ্ছে সে। সময়ের হিসেব নেই, গন্তব্যে পৌঁছানোর তাড়া নেই। অয়নের মনে হচ্ছে তিনটে স্টেশন কেন, এই মেয়ের পাশে বসে সে অন্তহীন নিরুদ্দেশের যাত্রায় যেতে পারে। অলস পায়ে নেমে যেতে পারে পৃথিবীর শেষতম স্টেশনে।

স্টেশনে নেমে অবশ্য অয়ন নিশ্চিত হল। সে বুঝেছে আজ বিদিশা তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চলেছে। ভালও লাগল। অনেক দিন কোনও মন্দিরে আসা হয়নি তার।

বিদিশা এরই মধ্যে একটা দোকান থেকে পূজোর ডালি কিনে এনেছে। অয়ন হেসে বলল, “এত বড় ডালি কিনলে বিদিশা!”

“বললাম না, স্পেশ্যাল দিন। যেমন তেমন করে পূজো দিলে হয় নাকি আজকের দিনে?”

অয়ন হেসে ফেলল, “এ বার কিন্তু সাসপেন্সের বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে বিদিশা! কিসের স্পেশ্যাল ডে সেটা তো বলবে?”

বিদিশা দুষ্ট হাসি হেসে বলল, “বাড়াবাড়ির আর দেখেছেন কী সার? চলুন, বলছি।”

ঠাঠা রোদ্দুরে মন্দিরের সংলগ্ন চাতাল প্রায় শূন্যশান। পা রাখা যাচ্ছে না এত গরম। বিদিশা তারই মধ্যে স্থির ভাবে হেঁটে গিয়ে মন্দিরের সিঁড়ির ঠিক আগে এসে অয়নের হাত ধরল, তার পর গাঢ় স্বরে বলল, “আমাকে সত্যি ভালবাসেন তো অয়নদা?”

অয়ন বিস্মিত ভাবে বলল, “সত্যি ভালবাসি বিদিশা, তুমি জানো না?”

“আমার ব্যাপারে সিরিয়াস তো?”

“অবশ্যই সিরিয়াস। কী হৈয়ালি করছ? এ বার বলো তো কিসের স্পেশ্যাল ডে আজ?”

“আমার ভয় হচ্ছে সেটা বললে আপনি এখনই ছুটে এখান থেকে পালিয়ে যাবেন। তা অবশ্য যেতে চাইলে যেতেই পারেন। সে ক্ষেত্রে আপনাকে আর বিরক্ত করব না,” বিদিশা অয়নের হাত ছেড়ে দিল, তার পর খুব শান্ত স্বরে বলল, “আজ আপনার বিয়ে, স্যার।”

অয়নের প্রথমে মনে হল সে ভুল শুনেছে, তার পর ব্যাপার বুঝে তার মাথা বনবন করে ঘুরতে লাগল, আবার অজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি? কিন্তু অচিরেই অয়ন বুঝল অদ্ভুত ভাললাগায় পুরোপুরি ডুবে যাচ্ছে সে।

যে মেয়ের কথা ভেবে সে রাতের পর রাত ঘুমোতে পারেনি, যে মেয়েকে এক বার চোখের দেখা দেখার জন্য শনি আর বুধ বারের অপেক্ষায় দিন কাটাত, সেই মেয়ে মনে মনে এত করে চেয়েছে তাকে? কী গোপনে, অথচ কত দৃঢ় বিশ্বাসে অয়নকে কাছে টেনে নিতে পেরেছে।

অয়ন মৃদু হেসে বিদিশার হাত ধরল, “চলো।”

বিদিশা পূজোর ডালা পুরোহিতের হাতে দিয়ে নিচু স্বরে তাঁকে কিছু বলল। তিনি সেকেন্ড খানেক অয়নের দিকে তাকিয়ে ডালা নিয়ে মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে নিয়ে এলেন। দু’জনকে কাছে ডেকে পূজারি মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, দু’জনকেও কিছু মন্ত্র বলতে হল। তার পর তিনি জানতে চাইলেন, “মালা কোথায়? মালা আনিসনি মা?”

বিদিশা আর অয়ন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, অয়ন বলল, “আমি কি গিয়ে নিয়ে আসব?”

পূজারি হাত তুলে বারণ করলেন, তার পর পূজোর ডালা থেকে সিঁদুর এগিয়ে দিলেন অয়নের দিকে। অয়ন মুগ্ধ চোখে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে রইল বিদিশার দিকে, তার পর সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দিল বিদিশার সিঁথিতে।

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল বিদিশার, সে চোখ বন্ধ করল।

বিদিশা ফিসফিস করে বলল, “একটা প্রণাম করব?”

অয়ন বলল, “নাটকীয় হয়ে যাবে না ব্যাপারটা?”

বিদিশা ফিক করে হেসে ফেলল, “পাবলিকলি সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে আবার বলছেন নাটকীয় হয়ে যাবে! নাটকীয় হতে কি বাকি আছে কিছু!”

টুপ করে অয়নকে প্রণাম করেই ফেলল বিদিশা।

বিদিশা মুঠো করে কিছু টাকা পূজারিকে দিতে গেল, “এটা আপনি রাখুন ঠাকুরমশাই।”

পূজারি নরম চোখে তাকালেন বিদিশার দিকে। রাজ হাজারে হাজারে মেয়ে আসে এই মন্দিরে, কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে এই মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েই আশ্চর্য মায়া জমেছে তাঁর মনে, তিনি টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বিদিশার মাথায় হাত রাখলেন, “সুখী হও মা। সুখী হও। মা কালী তোমাদের সহায় হোন।”

পৃথিবীটা এক লহমায় যেন কতটা পাল্টে গেল। দু’জন পায়ে পায়ে গঙ্গার ঘাটে এসে বসল। বসেই রইল দীর্ঘ ক্ষণ। চিরচেনা চার পাশ, তবু যেন আজ সব কিছু নতুন লাগছে। গঙ্গায় ভেসে যাওয়া ভটভটির মোটরের শব্দ কবে এত মোহময় ছিল? আকাশের নীলে এমন মেঘেদের ঝড়লগ্নের সাজ ওরা কি আগে কখনও দেখেছে! গঙ্গার ঘাটে এক বুড়ো ভিক্ষুক বাঁশি বাজাচ্ছে। বাঁশির সেই সুর কঁপে কঁপে ঘুরপাক খাচ্ছে ওদের ঘিরে। আজ পৃথিবীতে দুঃখের প্রবেশ নিষেধ, আজ পৃথিবীময়

শুধুই সুখের দিন।

ফেরার পথে অ্যাপ ক্যাব নিল ওরা। পিছনের সিটে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসল দু'জনে। দু'জনেই চাইছে আজকের দিন যেন আর না ফুরোয়, তবু পথঘাট আজ আশ্চর্য রকম শুনশান। অল্প সময়েই তাদের পাড়ার কাছাকাছি এসে পড়ল ক্যাব।

বিদিশা হাতের মুঠোয় অয়নের হাত ধরে বলল, “আর কোনও দিন আমার জন্য সম্বন্ধ আনবে না, ঠিক আছে? আর এ বার তো ঠান্মির সঙ্গে গিয়ে কথাটা বলে ফেলো। বেচারি বুড়িমানুষ হন্যে হয়ে নাতজামাই খুঁজছে। নাকি, এখনও ভয় পাবে তুমি? এই আজকের দিনের পরেও?”

সিঁদুর পরার পরমুহুর্তেই বিদিশার মধ্যে খানিক পরিবর্তন এসেছে। কিছুটা সিঁদুর সিঁথি উপচে তার নাকের ডগায় এসে পড়েছে। সেই সিঁদুর বিদিশা মোছেনি। তাকে অনেকটাই অন্য রকম দেখাচ্ছে।

বিদিশা জানে এ ভাবে সিঁদুর পরে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। বাড়িতে পৌঁছানোর আগেই কপাল, মাথা ভাল করে সাফসুতরো করে ফেলতে হবে। তবে সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, আজকের সুন্দর দিনের এই চিহ্ন পুরোপুরি মুছে ফেলবে না। তার মাথাভরা ঘন চুলের আড়ালে, সিঁথির কোনও এক প্রান্তে, এক চিলতে রক্তিমতা গোপনে রেখে দেবে বিদিশা।

একটু পরে তারা আলাদা হয়ে যাবে। দুই বাড়িতে আলাদা আলাদা করে দিন কাটাবে অপরিচিতের মতো। অথচ এই শহর জানে, এই আলো বালমল দুপুরে তারা দু'জন নিজেদের মতো করে দু'জনের হয়ে গেছে।

অয়ন বিদিশাকে কাছে টানল। বিদিশা ড্রাইভারকে বলল, “দাদা, একটু ঘুরিয়ে নিয়ে চলুন, এই ধরুন মিনিট দশ পনেরো।”

“ডেস্টিনেশন সেট করা আছে দিদিভাই।”

“লংগেস্ট পসিবল রুট দিয়ে চলুন। ভাড়া নিয়ে তো চিন্তা নেই।”

বিদিশা অয়নের বুকে মাথা রাখল। অয়নের বুক থেকে গভীর এবং বলিষ্ঠ ধুকপুক শব্দ আসছে। যত ক্ষণ না বাড়ি পৌঁছবে, তত ক্ষণ এই শব্দটুকু প্রাণ ভরে শুনতে চাইছে বিদিশা।

॥ ১০ ॥

“মনে বহুত চিন্তা আছে রে।”

“আরে পাগল, তুমি কেন চিন্তা করছ? চিন্তা তো করবে এই সোনার তরী-র লোকগুলো।”

“জানি, চিন্তা করে আর কী-ই বা করতে পারব? মামুলি ইনসান। ফির ভি, চিন্তা তো হয়। এত দিন এই বাড়ির নমক খেয়েছি।”

“শুধু কি তাই! এই বাড়ির লোকগুলো খুব ভাল রে। যেন অন্য কোনও দুনিয়া থেকে এসেছে সব। একটু মাথার গড়বড় আছে মনে হয় সবায়, কিন্তু লোক ভাল।”

“এই মাথার গড়বড় না থাকলে কেউ কি অজানা, অচেনা মেয়েলোককে ঘরে আশ্রয় দেয় রে! তোর জন্য এরা কী না করেছে। বেঁচে থাক এই মাথার গড়বড়, দুনিয়ার সব লোকের মাথায় এমন গড়বড় হোক।”

“এরা যদি আমার নামে কাগজে ইশতেহার না দিত, তো তুমি আমায় আর খুঁজে পেতে না, তাই না?”

“পেতাম নাই তো। পুরা শহর খুঁজেছি তোকে, কোথাও পাইনি। তার পর এখানে এসে...”

“তুমি পুরা বাঙ্গালি হয়ে গেছ তাই না? লিট্টি চোখা, সমস্তিপুরের চোক, চৌবারা, পিপলের ছাও...সব ভুলে গেছ?”

“হা হা... কম দিন তো হল না। এখন তিনবেলা চাওল খাই জানিস? এই মন্দির, এই মকান, এই লোকগুলোই আমার জিন্দগি। লেকিন, এদের কী হবে এখন? তুই তো সব দেখতে পাস, বল না?”

“না গো। আমি যা দেখি সব ধুন্ধ-এর মতো, বেশি দূর দেখা যায় না। সফট আসছে জানি, কী সফট দিখাই দেয় না।”

“এই সফট মিটবে কী করে?”

“আমি জানি না। দেবী মায়ের কাছে প্রার্থনা করো। দুনিয়া আজব

জায়গা, যার সফট তাকেই দূর করতে হয়, আমরা শুধু দূর থেকে দেখতে পারি, ব্যসা!”

কথোপকথন এখানেই থেমে গেল। এর পরে মুঙ্গেরিলাল বেশ কয়েক বার ডেকেও অহল্যার সাড়া পেল না। এমনটাই হয়ে আসছে আজ বেশ কয়েক বছর ধরে। সঙ্গে নামার ঠিক আগে মাঝে মাঝেই এক অজানা আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে মুঙ্গেরিলাল। কুহক টানে সে ছুটে আসে এই বাড়ির পিছনের বাগানে। একটু পরে তার পুরু কাচের চশমা দিয়ে মুঙ্গেরিলাল দেখতে পায় দোতলার বারান্দার জমাট আঁধার একটু একটু করে ফিকে হয়ে আসছে।

এর পর অহল্যা আসে। বেশি ক্ষণ থাকে না। মুঙ্গেরিলালের সঙ্গে ছোটখাটো সুখ দুঃখের কিছু কথা হয়। কথা অবশ্য মুঙ্গেরিলালই বলে বেশি, আর এক সময় অহল্যা চলে যায়। মুঙ্গেরিলাল তখন ধীর পায়ে আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে যায়।

আজ বাড়ির পিছনের ফাঁকা জমি থেকে ফিরে এসে মুঙ্গেরিলাল থতমত খেয়ে গেল। মন্দিরে ভিড়টা একটু বেশিই আজ। সেই ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছে জোনাকি।

মুঙ্গেরিলাল তার কাছে যেতেই জোনাকি ঝাঁঝিয়ে উঠল, “কোথায় ছিলে তুমি? আবার ওই বাড়ির পিছনের বাগানে গেছিলে? এ দিকে মন্দিরে লোক জমা হয়ে গেছে।”

“আরে বেটি, একটু খুম-ফিরকে আসলম। গুসসা কেন করিস?”

জোনাকি নিজেই সামলে নিল, “না গো মুঙ্গেরিচাচা, আসলে আজকাল খুব ভয় করে। এ রকম সোনার প্রতিমা এমনি এমনি রয়েছে। দুনিয়াটা তো বাজে লোকে ভরে গেছে, তাই না!”

মুঙ্গেরিলাল ভাল করে তাকাল জোনাকির দিকে। মেয়েটার পরিবর্তন গত কয়েক মাসে চোখে পড়ার মতো। কথায় কথায় হা হা হি হি অনেক কমিয়ে দিয়েছে। একটু চুপচাপই থাকে আজকাল। তার থেকেও বড় কথা চোখে-মুখে সব সময় ভয়ের ছাপ। যেন এখনই খারাপ কিছু ঘটবে।

মুঙ্গেরিলাল বলল, “জোনাকি, এত দিনের পুরানা মন্দির। এত দিনে যখন কিছু হয়নি, এখন আর কী হোবে?”

জোনাকি মাথা নিচু করল, “না, চিন্তা তো হয়। তোমার কাঁধে বন্দুক, সেটা দেখলে একটু শান্তি।”

মুঙ্গেরিলাল ফোকলা দাঁতে হেসে উঠল, “তোর মনে হচ্ছে বচপন ফিরে আসছে। চিন্তা করিস না জোনাকি। তোর মুঙ্গেরিচাচা জান থাকতে এই মন্দিরের নুকসান হতে দিবে না।”

মেঘ সরিয়ে সামান্য আলো ছড়িয়ে পড়ে জোনাকির মুখে, সে বলে, “জানি তো। মুঙ্গেরিচাচা আমাদের মস্ত বীরপুরুষ।”

দু'জনেই এক সঙ্গে হেসে উঠল। জোনাকির মনের সংশয় গেল না, কারণ সে নিজেও জানে, তার বলা কথা পুরোপুরি সত্যি নয়। মুঙ্গেরিলালের বয়স হয়েছে, হাঁটু কোমরে বাতের বাথা, তালপাতার সেপাইয়ের মতো লিকপিকে শরীর। কেউ যদি সত্যি সত্যি মন্দিরে আক্রমণ করে তবে সে এই বন্দুক চালাতে পারবে তো? চালানো তো দূরের কথা, জোনাকির মনে হয় মুঙ্গেরিচাচা এই বন্দুক ঠিকঠাক তাক পর্যন্ত করতে পারবে না।

জোনাকি বলল, “যাই গো মুঙ্গেরিচাচা। অনেক কাজ পড়ে আছে।”

মুঙ্গেরিলাল চিন্তিত মুখে বলল, “বিকেল থেকে দুটো লোক বাড়ির ভিতরে ঢুকে বসে আছে। কারা, চিনিস?”

জোনাকির কপালেও চিন্তার ভাঁজ। সে সত্যিই জানে না লোকগুলো কারা। ইয়া বড় গাড়ি নিয়ে দুটো লোক এল ঘন্টাখানেক আগে। বড়মা নিজে এগিয়ে এসে তাদের বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন।

মুঙ্গেরিচাচাকে উত্তর কী দেবে, জোনাকি এ রকম অপরিচিত লোককে এ বাড়িতে শেষ কবে আসতে দেখেছিল, নিজেই মনে করতে পারল না।

শুভপ্রসন্ন মজুমদার মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন মহাশ্বেতার দিকে। লোকে বলে যৌবন জীবনের সেরা সময়, সেই সময়েই মানুষ নাকি

সবচেয়ে সুন্দর হয়। কিন্তু এই অশীতিপর বৃদ্ধাকে দেখে শুভপ্রসন্নর মনে হচ্ছে, বয়স যত বাড়়ে, তত মানুষ আরও সুন্দর হতে থাকে। বেশ কিছু ক্ষণ এই ঘরে এসেছেন শুভপ্রসন্ন। এসেই তিনি মহাশ্বেতার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন। শেষ কবে কাউকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছেন, তা শুভপ্রসন্নর নিজেরও মনে নেই।

মহাশ্বেতা আঁতকে ওঠেননি, তিনি সেই প্রণাম গ্রহণ করেছেন, কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে বলেছেন, “আপনার মঙ্গল হোক।”

কথাবার্তা তেমন এগোয়নি, মামুলি কুশল বিনিময়। কিন্তু এরই মধ্যে এই বাড়ির পরিবেশ ভাল লেগে গেছে শুভপ্রসন্নর।

শুভপ্রসন্নর পাশে যে ভদ্রলোক বসে আছেন, তাঁকে অবশ্য বিশেষ আশ্রুত মনে হচ্ছে না। শুভপ্রসন্নর গদগদ ভাব তার বিরক্তি আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে মহাশ্বেতার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় শুভপ্রসন্ন বলেছেন, “ইনি আমার বাল্যবন্ধু অরুণ মহান্তি। চাইল্ডহুড ফ্রেন্ড। এখন ইনি হাইকোর্টের মস্ত বড় আইনজীবী, অ্যাডভোকেট। তবে সেই পরিচয়ে আজ ইনি এখানে আসেননি, ইনি এসেছেন শুধুমাত্র আমাকে সঙ্গ দিতে। তাই এর পরিচয় শুনে ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু হয়নি। হা হা।”

মহাশ্বেতা অরুণ মহান্তিকে দেখে ঘাবড়ে যাননি। বিস্মিত হয়েছেন। বিস্মিত হওয়ার কারণ অরুণ মহান্তি নন, বিস্মিত হওয়ার কারণ স্বয়ং শুভপ্রসন্ন। তিনি মহাশ্বেতাকে চিঠি লিখেছিলেন সাধু ভাষায়, কিন্তু এখন মহাশ্বেতা দেখছেন ভদ্রলোক ইংরেজি শব্দ ছাড়া একটি সম্পূর্ণ বাক্যও বলতে পারছেন না।

মহাশ্বেতার হাতে বেশ কিছু কাগজ আর ফোটোগ্রাফ। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, পুরনো ফোটো। সেই ফোটোতে নৈহাটির মজুমদার বাড়ির গৃহদেবীকে দেখা যাচ্ছে। মহাশ্বেতা ছবি খুঁটিয়ে দেখেছেন। এই ছবি যে তাঁদের মন্দিরের দেবীমূর্তির, তাতে আর সন্দেহ নেই তাঁর।

একটু আগে মহাশ্বেতা এই বাড়িতে দেবীমূর্তির আগমনের সম্পূর্ণ ইতিহাস তাঁর সামনে বসা দুই ভদ্রলোককে শুনিয়েছেন। ধেমে ধেমে, সময় নিয়ে নিয়ে কথা বলেছেন। চেষ্টা করেছেন সামান্য খুঁটিনাটিও যেন বাদ না পড়ে যায়। অহল্যার আগমন, মূর্তি স্থাপন, তার মৃত্যু, কাগজে বিজ্ঞাপন, মন্দির প্রতিষ্ঠা এক একটি বিষয় ধরে ধরে বলেছেন। কথা শেষ করার আগে বলেছেন, “গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে এই মন্দির আমরা একটি ট্রাস্টের আশ্বরে দিয়ে দিয়েছি। ট্রাস্টের নাম রাখা হয়েছে ‘অহল্যা মেমোরিয়াল ট্রাস্ট’। এই মন্দিরে আসা দান বা প্রণামীর একটি কানাকড়িও ‘সোনার তরী’ বাড়ির কোনও সদস্য নিজেদের বা পরিবারের প্রয়োজনে খরচা করেনি।”

এই কথা শুনে শুভপ্রসন্ন হাঁ হাঁ করে উঠেছেন, “আরে, এ আপনি কী বলছেন ম্যাডাম! আপনাদের পরিবারের যা নাম যশ খ্যাতি... আপনারা হলেন প্রকৃত বনেদি মানুষ। মন্দিরের আগে আপনাদের কোনও প্রয়োজন নেই, সে কথা কি আর বলে দিতে হবে।”

অরুণ মহান্তি ভুরু কঁচকে বন্ধুর দিকে তাকালেন। ভদ্রমহিলার মুখের কথায় বিশ্বাস কী! অহল্যা মেমোরিয়াল ট্রাস্টের ফাইন্যান্সিয়াল অডিট করে আগে দেখতে হবে কোনও গরমিল রয়েছে কি না।

শুভপ্রসন্ন অবশ্য বেশ কয়েক দিন ধরে খবরাখবর নিয়েই এসেছেন। ট্রাস্ট তৈরির খবর মহাশ্বেতা বলার আগে থেকেই তিনি জানতেন। তিনি আটঘাট বেঁধে এসেছিলেন। প্রয়োজনে এই বাড়ির লোকদের সঙ্গে বাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে, এই আশঙ্কাও উড়িয়ে দিতে পারেননি তিনি। যে কারণে সঙ্গে করে তিনি অরুণ মহান্তিকে নিয়ে এসেছেন। অরুণ যা শু শু লোক। এই সব পরিস্থিতির জন্য আদর্শ। কিন্তু এখানে এসে তিনি নিজেই হতবাক। এঁরা নিতান্তই ভদ্রলোক। এখানে অরুণকে না নিয়ে এলেও হত।

মহাশ্বেতা আর এক বার ছবিগুলোয় চোখ বুলিয়ে বললেন, “মিস্টার মজুমদার, এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, বাড়ি থেকে এত দামি মূর্তি উধাও হয়ে যাওয়া তো আর সাধারণ ঘটনা নয়। আর আপনারা আইনি সাহায্য চাইলেন না! এই ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত লাগছে।”

শুভপ্রসন্ন মাথা নিচু করে হাসলেন। তার পর ধীর গলায় বললেন,

“আমি আপনার এই প্রশ্নেরই অপেক্ষা করছিলাম। ইন ফ্যাক্ট, বাড়ি থেকে সোনার দেবীপ্রতিমা গায়েব হয়ে যাওয়া ইজ নট আ ম্যাটার অব জোক। আচ্ছা, একটা কথা বলুন ম্যাডাম, যখন অহল্যা বলে মেয়েটি আপনাদের বাড়িতে এসেছিল, সেই সময় বাইরের সামাজিক অবস্থা কি খুব স্বাভাবিক ছিল?”

মহাশ্বেতা মনে করার চেষ্টা করলেন, ঠিকঠাক মনে আসছে না। বছর পঞ্চাশ আগের কথা, তার উপর বয়সের প্রলেপে স্মৃতির সবই বাপসা।

শুভপ্রসন্ন নিজেই বললেন, “আমি বলছি। স্বাভাবিক ছিল না ম্যাডাম, নট অ্যাট অল নর্মাল। লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে তাদের ফিউচার, তাদের ড্রিমস সব জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজ বদলানোর নেশায় মেতে উঠেছিল। ইন আ ওয়ে, ঠিকই ছিল। আজকের প্রজন্মের তো শুধু মোটা টাকা মাইনে আর ফরেন ট্রিপ ছাড়া কোনও স্বপ্ন নেই। অন্তত সেই প্রজন্ম একটা জোরালো সোশ্যাল ড্রিম নিয়ে বেঁচে ছিল। সমস্যা হল সেই আশুত আমাদের মজুমদার বাড়িতেও ছড়িয়ে পড়ল। আমার ছোট আর সেজকাকা তখন নামকরা নকশাল, পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়াণ্টেড। অর্ধেক দিন বাড়িতে থাকে না, রাতে-বিরেতে আসে, এক বার তো দু'জনে নারকেল গাছের উপর রাত কাটিয়েছিল, ক্যান ইউ ইমাজিন!

“সে যাই হোক, তখন আমাদের পরিবারের হল শাঁখের করাতির দশ। আমার বাবা সরকারি আমলা, অর্থাৎ কিনা শ্রেণিশত্রু, আর ছোটকাকা আর সেজকাকা নকশাল, অবস্থা বুঝুন। বাবা তো অর্ধেক দিন মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে বসে থাকেন, পথে ঘাটে প্রায়শই লাশ পাওয়া যাচ্ছে। এই অবস্থায় তাঁর নিজেরও প্রাণসংশয়, তার উপর পুলিশের নজর থেকে দুই ভাইকে বাঁচানোর চেষ্টা, সব মিলিয়ে বাবার নাজেহাল অবস্থা।

“এই অবস্থায় সেই ভয়ানক ঘটনাটা ঘটেই গেল। আমি তখন অনেক ছোট। পাটির ফান্ডে টানাটানি পড়েছিল হয়তো। কাকারা এক রাতে বাড়ির গৃহদেবীর মূর্তি নিয়ে হাওয়া। কাকারা সৃষ্টিছাড়া টাইপের ছিল তাই, না হলে গোটা নৈহাটিতে ধর্মপ্রাণ হিসেবে আমাদের মজুমদার পরিবারের এক রকম খ্যাতিই ছিল বলতে পারেন।

“সেই হিসেবে বাড়িতে হলস্থল পড়ে যাওয়ার কথা ছিল পরদিন সকালে। হলস্থল পড়ল বটে, তবে একটা অন্য কারণে, ফর আ টোটালি ডিফারেন্ট রিজন। ছোট কাকার ডেডবডি পাওয়া গেছিল। একটা নালার পাশে। বুকে পুলিশের বুলেট। সেজকাকা ধরা পড়েছিল। দীর্ঘ দিন পুলিশের হেফাজত কাটিয়ে যখন বাড়ি ফিরল, তখন একেবারেই অপ্রকৃতিস্থ। পুলিশি হেফাজতের অত্যাচার তাঁকে পঙ্গু করে ফেলেছিল। জীবনের শেষ কয়েক বছর আমাদের নৈহাটির বাড়িতেই চলচ্ছস্তিহীন হয়ে, আই মিন অলমোস্ট ভেজিটেটিভ স্টেটে বেঁচে ছিলেন।”

এই পর্যন্ত বলে শুভপ্রসন্ন মাথা নিচু করে বসে রইলেন, তার পর বললেন, “দেশে ফেরার পরে এক সকালে মা আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন, মায়ের মুখে যে কী স্বর্গীয় হাসি তা আপনাকে কী বলব, মা যেন বলছেন, আবার আমাদের মজুমদার বাড়িতে ফিরে আসবেন তিনি।”

মহাশ্বেতা দেখলেন ভদ্রলোক অল্প-অল্প দুলছেন সামনে পিছনে। তিনি বিস্মিত হচ্ছেন, এই যুগে দাঁড়িয়েও একজন মানুষ সাধু ভাষায় চিঠি লেখেন, স্বপ্নাদেশ জাতীয় ধোঁয়াটে ব্যাপার-সাপারে বিশ্বাস করেন... তিনি একটু সময় নিয়ে বললেন, “কিন্তু মিস্টার মজুমদার, মূর্তিটা...”

“সেইটাই তো ধোঁয়াশা ম্যাডাম। মূর্তিটা কোথাও পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার পর ব্যাপারটা নিয়ে বাবা-জেঠারাও আর ধোঁয়াখুঁড়ি চাননি। একে তো ছোটকাকার ব্যাপারে তাঁদের মন ভেঙে গেছিল তার ওপর আমার বড়দাদা, সেই সময় বছর পনেরো বয়স, পুলিশ তাকে নিয়েও টানাটানি শুরু করেছিল। সে নাকি ছোটকাকার হয়ে কাজ করত, গোপনে খবর চালাচালি, এক বার নাকি পিস্তলও সাপ্লাই দিয়ে এসেছিল কোন এক সমিতির আড্ডায়। বাবা-জেঠারা আর রিস্ক নেননি, একে একে আমাদের তিন ভাইকেই চেম্বাইনে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে পড়তে পাঠিয়ে দেওয়া হল। আমার প্রবাসী জীবনেরও সেই সূচনা বলতে পারেন। প্রথমে চেম্বাই, সেখান থেকে সিঙ্গাপুর, তার পর অনারারি প্রফেসর হয়ে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি। দেশের পাট এক রকম চুকেই

গেছিল। রিসেন্টলি রিটারার করলাম, ছেলেরও তো বিয়ের বয়স হয়েছে, তার বিয়ের ব্যাপারে খোঁজখবর করতে ছেলের মা তাগাদা দিতে লাগল, তখন ভাবলাম, দেশ থেকে এক বার ঘুরেই আছি। আমার ছেলে সান্নিক একটু সেকলে টাইপের। স্কুল-কলেজ শেষ করে মাল্টিন্যাশনালে চাকরি বাগাল অথচ সে একবর্ণা, বিয়ে করলে বাঙালি মেয়েই বিয়ে করবে, বিলিতি মেয়ে সে ঘরে তুলবে না।”

এই কথার পর মহাশ্বেতা আর শুভপ্রসন্ন দু'জনেই কিছু ক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন। নীরবতা ভাঙলেন অরুণ মহান্তি, “যাক গে, সেটা বড় কথা নয়। অনেক গল্পেই কিছু ধোঁয়াশা থাকে, নিজের মতো করে ইন্টারপ্রেট করে নিতে হয়। হয়তো মূর্তিটা শুভর কাকা কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল, লেটস সে, কোনও জঞ্জালখানায়, কিংবা কোনও পোড়ো বাড়িতে। আপনাদের ওই মেয়েটি, অহল্যা না কী, সে হয়তো সেখান থেকেই পেয়েছে। সে দিন ঠিক কী ঘটেছিল সেটা বলে দেওয়ার মতো কেউ আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তবে তাতে আমাদের আসার উদ্দেশ্যটা পালটে যাচ্ছে না। তাই তো শুভ?”

শুভপ্রসন্ন সাড়াশব্দ করলেন না। অরুণ মহান্তি বললেন, “ম্যাডাম, অনেক দিন তো হল। এ বার যেখানকার জিনিস সেখানে চলে গেলেই ভাল নয় কি?”

মহাশ্বেতা অরুণ মহান্তির দিকে মুখ তুলে তাকালেন।

অরুণ মহান্তি হেসে বললেন, “আপনারা চাইলে আইনি পথ নিতেই পারেন, কিন্তু লাভ বিশেষ হবে না। আপনি কোনও লাইয়ার কনসাল্ট করে দেখতে পারেন। তিনিও বলবেন যে, কেস করলে আপনাদেরই আখেরে ক্ষতি। কারণ কেসে আমাদেরই প্লাস পয়েন্ট থাকবে, প্লাস যদি মূর্তি চুরির অভিযোগ আনি, তা হলে তো হয়েই গেলা”

“আহ! অরুণ!”

“কেন? কী হল? এই কথা ক্লিয়ার করে দিতেই তো এখানে আসা, তাই না?”

তিন জনেই চুপ। স্থির হয়ে বসে আছেন শুভপ্রসন্ন আর মহাশ্বেতা। উসখুস করছেন অরুণ মহান্তি, ঘন ঘন ঘড়িও দেখছেন। কাজের কথা বলতে অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে।

শুভপ্রসন্নর লজ্জাই করছিল। মহাশ্বেতা রুদ্র এমন এক জন ভদ্রমহিলা, যাঁর সঙ্গে এ ভাবে কথা বলা উচিত নয়। মহাশ্বেতার মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না শুভপ্রসন্ন, তাঁর কুণ্ঠা হচ্ছে। মহাশ্বেতার ফর্সা মুখে লালের আভা, সেই মুখ থমথম করছে।

শুভপ্রসন্ন নরম স্বরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁর আগেই চা-জলখাবারের ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল বিদিশা।

শুভপ্রসন্ন কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। শুভপ্রসন্নর মনে হল, তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে আজ থেকে ষাট বছর আগের মহাশ্বেতা রুদ্র। আজ শুভপ্রসন্নর মুখ হওয়ার দিন। অল্প সময়ের ব্যবধানে দু'বার মুখ হয়ে পড়লেন তিনি। এ বার দ্বিগুণ মুগ্ধতায় মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলেন শুভপ্রসন্ন।

বিদিশা হাসিমুখে চায়ের কাপ তুলে দিল শুভপ্রসন্নর হাতে। শুভপ্রসন্ন বিদিশার মুখের থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই চায়ের কাপে চুমুক দিলেন, তার পর বললেন, “বাহ, চমৎকার! এক্সেলেন্ট!”

১১ ১১

পারিজাত দেখল ‘সোনার তরী’-র বাইরে অয়ন দাঁড়িয়ে আছে।

গেটের উপর লতানো মাধবীলতার বাড, তার নীচে জায়গাটায় দিনে দুপুরেও সামান্য আবছায়া হয়ে থাকে। সেই আঁধারেই দাঁড়িয়ে আছে অয়ন। তাকে দেখে মনে হচ্ছে এই বাড়ির সে কিছুই চেনে না। এই বাড়িতে আজই সে প্রথম বার এসেছে।

পারিজাত এগিয়ে গিয়ে বলল, “আরে, অয়নদা! আপনি এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভিতরে যাবেন না?”

অয়ন আমতা আমতা করে বলল, “যাব কি না সেটাই ভাবছি। মানে, আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে?”

পারিজাত বলল, “যাওয়া ঠিক হবে না মানে? আজ আপনিই তো আসল লোক। আপনি না থাকলে তো এ সবের কিছুই হত না।”

অয়ন মাথা নিচু করল। সে জানে পারিজাত তার প্রশংসা করছে না। বরং মৃদু শ্লেষ মিশে আছে তার কথায়। পারিজাতকে তার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। অয়ন নিজেই একটা কেলেক্সারি ঘটিয়ে ফেলেছে।

সেই কেলেক্সারির ফলে বিদিশা তার সঙ্গে বাক্যালাপ মূলতুবি রেখেছে। ফোন তুলছে না, মেসেজের উত্তর দিচ্ছে না, দেখাসাক্ষাৎ তো বন্ধই। আজও কি নিজে থেকে এ বাড়িতে এসে উঠতে পারত অয়ন?

পারত না। তবুও যে শেষমেশ তাকে আসতে হয়েছে, তার কারণ আছে। একটা নয়, এক জোড়া।

প্রথম ফোনটা করেছিলেন মহাশ্বেতা, তিনি জোর করে বলেছেন যেন আজ সঙ্গে সাড়ে ছাঁটার মধ্যে অয়ন সোনার তরী-তে পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় আমন্ত্রণ এসেছিল বাবার ব্যবসায়ী বন্ধু শুভাশিস পালের তরফ থেকে। তিনি ফোন করেছিলেন বেলার দিকে, চড়া গলায় তিনি বলেছেন, “এই যে, ছোটকত্তা। আপনার ব্যাপারটা কী? কথাবার্তা নেই, দেখাশোনা নেই, এ দিকে তলে তলে এত বড় একটা কাজ করে বসে রইলেন? হা হা, আশ্চর্য মানুষ যা হোক! আচ্ছা, শুনুন, ছোটকত্তা, আজ ইভনিং-এ এক বার মহাশ্বেতা দেবীর বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন। কেমন?”

অয়ন তেতো স্বরে বলেছিল, “আমি সেখানে গিয়ে কী করব? আর তা ছাড়া আমার আজ বিকেলে একটা খুব জরুরি কাজ...”

শুভাশিস পাল অয়নকে কথা শেষ করতে দেননি, “না না, ছোটকত্তা। ও কথা বললে তো হবে না। আপনি না এলে তো কোনও কাজই হবে না, ‘শিবহীন যজ্ঞ’ আবার হয় নাকি!”

অয়ন কথা না বাড়িয়ে ফোন রেখে দিয়েছিল।

মহাশ্বেতা রুদ্র এবং শুভাশিস পাল দুই মেরুর মানুষ। হঠাৎ দু'জনের মধ্যে যোগাযোগ ঘটে যাওয়া এক আশ্চর্য ব্যাপার। সেটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র অয়নের সৌজন্যে।

মহাশ্বেতার কথা শুনে অয়ন শুভাশিস পালকে মহাশ্বেতার ফোন নম্বার দিয়েছিল। সে মনে মনে নিশ্চিত ছিল শুভাশিস পাল যে টাইপের লোক, তাতে মহাশ্বেতার তাঁকে পছন্দ হবে না।

শুভাশিস পাল অয়নকে ভুল প্রমাণ করেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে মহাশ্বেতার মনে হয়েছে তিনি অত্যন্ত খোলামেলা মনের সদালাপী মানুষ। কথাবার্তা এতটাই এগিয়েছে যে, শুভাশিস পাল তাঁর ছেলে নীলাজকে নিয়ে সরাসরি আজ সন্দের চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসছেন সোনার তরী-তে। উদ্দেশ্য বিদিশা আর নীলাজর মধ্যে এক বার দেখা করিয়ে দেওয়া।

খবর পেয়ে অয়নের মাথা বনবন করে ঘুরতে শুরু হয়েছে। এই চায়ের আড্ডার ফল কী হতে পারে, তা নিয়ে তার চিন্তা আছে, কিন্তু আসল সমস্যা অন্য জায়গায়। এই ঘটনার পরে সে বিদিশার মুখোমুখি হবে কী করে?

অয়ন পারিজাতকে বলল, “আচ্ছা, তুমি যাও। আমি একটু পরে আসছি।”

পারিজাত বলল, “না অয়নদা। সামহাউ আমার মনে হচ্ছে আমি চলে গেলে আপনি আর কিছুতেই ভিতরে যেতে পারবেন না। এত সুন্দর পাজামা-পাঞ্জাবি পরে এসেছেন, এই সব এথনিক ড্রেস... একেবারে মাঠে মারা যাবে। না না, আপনি আমার সঙ্গেই চলুন।”

অয়ন তবু দাঁড়িয়ে রইল।

পারিজাত ঠোঁট চেপে হাসল। যদিও পরিস্থিতি হাসির মতো নয়। মাসখানেক আগে বিদিশা ঘরের দরজা বন্ধ করে ফিসফিস করে তাকে কালীমন্দিরে বিয়ের কথা বলেছিল। কথা শুনে পারিজাত মাথা চেপে বসে পড়েছিল। এই মেয়ে বলে কী! এ ও কি তাকে বিশ্বাস করতে হবে! সেই ক্লাস ইলেভেন থেকে সবাই জানে পারিজাতই মুখরা, পারিজাতই সমস্ত ঝামেলার মূল। বিদিশা শান্তশিষ্ট মেয়ে। সেই মেয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে! পারিজাত বিস্মিত হয়ে বলেছিল, “মানে, সিরিয়াসলি! মন্দির তো সব সময় ক্রাউডেড থাকে। তাদের সবার সামনে অয়নদা তোকে

সিঁদুর পরিয়ে দিলা।”

“দিল তো!” মিটিমিটি হেসেছিল বিদিশা।

“এত লোকের যাতায়াত। যদি চেনা কেউ দেখে ফেলত! তোর ভয় করল না!”

“তখন ভয় করেনি। পরে ভেবে দেখে বেশ অবাক লেগেছে। কী করে পারলাম কে জানে!” বিদিশা ভাবুক চোখে জানলা দিয়ে বাইরে তাকায়। পারিজাত লাফিয়ে উঠে বসেছিল, “তোর পা-টা কোথায়? এক বার চরণধূলি দে মা।”

বিদিশা রাজেন্দ্রাণীর ভঙ্গিতে বিছানায় পা তুলে বসে। সত্যি সত্যিই তার পায়ে মাথা ঠুকতে ঠুকতে পারিজাত বলেছিল, “এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, চাপা আগুন নিশ্চয়। একটা কবচ তবিজ কিছু দাও মা, আমাদেরও একটা গতি হোক।”

পারিজাত কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখল অয়ন তার সঙ্গে আসছে না। সে আবার বলল, “কী হল, অয়নদা! চলুন। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে কি প্রবলেম সলভড হয়ে যাবে? চলুন, সমস্যা আপনি পাকিয়েছেন, আপনাকেই মেটাতে হবে, চলুন, চলুন।”

সোনার তরীর বিশাল বৈঠকখানায় আসর জমে উঠেছে। কাঁচের শৌখিন নিচু টেবিলে প্রচুর মিষ্টি, ফল, ভাজাভুজি সহযোগে আপ্যায়ন করা হচ্ছে শুভাশিস পাল আর তাঁর পরিবারকে। শুভাশিস পাল অয়নকে দেখে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, “এই তো ছোটকত্তা এসে গেছেন, আসুন আসুন। সময় হল আসার।”

শুভাশিস পালের স্ত্রী বললেন, “এই তবে তোমার ছোটকত্তা! শুধু নামই শুনেছি এত দিন। বাহ! পাঞ্জাবিটি তো চমৎকার।”

বসার ঘর সরগরম। মাতিয়ে রেখেছেন শুভাশিস পাল আর তাঁর স্ত্রী। দু’জনেই বৈঠকি মেজাজের মানুষ। তাঁদের ছেলে নীলাজ বরং চুপচাপ। প্রভঞ্জন আর মঞ্জুষা কথা বলছেন সামান্যই। অন্য দিকে শুভাশিস পাল আর তাঁর স্ত্রীকে দেখে মনে হচ্ছে তাঁরা নিজেদের বাড়িতেই বসে আছেন। সম্ভবত বিদিশাকে তাঁদের বেশ পছন্দ হয়েছে। তাঁরা জোর গল্প জুড়েছেন। এক বার তো শুভাশিস পাল বলে উঠলেন, “বুঝলেন, এই ছোটকত্তার বাবার কাছে আমাদের কোম্পানির একটা বড় লোন আছে। এই সম্বন্ধটা যদি ফাইনাল হয়ে যায় তবে সেই লোন আমি শোধ করে দেব। লোন তো লোন, এক সঙ্গে আমার ঘটক বিদায় পর্যন্ত হয়ে যাবে।”

পালদম্পতি হো হো করে হেসে উঠলেন। ঘরের বাকিরাও মনে হল এই কথায় মজা পেয়েছেন। হাসল না শুধু বিদিশা, আর হাসল না অয়ন। তাদের চোখাচোখি হল, চোখের ইশারায় অয়নকে বাইরের ঘরে আসতে বলে সোফা থেকে উঠে গেল বিদিশা।

বাইরের ঘরে বিদিশা অয়নের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, “এ সব কী হচ্ছে! এদের যা হাবভাব দেখছি আজই বিয়ের দিনক্ষণ স্থির না করে নড়বে বলে মনে হচ্ছে না।”

অয়ন বিদিশার রূপ দেখে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলল, “না না, বিদিশা। তা কী হয়? কথায় আছে লাখ কথার পর তবে বিয়ে। এত তাড়াতাড়ি বিয়ের ডেট ঠিক হয় নাকি? কী যে বলো তার ঠিক নেই।”

বিদিশা জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অয়নের দিকে তাকাল, “তুমি তা হলে ঠান্মির কাছে আমাদের ব্যাপারটা বলবে না অয়নদা, তাই তো?”

“কী আশ্চর্য! আমি কি তাই বলেছি নাকি? অবশ্যই বলব। আজকের অনুষ্ঠানটা মিটে যাক, কাল পরশু না হয়...”

“না!” বিদিশা চাপা আর্তনাদ করে উঠল, “অনেক কাল পরশু এল গেল, তুমি আজই বলবে অয়নদা। আজ, এখনই বলবে।”

অয়ন বুঝল সে দরদর করে ঘামছে, সে কোনও মতে বলল, “তা কি হয় বিদিশা! বাইরের লোকেরা আছেন, তাদের সামনে এ সব কথা... তোমাদের ফ্যামিলির তো একটা ডিগনিটি আছে নাকি!”

বিদিশা নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, “ঠিক আছে। সবার সামনে বলতে হবে না। আমার সামনে বলো। আমি ঠান্মিকে ডেকে আনছি।”

বিদিশা সত্যি সত্যিই জোনাকিকে দিয়ে মহাশ্বেতাকে ডেকে পাঠাল। মহাশ্বেতা বাইরের ঘরে এলেন।

বিদিশা নির্লিপ্ত স্বরে বলল, “স্যর তোমাকে কিছু বলবেন বলে ডেকেছেন ঠান্মি। বলুন স্যার।”

মহাশ্বেতা জিজ্ঞাসু চোখে অয়নের দিকে তাকালেন। অয়ন রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে বলল, “ইয়ে, মানে, পাত্র কেমন দেখলেন ম্যাডাম?”

“ভালই তো। কেন? কোনও অসুবিধে আছে?”

“না না, সমস্যা আর কী? স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড-এর ফাইনানশিয়াল অ্যানালিস্ট... চমৎকার ছেলে ম্যাডাম। চমৎকার ছেলে। বাবা মাকে দেখছেন না? দারুণ ফ্যামিলি। কী মিশুক, তাই না?”

মহাশ্বেতা অবাক হয়ে বললেন, “এই কথা বলতে আপনি আমাকে ডেকে আনলেন মাস্টারমশাই?”

অয়ন বোকার মতো একগাল হাসল, “হ্যাঁ, ওই আর কী? ভাবলাম আপনার কেমন লাগছে একটু জেনে নিই...”

মহাশ্বেতা কিছু ক্ষণ অয়নের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, “মাস্টারমশাই মনে হয় সারাদিন রোদে রোদে ঘুরছেন। মুখ শুকিয়ে গেছে। জোনাকিকে বলে ওকে এক গ্লাস শরবত দে বিদিশা।”

অয়ন চোরা চোখে বিদিশার দিকে তাকাল। তার চোখের আগুন নিভে এসেছে। হতাশা মেশানো অভিমান টলটল করছে বিদিশার চোখে।

এরই মধ্যে পারিজাতের ফোন এসেছে। প্রথম দু’বার পারিজাত ফোন কেটে দিয়েছে। দেখা গেছে অন্য পক্ষ নাছোড়বান্দা। তৃতীয় বার ফোন বেজে ওঠায় সে বসার ঘর থেকে বাইরে এসে ফোন ধরেছে।

ফোনের অন্য প্রান্তে সপ্রতিভ ভরাট গলা, “জানি ডিস্টার্ব করলাম, কিন্তু এখন একটা চান্স নেওয়া দরকার ছিল।”

পারিজাত সহসা উত্তর দিতে পারল না। এই মৈনাক কর্মকার লোকটা তাকে বিপদে ফেলেছে। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনে আলাপের সূত্রে প্রায় মাথায় চড়ে বসেছে পারিজাতের। গায়ে পড়া লোকদের মেয়েরা একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না, কিন্তু পারিজাত মৈনাককে পুরোপুরি এড়িয়ে যেতেও পারেনি। পারিজাত তার দেওয়া ফুল নিয়েছে, তার জোরাজুরিতে বাধ্য হয়ে এক দিন কাফেতে দেড় ঘণ্টা আড্ডা মেরেছে। মাঝে মাঝেই মৈনাক মেসেজ করছে, অনলাইন আড্ডা সময় সময় চলেছে অনেক রাত পর্যন্ত। ছেলোটো প্রকারান্তরে পারিজাতকে বিবাহ প্রস্তাব পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে, যে কোনও দিন নাকি সে পারিজাতের বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে যেতে প্রস্তুত। পারিজাত মেলোড্রামা পছন্দ করে না, কিন্তু তার মনে হচ্ছে এই গায়ে পড়া ছেলোটাকে সে পুরোপুরি অপছন্দ করতে পারছে না।

পারিজাত একটু সময় নিয়ে বলল, “কিসের চান্স বলুন তো?”

মৈনাক বলল, “এই যে আমার প্রস্তাবটা সিরিয়াসলি ভাবছেন না, তাই ভাবলাম এখন ফোন করি। বন্ধুর সম্বন্ধ দেখা হচ্ছে, এই সময় যদি আপনার মনও একটু নরম হয়, আপনারও যদি বিয়ের ইচ্ছে টিচ্ছে জাগে, এই আর কী!”

“বাহ! কী বুদ্ধি আপনার। না মশাই, আমার তেমন কোনও ইচ্ছে জাগছে না। আর কিছু বলবেন?”

“কী আর বলব বলুন। আপনার চার পাশে কত আনন্দ আর আমি একা ঘরে শুয়ে আছি। সত্যি, যদি কোনও ম্যাজিক করে আপনার কাছে চলে যেতে পারতাম।”

“এমন ইচ্ছে আপনার প্রায়ই করে নাকি?”

“করে পারিজাত। রোজ করে।”

পারিজাত কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “আচ্ছা এই যে লাভার বয় সেজে ঘুরছেন, যদি জানেন আমি অন্য কাউকে ভালবাসি, তবে এত প্রেম থাকবে আপনার?”

“এটা আপনি কী বললেন! এ তো একেবারে ন্যাচারাল ঘটনা। মান্না দে সেই কবে বলে গিয়েছেন— হৃদয় আছে যার সেই তো ভালবাসে/ প্রতিটি মানুষের জীবনে প্রেম আসে... কী বুঝলেন?”

গানের অংশটুকু সুর করে গেয়েই শোনালা মৈনাক।

“বুঝলাম আপনার গানের গলা সাংঘাতিক, একফোঁটা সুর নেই।”

“সে আপনি যাই বলুন, আমি জানি আপনি অত তরল স্বভাবের

মেয়ে নন।”

“মানে?”

“মানে, কারও টাকা পয়সা বা ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স দেখে গেলে যাওয়ার মেয়ে আপনি নন। যতই লোকে বলুক, লাভ হ্যাপেন্স ওনলি ওয়ান্স, আসল গল্প হল জীবনে বেশ কয়েক জনকে ভালবাসে মানুষ। তবে আপনি এটাও জানেন, জীবন তার সঙ্গে কাটানো উচিত যে আপনাকে ভালবাসে। ঠিক বলিনি পারিজাত?”

পারিজাত হঠাৎ উদাস হয়ে গেল। সাগর এই মুহূর্তে কী করছে? সেন্ট পিটার্স হসপিটালে কোনও জটিল সার্জারিতে ডুবে আছে ছুরি কাঁচি হাতে? নাকি একলা এক লাইব্রেরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বই মুখে কাটিয়ে দিচ্ছে? যাই করুক, পারিজাত জানে, একটি বারের জন্যও পারিজাতের চিন্তা আসছে না তার মনে। পারিজাতের মন বিচ্ছিন্ন রকমের খারাপ হয়ে গেল।

সে অন্যমনস্ক ভাবে বলল, “আমার এখানে একটু কাজ আছে মৈনাক, আপনার সঙ্গে পরে কথা হবে।”

প্রথম দেখার প্রথা মেনে পাত্রপাত্রীকে কিছু ক্ষণ আলাদা কথা বলতে দেওয়া দম্ভুর। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। নীলাজ আর বিদিশা একটু ক্ষণ বসল আলাদা ঘরে। নীলাজ খোয়াল করল এই মেয়ে কথা বলে অত্যন্ত কম। বেশিরভাগ কথার উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে সরে। যেটুকু জিজ্ঞেস করা হয় তারও উত্তর দেয় অতি সংক্ষেপে। বাধ্য হয়ে নীলাজ নিজেই সাধ্যমতো কথাবার্তা চালান। বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে আসার অভিজ্ঞতা তার আছে। সে জানে কী ধরনের কথা মেয়েরা এই সময় পছন্দ করে।

নীলাজ তাই নিজের কলেজের দিনের গল্প ছুঁয়ে নিজের কর্মব্যস্ত জীবন এবং আসন্ন পদোন্নতির কথা বলল। যোধপুর পার্কে সে সম্প্রতি নতুন ফ্ল্যাট বুক করেছে সেই কথাও জানিয়ে দিল কথার ফাঁকে।

প্রথম দেখায় মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে নীলাজর। মেয়েটি শুধু সুন্দরই নয়, এর মধ্যে এক অদ্ভুত নিরিবিলি ভাব আছে। নীলাজর মনে হল সারাদিন কাজের পর এই মেয়ের কাছে ফিরে আসতে তার খারাপ লাগবে না। কথা বলতে বলতে হঠাৎই সে দেখল, বিদিশার চোখে কান্নার জল টলটল করছে। যে কোনও মুহূর্তে মেয়েটি কেঁদে ফেলতে পারে। নীলাজ উদ্বিগ্ন হল না। প্রবল বিস্ময়ে আশ্চর্য সুন্দর এই মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক বাড়ি মাতিয়ে রেখে শুভাশিস পাল সপরিবার বিদায় নিলেন। যাওয়ার আগে মহাশ্বেতার হাত ধরে হাসিমুখে বলে গেলেন, “ব্যস! আমাদের কাজ শেষ। এবার ছেলেমেয়েরা নিজেদের পছন্দ জানালেই একটা শুভ দিন দেখে...”

অতিথিরা চলে গেলে বাড়ি হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল। অয়ন বিদিশার ঘরে ঢুকে বলল, “আলাদা করে তোমাদের কী কথা হল?”

বিদিশা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, “অয়নদা, আমি তোমার সঙ্গে এই বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাই না।”

অয়ন কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, “বিদিশা, আমি তো বলছি, আমি আর ক’দিনের মধ্যেই মহাশ্বেতা ম্যাডামের সঙ্গে...”

বিদিশা হাত তুলে অয়নকে থামাল, “তুমি কোনও দিনই পারবে না অয়নদা। বাদ দাও। আশ্চর্য লাগে, এর পরেও তুমি জানতে এসেছ আলাদা করে কী কথা হল? কী কথা হল শুনবে? ছেলেটাকে আমার বেশ ভাল লেগেছে। আমরা নান্দার এক্সচেঞ্জ করেছি। খুব তাড়াতাড়ি বাইরে দেখা করব, আপত্তি আছে?”

অয়ন কেমন যেন গুটিয়ে গেল, “তুমি আমাকে আঘাত করার জন্য এসব বলছ। আমি জানি এমন কিছু হয়নি। বিদিশা, আমি ছোটবেলা থেকেই এ রকম। হঠাৎ কী করে নিজেকে পাল্টাই বলো? একটু সময় দাও প্লিজ।”

“বাহ! অয়নদা। একটা মেয়ের সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করতে পারলেন, আর বাড়িতে সেই কথাটা বলতে পারবেন না? এড়িয়ে যেতে

চাইছেন আমায়?”

অয়ন মাথা নিচু করে মিনমিন করে বলল, “বিয়েটা কি আমি নিজে করেছিলাম বিদিশা... ইট ওয়াজ ইয়োর প্ল্যান, না?”

বিদিশা এ বার হাততালি দিয়ে উঠল, “এই তো কথা ফুটেছে। তা এই কথাগুলো ঠামির সামনে গিয়ে বলা যাচ্ছে না? নাকি সব মাস্তানি আমার উপর?”

তখনই পারিজাত ঘরে ঢুকে বলল, “তোরা কী শুরু করেছিস? বাইরে থেকে সব শোনা যাচ্ছে তো।”

বিদিশা রাগে কাঁপছিল, সে কোনও মতে নিজেকে সংযত করল। অয়ন মৃদুস্বরে বলল, “আমি চলে যাচ্ছি বিদিশা।”

বিদিশা উত্তর দিল না, পারিজাতের কানে এই কথাটা অদ্ভুত শোনাল, সে বলল, “ও আবার কী কথা অয়ন দা। কোথায় যাচ্ছেন আপনি?”

অয়ন মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তবে সত্যি সত্যি সে চলে গেল না। একতলার হলঘরের সোফায় গিয়ে চুপ করে বসে রইল। দৃশ্যটা দেখে ঘরে ফিরে এল পারিজাত।

“এ সব কী বিদিশা! অয়নদা একটু চুপচাপ। একটু টাইম দে ওকে। ছেলেটা ভুল কী বলেছিল? এটা তো সামান্য ব্যাপার নয়। বাড়িতে জানাজানি হলে কনসিকুয়েন্স কী হতে পারে তুই ভালই জানিস।”

“কথাটা সেটা নয়। নিজের এতটুকু বক্তব্য রাখার ক্ষমতা নেই। এই ছেলের সঙ্গে সারাজীবন আমি কাটাতে কী করে? আবার পাঞ্জাবি পরে এসেছে! পাটভাঙা পাঞ্জাবি... গাধা একটা, হন্দ গাধা!”

পারিজাত বিস্মিত হল, বিদিশাকে কোনও দিন এ রকম ভাবে কথা বলতে সে শোনেনি। আজ মেয়ের হলটা কী? এত রেগে গেল? বরকে গাধা মনে হতেই পারে, খুবই স্বাভাবিক চিন্তা... কিন্তু নিজের স্যরকে গাধা বলতেও বিদিশার আটকাচ্ছে না?

পারিজাত বলল, “প্লিজ বিদিশা শান্ত হ। যা বলছিস পরে মনে করলে তোর নিজেরই খারাপ লাগবে।”

“কিছু খারাপ লাগবে না। আজ পাঞ্জাবি পরে এসেছে, এর পর ওই ছেলে আমার বিয়েতে কজি ডুবিয়ে বিরিয়ানি খেতে আসবে, তুই দেখে নিস।” রাগের চোটে বিদিশা কেঁদেই ফেলল।

পারিজাত বন্ধুকে জড়িয়ে ধরল, “এ রকম ছেলেমানুষি করলে হয়? শোন, আমি অয়নদাকে ডেকে আনছি। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দু’জন কথা বলে নে। আর নো রাগারাগি, ওকে?”

পারিজাত বিদিশার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, “আরে, অয়নদা তোকে পাগলের অতো ভালবাসে, তুই এক দিন ঠিক বুঝতে পারবি। এ বার নে, তোরা মান অভিমান মিটিয়ে ফেল, আমি অয়নদাকে ডেকে আনছি। নীচের ঘরে মুখ চুন করে বসে আছে বেচারী!”

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ মুছে বিদিশা গাঁজ হয়ে বসে রইল। সামান্য কান্নাকাটি করলেই তার মন হালকা হয়েছে। এই মুহূর্তে অয়নের সঙ্গে এক বার কথা বলতে ইচ্ছে করছে বিদিশার। তার মনে হচ্ছে সত্যিই অয়নদার সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করে ফেলেছে। তার খুব খারাপ লাগছে। ও ভাবে কেউ “আমি চলে যাচ্ছি” বলে!

পারিজাত লঘু পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমেই থমকে গেল। অয়ন সেখানে নেই। সে কখন যেন নিঃশব্দে চলে গেছে। পারিজাত অবাক হল। রোগাসোগা চেহারার ভিত্তি একটা ছেলে চলে গেছে, তাতেই অতবড় ঘরটা যেন খাঁ খাঁ করছে।

॥ ১২ ॥

মঞ্জুরার মন ভাল নেই। এই মন খারাপের কারণ তিনি কাউকে বোঝাতে পারবেন না। যে কেউ শুনলে বলবে যার ছেলে বিলেতের হাসপাতালে ডাক্তারি করছে, যার মেয়ের বিয়ে পাকা হতে চলেছে, তার আবার মন খারাপ কিসের?

অথচ এই ঘটনাগুলোই আসলে মঞ্জুরার মন খারাপের কারণ। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর মনে হচ্ছে সাগর আর বিদিশা তাঁর কোলছাড়া হতে বসেছে। কী ভাবে নিজের জীবনের এক একটা দিন তিনি নিজেকে বিলিয়ে

দিয়েছেন ছেলেমেয়ে দুটোকে বড় করে তুলতে। হঠাৎ তারা নিজের নিজের জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়বে, সাগর পড়ে থাকবে কোন দূরদেশে, হয়তো ফিরিস্দি মেয়ে বিয়ে করে সংসার পাতবে সেখানে। বিদিশাও নিজের মতো করে সংসার করবে তাঁকে ছেড়ে... ছেলেমেয়েদের সেই জীবনে কতটুকুই বা ভূমিকা থাকবে মঞ্জুষার!

এই রকম হাজার হাবিজাবি চিন্তা তাঁকে রাতে ঘুমোতে দেয় না। মঞ্জুষা এ পাশ ও পাশ করেন। তার পর এক সময় ঘুলঘুলি দিয়ে ভোরের আলো আসে ঘরে। তখন উঠে পড়েন মঞ্জুষা। আজকাল ভোরের দিকে বাগানে পায়চারি করা ধরেছেন। তারই সঙ্গে গাছেদের পরিচর্যা চলে। জল দেন ঝাঁঝরি দিয়ে, ঝরাপাতা ঝাটি দিয়ে ফেলে দেন জঞ্জাল ফেলার বাস্কে। নানা রঙের মরসুমি ফুল হাওয়ায় মাথা দোলায়, সাময়িক একটা ভাল লাগা আসে মঞ্জুষার মনে।

আজও খুব ভোরে উঠে মঞ্জুষা বাগানের কাজ করছিলেন, সেই সময় তিনি দেখলেন পাঁচিলের ও পাশে একটা হলুদ ট্যান্ডি এসে দাঁড়াল। ট্যান্ডির দরজা খোলা এবং বন্ধ হওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। এর কিছু সময় পরে গেট খুলে এক যুবক বাড়ির ভিতরে ঢুকে এল। যুবকের পরনে খাকি কার্গো প্যান্ট, কালো রঙের রাউন্ড নেক টি শার্ট, পিঠে চাউস ব্লক স্যাক। মঞ্জুষার দমবন্ধ হয়ে এল। এও কি সম্ভব! তিনি কি ঠিক দেখছেন!

যুবক হাসিমুখে এগিয়ে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, “কেমন আছ, মা!”

মঞ্জুষা এতটাই অবাক হলেন যে তিনি কিছু ক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না। সাগর যে হঠাৎ সুদূর বিলেত থেকে একেবারে বাড়িতে ফিরে আসবে তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি।

সাগর তাঁর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে, মঞ্জুষা বিহবল স্বরে বললেন, “পাপান! তুই হঠাৎ চলে এলি! সব ঠিক আছে তো ওখানে?”

সাগর বলল, “সব কিছু একদম ফার্স্ট ক্লাস। তুমি চিন্তা কোরো না। একটু সারপ্রাইজ দিতে ইচ্ছে হল, তাই চলে এলাম। এ সবই বিলেতের শিক্ষা। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এ ভাবেই সারপ্রাইজ রেড করে, তারা বলে এতেই নাকি মানুষের স্বরূপ ধরা পড়ে সবচেয়ে বেশি। বুঝলে মা?”

ছেলের কথা শুনে হেসে ফেললেন মঞ্জুষা। এই একটু আগেও বেঁচে থাকা তাঁর কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছিল। অথচ, এই সুন্দর সকালে ফুলের বাগানে দাঁড়িয়ে তাঁর সন্তান তাঁর সঙ্গে গল্প করছে... এই সামান্য ঘটনাই আশ্চর্য এক সুখে দ্রবীভূত করল তাঁকে। নিজের অজান্তেই মঞ্জুষার চোখে জল চলে এল।

এক সময় সাগর যখন সপ্তাহান্তে মেডিকেল কলেজের হস্টেল থেকে বাড়ি ফিরত, তখন ঠিক আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ির সমস্ত খবরের আপডেট তার কাছে এসে যেত। এ বার তা হল না। সবাই যেন একটু চুপচাপ। জিজ্ঞেস করে করে খবর জানতে হচ্ছে। জোনাকি যে জোনাকি, যার মুখে সর্বদা কথাই ফুটত, সে পর্যন্ত দুটো কথা বলে কোথায় যে পিঠটান দিল তাকে আর দেখাই গেল না।

শুধু প্রভঞ্জন ছেলে আসায় ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাজারের ব্যাগ হাতে বেরোতে যাচ্ছিলেন। সাগর তাঁকে আটকেছে। বাবার হাত থেকে বাজারের ব্যাগ নিয়ে সে ঘোষণা করেছে যে ক’দিন সে থাকবে, সে ক’দিন তার ইচ্ছে বাজার, তারই ইচ্ছেতেই রান্না। তাকে কোনও কিছু খেতে বাধা দেওয়া যাবে না। কোনও কিছু খেতে জোর করাও চলবে না।

ছেলে তাঁর হাত থেকে বাজারের ব্যাগ কেড়ে নিজে বাজারে যাচ্ছে এ দৃশ্য বিশ্বাস করতে প্রভঞ্জনের অনেক ক্ষণ সময় লেগে গেল। বহু দিন পরে বাবার দিকে তাকাল সাগর। প্রভঞ্জন বর্তমানে কর্মহীন দিন কাটাচ্ছেন, বাড়িতে থেকে থেকে তাঁর টকটকে ফর্সা রঙ যেন ফেটে পড়ছে। অবশ্য এই ক’দিনেই বেশ কিছুটা ওজন বাড়িয়ে ফেলেছেন তিনি। কপাল চওড়া হয়ে আসছে, পাক ধরেছে অধিকাংশ চুলে। তবু সাগরের মনে হল তার বাবাকে এখনও পুরোপুরি বৃদ্ধ বলা যাবে না, বয়সের হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুপুরুষ। বাবাকে দেখাচ্ছে ক্লাস ফাইভের ইতিহাস বইয়ের রবার্ট ক্লাইভের মতো।

সাগর বাজার থেকে ফিরতেই অবশ্য মহাশ্বেতা নাতিকে পাকড়াও করলেন। এর আগে এত দিনের জন্য সাগর বাড়ির বাইরে থাকেনি।

মহাশ্বেতার ঘরে সাগর যখন এল তখন বিদিশা ঠাকুমার ওষুধপত্র সাজিয়ে রাখছিল। ঠাম্মির ওষুধের সংখ্যা রোজ বাড়ছে। সেসব জায়গামতো গুছিয়ে না রাখলে মহাশ্বেতা ম্যানেজ করতে পারেন না।

সাগর সে দিকে একবার তাকিয়ে ঠাম্মির বিছানায় বসে পড়ল, “এ সব আমি কী শুনছি ঠাম্মি? এই বাড়ির একটা পেতনিকে নিজেদের ঘরে নিয়ে তোলার জন্য নাকি কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে?”

মহাশ্বেতা হাসলেন, “কাড়াকাড়ি বলে কাড়াকাড়ি! যে দেখছে তারই পছন্দ হয়ে যাচ্ছে।”

“তাই নাকি!”

“একদম তাই পাপান। আমার নাতনি বলে কথা।”

“তা তো বটেই। তোমার নাতনি গুণে লক্ষ্মী, রূপে সরস্বতী। যাই হোক, যারা আগ্রহ দেখাচ্ছে তারা তো আর জানে না মেয়ে কী চিজ! ঈশ্বর তাঁদের মঙ্গল করুন!” সাগর কপালে হাত ঠেকাল, “আচ্ছা, শুনলাম ওর ওই অয়ন মাস্টার নাকি নিজে দায়িত্ব নিয়ে সম্বন্ধ আনতে শুরু করেছেন! হ্যাঁ, রে মামন! তোর মাস্টার কি ঘটকালিও শুরু করল নাকি!”

এই ধরনের কথায় চূপ করে থাকার মেয়ে বিদিশা নয়। সে দাদামণিকে পাল্টা দু’কথা শুনিয়ে দেয়। বাড়িবাড়ি পরিস্থিতি হলে সাগরের পিঠে দুমাদুম কিলও বসিয়ে দেয়। আজ বিদিশা কিছুই করল না। নির্লিপ্ত স্বরে বলল, “দাদাভাই, লম্বা সময় ফ্লাইটে এসেছি। সময়মতো লাঞ্চ সেরে বিশ্রাম নো।”

সাগর চমকে বিদিশার দিকে তাকাল। তার মনে হচ্ছে এই চার মাসে তার বোন আমূল পালটে গেছে। গালের হনু প্রকট হয়েছে, চোখদুটোও যেন একটু ফোলা ফোলা, কান্নাকাটি করেছে নাকি!

বিদিশা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে সাগর বলল, “ব্যাপার কী ঠাম্মি? বাড়ির হাওয়া একটু থমথমে মনে হচ্ছে!”

মহাশ্বেতা একটু সময় নিয়ে বললেন, “সাগর, নৈহাটির ভদ্রলোক ব্যাপারটা নিয়ে বেশ সিরিয়াস। মূর্তিটা উনি গুঁদের বসতভিটেয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন।”

“তা বললে তো হবে না ঠাম্মি। আমাদের এত বছরের মন্দির।”

“তা হলে তো লম্বা আইনি পথে হাঁটতে হবে। তোর বাবাকে তো তুই জানিস, ফিরেও তাকাবে না। তার ওপর তুই পড়ে থাকবি বিলেতে। মামলা মোকদ্দমার হাপা কি আমি এই বয়সে সামলাতে পারব!”

সাগর চূপ করে গেল। ঠাম্মি ভুল বলছে না।

সাগরকে চূপ দেখে মহাশ্বেতা বললেন, “একটা সলিউশন হতে পারে! শুভপ্রসন্নর বিদিশাকে দেখে দারুণ পছন্দ হয়ে গেছে। নিজের ছেলের জন্য বিদিশার কথা ভাবছেন উনি, আমাকে ফোন করে সে কথা জানিয়েছেন।”

“বলো কী ঠাম্মি!”

“হ্যাঁ, ছেলেও দারুণ। ম্যানচেস্টারে সেটেন্ড। বিয়ের জন্য পাত্রী খুঁজতেই ওঁরা এ দেশে এসেছেন। শুভপ্রসন্ন ছেলের ছবিও পাঠিয়েছেন আমাকে। দেখবি?”

সাগর শরীর মুচড়ে বলল, “আমার দেখার দরকার নেই, তোমার নাতনিকে দেখাও। বিয়ে তো আর আমি করব না। মন্দিরের প্রতিমা বাঁচানোর জন্য সে আত্মত্যাগে রাজি হয় কি না!”

“আহা, ও ভাবে কেন বলছিস? ছেলের প্রোফাইল দুর্দান্ত। ম্যাট্রিমনি সাইটে এক দিনে দেড় হাজার প্রোপোজাল পেয়েছে। নেহাৎ শুভপ্রসন্নর বিদিশাকে খুব পছন্দ হয়ে গেল তাই...”

সাগর উঠে দাঁড়াল। তার জেট ল্যাগ শুরু হচ্ছে, সে বলল, “আর ওই পাড়ার মোড়ে যে ইভিটজার-দের দৌরাড্যা শুরু হয়েছিল, তার কী হল?”

“হবে আবার কী? পরের পর নাগরিক মিটিং হয়ে যাচ্ছে। কাজের বেলা লবডঙ্কা। তারা নাকি দারুণ প্রভাবশালী লোকদের ছেলে। পুলিশ পর্যন্ত ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছে না।”

“তাই হয় ঠাম্মি। লন্ডনেও তো কয়েকটা মার্কামারা জায়গা আছে, বণবিদ্বেষের জন্য অনেক জায়গায় সঙ্কের পরে আমাদের যাওয়াই বারণ। আর এ পাড়ার নাগরিক কমিটি! এরা শুধু চা পকোড়া খেয়ে মিটিং করবে, কেউ এগিয়ে গিয়ে কিছু বলবে না। এটা ই এদের



ক্লাস ক্যারেকটার।”

কয়েকটা দিন সাগর এ দিক ও দিক করে কাটিয়ে দিল। তার আচরণ বাড়ির সবাইকে কমবেশি বিস্মিত করেছে। সারাদিন এখন সে বইয়ে মুখ গুঁজে থাকে না। সকাল থেকে টো টো করে বেড়াচ্ছে। বাড়ির ছোটখাটো বিষয়েও তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। আগে যে সাগর বাড়ির কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামাত না, এখন সামান্য একটা সুইচ বিকল হলেও ছুটোছুটি করে ইলেকট্রিশিয়ান ধরে আনছে। শুধু বিদেশার সঙ্গেই তার সময় কাটানো হচ্ছে না। মেয়েটা যেন সাগরের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

সাগর হচ্ছে করেই কিছু বলছে না। সে বিদেশাকে সময় দিতে চাইছে। দেখা যাক মেয়েটা নিজে থেকে কিছু বলবে কি না।

আজ সাগর বাজারে গেছিল। প্রমাণ সাইজের চিতল মাছের পেটি এনেছে। সেই মাছ জেনাকি রান্নাও করেছে জুত করে।

দুপুরের খাওয়াটা সাগরের একটু বেশিই হয়ে গেল। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হল বিলেতে দিনের এই সময়টা তার কি ব্যস্ততাতেই না কাটে! ঘুম ভাঙমাত্র ছুটতে ছুটতে হসপিটাল, হাজার রোগীর ভিড়, নতুন কালচার, সার্জারির নতুন টেকনিক, স্বাধীনতা কম, অল্প জটিল সার্জারি হলেও কনসালট্যান্টকে রিপোর্ট করা, এই সব কাটিয়ে যখন মেস-এ ফেরে, তখন ক্লান্তিতে চোখ বন্ধ হয়ে আসে সাগরের।

মেসে তার রুমমেট একটি উড়িয়া ছেলে। অযাচিত ভাবেই সে রান্নার সব দায়িত্ব নিয়েছে। সেই ছেলে চমৎকার, তার রান্নার হাত আরো চমৎকার। তার জোগাড়ে হয়ে সাগর নিজেরও রান্নার স্কিলের উন্নতি ঘটেছে। কোনও দিন একঘেয়ে লাগলে দু’জন কাছাকাছি ইন্ডিয়ান রেস্টুরায় রাতের খাওয়া সেবে নেয়। ড্রামন্ড স্ট্রিটে ইন্ডিয়ান আর বাংলাদেশি রেস্টুরার ভড়াছড়ি।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যেন চোখ লেগে এসেছিল সাগরের। যখন তার ঘুম ভাঙল তখন রোদ পড়ে এসেছে। বেলাশেষের আলো পিছলে যাচ্ছে নারকেল গাছের পাতায়।

এক একদিন একটাই গান মনে আসে বার বার, শুধু সেই গানটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে হচ্ছে করে সারাদিন। সাগরেরও এই গানটা মনে

আসছে দুপুরের পর থেকে। সাগর মানঘরে ঢুকে গুনগুন করে গাওয়ার চেষ্টা করল, ‘আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায় পড়েছে কার পায়ের চিহ্ন’। বহুদিনের অনভ্যাস, মন সামান্য হলেও বিক্ষিপ্ত। গান তাই ঠিকমতো হচ্ছে না। ‘ভাঙা’ এবং ‘রাঙা’ শব্দদু’টি পরস্পর স্থান পরিবর্তন করছে বার বার। পারফেকশনিস্ট সাগর বিরক্ত হয়ে গান থামাল।

ভাল করে মন সেরে জিনস আর টি শার্ট পরে, সুগন্ধি মেখে বেরোনোর জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে নিল সাগর। তার পর বিদেশার ঘরে উঁকি মারল। ঘরে বিদেশা নেই। এই সময়টা সে ছাদে গিয়ে বসে থাকে। বিদেশার বইয়ের তাক থেকে খুঁজে খুঁজে ‘গীতবিতান’ বার করল। তার পর দ্রুত পায়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

পারিজাতদের বাড়িটা ছিমছাম, একতলা। বাড়ির জানলার পর্দা সন্দের দিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সন্দের হাওয়ায় পর্দা উড়ছে, বাড়ির ভিতরের আসবাব, দেওয়ালের যামিনী রায় গেষ্টের কাছ থেকেও স্পষ্ট দেখতে পেল সাগর।

সাগর আসামাত্র এ বাড়িতে ছুটোছুটি পড়ে যায়। পারিজাতের মা চা-জলখাবার বানাতে ছোটেন, পারিজাতের বাবা সাগরের পাশে বসে জমিয়ে আড্ডা দেওয়ার তোড়জোড় করেন। আজও তার ব্যতিক্রম হল না। পারিজাত ঘরে ঢুকে দেখল বাবা সাগরকে কোনও গভীর বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ করছে, বাধ্য ছাত্রের মতো মাথা নাড়ছে সাগর। পারিজাত জানে পুরোটাই ভড়ং, বাবার একটা কথাও সাগর মন দিয়ে শুনছে না।

পারিজাতকে দেখে চায়ে চুমুক দিয়ে অত্যন্ত কেজো স্বরে সাগর বলল, “পারিজাত, তুমি নাকি গীতবিতান চেয়েছিলে! এই নাও, বিদেশা পাঠিয়ে দিল।”

টেবিলের ওপর গীতবিতান রাখল সাগর। পারিজাতের ভুরু সামান্য কুঁচকেই আবার সোজা হয়ে গেল।

পারিজাতের বাবা একবার আলগা ভাবে বইটা হাতে তুলে আবার টেবিলে রেখে দিলেন, “পুঁই, তোদের জেনারেশন এখনও এই সব প্রিন্টেড মেটিরিয়াল পড়িস? আমি তো জানতাম আজকাল অনলাইনেই চাইলে গোটা রবিঠাকুরের ক্রিয়েশন পাওয়া যায়।”

সাগর হাসতে হাসতে বলল, “কিন্তু কাকু, রবিঠাকুর তো শুধু

শোনার বা পড়ার ব্যাপার নয়, অধিকাংশটাই অনুভব করার। ছাপার হরফের ওপর আঙুল রাখার যে থ্রিল, গীতবিতানের গন্ধ নাকে এলে যে ইউফোরিয়া হয়, সেটা ওই মোবাইল স্ক্রিনে কোথায়?”

পারিজাতের চোখ গোল গোল হয়ে গেল। তার সামনে এটা কে বসে রয়েছে? এই ছেলেটি কি সত্যিই সাগরদা!

পারিজাতের বাবা অবশ্য সহসা থামলেন না। তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ডেভিড ক্যামেরন আর বরিস জনসনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ শেষ না করে সম্ভবত থামবেন না। এই সময়েই তাঁর ফোন বেজে উঠল। তিনি ফোনের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললেন, “ওহ! অফিসের ফোন! বাড়িতেও রেহাই দেবে না। কেটে দিই, কী বলো সাগর?”

সাগর হাঁ হাঁ করে উঠল, “না না, কাকু! কাজ সবার আগে। আপনি ফোন ধরুন। আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।”

পারিজাতের বাবা ফোন ধরেছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে বিষয় গুরুতর, শেষ হতে সময় লাগবে। তিনি ফোন কানে সোফা থেকে উঠে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

পারিজাতের দিকে তাকিয়ে সাগর বলল, “পারিজাত, কিছু কথা বলতে এসেছি। তোমার কি একটু সময় হবে?”

সাগর এত নরম করে কথা বলার ছেলে নয়, পারিজাত সামান্য বিস্ময়ের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

সাগর দু’বার গলা ঝেড়ে নিয়ে বলল, “পারিজাত, সেই ছোটবেলা থেকে আমার ঘুম ভীষণ গাঢ়। যে কারণে আমি কোনও দিন স্বপ্ন দেখি না। অথচ লন্ডনে যাওয়ার পর থেকে ঘুম খুব ডিস্টার্বড হচ্ছে, বুঝলে?”

পারিজাতের বিস্ময় সীমা ছাড়াল। এ সব কী বলছে আজ সাগরদা? মাত্র চার মাস দেখেনি সে এই লোকটাকে, তাতেই সাগরদাকে রীতিমতো অচেনা মনে হচ্ছে তার।

সাগর এক বার পারিজাতকে দেখে নিয়ে বলল, “আর আসছে স্বপ্ন। স্বপ্ন যে আমার অপছন্দের তা নয়, কিন্তু ঘুমের বারোটা বেজে যাচ্ছে। একটা মেয়ের স্বপ্ন দেখছি পারিজাত। সেই মেয়েটা রোজ আমার স্বপ্নে এসে বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকো ভাসায়। এই সমস্যা তো বেশি দিন চলতে দেওয়া যায় না। সমস্যা সমাধান করতে হয় ইনিশিয়াল স্টেজে, না হলে সেটা ক্রনিক হয়ে যায়, তাই ভাবলাম একবার সেই মেয়েটার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন,” অনেক কষ্টে সাগর বলল, “একটা চিঠি আছে। অফিশিয়াল প্রয়োজন ছাড়া জীবনে প্রথম বার সেই মেয়েকে চিঠি লিখেছি। সেই মেয়েটি কে, তুমি কি জানো পারিজাত?”

প্রায় এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে চোখ বন্ধ করল সাগর। চোখ খুলে সে দেখল পারিজাত তার দিকে অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছে। সাগর উঠে পড়ল। ব্যস্ত স্বরে বলল, “চিঠিটা গীতবিতানের পাতার ভাঁজে আছে, তুমি পড়ে নিজের মত জানিয়ো। আমি আজ চলি।”

সাগর পিছন ফিরে চলে যাচ্ছিল, পারিজাত অস্ফুটে বলল, “আয়াম স্যার সাগরদা!”

সাগরের মনে হল সে ভুল শুনেছে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে পারিজাতের চোখে চোখ রাখল।

পারিজাত অকম্পিত স্বরে বলল, “সাগরদা, গত সপ্তাহে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। আগামী জানুয়ারিতে বিয়ে।”

সাগর স্থগুৎ দাঁড়িয়ে রইল, তার পর একটু সময় নিয়ে মৃদু হেসে বলল, “কনগ্র্যাটস! তা হু ইজ দ্য লাকি ম্যান?”

পারিজাত নিচু স্বরে বলল, “মৈনাক। তুমি এর কথা বিদিশার কাছে শুনেছ।”

“ওহ! দ্যাট রোজ-গাই! গ্রেট!” সাগর স্বগতোক্তির মতো করে বলল, “এত বড় খবর কেউ আমায় জানায়নি!”

“বিদিশা হয়তো জানাত। কিন্তু ও একটু ডাউন আছে আজকাল... মৈনাক আমাকে পাগলের মতো ভালবাসে সাগরদা, আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারিনি। একা তো জীবন কাটাতে পারব না। টু বি ফ্রাফ্র, মৈনাককে আমার অনেক স্টেবল মনে হয়েছে।”

সাগর চাপা গলায় গর্জনের মতো করল, “বাট ইউ লাভ মি, ড্যাম ইট! ওই কেরানিটার জন্য তুমি আমায় রিফিউজ করছ!”

পারিজাত মলিন হাসল, “সাগরদা, আমি তোমার ভবিষ্যতে হওয়া কোটি টাকার ডুপ্পে, বি এম ডব্লু বা ফরেন ডিগ্রিকে ভালবাসিনি কোনও দিন। আমি একটা একা একা গুমরে থাকা রাগী ছেলেকে ভালবেসেছিলাম, চেয়েছিলাম সে আমার চোখে পৃথিবীটাকে দেখুক। সে একটু প্রাণ খুলে বাঁচুক। কিন্তু সেই ছেলেটা সত্যিই আর বেঁচে নেই সাগরদা। ভালবাসা জানাতে এসে আজকেও তুমি তোমার ইগো নিয়ে ভাবছ! ট্রাস্ট মি, তুমি ক্লার্ক হলেও তোমাকেই ভালবাসতাম। তোমার মেটিরিয়াল অ্যাসেস্টগুলো আমাকে টানেনি কোনও দিন।”

সাগর দাঁতে দাঁত পিষে বলল, “গ্রেট! ইউ অ্যান্ড ইয়োর মিডিওকার মাইন্ড। ইউ ডিজার্ড দ্যাট ক্লার্ক অনলি। বাই! কিন্তু একটা কথা বলে যাই পারিজাত। সারাজীবন ওর মধ্যে আমাকে খুঁজবে তুমি, মিলিয়ে নিয়ো।”

পারিজাত গীতবিতানের দিকে হাত বাড়াতোই সাগর প্রায় ছোঁ মেরে বইটা নিয়ে নিল। পারিজাত বলল, “চিঠিটা নষ্ট করে ফেলো না সাগরদা। নিজের কাছে রেখো।”

“দ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস, ইউ...” সাগর নিজেকে সংযত করল। তার কান দিয়ে আঙুন ছুটছে। তার অহং চিরকালই পাহাড়প্রমাণ, নিজেই সেই অহংবোধ দিনের পর দিন লালন করেছে সাগর। সামনে বসা, ঘরোয়া সালওয়ার কুর্তি পরা এই সামান্য মেয়েটির সামনে আজ সেই অহংয়ের মিনার ছড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে। অথচ সাগর কিছুই করতে পারছে না।

পারিজাত নরম গলায় বলল, “তুমি কষ্ট পাচ্ছ সাগরদা। বাড়ি চলে যাও, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরো না।”

সাগর প্রায় ভিখিরির গলায় বলল, “কিছুই কি করা যায় না পারিজাত? আর এক বার ভেবে দেখো।”

পারিজাত শীতল স্বরে বলল, “তা হয় না সাগরদা। মৈনাক এক জন অসাধারণ মানুষ। তাকে কষ্ট দিতে পারব না। আর তা ছাড়া ফ্যামিলি, নেবার্স, সবাই জেনে গেছে, বিয়ের ডেট ফিক্সড...”

সাগর আর শুনল না, সে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল পারিজাতের বাড়ি থেকে।

পারিজাত তার পিছু পিছু দু’-চার কদম এল, প্রায় না শুনতে পাওয়ার মতো গলায় বিড়বিড় করল, “ভাল থেকে সাগরদা।”

হনহনিয়ে হাঁটছে সাগর। তার মাথার ভিতর অসহায় রাগ দপদপ করছে। মাথার রগ দুটো মনে হচ্ছে ছিঁড়ে যাবে। এত দিনের এত অর্জন, এত সাফল্য, সব কিছু যেন অর্থহীন মনে হচ্ছে তার। পারিজাত তাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে বারণ করেছিল বলেই হয়তো অনেক রাত পর্যন্ত রাস্তাতেই ঘুরে বেড়াল সাগর। কত ক্ষণ কোন পথে হেঁটেছে, তার কিছুমাত্র ধারণা নেই উদ্ভ্রান্ত সাগরের। এক সময় সে দেখল তার পথরোধ করে শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন দাঁড়িয়ে আছে। সাগর ধীর পায়ে স্টেশনে ঢুকল।

গভীর রাতে তার মাথা কিছুটা ঠান্ডা হল। তখন শান্তভাবে মোবাইল সুইচড অফ করল সাগর।

তবে সে বাড়ি ফিরে গেল না। জনসমাগম কম হয়ে গেলে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের সিমেন্টের চাতালে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। গীতবিতান যে কী চমৎকার মাথার বালিশ হতে পারে এ তার কল্পনাতেও ছিল না।

সাগর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আজ রাতটা সে এখানেই কাটাবে। কিছু পরে তার চোখে নিবিড় ঘুম নামবে। যে ভাবে সন্ধে নামে। একটু একটু করে তেনার আলো মুছে যাবে, আবছায়া সেই স্বপ্নে সাগর একটা ছোট ছেলেকে দেখবে। যে ছেলে স্কুলের জানলায় দাঁড়িয়ে কালো মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকে, আর দেখে গাছের ডালে নাম না জানা এক হলদে পাখি।

আজ রাতে সেই ছেলেরা কাছে সাগরকে পৌঁছেতেই হবে।

রাস্তায় নেমেই ভদকাই বুঝল আজ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। তা পড়ুক। ভদকাইয়ের তাতে কোনও সমস্যা নেই। যে জ্বালায় সে জ্বলেপুড়ে মরছে,

তার কাছে এই শীতের জ্বালা কিছু নয়।

গভীর রাতে পথ হাটছে ভদকাই। শীতের থেকে অনেক বেশি সমস্যা রাস্তার আলোগুলো। ভদকাইদের কমবয়সে এই অঞ্চলের রাস্তাঘাট অন্ধকারে ডুবে থাকত। অপরাধের পাখি ডানা মেলত সেই অন্ধকারে। সন্দের দিকে এ সব এলাকা ছিল উঠতি ছেলেমেয়েদের মুক্তকচ্ছ। দু’-একটা লাইটপোস্টে পুরসভা আলো লাগিয়ে দিয়ে যেত, সেগুলোও বেশিদিন টিকত না। প্রেমিক-প্রেমিকার দল ঢিল ছুড়ে সেই ল্যাম্প ভেঙে চুরমার করে দিত। ভদকাই নিজেই এক বার...

ভদকাই মাথা নাড়ল, আজকের দিনে পুরনো কথা সে ভাবতে চায় না। আজকের দিনটা তার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগামী কয়েক ঘণ্টায় যা ঘটবে, তার ওপর ভদকাইয়ের বাকি জীবনের গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হতে চলেছে।

ভদকাইয়ের পিঠে একটা ছোটখাটো বস্তা। জিনিসে ঠাসা। এমন সব যন্ত্রপাতি, যেগুলো তার পেশায় অনবরত কাজে লাগে। স্কু-ডাইভার, ছেনি-বাটালি, হাতুড়ি, নাইলনের দড়ি আর ছোট সাইজের শাবল। বস্তার এক কোণে এক বোতল কড়া অ্যাসিড আর ছোট শিশিতে ক্লোরোফর্ম। আর আছে কয়েক জোড়া গ্লাভস আর মুখোশ-টুপি।

ল্যাম্পপোস্টগুলোর আলো ঘিরে জমাট কুয়াশা, আলো বেশি দূর ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। মনে হচ্ছে সারারাত জ্বলবেও না। ভদকাইয়ের জীবনের মতোই অনিশ্চিত আলো।

ভদকাই তখন অনেক ছোট। আট কি নয় বছর বয়স। তাদের গ্রামের ছোট বাড়ির পিছনে বাঁশবাগান ছিল একটা। তার ও পারে পদ্মদহের প্রকাণ্ড বিল। বিলের মাঝ বরাবর একটা চর জেগে উঠেছিল। এ পার থেকে সেই চর স্পষ্ট দেখা যেত না, ছায়া-ছায়া কুয়াশা-কুয়াশা ব্যাপার একটা। ছোট ভদকাই নিজের কল্পনায় সেই জঙ্গলময় অন্ধকার জায়গাকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছিল। ছেলেবেলায় ভদকাইয়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল হাবুমামা। সেই মামা একদিন একটা ডিঙি জুটিয়ে বলল, “চল ভদকাই, চর দেখিয়ে আনি তোকে।”

মুহূর্তের উৎসাহে লাফিয়ে নৌকায় উঠে বসেছিল ভদকাই, কিন্তু চর যত এগিয়ে আসতে লাগল তত ভদকাইয়ের মনের অজানা ভয়ও আঁটপুটে ঘিরে ধরতে লাগল তাকে। সে ভয়ানক স্বরে বলল, “ও মামা, ফিরে চলো।”

হাবুমামা দাঁড় বাইতে বাইতে হাসল, “কেন রে পাগলা, ভয় পেলি নাকি রে।”

চরের কাছাকাছি এসে ভদকাই প্রায় দড়ি ছেঁড়া হয়ে উঠল। কিছুতেই সে চরে যাবে না। তার লাফালাফিতে খুদে ডিঙি প্রায় উল্টে যায় যায়। চরম বিরক্তি নিয়ে নৌকোর মুখ ঘুরিয়েছিল হাবুমামা, গজগজ করতে করতে বলেছিল, “তোকে নিয়ে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে। কী আশ্চর্য! ঘরের এত কাছে একটা জায়গা, সেটা কেমনতর তা তুমি দেখবা না! কদিন না দেখে থাকিস আমিও দেখবা। এক দিন না এক দিন তো যেতেই হবে।”

তার পর এত বছর কেটে গেছে। ভদকাই গ্রাম ছেড়ে শহরে এসেছে, টোটে চালিয়েছে, তোলা তুলেছে, খারাপ পাড়ায় রাত কাটিয়েছে... হেন অসামাজিক কাজ নেই, যা সে করেনি। বলতে গেলে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে ভদকাই। তবু হাবুমামার বলা কথাগুলো এখনও তার কানে বাজে, মনে হয় এই সে দিনের কথা। গ্রামের সেই নিশ্চিত দিনগুলো ফিরে পেতে ইচ্ছে করে আবার। কিন্তু সে পথ বন্ধ। আপাতত ভদকাই এক জন পালিয়ে বেড়ানো লোক। পুলিশের থেকে তো বটেই, নিজের গ্যাং-এর লোকদের থেকেও পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে।

যে দিন আফজল খানের লোকেদের হাতে বেদম মার খেল ভদকাই, সে দিনের পরেও বেশ কয়েক বার তার লোকেরা ভদকাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তারা ভদকাইকে রীতিমতো ধমকে গেছে। সবচেয়ে সমস্যা পাকাচ্ছে ট্যাবলো, তার মারমুখী ভাব দেখে মনে হচ্ছে পান থেকে চুন খসলে সে ভদকাইয়ের বুক বুলেট দেগে দেবে। এই ধমকানির কাজ এক সময় ভদকাই নিজে করত। এখন ছবি পাল্টে গেছে। দীর্ঘদিন কাজ করার ফলে এই ছমকিগুলোর ভিতরের বয়ান ভদকাইয়ের কাছে

পরিষ্কার। ফলে তার দৃষ্টিস্তা আরও বেড়েছে।

তাদের কথায় ভদকাই বুঝেছে, আফজল খানের কাছে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ভদকাই দেখেছে প্রয়োজন ফুরালে আফজল খান সেই লোকের দিকে ভাল করে তাকায় না পর্যন্ত, দলের সবাই কুকুর বেড়ালের মতো আচরণ করে, ভাগ-বখরা কমিয়ে দেওয়া হয়, একদিন সেই লোক নিজেই মানে মানে সরে পড়ে। কিন্তু ভদকাইকে এত সহজে আফজল খান ছাড়বে না। সে ভিতরের খবর জানে, তার উপর সে এখন পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়ান্টেড, তাই তাকে ধরতে পারলে গ্যাং-এর গোপন খবর বার করা পুলিশের পক্ষে কঠিন কিছু হবে না।

আফজল খানের লোকেরা বলে গেছে ভদকাই যেন এই ঘর ছেড়ে এক বারের জন্যও বাইরে না যায়। ও দিকে ডালিম নাকি আফজল খানের লোকেরের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে, কিছুতেই তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যত দিন না তার খোঁজ পাওয়া যাবে তত দিন এ ভাবেই লুকিয়ে কাটাতে হবে ভদকাইকে।

আর যদি ডালিমকে না পাওয়া যায়, হয়তো আফজল খানের লোকেরা ভদকাইকে পুরোপুরি সরিয়ে দেবে।

এরই মধ্যে অবশ্য জোনাকি দু’বার এসেছিল। মনিবের বাড়ি ডাকাতির কথা বলায় সে অনেক দিন কথা বলেনি ভদকাইয়ের সঙ্গে। পরে ভদকাই প্রতিজ্ঞা করেছে যে, সোনার তরীর দিকে সে চোখ তুলে তাকাবে না। এই যে ভদকাই খেয়ে পরে বেঁচে আছে সে তো জোনাকিরই পয়সায়। জোনাকি না থাকলে যে ভদকাইয়ের কী হত!

তবু তো জোনাকি জানে না, ভদকাইয়ের মনে কী আছে। আজ ভদকাই বেরিয়েছে, সোনার তরী-র দেবীমূর্তি না নিয়ে সে ফিরবে না। জোনাকি মেয়েটা বোকা, কথায় কথায় বাড়ির হাজার খুঁটিনাটি সে বলে ফেলেছে ভদকাইকে। বেচারি বুঝতেও পারেনি ভদকাইয়ের ছক কষতে কত সুবিধে হয়েছে জোনাকির দেওয়া তথ্যের জন্যই।

সময়টাও সে রকমই বেছে নিয়েছে ভদকাই। কে ক’টার সময় ঘুমের ওষুধ খায়, কে কোন ঘরে ঘুমায়, সব কিছুই ভদকাইয়ের নখদর্পণে। বাধা আসতে পারে শুধু ওই দারোয়ানটার কাছ থেকে। মুচকি হাসল ভদকাই। শালা বুড়ো ভাম আবার কাঁধে বন্দুক! রুমালে ক্লোরোফর্ম মিশিয়ে মুখে চেপে ধরলেই জারিজুরি শেষ।

ভগবতী পার্কের দিকটায় রাস্তাঘাটে সি সি টি ভি বসে গেছে, শালা নতুন ফ্যাকড়া। অনেকটা ঘুরে প্রফুল্ল কাননের সামনের সড়ক রাস্তা দিয়ে সোনার তরী-র সামনে এসে দাঁড়াল ভদকাই। গোটা বাড়ি অন্ধকারে ঢাকা, গভীর রাতে সোনার তরী-কে ভৌতিক মহলের মতো দেখাচ্ছে। মন্দিরের পাশে একটা ছোট আলো জ্বলছে শুধু।

চোখে চোখে পাঁচিলের মাপ নিয়ে নিল ভদকাই। পিঠে বস্তা নিয়েও দিব্যি এক লাফে পেরিয়ে যেতে পারবে সে।

কিন্তু পাঁচিল পেরনো ভদকাইয়ের হল না। সে দেখল সামনের মোড় ঘুরে একটা কালো এসইউভি এগিয়ে আসছে তার দিকে। গাড়িটার গতি এতে বেশি যে, নড়াচড়ার সময়টুকুও পেল না ভদকাই। হেডলাইটের তীব্র আলোয় তার চোখ ধাঁধিয়ে গেল।

তীব্রবেগে ভদকাইয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পিছনের জানলার কাচ সামান্য নামল। অস্পষ্ট অথচ তীক্ষ্ণ শব্দ হল দু’বার। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে সামনে ডান দিকে বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

শব্দটা ভদকাইয়ের চেনা। সাইলেন্সার লাগানো রিভলবার। দু’বার কঁপে উঠল ভদকাইয়ের শরীরটা। সে দেখল তার কাঁধ আর বুক ভেসে যাচ্ছে রক্তের ধারায়। ব্যথা শুরু হল কয়েক মুহূর্ত পরে। তীব্র যন্ত্রণা! ভদকাই আছড়ে পড়ল রাস্তায়। শরীর জুড়ে অজস্র কীট দংশন। নিঃশ্বাসটুকু পর্যন্ত ঠিক করে নিতে পারছে না সে।

মাটিতে বুক টেনে টেনে কিছুটা এগিয়ে সোনার তরী-র লোহার গোটটা আঁকড়ে ধরল ভদকাই। সে বুঝল অতি দ্রুত সে চেতনা হারাতে চলেছে। চোখের সামনে মায়ের মুখটা ভেসে উঠল এক বার, ছেলেবেলার হাসিখেলার দিনগুলো, আবহা সুখের স্মৃতি... আচমকাই যেন এক বার হাবুমামাকে দেখতে পেল ভদকাই, মামার মুখে নির্মল হাসি— ‘এক দিন না এক দিন তো যেতেই হবে ভদকাই...’

পুরো পৃথিবী আঁধারে ঢেকে যাওয়ার আগে ফুসফুস নিংড়ে শেষ শব্দটা বেরিয়ে এল তার, “জোনাকি-ই!”

জোনাকি ধড়মড় করে উঠে বসল বিছানায়।

“কে! কে ডাকে! কে ওখানে?”

তার বিছানার চার পাশে জমাট বাঁধা অন্ধকার। অন্ধকার কোনও উত্তর দিল না।

জোনাকি আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। স্বপ্ন দেখল নাকি! কিন্তু কী আশ্চর্য জীবন্ত গলার স্বর। ঠিক যেন মানুষটা কানে কানে তার নাম ধরে ডাকল। জোনাকি পাশ ফিরে শুল। কিন্তু তার ঘুম এল না। কিছু ক্ষণ এ পাশ ও পাশ করার পর উঠেই পড়ল জোনাকি। একতলায় বৈঠকখানার পাশের ছোট ঘরটায় শোয় সে।

পায়ে পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। গোটা পাড়া আর পুরো বাড়ি গভীর ঘুমে ডুবে আছে। দূরে কোথাও দু’-একটা কুকুর ডাকছে মাঝে মাঝে। বাকি জগৎ-সংসার নিস্তব্ধ। দু’-এক বার টানা বারান্দায় পায়চারি করে ঘরের ভিতর ঢুকে যেতে গিয়েও থমকে গেল জোনাকি।

আধো অন্ধকারে সে দেখল, মেন গেটের সামনে বড়সড় একটা কিছু পড়ে রয়েছে। জোনাকি পা চেপে চেপে সে দিকে এগিয়ে গেল। খুব কাছে যেতে হল না। জিনিসটা একটা মানুষের শরীর। সেই শরীরও খুব চেনা।

কয়েক মুহূর্তের জন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল জোনাকি। সরাসরি ভদকাইয়ের ওপর হামলে না পড়ে জোনাকি পিছন ফিরে উর্ধ্বাঙ্গে ছুট লাগল। সে জানে তাকে কোথায় যেতে হবে। তিরবেগে বাড়িতে ঢুকে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কয়েক সেকেন্ডেই দোতলায় পৌঁছে গেল জোনাকি। তার পর ছড়মুড় করে মহাশ্বেতার ঘরে ঢুকে প্রায় আছড়ে পড়ল মহাশ্বেতার ওপর, “বড়মা, বড়মা! তাড়াতাড়ি ওঠো! ওঠো, ওঠো, তাড়াতাড়ি ওঠো!”

মহাশ্বেতার ঘুমন্ত শরীরটাকে দু’হাতে প্রায় উন্মাদের মতো বাঁকাতে লাগল জোনাকি।

ভদকাইকে শোওয়ানো হয়েছে জোনাকির ঘরের বিছানায়। তার জ্ঞান যাচ্ছে আর আসছে। যত ক্ষণ জ্ঞান আসছে তত ক্ষণ প্রবল ব্যথায় ছটফট করছে। জোনাকির বিছানা রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

মহাশ্বেতা ভদকাইয়ের পাশে বসে আছেন। তাঁর মুখচোখ বেশ গভীর। মাঝে মাঝে তিনি ভদকাইয়ের পালস দেখছেন। ঘরময় ফোন কানে অস্থির পদচারণ করছে সাগরনীল। সে এই নিয়ে অষ্টম জায়গায় ফোন করল, খুব তাড়াতাড়ি হলেও দু’ঘণ্টার আগে কেউ অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে পারবে না।

সাগর হতাশ হয়ে ফোন রেখে বলল, “এটা একটা সভ্য দেশ! কেউ একটা এমার্জেন্সি মেডিক্যাল হেল্প পর্যন্ত দিতে পারছে না! আবার বলছে, নিজেদের গাড়িতে নিয়ে চলে আসুন, আমরা সার্ভিস দেওয়ার জন্য সবসময় রেডি থাকি, স্যার!”

সাগর রাগ গোপন করতে পারছে না। একটু আগে মহাশ্বেতা তাকে ডেকে তুলেছেন। জোনাকির সঙ্গে গিয়ে মেন গেটের সামনে থেকে ভদকাইকে সে নিজেই তুলে এনেছে। কিন্তু কোথাও অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যাচ্ছে না। এর নাম এ ওয়ান সিটি! এর নাম নিউ ইন্ডিয়া! এই পরিবারে এক জন নয়, দু’জন ডাক্তার। তাদের যদি এই অবস্থা হয় সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়!

মহাশ্বেতা শীতল স্বরে বললেন, “পেশেন্টকে রাখা যাবে না পাপান, হি ইজ সিক্কিং!”

জোনাকি শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সাগর ভুরু কঁচকে তাকাল, “এখন কেঁদে করবিটা কী? বরটা যখন চোখের সামনে খারাপ লাইনে চলে গেল, তখন কি চোখে ঠুলি পরে ছিলি! সিলি ওয়ান!”

মহাশ্বেতা হাতের ইশারায় সাগরকে থামিয়ে দিলেন, “এখন ও সব কথা বলার সময় নয় পাপান!”

নিজের মোবাইল এগিয়ে দিয়ে বললেন, “এখানে দুটো পুরসভার

অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসের নাম্বার আছে, ট্রাই করে দেখো!”

সাগর সেই নাম্বারও ডায়াল করল, এক জায়গায় ফোন কেউ তুলল না, অন্য জায়গায় ঘুম জড়ানো চোখে এক জন বলল, “সকালে ফোন করুন, অফিসে এখন কেউ নেই...” বলেই ফোন কেটে দিল।

মহাশ্বেতা বললেন, “দু’ঘণ্টা আন-অ্যাটেন্ডেড রাখা যাবে না। দুটো গুলি লেগেছে, একটা রাইট ফোর্থ রিব-এ, আর একটা সুপ্রাফ্যাক্টিকুলার এরিয়ায়, শোল্ডার ঘেঁষে... অনেকটা মাংস উড়ে গেছে। ভয় হচ্ছে লাংস অবধি ড্যামেজ হয়েছে কি না! এক বার চেষ্টা করে দেখবি নাকি পাপান!”

সাগর প্রায় আঁতকে উঠল, “কী! কী বললে তুমি! পাপান হয়ে গেছে নাকি! ইটস অ্যান এমার্জেন্সি! মোস্ট প্রোবাবলি একটা পুলিশ কেস। গানশট ইনজুরির কেস পুলিশকে ইনফর্ম না করে, স্টেটমেন্ট না নিয়ে, নিজে হ্যান্ডল করব? তাও কোনও ইনস্টিটিউশনাল সাপোর্ট ছাড়া!”

“সে সব পরে দেখা যাবে। আপাতত, সেভ দ্য পেশেন্ট!”

সাগরনীল বিরক্তি চেপে সংযত স্বরে বলল, “তা হয় না ঠাম্মি। ছেলেটা এক্সপায়ার করলে আমার লাইসেন্স ক্যানসেল হয়ে যাবে, ভিসা বাতিলও হতে পারে। তুমি জানো ও দেশের নিয়ম কত স্ট্রিক্ট!”

“তাও তো ঠিক,” মহাশ্বেতা চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়লেন, “আচ্ছা পাপান, আমার আলমারিতে পুরনো কিছু সার্জিকাল ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল না? তুমি তো নেড়েচেড়ে দেখেছিলে এক বার। মনে আছে?”

“আছে। কেন?”

“বট করে নিয়ে এসো তো!”

“মানে? কী করবে?”

“তুমি আগে নিয়ে এসো, দেরি কোরো না, যাও!”

সাগর ইনস্ট্রুমেন্ট বক্স নিয়ে এসে বিছানার ওপর শব্দ করে রাখল, মহাশ্বেতার মতিগতি সে বুঝতে পেরেছে। সাগর রাগত স্বরে বলল, “কাজটা ঠিক হচ্ছে না ঠাম্মি, তুমি অসুস্থ, হাত কাঁপছে, পারবে না।”

মহাশ্বেতা বক্স খুললেন।

ছোটখাটো নার্সিং হোমে মাঝে মাঝেই অপারেশন করতে হত, সেই সময়ে কর্পোরেট হাসপাতালের এমন রমরমা ছিল না। নিজের কিছু সার্জিকাল ইনস্ট্রুমেন্ট রেখে দিতেন কাছে সব সময়। কত বছর পরে যে হাত পড়ল এগুলোয়! অথচ এক সময় নিজের শরীরের অংশ মনে হত এদের। নাইফ, স্ক্যালপেল, আর্টারি হোল্ডিং ফোরসেপ... আশ্চর্যজনক ভাবে একটা বুলেট হোল্ডিং ফোরসেপও থেকে গেছে। সামান্য স্মৃতিকাতর হলেন তিনি, পরমুহূর্তে অবশ্য সামলে নিলেন নিজেকে। কেজো গলায় তিনি বললেন, “আমার লাইসেন্স ক্যানসেল হলেও আর কিছু যায় আসে না। তুমি এগুলো একটু স্টেরিলাইজ করো পাপান, ছেলেটাকে বাঁচানো এখন সবচেয়ে বেশি জরুরি। জোনাকি, এখান থেকে চলে যা। অনেক রক্ত বেরোবে, তুই দেখতে পারবি না।”

জোনাকি তবু গেল না। ঘরের এক কোণে দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঠায় বসে রইল।

সাগর যন্ত্রপাতি নিয়ে গজগজ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যন্ত্রপাতি সবই স্টেরিলাইজ করে আনল অল্প সময়ের। সাগর বলল, “আমি চললাম, এই কাজ আমি চোখের সামনে বসে দেখতে পারব না।”

মহাশ্বেতা শুনেও শুনলেন না, তিনি স্ক্যালপেল নিয়ে পাঁজরের কাছের চামড়া তুলতে শুরু করেছেন। ছেলের কপাল ভাল, গুলি পাঁজরে লেগে আটকে আছে, পুরোটা পিয়ার্স করেনি। দুই পাঁজরের মাঝখান দিয়ে ঢুকলে হার্ট ছাঁদা হয়ে যেত।

খুব সাবধানে প্রথম বুলেটটা বার করলেন মহাশ্বেতা।

এই সময় ভদকাইয়ের শরীরটা কেঁপে উঠল। মহাশ্বেতা বললেন, “জোনাকি দাদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার ফ্যামেসি থেকে যতটা পারিস তুলো আর গজ নিয়ে আয়। আর পাপান, আমার ওষুধের মধ্যে দ্যাখ ভ্যালিয়াম ইনজেকশন আছে। এখুনি পেশেন্টকে ইনজেক্ট কর। এত ব্যথা নিতে পারবে না।”

জোনাকি সদর দরজা খুলে এক ছুটে বেরিয়ে গেল।

সাগর সহ্যের শেষ সীমায় চলে গেছিল। সে চিৎকার করে উঠল, “পারব না, কিচ্ছু পারব না। একটা ট্রেসপাসার, একটা ক্রিমিনাল, তার

জন্য এই সব করছ তুমি! লোকটা মরে গেলে কী হবে ভাবতে পারছ?”

“চেষ্টা না পাপান। বাকিরা জেগে গেলে কাজ করা যাবে না।”

“তুমি পাগল হয়ে গেছ ঠান্মি, যা পারো করো। জাস্ট কিপ মি আউট অব ইটা।”

সাগর সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে গেল, ঠান্মির ওষুধের বাক্স থেকে ভ্যালিয়াম নিল আর ঘরে এসে ভদকাইয়ের হাতে পুশ করল ইনজেকশন। গোটা কাজটা হল এক মিনিটেরও কম সময়ে। বাকি সময়টা সে ঠান্মির পাশ থেকে উঠল না।

মহাশ্বেতা কাঁপা কাঁপা হাতে কলার বোনের ওপরে ইনসিসন করলেন। অনেকটা মাসল কেটে বাদ দিতে হল, গুলিটা বিচ্ছিন্নি ভাবে ঢুকে গেছিল। সাগরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে ক্রমাগত ভদকাইয়ের ভাইটালস চেক করছে। ছেলোটার প্রেশার একেবারে ফল করে গেছিল, পরে অবশ্য সামলে নিল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল, দ্বিতীয় বুলেট টেনে বার করে মহাশ্বেতা বললেন, “ড্রেসিং করো। অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত ব্রিডিং আটকে রাখতে হবে।”

অ্যাম্বুলেন্স এল ভোর পাঁচটায়। মহাশ্বেতার ছাত্রের নার্সিং হোম, মহাশ্বেতা প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে রাখলেন। ছাত্র নিশ্চিত করল, ছেলোটি বেঁচে গেলে আইনি জটিলতা অন্তত সামলাতে হবে না।

জোনাকি সঙ্গে গেছে। অ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে সে উদাস চোখে তাকিয়ে আছে ভদকাইয়ের দিকে। ইনজেকশনের প্রভাবে ঘুমন্ত ভদকাই। এ জোনাকিকে ছেড়ে অন্য মেয়েমানুষের ঘরে রাত কাটিয়েছে, এর জন্যই জোনাকিকে সইতে হয়েছে অকথ্য সামাজিক গ্লানি... শুধু কি তাই! এ বারেও তো কথা দিয়ে কথার খেলাপ করল ভদকাই। তবুও জোনাকি অনুভব করল ভদকাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে তার খরাপ লাগছে না। এই মুখের দিকে তাকিয়ে সে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

মহাশ্বেতা অত্যন্ত বেশিরকম অসুস্থ বোধ করছেন। সাগর তাঁকে ধরে ধরে নিজের ঘরে নিয়ে গেল। জীবনে কখনও এই অলৌকিক রাত ভুলতে পারবে না সাগর। একটা আধমরা মানুষের প্রাণ বাঁচানো হল, অথচ বাবা-মা-বোন কারও ঘুমই ভাঙল না।

মহাশ্বেতা বিছানায় শুয়ে ক্ষীণস্বরে বললেন, “পাপান, ইনহেলারটা দাও, ব্রিডিং ট্রাবল হচ্ছে।”

সাগর ইনহেলার দিল, বার কয়েক বড় করে ইনহেল করে আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইলেন মহাশ্বেতা। তাঁর ক্লান্ত লাগছে, গভীর অবসন্নতা কাটিয়ে তিনি বললেন, “ছেলেটা মনে হয় বেঁচে যাবে, কী বলা?”

সাগর উত্তর দিতে পারল না। সে ভাবছিল অন্য কথা। কেনই বা সে হঠাৎ দেশে ফেরার কথা ভেবেছিল! পারিজাত তাকে অলীক টানে টানছিল এ কথা ঠিক, কিন্তু দেশে ফিরে সাগর হয়তো বা নিজেকে খুঁজে পেল। একটা ছোট্ট আপনভোলা ছেলেকে খুঁজে পেতেই সম্ভবত তার দেশে ফেরার খুব দরকার ছিল। সে আসলে অতি ক্ষুদ্র এক জন মানুষ, লাখ লাখ মানুষের ভিড়ে মিশে জীবন কাটানো আর একটা মানুষ, তাদের মধ্যেই তার জন্ম, তাদের মধ্যেই মিশে ফুরিয়ে যাওয়া তার নিয়তি। এর বাইরের বাকিটুকু শুধুই খোলস। এই সত্যটুকু বোঝানোর জন্যই কি অদৃষ্ট তাকে দেশে টেনে এনেছিল!

সাগর ঠান্মির হাত নিজের মুঠোয় নিল, “স্যরি ঠান্মি, রিয়েলি স্যরি।”

মহাশ্বেতা ক্লান্ত স্বরে বললেন, “ছোটবেলা থেকে নিজের হাতে তোমাকে গড়েছি সাগর, তুমি ভাল, মন্দ যাই হও না কেন, তার দায় আমি এড়াতে পারি না। আমি আর বেশি দিন নেই সাগর, হাতে সময় খুব কম। যে দেশেই থাকো, যত উন্নতিই করো, মানুষকে কখনও ভুলো না। তাদের দুঃখে যেন চির দিন তোমার চোখ ভিজে ওঠে। অনেক বড় হও। সাগরের মতো হও, বিশাল...গভীর...”

এই কথা বলে মহাশ্বেতা বিছানায় শরীর এলিয়ে দিলেন। কিছু পরে তিনি সাগরের দিকে তাকালেন। সাগর হাতের মুঠোয় তাঁর হাত নিয়ে নিজের মুখ ঢেকেছে। মহাশ্বেতা বুঝলেন সাগর নিঃশব্দে কাঁদছে। মহাশ্বেতার শীর্ণ হাত ভিজে যাচ্ছে সাগরের কান্নায়।

॥ ১৪ ॥

অয়ন লেকের ধারে বসে আছে।

মাঝে মাঝে মাটি থেকে ছোট ছোট ঢিল, পাথর কুড়িয়ে জলে ছুড়ে ফেলছে। গুবগুব শব্দ করে সেগুলো ডুবে যাচ্ছে জলে।

সময়টা সন্ধেবেলা। এই সময়টা সাধারণত অয়ন বেশ ব্যস্ত থাকে। আজ তার কোনও ব্যস্ততা নেই। টিউশন ক্লাসে সে আজ ছুটি ঘোষণা করেছে। এমনটা আজকাল হামেশাই হচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ টিউশন ক্লাস বন্ধ থাকছে। কখনও কখনও অয়ন আগে থেকে ছাত্রদের কিছু জানাচ্ছে না পর্যন্ত। টিউটোরিয়ালের বাঁপ বন্ধ দেখে ফিরে যাচ্ছে তারা।

অয়ন জানে এ ভাবে চলতে পারে না। কম্পিটিশনের যুগ। বেশি দিন এ রকম চলতে থাকলে ছাত্ররা নতুন মাস্টার খুঁজে নেবে। তবু কোনও কিছুতে মন বসাতে পারছে না অয়ন। মাঝেমাঝেই এ ভাবে পালিয়ে আসছে সব কিছু থেকে।

সে দিনের পর থেকে সোনার তরী-তে আর পা রাখেনি অয়ন। তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল বিদিশা তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। তেমন কিছুই ঘটেনি। তিন চার দিন কেটে যাওয়ার পর নিজেই ফোন করেছিল অয়ন। এক বার... দু’ বার...তিন বার, কোনও বারেই ফোন তোলেনি বিদিশা।

গভীর অভিমানে আর যোগাযোগ করেনি অয়ন নিজেও। বিদিশা যা চাইছে তাই হোক। যে দিন নিজে থেকে বিদিশার বাড়ির লোকদের সামনে গিয়ে সত্যিটা বলার সাহস করতে পারবে, সে দিনই যাবে অয়ন। তার আগে নয়। থাকুক বিদিশা তার ইগো নিয়ে। ভালবাসার মানুষের সামান্য দুর্বলতার দিকে যদি নরম চোখে না তাকানো যায়, তবে তা কিসের ভালবাসা!

বিদিশা যোগাযোগ না করলেও কয়েক বার ফোন করেছিল পারিজাত। তার গলা উদ্বিগ্ন শোনা, “অয়নদা! কেমন আছেন?”

অয়ন মৃদু হেসেছিল, সেই হাসির আবছা শব্দ ফোনের ও পারে শুনেছিল পারিজাত, “অয়নদা, বিদিশাও ভাল নেই, একদম ভাল নেই। খাওয়া দাওয়া করে না, রাতে চোখে ঘুম নেই। সারাদিন জ্বাশির মতো এ ঘর ও ঘর করে বেড়ায়। ওর দাদা লন্ডন ফিরে যাওয়ার পর আরও একা হয়ে গেছে।”

অয়ন বলেছিল, “আমি কী করতে পারি? আমার কোনও কথা তো সে শুনবে না। ফোন করেছিলাম, কত কত মেসেজ...”

“কিন্তু তার পর তো আপনিও চুপচাপ হয়ে গেছেন। এত সহজে হাল ছাড়লে চলে?”

“একটু সময় দাও, সব ঠিক হয়ে যাবে।”

পারিজাত কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, “মুশকিলটা হল, আপনারা দু’জনেই ভীষণ ইন্ট্রোভার্ট, তার উপর সমান অভিমানী। এই জন্য বলে বিপরীত মানসিকতার মানুষের মধ্যে মিল বেশি হয়।”

অয়ন দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেলে, “তোমার খবর বলো পারিজাত। বিয়ের ডেট ফাইনাল হল? কেমন আছ তোমরা?”

“এ দিকেও অবস্থা একই। আমি আর মৈনাক দু’জনেই সমান বাচাল। দেখা হলেই কে বেশি কথা বলবে তার কম্পিটিশন চলতে থাকে। আমি যদি কখনও রাগ করি, সে এমন জোকারের মতো করবে যে, বেশি ক্ষণ গভীর হয়ে থাকতেই পারি না। এমন লোকের ওপর রাগ করে থাকা যায় বলুন? তাই ঝগড়াঝাটিও হয় খুব কম।”

অয়নের সামান্য অদ্ভুত লাগে। বিদিশার কাছে সে শুনেছিল সাগরদার প্রতি পারিজাতের এক আশ্চর্য অথচ প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সেই মেয়ে এত দ্রুত পাল্টে গেল! নাকি কিছুই পাল্টায় নি, সাগরদার জন্য চিরদিনই হয়তো পারিজাতের মনে একটা আলাদা কুঠুরি থেকে যাবে। মৈনাক পারিজাতের সমস্তটা পেলেও হয়তো সেই ছোট্ট কুঠুরিটার চাবি খুঁজে মরবে আজীবন। কে জানে!

তবু অয়নের ভারী ভাল লাগে। তার কাছাকাছিই এমন যুগল রয়েছে যারা রাগারাগি, মান-অভিমান না করে হাসিতে খুশিতে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে, এই অদ্ভুত সুন্দর চিন্তাটুকুই তার মন ভাল করে তোলে।

পারিজাত বলে, “অয়নদা, টপিক কিন্তু অন্য দিকে ঘুরে যাচ্ছে। প্লিজ আপনি এক বার ও বাড়িতে যান। বিদিশাকে আমি অনেক দিন চিনি। আপনাকে সামান্যসামনি দেখলেই ও গলে জল হয়ে যাবে, কী ভাল যে সে আপনাকে বাসে অয়নদা...”

কিন্তু অয়নের যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

আজ এই সন্ধে নামার মুখে লেকের ধারে বসে অয়ন বুঝল বিদিশার জন্য সাঙ্ঘাতিক মন কেমন করছে তার।

কদিনই বা হয়েছে, দীপাবলির সন্ধেবেলায় এই লেকের ধারেই নিজেদের মতো করে আড়াল খুঁজে নিয়েছিল ওরা। সন্ধের অন্ধকার গাঢ় হতেই অয়নের ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দীর্ঘ ক্ষণ আদর করেছিল বিদিশা। তার পর বলেছিল, “বিয়ের পরেও দীপাবলির সন্ধেগুলোয় এ ভাবেই সবার কাছ থেকে পালিয়ে লেকের ধারে এসে বসব আমরা, এভাবেই বাজির আলোয় আকাশ ভরে যাবে, দু’জন চুপচাপ বসে দেখব...” বলতে বলতে আকাশের দিকে আঙুল তুলেছিল বিদিশা, “দেখো দেখো, কী সুন্দর!”

আকাশ আশ্চর্য ছটায় ভরে গেছিল কোনও বিচিত্র আতশবাজির আলোয়। সেই আলো বিদিশার মুখে পড়ে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছিল! বিদিশা অয়নের বুকে মাথা রেখে বলেছিল, “অয়নদা! তোমার বুকের ভিতর একটা রেলগাড়ি আছে, জানো! একেবারে রাজধানী এক্সপ্রেস!”

অয়নের মাথা ঝিমঝিম করছিল। তার পছন্দের নারী, এই সুগন্ধী শরীর, এই অকূলপাথর ভালবাসা... হে ঈশ্বর! পৃথিবীটা এত সুন্দর!

আজ বিদিশা নেই অয়নের পাশে। আর কোনও দিন থাকবে কি না তাও অয়ন জানে না। লেকের আশেপাশের বহুতলগুলোয় আলো জ্বলে উঠছে, স্পষ্ট হচ্ছে স্ট্রিট ল্যাম্পের আলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অয়ন উঠে পড়ল।

অয়ন যখন বাড়ি ফিরল তখন সন্ধে প্রায় রাতে মিশতে চলেছে। বাবার অফিসঘর যথারীতি জমজমাট। অম্বরীশ রায়চৌধুরী বসে আছেন নিজের বড় অফিস-চেয়ারে, তাঁর সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে তিন-চার জন ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বসা, তাঁদের সামনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ।

অম্বরীশ চশমার উপর দিয়ে এক বার অয়নের বাড়ি ফেরা দেখেই আবার কাজে ডুবে গেলেন।

অয়ন নিজের ঘরে ঢুকে দেখল বিছানার পাশের টেবলে একটা বাদামি খাম পড়ে আছে। তার বুকটা ধক করে উঠল। অয়ন গলা তুলে বাড়ির কাজের ছেলেটিকে ডাকল, “পচা, চিঠিটা কখন এল?”

“আজ দুপুরে দাদাবাবু।”

অয়ন খামটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বলল, “আমাকে আগে বলসনি কেন?”

প্রশ্নটা করেই অয়ন বুঝল এটা একটা বোকা বোকা প্রশ্ন হয়ে গেছে। পচা মাথা চুলকে বলল, “দাদাবাবু, তুমি তো কোন সকাল থেকে বাইরে। তোমাকে আমি পাব কোথায় যে খবর দেব? আর তা ছাড়া...”

অয়ন বলল, “বুঝেছি। তুই যা, কাজ কর।”

অয়ন বুঝল তার পালস বেড়ে যাচ্ছে, বাদামি খামে প্রেরকের নাম লেখা আছে। প্রায় দমবন্ধ করে খামটা খুলে অফিশিয়াল লেটার বার করল অয়ন।

বিস্ময়িত চোখে অয়ন চিঠিটা পড়ল। এক বার... দু’ বার...বার বার পড়তে লাগল চিঠিটা। অয়ন বুঝল তার হৃৎপিণ্ড পাঁজরের হাড়ে জোরালো ধাক্কা দিচ্ছে। তার মনে হল বিদিশা থাকলে এই সময় বলত, ‘তোমার বুকের ভিতর একটা রেলগাড়ি আছে অয়নদা।’

অয়ন মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে বটপট মেলবন্ধ খুলল। হ্যাঁ, এই তো! মেল এসেছে কয়েক দিন আগেই। মানসিক ভাবে খারাপ থাকার কারণে মেল চেক করেনি অয়ন। ইস! এমন খবরটা জানতে এত দিন দেরি হয়ে গেল অয়নের! স্বপ্নাবিষ্ট মানুষের মতো চিঠি হাতে ঘরের বাইরে এল অয়ন। তার পর সোজা ঢুকে গেল বাবার অফিসঘরে। অম্বরীশ দরকারি কাগজ থেকে মাথা তুলে বললেন, “কিছু বলবে?”

অয়ন কিছু বলল না। সে চিঠিটা বাবার দিকে এগিয়ে দিল।

অম্বরীশ বললেন, “কিসের চিঠি? নিজে পড়ে শোনাও।”

অয়ন কোনও কথা বলতে পারল না, শুধু ডাইনে বাঁয়ে মাথা নাড়ল। অম্বরীশ এ বার সত্যিই অবাক হলেন, তিনি অয়নের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে সেই চিঠিতে চোখ রাখলেন। ঠিক পনেরো সেকেন্ডের মাথায় তাঁর অভিযুক্তি পাল্টাতে শুরু হল। এই পরিবর্তন শুরু হল ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠা এক চিলতে হাসি দিয়ে, ধীরে ধীরে সেই হাসি তাঁর মুখময় ছড়িয়ে পড়ল।

চিঠি পড়া শেষ করে তিনি বললেন মুখে বলে উঠলেন, “কী কাণ্ড ভাবুন দাসদা! ছেলে চাকরি পেয়েছে। যে সে জায়গায় নয় একেবারে ইউটিআই ব্যাঙ্কে, তাও আবার এক লাফে প্রবেশনারি অফিসার! ভাবতে পারছেন!” তিনি অয়নের দিকে তাকিয়ে বললেন, “করেছিস কী রে ছোট! আনবিলিভেবল!”

টেবিলের ও পারে থাকা লোকেরা প্রায় সমবেত স্বরে হর্ষধ্বনি টাইপের কিছু একটা করে উঠল। অম্বরীশ পচাকে তৎক্ষণাৎ হুকুম করলেন মোড়ের দোকান থেকে মিষ্টি নিয়ে আসতে।

অয়ন বারান্দায় এসে পায়ে চটি গলাচ্ছিল। অম্বরীশ উঠে এসে ছেলের দু’কাঁধে হাত রাখলেন, “আই অ্যাম প্রাউড অব ইউ ছোট। আমি আসলে তোকে একটু আন্ডারএস্টিমেটই করে ফেলেছিলাম, ভেবেছিলাম তুই কোনও দিনই...”

অম্বরীশের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে অয়ন বলল, “বাবা, তোমার সঙ্গে আমার খুব দরকারি কিছু কথা আছে। রাতে এক বার বসতে হবে।”

অয়নের মাথায় হাত রেখে অম্বরীশ বললেন, “সে না হয় হল, কিন্তু তুই এখন চললি কোথায়?”

অয়ন বলল, “খুব এমারজেন্সি একটা কাজ আছে বাবা। অনেক দিন নেগলেস্ট করেছি, আজ কাজটা সেরেই ফিরব।”

রাস্তায় নেমে অয়নের মনে হল এই আধ ঘণ্টাতেই পৃথিবী অনেকটা পাল্টে গেছে। ফ্যাকাশে ত্রিফলা-আলো হঠাৎ অমন মায়ারী হল কী করে! কে যেন কোন জাদুমন্ত্র দিয়ে চিরচেনা শহরকে পালটে দিয়েছে অলকানগরীতে, কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় পাতাঝরা সন্ধেয় পড়ল এমন সোনালি প্রলেপ!

অয়ন ঘড়ি দেখল। কী করছে এখন বিদিশা! একটু পরে যখন সে মহাশ্বেতা ম্যাডামের সামনে নিজের মনের কথা খুলে বলবে তখনও কি বিদিশা মুখ ঘুরিয়ে থাকবে! মহাশ্বেতা ম্যাডামই বা সব শুনে কী ভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাবেন তাও জানে না অয়ন। কী করে বিদিশার বাবা-মাকে বোঝাবে, সেটাও জানা নেই। তবু অয়নের আজ একটুও ভয় করছে না।

অয়ন হাঁটার গতি বাড়াল। ভিআইপি রোড পেরিয়ে সরু গলির মুখটায় জমাট অন্ধকার। সেই অন্ধকার থেকে একটা চিংকার শুনে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল অয়ন।

ঝুপসি গাছে ঢাকা জায়গাটা সন্ধের আগে থেকেই অন্ধকার হয়ে থাকে। চোখ সইয়ে নিতে কিছুটা সময় লাগল অয়নের। সে দেখল একটা মেয়েকে দু’জন লোক হাত ধরে টানটানি করছে। গাড়িতে তোলার চেষ্টা করছে সম্ভবত। মেয়েটাও কম যায় না। হাত ছাড়াচ্ছে, থিমচে দিচ্ছে, হাতে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগ দিয়ে এলোপাথাড়ি পেটাচ্ছে লোক দুটোকে।

অয়নের মস্তিষ্ক সঙ্কেত দিল, ‘পালাও অয়ন, পালাও।’ হাওয়া খুব খারাপ। দু’পা এগিয়েও ফিরে এল অয়ন। মস্তিষ্ক এখন তাকে অন্য সঙ্কেত দিচ্ছে। সে শুনেছে এই ইভটিজাররাই এখন এলাকার ত্রাস। এদের জন্যই দিনে দুপুরেও মেয়েরা শান্তিতে রাস্তায় বেরোতে পারে না। এক বার বিদিশাকেও এরা কটুক্তি করেছিল, সেই কথা বলতে গিয়েও গাল লাল হয়ে গেছিল বিদিশার, আজও মনে আছে অয়নের। এদের সাহস এত দূর বেড়েছে যে, মেয়েদের হাত ধরে টানটানি শুরু করেছে!

অয়ন আবার পিছিয়ে এল, বিদিশার আলোময় পাড়া কতটাই বা দূর? কে জানে মেয়েটা আর ছেলেদুটোর নিজস্ব কোনও সমস্যা কি না! অয়ন কেন নাক গলাতে যাবে?

তার পরও অনেকটা এগিয়ে গিয়েও স্থির থাকতে পারল না অয়ন। সে ফিরে এল। অন্ধকারে মেয়েটাকে দু’জন ছেলে তত ক্ষণে জাপটে ধরে

প্রায় গাড়িতে তুলে ফেলেছে।

অন্ধকারে গাড়ি লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল অয়ন, “অ্যাই! কে, কে ওখানে! কী হচ্ছে এ সব, হ্যাঁ!”

সোনার তরী-তে খবর পৌঁছল রাতের দিকে।

নাগরিক কমিটির সেক্রেটারি পার্থ দাস এসেছেন। তিনি মহা উল্লসিত। চায়ে চুমুক দিয়ে তিনি জানিয়েছেন এত দিনের ইভটিজিং এর সমস্যা হয়তো এ বার মিটেতে চলেছে। সন্ধ্যাবেলা কী ধুকুমার কাণ্ডটাই না ঘটে গেল! দু’গাড়ি বোঝাই ছেলে নাকি একটা মেয়েকে বিভিন্ন ভাবে হ্যারাস করছিল। মেয়েটা পাল্টা দুটো কথা বলায় তারা মেয়েটাকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যেতে পর্যন্ত চেয়েছিল। হয়তো নিয়েও যেত। কিন্তু তখনই সেখানে একটা ছেলে এসে পড়ে। চূড়ান্ত ঝামেলা শুরু হয়, হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে। কিন্তু ছেলেগুলোর কাছে আর্মস ছিল। যে ছেলেটা মেয়েটার রেসকিউ-এ এসেছিল তার খুব বাজে একটা হেড ইনজুরি হয়েছে। ছেলেটি এখন স্পন্দন নার্সিং হোমের আইসিইউ-তে ভর্তি। তবে এর এফেক্ট হয়েছে মারাত্মক। গত সপ্তাহে নতুন ওসি এসেছে থানায়। সবক’টাকে দু’ঘণ্টার মধ্যে তুলে নিয়ে এসে লকআপে ভরেছে। ইভটিজিং, মলেস্টেশন, অ্যাবস্কন্ডিং, অ্যাটেম্পট টু মার্ডার... চার চারটে চার্জ বসাবে।

মঞ্জুষা বললেন, “কী কাণ্ড গো পার্থদা! শহরের আইন-শৃঙ্খলার এ কী অবস্থা হল গো!”

প্রভঞ্জন বললেন, “আহ! তুমি চুপ করো। দেখছ তো এখনও কিছু লোক অন্যের জন্য নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে। এরাই তো ভরসা।”

পার্থ দাস প্রভঞ্জনের দিকে তাকিয়ে সহজ ভাবে বললেন, “ছেলেটাকে তোমরাও ভাল করে চেনো বাবলুদা। মামনকে ইকনমিক্স পড়াত। পূর্বপাড়ার অম্বরীশ রায়চৌধুরীর ছেলে, ওই যে ট্রান্সপোর্ট এর বিজনেস... নামটা কী যেন বেশ...”

পার্থ দাস কপালে বুড়ো আঙুল ঘষতে লাগলেন।

“অয়ন!”

কখন যেন মহাশ্বেতা ঘরে এসে ঢুকেছেন। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে বিদিশা। তার মুখেচোখে আতঙ্ক।

“ইয়েস, অয়ন। হসপিটালে গেছিলাম। লোহার রড দিয়ে মাথার ব্যাক সাইডে হিট করেছিল... ছেলের মাথায় একটা অপারেশন হয়েছে। ব্রিডিং বন্ধ হচ্ছে না, সমানে বমি করে চলেছে। অবস্থা খুবই ক্রিটিকাল বুঝলেন, খুবই ক্রিটিকাল। মিরাকল ছাড়া ও ছেলে ফিরবে না। এ দিকে আর এক কাণ্ড, ডাক্তাররা বললেন, ছেলেটা অচেতন অবস্থায় নাকি ‘বিদিশা... বিদিশা...’ বলে বিড়বিড় করছিল। তা, আমি শুনে বললাম যে, ওই নামে ওর এক জন ছাত্রী আছে। ডাক্তাররা তো অবাক। তাঁরা নাকি মুমূর্ষু রোগীদের ‘বাবা গো, মা গো’ করতে শুনেছেন, কেউ কেউ নিজের ছেলে-মেয়েদের নাম ধরেও চেষ্টা করে ওঠে। কিন্তু ছাত্রীর নাম বিড়বিড় করতে এর আগে নাকি তাঁরা কাউকে শোনেননি। কত কিছু যে দেখব!”

প্রভঞ্জন আর মঞ্জুষা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন।

পার্থ দাস এক চুমুকে চা শেষ করে উঠে পড়লেন, “উঠি আজ। নাগরিক কমিটির সেক্রেটারি হওয়ার জ্বালা কি কম বাবলুদা! এক বার থানায় যেতে হবে দলবল নিয়ে। হলিগানগুলো যেন কিছুতেই জামিন না পায় সেটা দেখতে হবে। দরকারে থানা ঘেরাও পর্যন্ত করব। চলি।”

বিদিশা নিঃশব্দে অ্যাপ-ক্যাব বুক করেছে। পার্থ দাস চলে যাওয়ার প্রায় পিঠোপিঠিই সেই ক্যাব এসে দাঁড়াল সোনার তরীর গেটে।

বিদিশা দমকা হাওয়ার মতো বেরিয়ে যাচ্ছিল, প্রভঞ্জন বললেন, “দাঁড়া মামন, আমিও আসছি।”

মহাশ্বেতা ছেলের কাঁধে হাত রাখলেন, “তুমি বাড়িতে থাকো বাবলু। ছেলেটার অবস্থা ভাল নয়। হয়তো বেশ কয়েক বার যাতায়াত করতে হতে পারে। আজ আমি যাচ্ছি।”

স্পন্দন নার্সিং হোমের আইসিইউ এর বাইরের লাউঞ্জে বসে আছেন মহাশ্বেতা। বিদিশা বসে আছে তার পাশেই। বাড়ি থেকে বেরোনের পর



থেকেই সে আশ্চর্যরকম নীরব। যেন জলজ্যান্ত একটা মেয়ে মুহূর্তে পাথর হয়ে গেছে। ক্যাবে দু’-এক বার কথা বলার চেষ্টা করেছিলেন মহাশ্বেতা, বিদিশা সাড়াশব্দ করেনি। মহাশ্বেতা নিজেই চূপ করে গেছিলেন। এই মুহূর্তে তাঁর এক অজানা অস্বস্তি হচ্ছে। অস্বস্তি কী কারণে হচ্ছে তা মহাশ্বেতা জানেন না এমন নয়, তবে নিজের কাছে নিজেই লুকোচুরি করে বেড়াচ্ছেন।

নাসিংহোমে এসে ওরা প্রথমেই অম্বরীশ রায়চৌধুরীর মুখোমুখি হয়েছিল। ভদ্রলোকের ওপর দিয়ে যেন এই কয়েক ঘণ্টায় একটা ঝড় চলে গেছে। এক অশীতিপর বৃদ্ধা এবং এক তরুণীকে দেখে তিনি বিস্মিত ভাবে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে এগিয়ে এলেন। মেয়েটির নাম ‘বিদিশা’ শুনে কয়েক সেকেন্ড বিহ্বল চোখে তিনি চেয়ে ছিলেন তার মুখের দিকে। তার পর তিনি মহাশ্বেতা আর বিদিশাকে নিয়ে বসিয়েছেন লাউঞ্জের কাউচে। এই পরিস্থিতিতেও ভদ্রলোকের আতিথেয়তা লজ্জায় ফেলেছে মহাশ্বেতাকে।

এরই মধ্যে ডাক্তার এলেন, গম্ভীর মুখে তিনি বলে গেলেন, “বাকি ইনজুরি নিয়ে চিন্তা করছি না। কিন্তু ব্রেন কংকাশনটাই চিন্তায় রেখেছে। আটচল্লিশ ঘণ্টা না কাটলে কিছু বলা যাচ্ছে না।”

অয়নের জ্ঞান যখন ফিরেছিল তখন মধ্যরাত্রি। নার্স এসে অম্বরীশকে বললেন, “জ্ঞান ফিরেছে, এক বার দেখতে চাইছে আপনাকে।”

অম্বরীশ পড়িমরি করে ভিতরে ছুটলেন। ভরসা হারানো মুখচোখ নিয়ে ফিরেও এলেন কিছু ক্ষণ পরে, এসেই বসে পড়লেন সোফায়, “জ্ঞান আসছে আর যাচ্ছে, কেমন তন্দ্রার মধ্যে রয়েছে।” গলা ধরে এল তাঁর, তার পর তিনি মহাশ্বেতাকে বললেন, “আপনাকে দেখতে চাইছে। অল্প সময় যাবেন এক বার?”

মহাশ্বেতা আর বিদিশা আইসিইউ-তে ঢুকল। মধ্যরাত্রির টিমটিম আলো জ্বলা আইসিইউ। সারি দেওয়া বেডে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে কিছু অচেতন মানুষ। থেকে থেকে মনিটরে যান্ত্রিক বিপ বিপ শব্দ হচ্ছে।

অয়নকে দেখে আঁতকে উঠতে হয়। তার মাথার চুল কামিয়ে ফেলা হয়েছে অপারেশনের জন্য, মাথার অর্ধেক ঢাকা সার্জিকাল ড্রেসিং, একটা চোখ ফুলে প্রায় বন্ধ হতে বসেছে, ঠোঁটের কোণে তিনটে সেলাই।

তাই নিয়েও খুব সামান্য হাসল অয়ন।

মহাশ্বেতা এগিয়ে গিয়ে নিচু স্বরে ডাকলেন, “মাস্টার!”

অয়ন যেন মহাশ্বেতার অপেক্ষাতেই ছিল, সে ভাঙা গলায় বলল, “একটা কথা... আজ না বললে আর হয়তো বলা হবে না। ম্যাডাম... আমি বিদিশাকে বিয়ে করেছি। রেজিস্ট্রি করে নয়, মন্দিরে। যদি আমার কিছু হয়ে যায় তবে এই তথ্য আপনি আর কাউকে জানাবেন না। বিদিশার ভবিষ্যতের পক্ষে তা ভাল হবে না,” অয়ন থেমে থেমে বলল, “কিন্তু যদি আমি ফিরে আসি... যদি আমি ফিরে আসি...”

কথা শেষ করতে পারল না অয়ন, আচ্ছন্নের মতো পড়ে রইল বিছানায়।

অয়নের বেডের কাছে রাখা একটা স্টিলের টুলে ধপ করে বসে পড়লেন মহাশ্বেতা। এ তিনি কী শুনলেন!

বিদিশার কী যে হল! এত ক্ষণ সে নিজেকে শব্দ করে ছিল। আর পারল না। স্থান, কাল অবজ্ঞা করে সে অয়নকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

তীব্র যন্ত্রণায় শরীর ভেঙে আসছিল অয়নের। বিদিশার ছোঁয়া পেয়ে এক মুহূর্তে তার ব্যথা বেদনা সব কোথায় মিলিয়ে গেল। অয়নের মনে হল তার শরীরটা অনন্ত শান্তির আকাশে ভাসছে।

প্রিয়তম পুরুষের বুকের রেলগাড়িটা খুঁজছিল বিদিশা, পাচ্ছিল না। শেষ ট্রেন চলে যাওয়া স্টেশনের মতো সেখানে অপার শূন্যতা।

মহাশ্বেতা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। দীর্ঘ জীবনে তিনি অনেক দেখেছেন। কত মৃত্যু, কত হানাহানি, কত বিচ্ছেদ, কত ভালবাসাবাসি... তবু তাঁর মনে হল তিনি এই মুহূর্তে পৃথিবীর পবিত্রতম দৃশ্যটির সাক্ষী হয়ে রইলেন।

মহাশ্বেতা নিজেও জানেন এই পৃথিবীতে তিনি আর বেশি দিন নেই, তবু তাঁর মনে হল এমন অসাধারণ এক রাত্রি তাঁর জীবনে আসবে বলেই

সম্ভবত তিনি আজও বেঁচে আছেন।

পৃথিবীর ভয়াবহতম রোগব্যাধির থেকেও কান্নার জল বেশি সংক্রামক। দীর্ঘ কয়েক দশক পর মহাশ্বেতার চোখে আজ জল এসে গেল। অবাস্তব এক আশায় তিনি নিখর অয়নের গাল ঝুঁয়ে দিলেন, তার কানের কাছে মুখ নিয়ে কাঁপা গলায় বললেন, “তুমি ফিরে আসবে। ফিরতেই হবে তোমাকে। এই বুড়ি মানুষটা তোমার অপেক্ষায় থাকবে। তোমার মুখ থেকে ‘ঠান্মি’ ডাক শোনাটাই তো বাকি রয়ে গেল, মাস্টার।”

॥ পরিশিষ্ট ॥

“অহল্যা!...আরে ও অহল্যা!”

“বোলো মুঙ্গেরি।”

“তোরা কি মন খুব খারাব আছে?”

“খারাব কেন থাকতে যাবে? আজ তো আনন্দের দিন!”

“কিন্তু তুই যে কোথাও রইলি না রে অহল্যা। থাকার মধ্যে তোরা নামে একটা ট্রাস্টের নাম ছিল, এখন তো সেটাও চলিয়ে গেল নৈহাটির মজুমদারদের নামে।”

“আমি চাই আমার মুঙ্গেরি হাজার সাল বেঁচে থাকুক, তবু যে দিন তুমি ওই জগত ছেড়ে আমাদের জগতে আসবে তখন বুঝবে, যা হওয়ার তাই হয়, হোনি ভো কোই নহি টাল সকতা মুঙ্গেরি।”

“কিন্তু তুই! তোরা কী হবে অহল্যা? তুই কোথায় থাকবি?”

“থাকার জায়গার কি অভাব আছে গো? হয়তো এই নিম্ন গাছের হাওয়া হয়ে থেকে যাব, সামনের বাগিচায় সকালের যে প্রথম রোদটা আসে, সেই রোদে মিশে থাকব। এই বাড়ির সবখানে থেকে যাব আমি... হয়তো তুমি দেখতে পাবে না মুঙ্গেরি, তবু থেকে তো আমি যাবই।”

মুঙ্গেরিলালের চোখ জ্বালা করে ওঠে, সে অসহায়ের মতো বলল, “কিন্তু আমি! আমার কী হবে? তুকে ছাড়া আমি কী করব রে অহল্যা...” কথা শেষ করার আগেই মুঙ্গেরিলালের ঘোর ভাঙল। দোতলার পশ্চিমের বারান্দা আলোয় ঝলমল করছে, তবু সামান্য ছায়া ভাব খুঁজে নিয়ে আজও অহল্যা এসেছিল।

অহল্যার তরফ থেকে কোনও উত্তর এল না। মুঙ্গেরিলাল বুঝল অহল্যা চলে গেছে। হয়তো আর কখনও আসবে না অহল্যা।

বিষাদ চেপে রেখে সে মন্দিরের পিছনের জমি থেকে বেরিয়ে বাড়ির সামনে এল। তার সামনে রাজপ্রাদের মতো যে বাড়িটা

আলোর রোশনাই-এ ঝলমল করছে, সেটাই যে মুঙ্গেরিলালের এত বছরের দুঃখ-সুখের নিভৃতবাস, তা বলে না দিলে বিশ্বাস করা কঠিন।

“সোনার তরী” আজ আলোয় আর ফুলের মালায় সাজানো। ছাদ থেকে আলোর মালা নেমে এসেছে বাগান পর্যন্ত। প্রকাণ্ড মঙ্গল ঘট বাড়ির গেটের সামনে রাখা। আচের আকারে তোরণ। সোনার তরী নামের এই পুরনো বাড়িটিকে দেখাচ্ছে নবযৌবনা নারীর মতো।

সোনার তরী-র এই ভোলবদলের কারণ আছে। আজ এই বাড়ির ছোট মেয়ের বিয়ে। আজ বিদিশার বিয়ে।

বিয়ের লগ্ন একটু রাতে। আমন্ত্রিতরা সন্ধে থেকেই আসতে শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের আপ্যায়ন করছেন মঞ্জুষা। একটু আগে তিনি মহাশ্বেতাকে হুইলচেয়ারে বসিয়ে লনে নিয়ে এসেছেন। মহাশ্বেতা ঘোষণা করেছিলেন, তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিদিশার বিয়ে দেবেন। কিন্তু বিয়ের দু’দিন আগে থেকে বাতের ব্যথা তাকে এমনি কাবু করে ফেলল যে, বেশি ক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। তিনি বিয়ে দেবেন হুইলচেয়ারে বসে। সেই হুইলচেয়ারে বসেই তিনি মিটিমিটি হাসছেন।

বিদিশার বিয়ের মণ্ডপের সামনেই মন্দিরে জ্বলজ্বল করছে সোনার প্রতিমা। নৈহাটির মজুমদাররা এই মূর্তি ফিরে পাওয়ার জন্য কেস করতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু আউট অব দ্য কোর্ট সেটলমেন্ট হয়েছে। কারণ সেই স্বপ্নাদেশ। দেবী শুভপ্রসন্নকে স্বপ্নে বলেছেন, তিনি আপাতত স্থান পরিবর্তন করতে চাইছেন না। তিনি এক জন প্রকৃত ভদ্রলোক। কিন্তু তিনি যে বোকা নন, এটাও বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

প্রতিমা স্থানান্তর না হলেও সোনার তরী-র হাত থেকে অনেক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তবে বিলেত ফিরলেন শুভপ্রসন্ন। অহল্যা ট্রাস্ট-এর সম্পূর্ণ অডিট এ বার থেকে নৈহাটির মজুমদার পরিবার দেখবে, ট্রাস্টের সব সদস্য ওই মজুমদার পরিবারেরই। তার থেকেও বড় কথা ‘অহল্যা’ ট্রাস্টের নামটাও পালটে গেছে। শুভপ্রসন্ন সেই ট্রাস্টের নাম রেখেছেন নিজের মায়ের নামে। অত্যন্ত শান্ত ভাবে সোনার তরী-র সদস্যরা এই পরিবর্তন মেনে নিয়েছে।

অপ্রত্যাশিত ভাবে বিয়েবাড়ি মাটিয়ে রাখল সম্পূর্ণ অন্য এক জন। সে এই পরিবারের কেউ নয়। অথচ বিয়েবাড়ির সব দায়িত্ব নিজে থেকেই কাঁধে তুলে নিয়েছে। তার ব্যস্ততা চোখে পড়ার মতো। যুবকের নাম মৈনাক। ব্যস্ততাটা বাহানা। আসলে এই অছিলায় ক’টা দিন পারিজাতের কাছাকাছি থাকার সুযোগ সে হারাতে চায়নি। বিয়েবাড়ির বেশিরভাগ কাজ দু’জনে করেছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

পারিজাত লজ্জায় পড়ে গেছে। সে মৈনাককে ফিসফিস করে বলেছে, “এই! এ রকম পায়ে পায়ে ঘুরছ কেন?”

“দূরে থাকব বলে কি এসেছি নাকি!” মৈনাক পারিজাতের গা ঘেঁষে আসে। হালকা ঠেলায় তাকে সরিয়ে দেয় পারিজাত, “আবার! দু’মাস পরেই তো বিয়ে।”

“দু’মিনিট দূরে থাকলেই তোমাকে মিস করতে শুরু করি পারিজাত।”

কী বলবে পারিজাত বুঝে পায় না। মৈনাকের মুখ দেখে তার পেট গুলিয়ে হাসি পায়ে, কিন্তু হাসতে গিয়ে পারিজাত দেখে তার চোখ ছাপিয়ে জল আসছে।

মৈনাকের হাসি মিলিয়ে যায়, “কী হল পারিজাত? অল ওকে! আমি কি কিছু ভুল বললাম?”

পারিজাত চোখ মুছে হাসার চেষ্টা করে। মৈনাককে পারিজাত তার আন্ত নারীজন্মের একটা বড় অংশ উপহার দিতে চলেছে। এই হঠাৎ কান্না পাওয়ার কারণটুকু না হয় শুধু পারিজাতেরই থাক।

বিয়েবাড়ির একেবারে মধ্যখানে বিরক্ত মুখে চেয়ারে বসে আছেন প্রভঞ্জন। বিদিশা আর অয়নের ব্যাপারটা জানতে পেরে প্রথমটায় খুবই আপসেট হয়ে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর মেয়ে যে মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করতে পারে এ কথা যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি। মেয়ের সঙ্গে কথাও বন্ধ রেখেছিলেন কিছু দিন। কিন্তু মেয়ে যখন এসে বাবার গলা জড়িয়ে ধরেছিল, তখন মুহূর্তে তাঁর সেই রাগ গলে জল হয়ে গেছিল।

আজ অবশ্য তাঁর বিরক্তির কারণ অন্য। তিনি ভেবেছিলেন বিয়ের ফোটোগ্রাফির জন্য ফোটোগ্রাফার যা দর হৈকৈছিল, তা শুনে তিনি আঁতকে উঠেছিলেন। ফোটোগ্রাফার তাঁকে বুঝিয়েছিল, “না দাদা, ম্যারেজ ফোটোগ্রাফি এখন অন্য লেভেলে চলে গেছে, আগে বিয়ের ছবি তুলত এক জন। এখন ছ’জনের টিম যাবে। বিয়ের একটা ডিটেলও বাদ যাবে না দাদা।”

সেই ছ’জন ফোটোগ্রাফার সকাল থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বিয়েবাড়ির আনাচে কানাচে। কেউ ঘরের ফার্নিচারের ছবি তুলছে, কেউ গাছের ডালে ঝুলতে থাকা নারকেলের দিকে ক্যামেরা তাক করেছে, কেউ মাটিতে পড়ে থাকা ছেঁড়া বটগাছের পাতায় কাঠপিঁপড়ের মুভমেন্ট ধরে রাখছে ক্যামেরায়। এরই নাম ডিটেলিং।

প্রভঞ্জন নিজেও বসে আছেন কাঠ হয়ে। কারণ, তাঁর কোলে মাথা রেখে এক কজন ফোটোগ্রাফার শুয়ে আছে, চোখে প্রায় দেড়ফুট লেন্স লাগানো ক্যামেরা। বিয়েবাড়ির একটা ক্যান্ডিড মোমেন্ট ক্যাপচার করার নাকি এটাই সেরা অ্যাপ্রোচ।

বিয়েবাড়ির হাজার কাজের মাঝেও আনমনা হয়ে পড়ছে জোনাকি। সানাইয়ের বিষম্বা তার বুকে বাজছে। আজ ভদকাইটা থাকলে কী ভালই না হত। দ্রুত সেরে উঠেছিল ভদকাই। হাসপাতাল থেকে সরাসরি পুলিশের হেফাজতে পাঠানো হয়েছে তাকে।

মহাস্থেতার পুরনো এক পেশেন্ট দুঁদে উকিল, ভদকাইয়ের কেসটা

তিনিই লড়েছেন। অনেক চেষ্টার পরও দু’বছরের জেল হয়েছে ভদকাইয়ের। আফজল খানের লোকেরা ডালিমকে খুঁজে পেয়েছিল ক’দিন পরেই। দামি নেশার জিনিসও উদ্ধার হয়েছিল তার কাছ থেকে। আফজল খান জেলে লোক পাঠিয়ে ভদকাইকে বলেছে ট্যাবলোই ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে মারতে চেয়েছিল ভদকাইকে। ট্যাবলোকে লাথ মেরে দল থেকে ভাগিয়েছে আফজল খান। তার থেকেও বড় কথা, আফজল খান ভদকাইকে কথা দিয়েছে, ভদকাই জেল থেকে বেরোলে তাকে ক্ষতিপূরণ দেবে।

ভদকাই ঠিক করেছে জোনাকির সঙ্গে তার হোম ডেলিভারির কাজেই লেগে যাবে। জোনাকির জোগাড়ে হয়ে আর তার রান্না সাইকেলে চেপে লোকের বাড়ি বাড়ি ডেলিভারি করেই সে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চায়। ভদকাইয়ের ফেরার অপেক্ষাতে আছে জোনাকি।

“বাহ! জোনাকি বেটি! বড়িয়া কাপড়া পরেছিস তো?”

জোনাকি চমকে তাকাল। মুঙ্গেরিলাল তার দিকে সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে আছে। জোনাকি পরেছে সোনালি লেহেঙ্গা, বিয়ে উপলক্ষ্যে এটাই তাকে এ বাড়ির উপহার। মুঙ্গেরিলালও উপহার পেয়েছে তার পরনের পিঁয়াজি শেরওয়ানি।

“তুমিই বা কম কী মুঙ্গেরি চাচা, বিয়েবাড়িতে আজ তোমাকে দেখেও অনেক মেয়ে ফিদা হয়ে যাবে।”

দু’জনেই একসঙ্গে হেসে উঠল।

জোনাকি বলল, “ভালদের সঙ্গে সব সময় ভালই হয়, তাই না মুঙ্গেরি চাচা?”

“সবসময় নয় রে বেটি। তবে ভালদের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সব কিছু ভালই হয়।”

জোনাকি আর মুঙ্গেরিলাল তাকিয়ে রইল আলো ঝলমল বাড়িটির দিকে। এই বাড়ির লোকগুলো সত্যিই খুব ভাল। যেন এরা এই পৃথিবীরই কেউ নয়।

নিজের ঘরে বসে আছে বিদিশা। তার প্রসাধনে ফাইনাল টাচ দেওয়া হয়ে গেছে। কত যুগ যেন সে এই দিনটার অপেক্ষায় ছিল। প্রথমে সে ভাবতেই পারেনি এই দিনটা আসবে বলে। তার চিন্তা ছিল অয়ন ফিরবে কি না!

অয়ন ফিরেছে। কিন্তু পুরোপুরি সুস্থ হতে তার অনেক সময় লেগে গেছে। তার পর দুই বাড়িই আর দেরি করতে চায়নি।

হিসেবমতো আজ বিদিশার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের দিনগুলোর একটা হওয়া উচিত। অথচ সে কিছুতেই পুরোপুরি খুশি হতে পারছে না। কারণ সাগরের হসপিটালে প্রচণ্ড কড়া কড়ি। কয়েক মাস আগেই সাগর প্রায় বিনা নোটিশে দেশে ফিরেছিল, কর্তৃপক্ষ সেটা ভাল চোখে দেখেনি। আর এ বার তার এমারজেন্সি ডিউটি। তাই ছুটি মেলেনি। সাগর তবু আসতে চেয়েছিল, বিদিশা আটকেছে। সে জানে, এই চাকরিটা সাগরের স্বপ্ন। এই চাকরি জোটানোর জন্য বছরের পর বছর দিন রাত এক করে খেটেছে সাগর। বিদিশা ধরা গলায় বলেছিল, “তোর এমারজেন্সি ডিউটি শেষ হলেই এক বার ঘুরে যাস দাদাভাই। বাবা মা ঠান্মি তো রইল, আমরা সামলে নেব।”

আপাতত বিদিশা স্কাইপ অন করেছে, তার সামনে সাগর বসে। কথা

বলতে বলতে সাগর মাঝে মাঝেই বিভোর হয়ে বিদিশার দিকে তাকিয়ে থাকছে। আপাদমস্তক নববধূর সাজে সেজে থাকা এই অপরূপ রূপবতী মেয়েটি যে তার সেই ছোট্ট বোন সেটা যেন তাঁর বিশ্বাসই হতে চাইছে না।

বিদিশা বলল, “সবাই এসেছে দাদাভাই, শুধু তুই নেই...”

সাগর উচ্ছল হয়ে হাসছে, “দূর! সারাক্ষণ আছি। এই তো, কেমন কথা বলছি। ওখানকার লাইভও তো হচ্ছে, সেটাও দেখব। আছি তো। নেই কে বলল?”

বিদিশা ভুরু কঁচকে বলেছে, “তুই কেমন আছিস দাদাভাই?”

“ফাটাফাটি। দেখে বুঝতে পারছিস না? কত রকম পেশেন্ট, নতুন কালচার, অ্যাডভান্সড সার্জিকাল ইন্টারভেনশনস... দারুণ দিন কাটছে।”

“আমার কেন মনে হচ্ছে তুই ভাল নেই?”

“তোদের ন্যাকামিগুলো আর গেল না মামন। বিয়ের দিন তো এ সব একদম পিক-এ থাকে। এখানকার পে-স্কেল তো জানিস, পরের বছর নিজের অ্যাপার্টমেন্ট পেয়ে যাব... যা চেয়েছিলাম সব পাচ্ছি। খারাপ থাকতে যাব কেন? শুধু যদি বিয়েটায় থাকতে পারতাম...”

বিয়েবাড়িতে একটা শোরগোল উঠল। সম্ভবত বর এসেছে। বিদিশা বলল, “আমি চলি রে দাদাভাই। পরে আসছি।”

“অল দ্য বেস্ট মামন।”

“থ্যাঙ্ক ইউ দাদাভাই।”

ততক্ষণে উলুর শব্দ আর শব্দধ্বনিতে চাপা পড়ে গেছে সানাইয়ের সুর। বাচ্চার ছোটোছুটি শুরু করে দিয়েছে। একদল সুবেশ নারী-পুরুষ ভিড় জমিয়েছে বাড়ির গেটের সামনে।

সমস্তর গুঞ্জন বলে উঠছে, “বর এসেছে! বর এসেছে!”

ল্যাপটপের সামনে থেকে সরে এল সাগর। জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ধীর পায়ে। বোনকে সে ভুল কিছু বলেনি। সে সত্যিই ভাল আছে। দেশের যে জিনিসগুলো সে অপছন্দ করে তার কোনওটাই এখানে নেই। সাগর তাই এখানেই ভাল আছে।

শুধু যে দিনগুলোয় মেঘ করে আসে, আকাশ থেকে অনবরত গুম গুম শব্দ আসে, সে সব দিনে সাগরের খুব কষ্ট হয়। দামাল গোছের, কোমরে ড্রাগন ট্যাটু আঁকা, এলোমেলো একটা মেয়ের কথা ভেবে ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায় তার।

লন্ডনে আজ তুমুল বরষা। সন্ধ্যে নামার মুখে হঠাৎ কালো মেঘ, প্রায় রাতের মতো দেখাচ্ছে চারপাশ। রয়াল পার্কের উঁচু উঁচু মহীরুহদের মাথা ঝুঁয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে বৃষ্টির অশ্বারোহীদের দল।

সাগর কিছুক্ষণ একমনে বৃষ্টি দেখল জানলা দিয়ে। তার পর অলস ভাবে দরজা খুলল।

সাগরের রুমমেট ছেলোটি দেখল, একটা ফুলস্ক্যাপ কাগজ হাতে

ঘোরপ্রস্তু মানুষের মতো সাগর বেরিয়ে যাচ্ছে ঘর থেকে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেসমেন্টে এল সাগর। শোঁ শোঁ হাওয়ার শব্দ, বৃষ্টির তোড় যেন কমেছে কিছুটা। বেসমেন্টের পাশে রাস্তায় জল বয়ে যাচ্ছে কুলকুল করে।

হাড় কাঁপানো ঠান্ডা উপেক্ষা করে সাগর শান্ত ভাবে নৌকো তৈরি করল একটা। পারিজাতকে লেখা চিঠির নৌকো।

সাগর জানে, পৃথিবীর প্রতিটি জলধারা আসলে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। যে কোনও জলধারা বরাবর চলতে থাকলে পৌঁছে যাওয়া যায় বিশ্বের যে কোনও প্রান্তে। হয়তো বা ঝুঁয়ে দেওয়া যায় পারিজাতের চিঠি-নৌকোকেও।

হাঁটু মুড়ে বসে সেই বহমান দুরন্ত স্রোতে কাগজের নৌকো ভাসিয়ে দিল সাগর।

কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল কোথাও, দারুণ বিদ্যুৎ চিরে দিল আকাশের বুক। নৌকো তার যাত্রা শুরু করল। তুমুল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মাথায় নিয়ে। কত দূর যাবে নৌকো? কত দূর যায়? সাগরের জানা নেই।

অন্ধকার জল বেয়ে তরতরিয়ে এগিয়ে গেল নৌকো, কিছু পরে মিলিয়ে গেল অন্ধকারেই।

ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। একই সঙ্গে ভিতর থেকেও ক্ষীণ জলধারা উঠে এল সাগরের। নামল চোখের কোল বেয়ে। সহস্রধারা বৃষ্টির মধ্যেও তা আলাদা করে অনুভব করল সে। সেই মুহূর্তে তার মনে হল, লন্ডনে তার আর থিতু হওয়া হবে না। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে রেখেছে, এই হসপিটালের টার্ম শেষ হলে সাগর সুইটজারল্যান্ড পাড়ি দেবে, সম্ভব হলে সেখান থেকে ইউ এস এ, আবার সেখান থেকে অন্য কোথাও, অন্য কোনওখানে...

না-পড়া এক চিঠি-নৌকোয় আজীবন ভেসে চলাই হয়তো সাগরের নিয়তি।

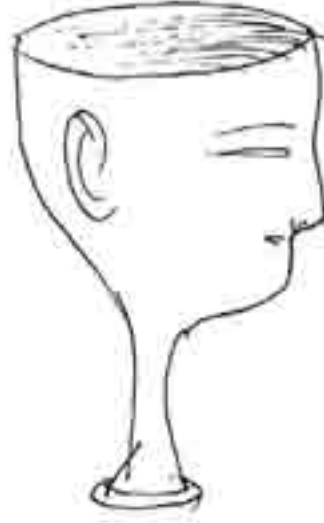
শিল্পী: রৌদ্র মিত্র



গ্রন্থ

জয় গোস্বামী

এই জীবনে বিস্ময়কর যা দ্রষ্টব্য
 দেখতে বাকি— তাদের দিকে যত এগোই
 ততই আমায় ঘিরে ধরছে ভদ্র, সভ্য
 পোশাক-পরা নারী-পুরুষ, দু'হাতে বই!
 সকল বইয়ের মলাট দেখছি নামাক্তিত
 আমার নামেই— বইগুলি সব বাধ্য, বশ্য।
 পৃষ্ঠা খোলার দরকার নেই— ব্রহ্ম, ভীত
 রচনা সব এতই অসূর্যম্পশ্য
 পাঠকদৃষ্টি সহিবেই না— বুঝতে পারছি—
 আমার আসল রূপ এখানে পরিস্ফুট?
 তাই তো এখন শিক্ষা করছি আরবি, ফার্সি—
 সেসব ভাষায় লিখলে কি কেউ বুঝবে কুটো
 কোথায় নড়ছে, উড়ল কোথায়? কোন মুহূর্তে
 কাদের ছাদে আমার চরম মিলনসিদ্ধি
 ঘটল কখন? এ-দেশ থেকে উড়তে-উড়তে
 কোন গাছে যাই? কোন কোকিলের গলায় শিস দি'
 আন্দাজই তো পাবে না কেউ! বইয়ের মলাট
 ভাসবে জলে... জানবে না তো স্নানার্থীগণ
 কার লেখা বই, সে-লোক কোথায়—
 শ্মশানে খাট
 নামিয়ে রাখলে উঠে বসবে গ্রন্থজীবন...



মিথ্যা বলি আদালতে, সত্য বলি পানশালায়

সুবোধ সরকার

মানুষ যত মিথ্যা বলে আদালতের কাঠগড়ায়
 মানুষ তত সত্য বলে বোতল ভেঙে পানশালায়।

সত্য হল এমন তুষ নিজের ঘর নিজে পোড়ায়
 কেউ কি জানে বিভাল আছে ঘাপটি মেরে কার ঝোলায়?

সত্য যারা বলতে পারে তাদের যেন মা বোন নেই
 বন্ধ ছিল যে ঘরগুলো আইন এসে ঘর খোলায়।

দার্শনিক সত্য বলে কেউ জানে না তার কী নাম
 কেউ জানে না মাথার ওপর কারা কখন খড়্গ দোলায়।

মদ আনাও, বাঈজি ডাকো, অবলীলায় অতঃপর
 বাঈজি যেন তোমার আর আমার সব ব্যথা ভোলায়।

গীতা ছুঁয়েও মিথ্যা বলি, মিথ্যা বলি মহান কাজে
 মিথ্যা যত সাজায় তাকে মিথ্যা নিজেও দারুণ সাজে।

মিথ্যা দিয়ে বাড়ি বানাতে হয়নি খেতে দারু চোলাই
 বন্ধ হলেও পানশালার দরজাগুলো থাকে খোলাই।

যে আদালতে মিথ্যা বলি, সত্য বলি পানশালাতে
 মানুষ চায় মানুষ হতে, খেতে বসুক এক থালাতে।

ঋণ: মির্জা গালিব

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ

রণজিৎ দাশ

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ— এই বিশ্বলোকে
তিনি না-থাকার জন্যই
একটা নষ্ট চাঁদের ভ্রষ্ট জীবন
এমন অবাধ আমোদে আমি কাটিয়ে গেলাম

কোনও বিচার হল না
কোনও শাস্তিও না

শুধু আরও খুলে গেল পানশালা, পরমাণু, মহাযুদ্ধ, অস্তিত্ববাদ

ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ—
তিনি না-থেকেও থাকার জন্যই
খুলে গেল মানুষের পাপ ও পুণ্যের বিপুল বাজার
সকালে পূজার ফুল, প্রমত্ত সন্ধ্যায়
ঠাই পেল বাইজি-খোঁপায়
ফরাসি দর্শন এল, দ্বিধাহীন, স্বল্পনে দুর্বীর—
‘পাপকর্মের চেতনাই মহত্তম রতিসুখসার!’

তবুও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ— এই বিশ্বলোকে
তিনি না-থেকেও থাকার জন্যই
আজীবন বুকুর ভিতর
এই তীব্র অনুতাপ,
এই কাব্য, এই প্রেম, গ্রহে-গ্রহান্তরে
এই স্তব্ধ মহৎ বিষাদ



ঈশ্বর মানুষ হয়ে জন্মাতে চাইছেন

পঙ্কজ সাহা

ওই যে অপক্লপা ওখানে দাঁড়িয়ে
রামধনু আঁকা মেঘের নীচে,
তার রূপের বিভায়ে
ঈশ্বরও মানুষ হয়ে জন্মাতে চাইছেন!

আমি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াব বলে
হেঁটে আসছি এই এক জীবন।
আমার আগেই আর কেউ পৌঁছে গিয়ে
দাঁড়াবে কি তার পাশে?
তিনি কি স্বয়ং ঈশ্বর!

আমার পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই
সময় বিন্দু মিলিয়ে
সে যদি মুছে যায় স্বর্গের পারিজাত হাতে
সেই হবে তাকে আমার নিজস্ব করে পাওয়া।





পথ ও পথিক

রূপক চক্রবর্তী

রুচিরা রেসিডেন্সি থেকে
প্রেসিডেন্সির পথে
অলোক যখন দেখতে পেলেন
সবুজ মাখানো পথ।
একেই এখন বাইপাস তবে বলে।
অলোক তখন রঞ্জিত হন—
নতুন রাস্তা-পথ নতুনের দলে।

পরমুহূর্তে মনে হয় তাঁর
রাস্তা তো নয়— নতুন কিছু আজ
সারা পথ যেন—
জানালা জানালা জানালা...

জীবন-সঙ্গীত

কৃষ্ণা বসু

বুকের ভিতর লুকিয়ে রয় স্মৃতিকাতর গান,
অতীত টানে পিছন দিকে, পুরান আনচান।
স্মৃতির ঝাঁপি খুললে দেখি রঙিন ছবি কত,
মনের মধ্যে জমেই আছে ক্ষত ও বিক্ষত!
সে সব ছবি ছুঁতে চেয়ে রাত্রি জাগি আমি,
রাত্রি জাগি স্বপ্নাতুরা, গভীর স্বপ্নকামী!
জোছনা রাতে ঘুম ভেঙে যায়, স্বপ্নময়ী রাত,
অতীত পানে হাত বাড়ালে অতীত ধরে হাত,
মধ্যরাতে নিদ্রাবিহীন স্বপ্নাবিষ্ট থাকি,
ঠিক নিজেকে চিনতে বলো আর কত দিন বাকি?
অতীত কাছে সম্ভাখানি সুগচ্ছিত আছে,
হৃদয় কেন ঘুরে বেড়ায় পিছুটানের কাছে?
বর্তমান তো সত্য জানি, অতীত মিথ্যা নয়।
দুই সত্যই ছুঁয়ে দেখি— প্রাণের ভিতর ভয়!
কিসের ভয়? অতীতকে কি মিথ্যে বলতে পারি?
অতীত আমায় জাগিয়ে নেয় বুকের মধ্যে তারই।
দুই সত্যেই যাওয়া-আসা অতীত বর্তমান,
বুকের মধ্যে উঠছে জেগে স্মৃতিকাতর গান!



পুতুলদি

রানা সরকার

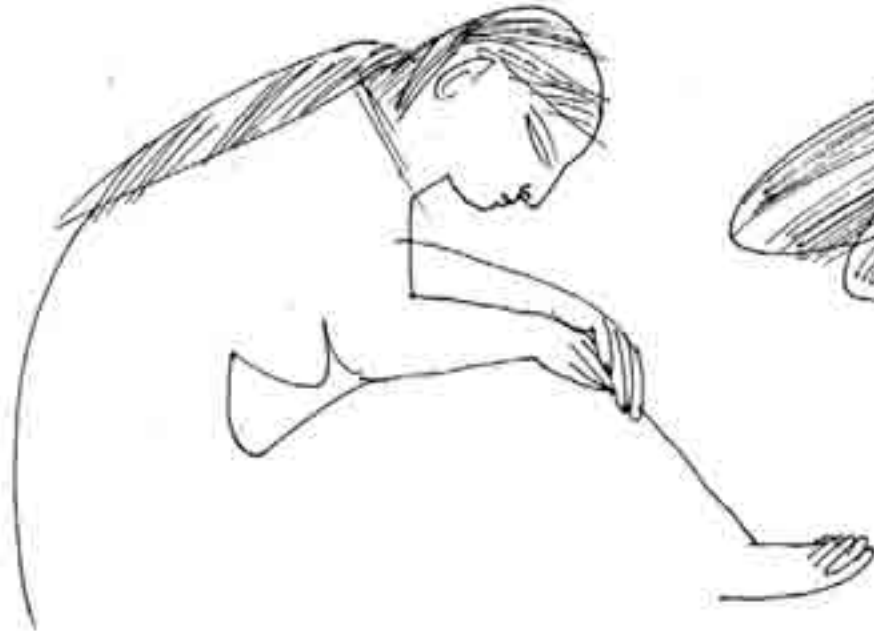
এখানে স্মৃতিমুগ্ধ দিনগুলোতে তোমায় মনে পড়ে এখন পুতুলদি—
এই মফসসল শহরে ফিরে আসে মধুমাস, রাত চৈত্রের ফসল,
এখানেই নেমে আসে গৃহী জীবনের মগ্ন সুবাস, চেনা বকুলের ছায়া;
তোমার কিশোরীবেলার চপলতা ঘরে বাইরে এখন খুঁজে নেয় কৃষ্ণচূড়ার মাস।

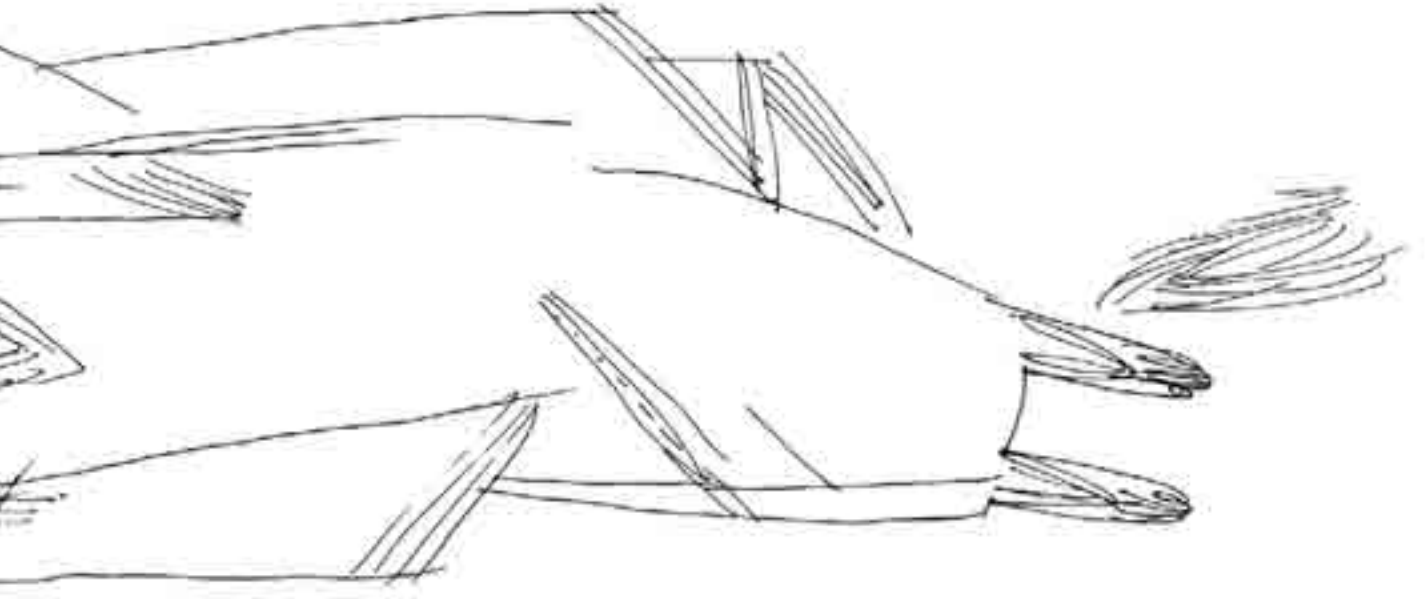
পরবাসে এখানে রয়েছে আজও পাঠশালা দুপুর, অখণ্ড নশ্ব বিকেল—
হতশ্রী দিনের হাওয়ায় ধুলোর ঘূর্ণি দূরের পথে বহু বার গোধূলি আঁধারে,
এ শহরে তবুও উৎসব ফেরে, শারদ শঙ্খে পারিবারিক পূজো সাক্ষ্য বোধনে,
দেবীর অর্ঘ্যে মন্ত্রপূত উচ্চারণ, শ্বেতপদ্মের মালায় সেজে ওঠে অরূপ দেওয়াল।

পুতুলদি, সে শৈশব তোমার বড় এলোমেলো, একানবর্তীর আশ্রিত দাওয়ায়—
ভোরের শিশিরে ধোয়া শিউলির ঘ্রাণে কুমারী পূজোর আয়ুষ্কাল বেড়েছিল।
মানবী তুমি, পূজোর অর্ঘ্যে পুষ্পিতা নিশ্চিত আশ্রিতা ছিলে, মনের মন্দিরে—
দূরে নদী মোহনার কূলে দেবীপঙ্কের দক্ষিণী বার্তা ফেরে হাওয়ায় হাওয়ায়।

পুতুলদি! এ শহর তোমায় মনে রেখেছে, বনেদি বাড়ির সই খোঁজ রাখে এখনও তোমার নিবিষ্ট প্রবাসে।
কুমারী পূজোর দেবী, তুমি একই ভাবে প্রতিবার খুঁজে নিয়েছিলে ভাসানের ঘাট সুমুক্ত দিশায়,
দেবী গর্জনের রাত, যুগলবন্দী আজ শারদ-সরোদে, মিলিত ছায়ায়।
নৌযাত্রায় আগমনী সুর, জীবন খেয়ায় অনুক্ত কথকতা লুকিয়ে এখন দুখি পরানের ঘাটে।

ভাসানের গোধূলি ছায়া ভাসে, জলজ উঠোনে করলার জলে
দেবী বিসর্জিতা, আঁধারের ঢেউয়ে অস্ত্রহীনা দেবী ফেরে মুক্ত দেশান্তরে।
কুমারীর রাঙা চেলী, বিষাদের সানাই ঢাকে গভীরে কোথাও, ভগ্ন লোকালয়ে—
এ শহর শোকে নিষ্প্রদীপ কিছু ক্ষণ, দীর্ঘ ছায়াপথ ছুঁয়ে থাকে আজও সোহাগের লুপ্ত উপকূলে।





আমি, রতনলাল

বিকাশ সরকার

আমি তো দীপক চ্যাটার্জি নই, আমি রতনলাল, তার সহকারী
তার তুলনায় আমি নেহাতই এক গোবেচারার দুর্বল খিন্ন বাঙালি
কেউ কোনও তদন্তের কাজ নিয়ে এলে আমি দাঁড়িয়ে থাকি দূরে, শুনি
জেরা চলতে থাকে, পাতার পর পাতা আমায় নোট নিতে হয়
আমারও মনে কিছু প্রশ্ন জাগে, বোকামো হতে পারে ভেবে চুপ করে থাকি
অপেক্ষা করি আমার মত কখন জানতে চাওয়া হবে, গৌরবে ফুলে উঠবে বুক

আমি হাজার চেষ্টা করেও রিভলভার তো দূর অস্ত, চাকু ও চালাতে শিখিনি
হাতে জ্বলন্ত টর্চ নিয়ে জলের পাইপ বেয়ে ওঠা কিংবা নামা আমার পক্ষে সম্ভব নয়
তবে আমি ভাল ড্রাইভার, রোজ রোজ কত কালো গাড়ি অনুসরণ করি
এ শহরে যে এত আততায়ী, এত যে খুনে ও জোঁচোর, তা আগে জানাও ছিল না
এত যে কালো গাড়ি আছে, কালো শার্সি আঁটা, তাও এমনি সময়ে চোখেই পড়ে না

সম্ভাব্য সংঘর্ষে আমার ডাক পড়ে না, সত্যি বলতে কী, গোলাগুলিতে আমি সন্ত্রস্ত হই
আমি জুজুৎসু কুস্তি কুংফু কিছুই জানিনে, ফলে বেশ ক'বার আমি আহত হয়েছি
আমাকে বারবার রক্ষা করে গোয়েন্দা প্রমাণ করেছে আমি আসলে শ্লথ ও ভিত্ত
এতদর্থে, বলা যায়, নেহাত করুণাবশত ও আমাকে তদন্তের সঙ্গী করে রাখে
তাই কখনও কখনও নিজের প্রতি ঘৃণা হবে, অনাস্থা হবে, সে তো স্বাভাবিক

এই যে এত মুখোশ পরা শয়তান, চিৎপুর রোড দিয়ে গাড়ি ধাওয়া করা
অন্ধকার রাতে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে, রোমহর্ষক কত না রাহাজানি রক্তপাত
এই যে অগুনতি মেরুদণ্ড হিম করা খুনখারাপির শেষ অবধি সুরাহাও হয়
এই যে টুপি ও ওভারকোট পরা একটি মানুষ সব হাততালি কুড়িয়ে নিচ্ছে
কেউ জানুক বা না জানুক, আমি জানি, রতনলালেরও কিছু অবদান আছে



ছায়া মিউজিয়ম

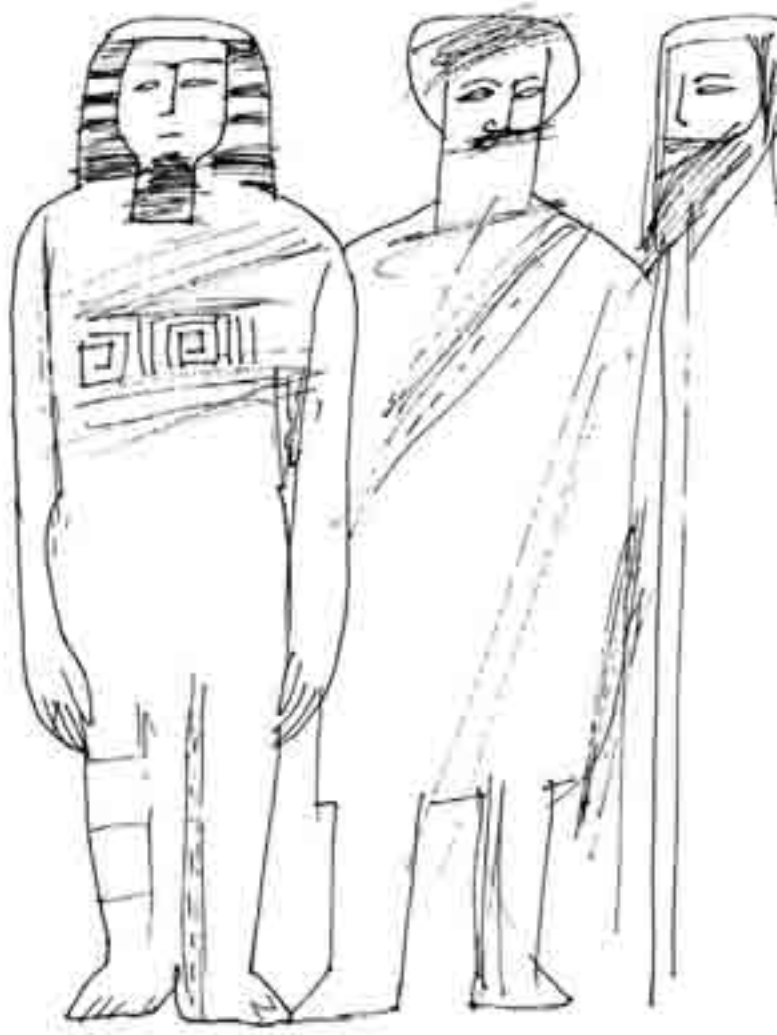
প্রবালকুমার বসু

এই শহরে একটা ছায়া মিউজিয়ম আছে
যার খবর প্রায় কেউই জানে না
আমিও সদ্য জেনেছি
আর সেই থেকে খোঁজ করে চলেছি
মিউজিয়মটা ঠিক কোথায়?

ছায়া মিউজিয়মে রাখা রয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ছায়া
এই রকম মিউজিয়ম পৃথিবীতে আর কোথাও নেই
এখানে তুতেনখামেনের পাশে রয়েছে
রাজা পঞ্চম জর্জের ছায়া
সিরাজ উদ্ দৌলার পাশে শেরশাহ-এর ছায়া
শুধু মানুষ নয়, বিভিন্ন প্রাণীর ছায়াও সংরক্ষিত রয়েছে এখানে
জলহস্তীর ছায়ার পাশে ডাইনোসরের ছায়া
কিছু কিছু হারিয়ে যাওয়া নক্ষত্রের ছায়াও শুনেছি
রাখা আছে শেলফ-এ, নীল জারে

যাদের ছায়া রাখা আছে, এরা সবাই
অনেক অনেক বছর হল মৃত
কিন্তু মৃতের তো ছায়া পড়ে না
তা হলে কি এরা যখন জীবিত ছিল
এই ছায়া তখনকার?

এই শহরে একটা ছায়া মিউজিয়ম আছে
জানার পর থেকে সেটা খুঁজেই চলেছি
হয়তো আরও কত বছরই না খুঁজতে হত
যদি না আজ প্রায় মধ্যরাতে
তালা খুলে নিজের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে আবিষ্কার করতাম
রোজ ফিরে আসা বাড়িটা আসলে ছায়া মিউজিয়মই



প্রণয়কথা

পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

বিধাতা ডেকেছে বুঝি নিচু স্বরে, প্রান্তিক ভূমি জুড়ে
নিভে যাওয়া আলোর মৃত্যু চেতনায় ছুঁয়ে আছে
অস্থির ফলক। দৃষ্টিকে আড়াল করেছ বারবার, হরিণীর
নাভি গন্ধের মতো শ্বাস নিয়েছ প্রতিশোধ লিপ্সায়।
ক্লান্তিহীন বিধুর চিহ্ন মুছে গেলে তুল ঠিকানায় জড়ো হয়
শোকাক্ত নাদ, শব্দকথারা বৃত্ত পার হলে
ঘুমিয়ে পড়ে সারা দিনের রৌদ্রডানা। অগ্নি গভীর সন্ধেয়
কিছুটা ক্ষয় ফিরে ফিরে আসে, বাকিটা চলে যায়
দ্রাবিড় চিহ্নে। অসংখ্য পুরুষ প্রশ্ন একটাই, বাহিত আগুন
জ্বলে আর কত তীব্র প্রেম, শরীর জুড়ে তাপসময় খেলা।
বিরাগ এসেছে কক্ষপথে, চিহ্নিত জন্মবেলায় জলের প্রহর,
ভোরের পাখিঘরে বাদল দিনের সাজ।
আমাকে স্পর্শ করো নক্ষত্র বেষ্টিত আত্মকথনে,
মুক্ত হোক জ্যোৎস্নার প্রণয়কথা,
বিলুপ্ত নীলে হাজার হাজার বাতিল উর্বশী।



মেহেন্দি আকাশ

সুমন মহাস্তি

রোদে পিঠ রেখে মেয়েটি পড়ছে বিশেষ প্রতিবেদন
বিচ্ছেদ বাড়ছে মহানগর এবং শহরে
আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা ভুরিভুরি
দাম্পত্য মৃত্যুপ্রবণ, প্রেমও ক্ষণিক উৎসব
মেয়েটি জানে নারীবাদ, লিভ-ইন, একাকী মাতৃত্ব—
সম্পূর্ণ নিজের কক্ষপথে বেঁচে থাকা
বিবাহিত বান্ধবী তার ইনবক্সে লেখে হাহাকারে—
“প্রতিদিন গোপন রক্তক্ষরণ
প্রতিদিন মেনে নিয়ে বাঁচা
আমাদের মধ্যে তুই-ই ভাল আছিস নিজস্ব ব্যালকনিতে।”
মেয়েটির অনুভবে শীতের মরা বিকেলে হারিয়ে যাচ্ছে—
লালিত সুন্দরের মূর্ছনা।

গাছ সব সবুজ ফিরে পায় শীতকাল ফুরোলে
চার দিকে লাল, হলুদ, বেগুনি বিভার ফুল
মেয়েটি আবিরস্নাত এক সকালে বেথেয়ালে গেয়ে ওঠে—
ভালবাসার গান দু’-তিন কলি।

তরুণীর নিভৃত আকাশ ভরে যায় বিশ্বাসে মেহেন্দিপাতার রঙে।

অরণ্যের গভীরে

সনৎ সেন

এই সব কাঠে কাঠে সংঘাত অরণ্যের গভীরে শুষ্ক বিশৃঙ্খল খণ্ডের ভিতর
আকর্ষণ বিকর্ষণ অথবা শুধুই পাথরে পাথরে ঘর্ষণজাত অগ্নির স্ফুলিঙ্গ আর
সেখান থেকেই দাবানল দেখো ধীরে ধীরে জঙ্গলের গভীরে তার সর্বনাশী রূপ
সে দাঁউদাঁউ জ্বলছে আর গ্রাস করছে বৃক্ষ বৃক্ষলতা গুঁড়ির পাশে শিশু গাছটিকেও
মাটির নীচে অন্ধুরোদগমের স্বপ্নে বিভোর যে বীজ সেও তপ্ত মাটির অন্দরে আজ পরিণত
হচ্ছে নির্জীব অঙ্গারে আকাশমার্গে ধাবমান ধূস্রজাল আছন্ন করছে পরিচ্ছন্ন নীলিমা
অরণ্যে যাদের বসবাস বৃষ্টি ধারায় সঞ্চিত কৃত্রিম জলাশয়ে যাদের তৃষ্ণা নিবারণ
খাদ্য পানীয় তারাও দিশাহারা হয়ে ছুটে যাচ্ছে দিগ্বিদিক বড় ত্রস্ত ব্যস্ত পলায়নে
আদিম অধিবাসীরা অরণ্যের সম্পদে যাদের অধিকার জীবনধারণ তারাও চলেছে
নিরাপদ দূরত্বে নির্বিঘ্ন কোনও স্থানে ক্রমবর্ধমান উষ্ণতায় গলছে শৈলশিখরের হিম
প্রবহমাণ তুষারশ্রোতে জলস্ফীতি নদীতে সাগরে ডেকে আনে ধরায় অসময়ের প্লাবন
উদ্বিগ্ন চিন্তাঘটিত মুখ কপালে হাজার দুশ্চিন্তার কাটাকুটি রেখায় এক একটি দেশ মহাদেশ
কী ভাবে নির্বাপিত হবে বনস্থলে ডালপালায় ক্রমশ ছড়িয়ে যাওয়া আগ্রাসী এই আগুন
এই পৃথিবী প্রকৃতির সঙ্গে সুসামঞ্জস্যে যার প্রতিটি পল দিন ও রাত সেও আজ
অস্থির টালমাটাল পায়ে এগিয়ে চলেছে চরম পরিণতির দিকে অনিশ্চিত দিশায়।

কবিতার একপাতা

শঙ্খশুভ্র পাত্র

কবিতার একপাতা, তার জন্য মেঘ-খাতা, জল...
কলমে কবুল করি, ঝোড়ো হাওয়া, এতটা হিমেল!
স্পর্শে, প্রাণ আল্লাদিত। নিদাঘের আতপ্ত কৌশল
ব্যর্থ হল এক লপ্তে, তবু তুমি দিলে না হিমেল!

আষাঢ়স্য, ভাষাহারা, এই যে জীবন, ধারাপাত
জানালার পাশে একা, মেঘ-খাতা, বিরহকুসুম
অন্ধকারে প্রস্ফুটিত। শীর্ণ চাঁদে জ্যোৎস্নার পাঠ
তারকামণ্ডল চেনে, আর জানে গ্যালাক্সির ঘুম!

ইমেল ঠিকানা, আহা! মেলে নাই। তথাপি ভুবন
বানানে জানান দিল শুদ্ধমতি, বুদ্ধ অভিপ্রায়—
একে কি কবিতা বলে? কী জানি সে পাঠকের মন...
আমি যে তাহার প্রতি ভেসে যাই চিরমুগ্ধতায়।

কবিতার একপাতা, মেঘ-খাতা, আবেগ সম্বল...
কে লেখে! কলম নাকি মেঘে-ঢাকা তারার আঁচল?



ঝোরা

সেখ রমজান

এই যে সামান্য ঝোরা, কত বার কত নামে ডাকি
চিরল চিকন জল, পাশফেরা বাঁকে রাত্রিরাগ
বিজুরি চমক মৃদু, মন্দ্র মেঘ অথির একাকী
অনিমিখ নিরীক্ষায় বেজে ওঠে শিয়রে বেহাগ।

অবিরল হিম বহে, পালকের মিহিন প্রলেপ
বিন্দু বিন্দু তান ওড়ে, যেন ওড়ে সহস্র কুটজ
হিরণ্য দ্যুতির বাঁক, নিভৃত সে দিনের আক্ষেপ
স্থলিত পাখায় ঢাকা অতিদূর সেই পথ ব্রজ।

সেইখানে নিরাতপ কুঞ্জবাট, আনখ কুসুম
সংখ্যায় মেলে না তত্ত্ব, অগণন নক্ষত্র বুনন
গর্ভে তার যত স্তব, প্রতি স্তব শব্দকল্পদ্রুম
কে করেছে অবহেলা, আকাশ বেঁধেছে দু'নয়ন।

পথ তো সৃজন নয়, প্রতি প্রাস্ত অসুয়ানগরী
হোক না বিস্কৃত আয়ু, ঝোরা তুই আজ রাজেশ্বরী।

উপোসি বাংলার কবিতা: আটত্রিশ

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

আপন বাপন জানি, চাপন চৌকিও, খাটিয়াচোর খালি সামনে আয়—
চোর-পুলিশের খেলা। পুলিশ চোর সাজে; চোরেরা প্রোমোটিং-এ নাম লেখায়...
ফিটফাট বাংলা যে, ব্লুটুথসেট গুঁজে, পা থেকে মাথাতক গুচ্ছ কেত...
জিনসে ঢেকেছে তার ঘামাচি-আমবাত... প্রোটিনাভাবে ঢোকা রুগুণ পেট...
পেটের-ভিতরে-পানি হিস্যা টানাটানি... লিভারে ভাগাভাগি— যা' গুরু ক'ন!
হজম হয়নি খাঁটি— হপ্তাতোলা আঁটি... রাজনীতির চাঁটি— স্নায়ুদূষণ...
দেশভক্তির নামে আপদ যত আছে রঙের-ছুরি-দিয়ে কেটে ভাসাই...
দিবি মা হরির লুঠ, জেব-কোঁচড়-খুঁট... দু'হাতে লুটেপুটে চেটে মাখাই!

এমন মধুর 'হানি' কোথায় পাব রানি, পাবলিকের 'মানি' শুদ্ধ-ধন...
কিস্তি উদরে হয়, সহ্যে না এত খাঁই, উগরে ভেসে যায়— উফ বমন...
চেলাচামুগুগুলো যে পারে ছিঁড়ে নিল অনাথ্রাত ফুলও, চামড়া-কেশ...
অশান্তি ফুৎকারে চু-কিতকিত ছাড়ে বসছে-চেপে-ঘাড়ে দামড়া দেশ!
বাংলা উদ্যোম স্মার্ট— ব্র্যান্ডে অটসাঁট, বোলচালের ভাট— উহার ক্লাস...
তলায় তলায় ভয়... মানলে তোর নয়, না-মানলেই মামু 'তু খাল্লাস'!

মহড়া

সুস্মেলী দত্ত

চাতকের মতো চেয়ে থাকি রোজ বৃষ্টি বরছে অঝোরে
ওপাশে পলাশ এপাশে শিমুল নন্দাদামুরা খবরে

আমি উড়ালের গন্ধ শুঁকছি ইশকুল বেলা সাঙ্গ
উলঙ্গ বোধ আগুনকপালি শরীরের অর্ধাঙ্গ—

তুচ্ছ যা হোক নদীর মাটিতে ভিজেছিল মন অবুঝে
সর্বনাশীর শরীর ডুবছে ধুকছে হাঘরে সবুজই...

আস্তিনি ছুঁয়ে ক্রমশ বিষাদ বিষণ্ণ বেলা ভাগর
মধুলোভী জানে ইত্যাদি প্রেম আলুক শালুক নাগর

ওড়ে হসন্ত ওড়ে নামাবলি তুক মানে ভুল মোহনা
সারা রাতভোর পুড়ছে আগুন অসুর বিলাসী ছলনা

বুপ মহাকাল প্রিয় সম্ভাষী বিস্তার ভীকু শঙ্কা
চল মহারাজ চাটব নিষাদ বাঁশিওলা লবডঙ্কা

সমাধির পাশে পড়ে আছে লাশ আধাআধি সুখে জ্যান্ত
আল্লাদ হেঁড়ে টুকরো সোহাগি ভাতের বদলে ফ্যান তো...

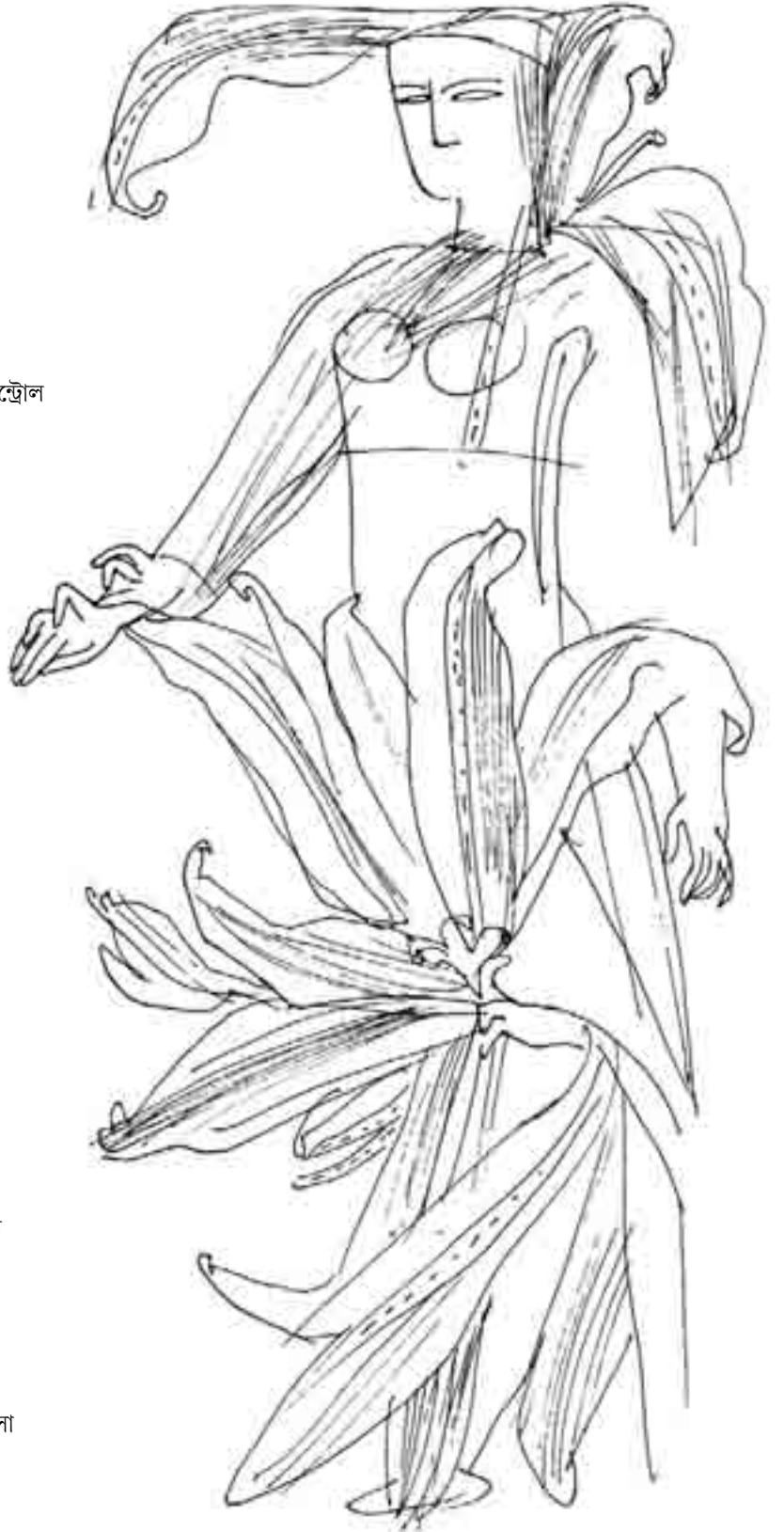
নাছোড় বর্ষা নাছোড় বৃষ্টি ঋতু ঋতু বাজে শঙ্খ
চেউ সম্ভোগে কুশীলব দুই নাটকের শেষ অঙ্ক।



চুক্তিপত্র

সায়ন্তনী নাগ

আজ আর সীমান্তে কোনও গোলাগুলি নেই
হাড়হিম উচিয়ে আছে জলপাইরঙা কুচকাওয়াজ
কূটনীতি বলছে ভাই ভাই,
বলছে সমঝোতা, অস্ত্র সংবরণ
আপাতত যুদ্ধবিরতি তাই,
ক্ষণজীবী শান্তিকল্যাণ।
এখন কোনও ভাঙচুর, গালিগালাজ,
বিষদাঁত, নোনতা রাতবালিশ... কিচ্ছুটি নেই
নৈশব্দ্য ঘিরে আছে দোতলার ব্যালকনি, লাইন অব কন্ট্রোল
একজনের খবরের কাগজের পাতা উড়ে
ছুঁয়ে যাচ্ছে আর একজনের গড়িয়ে পড়া উলের বল
এভাবেই দাম্পত্য ছড়িয়ে পড়ছে
মানিয়ে নেওয়ার অভ্যাসে...



পলাশকথা

জয়ন্ত সরকার

পলাশ, পলাশ, আগুন ছড়াও আকাশে
ডালে পাতায় ফুলকি ওঠে, পোড়ে রাজপথ।
পলাশ, তোমার বসন্তের বয়স বাড়ে না
উদাসী হয় জ্যোৎস্না অভিলাষী মনে
ওই দেখো প্রিয়-মুখ, ওই দেখো রৌদ্রফলকে
বিদ্ধ বাতাসে পাখির চিকন সুরের গান
অনন্ত নক্ষত্রপথ, লীলাভূমি, অরণ্যের গহন
ওখানেই কি দেখা হবে? ধরা দেবে তুমি?

পলাশ, তোমার পরিচয় অচেনা, প্রহেলিকায়, সহজিয়ার
গানে, তিরতির কাঁপনে, ঘুমহীন রাত্রির দূর-দূর ভয়ে
ছায়ায় বারবার দেখো নিজে, ফুলের বাহুল্যে ঢাকা
মহার্ঘ শরীর, দেখো
আর বাতাসে সেই দ্রিমিকি-দ্রিম, দ্রিমিকি-দ্রিম
কল্পলোকে পরাগমিলন হয়
খেলা করো, তৃপ্ত হও, প্রণয়লিপিতে বাঁধো কত ভালবাসা
রাতদিন মন ফস্কে উড়ে যায়... যাঃ..

ফাগুনের দেশে তুমি জন্মেছ পলাশ, ভুল
বোঝার অনুরাগ কি তোমাকে মানায়?

প্রস্তাব

দুলালেন্দু সরকার

তার পর আর যাওয়া হয়নি সেই নির্জন স্টেশনটিতে
নিচু প্ল্যাটফর্ম, শুকনো পাতার চাঁদোয়া, বৃদ্ধ স্টেশনমাস্টার
পড়ে আছে অবনত প্রস্তাব

ট্রেন যায়, ট্রেন আসে
হাওয়ায় ওড়ে শুকনো পাতা, প্রত্যয়, অপেক্ষা
সময়ের দীর্ঘশ্বাস, বয়স

ডাক শুনি অরণ্যের
তার ঐকে দেওয়া ক্যানভাস ভেসে ওঠে চোখের সম্মুখে
গুহামুখে পড়ে আছে কবেকার প্রস্তাব

বয়স বাড়ে, নাকি দূরত্ব
তোমার আনত চোখের অতলে দীর্ঘ এক পথ
অন্ধকার টানেল পার হয়ে মুখ বের করছে দূরপাল্লার ট্রেন

শুভ বিজয়া

ম্লেহাশিস পাল

সুদীর্ঘ অপেক্ষারত অনিন্দ্য-সুন্দর মনই হল ভগবান!
আমি তার নবীন পূজারি,

শুধু ঘুরে ঘুরে মরি—

ঝড়ে ভাঙা উদ্ভিদের নিঝুম চিৎকার থেকে

নকল হাসির মতো, চোরেদের ফেলে যাওয়া অবিকল আসল চাবিতে...

মেঘে ঢাকা চোখের আড়ালে— একা একা বুঝি—

বৈরাগ্যই শ্রেয়; শ্রেষ্ঠ ঋতু দুঃখ, ঋতুরাজ...

আকাশের বুকেই দূরত্ব, রাজত্ব— দূরত্ব—

রাজত্বের মধ্যেই আকাশ... ঘিরে রাখে বৃষ্টির প্রদীপ...

মাঝরাতে, সেই আলো ঘুরে ঘুরে দেখি...

নিঃসীম আলোয় দেখি; অভিধানময় এই রক্ষ পৃথিবীতে— প্রিয় অভিমান, গীতবিতানের আল ধরে
নিশ্চুপে হারিয়ে যাচ্ছে—
বিসর্জন-ঘাটে...

চৈত্রের দুপুর

শ্যামলজিৎ সাহা

তপ্ত সরগিতে শুধু দু'-একটি কুকুরের চলাফেরা।
বাকি যা-ই দেখি যেন প্রহেলিকা, দূর-কাছে
কেউ দাঁড়ালেও জলের প্রতীতি বলে ভ্রম হয়;
আর একটু এগোলে প্রাচীন বটের ছায়া যেন
শেকড় চারিয়ে মাটির গভীরে ঢুকে গেছে;
ছায়া দেবে না, আশ্রয় দেবে না এই পথিকের।
চেনা মানুষ খুঁজেছি— জল চাই, জল চাই,
কেউ নেই; আমার শহর আজ মৃত নগরীর মতো।
ওই দিকে গলির ভেতরে যে ঢুকে গেল, ত্বরিতে
তার পিছু ধরি, অকস্মাৎ সে ফিরে তাকালে
দেখি কেউ নয়; সে মনুষ্যমূর্তিও নয়; তবে কে?
এই ভরদুপুরে কী কাণ্ড যে ঘটছে আর কী
ঘটবে এখন ভাবতে ভাবতে সামনে এগোই—
এই চৈত্র দিনে শুষ্ক পাতার ভিড়ে আমি
ক্রমে ডুবে যেতে যেতে দেখি আমার মুখটি তুলে
একটি ফরসা হাত বিন্দু বিন্দু জল ঢেলে যাচ্ছে...



নিষিদ্ধ রাস্তার মেয়ে

অভিজিৎ রায়

নিষিদ্ধ রাস্তার পাশে
দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে তোমাকে দেখেছি।
কোথা থেকে এসেছিলে?
কোন প্রেমিকের হাত ধরে তুমি ছেড়েছিলে ঘর?
যে তোমাকে পণ্য ভেবে
বিক্রি করে ঘুরিয়েছিল নজর!

এখন হিসেব শিখে দাঁড়িয়েছ
নিষিদ্ধ রাস্তার ভিড়ে
অনেক দিয়েছ সুখ, পেয়েছ কী
নিজের শরীরে?

শরীরের নাম নেই,
নাম নেই
হৃদয়ের কোনও;
বেলি ফুল ছুঁয়ে হাওয়া
বলে গেল,
মন তুমি দাওনি এখনও।

দিয়েছ কি নিষিদ্ধ রাস্তার মেয়ে?



অন্ন

পার্থজিৎ চন্দ

আমরা তো বুদ্ধেরই মতো, জীবনভর বন্দীকের তপস্যা করেছি
বিষগ্নতা আমাদের রোজ কোলে-পিঠে করে ক্ষতে বিষময় থুতু
মাখিয়ে দিয়েছে। ব্যথা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি দূর গ্রাম থেকে গ্রামে
সূর্য অস্ত গেছে করোটিতে, দুটো চোখ কামপীঠ; বকবাকে ক্রতু
তাকিয়ে থেকেছে নির্বিকল্প, ভরা পাথর-স্তনের দিকে; রক্তমাংসশূন্য
তবু কোনও দিন ধারা ক্ষরিত হবার কথা ভেবে অসহায় জিভ
চকিত হয়েছে একা, 'মার' তার বীণা ফেলে রেখে ঘুমিয়েছে পাশে
সূর্যরেখা ফুটেছে প্রত্যুষে; আমাদের মুঞ্জপরা মাথা পিন্ডরক্ষা-পুণ্য
হয়ে প্রবেশ করেছে পেটে... সেতার রূপান্তরিত... রক্তলোভী ছোরা
পারা-মাখা অন্নের থালায় পাখি ঠুকরে মরে গেছে; মৃৎপাত্রের বিষ-
স্মিতহাস্যে ঠোঁটে তুলে তবু দেখেছি নিশীথ-ছায়া, হিংসার বোরা...
ক্ষুধা, কাম, অরতি, বাসনা ঘিরে চাবুক মেরেছে। গোখুরের শিস
বয়ে গেছে রাত্রি-মাঠ জুড়ে। অন্ধ-শরভের ছুটে ঘুম ভেঙে তাকিয়েছি
দৃশ্যত নৈরঞ্জনার স্রোতে ভেসে যাচ্ছে তারাদল, আগুন-প্রশাখা...
কোনও দিন সুজাতা আসবে না... একাই আগুন জ্বলে, নিজেকে অর্পণ
পায়সাম, মৃত্যু-নীল জল; খেয়ে নাও শেষ গ্রাস... শেষ বিক্ষোৰণ

রোহিণীর লায়মান আলো, সমস্ত অন্নের গায়ে নিজ-রক্ত মাখা

মার্জনা

শ্যামশ্রী রায় কর্মকার

ওই তো বপন-ঋতু, চাষি দ্রুত পায়ে যাচ্ছে মাঠে
মাথার বুড়িতে কী রৌদ্রসম্ভব বীজধান!
তার কপালের বলিরেখা জুড়ে লেখা মেঘের পুরাণ
হাতের কড়ায় লেখা শ্রমকাব্য, শুষ্কতার ব্রত
ক্ষুধা তৃষ্ণা লুটিয়ে পড়ছে তার পায়ের পাতায়
কষ্ট করজোড়ে ঝুঁকে দাঁড়াল পথের এক পাশে
দুঃখ কী পরম বন্ধু, ছাতা ধরে আছে দীর্ঘ পথ
উদয়াস্ত রোমে রোমে গান গায় রজঃস্বলা মাটি
বহমান অলকানন্দার ধ্বনি শুনি সেই গানে
বন্দনার পূত দ্যুতি, বেদনামৃত মথিত স্বর

বন্ধু,
অনেক তো পড়া হল ভানের পাঁচালি
যে দেশে ভ্যানচালক সত্য, যে দেশে রেলশ্রমিক
কৃতকার্য হলে ট্রেন চলে, যে দেশে নির্মাণকারী
ডান হাত মেধাবী শ্রমিকের, বাম হাত শিল্পীর তুলি
সেই অর্ধেক দেশ চাষির পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে
সে-ই তুমি

যে পরনির্ভরশীল বলে তোমার পাশে দাঁড়াতেও শেখেনি
আমিই সেই অন্য অর্ধেক

আমাকে মার্জনা করো



সেই চোখ

সোহরাব পাশা

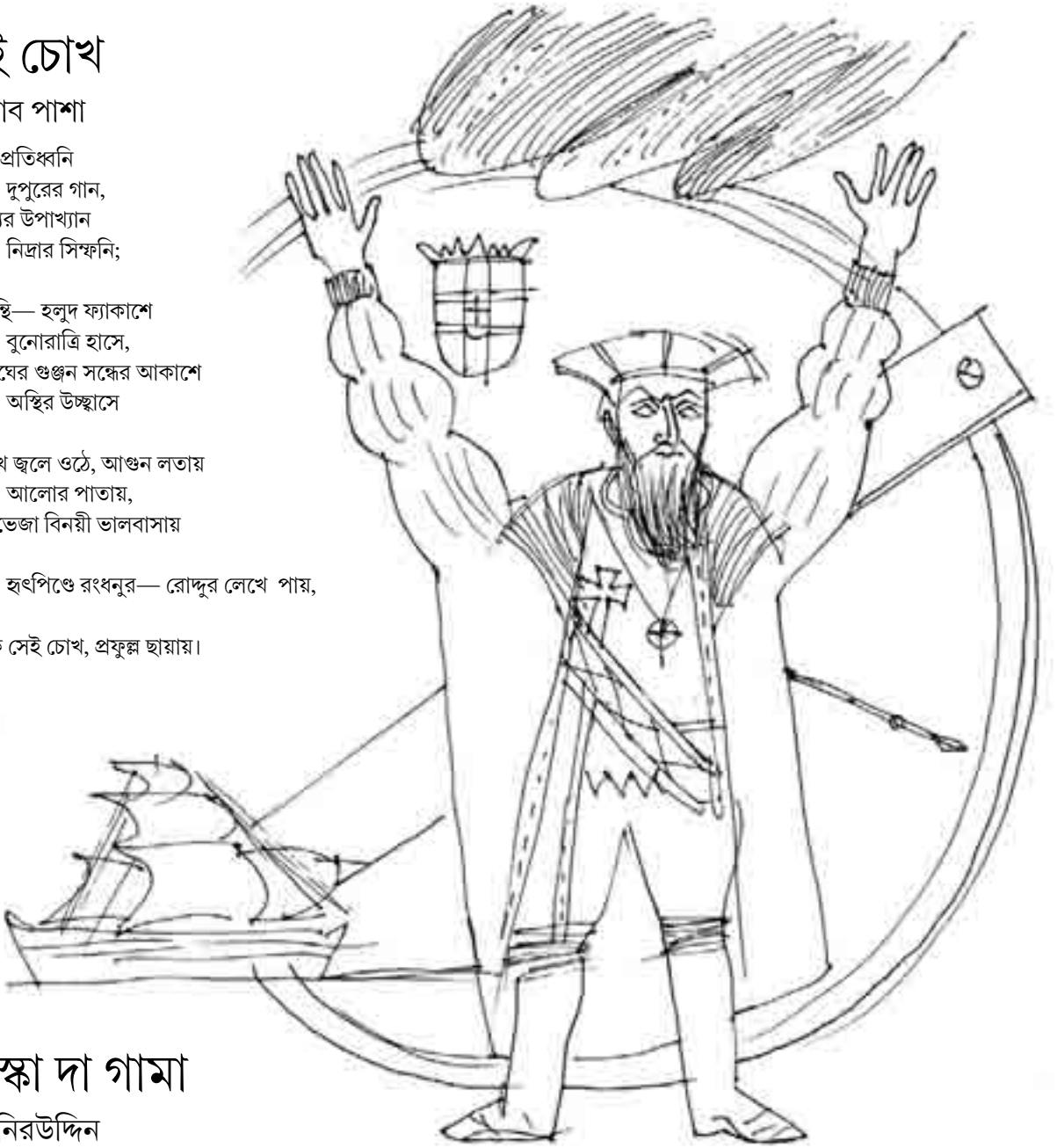
আলোর প্রতিধ্বনি
দুপুরের গান,
নৈশব্দের উপাখ্যান
নিদ্রার সিস্ফনি;

বিনিদ্রগ্রস্থি— হলুদ ফ্যাকাশে
বুনোরাত্রি হাসে,
ক্ষিপ্ত মেঘের গুঞ্জন সন্দের আকাশে
অস্থির উচ্ছ্বাসে

সেই চোখ জ্বলে ওঠে, আগুন লতায়
আলোর পাতায়,
দীর্ঘ স্বপ্নভেজা বিনয়ী ভালবাসায়

হৃৎপিণ্ডে রংধনুর— রোদ্দুর লেখে পায়,

দূর ডাকে সেই চোখ, প্রফুল্ল ছায়ায়।



ভাস্কো দা গামা

এস মনিরউদ্দিন

জন্মান্তর থেকে উঠে-আসা এক কঠিন গণিত
ক্রমশ বিলীন হচ্ছে সূর্যাস্তের আলোয়। কম্পাস থেকে মুখ ফিরিয়ে তিনি জলরাশির উপর দিয়ে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করলেন
দিগন্ত পারে।

আশ্চর্য এক আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে দিকচক্রবাল। আগেও দেখেছেন এই আলোর খেলা, তবে আজ যেন অন্য রকম
আলোর উদ্ভাস।

সাঁউ গাব্রিয়েল থেকে আর তিনটি জাহাজের অবস্থান দেখে নেবার পর হাত রাখলেন থুতনিতে; স্পর্শ করলেন শ্মশ্রুশাশি। তাঁর
কম্পমান বুকের গভীর থেকে এক দীর্ঘশ্বাস সমুদ্রের জলরাশির উথালপাতালে মিশে গেল; যেন খণ্ডিত এক মেঘ বিলীন হল
বিশাল মেঘপুঞ্জের পেটের ভেতর।

আকাশের কত রং হয়, আর কত যে রঙের সমাহার নিয়ে উদ্ভাসিত হয় আকাশ, তা অবলোকনের মধ্য দিয়ে ভাস্কো যেন গভীর
এক জীবনবেদ রচনা করছেন।

তিনি আকাশের দিকে হাত দু'টি তুললেন, যেন আনন্দময় এক সমর্পণ।

তত ক্ষণে আকাশ জুড়ে শুরু হয়েছে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টিধারায় অবগাহন করছেন ভাস্কো দা গামা।

প্রেম

পার্থপ্রতিম আচার্য

চুল বাঁধতে পারি না বলে রান্না করতেও পারব না
এমন কোনও কথা নেই।
গ্যাস জ্বালাতে পারি না বলে গান গাইতেও পারব না
তারও কোনও কথা নেই।
তোমার জন্য ঠিক দু'মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারব।

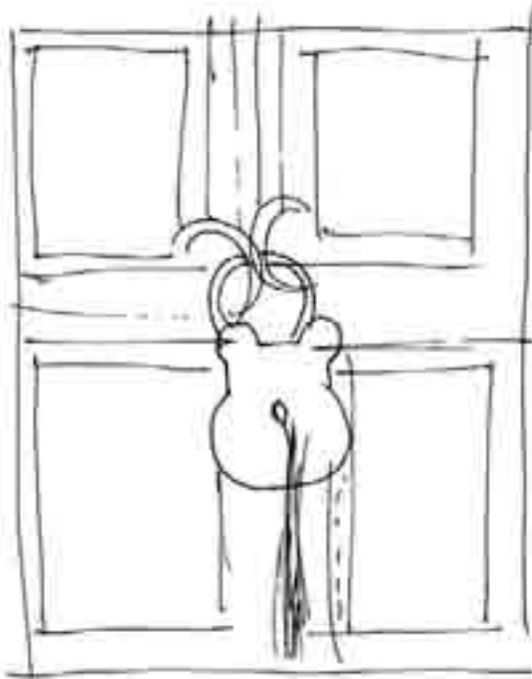
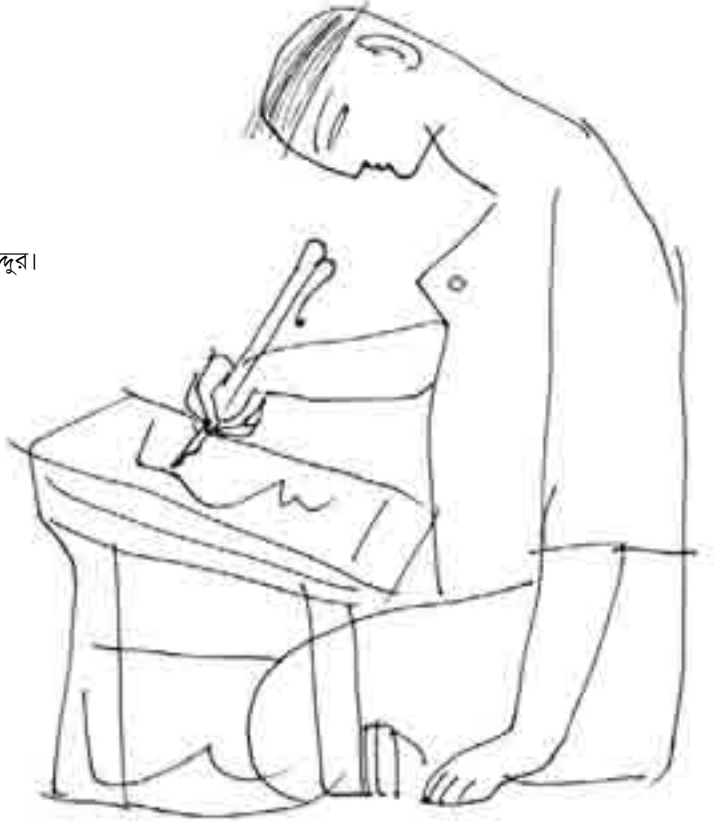
সময়মতন অফিস পাঠিয়ে আমি না হয় ড্রয়িং করব
দিনান্তের আঙিনায় তোমার জন্য টাঙিয়ে দেব প্রশান্ত রোদুর।

বাজার করতে পারি না বলে ফুল তুলতেও পারব না
এমন কোনও কথা নেই।
ভোরবেলায় স্নান করে কপালে লাগিয়ে নেব রক্তচন্দন,
গোপালের জন্য গেঁথে নেব দোপাটি ফুলের মালা
অফিস থেকে ফিরে তুমি পাবে
কামিনীফুলের অবিনশ্বর ঘ্রাণ...

সারা রাত্রি কথা হবে আমাদের,
চাঁদ ও নক্ষত্রের লাজুক আকাশে
এক মনে খেলে বেড়াবে করুণাময় আলো...

সবাই মিলে মিথ্যেকে ভালবেসেছে বলে
একজনও সত্যি হবে না, এমন কোনও কথা নেই।

ফুটফুটে বাচ্চা নেব এক বছরের মাথায়,
তার পরে হেঁটে যাব সমুদ্রের দিকে।



প্রথম সম্পর্কের রক্ত

অর্ণব পণ্ডা

পুরনো বাসার দিকে মাঝেমধ্যে যাই।
কারা থাকে ওখানে এখন?
এসেছে নতুন কোনও পরিবার? স্বামী-স্ত্রী কেবল?
ভেতরের রং জানি, বদলে গিয়েছে, তবু
সন্কেবেলা আলো জ্বললে দেখা যাবে
এখনও সিঁড়ির নীচে জ্বুতোগুলি সে রকমই গুঞ্জরনরত।
আর আমাদের কোনও দাগ নেই ঘরে।

বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে কখনও বুক ধক করে ওঠে।
গোপন রঞ্জের মতো সেই ক্ষত আজও আছে
যা কেবল দরজা-ছিদ্রে চোখ রাখলে দেখা যেত ভেতরের ঘরে।

যখন থাকে না কেউ, মস্ত এক তালা খুলে থাকে দরজায়।
আমি কিন্তু দেখতে পাই প্রথম সম্পর্কের রক্ত
টুইয়ে নেমে আসছে ফোঁটা ফোঁটা
অন্ধকার তালার ভেতর থেকে।

ইলিন

সুদীপ বসু

বাঁ চোখের নীচে কাটা দাগ
আয়না বলতে আমি এটুকুই বুঝি
মেয়েটির নাম ইলিন
চোরাচালানের ফুল নিয়ে আসত লুকিয়ে লুকিয়ে
সে জানত নিশিডাক
জোছনায় তছনছ হয়ে যাওয়া পাওয়ার স্টেশন।

সে জানত ছেড়ে যেতে হবে,
কাঠের বন্দুকের এই আশ্চর্য দোকান
ইলিন
আমি ভালবাসতাম তাকে
আর এক দিন হারিয়ে ফেললাম
জামরুলের অন্ধকারে ছুটে যাওয়া শিসের মতন।



ফিনকি দিয়ে ওঠা ক্ষতমুখ

সৌমিত বসু

এক দিন একটা বাঘের সঙ্গে আকাশের দেখা হল
তাদের কথা হল,
কিন্তু বন্ধুত্ব হল না।

এক রাতে চাঁদ ও বেড়াল মুখোমুখি
বেড়াল জানাল, সকলেই নাকি
চাঁদ হয়ে উঠতে চায়।
চাঁদ মুচকি হাসল
তবু তাদের বন্ধুত্ব হল না।

এক বার ক্রসফায়ারের পর
একটা বন্দুক আর একটা কার্তুজ
পাশাপাশি শুয়ে আছে,
তাদের তুলে নেওয়ার মতো
চার পাশে কোনও জীবিত মানুষ নেই
প্রগাঢ় বন্ধুত্বে তারা এক জন আর এক জনকে
জড়িয়ে ধরতে চায়

একটি অভিশাপের অর্থ অন্য প্রাপ্তে দাঁড়িয়ে
বন্ধুত্ব নিঃশব্দে হাসছে।



আদিম অভ্যাস

সুদীপ চক্রবর্তী

আসলে তুমিও মানুষের মতো আরও সব মানুষেরই মতো, এসেছ কী এক নিরাময়হীন ক্ষত নিয়ে। সত্যি কি চেয়েছিলে এক দিন কেউ এসে বলবে— তোমার সমস্ত দুর্ভাবনা, সমস্ত ক্লেশ আমাকে দিয়ে দাও! তুমি তো জানতে এ শুধুই কবিতা। প্রতিটি প্রত্যাশা আসলে আক্ষেপ বয়ে নিয়ে আসে, যেভাবে ওপরওয়ালারা, চিৎকার করে ওঠে! নীচের আরও নীচের দিকে, বয়ে চলে সে প্রবাহ। তারও কি মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের কথা! মনে হয়; সেও তো মানুষই এক জন, সেও তো বয়ে নিয়ে বেড়ায় আরও এক নিরাময় আশা। তোমার বুটের আঘাত আমার পরিচিত। তোমাকে চিরকাল ভেবে এসেছি সফল। যদি সফলতা বলে কিছু থাকে তো! জেনে এসেছি তোমার সততার প্রবন্ধ মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হয়! কিন্তু এই যোর দুর্যোগে থেকে থেকে ভেসে আসে তোমার মর্মস্ফুট চিৎকার। কেউ কি দিতে পারে নিরাময়? কেউ দিতে পারে এই দুর্যোগ থেকে পরিত্রাণের উপায়? যে ক্ষমতার দণ্ড দিয়ে ভয় দেখাতে তুমি, তাও আছে যথাযথ জানি। যে পেন দিয়ে তুমি কেটে দিয়েছ একের পর এক নাম, তার কালি এখনও অটুট। অথচ এখনও কী এক গভীর ক্ষত নিয়ে সারা দিন কেটে যায় তোমার! কত কত রাত নিদ্রাহীন তুমি অথচ মধ্যে অবিরাম!

আন্তর্জাল

শর্মিষ্ঠা

যেন কোনও তাড়া নেই
যেন কোনও শহর ছুটে যাচ্ছে না কোথাও
যেন সমস্ত বড়-মেজো-সেজো-ন-রাঙা-ছোট-নূতন সাহিত্যিকের
চকচকে বুদ্ধদণ্ডলি কোলাহলহীন হয়ে গেছে।

নেট নেই তাই।

লিখতে হবেই এমন কোনও তাড়া নেই
পাশে রাখা অভয়-ঔষধের মতো
মেপে মেপে ব্যবহার করা যায় আরণ্যকটি।

কেউ দেখুক না দেখুক
টাঁড়বারোর মতো মেঘ ধরবেই সেগুনের মাথায়
নীচে খসে পড়বে
প্রকৃত আন্তর্জাল—

পাতার আলো-বাদামি জাফরি
দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে নেবে শিশুটি



পরিয়ায়ী

সীমা জানা

তোমার কথা ভাবলেই চোখের সামনে একটা
পাহাড়চূড়া ভেসে ওঠে। ও পারে তার বার্না, সরোবর,
শস্যখেত, গৃহ ও গৃহপালিত নিয়ে গড়ে ওঠা ছোট ছোট গাঁ
কৃষক ও কৃষকবধূটি এক সঙ্গে বীজ বোনে, সাঁকো পার হয়
অতিথির জন্য প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে
সন্ধে হলে ঘরে ফেরে সব, যারা গিয়েছিল ভোরে

পাহাড়ের এ পারে কোনও উঠোন নেই। এখানে
ঘন্টায় ঘন্টায় বাড় ওঠে, কালো মেঘ নেমে আসে মাথার ওপরে।
আমি রোজ টিলা ভেঙে ভেঙে, টিলা ভেঙে ভেঙে
আরও উঁচু টিলার ওপরে উঠি। অনতিক্রম্য পাহাড়চূড়া দেখি
বাতাসেরা হি হি হাসে। চূড়ার ওপর দিয়ে
ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যায় দূরগামী পাখি।

অবশিষ্ট সমুদ্রবন্দর এবং একটি গাঙচিল

দীপা পান

নির্জন হয়ে বসে আছি
যে শূন্যতা আমাকে চেনে, ঠিক তার পাশে।
দু'হাতে ভরা আছে ধুতুরার ফল!

বাস্তবিক যা কিছু আমার ছিল-
স্যামন্তক অপেক্ষার দিনে ভেসে গেছে
নোনতা জলের টানে। দূরের একটি সমুদ্রবন্দর।

ভেসে গেছে খসে পড়া পালকের স্বাণ,
পালকের স্পর্শের মতো যত সূক্ষ্ম উপশিরা।
সন্ধেতে অধরা নিরাময়।

আমি তার চলে যাওয়া মেনে নিয়ে
নিকিয়ে রেখেছি অবশিষ্ট ভগ্নাংশ, সময়ের উষ্ণতা,
এখনও শ্বাস প্রশ্বাসে বিশুদ্ধ নিবেদন!

যে শূন্যতা মাংসাসী, যে শূন্যতা আমার খাদক
সেও আজ চুপটি বসে আছে—
ত্যাগী পুরুষের হাতের মতো উদাসীন!



প্রস্তুতি

সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

দু'হাতে ঐঁকেছি কারাগার
দু'কানে শুনেছি মৃত্যুস্তব
দু'চোখে বেঁধেছি আবরণ
দু'অলিন্দে ভাসমান শব

আমাদের যোগাযোগ নেই
সেতু ভেসে গেছে বন্যাজলে
স্মৃতি বলতে আছে রণখেত
শস্যেরা শস্ত্রের কথা বলে

ভালবাসা চিতায় আসীন
দূর থেকে পোড়া গন্ধ পাই
কাছে গিয়ে করেছি চয়নও
পদাবলি-ভস্মীভূত ছাই

চাপচাপ অভিমান জমা
ক্রোধের পিছনে ঘোরে ক্ষমা



চেনা পথ, অচেনা মানুষ

অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়

তুমি কি সত্যিই আজ চলে যাবে, শুনবে না কথা?
তোমার কিসের কষ্ট, আমাকে বলতে পারো, একা
চুপি চুপি চলে গেলে তার কোনও থাকে না মান্যতা
বৃষ্টির ধারার মতো মুছে যায় মৌন পদরেখা।

বাতাসে বারুদ ছিল, আকাশটি ভরা নীলিমায়
বুকের গোপনে ছিল আশা-নিরাশার খোলামুখ
চঞ্চল পাখির মতো উড়েছিল মেঘের ছায়ায়
স্বপ্ন দিয়ে ঢাকা প্রেম, ভালবাসা গোপন, উন্মুখ।

সোনালি দুঃখের দিন শেষ হতে আর দেরি নেই
প্রভঞ্জন বয় বেগে আলোক ইশারা করে কত
শব্দ তুলে চলে যাও, আমিও তো যাব সেখানেই
যেখানে প্রসন্ন দিন ঢেলে যায় করুণা সতত।

বৃষ্টির মহিমা মাথা ভ্রমরের গুঞ্জনের সাথে
আদরের ডুবজলে ভালবেসে সাজাব বাসর
আলোর তুফান তুলে নিশীথের নরম প্রপাতে
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বেঁধে নেব আমাদের ঘর।

অন্তঃপুরে কেউ নেই, ডাকলেও দেবে নাকো সাড়া
গুঞ্জে স্বপ্নিল রাত্রি জুড়ে রবে মগ্ন চরাচর
উত্তরে তুমিও মুগ্ধ, স্বপ্নভ্রমে দৃষ্টি পরস্পরা
উজ্জয়িনী চেনা মুখ, সৃষ্টিসুখে অস্পষ্ট অক্ষর!



অভিমান

রাজকুমার রায়চৌধুরী

সন্তান ও স্ত্রীর মাঝখানে বসে মনে হয়, এ সুখ ঈশ্বরের রচিত।
সমস্ত রাগ ও অভিমান খরচা করি প্রতিটি দিন ওদের কাছেই।
ওরা তা ধরে নেয় অদ্ভুত কায়দায়! আমার সমস্ত বিপদের মধ্যে
শূন্যে লাফিয়ে অন্তর্জগতে মিশে ওরা বলে, “জানালাটা খুলে
দিই, বাইরের আলোটি খুব নিঃসঙ্গ, ওকে সঙ্গ দাও।”

ওদের দুঃখ আঙুলে রেখে একটা লেখার কাছে পৌঁছোতে চাই।
শুধু বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় তোমাদের! তোমাদের নানাবিধ বেদনা
পড়ার মতো নির্জন ভাষাকে যদি অল্প একটু চিন্তাম! যদি ছুঁয়ে
দিতে পারতাম ওই সংবেদনশীল দিনগুলি।

খেলা হবে

সুজিত দাস

যদি চিঠি লেখো আর এক বার, কেটে যাবে কালসর্প দোষ।
যদি আর এক বার জিভে ছোঁয়াও ম্যাটফিনিশের ওই অলৌকিক ডাকটিকিট...
বামবাম বেজে উঠবে পাহাড়ি রাস্তা, চাঁদের আলোয় ভেসে যাবে আর্মি গলফ কোর্স।
পাংখাবাড়ির রাস্তা থেকে দূরের শিলিগুড়ি শহর, মন্তবলে হিরের নেকলেস।

চিঠি দাও, আর এক বার।
আদিবাসী তরুণ দাপিয়ে বেড়াবে মফস্সলের মাঠ।
ঘামে ভেজা জার্সি। সাদ্রি ভাষায় উড়ে আসা চিৎকার, কলেজ মাঠে রেফারির লম্বা বাঁশি।
রাধিকার বুক ধড়ফড়, জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের আমলকী পাতায় মৃদু কম্পন।
খেলা হবে।

খেলা তো হবেই, সখি।
আয়নার সামনে দাঁড়ালে অফসাইডের পতাকা। কোথাও কোনও স্পেস নেই।
প্রচ্ছদে খেলা হচ্ছে, ব্লার্বে খেলা হচ্ছে। বিটুইন দ্য লাইনস, সে এক চরম খেলা!
ঘুমের ওষুধ এবং পুরনো প্রেমিকা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। মুখ ফিরিয়েছে শাটলের জোঙ্গা।
দু’একটি তামাদি চিঠিতে এখনও দপদপ করে জোনাকির মৃদু আলো।
খেলা হয় পাহাড়ের সানুদেশে। এখনও খুনিয়া মোড় দাপিয়ে একা বাড়ি ফেরে বিষণ্ণ মাতাল।
মাঝরাতে নক্ষত্রের খেলা হয়। ছোট গোলপোস্ট, সেভেন-সাইড ম্যাচ। মাইকে প্যারোডি গান,
ঘ্যাম খেলা।

খেলা এখনও বাকি সখি, সবে তো আষাঢ়ের শুরু। ইনজুরি টাইমে কী হয়, কী হয়!

সফরনামা

কামরঞ্জামান

শূন্য সফর

শেষের পথ মনথারাপ কেটে কেটে এগোয়
মনভাল জুড়তে জুড়তে কোনও রক্তপাত নেই

বরং ফুটেছে নির্ধারিত না ফোটা কুঁড়ি
তাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিশ্চিত এগোতে জানে পথ

পথ হতেই পারে দীর্ঘ ভ্রমণ, কিঞ্চিৎ কষ্ট বিলাস
হতেই পারে পথ ফিরতি ক্লান্ত ছায়া শাখার পতন
কিংবা ঘুম ঢুলু চোখ পেতে চায় খানিক বিশ্রাম
এগোতেই হবে পথ— তাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিশ্চিত

শুভেচ্ছা সফর

নীরবতার এক মিনিট মানে
দু'চোখের খানিক বিশ্রাম
চোখ স্নেহ, কচুপাতায় জল টলমল

বৃষ্টি সরণি জবরদখল নেয় শুভেচ্ছা সফরে
ফাঁকা মাঠ, লাঙল, বলদ— চাষশিল্প আঁকে
বরফের স্রু থেকে চোখ টানে স্মৃতিলিপি
বুক ভর্তি কাটাকুটি, শব্দ একটু একটু করে হয় বর্ণহীন

প্রতিদিন পরিচিত সূর্যভোর
সকাল ডেকেছে ভীরু পদক্ষেপে— একবুক ভালবাসায়...



দেবী দুর্গার দশ হাত

তুষার ভট্টাচার্য

টাপুর টুপুর বৃষ্টিতে ভিজে যে মেয়েরা বিজন দুপুরে
একদা দোকা গোলা ছুট খেলতে ছুটে যায় হিজলের বনে
তাদের উড়াল দু'ডানায় লেগে থাকে
রৌদ্র চন্দনের ঘ্রাণ;
মেঘভাঙা জোছনা রাতে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে যে মেয়েরা
গুনগুন করে গায় বিরহের গান
তাদের অশ্রুমতী চোখে ভেসে ওঠে
কিশোর রবি ঠাকুরের মুখ;
ভোর সকালে যে মেয়েরা নুন ঘাম জলে ভিজে
বজবজ ক্যানিং লোকালে
চেপে মহানগরে এসে বাড়ি বাড়ি
হাজায় খাওয়া দু'হাতে বাসন মাজে
তাদের রোগাটে শরীরে জেগে ওঠে দেবী দুর্গার দশ হাত;
আর ঘুমের ভিতরে খিলখিল করে হেসে ওঠে
যে ছোট্ট মেয়ে
তার চোখেমুখে শরীরে ওই পুব আকাশ থেকে
দেবদূত উড়ে এসে ছড়িয়ে দেয়
বিকমিক আলোর উদ্ভাস।



দুর্গাপূজার নিয়মাবলি

রত্নদীপা দে ঘোষ

মধুকৈটভনাশিনীর পাদপদ্মে নিজেকে সমর্পণ!

স্মরণ করো চার বেদ তিন চক্ষু সাত দৃষ্টি নিবিড় পবিত্রতা
এই ভূমণ্ডল তাঁহারই কৃপা। ব্রহ্মাদেবীর আশীর্বাদ কপালে, বক্ষে
ইন্দ্রদেবের শঙ্খনিদাদ অত্যন্ত সুলক্ষণ। তাঁকে ধারণ করো মস্তকে
অখণ্ডমণ্ডল মহাসূর্য, তাঁর মঙ্গলধারায় নিযুক্ত হোক আদ্যাশক্তি

নদী আকাশ জল। স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভূমানন্দের বাহক। বাম তর্জনীতে
বিদূষী তপোবন। আছতির হাতপাখা বইছে বিশ্বলোকের বন্দরে
মৃদুহাতে আচমনের পাপড়ি! অঙ্কুরিত কলিগুচ্ছ, বৈকুণ্ঠকে

জগৎপালিকা তিনি, দিগন্তের কোণে কোণে স্পষ্ট তাঁর
প্রজ্ঞাবতী উষা! রৌদ্র আর পঞ্চগব্যে লেখো পাঁচ আনা প্রণাম
আদুরে কন্যা তুমি! আবদার পরাও মায়ের গহনারং চালচিত্রে

বিলাবল তাঁর বৈদিক চলাচল। বীজপত্রে টাটকা মধুক্ষরা মিথিলা
চাঁদ আর ধরিত্রীর সঙ্গমস্থলে ভাস্তিনাশিনীর বাসস্থান। তুমি কণামাত্র
চর্যাপদের যমুনাকে প্রদক্ষিণ! অঞ্জলির আটচালায় ভিক্ষাপাত্র শেখো

দীনতম তুমি, রক্তমাংসে টালমাটাল তোমার অন্দরদশা
চারপ্রহর শেষ হলে কাঁদো! কাঁদো চোখের খেরোখাতা খুলে
চোখের চাইতে মহৎ শুকসারী আর নাই গো!



ধ্যান

রামকৃষ্ণ মহাপাত্র

আকাশের পরে শূন্য আরও,
কী অসীম, কী অনন্ত..
হৃদয়ে শান্ত মেঘ;
মগ্ন, সমাহিত
এ কোন মায়া? পবিত্র অগ্নিস্নান সেরে
গোধূলির আনত আলায়
আত্মস্থ করো মৃত্যুর সমান এই নীরবতা,
বোধিবৃক্ষতলে!

অদীপ সন্ধ্যায় ফুটে ওঠে
দু'-একটা অন্ধতারা

মোক্ষনদীর জল কী যে শান্ত!



বধ্যভূমির দিন

অনিন্দিতা গুপ্ত রায়

জ্বলন্ত লাভার মতো ছুটে আসবে যা কিছু
সে সবে গায়ে কোনও স্মৃতি নেই সূর্যোদয় নেই
ভয়ে ভয়ে দূরে থাকি, কথাটি বলি না
তবু তির, স্তব্ধতা লক্ষ্য করে নিখুঁত, ধারালো
ছুটে আসে, বিঁধে যায়।
কচ্ছপ-জন্ম চাই, সহজাত খোলসের গর্ভ-আড়াল!
লুকোনো তোরঙ্গ চাবি তুলে দিয়ে বলেছ যে হাতে
এই, এই যত কিছু মান অপমান
হা হা কষ্ট, আধপোড়া হৃৎপিণ্ড,
ওপড়ানো নখের ভিতর জমা
চাপ চাপ ব্যথা সব এখানে গোপন
তুমি রাখো, নিরাময় দাও—
তাদেরই ধুলোয় যত অবহেলা, ইতিহাস জানে।
তর্জনী তুলে তুলে প্রতিশোধ বুঝে নেওয়া
গোপন ইশতেহারে নিলামপত্র লেখা দেশ বা মাটির।
চিহ্নিত জন্মদাগ, পরিচয়, খিদের আগুন
কৌতুকজনক খুব, প্রকাশ্যে অশ্রু যেমন!

অপরিচিতের মতো চেয়ে থাকা— বুকে বিঁধে গেলে
আজকাল ভুলে যাই
কে কার ঘাতক আর কে-ই বা স্বজন!



অশরীরীরা ফিরে আসে দুর্গাদালানে

মলয় ঘোষ

ধূসর স্মৃতি ছড়ালো খুব চুপিসারে, চেনা চেনা শরতের হাওয়ায়
শহরের মোহ বন্ধনে যে জীবন ব্যস্তসমস্ত, পাশাপাশি অন্য জীবনে
সেখান মাঠে ঘাটে খর রোদে, বৃষ্টি দুপুরে অমোঘ প্রকৃতি
ঘুম ভেঙে গেলে উঠে দেখি পুজোর গন্ধ বালিশে বিছানায়

ক্রমশ গুছিয়ে নিয়েছি ব্যাগ, হেঁটে যেতে হবে দূরের রাস্তায়
ওই তো বাস ছাড়ছে, যাচ্ছি ভাই, যাচ্ছি হে, তুমিও চলো
দূরগামী ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে, সবুজ সিগন্যাল
ওই তো ফেরিঘাট, বিদায়ী নীলাভ রুমাল ওড়াচ্ছে কেউ
দুর্গা দুর্গা জবাকুসুমসঙ্কাস, শরতের একটি সকাল

আমাদের দেশে ফেরা, কারখানা চটকল অফিসও ছুটি
আমাদের দেশে ফেরা, শিয়ালদার জীর্ণ মেসবাড়ি ফাঁকা
আমাদের দেশে ফেরা, দুপুরের রাস্তায় ঘুগনি-পাঁউরুটি
তবুও ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্নের পিছু পিছু কেবল আমরাই হাঁটি

গঞ্জের পদ্মপুকুরে ভ্রমর ওড়ে, নাবালে বেড়ে ওঠে কাশ
আলের দু'পাশে আদিগন্ত নতুন ধানের খেতে লুকোনো বাতাস
দেবীপক্ষে প্রকৃতির ছবিটি সবুজ রঙেতে আঁকা পরিপাটি

দৌড়ায় ছোট ছোট সুখ দুঃখ জীবনের মস্থর চাকায়
ঢাকের, বাদ্যি আর, যা দেবী সর্বভূতেশু, মন্ত্র উচ্চারণে
টের পাই কবেই পৃথিবী ছেড়েছে যারা, তারা আজও সন্ধ্যায়

ফিরে আসে প্রিয় মুখ অশরীরীরা প্রাচীন দুর্গাদালানে।

বাহার

সঙ্ঘমিত্রা হালদার

এক অনায়াস ফুটে ওঠা তাতে বড় বেমানান কীট
তুমি জুড়ে যাচ্ছ কোনও মতে, এই কথা মন্দ্র সপ্তকের
ভিতর তোমাকে ফেলে একা ছেড়ে রাখে
আহত অবশ করে যত ঝিঁঝি রব
এমন একার খাদ থেকে

তোমার মজ্জার আলো চেটেপুটে শিস
দিতে চেয়ে অপারগ হাই তোলে শিশুগাছ
এক খুশি হয়ে উঠতে চাওয়ার বাজনা
অধীর করেছে যাকে
যার স্বভাবেই ছিল, ছিল খুশি হওয়া
সেই পথে তুমি বড় বেমানান কীট

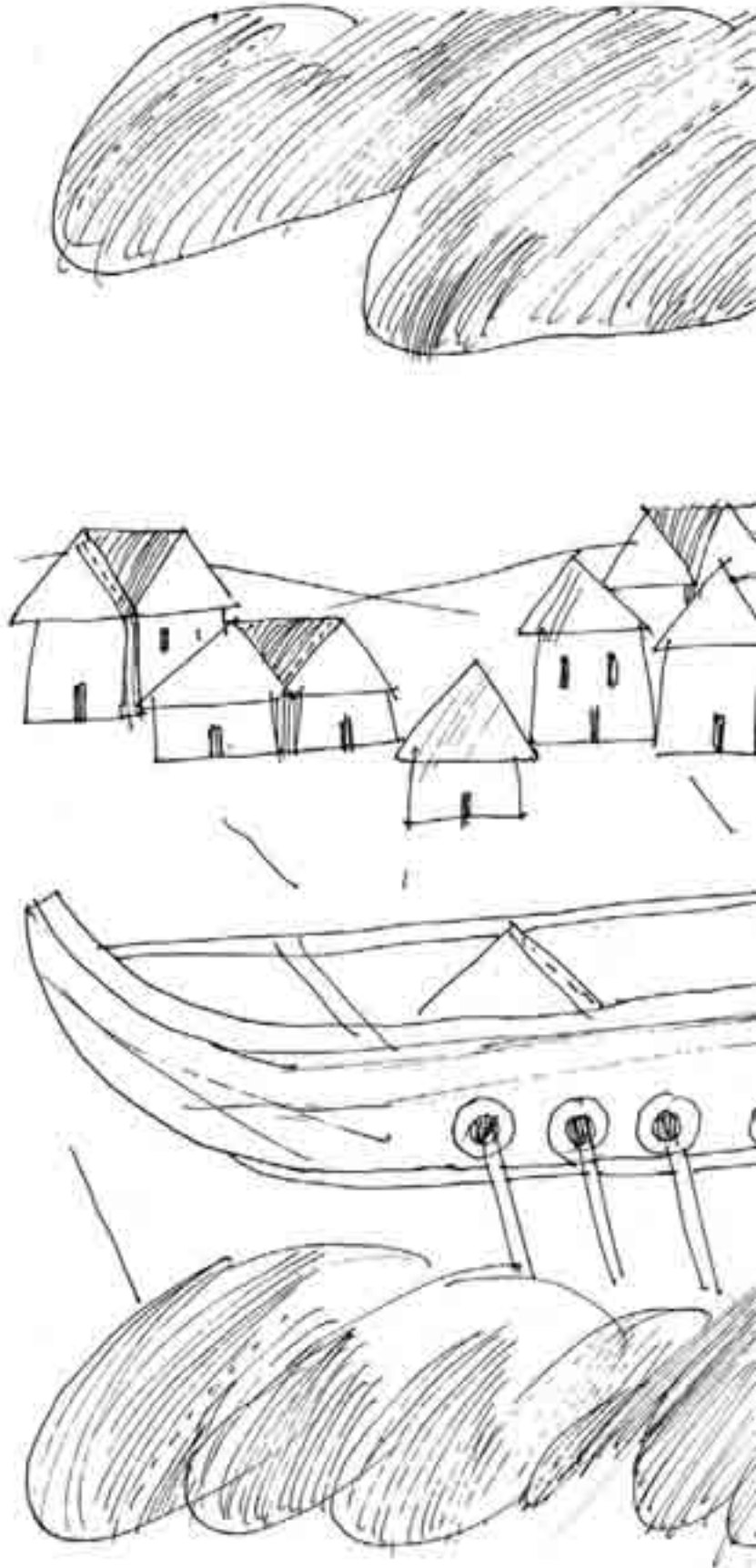
কীটের সর্বস্ব জুড়ে তোমার বাহার
সে ডানায় বসে প্রাণ এই ওড়ে এই ভেঙে যায়

সন্তান

বেবী সাউ

ভাঙন গভীর হলে, মাটিও অস্থির হয়ে যায়
যেমন পাখির ডানা থেকে থেকে হাওয়া কেটে ফেলে,
শূন্যতায় দূর থেকে ভেসে আসে ভিজে ভিজে শ্বাস
কে আসে? ঈশ্বর ভাবি। বুঝি কোনও রাস্তা নেই আর
আমাদের যন্ত্রণায় কে যেন লবণ ঢেলে দেয়
এত ক্ষত ছিল তবে? অপরাধ নিয়ো না জনাব
আমাদের রান্নাঘরে খিদে পোড়ে স্বভাববশত।
বুঝি না তোমার কথা, কত ঘৃণা কত না বিদ্বেষ
মানুষ নিজের বুকে নিয়ে তবু কষ্ট পায় রোজ
ভাবে তার নৌকো নিয়ে যাবে কোনও বাণিজ্যের দিকে
পাশেই একাকী গ্রাম, ভিজে ঘাট, শৈশবের কুয়ো
আলো কি নিজের মতো বাঁপ দেবে আগুনের কাছে?
সমূহ জীবন নিয়ে গাছ থাকে, গাছের শিকড়ে
জল দেয় মাটি, দূরে, যেখানে নতুন জন্ম নীল...
কে তুমি ঝাঁপিয়ে পড়ো, কে তুমি আমার আলুথালু
ভেবেছি মেঘের নীচে এত যে বিদ্যুৎ পুড়ে ছাই
তাকেই বিবাহ করব, দেব তাকে সবুজ মোহানা।

মাটিও অস্থির, তবু, পাড় ভাঙে, নারীজন্ম হয়



জোনাকি

অর্পণ গুপ্ত

বেয়াড়া স্রোত টেনে নেয় বিষাদ বিনুক।

পড়ে থাকে আয়ুরেখা। শুকনো নদীর মতো ক্ষত
শবযান যেন এক। মৃত নাবিকের

হাতে জুঁইচারা।

কুহকশরীর জুড়ে বিন্দু বিন্দু জমা জল।

কেঁপে ওঠে মজা মাঠ, বিষণ্ণ কাদার মতো ঠোঁট
জোনাকি জন্ম নেয় নিভু নিভু আলোর জঠরে...

অন্ধোভ

ঋতব্রত মিত্র

কালো মেঘের দলের 'পরে সাদা বকের সারি—
এইটুকুতে বাহাজ্ঞান লোপ পেয়ে যায় তার...
পরমহংস উড়বে কী আর! মুখ খুবড়ে পড়ে
মাটি এত কোমল? সাকার এতই নিরাকার?

আত্মানাস্ববিচারে দিন এমনি কেটে গেল...
চক্রাকারে দেখবে নাকি যোগপত্যে সায়—
ভেবে ভেবে কুল-কিনারা না পাওয়া যায় যদি
আকৈশোর রইল দ্বিধার এমন প্রত্যবায়

কে দেবে ঠিক পথের হদিশ? হৃদ হয়ে খুঁজে
হাজার রকম পথ পাওয়া যায়, লক্ষ রকম স্তব
সহজ কথা সহজ তো নয়, কঠিন মনে শুধু
নিজের ভেতর ডুব দিয়ে দিক পাওয়া কি সম্ভব?

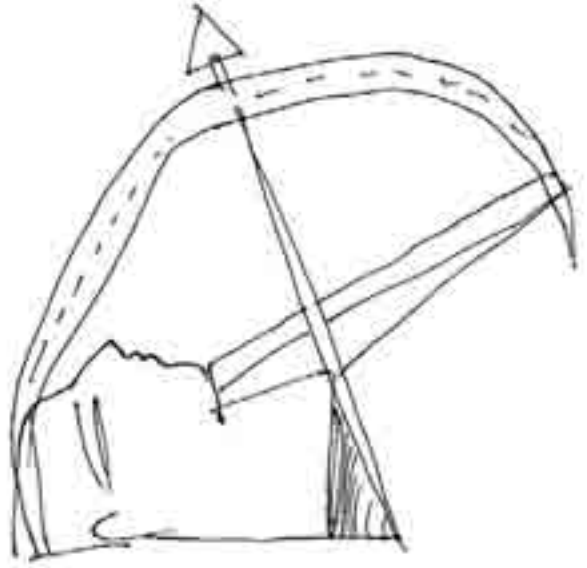
যাওয়া কি যায় সেই ঠিকানায় যেখানে চোখ বুজে
দিনের পরে রাত আসে না, রাতদিন এক সাথে
এক লহমায় মুছে গিয়ে নির্গুণে সগুণে
নতুন করে ঘনিষে ওঠে দেয়াসিনীর হাতে?

ভ্রাস্তি এ সব? কে অঘটনঘটনপটীয়সী?
বাঁচা-মরার স্থির নিয়মে ফুরোবে সব কথা!
শব্দের শবদেহের ভেতর প্রাণসঞ্চার করে
খ্যাপা যদি খুঁজেই ফেরে অর্থশরণতা?

আমি

দেবব্রত দত্ত

প্রতি পদক্ষেপে হিসেব-নিকেশ করে চলতে চলতে মনটা মাটিনির্ভর হয়ে যাচ্ছে! কিছুতেই আর আকাশের দিকে তাকাতে পারছি না। প্রশ্ন করার কিছু থাকে না, ছোট ছোট অনিশ্চয়তায় আত্মসমর্পণের ভয়। স্ব-চেতনা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ভয়। সকাল থেকে মোবাইলে যে-মানুষটি মেসেজ পাঠায় ‘গুড মর্নিং’, রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে একটা কথা বলে না! আমিও মোবাইলের স্ক্রিনে কত ফুলের ছবি দেখি, অথচ ফুলগাছের দিকে তাকানোর সময়ই পাই না! কেউ আমাকে গান পাঠান, শুনি। কিন্তু, অন্য সময় গান শুনলে তো সময় নষ্ট মনে হয়। নিজের কোনও পছন্দ অপছন্দ নেই, অন্যের পথ হেঁটে চলি। কল্পনার সঙ্গে কল্পিত সংঘাত, স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্নের ছলনা, বিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ! তাই আমারই চেতনার রঙে পান্নাকে সবুজ দেখি না, কিংবা চুনিকে রাঙা হয়ে উঠতে! আমি আর আমাকে খুঁজে পাই না, চতুর্দিকের সিসিটিভির ক্যামেরা খুঁজে পায় আমাকে। সবাই আমাকে দেখছে, কিন্তু আমি নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না! হয়তো—



কাপাসসুতো

ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

পথেরা পিছল বড়, নুড়িগুলো ভিজে সুড়ঙ্গের
পায়ে পায়ে নেমে গেলে চলাটুকু শুধুই নিজের

শর-বেনেঘাস, ছোট ফলে ঢাকা কুলকাঁটা ঝোপ
শরীরের মধ্যে বাঁচে প্রতিহিংস্র একানটি জেঁক

ভীষণ আঁকড়ে ধরে, রক্তরস চোষে পরস্পর
শিরার মৃগাল ধরে ফুটে ওঠে মন-ইন্দীবর

শরীর বাঁকানো গেলে জলে ভেসে যেতে থাকে মুখ
ধনুকের ছিলা টেনে কথা ছোটো তোমার সম্মুখ

ভীষণ ঝাঁঝালো স্বর উঁচু করে তোমাকেই বলি
প্রতিধ্বনি ফিরে আসে, ভেসে যায় সব কানাগলি

ভাসন্ত স্বরের নেশা জলে ডুবে ভিজে করোটিও
নদীর কিনার ধরে কত বার হেঁটে গেছ, বলো তো তুমিও

কত কত সন্ধ্যাবেলা মনে হয় বৃথা জেগে থাকি
তুমি ভেবে ছুঁয়ে যাই জ্বলে থাকা নীরব জোনাকি

তুমি ভারো মিথ্যে সব, আমি হই অনিশ্চিত চলা
ভেতরে নিহিত কিছু দেখা, কিছুটা অনন্ত কথা বলা

দেখা ও বলার যোগ ফুরোয় না, ফুরোয় না দ্রুত
যেভাবে অশথে-বটে বেঁধে রাখে কাপাসের সুতো

সামান্য আলোয় উড়ি তুলো তুলো গাঢ় নীলাস্বরী
চোখের কোটরে ভাসে অনির্দেশ বৈঠাছীন তরী

ফিলহারমোনিক

(সঙ্গীতপ্রিয়, যে অর্কেস্ট্রা সিম্ফনি বাজায়)

তন্ময় চক্রবর্তী

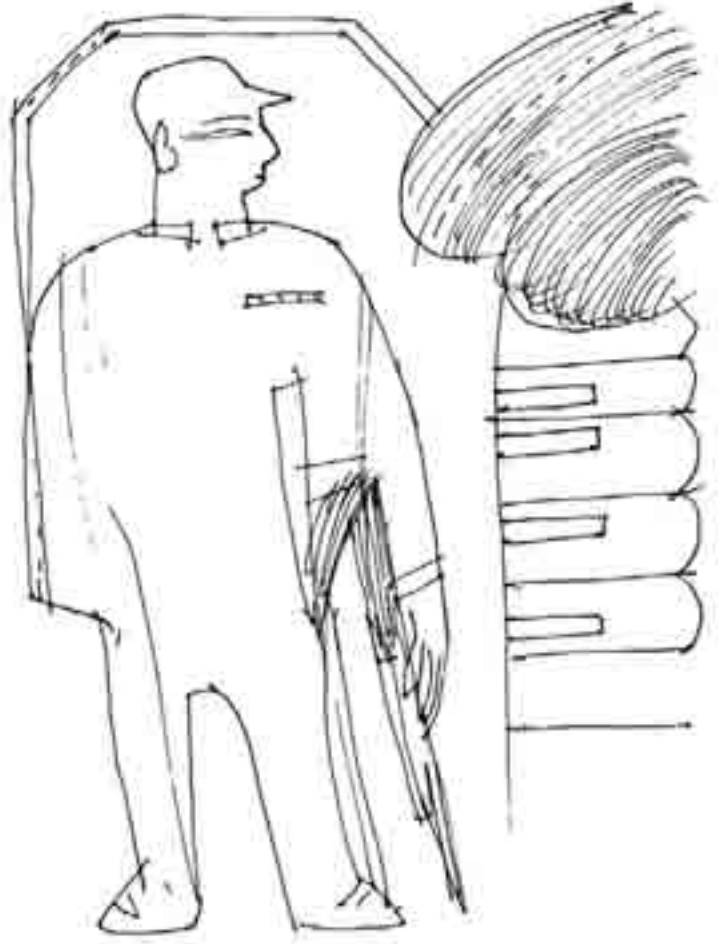
যুদ্ধ থেকে ফিরছে যারা কফিনভর্তি
তাদের জন্য রাতিরে আজ ফিলহারমোনিক
দেওয়াল থেকে স্লোগান মুছে কে বা কারা
শহরতলির বিক্রিবাট্টা বিজ্ঞাপনী

বাগান জুড়ে প্রজাপতি হলুদ রঙের
নাইট ক্লাবে কালকে রাতে দু'হাত তুলে
যে মেয়েটা কাজের বাড়ির বাসন-কোসন
বইয়ের পাতায় বিচ্ছু ছেলে স্পেস শাটলে

মুক্ত মনে বাগানবাড়ি একটু আধটু
রাতবিরেতে হঠাৎ যদি বুকের ব্যথায়
তোমার আমার আলোকবর্ষ দূরের প্রেমে
'অমলকান্তি' কলেজপাড়ায় রৌদ্র নামায়

ফিনিক্সপাখি মাইক্রোফোনে উড়তে থাকে
শপিংমলে কৌতুহলে পাকাচ্ছে জট
দূরের গ্রামে ধূমকেতুরা খুঁজছে কাকে
সিনেমাওয়ালা ভলক্যানোদের রাতিরে স্লট

ঘুমিয়ে পড়া কপাল ভেজা ফ্লায়িং কিসে
অসাবধানী রাত্রি নামুক সাহেবপাড়ায়
চুরি করবে আস্ত শহর ভিনগ্রহীরা
এসব সত্যি, গুজব খবর, কী এসে যায়



চোখ

দেবগুরু বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার চোখের কাছে
বিকেল লুকিয়ে আছে
মেঘের করুণা দিয়ে ঘেরা
উজানে অভয় ভাসে
আগুন প্রদীপে হাসে
বেহায়া বাতাস কেটে ফেরা।
একটি শোকের নামে
নূপুরে কুয়াশা ঘামে
বিনীত মাটির পটভূমি
দু'চোখের অন্তরালে
স্মৃতির চন্দন গালে
চরাচরে জেগে থাকো তুমি।
মেরুদণ্ডে ধাতুমল
করতলে শাদ্ভজল
দৃষ্টি ছুঁলে বেঁকে যায় নদী
চোখের খামার জুড়ে
ছন্দে দাঁড়ায় ঘুরে
চোখ-ই কবিতা হয় যদি।





একটি বাক্যে একটি আঙুল

স্বাগতা দাশগুপ্ত

একটি বাক্যের ওপরে একটি আঙুল রাখা
উদাসীন শব্দের গায়ে তৎপর মধ্যমা
চিনিয়ে দিচ্ছে সাবেককালের ইতিহাস—
ঈশ্বরের প্রিয় নৃপতির অপার দয়া
ক্ষমাশীলতার অপূর্ব নিদান;
পশু-পাখি কেউ বাদ যাচ্ছে না
তাঁর দাক্ষিণ্য থেকে,
রক্ত তিনি কিছুতেই দেখবেন না আর।
যদিও অরণ্যবাসীরা যেন ভুলে না যান
সম্রাটের ভালবাসার শর্তগুলি,
অন্যথায় তাঁর অনিচ্ছুক খড়গ
বাধ্য হয়ে নেমে আসবে তাঁদের মাথায়,
কারণ ঈশ্বরের প্রিয় নৃপতি মনে করেন
ধর্মের জয়ই শ্রেষ্ঠ জয়;
প্রস্তরলিপির গায়ে গায়ে এমনই করুণ আর্তি—

বইয়ের একটি পাতায় হাত রেখে যা চিনিয়ে দিচ্ছে
তার একটি উৎসুক আঙুল...

ওয়েস্টল্যান্ডের শহরে

দেবায়ুধ চট্টোপাধ্যায়

"Mixing memory and desire, stirring dull roots with spring rain"

— T S Eliot, The Waste Land: The Burial of the Dead

সাত-আট বছর পর মনে পড়ে, মনে পড়ে যায়
কী পোশাকে সেজে তুমি এসেছিলে প্রথম সন্ধ্যায়
কী ভাবে তোমার গালে খেলেছিল গোধুলির আলো
তখন বয়স কম। সহজেই কত কিছু ভাল
লেগে যেত। দুর্নিবার যাপনের স্রোতে
তোমার স্বপ্নের মতো সরল ও বেপরোয়া হতে
সমস্ত নিয়ম ভুলে অনায়াসে ঝাঁপ দেওয়া যেত
সাজানো বাগানে আজ তারা বরাপাতা হয়ে সমবেত
এখন জীবন যেন জীবনানন্দের সেই লেখা
স্বাভাবিক রোমন্থনে নিজেদের দেখে ঠেকে শেখা
তবুও কি প্রেম জাগে? এই নদী সাক্ষী ছিল জানি
হঠাৎ জোয়ার এলে জলপরিদের কানাকানি
আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। যে পাড়ার সবক'টি হাটে
এখনও যুদ্ধের স্মৃতি সংঘাত দিয়ে গাঁথে ভিটে
আমাদের পুনর্বীর জেগে উঠে ভালবাসতে বলে
আমাদেরই ছায়া যেন ভেসে আছে চাঁদভেজা জলে
আমাদেরই মজ্জা, ঘিলু এ যুগের ধ্বস্ত অবয়ব
তবু কি কবিতা এসে ধুয়েমুছে দিয়ে যাবে সব?
অবশিষ্ট আঁকড়ে ধরো। ফুটপাথে কান পেতে শোনো
বাঁচার অবাধ্য স্তোত্র, সমঝোতা শেখেনি এখনও



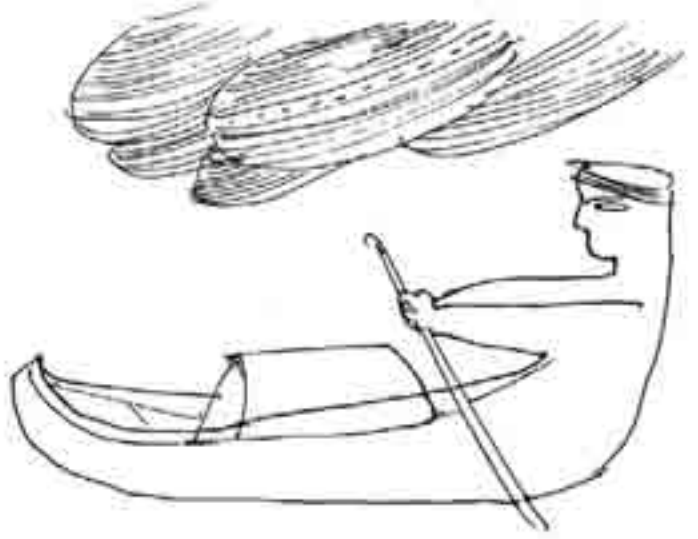
আকাশজলা

অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়

মন পাল্টে গেছে তার, জানাল তোমাকে...
চারের মাঠ থেকে বিদায়-বাতাস
এল আজ

পুরনো ব্যারাজ
ঘুমিয়ে পড়েছে, আর তাকে
রাতের ডাইনি এসে বিধিয়ে, পেতেছে
এক ফাঁকে
বিপ্রতীপের মন্তাজ!

যড় করে জ্যোৎস্নার জলে ফেলে গেছে
ছায়াপথ...
শশী তারকাকে...



কবি

অরুণাভ রাহারায়

একটু দূরে নীরব কোনও গ্রাম
একটু দূরে আকাশি নীল, মেঘ
খানিক দূরে আরও আকাশ... পাখি
খানিক দূরে অচেনা উদ্বেগ

একটা নদী, মাঝির দাঁড়ে সুর
নদীর বাঁকে ছবির মতো গ্রাম
কুড়িয়ে নিই পথের ধুলোবালি
কুড়িয়ে পাই হারিয়ে যাওয়া নাম

একটু দূরে খানিক মফসসলও
বৃষ্টি ভিজে পাহাড় হল ছবি
সঙ্গে নিয়ে বই কলম আর খাতা
গ্রামের পথে বেরিয়ে পড়েন কবি...



ধুলোপুরাণ

কমলেশ কুমার

প্রতিটি বিষণ্ণ ভোরে জেগে উঠি আমি। স্বপ্নের ভিতর থেকে গ্রামঘর তোলপাড় করে উঠে আসে এক আত্মমগ্ন হাওয়া।
দেখি, মায়াভরা চোখ নিয়ে জ্যোৎস্নার শীতলপাটি বিছিয়ে আমাকে ডেকে চলেছে প্রাচীনকালের স্মৃতিরা।
আলোআঁধারিতে জ্বলে যায় পূর্বপুরুষের শবের চিতা। ফিরে ফিরে আসে ভালবাসা, অশ্রু, আলিঙ্গন আর উল্লাস।
দেওয়াল ঘেঁষা শেওলা, বোপঝাড়, আর চেনা পরিসরে গজিয়ে ওঠা আকাশচুম্বী সভ্যতার বিভায়ে স্নান সেরে নেয়
শোকাহত বিলুপ্ত পুঁথি।

শেষ প্রহরের দৈত্যের মতো গলা টিপে ধরে অনুচ্চার সম্ভাষণ।

আমি নৈঃশব্দের ভিড়ে পথভোলা পাখির মতো খড়কুটো আগলে বসে থাকি। ঠোঁটের ভিতর ধরা থাকে রামধনু রঙের
অলিঙ্গ, বসনাচঞ্চল বিরহ, সদ্যোন্মাত জোনাকির রাত।

মহাকাল দরজা খুলে রাখে। হিরণ্ময় মুগ্ধতা ছুঁয়ে অগ্নি স্পর্শ করি আমি।

ভাবি, কত দূর উড়ে গেলে চোখে পড়বে দিগন্তবিস্তৃত পাখির উড়াল!

কবিতার অকালবোধনে মায়াকুয়াশার সঙ্গিনী হবে সেই সব মেঘেদের ধারাপাত...

শব্দ

তমোদ্বয় মুখোপাধ্যায়

“Listen! And they heard it—pure and crystal tone—the silence.”
—Vicente Aleixandre

এই শান্ত ভোরবেলায় সেই সব উচ্চারণ স্মরণ করো, যাদের
হাজার ব্যবহারেও নষ্ট করা যায়নি। স্মরণ করো সেই সব স্বীকারোক্তি
যাদের লিখতে লিখতে তোমাদের ভেতর বহু গাছের মৃত্যু ঘটে গেছে।
হে ভাবলেশহীন স্বয়ংক্রিয় বন্ধুবান্ধব, তোমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে
অজস্র বিদেশি ভাষার কবর ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পাই না আর!

কার শব্দ বলো তোমরা? কার চিৎকার অনুবাদ করতে করতে তোমরা
নিজেদের হাসি কুপিয়ে ফেলছ? এখানে ঈশ্বরের মতো দেখতে
অগুণতি শিশু তোমাদের এই নৃশংসতা বুঝতে বুঝতে বড় হচ্ছে;
ওদের প্রতিটি কান্নার মধ্যে মৃত গাছগুলোর পুনরুত্থানের সম্ভাবনা
শুরুতে আমাদের বিহ্বল করেছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে বোধগম্য হয়
এই সমস্ত শিশুকান্না অনুবাদের অযোগ্য, স্বীকারোক্তির বিপ্রতীপ।
শিশুর মতো দেখতে ঈশ্বর কোপানো হাসিগুলোর ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে—
এই দৃশ্য লিখতে গেলে শব্দ নয়, স্তব্ধতা জরুরি।

এই শান্ত ভোরবেলায় অক্ষত উচ্চারণগুলি পোড়ানোর নিমিত্তে স্মরণ করো অগ্নি।
শব্দ ধারণের যোগ্য কোনও মুখ যদি জন্ম নেয় কয়েক প্রজন্ম পর,
তার সহজ হাঁ-এর ভেতর আমরা ঠিক খুঁজে পাব আজকের ছাই।
আবার ভাষা হবে তখন, আবার অর্থ স্থাপনের এলোপাথাড়ি খেলা...

আপাতত, হে রহস্যময় বন্ধুবান্ধব, যে-যার একাকী হাত মৌন জলে রাখো!
আর শব্দ নয়, আর অর্থস্তর নয়, স্তব্ধতা বোঝার মন তোমাদের শেষ পরিব্রাণ।

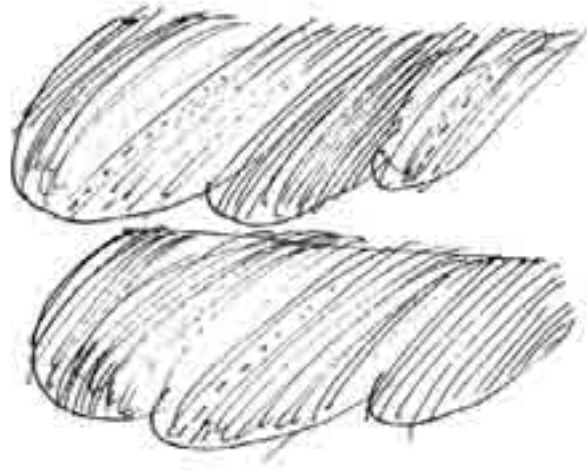
উপশম

রাজদীপ রায়

অন্ধ চোখ;
দেখে ফেলে কখনও কখনও:

শ্মশান ডেকেছে যাকে ভালবেসে—

তার প্রতিশোধম্পূহা নেই কোনও।



এ পরবাসে

শ্রোতস্বিনী চট্টোপাধ্যায়

আকাশের এক দিকে গাঢ় কালো মেঘ
অন্য পার আলো মুখরিত
জলে তার ছায়া পড়ে
দুই ভাগে ভেঙে যায় শ্রোত

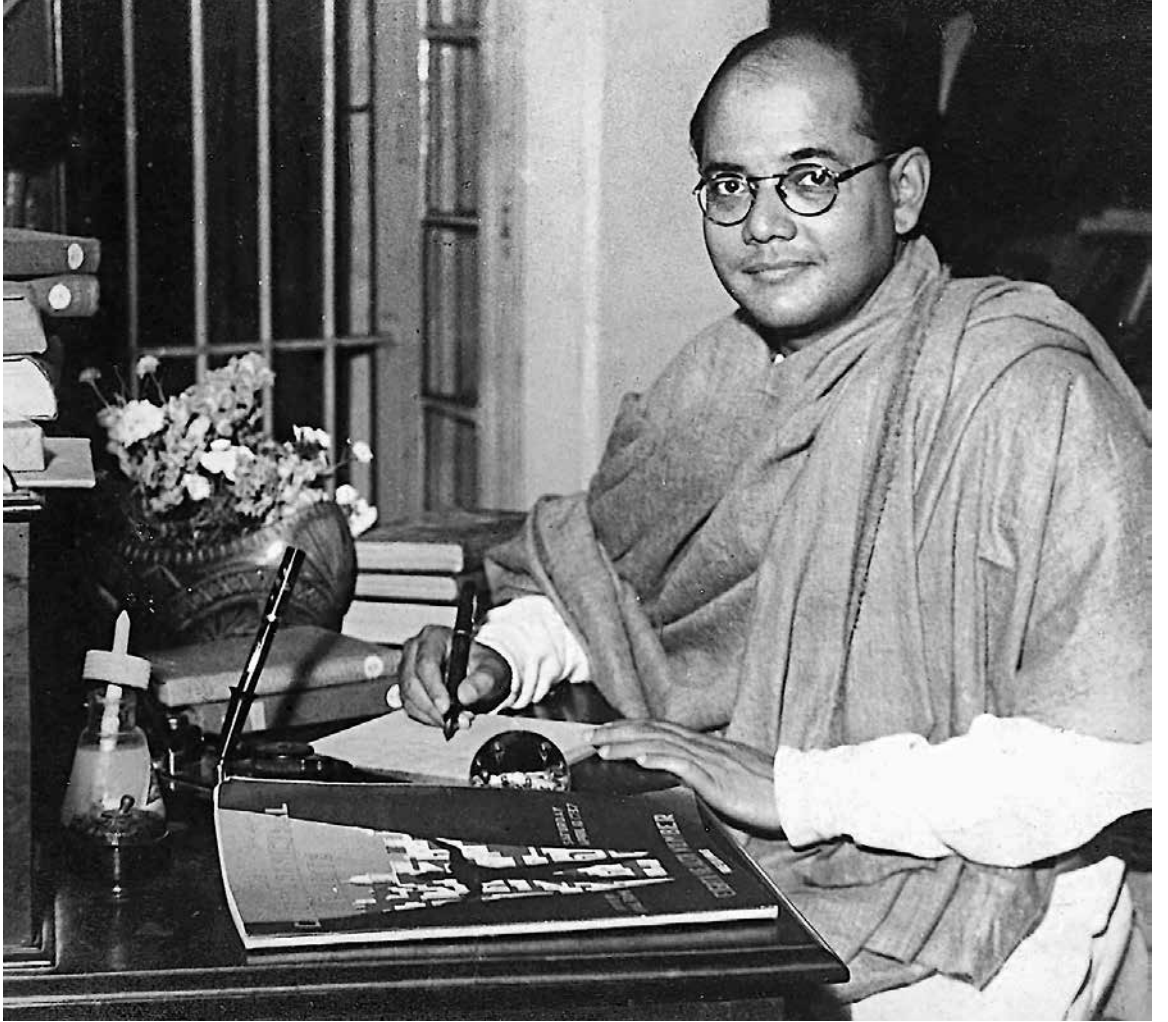
সমস্ত জীবন জুড়ে
এই হ্রদ পার হতে চাওয়া

রবাহৃত ফকিরের ছদ্মবেশে
কেন যে এসেছি দুর্বিপাকে!
এই জন্ম বৃথা কেটে যায়...
পেরিয়ে চলার দায়
জন্মকে ভিতর থেকে কুরে কুরে খায়

অবসন্ন সন্ধেগুলি পৃথিবীর
গর্ভকোষ থেকে উঠে আসে,
হামাগুড়ি দেয় শিশুর মতন
আমাকে চঞ্চল করে রাখে

অস্ফুট শব্দের স্নেহ
প্রাচীন অভ্যেসে নিংড়ে নেয়
আধো আধো নাছোড় উল্লাসে

শিল্পী: সুব্রত চৌধুরী



সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভারত ছিল ভগবানের বড় আদরের দেশ, ঈশ্বরের প্রিয়ভূমি

সুভাষের ধর্ম

সেমন্তী ঘোষ

সুভাষ ফিরে এসেছেন। কোথায় ফিরে এসেছেন? না, বাংলায় নয়, বাংলায় তো তিনি ছিলেনই। এতগুলি বছর, এতগুলি দশক তিনি বাঙালি-হৃদয়ে তাঁর রাজপাট ছেড়ে এক পা-ও বাইরে যাননি। কিন্তু বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাঁকে অনেক কাল দেখা যেত না। সেই আঙিনাতেও এখন তাঁকে নিয়ে যে ভাবে টানাটানি পড়েছে— সেটাকে নতুন করে ফিরে আসা-ই বলতে হবে।

কিন্তু ঠিক ভাবে কি ফেরানো হচ্ছে তাঁকে? সত্যিকারের সুভাষ ঢাকা পড়ে যাচ্ছেন না তো রাজনীতির নিহিত পাতালছায়ায়, কিংবা দুর্নিবার

স্বার্থমনর্থম্-এর নেতাজি-বন্দনায়?

এই যেমন, সুভাষের ধর্ম নিয়ে আজকাল শোনা যাচ্ছে অনেক কথা। হিন্দুত্ব রাজনীতির কারবারিদের দাবি— তিনি নাকি আসলে তাঁদেরই পূর্বসূরি। শুনে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। যে সব লেখায়, চিঠিতে, কাগজপত্রে লেখা আছে সুভাষের ধর্মভাবনার কথা, ধর্মের সঙ্গে সমাজ আর রাজনীতির যোগবিয়োগ নিয়ে তাঁর চিন্তার কথা— সেগুলো তো খোঁজ করলেই হাতে পাওয়া যায়। তবুও এত ভুল বিতরণ, অন্যায় বিচরণ? অন্তত বাঙালির আর একটু ভাল করে জানা উচিত নয় কি,



সুভাষচন্দ্র ও তাঁর দাদা শরৎচন্দ্র বসু। তাঁদের পরিবারের সংস্কারে ছিল ছিল গভীর ভক্তি ও ধর্মের বোধ

তাঁদের প্রিয় নেতাজিকে? কেমন মানুষ ছিলেন তিনি? কী ভাবতেন, কী বলতেন, কী চাইতেন?

প্রথমেই যেটা বলতে হয়— সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন আদ্যন্ত ধর্মবিশ্বাসী মানুষ। সারা জীবনে সে সত্য পাল্টায়নি। এ তাঁর পারিবারিক ধারা, নিজস্ব অর্জনও বটে। তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে মিশে ছিল ভক্তি ও সেবার ভাবনা, যার সঙ্গে বার বার এসে মিলত এক গভীর ধর্মবোধ। কিন্তু সেই বোধ কেমন বোধ, একটু উল্টেপাল্টে দেখলেই আমরা চিনতে পারব তাকে। চিনতে পারবই, কারণ আমরা নিজেদের চার পাশে নিশ্চয়ই দেখেছি সে রকম মানুষ, সে রকম বোধ। সেই মানুষদের আমরা নিশ্চয়ই চিনতাম, যাঁরা নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন, গর্ব বোধ করতেন, ধর্মাচার পালন করতেন, কিন্তু কদাপি অন্য ধর্মকে ছোট করতেন না, আক্রমণ তো করতেনই না। একটা ভাষা জানলে যেমন অন্য ভাষাও শিখতে সুবিধে হয়, ঠিক সে ভাবেই তাঁরা প্রমাণ করতেন, একটা ধর্মের ভেতর মনকে ঠিক ভাবে প্রবেশ করালে অন্য ধর্মের প্রতিও সম্মানবোধ আসার কথা— কেননা— সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়, ভালবাসা।

কেমন ছিল সুভাষের ধর্মভাবনা, তাঁর জীবনের কিছু কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে এক বার ফিরে দেখতে পারি।

দুর্গাপূজা নিয়েই শুরু করা যাক। আজকাল কত কথাবার্তা হয় বাঙালির বারোয়ারি পূজোর ঐতিহ্য নিয়ে। আজ থেকে একশো বছর আগে অবশ্য এই বারোয়ারি দুর্গাপূজোর গুরুত্ব ততখানি অলোচ্য বিষয় ছিল না। অথচ, লক্ষ করার মতো ব্যাপার— উনিশশো কুড়ির দশকের মধ্যভাগে কলেজ-উত্তীর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামী টগবগে তরুণ সুভাষচন্দ্র বসু সে দিনও বিষয়টিকে দূর থেকে দেখছিলেন, আর বুঝতে পারছিলেন, কী বিপুল গুরুত্ব এই উৎসবের। বর্মার মান্দালয় জেলে বন্দি হিসেবে যখন চিঠিপত্র এবং অস্ত্রিয়ায় বসে যখন আত্মজীবনী লিখছিলেন— তখন দেখছি, বারোয়ারি পূজোর প্রয়োজন নিয়ে কত কী-ই না তাঁর মতামত। কী লিখছিলেন তিনি? লিখছিলেন নিজের প্রথম যৌবনের কথা। কেমন

করে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন ঘন ঘন। কেমন করে সেই বেড়ানোর মধ্যে চলত নানা গল্প আর তর্কবিতর্ক— ধর্ম নিয়ে, সমাজ নিয়ে। কেমন করে বন্ধুদের সঙ্গে পরিকল্পনা করেছিলেন, বাংলার বারোয়ারি পূজোকে আরও জোরদার ভাবে নানা দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার। ১৯১৭ সালে, কুড়ি বছর বয়সে নিজেরা উদ্যোগ করে একটা গোটা বারোয়ারি দুর্গাপূজো আয়োজনও করে ফেলেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, এক দিকে পূজো যেমন একটি বাড়িতে হয়, তেমনই অন্য দিকে “জনসাধারণের ব্যবহারযোগ্য কোনও বিরাট হলঘরে হয়, যেখানে কোনও পরিবারকে এর ব্যয়ভার বহন করতে হয় না, জনসাধারণই তা করে থাকে।” মনে হয়েছিল, বারোয়ারি পূজো যেন আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। বাংলার মানুষের হাতে বেশি টাকাপয়সা থাকছে না, তাই পূজোর ব্যবস্থা করাও মুশকিল হচ্ছে। না, তা তো হতে দেওয়া যাবে না। ফিরিয়ে আনতে হবে তাকে। এই পূজো তো কেবল পূজো নয়, এ একটা উৎসব। “এতে সমগ্র সমাজ অংশগ্রহণ করে থাকে।... গ্রামের প্রত্যেক জাতি বা পেশার লোক তাতে অংশ নেয়।... আমাদের গ্রামে পূজোর পর নাটক হলে সারা গ্রামের সব লোক তা উপভোগ করতে পারত।” নিজেদের আয়োজনের সেই পূজো কিন্তু এক বছরেই শেষ হয়ে গেল না। ছেলেদের উদ্যোগের বিরাট সাফল্যের পর পরবর্তী বছরগুলিতেও তা চালু রইল।

আরও কয়েক বছর পর। ১৯২৫ সাল। তখন তিনি মান্দালয় সেন্ট্রাল জেলে। আগের বছরই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বন্দি করেছিল, তাঁর পর তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন বর্মায়। জেলে বসে নিয়মিত সুপারিন্টেনডেন্টকে চিঠি লিখতেন তিনি— রাজনৈতিক নেতা, রাজনীতির টান যাবে কেন— জেলে বসেও হাজারো বিক্ষোভ, অন্যায়ের প্রতিকারের দাবিতে সদা সর্বব থাকতেন তিনি। জেলে দুর্গাপূজো করার অধিকার নিয়ে অনশনে বসে গেলেন। সুপারিন্টেনডেন্টকে চিঠি লিখলেন— জেলে দুর্গাপূজোর ব্যবস্থা হোক সেই দাবি নিয়ে। খ্রিস্টানদের জন্য ধর্ম পালনের ব্যবস্থা আছে, আর দুর্গাপূজোর ব্যবস্থা নেই? হতেই হবে

পুজো। হল তাই। লিখছেন তিনি: প্রতিমা নির্মাতার টাকা মেটাতে হবে এফুনি। নয়তো “ভবিষ্যতে তার থেকে আমরা আর এই সাহায্য পাব না। মান্দালয়ে আমাদের অনির্দিষ্ট কালের জন্য থাকতে হতে পারে। তার ফলে ভবিষ্যতে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে আমরা এই সব লোকের সাহায্য নাও পেতে পারি, তখন জেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমাদের গোলমাল অবশ্যম্ভাবী।”

পুজোটাই হয়তো একমাত্র লক্ষ্য নয়, ‘গোলমাল’ পাকানোটোও অত্যন্ত জরুরি আর একটা লক্ষ্য— চিঠি পড়তে পড়তে পাঠক ভাবতেই পারেন। বিশেষত যদি পড়ে ফেলা যায় ঠিক এর আগের চিঠিটাই, যেখানে জেলে বসে পছন্দমতো সঙ্গীত শোনার অধিকার নিয়ে বিস্তর তর্ক জুড়ে দিচ্ছেন সুভাষ— “জেলের ঠিক মধ্যখানে একটি গীর্জা আছে, এবং জেলের যে কোনও জায়গা থেকে গীর্জার অর্গানের শব্দ শোনা যায়। ... খ্রিস্টান কয়েদিদের সঙ্গীত শ্রবণের অধিকার দেবার পরে রাজ্যের বন্দীদের এবং শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান রাজবন্দীদের ওই সুযোগ না দেওয়া কোনও দায়িত্বশীল সরকারের পক্ষে বেমানান।” বার বার এই বিষয়ে বিক্ষোভ প্রকাশ করছেন বন্দি সুভাষ— খ্রিস্টানদের ধর্মপালন করতে দেওয়া হলে অখ্রিস্টানদের দেওয়া হবে না কেন? ঔপনিবেশিক সরকারের জেলে ধর্মের ভিত্তিতে এই বৈষম্য চলবে না, চলবে না...

পরের বছর, ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা চিঠিটিতে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন তিনি, “তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান (যেমন সরস্বতী পূজা, হোলি বা দোলপূর্ণিমা উৎসব এবং দুর্গাপূজা) আমরা এখানে পালন করতে চাই।” ফেব্রুয়ারি মাসে লেখা চিঠি, সুতরাং দাবি তোলা হয়েছে সরস্বতী পূজা এবং দোল উৎসব পালনের জন্য “খরচের টাকা আমাদের দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।” না, মোটেই এ সব চিঠির ‘সন্তোষজনক’ উত্তর আসেনি তাঁর কাছে। ফলে এ বার সুপারিন্টেনডেন্টের মাধ্যমে সোজা ‘চিফ সেক্রেটারি, বর্মা সরকার’ সমীপে প্রেরিত হল সুভাষের পরবর্তী চিঠি। ছ’মাস অতিক্রান্ত, তাঁদের ‘সাহায্যমতো সাংবিধানিক’ পথে দাবিদাওয়া জানানোর পরও এখনও কেন উত্তর নেই? কেন কোনও পদক্ষেপ নেই? এই চিঠিটিতে দেখাচ্ছি রীতিমতো সপাট আক্রমণ— সরকারের অনায়াস দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে সুভাষের তীব্র অভিযোগ এখানে চিফ সেক্রেটারির প্রতি ধাবিত হয়েছে। “ধর্মীয় ব্যাপারে আমাদের দাবি না মেনে আপনার সরকার ভারতীয়দের ধর্ম-প্রবণতা এবং তাঁদের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সম্পর্কে দুঃখজনক অজ্ঞতা প্রদর্শন করেছে। আমরা যারা প্রাচ্যদেশীয়, আমাদের কাছে ধর্ম নিছক সামাজিক সম্মিলন, বুদ্ধিবিলাস বা ছুটির দিনের উৎসব নয়। এটি সপ্রাণ। ধর্ম আমাদের দৈনিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত, ধর্ম আমাদের সমগ্র জাতীয় ও ব্যক্তিসত্তার পরিব্যাপ্ত।”

সেই ধর্ম পালনে তাঁর কাছে আচারের থেকে আচরণ বড় হয়ে উঠত, সংস্কারের থেকে সকল কাজে ধর্মভাব অনুশীলন হত বেশি জরুরি। মাতৃপূজার তাই আড়ম্বরের চেয়ে আন্তরিকতা চাইতেন তিনি। মনে করতে চার দিকের পাপ আর নীতিহীনতার ছড়াছড়ির মধ্যে ভারত আলাদা, কেননা ভারতবর্ষ ‘ঈশ্বরের প্রিয়ভূমি’, ‘ভগবানের বড় আদরের দেশ’। আরও অনেক অল্প বয়সে মা প্রভাবতী দেবীকে ১৯১২-১৩ সালে চিঠিতে লিখেছিলেন এ কথা।

আরও অনেক বছর পর, ১৯৪০ সালেও জেলে দুর্গাপূজার আন্দোলন করেছিলেন সুভাষচন্দ্র। কংগ্রেসের পূর্বতন প্রেসিডেন্ট সে বার হলওয়েল মনুয়েন্ট সরানোর দাবিতে আন্দোলন করে বেশ সাড়া ফেলেছিলেন। বাংলার মাটিতে তখন হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটা অস্পষ্ট কিন্তু কঠিন পর্দা নেমে আসছে— সুভাষের ডাকে সে পর্দা যেন ছিঁড়ে গেল, হিন্দু মুসলমান সব একসঙ্গে এগিয়ে এসে তাঁর সত্যগ্রহে সমর্থন জোগালেন। ব্রিটিশ রাজের অশনিশাসন নেমে এল নেতাজির উপর, তিনি বন্দি হলেন আবার, নিয়ে যাওয়া হল প্রেসিডেন্সি জেলে। সে বারেও জেলের মধ্যে দাবি তুললেন সুভাষ— দুর্গাপূজা করতে দিতে হবে। গতাত্তর না দেখে জেল কর্তৃপক্ষ রাজি হলেন। পূজোর সব জোগাড় গেল সুভাষের বাড়ি থেকে। ভ্রাতুষ্পুত্র শিশিরকুমার বসুর স্মৃতিকথায় পড়ি, “বিসর্জনের দিন বিকালে আমরা দল বেঁধে জেল গেট-এ উপস্থিত

হলাম। লরি করে প্রতিমা জেল থেকে বার করে আনা হল। লরির পেছন-পেছন রাঙাকাকাবাবু [সুভাষ] ও অন্য বন্দীরা গেট অবধি এলেন।”

বার বার জেলের মধ্যে পূজোর দাবি তুলে যে আসলে ‘গোলমাল’ পাকাতে চেয়েছিলেন সুভাষ, ঔপনিবেশিক শাসকের ‘নীতিনিষ্ঠা’র মেকি বুলির তলায় গাদাগুচ্ছের জাতিবিদ্বেষকে স্পষ্ট করে দিতে চেয়েছিলেন, এ সবই ঠিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও ঠিক— ‘জাতীয় ও ব্যক্তি সত্তা’র মধ্যে ধর্মকে এমন গভীর ভাবেই অনুভব করতেন তিনি। বিদেশি শাসকের সঙ্গে গোল পাকাতে তিনি যেমন সব সময়েই কোমর বেঁধে তৈরি, তেমনই আবার পূজোর বিষয়টিও তাঁর কাছে ফেলনা অজুহাত নয়, খুবই গুরুতর, আন্তরিক আবেদন। মান্দালয় জেলে সে বার পূজোর আয়োজন করতে পেরে মহাখুশি সুভাষ তাই ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর অতি নিকটজন ‘মেজবৌদিদী’কে (মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর স্ত্রী বিভাবতী বসু) লিখেছিলেন: “এত আনন্দ কোনও পূজাতে পেয়েছি কি না জানি না। অনেক ঝগড়াঝাঁটি করে আমরা পূজা করবার অনুমতি পাই, তাই বোধ হয় পূজার মধ্যে বেশি আনন্দ পাই। কত দিন জেলে কাটাতে হবে জানি না। তবে বৎসরান্তে যদি মার দর্শন পাই তবে সব দুঃখ সহ্য করতে পারব। দুর্গামূর্তির মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই। তিনি একাধারে জননী, জন্মভূমি ও বিশ্বময়ী।”

“দুর্গামূর্তির মধ্যে আমরা মা-স্বদেশ-বিশ্ব সমস্তই পাই।” নিজের ভিতরের আত্মিক ভরটা ছিল বিশ্বাসময়তার কোলে— এই এক পঙ্ক্তিতেই সে কথা জ্বলজ্বল করে ওঠে। আর এ তো কেবল তাঁর একার কথা নয়। সেই সময়কার অনেক জাতীয়তাবাদীর প্রাণের কথা। ধর্মবোধে ছিল তাঁদের জাতীয়তাবোধের ভিত। তাই বলে তাঁরা ধর্মবোধে সক্ষীর্ণ ছিলেন না। সুভাষচন্দ্রের গুরুপ্রতিমা চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গেও সুভাষচন্দ্রের হয়তো সবচেয়ে বড় মিলের জায়গা এই ধর্মনিযুক্ত জাতীয়তাবোধই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন ভক্তবৈষ্ণব, নারায়ণ ছিল তাঁর সম্পাদিত জাতীয়তাবাদী পত্রিকার নাম। সুভাষচন্দ্র তাঁর ‘দেশবন্ধু’ প্রবন্ধে লেখেন, “বাংলার বৈষ্ণবধর্ম ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা থেকে টেনে... প্রেমমার্গে নিয়ে গিয়েছিল।” এই প্রেমমার্গে হেঁটেই দেশবন্ধু বাঙালি মুসলমান ও হিন্দুদের জন্য ৬০-৪০ অনুপাতে, অর্থাৎ জনসংখ্যার অনুপাতে, চাকরি সংরক্ষণের কথা বলেছিলেন— প্রথম বার, এই বাংলাদেশে। সে দিন তাঁর অতি বিশ্বস্ত সৈনিক ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু— কলকাতা কর্পোরেশন পরিচালনার কাজেও, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগেও। সে কালে বাঙালি মুসলমানরা সবচেয়ে কাছের নেতা বলে মনে করতেন দেশবন্ধুকে। আর এ কালে, এই একুশ শতকেও, বর্ষীয়ান বাঙালি মুসলমানদের স্মৃতিপটে ধরা আছে তিন বাঙালি নেতার নাম, যাঁরা বিশ শতকের বাঙালি মুসলমানদের আশ্রয় ছিলেন— চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু। কী আশ্চর্য, এঁরা প্রত্যেকেই কিন্তু ব্যক্তিভাবে পরম ধার্মিক, ‘হিন্দু’ পরিচয়ে নিজেদের সমৃদ্ধ মনে করা ধার্মিক।

দেশসেবাকে যে একটা সাধনার মতো করে দেখতে চাইতেন তাঁরা, ধর্মভাবের সঙ্গে মিশে থাকা সাধনা— সুভাষের কথায় তার দ্বিধাহীন প্রকাশ দেখি: “আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে আর কিছু নেই। অর্থনৈতিক স্বয়ংস্বত্ব এখন অতীতকালের বিষয়। আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নিয়মিত ভাবে হস্তক্ষেপ চলছে। কিন্তু এখনও আমাদের ধর্মবিশ্বাস অটুট। আমরা আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের আদর্শে ঈশ্বরোপাসনা করতে চাই, পশ্চিমের ধর্মজগতের আওতায় যাওয়ার বদলে আমরা স্বধর্মে নিষ্ঠা থেকে আত্মবিসর্জন করতে প্রস্তুত।”

‘পশ্চিমের ধর্মজগতের আওতা’ বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছিলেন তিনি, সেটাও বলে দিয়েছিলেন স্পষ্ট করে। খ্রিস্টান ধর্মকে সম্মান করতেন তিনি, কিন্তু তার জন্য হিন্দু সমাজের কোনও ক্ষতি তাঁর কাছে গ্রহণীয় ছিল না। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তরুণ সুভাষের মনে হয়েছিল, পশ্চিমের ধর্মভাবনার মধ্যে আরও একটা বিষয় বেশ সমস্যাজনক— তথাকথিত পশ্চিমি ধর্মনিরপেক্ষতা। “ধর্মনিরপেক্ষতা এবং এর জাতক বিশ্বনিন্দুকতা ইউরোপের আত্মকে অতি দ্রুত নিঃশেষিত করে দিয়েছে।



গুরুপ্রতিম চন্দ্রগুণ দাশ ও প্রিয় বন্ধু দিলীপকুমার রায়

কিন্তু একদা ইউরোপের ধর্মে বিশ্বাস ছিল। ক্ষমতার মদে সে তখন মত্ত ছিল না, লুঠের লালসায় পাগল হয়ে ওঠেনি.... তখন এই ধর্মে ছিল সাম্য ও সমভ্রাতৃত্ববোধ।... টাকার পাহাড় বানানো নয়, প্রকৃত খ্রিস্টানের জীবনযাপন করাই ছিল প্রধান কাজ। প্রতিবেশীকে লুণ্ঠন করা নয়, ঈশ্বরের ভজনার মধ্যেই মহত্তর আনন্দের সন্ধান পেয়েছিল ইউরোপ।”

সুভাষের এই কথার মধ্যে ‘পশ্চিম’ বা ‘ইউরোপ’ বলতে যে আসলে উপনিবেশিক পশ্চিম বা সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপের কথা বলা হচ্ছে— সেটা বেশ পরিষ্কার। কিন্তু যেটা আর একটু আলাদা করে পরিষ্কার করা দরকার— তা হল, ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটা এখানে তিনি কী অর্থে ব্যবহার করছিলেন। আমরা এখন যে অর্থে শব্দটাকে জানি, বলি, ব্যবহার করি— সেটা কিন্তু এখানে বলতে চাওয়া হয়নি। বিশ শতকের শুরুতে পশ্চিম ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে একটা অন্য ধারা বোঝানো হত। ‘কনটেন্ট’ বা প্রসঙ্গ মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় সুভাষ বলতে চাইছেন, সেই ‘ওয়েস্টার্ন সেকুলারিজম’-এর কথা, যেখানে সমাজ বা ব্যক্তিজীবনে ধর্মের ভূমিকাটাই অস্বীকার করা হয়। ধর্মকে বাদ দিয়ে চলার কথা বলা হয়। ঠিক এটাই খুব আপত্তি ছিল তাঁর। কিন্তু পরবর্তী কালে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটা ভারতীয় জীবনে যে ভাবে ব্যবহার করা শুরু হল, সেটা তো ওই পশ্চিম ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ নয়। ভারতীয় শব্দ বা ভাবটির অর্থ বরং— সব ধর্মের প্রতি সমভাব রেখে চলা, প্রতিটি ধর্মের প্রতি সমমনস্ক থাকা। ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের শেষ দিকে জাতীয়তাবাদী নেতারাও ক্রমে এই বিশেষ অর্থে ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দটি ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন, স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের সংবিধানেও ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সব ধর্মের প্রতি সমান সম্মান প্রদর্শনকেই বোঝানো হয়। স্পষ্ট করে বলা দরকার, এই যে ‘ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা’, এ বিষয়ে সুভাষের কোনও সমালোচনা বা আপত্তিই থাকত না, থাকা সম্ভব নয়। কেননা, এই সব ধর্মে সমদর্শিতার কথা তিনি বলে গিয়েছেন, বার বার, আমৃত্যু, তাঁর সব কাজে কর্মে আদর্শে উদ্দেশ্যের মধ্যে দিয়ে। যে কোনও ‘কনটেন্ট’ বা প্রসঙ্গ নির্বিশেষে তাঁর লেখা, বার্তা কিংবা ভাবনা যদি আমরা মিলিয়ে দেখি, এ কথা বুঝতে পারব নিমেষে। ধর্ম বলতে কোনও কালে কোনও সন্ধীর্ণ বোধ ছিল না তাঁর মধ্যে, ছিল না অন্য ধর্মের প্রতি বিরোধিতা বা আক্রমণ। নিজের ধর্মের প্রতি অনুরাগ তাঁকে সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, প্রথমত, ভারতবাসীর জীবনে ধর্মচেতনার একটা গভীর স্থান আছে। পশ্চিম মানুষ, পশ্চিম আধুনিকতা, পশ্চিম জাতীয়তাবাদ থেকে সেখানেই ভারতীয় বাস্তবটি আলাদা। এবং দ্বিতীয়ত, ভারতবাসীর জীবনে সব ধর্মের প্রতি সমান সহিষ্ণু ও গ্রহিষ্ণু হওয়ার একটা উজ্জ্বল ইতিহাস আছে, সেখানেও ভারতীয় অভিযাত্রাটি একেবারে আলাদা। খোলা, উদার। বৃহৎ ও মহৎ।

দেশাত্মবোধ কি এই ভাবে আরও অনেক বড় হয়ে উঠেছিল এহেন ধর্মবোধের মিশেলে? অন্তত সুভাষের মনে তো তেমনটাই হয়েছিল। ইতিহাসবিদ সুগত বসুর *দেশনায়ক* বইতে পড়েছি, কী ভাবে অল্পবয়সে

বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে বাংলার ইতিহাসের খোঁজে ছাত্র সুভাষ ঘুরে বেড়াতে, ১৯১৪ সালে রবীন্দ্রনাথের কাছে বসে তাঁর পল্লিগঠনের কাজ আগ্রহ নিয়ে শুনতেন, আবার ওই একই সময়ে তাঁর অধ্যাপকসন্ধান ও চলত পুরোদমে— মিশে যেত দেশভক্তি ও ঈশ্বরভক্তির দুই স্রোত। বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ, এই দুই জনের বিরাট প্রভাব ছিল সুভাষের উপর, দু’জনের কাছেই অধ্যাপকের মধ্য দিয়ে মানবসেবা ও দেশসেবার পথের সন্ধান পেয়েছিলেন তিনি। দুঃখী দরিদ্র ভারতের সন্ধান পেয়েছিলেন, “যে ভারতবর্ষের প্রাণ তার গ্রামসমাজের মধ্যে, যেখানে মাটির উপর বিস্তীর্ণ ছেয়ে থাকে দারিদ্রের ছায়া, পতঙ্গের মতো মারা পড়ে সাধারণ মানুষ, অশিক্ষা যেখানে সর্বব্যাপী।” যে সময়ে তিনি এই ভক্তিবাদে ডুবছেন, তেমন সময়েই হিন্দু সমাজের সন্ধীর্ণতার চেহারাটাও দেখতে পেয়েছিলেন স্পষ্ট। সাধুসন্ন্যাসীরা কত কপট ও ভণ্ড হতে পারেন, তারও প্রমাণ হাতেনাতে পেয়েছিলেন। সূতরাং তাঁর অল্পবয়সের অ্যাডভেঞ্চার যেমন ছিল হিন্দু সন্ন্যাসীদের মতো গেরুয়াবসনে হুগলি নদীর তীরে তাঁবু খাটিয়ে থাকা, আবার আর একটু পরিণত হতেই উত্তর ভারতের হরিদ্বার হাবীকেশ, মথুরা বৃন্দাবন কাশী ঘুরে এসে হিন্দু সমাজে জাতপাতের ভয়াবহ নিষ্ঠুর চেহারাটা দেখে ফেলে “অনেক প্রাজ্ঞ” হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ধর্মসমাজের অন্দর থেকে নিজের ধর্মবোধকে আলাদা করে নিতে পেরেছিলেন।

এই ‘ব্যক্তিগত’ ধর্মযাত্রায় তাঁর উপর একটা প্রভাব ফেলে গিয়েছিল দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র দিলীপকুমার রায় ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর, ছোটবেলা থেকেই। গানের গলা তাঁর উদাত্ত, ভক্তিতে সেই সঙ্গীত বিভোর, বিধুর। দিলীপকুমার রায়ের গলায় দেশাত্মবোধক গান শুনতে শুনতে সুভাষ চলে যেতেন অন্য জগতে, আত্মনিবেদনের আকুলতা তাঁকে আবিষ্ট করে দিত। শিশিরকুমার বসুর স্মৃতিচারণে পড়ি, ১৯৩৭-৩৮ সালে যখন উডবার্ন পার্কের বাড়িতে জমিয়ে গানের আসর বসেছিলেন দিলীপকুমার, “বাবা ও রাঙাকাকাবাবু [শরৎ বসু ও সুভাষ বসু] পাশাপাশি বসে গান শুনতেন। দুজনেই একেবারে অভিভূত হয়ে যেতেন, তাঁদের মুখে অপূর্ব এক জ্যোতি ফুটে উঠত, দু’চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত।” সত্যিকারের ভক্তি তো আসলে কাউকে ছোট করে না, বড় করে, বৃহৎ করে, মুক্ত করে— তাই সত্যিকারের নিবেদনের গান শুনে অশ্রুতে অশ্রুতে সুভাষের মনে গাঁথা হত মানুষের প্রতি ভালবাসার মালা।

শিশিরকুমারের বই থেকে আর একটি ঘটনাও মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে, যদিও সে ঘটনা প্রত্যক্ষ ভাবে ধর্ম-প্রসঙ্গীয় নয়, বরং বলা যায় বিশ্বাস-প্রসঙ্গীয়। এক বিকেলে সুভাষ উঠে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে, ধীরে ধীরে, নীরবে, গভীর। যেন একটি পাথরের মূর্তির মতো তাঁর মুখভাব। বৌদি বিভাবতী দেবী বেরিয়ে আসতে সুভাষ একটি কাগজের মোড়ক তাঁর দিকে এগিয়ে দিয়ে খানিক থমথমে গলায় বললেন, “যতীন দাসের অস্থি, যত্ন করে রেখে দেবেন।” শহিদ বিপ্লবী যতীন দাসের শোকযাত্রা করে শ্মশান থেকে ফিরছিলেন তিনি তখন।

এই বিশ্বাস, এই ভক্তি তাঁদের পারিবারিক উত্তরাধিকার। প্রার্থনা বা গানও সেই উত্তরাধিকারের মধ্যে পড়ে। উডবার্ন পার্কের বাড়িতে নিয়মিত প্রার্থনাসভা হত। সেখানে রামধন হত, অন্যান্য ভক্তিমূলক ও দেশাত্মবোধক গানও হত। মাঝে মাঝে ইংরেজিতেও প্রার্থনাসঙ্গীত হত, গৈরিক বসন পরিহিত দিলীপকুমার রায় গাইতেন ইংরেজি গান।

ধর্মবিশ্বাসে ভর রেখে যে কতটা খোলামেলা পরিবেশ তৈরি হতে পারে, ‘বসুবাড়ি’কে তার দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। বাড়ির ছেলেমেয়েরা ওই রকম পরিবেশে বড় হয়ে উঠতেন একসঙ্গে। একটা বিধান ছিল সে বাড়িতে, সন্ধ্যাবেলা সকলে মিলে একসঙ্গে বসে স্তোত্র পাঠ করা হত। শিশিরকুমারের ধারণা— রাঙাকাকাবাবু সুভাষচন্দ্রের উদ্যোগেই আরম্ভ হয়েছিল এই ধারা। ছোটদের প্রত্যেকের নিজেদের একটি স্তবের খাতা ছিল, তাতে লেখা স্তবগুলি মুখস্থ করতে হত। একটি ভবানী স্তোত্র ও একটি শিবস্তোত্রের কথা স্মৃতি থেকে লিখেও রেখেছেন শিশিরকুমার। এমনকি কাশীয়াঙের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েও প্রাতঃকালীন স্তবপাঠ বাদ পড়ত না।



গান্ধীজি মনে করতেন, ধর্মীয় সন্ধীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বর্জনই হতে পারে সুভাষচন্দ্রের প্রতি প্রকৃত সম্মানজ্ঞাপন

এই সেই ধারা যেখানে নিজের ধর্মের শাস্ত, গভীর বাণীটি হৃদয়ে ধারণ করতে শিখেছিলেন সুভাষচন্দ্র। শিখেছিলেন, কী ভাবে সেই বাণী মুক্তি ও উদারের দিকে এগিয়ে দেয় হাত ধরে। বসুধৈব কুটুম্বকম্—সকলকে আপন করে নিতে হয়। প্রবল উদ্যমী জাতীয়তাবাদী নেতাটি যখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট পদে বৃত্ত হলেন, তাঁর ব্যক্তিগত ‘ধর্মবিশ্বাস’ বানবানিয়ে বেজে উঠল কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে, দেশব্যাপ্ত সমস্ত জনসমাজের জন্য উদার রাজনীতির আহ্বান নিয়ে— “কংগ্রেস ঐতিহ্য বলে যদিও কংগ্রেস সদস্য যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং যাতে তিনি লালিত হন তার থেকে কখনও সম্বন্ধচ্যুত হন না, কিন্তু ধর্মবিশ্বাসের বলে কেউ কংগ্রেসের সদস্যভুক্ত হন না। কংগ্রেস রাজনৈতিক নীতি ও পদ্ধতিকে সমর্থন করেন বলেই তিনি অন্তরে বাহিরে কংগ্রেসি। কংগ্রেস কোনও ভাবেই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়। সকল ধরনের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কংগ্রেস সংগ্রাম করে এসেছে, কারণ বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক জাতীয়তাবাদের বিকাশের পক্ষে তা অন্তরায়।”

এই লাইনগুলি রয়েছে ১৯৩৮ সালে মহম্মদ আলি জিন্নাকে লেখা সুভাষচন্দ্রের চিঠিতে। স্থানকালপাত্র-বিচারে বোঝাই যাচ্ছে, কেন এত দৃঢ় ভাবে তিনি নিজের বক্তব্যটি প্রকাশ করতে চাইছেন। কংগ্রেস প্রেসিডেন্টের পদ থেকে জিন্নাকে লেখা সে সময়কার অন্য কয়েকটি চিঠিতেও এই প্রাবল্য বার বার ফুটে উঠেছে— কোনও ভাবেই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সামনে এক বিন্দু জমি ছাড়তে রাজি নন এই নেতা। হিন্দু-মুসলমানের মিলিত পথের এই লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হওয়া তাঁর কাছে আত্মঘাতের শামিল, এমন কথাও বলছেন। ব্যক্তিজীবন থেকে সমাজজীবনে জড়িয়ে যায়, ছড়িয়ে পড়ে যে ধর্মবিশ্বাস, সেই ধর্মই তো বলে দেয়, সমাজে আর রাজনীতিতে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ ও বৈষম্য মানবতার অবমাননা, আত্মঘাতের মতো পরিমাপহীন অন্যায়।

ধর্মীয় বিভেদ ও বৈষম্যের প্রশ্নে এই যে প্রবলতা শোনা যেত সুভাষের গলায়, অন্যদেরও তা কান এড়ায়নি। সুভাষ হিন্দু মহাসভাকে আটকানোর জন্য, তাদের কড়া হাতে মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। এখনকার হিন্দুত্ববাদীরা যতই সুভাষকে নিজেদের করে নেওয়ার জন্য গলা ফাটিয়ে যান না কেন, তাঁদের ‘আইকন’ সাভারকর এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা কিন্তু খোলাখুলিই সুভাষকে বলতেন ‘হিন্দু জিহাদি’। অর্থাৎ হিন্দু হয়েও হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে সক্রিয় সুভাষ— এই ছিল তাঁদের অভিযোগ। সুভাষ নাকি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিপদটা দেখতে পেতেন না, মুসলিমদের দূরে সরানোর বিরোধিতা করতেন, রাজনীতিক হিসেবে হিন্দুত্ববাদের

সবচেয়ে বড় প্রতিরোধী ছিলেন!— বেশি নথিপত্র ঘাঁটার দরকার নেই, জিন্নাকে লেখা উপরের ওই চিঠিই বলে দেয়, কত ভুল এই অভিযোগ।

কোনও কালে সুভাষ কোনও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেননি— হিন্দুদেরও না, মুসলমানদেরও না। সুভাষই সম্ভবত প্রথম নেতা, যিনি ভারতের নামে কোনও কিছু তৈরি করে তাতে খোলাখুলি সর্বধর্মের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। দেশ ছেড়ে অন্তর্ধানের পর তিলে তিলে গড়ে তুলছেন ‘আজাদ হিন্দ’ বাহিনী, এবং সেটাকে সত্যিকারের ‘জাতীয়’ করার জন্য হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রিস্টান সকলকে নিয়ে একসঙ্গে তৈরি হয়েছেন। তৈরি করেছেন তিন ব্রিগেড: গান্ধী ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ব্রিগেড। সিঙ্গাপুরে ১৯৪৫ সালে আইএনএ শহিদদের জন্য স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হতে তার উপর উদ্ভূত— অন্য কোনও ভাষায় নয়— লিখেছেন ইতমদ (বিশ্বাস), ইত্তেফাক (ঐক্য), কুরবানি (আত্মত্যাগ)। হিন্দু মুসলমান সব সেনাদের একসঙ্গে খাওয়ার চল করিয়েছেন সেই বাহিনীতে, একসঙ্গে বসবাস করতেন সৈনিকরা— ধর্মপরিচয় মাথায় না রেখে। ১৯৪৫-৪৬ সালে তিন আইএনএ অফিসারের ট্রায়াল হচ্ছিল যখন, অভিযুক্ত ছিলেন গুরবক্স সিংহ ধিলৌ, শাহনওয়াজ খান আর প্রেমকুমার সহগল— শিখ, মুসলমান ও হিন্দু তাঁরা, ধর্মপরিচয় যদি ধরতেই হয়। ওই আইএনএ বিচার দেশে আবেগের ঢেউ তুলেছিল। ভারতের পরাধীনতার শেষ প্রহরে যখন চার দিক জুড়ে ঘনিয়ে আসছিল ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ন মেঘ, হঠাৎ সেই ক্লিষ্ট দেশের কৃষ্ণপটে বিদ্যুৎচমকের মতো বালক দিয়ে উঠেছিল সম্প্রীতি-ঐক্য-উদার্য সিন্ধু এক ‘অন্য’ ভারতের ছবি। নেতাজির বিশ্বাস আর আদর্শেই তো তিলে তিলে গড়া সেই ছবি— নেতাজির ধর্মবোধের সাক্ষ্য প্রমাণ।

মহাত্মা গান্ধীকে এক বার এক আইনজীবী বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হিন্দুধর্মের সংজ্ঞা তিনি দেবেন কী ভাবে। সোজাসুজি উত্তর দেননি গান্ধীজি, কেবল বলেছিলেন, “হিন্দুধর্ম সেই ধর্ম যা অন্য সব ধর্মকে সম্মান করে চলে।” আর তার সঙ্গে তিনি যোগ করে দিয়েছিলেন যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র এক জন ঠিক ‘সেই রকম হিন্দু’— আর তাই গান্ধীজির মতে— নেতাজির স্মৃতি মনে ধরে রাখতে হলে “সব ভারতীয়ের উচিত যে কোনও ধরনের ধর্মসম্বন্ধীয় সন্ধীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে নিজেদের মুক্ত করান।”

ঠিকই তো। সব বিদ্বেষ থেকে তাঁর দেশকে উদ্ধার করার ব্রত নিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু— যে দেশকে তিনি বলতেন ‘ঈশ্বরের প্রিয়ভূমি’।

উপন্যাস

অবশ্যভাবী

অজিতেশ নাগ





“কী হচ্ছো কী? লোকটাকে সামলা না।”

অনেক ক্ষণ ধরেই, বিশেষ করে এঞ্জাইন্ডের মোড়টা পার করেই, তুমুল জোরে গাড়ি ছুটিয়েছিল ট্যান্ডিওয়ালা। ভিতরে এক মাত্র প্রত্যাশাকে বাদ দিয়ে সবাই বেশ এনজয় করছিল এই দৌড়টা। প্রত্যাশা, একদম সাইডে বসার কারণে, এক হাতে জানালার উপরের হাতলটা সজোরে চেপে ধরে বলেছিল, “ও দাদা, আমরা বইপাড়া জায়েগা, বৈতরণী পার নেহি। একটু আন্তে চালাইয়ে।”

মিঠি তার কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ছোট বোতল বের করে জল খেতে যাচ্ছিল, প্রত্যাশার হিন্দি শুনে হি হি করে হেসে প্রায় ড্রাইভারের গায়ের উপরে হেলে পড়ল। হাসি থামিয়ে সে বলল, “ভাগ্যিস, জলটা মুখে দিইনি।”

সৌজিতা বলল, “মনে হচ্ছে, দাদার পটি পেয়েছে।”

গাড়ি দুলুনিতে হরবিন্দর এক বার সৌজিতার গায়ে পড়ছিল, আর এক বার প্রত্যাশার গায়ে।

অবশেষে মেডিকেলের সামনে এসে ট্যান্ডিওয়ালা স্পিড কমাল। মানে ভিড়ের কারণে কমাতে বাধ্য হল আর কী!

সৌজিতার কথাই হয়তো সত্যি। আদি মোহিনীমোহনের আগে গাড়ি সাইড করে ট্যান্ডিওয়ালা মুখ বিকৃত করে বলল, “জলদি কিজিয়ে, মুঝে... জানা হ্যায়।”

সৌজিতা মুখ টিপে এমন ভাবে তাকাল, যেন বলতে চাইছে, ‘দেখেছিস, আমি আগেই জানতাম।’

ট্যান্ডি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিল মিঠি। হরবিন্দর অবশ্য পিছন পকেটে হাত ঢুকিয়ে পার্সটা বের করে আনতে যাচ্ছিল, সৌজিতা তাকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে বলল, “তুই রাখ! আজ মাসের কত তারিখ?”

“থার্ড। সো?” হরবিন্দরের চোখে বিস্ময়।

সৌজিতা বলে, “ইতনা দিন বাদ আওগে তো ইনার মগজ মে গ্রে-ম্যাটারের সালসা-ডান্স হবেই। ইঞ্জ’নট ইট ডুড?”

প্রত্যাশা তত ক্ষণে মোবাইলের ফ্রন্ট ক্যামেরা অন করে লিপস্টিকটা ঠিক আছে কি না দেখার চেষ্টা করছিল। সৌজিতার কথাকানে যেতেই সে কলকল করে উঠল, “ওএমজি! আজ তো তিন তারিখ।”

এক মাত্র হরবিন্দর বাদ দিয়ে মিঠির প্রাণের বন্ধুবান্ধব মানেই জানে, প্রতি মাসের তিন তারিখ মানে মিঠির ব্যান্ড অ্যাকাউন্টে পাঁচ অঙ্কের টাকাটা ঢুকে গেছে। সেই দিন তার মেজাজ খুশ। এমনিতে মিঠি যে খুব খরচা করে তা নয়, তবে এই দিনটা সে ভারী হাতখোলা হয়ে ওঠে। বাকিরা জানেও তাই। অন্য দিন হলে সে বড় জোর কফির দামটা মেটায়, খাবার-দাবারের দাম মেটানোর হৃদয় পেতে দেয় প্রত্যাশা নয়তো সৌজিতা। সৌজিতা বলে, “মিঠি একটি অ্যাকাউন্টেবল এন্সপেন্সার।”

এই দুটো শব্দের সত্যি কোনও মানে আছে কি না জানা নেই, তবে সৌজিতার বক্তব্য মোটামুটি সত্যিই। মিঠি আগে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ পেয়েছিল। চাকরিটা মন্দ নয়, অফিসটাও বাকমকে, তবে মাস শেষে মাইনে দিতে গিয়েই ভ্যানতারা করত। রেগে মেগে আর বিশেষত তার সবেধন তিনটি প্রাণের বন্ধুর পরামর্শে সে “ধুত্তোরি” বলে চাকরিটা ছেড়ে দেয়। তার পর মাস চারেক অপেক্ষার পর অবশেষে সে একটা বহুজাতিক সংস্থায় জয়েন করে। মিঠির এই কোম্পানিটি রাজারহাট এলাকায় আর হেড অফিস সেকেন্দরাবাদে। এমনিতে খাটুনি প্রচণ্ডই, দিনে প্রায় ঘণ্টা দশ-বারো অফিসে কাটিয়ে মিঠি যখন বাড়ি ফেরে, তখন সে মড়া। কোনও মতে কিছু একটা পেটে দিয়েই থড়াস। এমনিতে সে ভারী সিনসিয়ার। শরীর খারাপেও সে কাজে কোনও ফাঁকি দেয় না। শুধু প্রতি মাসের তিন তারিখে তার মোবাইলে ‘স্যালারি ক্রেডিটেড’ মেসেজটা টুং শব্দ করে ভেসে উঠলেই সে হাফ দিনের মাইনে

বরবাদ করে বেরিয়ে আসে। আগে তার ইমিডিয়েট বস সামান্য গাঁইগুঁই করত, এখন জেনে গেছে।

অফিস থেকে বেরোনোর আগে অবশ্যই তিন বন্ধুকে জানিয়ে দেয়, যদিও জানে তিন তারিখটা জ্ঞানত তার বন্ধুরা ভুলবে না। চার বন্ধুর কমন মিটিং প্লেস আদি মোহিনীমোহনের মোড়। সেখান থেকে হটিতে হটিতে কফি হাউস, নয়তো বইয়ের গন্ধ শুকতে শুকতে কলেজ স্কোয়ারের বেঞ্চি। শুরু হয় গল্প-গাছ। আবার কোনও দিন হয়তো ওদের হাসি-ঠাট্টা আর এর-ওর পিছনে লাগার শ্রোতা থাকে প্যারামাউন্টের ডাব-শরবত। ওরা মানে সৌজিতা, মিঠি, কৌশানী আর প্রতুষা। চার জন চার জনের প্রাণের বন্ধু, সেই ক্লাস কমলা গার্লসের স্কাট-পরা বয়স থেকে, ঋতুচক্র শুরু হওয়ার অনেকটা আগে থেকেই। তিন তারিখটা বাদ দিলে বাকি থাকে রবিবারগুলো। তবে প্রত্যেক বারই যে কলেজ স্ট্রিট, তা অবশ্য নয়। এক-এক বার হয় নন্দন নয় সাউথ সিটি মলেও টু মেরে আসার ইচ্ছে জাগে।

মিঠি থাকে ভবানীপুরে। হরিশ মুখার্জি স্ট্রিটের উল্টো দিকের গলিতে ওদের তিন পুরুষের বসবাস। ওদের এই বাড়িটা অবশ্য মিঠির পিতৃপুরুষদের তৈরি নয়, এক ধনী মুসলমান পরিবারের। দেশভাগের অনেকটা আগেই তারা বিক্রিবাটা সেরে চলে যায় ফইজলাবাদ না ইসলামাবাদ কোথায় যেন। সেই থেকে এই আখান্না বাড়িটা মিঠিদের। অবশ্য ‘আখান্না’ শব্দটা প্রতুষার, ‘আখান্না বলব না? সিঁড়িগুলো দ্যাখ, কেমন সরু সরু, খাড়া, খাড়া। কোনও দিকে নেই, শুধু এক দিকে চার তলার সমান দেওয়াল। কেন? বারান্দাগুলোয় রোদ লাগে না, রাত-দিন পায়রা পটি করে, আবার ঘরগুলো দেখ! উফ, ছাদের হাইটই দোতলা বাড়ির সমান। কোনও মানে হয়?’

প্রতুষা কোনও চাকরি-বাকরি করে না, করার চেষ্টাও করেনি কোনও দিন। পার্ক সার্কাসে ওদের তেতলা বাড়ি, পারিবারিক অ্যান্টিক জিনিসপত্রের দোকান, সোনার দোকান, হ্যান দোকান, ত্যান দোকান, চালকল, দু-তিনটে কোন্ড-স্টোরেজ, আরও নানা কারবার, সব মিলিয়ে যাকে বলে বাপের দেদার টাকা প্লাস বয়ফ্রেন্ডের পার্সে ভর্তি নামী-দামি ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড। প্রতুষা মুখেও বলে, “এর পরেও বাড়ি হেলিয়ে চাকরি করে কে?”

“তবুও। নিজের বলে একটা কিছু... সেল্ফ ইন্ডিপেন্ডেন্স...”

মিঠির কথা শেষ হয় না, প্রতুষা মাছি ওড়ায়, “ধ্যার, আগে যা আছে, খেয়ে শেষ করি!”

সৌজিতা ফুট কাটে, “খেয়ে শেষ করি! মানোটা কী?”

সৌজিতা আসে সন্তোষপুর থেকে। সে আগে মাঝেরহাট ব্রিজের কাছে একটি পেট্রোল পাম্প-সংলগ্ন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে চাকরি করত, পোষায়নি বলে এখন নিউ আলিপুরে একটা টিউটোরিয়াল হোমে স্টুডেন্ট পড়াচ্ছে। এই চার জনের মধ্যে সৌজিতা লেখাপড়ায় ভাল। চোখ তার সান্ধী। সেখানে মাইনাস তিন-চার পাওয়ারের একটি চশমা। তার বাড়ির অবস্থা মোটামুটি তুলা রাশি। বেশিও না, কমও না। সৌজিতার একটা সুবিধে ওর মেয়েলি সাজগোজ, লিপস্টিক ইত্যাদিতে খরচা নেই। যা কামায়, অল্প বাড়িতে দিতে হয়, বাকিটা খরচ করে ফেলে, খেয়েদেয়ে নয়তো গিফট-ফিফট করে।

“কিছু জমাস না?” মিঠি বলেছিল।

সৌজিতা ঠিক প্রতুষার মতো মাছি উড়িয়েছিল, “সেভিংস? ফুং! আর পাঁচ মিনিট পরে বেঁচে থাকব কি না, তার ওয়ারেন্টি আছে? পরে ভূত হয়ে কি মাথা চাপড়াব?”

পাশ থেকে প্রতুষা ফুট কেটেছিল, “রেস্টিফিকেশন। ওটা মাথা হবে না। করোটি।”

এদের মধ্যে এক মাত্র কৌশানীর পারিবারিক স্টেটাস সামান্য ঝুলে। বিজয়গড়ের তিন কামরার একটা বাড়িতে থাকে। বাবা আছে, মা আছে, একটা বোন আছে। কয়ার্সে মাস্টার্স পাস করে একটা ভদ্র গোছের চাকরি খুঁজছে প্রাণপণে, কিন্তু এখনও সুবিধে করে উঠতে পারেনি। বাড়িতেও নাকি নিত্য অশান্তি! সেই অশান্তি অবশ্য তার বেকারত্বকে ঘিরে নয়। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হলে সেটার খানিকটা শেয়ার করে সে শান্তি পায়।

“আব? কাঁহা?” রুমাল দিয়ে মুখ মুছে হরবিন্দর জানতে চায়।

“কফি হাউস ডুড,” সৌজিতা বলে।

“কফি হাউস,” মিঠি সায় দেয়।

“অ্যাবসোলিউটলি,” প্রতুষা মোবাইল ক্যামেরা অফ করে।

“নোওও। নট আগেন,” হরবিন্দর বেঁকে বসে।

সৌজিতার চোখে জিজ্ঞাসা, “কেয়া ছয়া বিন্দা? এনি প্রবলেম? এই মেরেছে! তোর সেই লেডি ব্রেবোনের ডেলি কেসটা...”

ওকে কথা শেষ করতে না-দিয়ে মাথায় আলতো চাঁট মারে হরবিন্দর, “আবে! ম্যায় বোলা কফি হাউস নেহি। বহত শোর হ্যায়। লাস্ট টাইম পরেশান হয়ে গিয়েছিলাম।”

“তা হলে তুই বাবা এক কাজ কর, তুই ডিস্কোয় যা, ডুড।”

সৌজিতার মন্তব্যে হরবিন্দর চমকায়, “কেয়া? কেয়া বোলি তু?”

“বললাম কলকাতায় জন্ম নিলি, বড় হলি, এখন পঞ্জাব থেকে এসে ফালতু পরেশানি দেখাচ্ছিস? মারব এমন না?”

মিঠি হাত তোলে, “অ্যাই, মারামারি নয়। বিন্দা, কফি হাউসের তিন তলার ব্যালকনিতে বসব। আই বিলিভ, তোর পরেশানি কম হবে।”

ওরা তিন জনে এগোলে হরবিন্দর অগত্যা বেজার মুখে পিছু নেয়।

বৈশাখের শেষ। কালই বেশ বাড়-বাদলা গিয়েছে। তার পরেও কে ভাবতে পেরেছিল আজ আবার এত গরম পড়বে? রাস্তার পিচও যেন গলে গলে যাচ্ছে। তবুও কলেজ স্ট্রিট এমনই এক আজব জায়গা, যে চোখ-মুখ-মাথা ঢেকেও ইয়াং ছেলে-মেয়েরা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে কাজে-অকাজে। কোনও কোনও মোড়ে জটলা করে গুলতানি মারছে। এমনকি কলেজ স্কোয়ারে, প্রবল রোদের ঝাপটা সহ্য করেও জোড়ায় জোড়ায় বসে আছে। অবশ্য কারও কারও মুখের সামনে ছাতা। ছাতা অবশ্য সর্বদা রোদ আটকাতে নয়।

কাল সকালে উঠে ওয়েদার দেখে প্রতুষাই কনফারেন্সে ফোন করেছিল বাকিদের, “টম্পারেচার নেমে গেছে, গুরু! পুরো ডাউনফল। আজ চলে আয়।”

মিঠি বলেছিল, “আজ হবে না রে। আর্জেন্ট একটা কনফারেন্স আছে। সেটা হয়ে গেলে অবশ্য আমি ফ্রি।”

সৌজিতা বলেছিল, “সেটি হচ্ছে না, ডুড। তুমি আজ এসে তার পর কাল ডোবাবে।”

প্রতুষা বলেছিল, “কেন? কাল কী আছে?”

“কাল কোন তারিখ ভুলে মারলি? আজ যাবে কোন মুখ?”

“ইয়েস, ইয়েস। কালই তো তিনি। হাউএভার, কাল আসছিস তো?”

সৌজিতার গলাতেও খুশির রেশ ছিল, “তবে সত্যি রে ডুড, আজ হেবি ভাল ওয়েদার ছিল। মনে হচ্ছে কালকেও লাস্টিং করবে। বিন্দাটাকেও দ্যাখ, কালকেই আসছে দিন বুঝে। উফ ব্যাটা কদিন পরে পা রাখছে কোলকাতায়। জানিস, আমাকে এই নিয়ে কুড়ি বার ফোন করেছে। মোহিনীমোহনের সামনে ডেকেছি। চলে আসিস।”

প্রতুষা খিল খিল করে হেসেছিল, “ওএমজি! ইজ ইট? কাল শিয়ার ব্যাটার অনেক টাকা খসাব। ভাটিভা না মাটিভায় এত বছর থেকে কত কামাল, সেটা খুঁচিয়ে দেখব না?”

“বাট, ওয়ান থিং, এত বছর পরে বিন্দা ফের এখানে? সেই লেডি ব্রেবোন ডাক দিয়েছে নাকি ভুরু-পল্লবে? তোরা জানিস কিছু?” মিঠি জানতে চায়।

“আরে ধ্যাত। তোর যত ফালতু বাতেলা। বিন্দাটা বিয়ে করছে।”

“রিয়্যালি?”

“হ্যাঁ রে। মাস চারেক পরে। আমাদের ইনভাইট করতে আসছে। তা ছাড়া কী সব কাজ-ফাজ আছে বলছিল।”

ওদের সবার ফোনে কনফারেন্স ভিডিয়ো কল যখন কেটে যায়, তখনও কি জানা ছিল আজ এই রকম সৃষ্টিছাড়া গরম পড়ে যাবে?

বিন্দা অর্থাৎ হরবিন্দর খালিওয়াল নামের খেড়ে ছেলেটার সঙ্গে ওদের আলাপ আশুতোষে। প্রথম থেকেই ছেলেটিকে নিয়ে ক্লাসের সবার একটা কমন কৌতূহল ছিল। পঞ্জাবি ছেলে বাংলা কলেজে কেন

বাবা? তার পর ধীরে ধীরে সবাই সব জানতে পারে। বিন্দার তিন-চার পুরুষ ধরে কলকাতারই বাসিন্দা। এলগিন রোডে কাপড়-চোপড় আর টায়ার টিউবের বিজনেস ওর বাপ-ঠাকুরদার, সেই কোন আদিকাল থেকে। ফলে নিজেদের ফ্যামিলির মধ্যে কাটানো সময়টুকু বাদ দিলে বাড়ির বাইরে সবাই বাংলাতেই কথা বলে।

বিন্দার লেখাপড়াও বাংলা মিডিয়ামে। তার পর ধীরে ধীরে এই চার মাস্টেটিয়ার্সের সঙ্গে কবে থেকে যে সে জুড়ে গিয়েছিল, নিজেই ভুলে গেছে। বছর তিনেক আগে কী-একটা চাকরি বাগিয়ে বিন্দা চলে যায় ভাটিভায়। যাওয়ার আগে চোখ ছলছলিয়ে সে বাকিদের হাসির খোরাক হয়েছিল, আজও মনে আছে। অবশ্য মিঠি-সৌজিতা-কৌশানী-প্রত্যাষাদের হাসিটা ছিল ওকে মন খারাপের ছোঁয়াচ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা। নইলে যে দিন বিন্দা উড়ে গেল, তার পরের টানা দিন দশেক ওদের মন ভারাক্রান্ত হয়েই থাকত।

ভাটিভায় চলে গেলেও ফানে আর হোয়াটসঅ্যাপে ওদের সঙ্গে যোগাযোগটা বেঁচেই ছিল, তবে বেশি মেসেজ চালাচালি হত সৌজিতার সঙ্গে। তবে ওরা ভাবেনি বিন্দা ফের ফিরে আসতে পারে। এক মাত্র সৌজিতা জানত বিন্দা একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দিতে চায়। নেহাত কাল কথার ফাঁকে তার মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। পরে যার জন্য হাত কামড়াতে হয়েছিল সৌজিতাকে। বিন্দা জানতে পারলে বলবে, ‘তেরে অন্দর এক মচ্ছর ভি ছুপ নেহি সকতি! বুরবক!’

কফি হাউসের সামনে এসে প্রত্যাষা থমকে দাঁড়াল। হাত তুলে বলল, “অ্যাঁই, দাঁড়া দাঁড়া, আগে নিবুম আসুক।”

সৌজিতা বলল, “ও চলে আসবে’খন। আমরা তো গিয়ে বসি। আদারওয়াইজ জায়গা পাব না। নিবুমের তো স্কুটি। অনেক ক্ষণ হল রওনা দিয়েছে। দেখিস, ঠিক টুকটুকিয়ে চলে আসবে। আর বাহন না-থাকলেও অসুবিধে কোথায়? এগারো নম্বরে ভর করে উড়ে আসবে।”

বলেই সৌজিতা খিল খিল করে হেসে ফেলল। সেই হাসিতে যোগ দিল মিঠি আর প্রত্যাষাও। কথটা ইয়াকিরি ছলে হলেও মিথ্যে নয়। ওদের কলেজের অ্যানুয়াল স্পোর্টস মিটে মহিলা বিভাগে দৌড়ে প্রথম হওয়াটা এক রকম অভ্যাস করে ফেলেছিল কৌশানী। সে একশো হোক বা চারশো মিটার অথবা রিলে। কত যে পুরস্কার পেয়েছিল সেই সময়! ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট কমপিটিশনেও এসেছিল পুরস্কার। কৌশানীর খুব ইচ্ছে ছিল এটাকেই তার প্রফেশন হিসেবে নেওয়া। কিন্তু ভাগ্য আর সংসারের মুঘলচক্রে প্রবেশ করে সব ভোগে গেছে। এখনও দেখা হলে বন্ধুরা যখন বলে, “ফের শুরু কর না,” কৌশানী মূদু হাসে। তবে সে তার অভ্যেসটা ভুলতে চায়নি বলেই মাঝেমধ্যে ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে ভারতমাতার মাঠে গিয়ে দশ-এগারো পাক দৌড়ে নেয়। সে টের পায়, সকালে ঘাম বারালে বাকি দিনটা ভারী ঝরঝরে কাটে।

সৌজিতার কথা শুনে হরবিন্দরের মুখের গোমড়া ভাব আচমকাই কেটে গিয়ে রোদ ঝলমলিয়ে উঠল, “নিবুম? মতলব হমলোগোকা কৌশানী? ও অভি তক জিন্দা হয়?”

বলেই হা হা করে রাস্তা-কাঁপানো হাসি হাসল হরবিন্দর। এই সময় একটা ভ্যানরিকশা প্রচুর বইপত্র চাপিয়ে ‘হটিয়ে’, ‘হটিয়ে’ বলতে বলতে আসছিল। রাস্তার আরও পাশে সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিয়ে মিঠি একটা কিল বসিয়ে দিল হরবিন্দরের পিঠে, “তখন থেকে খুব হিন্দি কপচাচ্চিস যে রে বিন্দা? কেসটা কী গুরু? আগে তো বাংলা ছাড়া অন্য কিছু ডাইজেস্টই করতে পারতিস না।”

হরবিন্দর জিভ বের করল, “সরি রে, বছর তিনেক ভাটিভায় থেকে, ইউ নো...”

হরবিন্দর কথা শেষ করতে পারল না। কাঁধে একটা বোলা নিয়ে কৌশানী হাজির। স্পষ্টত বাবা যাচ্ছে হন হন করে হাঁটতে হাঁটতে আসছে। ফরসা মুখটা ঘামে ভিজে চকচক করছে। কৌশানী ওদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে মুখ হাঁ করে দম নিল খানিক। প্রত্যাষা অবাক গলায় বলল, “তোর স্কুটি কোথায় রাখলি? হাঁপাচ্চিস কেন?”

একটু দম নিয়ে হাতখড়ির দিকে তাকিয়ে কৌশানী বলল, “উপরে চল, সব বলব। মেট্রো ধরে এলাম। তার পর এমজি রোড থেকে... উফ

মাগো! কী গরম পড়েছে রে!”

কফি হাউসের গেটের দিকে এগোতে গিয়ে হরবিন্দরের দিকে চোখ পড়ল। ওর কৃষ্ণত ভুরু-দুটো উপরের দিকে উঠে গেল, “ওএমজি! বিন্দা! বিন্দা না? এত ফুলেছিস কেন রে? খবর কী বাড়ি? দাঁড়া আগে উপরে চল, গলায় জল ঢেলে তাপ্লর শুনছি তোর কেছা।”

সৌজিতা, প্রত্যাষা, মিঠি, হরবিন্দররা চলে গেছে অনেক ক্ষণ। এখন কলেজ স্কোয়ারের ভিতরের একটা খালি বেঞ্চে একা কৌশানী বসে আছে। তার নিস্পলক দৃষ্টি লোহার ফেন্সিংয়ের ভিতর দিয়ে জলাশয়টার দিকে। বিকেল নামলে তবে কচিকাঁচা সঁতারুদের ছল্লোড়ে মেতে উঠবে জলাশয়টা। এখন ভিতরে কেউ নেই। জল নিস্তরঙ্গ। কৌশানী তাকিয়ে আছে, তবে দেখছে না কিছুই। একটু আগেও একটা বাদামওয়ালা হাঁক দিয়ে গেছে। দু’-এক জন চা-বিক্রেতা তার সামনে খানিক দাঁড়িয়ে কী মনে করে ফের এগিয়ে গেছে। গোটা তিনেক ছেলে তার দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেছে। কৌশানী, এই চড়া রোদেও যে বেঞ্চিতে ঠায় বসে আছে, সেই বেঞ্চিটার অপর প্রান্তে, এক জোড়া ছেলেমেয়ে, বসতে গিয়েও কী মনে করে উঠে গেছে। কৌশানী যেন তাকিয়ে আছে, দেখছে না কিছুই। গোটা দুনিয়া চলমান আর সে-ই যেন স্থির।

আধ ঘণ্টা আগে সৌজিতারা চলে গেছে বইপাড়া ছেড়ে। অনেকটা যেন অভ্যেসে তার আজ কলেজ স্ট্রিটে আসা আর কথা দিয়েছিল বলেই সে এসেছে। নইলে আসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না। ওদের সঙ্গে কাটানো সারাটা সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে স্বাভাবিক থাকতে চেষ্টা করেছে সে, যেন কিছুই হয়নি। সব কিছু স্বাভাবিক। হয়তো ধরাও পড়ত না, চেষ্টার কোনও ক্রটি করেনি সে। স্বাভাবিক ভাবেই কথা বলেছে, কফির কাপে চুক চুক আওয়াজ তুলে খিল্লি করেছে বিন্দাকে নিয়ে, অবধারিত ভাবেই প্রত্যাষার লালচে ঠোঁট আর হরবিন্দরের পুরনো লেডি ব্রেবোনের ব্যথা নিয়ে খোঁচা মেরেছে, চিকেন কাটলেটে কামড় দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছে। করেছে আরও অনেক কিছুই, তবে শেষরক্ষা হয়নি। অবশ্য কৌশানী জানত, সৌজিতার চোখকে ফাঁকি দেওয়া খুব সহজ নয়। তাই তার দিকে পাশ ফিরে বসেছিল সে। কিন্তু উদ্দেশ্য ব্যর্থ।

সৌজিতা চেপে ধরতেই অবশেষে ভাঙতে হল নিজেকে। দু’হাতে মুখ চেপে উদ্গত কান্না থামানোর প্রচুর চেষ্টা করেছিল সে, কিন্তু তার সঙ্গে তার পিঠে-মাথায় চার জোড়া হাতের স্পর্শ যেন কৌশানীকে আর কিছুতেই পেরে উঠতে দিল না। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদছিল সে। পাশের টেবিলগুলো থেকে চমকে ফিরে তাকিয়েছিল কয়েক জোড়া চোখ।

কফি হাউস থেকে বেরিয়ে কৌশানীকে ওরা একা ছাড়তে চাইছিল না কিছুতেই। প্রস্তাবটা বিন্দাই দিয়েছিল। একটা অ্যাপক্যাব নিয়ে প্রথমেই পার্ক সার্কাসে প্রত্যাষাকে নামিয়ে তার পর সৌজিতাকে সন্তোষপুরে ছেড়ে, কৌশানীকে নামাবে বিজয়গড়ে। শেষে মিঠির বাড়ি ভবানীপুর হয়ে নিজের বাড়িতে নিজেকে গ্যারেজ করে ফেলবে। কফি হাউস থেকে বেরিয়ে কৌশানী বেঁকে বসেছিল, “তোরা যা। আমার কিছু কাজ আছে। আমি চলে যাব। তোরা যা।”

প্রত্যাষা বলেছিল, “ওটি হচ্ছে না গুরুমা। আমরা চলে যাব আর তুমি একা একা বইয়ের গন্ধ শুকবে, নেক্সট টু ইম্পসিবল। আমরাও যাব।”

মিঠি বলেছিল, “এগজ্যাক্টলি। আমাদের হাতে টাইম আছে বস।”

কৌশানী মরিয়া হয়ে স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করেছিল, “আরে, আমাদের পাড়ার এক জনের স্কুলের বই নেব আর কিছু খাতা, কেজি দরে। তোরা কাট তো। নেক্সট ডে আই উইল অ্যাটেন্ড। বিন্দা, কবে ফিরছিস যেন? আর শোন, শুধু মুখে ‘আসিস’ বললে আসব না, সলিড কার্ড-ফার্ড দিস। ও ভি হ্যান্ড টু হ্যান্ড, নট ভার্চুয়াল। হি হি হি।”

কৌশানী দেখল, ওরা স্থির চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ওদের মুখ গম্ভীর। সৌজিতা তার মাথায় একটা আলতো টোকা মেরে বলেছিল, “ওহ ডুড। খুব হয়েছে। নাউ টেল মি, কোন দিকে স্টয়ারিং ঘোরাতে হবে? ভাবিস না, আমাকেও ‘আনন্দ’ থেকে দু’-তিনটে বই

তুলতে হবে। চ'।”

কৌশানী বুঝতে পেরেছিল, এক কথায় ওরা ওকে একা রেখে যেতে চাইবে না। কী জানি মগজের ভিতরে গ্রে-ম্যাটার কী ষড়যন্ত্র শুরু করে মাঝেমাঝে! নাহ, আর নিজেকে সামলাতে পারল না সে। প্রবল চেষ্টা করতে করতে এক সময় সে প্রায় চোঁচিয়ে উঠেছিল, “আমি একটু একা থাকতে চাই। প্লিজ। এখনই বাড়ি ফিরতে চাইছি না। প্লিজ একটু একা থাকতে দে তোরা। প্লিজইজ্ঞা।”

মিঠি, প্রত্যুষা তবু মৃদু প্রতিবাদ করেছিল, কৌশানী শোনেনি। আচমকা ‘বাই বাড়ি’ বলে হন হন করে হাটা দিয়েছিল উল্টোদিকে। হরবিন্দর দৌড়ে ধরতে যাচ্ছিল, ওর হাত ধরে ফেলে দিয়ে সৌজিতা বলেছিল, “বেকার ঝামেলা করিস না বিন্দা। আমরা তো নিবুমকে আজ থেকে চিনি না। তাই না? একটু মাথা ঠাণ্ডা হলেই নিবুম ফিরে যাবে। ওকে কিছুটা সময় একা থাকতে দে ডুড। পুয়ের নিবুম! ওর ফ্যামিলিটা যেন কী রকম। এত দিনেও বদলাল না।”

কৌশানীর চোখদুটো এখন খটখটে শুকনো। গালের উপরে জল শুকিয়ে চড়চড় করছে। মা আচমকা এসে বিরাশি সিক্কার একটা চড় মারলেও অতটা তার গায়ে লাগত না। সে তো অনেক দিনের অভ্যেস। বাবাও তো সেই কবে থেকে মা’র পথের যাত্রী। কিন্তু তাই বলে তার এক মাত্র সাথের স্কুটি! নিজের বাবা হয়ে পারল? ফের কঁপিয়ে উঠতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে কৌশানী। কী করে পারলে বাপি? আমি না তোমার নিবুম? আমি না তোমার বুঝবুম? বাপি, তুমিও?

ওর বন্ধুরা এই কিসূসার সঙ্গে পরিচিত। মিঠি এক দিন থাকতে না-পেরে প্রশ্নটা করেই ফেলেছিল, “ডোন্ট মাইন্ড নিবুম! এগজ্যাক্টলি বল তো, তোর বাবা সং না মা?”

কী বলবে ভেবে উঠতে পারেনি কৌশানী। তার মতো মেয়ের এই রকম কাহিনি তো সিনেমা-সিরিয়ালের স্ক্রিপ্ট রাইটাররাও বানাতে সাহস করবে না। অথচ প্রথম প্রথম সবই ঠিক ছিল। মা’র আদর খেতে খেতে রাতে ঘুমিয়ে পড়া অথবা বাবার আঙুল চেপে ভোরের শিশির-ফেলা সকালে ছাদে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে ফুলগাছগুলোর গায়ে হাত বোলানো, ওগুলো তো আজমকালীন অভ্যেস। অথবা মাসের প্রথম রবিবারগুলোয়, অন্যান্য ছুটিছটির দিনে, নিউ মার্কেট-পার্ক স্ট্রিট এলাকায় সুসজ্জিত রেস্টুরাঁ খেতে যাওয়া, জামা-কাপড় কেনা, শীতকালে চিড়িয়াখানা, নয়তো ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম। এত জায়গা থাকতে বাপি মিউজিয়াম কেন এত ভালবাসত, কে জানে! মা অবধি বিরক্ত হয়ে যেত, “কী আছে ওখানে?”

একই প্রশ্ন করত ছোট্ট কৌশানী। বাপি চকিতে তাকে কোলে তুলে নিয়ে দরজা হাসত, “আছে রে, অনেক কিছু আছে। শুধু সামনের দিকে তাকালে হবে না মা, পিছনটাও বারে বারে ফিরে ফিরে তাকাতে হবে।”

কী যে বলে না তার বাপি! কিছুই বুঝতে পারত না কৌশানী।

“এক দিন ঠিক বুঝবি রে, মা। মানুষের অতীতটা বড্ড বেশি দামি।”

ছোটবেলা থেকেই মা আর বাপি কী করে যেন জেনে গিয়েছিল ঘন নীল রং কৌশানীর ভীষণ পছন্দের। সেই সময়, কতই বা বয়স হবে, সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছে, ঘন নীল রঙের জামা-কাপড়ে তাদের আলমারি প্রায় ভরে গিয়েছিল। তাদের তিন কামরার ঘরের একটা কামরার চারটে দেওয়ালেই বাপি এক জন শিল্পীকে দিয়ে আঁকিয়েছিল হালকা নীল রঙে। দেওয়ালগুলোর উপরে, এখনও মনে আছে কৌশানীর, নানা রঙের পাখি, নীল আকাশ, মেঘলা পাহাড় এই সব আঁকা ছিল। মা অবশ্য সামান্য গজগজ করেছিল, এতগুলো টাকা খরচা করে ফেলায়, তবে কৌশানী তার ছোট্ট ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে মা’র গলা জড়িয়ে ধরতেই মা’র সব রাগ গলে জল হয়ে গিয়েছিল। এখন সেই সব দেওয়াল বিবর্ণ। বোনের করা হিজিবিজি আর আঁকিবুকিতে মুখ লুকিয়েছে সব পাহাড়, নদী, আকাশ আর পাখিগুলো। দেওয়ালের যে সব জায়গায় বোনের হাত পৌঁছায়নি, সেই সব জায়গাগুলোও ঢেকে গেছে বোনের স্কুলের রুটিনে। তাও যেটুকু অবশিষ্ট, তার উপরে ঝোলানো দড়িতে বাপি, মা’র আর বোনের শাড়ি, শেমিজ আর পাজামা শোভা পায়।

ছোটবেলা থেকেই কৌশানী কথা বলত কম। এক মাত্র বাপি-মা-ই বুঝতে পারত তার কোন জিনিসটা কখন লাগবে। কম কথার জন্য তার বাপিই তার ডাকনাম রেখেছিল নিবুম। মনে আছে, ছোটবেলায় হয়তো কোনও নিস্তরূ দপুয়ে, মা ঘুমিয়ে পড়লে, কৌশানী ঘন্টার পর ঘন্টা দেওয়ালের ওই সব আঁকাগুলোর উপরে হাত বুলিয়ে চলত, হয়তো নিজের অজান্তেই নিজের একটা জগৎ তৈরি করে ফেলেছিল সে। সেই জগতে সে ছিল ভারী খুশি।

এই ভাবে সব কিছুই ঠিকঠাক চলছিল, যত দিন না মা হাসপাতালে চলে গেল এক দিন। ফিরে এল একটা ছোট্ট পুতুল নিয়ে। মোম। কৌশানীর এক মাত্র ও বড় আদরের বোন মোম। কিন্তু তার পরেই সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। তবুও নিজের জগতে মশগুল ছিল কৌশানী। মনে আছে তার সেই মোমপুতুল বোনটা হাটতে শিখেই বাপির কানে দেওয়া রং-পেনসিল মকশো করতে শুরু করেছিল তার সেই জগতের উপরেই। কৌশানী স্কুল থেকে ফিরে, সেই দৃশ্য দেখে, রাগে-দুঃখে এক দৌড়ে গিয়েছিল মা’র কাছে। মা’র কাছে বকা খেয়ে দারুণ অভিমানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বাপির বুকে। বাপি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিল, “তাতে কী হয়েছে? ছোট্ট বোন তো। তুই না দিদি?”

“কিন্তু আরও তো দুটো ঘর রয়েছে, বাপি।”

বাপি কিছু বলার আগেই মা ঝাঁঝিয়ে উঠেছিল, “অনেক দিন তো খেলে-খুলে গেল। এ বার মন দিয়ে পড় দেখি। ক্লাস-টিচারের কাছ থেকে কমপ্লেন এলে কিন্তু পিঠের ছাল ছাড়িয়ে নেবা।”

কিছু ক্ষণের জন্য কৌশানীর মুখে কথা আটকে গিয়েছিল। ক্লাস টিচারের কাছ থেকে কমপ্লেন! কৌশানী দারুণ কিছু ফলাফল না-করলেও, মোটের উপরে ছাত্রী সে ভাল। মনোযোগী আর ভীষণ বাধ্য ছাত্রী হিসেবে তার সুনাম আছে স্কুলে। কিন্তু...

“এক্সকিউজ মি। বসলাম।”

এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সত্যিই যেন নিবুম হয়ে গিয়েছিল কৌশানী। চার দিকের মৃদু কোলাহল, গুমোট বাতাস, আচমকা আচমকা হানা দেওয়া বাতাসে উড়ে যাওয়া প্লাস্টিকের প্যাকেট, বরা পাতা... কিছুই তাকে ছুঁতে পারছিল না। আচমকা কানের পাশে একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর শুনে সে চমকে ফিরে তাকাল।

এক জন ভদ্রমহিলা। দেখে মনে হল বয়স তিরিশের উপরে নয়। এই গরমেও বেশ সাজগোজ করেছেন, মাথার চুলে একটি ফুলও গোঁজা আছে। কী ফুল? কাঠ-গোলাপ? নাকি চাঁপা?

কৌশানী একটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ছিল। সে মহিলার মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু বুঝতে পারল না। ভদ্রমহিলা কি তাকেই বললেন? তার ভাবনার স্রোত ফুরিয়ে আসার আগেই সে দেখতে পেল মহিলা মিষ্টি করে হাসছেন। মহিলার বাঁ গালে একটা টোল পড়ল। এ রকম টোল কোথায় দেখেছে কৌশানী?

“আমাকে আপনি চিনবেন না।”

কৌশানী এ বার নিজস্ব ভাবনার স্তর ভেঙে উঠে এসে ভাল করে তাকিয়ে দেখল, নাহ, ভদ্রমহিলা খুব অপরিচিত নন। শুধু টোল নয়, পুরো মানুষটাকেই কোথায় যেন দেখেছে সে। বিশেষ করে কপালের মাঝে একটা বড় টিপের উপরে আর-একটা ছোট টিপের অদ্ভুত অবস্থান বেশ আনকমন। হয়তো এর জন্যই ভিড়ের মধ্যে ঐকে আলাদা করে রাখা যাবে। কিন্তু কোথায়? অথচ সে দেখেছে। আজকেই।

“নমস্কার। আমি কিন্তু সেলস গার্ল নই। হি হি হি।”

এর পরেই বেশ বার্নার মতো হেসে ফেললেন মহিলা। গলায় ততটাই আত্মীয়তার সুর, যতটা এক জন পূর্ব-পরিচিতের প্রতি দেখানো উচিত। কৌশানী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। তার গ্রে-ম্যাটার যথেষ্ট শক্তিশালী। ক্লাস সিলেই মোমের জন্য দু’জন মাস্টার নিযুক্ত করা হলেও উচ্চ মাধ্যমিকেও কৌশানীর জন্য কোনও শিক্ষক রাখা হয়নি। হয়নি অ্যাকাউন্টসিতে অনার্স নিয়ে পড়তে গিয়েও। এম কন্মের গণ্ডিটাও সে পেরিয়ে গিয়েছিল নিজের জোরেই। ফলাফল মন্দ হয়নি। মাথায় সামান্যজোর দিতেই তার মনে পড়ে গেল। ওরা যখন কফি হাউসে

চিকেন কাটলেট খাচ্ছিল, তখন এই মহিলাই বিন্দা আর সৌজিতার পিছনে বসেছিল। উল্টো দিকে কৌশানীর পাশে মিঠি। ওদের ডান দিকে এক্সট্রা চেয়ার টেনে এনে বসেছিল প্রত্যাষা। বিন্দা তখন নিজের বিয়ের প্রিপারেশন আর তার হবু বোয়ের সুখ্যাতিতে গদগদ হচ্ছিল, মিঠিই কাঁধের গুঁতো দিয়ে কৌশানীর নজর টেনেছিল এই মহিলার দিকে। এখন যত দূর সম্ভব মনে পড়ছে এর পরে মহিলা বারদুয়েক উঠে কৌশানীদের টেবিলের পাশ দিয়ে চলে যান এবং ফিরে আসেন। কয়েক বার ওদের সঙ্গে চোখাচোখিও হয়। ভদ্রমহিলা একাই ছিলেন।

“আপনাকে আমি তখন দেখেছি। কফি হাউসের তিন তলায়,” কৌশানী বলল।

“রাইট। গুড অবজারভেশন। ভুল ভাববেন না। আমি মেয়েধরা নই বা অন্য কোনও বদ মতলব নিয়ে এখানে বসিনি।”

মহিলা ফের বার্নার মতো হেসে ফেললেন। কৌশানীর হাসি পেল না। এইখানে এসে মাথা নিচু করে বসেছিল আর কখন যেন নিজের অজান্তে তার চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা উষ্ণ জল ঝরে পড়েছিল চশমার কাচে। তার ফলে চশমায় দাগ ধরেছে। কৌশানী চশমা খুলে নিজের ওড়নায় ভাল করে মুছে চশমার ভিতর দিয়ে মহিলাটিকে ভাল করে দেখল। প্রত্যাষা থাকলে নির্যাত বলত, ‘স্টিল নাউ এক্স ফ্যাক্টর ওয়ার্কিং!’ মহিলার চোখের ভাষা, শাড়ি পরার স্টাইল, ড্রেস-সেপ, চুলের খোঁপা... সব কিছুতেই সেই এক্স ফ্যাক্টর বাস্তবিক প্রতিফলিত হচ্ছে। কৌশানী পুরুষ হলে তবুও একটা মানে দাঁড়াত। কিন্তু এই কাঠফাটা রোদের নীচে মহিলা তার কাছে কেন? কোনও রেস্টরাঁয় কেউ কাউকে এক বার দেখেই বন্ধুত্ব বা আলাপ জমাতে এত দূর চলে আসে নাকি? তাকে পেলেনই বা কী ভাবে? মহিলা কি তাকে অনুসরণ করছিলেন নাকি?

কৌশানী এ বার চঞ্চল হল। সে থাকতে না-পেরে বলল, “বুঝলাম। কিন্তু মাফ করবেন, আমার কাছে কেন, সেটা বুঝিনি।”

এই কথার উত্তরে ভদ্রমহিলা নিজের কাঁধের ব্যাগটা কোলের উপরে জমিয়ে রেখে বললেন, “স্বাভাবিক। সেই জন্যই তো প্রথমে সেক্স ডিক্লারেশন দিয়েছি, আমাকে আপনি চিনবেন না। আচ্ছা, আমার নাম প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাপারমিতা। আপনার নাম? ধ্যান্তেরি, আর পারছি না। তুমি করে বলি?”

কৌশানী নিশ্চুপ। নীরবতা সম্মতির লক্ষণ বিবেচনা করেই হয়তো প্রজ্ঞা বললেন, “তোমার নামটা কী ভাই?”

কৌশানী বলল। প্রজ্ঞা বললেন, “নাইস প্লেস।”

“হ্যাঁ। এই জায়গাটা আমার বরাবরের ভীষণ প্রিয়।”

“ওহ নো। কৌশানী নামের মানে হল একটি চমৎকার জায়গা। জানতে না?”

চমৎকৃত হল কৌশানী নিজেই। তার এই নাম রেখেছিলেন জেঠামশাই। কী ভেবে রেখেছিলেন, সে জানে না। বোনের নামের মানে না-জানলেও, উৎসটা জানে। তার জেঠামশাই ভারী পড়ুয়া মানুষ। বংশের নেস্ট জেনারেশনের সব বাচ্চা-কাচ্চার নামকরণ তিনিই করেন। উইলিয়াম সমারসেট মম-এর নামে বোনের ডাকনাম রেখেছিলেন মম। সেই নাম মুখে মুখে ঘুরতে ঘুরতে মোম। কৌশানী খানিকটা সহজ হল, “আচ্ছা? জানতাম না। থ্যাঙ্কস।”

মহিলা এক বার নিজের হাতে ধরা মোবাইলটা ঘুরিয়ে দেখে বললেন, “এ বার আমাকে উঠতে হয়। নইলে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যাবে। ও দিকে অনেক কাজ পড়ে আছে। যাক, এ বার আসল কথায় আসি। আমাকে প্রজ্ঞাদি বলে ডাকলে আমি খুশি হব ভাই।”

আবারও কৌশানীর অবাক হওয়ার পালা। এক জন সুন্দরী মহিলা, তার পিছু ধাওয়া করতে করতে এতটা দূর এসেছেন। তাও সে এসে বসার সঙ্গে সঙ্গে আলাপ জমাতে চলে আসেননি। হয়তো দূর থেকে কৌশানীকে স্বাভাবিক হওয়ার মতো সময় দিয়েছেন। তার পর এসে বসেছেন। আর বসার প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই উঠে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন? কেসটা কী? আর মাত্র এক মিনিটের আলাপে ‘প্রজ্ঞাদি’ সম্বোধনের আত্মীয়তায় চলে যাওয়ার কোনও কারণ খুঁজে পেল না কৌশানী। সে এ বার নিজের কব্জির দিকে তাকাল। তাকেও বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু

আরও একটু নিজের সঙ্গে সময় কাটিয়ে। এই নিজস্ব সময়টুকুর জন্যই সে মিঠি-সৌজিতার কাছ থেকে পালিয়ে এসেছে। আসলে বাড়ি ফেরার মতো কোনও তাগিদও সে অনুভব করছে না। করেও না দীর্ঘ দিন যাবৎ। সে বাড়ি ফেরে দীর্ঘ কালের অভ্যেসজনিত কারণে অথবা বাইরে রাত কাটানোর মতো দ্বিতীয় আশ্রয় নেই বলে।

ভদ্রমহিলার হাতে ধরা মোবাইলটা শেষ বিকেলের রোদের আলোয় এক বার চক চক করে উঠল। কৌশানী তাকিয়ে দেখল মোবাইলটাকে। যথেষ্ট দামি বলেই মনে হচ্ছে। মোবাইলটা দেখে তার মন আরও ভারী হয়ে এল। নিজের টিউশনের টাকায় এমনিতেই সে বাড়ির ইলেকট্রিক বিল, চাল-তেল কিনে দিয়ে থাকে। কৌশানীর নিজস্ব বিলাসিতা নেই। সেই নীল রং তার জীবন থেকে হারিয়েছে কবেই। তাও সম্পূর্ণ অজানা কারণে। একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে এখন। বছর দুয়েক আগের কথা। নিজের টাকায় সে কিনে এনেছিল একটা মোবাইল। তারও রং ছিল নীল। বাড়িতে বড় শখ করে দেখিয়েছিল বাপি-মাকে। তার পরই বিনা মেঘে বজ্রপাত। বাপির সে কী খেপচুরিয়াস মূর্তি! অত বড় মেয়ের গায়ে হাত তুলতে বাপির বাধেনি। সঙ্গে হাত লাগিয়েছিল মা-ও। কেন? কৌশানী মোবাইলটা কিনেছিল বাড়িতে কাউকে না জানিয়ে। এত বড় স্পর্ধা সহ্য হয়নি ওর বাপির। সে দিন অত বড় মেয়ের প্রায় তলপেটে আঘাত করতেও বাপির হাত কাঁপেনি। ঘটনাটা আরও মারাত্মক হয়, যখন বোনও হাত চালিয়ে দেয় দিদির গালে। এত দূর! বাপি-মা কিছুই বলেনি সে দিন। এও কী সম্ভব! কৌশানী এক দৌড়ে গিয়ে মোবাইলটা ছুড়ে ফেলেছিল বাড়ির কাছের পুকুরটায়। জলে ডেউ তুলে সাধের মোবাইল তলিয়ে গিয়েছিল তক্ষুনি। মনের ঘা-টা আজও তলায়নি। অনেক পরে আর-একটা মোবাইল কিনেছিল সে। তারও গল্প আছে।

“চাকরি করবে ভাই?”

“মানে?” আক্ষরিক অর্থে অবাক হয় কৌশানী। সে ভুরু কুঁচকে তাকায়। এই ভাবে চাকরির অফার দেয় নাকি কেউ?

“জানি এই ভাবে দুম করে অফার দেওয়াটা তোমার কাছে অড লাগছে। আসলে আমি একটা অপরাধ করে ফেলেছি। অপরাধ যখন করেছে, তখন স্বীকার করেই ফেলি। তোমাদের কথাবার্তা কিছুটা হলেও আমার কানে এসেছে। হয়তো দোতলায় হলে সম্মিলিত ঢেঁচামেচিতে কিছুই কানে আসত না। হাউএভার, সাইলেন্ট থাকলেই যে পাশের টেবিলের কথা কান পেতে শুনতে হবে, এমনটাও ঠিক নয়। আসলে তোমার কান্নাটাই আমাকে অ্যাট্রাক্ট করে। কফি হাউসে এসে হাউ হাউ করে কাঁদতে আমি কাউকে দেখিনি... বাদ দাও। যেটুকু কানে এসেছে, তাতে এটা বুঝতে পেরেছি, তোমার ফ্যামিলিতে কিছু-একটা প্রবলেম চলছে। সেটাও আমার ভাবার বিষয় নয়। তবে তোমার একটা চাকরির খুব দরকার, সেটা যে কারণেই হোক, বুঝতে পেরেছি। আমি জানতে চাই না, কেন। হয়তো ফিনানশিয়াল বা সাম আদার রিজুন। মে বি আয়াম রং। বাট আমি কি খুব-একটা ভুল বললাম, কৌশানী?”

কৌশানী ঠিক কী বলবে এই মুহূর্তে একদম ভেবে পেল না। এম কম পাশ করে, বিশেষ করে এত ভাল মার্কস পেয়ে, খুব আশা ছিল একটা ভদ্র গোছের চাকরি পাওয়াটা তেমন সমস্যা হবে না। ইতিমধ্যে দুটো সরকারি চাকরির পরীক্ষা সে দিয়েছে। সুফল ফেলেনি। অবস্থা বুঝে কাগজে খুঁজে-খুঁজে প্রাইভেট সেক্টরগুলোয় বেছে বেছে দরখাস্ত পাঠিয়েছে। যারা ই-মেলে দরখাস্ত চেয়েছে, পাশের বাড়ির সম্ভ্রদাকে ধরে, বাড়ির কাছাকাছি একটা নেট-পাবে নিয়ে গিয়ে, পাঠিয়ে দিয়েছে তাও। কৌশানীর নিজস্ব ই-মেইল ঠিকানা নেই, বানাব বানাব করেও হয়ে ওঠেনি। মিঠি কত দিন বলেছিল, “আমার বাড়িতে চলে আয়, আমি বানিয়ে দিচ্ছি।” যাচ্ছি, যাব করেও হয়ে ওঠেনি। তাই সম্ভ্রদাকে ধরা। সম্ভ্রদার নাকি চব্বিশ ঘণ্টা নেট অন থাকে। সে আশ্বাস দিয়েছে, “চিন্তা করিস না, কোনও একটার রিপ্লাই এলেই আমি তোকে জানিয়ে দেব।”

তো গত মাস অবধি খান পাঁচেক ডাকও সে পেয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে তার সব ক্রেডেনশিয়াল বগলে চেপে হাজির হয়ে কোনওটারই অফিস দেখে মনঃপূত হয়নি। একটি অফিস তো পুরো খাঁ-খাঁ করছে। শুধু এক জন দারোয়ান গোছের লোক বসে ঢুলছিল। কোথাও গিয়ে

দেখেছে ঝাঁ চকচকে বিজ্ঞাপনের আড়ালে আদতে সেলস গার্লের চাকরি, বাড়ি বাড়ি ঘুরে। কোথাও আবার যে-মানুষটা সাক্ষাৎকার নিয়েছে, তার কথায় মনে ঘোরতর সন্দেহ বাসা বেঁধেছে। তবুও ভাল স্যালারি দেবে দেখে, মাস চারেক আগে, জোর-জবরদস্তি একটা চাকরিতে নিজেকে জুতে দিয়েও লাভ হয়নি। দু'মাস চাকরি করে এক মাসের টাকা হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাকি স্টাফরা বলেছিল, এখানে এমনটাই নিয়ম। কেন? যাতে কেউ দুম করে চাকরি ছেড়ে চলে যেতে না-পারে। অদ্ভুত! তবুও সে চালিয়ে যেত, কিন্তু অনতিবিলম্বে কানে এসেছিল, পরে এই ডিউ পিরিয়ড আরও বাড়বে। কোনও কোনও পুরনো স্টাফের নাকি চার-পাঁচ মাসের স্যালারি বাকি। আরও একটা মুশকিলের সে সম্মুখীন হয়েছে। কে যেন বলেছিল, আজকাল মিনিমাম কম্পিউটার নলেজ না-থাকলে চাকরি-বাকরির তেমন সুবিধে হয় না। তাই কম্পিউটারের একটা কোর্সে সে ভর্তি হয়েছিল বছরখানেক আগে, বাড়ি ও বন্ধুদের অন্ধকারে রেখেই। বেসিক কোর্স। নিজের টিউশনের বেশ খানিকটা খরচা করে ছ'মাস ধরে যা শিখল, মিঠি পরে সবটা শুনে বলেছিল, “ধ্যাত, কতগুলো টাকা ফালতু খরচা করেছিস। আজকাল বেসিক মানে ওই ওয়ার্ড, এক্সেল শিখিয়েছে তো? ও সব কিস্যু কামের না। একটা ভাল দেখে কোর্স কর।। কোর্সের মধ্যে প্রোগ্রামিং ল্যান্ডুয়েজ আছে কি না দেখ। তবে সবার আগে প্রপার এডুকেশন পেতে হলে একটা প্রপার ইনস্টিটিউশন লাগে। তুই হেল্প চাইলে আমি করতে পারি। আমার চেনাজানা ভাল ইনস্টিটিউশন আছে। সাকসেসফুলি কোর্স কমপ্লিট করলে তারাই প্লেসমেন্ট করিয়ে দেয়। তুই রাজি থাকলে আমায় জানা, আই উইল লুক আফটার।”

এমনটাই আশ্বাস দিয়েছিল মিঠি। ফোন ছাড়ার আগে তুলেছিল ফের সেই পুরনো প্রসঙ্গ, “নিঝুম রে, আজ যদি তুই স্পোর্টসে লেগে থাকতিস, তোর সরকারি চাকরি আটকাত কে?”

সেই ‘ভাল দেখে একটা’ কোর্স করছি-করব করে এত দিনেও করে উঠতে পারেনি কৌশানী। তার প্রধান কারণ আলস্য নয়, টাকা। একটা টেক-স্যাভি চাকরি জোগাতে হলে মোটামুটি যে কোর্সটার হন্স তাকে দিয়েছিল মিঠি, তার কোর্স-ফি শুনেই তার আক্কেল গুঁড়ুম। তার বাপি চাকরি করে একটা পেট্রল পাম্পে। মোটামুটি যা পায়, তাতে মধ্যবিত্তের সংসার চলে না। বাড়িটা পৈতৃক হলেও না হয় কথা ছিল। তার উপরে মোমের পড়াশোনা চালানোর হাতির খরচ তো আছেই। তাই কৌশানীকে হাল ধরতে হয়েছিল। প্রথমে ইলেকট্রিকের বিল, তার পর বাড়ি ভাড়ার অর্ধেকটা, তার পর সারা মাসের চালের খরচ.... এই করতে করতে তার টিউশনের প্রায় সব টাকা শেষ হয়ে যায়। এত সব খরচ-খরচা সামলে প্রতি মাসে কোর্সের পিছনে এতগুলো করে টাকা ঢালা তার পোষাবে না। প্রত্যুভা অবশ্য বলেছিল, এই সামান্য টাকাটা সে অনায়াসেই দিতে পারবে। সে কথা জানে কৌশানীও। প্রত্যুভার বিদেশি লিপস্টিক আর বাকি মেক-আপের সরঞ্জাম কিনতে এর চেয়ে বেশিই বেরিয়ে যায়। কিন্তু তার আত্মসম্মানে লেগেছিল। “বেশি সেন্টু খাস না, নিঝুম। চাকরি পেলে দিয়ে দিস, ইটস সো সিম্পল,” বলেছিল প্রত্যুভা।

কৌশানী বলেছিল, “সে তো অবশ্যই, দাঁড়া আগে নিজে চেষ্টা করে দেখি, না পারলে...”

“বাকবাহ, আরে, আমি তোমাকে ওঠ বলতে ওশিয়ানিয়া যেতে বলছি না, এত চিন্তা করছ কেন?”

“মানে, হ্যাঁ, সে ঠিক আছে কিন্তু আমি ঠিক... এখনও...”

“আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না। রাইট? তা হলে খুলে বলি।”

প্রজ্ঞার মুখের উপরে একটা মাছি এসে বসেছিল, সেটাকে তাড়িয়ে দিয়ে বললেন, “পিয়ালি আইল্যান্ড চেনো? পিয়ালি আইল্যান্ডে আমার একটা টুরিস্ট লজ আছে। আমার আদি বাড়ি শ্যামবাজার। পিয়ালি আইল্যান্ডে আমার লজ থেকে কিছুটা দূরে আমার আর-একটা বাড়ি আছে। আমি সেখানেও থাকি। ব্যবসা বলে কথা!”

প্রজ্ঞা কিছু ক্ষণ কৌশানীর মুখের ভাব খেয়াল করে বললেন, “ভাল কথা, পিয়ালি আইল্যান্ড জায়গাটা চেনো তো?”

পিয়ালি আইল্যান্ডের নামটাই শুধু কৌশানী শুনেছে। স্বীকার

করতেই প্রজ্ঞা বললেন, “সে কী! আজকালকার বাঙালিদের তো ওটা হটস্পট। স্পেশালি ইয়াংদের। যাক গে। সেখানে আমার একটা লজ আছে আগেই বললাম। এনি ওয়ে, তোমার এডুকেশনের স্ট্রিম কী?”

“আমি কমার্সের ছাত্রী। মাস্টার্স করছি।”

“কমার্স? এম কম। ইজ ইট? ভেরি গুড। প্রিভিয়াস ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স আছে?”

“নাহ।”

“ওহ!”

ভদ্রমহিলা সামান্য দমে গেলেন বলে মনে হল। থুতনিতে হাত দিয়ে সামান্য ভাবলেন। কিছু ক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন সামনের জলাশয়ের দিকে। তার পর বললেন, “পার্সেন্টেজ?”

কৌশানী বলল। এ বার মহিলা পিঠ সোজা করে বসলেন, “ইজ ইট? আমি কাজ বুঝিয়ে দেব আর অ্যাকাউন্টসের ব্যাপারটা তো তুমি সামলে নেবেই, আমি জানি।”

মহিলা এক বার ভাল করে কৌশানীকে দেখলেন। তার পর ব্যাগ থেকে জলের বোতল বের করে একটু জল খেয়ে বললেন, “এ বার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। আসলে আমার লজের অ্যাকাউন্টসের জন্য এক জন অ্যাকাউন্টেন্ট দরকার। আগে যে মেয়েটি কাজ করত, তার বিয়ে হয়ে গেল। বেসিক্যালি আমি কলকাতা এসেছিলাম এই কারণেই। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখেছি। যত রাজ্যের ফালতু ফোন চলে আসে। ইন্টারভিউ দিতে আসব বলেও আসে না। যারা আসে, তাদের মধ্যেও সত্যি সত্যি কাজের মানুষ খুঁজে পাইনি। কেউ কেউ এমন মাইনে হাঁকে, আমার পক্ষে পসিবল নয়। আসলে আমার লজটা খুব-একটা পুরনো নয়। বছর খানেক হল। তবে ধীরে ধীরে ব্যবসা জমে যাবে। আজ টেমার লেনে একটা এমপ্লয়মেন্ট এজেন্সিতে এসেছিলাম। যা দেখলাম...মানে আমি বেসিক্যালি ফিমেল ক্যান্ডিডেট খুঁজছি... পছন্দ হল না। লজ শুনে সব সুন্দরী মেয়েদের দেখাচ্ছে। আরে বাবা! চাকরি আমার লজে নয়। চাকরি আমার বাড়িতে। ব্যবসার হিসেবপত্র দেখার। বাদ দাও, তুমি নিশ্চয়ই কম্পিউটার জানো?”

“ওই সামান্যই, বেসিক কোর্স করা আছে একটা।”

ভদ্রমহিলার মুখ সামান্য উজ্জ্বল হল, “বাস বাস, তাতেই হবে। তা ছাড়া আমার কাজ এমন কিছু হাতিঘোড়া নয়। বি কম পাস হলেও আমার চলে যেত। তোমার ডিগ্রির চাইতেও তোমার অ্যাপিয়ারেন্স দেখে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। মনে হচ্ছে তুমি বুদ্ধিমতী। তুমি পারবে। আমার সিক্সথ সেন্স একটু বেশিই কাজ করে।”

ভদ্রমহিলার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কৌশানী শুনছিল। সে তো চাকরি পেলে বেঁচে যায়। বিশেষ করে বাড়ি থেকে পালাতে পারলে তো আরও শান্তি। কিন্তু চিনি না জানি না এমন মানুষের সঙ্গে এই ভাবে.. নাহ! মন সায় দিচ্ছে না।

কৌশানীকে চুপ করে থাকতে দেখে ঠিক এর পরেই ভদ্রমহিলা যে-কথাটা বললেন, কৌশানীর মনে হল ভদ্রমহিলা বোধ হয় থট রিডিং জানেন, “আমি বুঝতে পারছি, এই ভাবে হট করে চাকরির অফার কেউ করে না। তোমার হয়তো পুরো ব্যাপারটা অদ্ভুত লাগছে। হয়তো পরে এটা নিয়ে ভাবতে বসে তোমার এটাও মনে হবে যে, আমার কোনও বদ মতলব রয়েছে। দিনকাল ভাল নয়। বিশেষ করে তুমি মেয়ে। আমিও মেয়ে। তাই আমি বুঝতে পারছি। বেসিক্যালি এক জন অজানা-অচেনা মেয়েকে এই ভাবে দুম করে চাকরি অফার করাটা আমার নিজের কাছেই অদ্ভুত লাগছে। কিন্তু কেন যে তোমাকে দেখে...”

ভদ্রমহিলা ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে আলতো করে চোখের নীচে জমে ওঠা ঘাম মুছে বললেন, “আসলে আমার কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়। তুমি তো বেসিক কোর্স জানোই। ওতেই হবে। কারণ আমার মূলত কাজ বলতে কম্পিউটারে লজের হিসেবপত্র রাখা। ওটা এক্সেলেই হয়ে যাবে। ইচ্ছে আছে খুব তাড়াতাড়ি একটা সফটওয়্যার ইন্সটল করার। কিন্তু তার আগে সব কিছু গুছিয়ে নিতে চাইছি। আর কিছু চিঠিপত্র আছে, কিছু ই-মেলের জবাব দিতে হবে আর চিঠিপত্রের হিসেব রাখতে হবে। মাসের শেষে জিএসটি সাবমিট, বছরের শেষে ফাইনাল অ্যাকাউন্টস...”

“আমি সব জানি। শুধু ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স নেই বলে...”

মহিলা ব্যাগের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে একটা সাদা কার্ড বের করে আনলেন, তার পর মৃদু হেসে বললেন, “সে তো জানবেই। এটা আমার কার্ড। ধরো। আমার নাম, লজের নাম, ঠিকানা, আমার নাম্বার... সব দেওয়া আছে। পিছন দিকে রুট ডিরেকশন। এখন বাড়ি যাও। সবাইকে জানাও। তারা রাজি থাকলে চলে এসো। না রাজি থাকলে আমায় জানিয়ে দিয়ো। চাইলে বাড়ির লোকজনদেরও নিয়ে চলে আসতে পারো। চাইলে সেই রাতটা থেকে, তার পরের দিন তাঁরা ব্যাক করবেন। তুমিও সব দেখে শুনে নাও। যদি সূটেবল মনে হয়, তা হলে ওয়েলকাম।”

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন, “এ বার আমি আসি? তুমি এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলছিলে না? আমার অফিসে প্র্যাক্টিক্যাল ওয়ার্ক করো, অটোমেটিক্যালি এক্সপেরিয়েন্সড হয়ে যাবে। তার পর বেটার চান্স পেলে... তাই না?”

এত ক্ষণে কৌশানীর মনে হল সে অনেকটা সহজ বোধ করছে। কান্না আর মন খারাপটা রাস্তা হারিয়েছে। সে বলল, “একটা কথা জিজ্ঞেস করব ম্যাডাম?”

ভদ্রমহিলা যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন, “হ্যাঁ। শিয়োর।”

“আমি যা বুঝলাম, কাজ তেমন ভারী কিছু নয়। সেটা তো আপনি নিজেও হয়তো করতে পারেন। শুধু ইয়ারলি অডিট করিয়ে নিলেই...”

প্রজ্ঞাপারমিতা এ বার শব্দ করে হেসে উঠলেন, “আরে, আমার অ্যাকাউন্টস দেখার সময় কোথায়? আমি লজ সামলাব না অ্যাকাউন্টস দেখব? বিসাইডস, ওই সব ঘাড় গুঁজে কাজ আমার পোষায় না, বিশ্বাস করো। তা ছাড়া ব্যবসাতাকে তো বাড়াতে হবে। আমি বেশির ভাগ সময় পিয়ালি আইল্যান্ডের বাইরেই থাকি। তার পর কাঁচা মাছ, মাংস, রোজকার আনাজ... আমার ম্যানেজার অবশ্য আছে, কিন্তু সবটা স্টাফের হাতে ছেড়ে দেওয়া তো ঠিক নয়। এক জন রেগুলার অ্যাকাউন্টেন্ট আমার পাশে না-থাকলে বছরের শেষে হয়তো দেখব, লাভের গুড় সাবড়ে দিয়েছে কেউ না-কেউ। বুঝলে না? বড় বড় পিঁপড়ে।”

কৌশানীর মাথায় শেষ চার মিনিট ধরে যে ভাবনাটা ভিড় করে আসছিল, ভদ্রমহিলা এ বার সেটার খেঁই ধরে ফেললেন, “আর সাল্যারির ব্যাপারটা তো তুমি আসতে রাজি হলে তার পরই ডিসাইড করা যাবে। তাই না? ফুড অ্যান্ড লজিং নিয়ে তোমার চিন্তা নেই। আজ তো তিন তারিখ, বুধবার। আমি শুক্রবার রাত অবধি তোমার ফোনের জন্য ওয়েট করব। তার পর... বুঝতে পেরেছ? বাই।”

ক্লাস এইটে সে পেয়েছিল সুমিতাদিকে। বাংলা পড়াতেন। বড় ভাল মানুষ সুমিতাদি। পরের বছর রিটার্নার করে যান। সেই সুমিতাদি বলতেন, “একটা কথা তোমরা জেনে রাখো, সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। সুবর্ণ সুযোগ সবার জীবনে আসে। তবে দু'বার বা বড়জোর তিন বার। তাকে লুফে নেওয়াটাই বড় ব্যাপার। যারা পারে, তারা অনেকটা উঁচুতে চলে যায়। সে রকম সুযোগের প্রত্যাশায় থাকবে।”

ভদ্রমহিলার অপসূরমাণ চেহারাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কৌশানীর মনে হল, এই অযাচিত সুযোগের কথাই কি বলেছিলেন সুমিতাদি? এই মুহুর্তে তাঁর মুখটা মনে এল কৌশানীর। তাঁর সঙ্গে এক বার দেখা করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তিনি কোথায় এখন? শেষ শুনেছিল, মেয়ের কাছে, জামাইকায় চলে গেছেন। কিন্তু এখানে কৌশানীর নিজের বন্ধুরা তো আছে। কৌশানী ঠিক করল, আজ এক বার সন্দের পর প্রত্যাচার বাড়িতে যাওয়া দরকার। ওর বাড়িতে বসেই বাকিদের সঙ্গে এক বার কথা বলে নেবে। এমন দোলাচলের সময় তার প্রাণের বন্ধুরাই ঠিক পরামর্শ দিতে পারবে। সবচাইতে ভাল হত বাড়িতে কথা বলতে পারলে। কিন্তু...

ফের মন খারাপে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল কৌশানী।

কিন্তু একেবারে প্রত্যাচার বাড়ি হয়ে নিজের বাড়ি ফিরলে ভাল হত। আসলে সারা দিনের ঘামে প্যাচপেচে হয়ে যাওয়া সালোয়ারটা আর গায়ে রাখতে ইচ্ছে করছিল না কৌশানীর। ইচ্ছে ছিল বাড়ি ফিরে, গা ধুয়ে, তার পর ফ্রেশ সালোয়ার গলিয়ে পার্ক সার্কাস রওনা হয়ে যাবে।

স্কুটিটা থাকলে চিন্তা ছিল না। কিন্তু বাড়ি ফিরে আর বেরোনো হল না কৌশানীর। মোম তৈরিই ছিল খড়গ হাতে নিয়ে। সে ঘরে ঢুকতেই তুলকালাম কাণ্ড।

“তুই জানিস না আমি টিউশন যাব? আমার সালোয়ারটা পরে চলে গেছিস? মুর্থ নাকি?”

কৌশানী থমকে গেলেও বলল, “এটা তোর সালোয়ার?”

“তুই আজকাল কোন জগতে থাকিস? প্রেম-ট্রেম করলে বল, বাপিকে বলে...”

ইচ্ছে করছিল ঠাটিয়ে একটা চড় মারে বোনের গালে। নিজেকে সংযত করে সে বলল, “বাজে কথা বলিস না মোম। এটা আমার সালোয়ার। এটা লার্জ। তোর হবে? তোর তো ট্রিপল এক্সেল লাগে।”

এতে যেন আরও জ্বলে উঠল মোম। সে হয়তো ভাবল তার পৃথুলা চেহারা নিয়ে দিদি ঠাটা করছে। সে জ্বলে উঠে কিছু একটা বলতে গিয়ে কথা খুঁজে না-পেয়ে কেঁদে ফেলল, “তাতে তোর কী? আমি কি তোর পয়সায় মোটা হয়েছি?”

“সে কথা কখন বললাম? বললাম, এই সালোয়ারটা তোর গায়ে হবে না। ফালতু ঝামেলা করছিস কেন?”

“এই আকাশি নীল কটা আছে এই বাড়িতে? কটা নিজের পয়সায় কিনেছিস? তুই... তুই...”

মা'র প্রবেশ।

“কী হয়েছে? আবার বোনটাকে কাঁদাচ্ছিস নিবুম? তোর কি বাড়ি ফেরা মানে ঝামেলা করা?”

সব শুনে মা'র মুখটা শুকিয়ে গেল। তিনি আমতা আমতা করে বললেন, “মোম রে, আসলে তোরটা তো দামি, তাই নষ্ট হয়ে যাবে ভেবে ধুয়ে তুলে রেখেছি। সামনেই তো একটা বিয়ে আসতে চলেছে। আমাকে বললেই পারতিস। আমি...”

মোম একটা স্ল্যাং উচ্চারণ করে মেঝেয় দুম দুম শব্দ তুলে চলে গেল। ইস। লজ্জায় মাথা কাটা গেল কৌশানীর। বোনটা দিনে দিনে অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। কৌশানীর মা'রও অজানা নয় শব্দটা। তিনি হয়তো পাশ কাটাতেই বেছে নিলেন কৌশানীকে, “আর তোকেও বলি, নিবুম, ভবঘুরের মতো রাস্তায় রাস্তায় না-ঘুরে আরও দুটো টিউশন করলেই তো পারিস। তা করবি কেন? বাপের তা হলে সাস্রয় হয় তো, মা'র হাড়ে বাতাস লাগে তো...”

আরও কত কী বলে যাচ্ছিল মা। নিবুম চূপ করে বসেছিল খাটের উপরে। তার পর মা বেরিয়ে গেলে সে ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়াল। দিনে দিনে এই বাড়িটা তার কাছে দম বন্ধ করে মারার কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প হয়ে উঠছে। সে চলে যাবে, সে চিরতরে চলে যাবে। কৌশানীর দু'চোখ ভিজে ওঠে।

পর দিন দুপুরে কৌশানী গিয়ে হাজির হয় প্রত্যাচার বাড়িতে। প্রত্যাচার সবটা শুনে ভিডিও কনফারেন্স কলে নেয় মিঠি আর সৌজিতাকে। সবটা মন দিয়ে শুনে মিঠি প্রশ্ন করল, “বাড়িতে জানিয়েছিস?”

কৌশানী জবাব দেয়, “প্রশ্নই ওঠে না। আর জানালেও হয় আর-এক দফা ঝামেলা করত, নয়তো আমাকে বাড়িতে আটকে রেখে দিত। নয়তো অন্য কিছু। কিছুই বিশ্বাস নেই। আমি এই সবেল হাত থেকেই বাঁচতে চাইছি। তোরা তো জানিস, বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে।”

মিঠি বলল, “আমরা সবাই তোর ব্যাপারটা জানি। যদিও পারফেক্ট কোনও রিজন খুঁজে পাই না। ফ্র্যাঙ্কলি, এক দিন আমি আর সৌজিতা এই নিয়েই ডিসকাস করছিলাম। আমাদের মনে হয়েছিল তুই ওভাররিঅাক্ট করছিস। তোর বোনের না হয় তোকে নিয়ে ইনফিরিয়োরিটি কমপ্লেক্স আছে, থাকতেই পারে, আমার অনেক আত্মীয়স্বজনই আছে, আমাকে নিয়ে। হি হি হি। বাট কাকু-কাকিমা, আফটার অল, ইয়োর ওন পেরেন্টস! শোন নিবুম, আমার মনে হয় বাড়িতে তোর এক বার জানানো উচিত।”

“তা হলে বলি? তোদের বলতে পারিনি লজ্জায়। গত মাসেই আমার বাপি একটা সম্বন্ধ এনেছিল আমার জন্য। পাত্র কী করে জানিস? পান

পাতার ব্যবসা। ভাবতে পারিস? পাত্র নিজে বাড়িতে এসেছিল এক মিছিল লোকজন নিয়ে। সারা মুখে পঙ্কের দাগ। কোয়ালিফিকেশন স্কুল ফাইনাল। বিড়ি খেয়ে খেয়ে ঠোঁট আর দাঁত ভোগে। বাড়ি মুর্শিদাবাদের এক গ্রামে। আর যে ভাবে সন্দেশ, শিঙাড়া সাঁটাছিল, মাই গড!”

“হোয়াট! ওএমজি! তুই কী বললি?”

“বললাম, আমি চলে গেলে তোমাদের শান্তি? সেটা মুখে বললেই তো পারতে। উত্তরে যা-তা বলে দিল আমায়। বোনটাও মা-বাপির প্রশ্রয় পেয়ে গোপলায় যাচ্ছে। তার মুখের ভাষা তো নর্দমা হয়ে গেছে কবেই।”

প্রত্যাষা বলল, “তোমার বোনকে দেখেছিলাম এক দিন মৌলালিতে। ফাস্টে চিনতে পারছিলাম না। কী মোটা হয়ে গেছে!”

সৌজিতা বলল, “আঙ্কল-আন্টিরা কিছু বলে না?”

“বললে তো আজকের এই সিচুয়েশন আসতই না রে। মোম আগে এরকম ছিল না। লেখাপড়ায় অনেকেই মিডিয়োকোর হয়। আমি দেখিয়ে দিতে পারতাম। এক দিন প্রপোজাল দিয়েওছিলাম। ও বাবা! ছাড় ওর কথা। সে দিন সারা দিন মোবাইল অফ করে গঙ্গার ধারে বসেছিলাম, জানিস? রাতে বাড়ি ফিরে দেখি, ওরা ঘুমোনের তোড়জোড় করছে। আমার জন্য ফ্রিজও কোনও খাবার নেই। মোম বলে, আমি নাকি লস্ট কেস। এর পরেও...”

কৌশানীর গলা বুজে এল। প্রত্যাষা ওর মাথায় হাত রাখল। সৌজিতা এত ক্ষণ শুনছিল। এই বার সে বলল, “ওয়েট, ওয়েট! তোরা এই আলোচনা থাম। বাড়িতে খুলে বলার জন্য সার্বিশিয়েন্ট টাইম পাবি হাতে। কিন্তু ওই প্রজ্ঞাজিতা নামের...”

“প্রজ্ঞাপারমিতা।”

“ওই হল। আমার কিন্তু কেস জন্মিস মনে হচ্ছে, বাড়ি। এই ভাবে ঘাড়ে এসে কেউ চাকরি অফার করে নাকি? লোকের তো একটা চাকরি জোটাতে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। স্পেশাল কোয়ালিফিকেশন আর চ্যানেল-প্যানেল না-থাকলে একটা হেবিস স্যালারির সার্ভিস পাচ্ছিস কোথায় তুই? কী রে, মিঠি তোরা বল না!”

মিঠি বলল, “দ্যাটস কারেক্ট। আমি যে কোম্পানিতে আছি, চাকরিটা পেয়েছিলাম শ্রেফ লাক ফেভার করেছিল বলে। এই কথা বলেওছিলাম তোদের। এখনও চালিয়ে যাচ্ছি, মিস্টার আর মিসেস ঈশ্বরের পাশে আছেন বলেই। নইলে দেখি তো। পাঁচতলা হাইটের কোয়ালিটি নিয়েও কত ক্যান্ডিডেট ঘষে যাচ্ছে, ঘষেই যাচ্ছে!”

সৌজিতা বলল, “আমারও একই এক্সপেরিয়েন্স। পড়াচ্ছি, ভাল কথা, একটা প্লেনমেন্টও দেয় আমাদের টিউটোরিয়াল হোম, কিন্তু তার গ্রেডটা তো আমি অ্যাট লিস্ট জানি। নো ফিউচার!”

প্রত্যাষা বলল, “আমার বাবা ভাল লাগছে না। ছেড়ে দে নিবুম। ঠিক একটা কিছু হয়ে যাবে এখানে। আচ্ছা, আমি না হয় দীপকে বলে দেব। রিসেন্টলি ওর প্রোমোশন হয়েছে। এখন হাতে হেবিস পাওয়ার। তোকে বললাম, লাম্পসাম টাকটা আমি লোন দিচ্ছি, একটা গুড গ্রেডের ইনস্টিটিউশনে ঢুকে যা। নিলি না। চাকরির অফার পেলেও হয়তো নিবি না। তুই একটা পচা! সেন্টিমেন্টালিস্টদের আর যুগ নেই রে, নিবুম!”

দীপ প্রত্যাষার লেটেস্ট বয়ফ্রেন্ড। আজ অবধি গোটা আষ্টেক ছেলেকে ডজ করে অবশেষে প্রত্যাষা এখন দীপরাজ মেহরার এয়ারপোর্টে ল্যান্ডেড। শোনা যাচ্ছে, সামনের বছরেই চার হাত নাকি এক হবে। কৌশানী ছটফট করে উঠল, “একটা হেল্প কর তোরা। করবি?”

“ব্যস্ত কর সন্তাজী,” সৌজিতা বলল।

“ইয়ার্কি নয়। তোরা এক জন কেউ যাবি আমার সঙ্গে? চাইলে সবাই যেতে পারিস। উনি তো অফার দিয়েই রেখেছেন। গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আসবি চল।”

সৌজিতা বলল, “হুম, আইডিয়া সাউন্ডস গুড। বাট, আমার হোমে... ওকে। আই উইল ম্যানেজ। তোরা?”

প্রত্যাষা, “আমি রাজি। আমার কোনও কাজ নেই।”

সৌজিতা বলল, “কবেই বা তোমার কাজ থাকে? জিম ছাড়লে তুই যা চর্চি কালেক্ট করবি, আমি থার্ড আইতে দেখতে পাচ্ছি।”

মিঠি বলল, “আমার হবে না রে। এই উইকে এজিএম আসছেন।

তোরা ম্যানেজ করে নে। আর যদি নেক্সট উইকে যাস...”

কৌশানীর স্বর দৃঢ় শোনা, “নাহ, যা হওয়ার এই উইকেই। গিয়ে তেমন বুঝলে ইউ-টার্ন করব। আমার সঙ্গে সৌজিতা আর প্রত্যাষা চলুক। আমি থেকে গেলে, তুই না হয় নেক্সট উইকে এসে দেখা করে যাস।”

প্রত্যাষা বলল, “চল। যা হওয়ার দেখা যাবে। আর কিছু না হোক, একটা উইক-এন্ড টুর তো হবে। পিয়ালি আইল্যান্ড ইস আ গুড প্লেস। লাস্ট গিয়েছিলাম...”

আচমকা জিভ কেটে থেমে গেল প্রত্যাষা। হয়তো কোনও বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে পিয়ালি আইল্যান্ডে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে এসেছিল। সবাই এক সঙ্গে হি হি করে হেসে উঠল। কৌশানীর মনের কোনায় জমে থাকা সামান্য মেঘটুকুও যেন উড়ে গেল এই সমবেত হাসির ঘূর্ণি হওয়ায়। তার এই বন্ধুগুলো আছে বলেই আজও সে বেঁচে থাকার ইচ্ছেগুলো সযত্নে জমাতে পারছে। সৌজিতা বলল, “তা হলে ওই কথাই থাকল? ডান ডানা ডান ডান।”

আচমকাই প্রত্যাষা বলে উঠল, “নট ডানা ডান। ওয়েট ওয়েট!”

মিঠি বলল, “আবার কী হল?”

কৌশানী দেখল প্রত্যাষার ভুরুদুটো কুঁচকে গেছে। খানিক কী ভেবে নিয়ে সে বলল, “এত ক্ষণ এই কথাটা আমার মাথায় আসেনি কেন?”

“হয়েছেটা কী?” কৌশানী প্রশ্ন করে।

“আরে, পিয়ালিতে তো নাইট স্টে করার একটাই লজ।”

“আর ইউ শিয়োর?”

“হ্যাঁ রে। অনেক দিন থেকেই ওখানে একটাই লজ। বিশাল বড় কমপ্লেক্স। কলকাতা থেকে বুকিং করতে হয়। সে ভাবেই আমরা গিয়েছিলাম। আর কোনও থাকার জায়গা আছে বলে তো আমার মনে পড়ছে না। তোমার সেই প্রজ্ঞাপারমিতা কি সেই লজের মালিক?”

মিঠি বলল, “হতেও তো পারে।”

“তাই বা কী করে হয়? সেই হোটেলের মালিক, ম্যানেজার সব আমরা চেনা। ওখানে মহিলা-মালিক তো কেউ নেই, অ্যাঙ্ক ফার আই নো।”

“মাই গড! তুই ক’বার গেছিস যে ম্যানেজার, মালিক সবাইকে চিনে ফেলেছিস? আর ক’জনের সঙ্গে গেছিস? দ্যাখ সৌজিতা, ব্যাটা কত কিছু চেপে গেছে আমাদের কাছে।”

সৌজিতা সে কথায় কান না দিয়ে বলল, “দ্যাখ হয়তো সলিড মালকড়ি পেয়ে বেচে দিয়েছে লজ।”

কৌশানী প্রশ্ন করে প্রত্যাষাকে, “তুই কদিন আগে গিয়েছিলি?”

“বছর চারেক আগে।”

কৌশানী যেন প্রাণে আরাম পায়, “তাই বল! প্রজ্ঞা ম্যাডামের লজ বছর খানেক আগে তৈরি। আমায় নিজে মুখেই বলেছেন।”

“আ! আমি শুনেছিলাম ওখানে আর নাকি এক্সট্রা লজ হবে না,” প্রত্যাষা বলে উঠল, “এনিওয়ে, ছাড় তো! আমরা বাচ্চা নাকি? আমরা তো যাচ্ছিই নিবুমের সঙ্গে। তেমন ট্যান্ডাইম্যান্ডাই বুঝলে শ্রেফ ঘুরে চলে আসব। কী?”

সৌজিতা বলে, “এগজ্যাক্টলি!”

প্রত্যাষার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গড়িয়াগামী একটা বাস ধরে কৌশানী। বাঘা যতীনে নেমে দেখে অটো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কৌশানী ঠিক করে আজ হেঁটেই ফিরবে বাড়ি। যেতে যেতে একটু ভাবা দরকার এবং যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আছে সেটা তাড়াতাড়ি নিতে হবে। তা ছাড়া জলদি বাড়ি ফেরা মানেই তো সেই দমবন্ধ পরিবেশে মাথা গলানো। বিগত পনেরো-ষোলো বছর ধরে সে এই বাড়িতে বসবাস করে নিজের মগজটাকে সুস্থ রেখেছে কী করে, সেটাও মাঝেমাঝে আশ্চর্য ঠেকে তার নিজের কাছে। সে জানে এক বার বাড়িতে ঢুকে গেলে তার ব্রেন গ্যাঞ্জাম হয়ে যাবে। যা ভাবা, তা আগেই ভেবে ফেলতে হবে।

লায়েলকা মাঠ অবধি এসে সে ঠিক করে প্রজ্ঞা ম্যাডামকে একটা ফোন করবে। মোবাইলটা ব্যাগ থেকে বের করেও রেখে দেয়। প্রজ্ঞাপারমিতার কার্ডটা বের করে সামনের পাবলিক টেলিফোন বুথ থেকে ফোন লাগায়।



“হ্যালো...” প্রজ্ঞাপারমিতার গলা চিনতে কৌশানীর ভুল হয় না।

“আমি কৌশানী।”

চার সেকেন্ড নীরবতার পরে গলা ভেসে আসে, “তা হলে? আসছ?”

“আসছি।”

“বাড়ির লোকজনদের জানিয়েছ তো? এখানে এক বার জয়েন করে গেলে কিন্তু ঘন ঘন ছুটি পাবে না। মাসে এক বার, থার্ড স্যাটারডে। আর ফার্স্ট টাইম ঠিক আছে, কিন্তু বার বার স্টাফের বাড়ির লোক কাজের জায়গায় আসবে, এটা আমি অ্যালাও করি না। আর আজকাল মোবাইল তো সবার কাছেই থাকে। ইচ্ছে হলেই কথা বলে নিতে পারবে। তোমার মোবাইল আছে নিশ্চয়ই?”

সামান্য কি বুক কঁপে ওঠে কৌশানীর? বাড়ি ছেড়ে কোন দিনও সে কোথাও গিয়ে থাকেনি। বিশেষ করে একা। মাসির বাড়ি মালদহ আর জেঠার বাড়ি রানাঘাট। ব্যস। সেই বাড়িগুলোয় সে তিন-চার দিনের জন্য ছিল বটে, তবে পরিবারের সঙ্গে। একটা কি যন্ত্রণার রেশ তার বকের বাঁ-দিকটায় ঢোকা মেরে যাচ্ছে? অনেক কষ্টে কষ্ট স্বাভাবিক রেখে সে বলে, “আছে, ম্যাডাম।”

“তা হলে টেলিফোন বুথ দরকার হল কেন?”

দারুণ উপস্থিত বুদ্ধি মহিলা! কৌশানীও নির্ভেজাল মিথ্যে বলে, “আজই প্যাক শেষ হয়ে গেল। আমি ফেরার পথে রিচার্জ করিয়ে নেব।”

“গুড। তা হলে কে কে আসছ? বাবা-মা বাদে আর কেউ?”

“নাহ, আসলে তাদের আসা হবে না। আমি দুই বন্ধুর সঙ্গে আসছি।”

“ডোট মাইন্ড। জেনারেল বাড়ির লোকজন সঙ্গে আসতে চায়। তোমার বাবা মা কি...”

“হ্যাঁ, দু’জনেই বিজি। আসলে অফিস ডে তো।”

“ওহ। দু’জনেই সার্ভিস করেন? দেন...”

ফের চার সেকেন্ড নীরবতা।

“তা হলে বন্ধুদের নিয়েই চলে এসো। ওদেরও জায়গাটা ভাল লাগবে। আর শোনো, মোবাইল রিচার্জ করে আমাকে ফোন করো। রাতের দিকে হলেও সমস্যা নেই। তখন রুট বলে দেব। বাই।”

যাচ্ছিল! কৌশানী চাইছিল না এখনই তার মোবাইল নাম্বার প্রজ্ঞাপারমিতা জেনে যাক। কিন্তু ভদ্রমহিলা দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনই উপস্থিত বুদ্ধি রাখেন। মিঠি এক বার বলেছিল, “যে সব মেয়েরা দেখতে অপরাধী হন, তাদের বুদ্ধি তত কম হয়। খুব কম মেয়ের ভাগ্যে দুটোই সমান সমান থাকে। আর সঙ্গে প্রচুর মালকড়ি থাকলে তো সোনায় সোহাগা। আমাদের প্রত্যাশা তাদের মধ্যে এক জন।”

কৌশানী মনে হল প্রত্যাশাকে টক্কর দেওয়ার জন্য আর-এক জন এসে গিয়েছে।

কৌশানী ইচ্ছে করেই পল্লীশ্রীর মুখে সামান্য সময়ক্ষেপ করল। মোড়ের মিষ্টির দোকান থেকে একটা শিঙাড়া কিনে খেল। শিঙাড়া গিলতে তার কষ্ট হচ্ছিল। গলার কাছে একটা দলা মতো কী-একটা আটকাচ্ছে। কৌশানী মিষ্টি খেতে পছন্দ করে না। নোনতার মধ্যে শিঙাড়া তার খুব প্রিয়। বিশেষ করে শীতকালে ফুলকপি, মটরশুঁটি দেওয়া শিঙাড়া। বাপি আগে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে এই দোকানটা থেকে প্রায়শই শিঙাড়া কিনে আনত। মোট তিনটে। একটা তখনই গপ গপ করে খেয়ে ফেলত কৌশানী। আর বাকি দুটো দিয়ে একটা বড় বাটিতে মুড়ি আর জবজবে করে সর্বের তেল মেখে... আহ! তিন জনে সেই একই বাটি থেকে মুড়ি তুলে তুলে খেতে খেতে গল্পগুজব। মোম বড় হওয়ার সময়েও এই নিয়ম বজায় ছিল। তার পর এক দিন মোম আর শিঙাড়া খাওয়া পছন্দ করল না। ওর জিভের স্বাদকুঁড়িগুলো মিষ্টির দিকে ধাবিত হল। ব্যস, ধীরে ধীরে বাপির ব্যাগ ভরে উঠতে লাগল গজা, জিলিপি আর কালাকাদে।

শিঙাড়াটা ধীরে সুস্থে শেষ করে কৌশানী হাঁটতে হাঁটতে গল্ফ গ্রিনের রাস্তায় ঢুকে পড়ে ফোন করল। এখানে চার দিকের আওয়াজ বেশ কম। প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “এ বার মোবাইলের রেকর্ড অপশন অন করো। আমি যা বলছি রেকর্ড করে নাও।”

কৌশানী তা-ই করল।

“তুমি থাকো কোথায়?”

“বিজয়গড়া।”

দু'বার শব্দটাকে নিয়ে খেলা করে প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “দেখো কৌশানী, পিয়ালি আইল্যান্ড ভূমি কিসে আসবে আমি জানি না। আমি গাড়িতে আসি। সেটাই বলছি। সোজা গড়িয়া চলে আসবে। সেখান থেকে কামালগাজি। কামালগাজি বাইপাসের উপর দিয়ে ফ্লাইওভার ধরে বারুইপুর। গোচরণ-ধসা রোড ধরে দক্ষিণ বারাসাত ছাড়িয়ে মহিষমারি বাজার। সেখানে এসে যাকে জিজ্ঞেস করবে, সেই বলে দেবে পিয়ালি আইল্যান্ড যাওয়ার রাস্তা। গ্রামের মধ্যে দিয়ে সরু রাস্তা। স্থানীয় লোকজনদের জিজ্ঞেস করবে, কেল্লা যাওয়ার রাস্তা। তাদের কাছে পিয়ালি আজও কেল্লা নামে পরিচিত। যাই হোক, সেই রাস্তা ধরে কুলতলি স্ট্রাইট গেট। এই ব্রিজ পার হলেই পিয়ালি আইল্যান্ড। সামনেই পিয়ালি আইল্যান্ড টুরিস্ট লজ। ব্রিজের ওঠার আগে আমায় ফোন করবে। আমি ওই টুরিস্ট লজের কাছেই থাকব। রেকর্ড হচ্ছে তো?”

“হচ্ছে ম্যাডাম।”

“এ বার বুঝলে, কেন মোবাইল থেকে ফোন করতে বলেছিলাম? এতটা রুট ডিরেকশন মনে রাখা কারও পক্ষেই সম্ভব হয় না।”

“এক্সকিউজ মি ম্যাম, সেই লজটাই কি আপনার লজ?”

“না। ওটা অনেক আগের লজ। আদিকালেরও বলতে পারো। ওখানে অনেক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায় না। তাই তো গ্র্যাজুয়ালি আমার লজে ভিড়ে বাড়ছে। পিয়ালি টুরিস্ট লজ মেনশন করলাম অ্যাজ আল্যান্ডমার্ক... তো কবে আসছ?”

“কালই।”

“গুড ডিসিশন। কাল ফ্রাইডে। কালকের দিনটা রেস্ট নাও। বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাও। এখানকার পরিবেশ দেখে নাও। স্যাটারডেতে তোমাকে কাজ বুঝিয়ে আমি বেরিয়ে যাব নিজের কাজে। গুডনাইট।”

প্রজ্ঞাপারমিতার ফোনটা কেটে যেতে রেকর্ডিংটা তিন জনকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়ে সৌজিতাকে ফোন করে সবটা জানাল কৌশানী। সৌজিতা বলল, “খেপেছিস নাকি? ট্রেনে, বাসে ট্রাভেল করবে প্রত্যাখ্যা? আরে ওর তো ফুটকা খেতে হচ্ছে হলেও বিলাসবহুল গাড়ি বের করে! হি হি হি। ডোন্ট ওরি বাড়ি। আমি ম্যানেজ করে নিচ্ছি।”

প্রত্যাখ্যা নিজেই ড্রাইভ করছিল। ওর পাশে বসেছিল কৌশানী। পিছনে সৌজিতা। কামালগাজি ফ্লাইওভার পার হতেই গাড়ির গতি বাড়াল প্রত্যাখ্যা। কৌশানী বলল, “আন্তে চালা। করছিস কী?”

প্রত্যাখ্যা রাস্তা থেকে চোখ না-সরিয়ে বলল, “নিবুম, আশি কিলোমিটার রাস্তা কিন্তু, ঠিক আছে? এমনিতেই আমরা দেরিতে বেরিয়েছি। দুপুরের আগে পৌঁছোতে না পারলে...”

“দেরি আমি করিনি। ঠিক টাইমেই গড়িয়াতে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। দেরি তুই করেছিস।”

পিছন থেকে সৌজিতা বলল, “ওকে ফালতু কথা শোনানি নিবুম। মেকআপ করতে করতে বেচারি ঘুমিয়ে পড়েছিল। তাই তো?”

প্রত্যাখ্যা একটা অটোকে ওভারটেক করে হেসে ফেলল, “হি হি হি। অ্যাঁ, বাড়িতে কী বললি রে, নিবুম?”

“কী আবার বলব? কাল রাতে ব্যাগ গোছাতে দেখেই মোম মাকে লাগিয়েছিল। মা বলল, ‘কোন চুলোয় যাওয়া হচ্ছে শুনি?’ বললাম, ‘বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি। কাল ফিরব।’ শুনে কী বুঝল জানি না। মা বলল, ‘ফিরে এলেই ভাল!’ আর সহ্য হল না। বলে দিলাম, ‘মানেটা কী?’ মা’র হয়ে বোনই জবাবটা দিল, ‘আজকাল তো কোথায় কোথায় কার সঙ্গে ঘুরিস। আমি কোনও খবর রাখি না, নাকি?’ উত্তর দিলাম না। বুঝলাম মা একটা উত্তরের আশায় আছে। সেই আশায় গ্যামাক্সিন। ভেবেই রেখেছিলাম আর কোনও বামেলা করব না, জিন্দেগিতে না।”

পিছন থেকে সৌজিতা বলল, “অ্যাঁ, কাচটা একটু নামাচ্ছি।”

সামনের একটা ট্রাককে সাবধানে ওভারটেক করে প্রত্যাখ্যা বলল, “অ্যাঁ না, প্লিজ, ও সব পরে হবে। দেখছিস রাস্তায় কী ধুলো? প্লাস বাইরের হাই টেম্পারেচার। কাচ নামালে এসি অফ করতে হবে। হিউমিডিতে স্রেফ মরে যাব। প্লিজ ডোন্ট। তা ছাড়া কী ব্যাড স্মেল!”

কৌশানী মুখ টিপে হেসে বলল, “তা ছাড়া মেকআপে ডাস্ট লেগে নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স আছে।”

তত ক্ষণে একটা কিং সাইজ সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ফেলেছে সৌজিতা। বাধ্য হয়ে মুখ থেকে একটা বিরক্তিসূচক শব্দ বের করে বোতাম টিপে গাড়ির কাচ নামাতে হল প্রত্যাখ্যাকে। বাইরের দিকে তাক করে এক মুখ খোঁয়া ছেড়ে সৌজিতা বলল, “মিনিট পাঁচেকের তো মামলা। এতে তোর মেকআপ গলবে না। তা ছাড়া এমন টাচআপ দিস কেন যে বিট্রে করে? হাউএভার নিবুম, কন্টিনিউ।”

সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ নিবুমও বরদাস্ত করতে পারে না। তবুও প্রাণের বন্ধু বলে কথা! মাঝেমধ্যে প্রত্যাখ্যার বাড়িতে মিটিং হলে ওদের খোলা বারান্দায় গিয়ে সিগারেট খেয়ে আসে সৌজিতা। নিবুম ভুরু কুঁচকে বলল, “তোর এই হ্যাণ্ডিটা আর গেল না। তাড়াতাড়ি শেষ কর। যাক গে, বলি। কাল বাবাও অন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। বাট, লাস্ট মোমেন্টে ওরা আর কিছু করেনি, বলেওনি। আমিও আজ সকালে বেরিয়ে আসার সময় কিছু বলিনি। বাবা, বোন বাড়িতে ছিল না। মাকে প্রণাম করলাম। মা শুধু বলল, ‘সাবধানে যা।’ দ্যাটস অল! কোথায় যাচ্ছি, কার সঙ্গে যাচ্ছি, নাথিং জিজ্ঞাসিং। বাদ দে তো, একটা চায়ের দোকান দেখতে পেলো দাঁড় করা তো প্রত্যাখ্যা। সকাল থেকে চা-টাও খাওয়া হয়নি। তুই এত লেট করবি জানলে লাঞ্চটাও সেরে আসতাম।”

সৌজিতা সিগারেটে একটা দীর্ঘ টান দিয়েছিল। কৌশানীর কথায় হেসে ফেলতে গিয়ে বিষম খেল। তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, “শুধু চা? পেটে কিছু দানাও পড়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না ডুড। নিজের মুখটা লুকিং গ্লাসে দ্যাখ।”

দেখল কৌশানী। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি। মাঝ রাতে উঠে বাইরের বারান্দায় গিয়ে ওর প্রিয় বইগুলোয় হাত বুলিয়েছিল। আগে অপেক্ষাকৃত বড় ঘরটায় মা-বাবা-বোন শুত। আর দুটো ঘরের একটায় কৌশানীর টোকি আর পড়ার টেবিল। তৃতীয় ঘরে সংসারের দরকারি চাল-ডাল-সাবান-টুকিটাকি থাকত। তারই মধ্যে এক কোণে দুটো কাঠের বেঞ্চি পেতে ছাত্রছাত্রী পড়াত কৌশানী। তার পর এক দিন বাড়ি ফিরে দেখে সেই বেঞ্চিদ্বয় উধাও। মা বলল, বোন বড় হচ্ছে। ওর জন্য একটা আলাদা ঘর চাই। বেঞ্চি দুটোকে বেচে দেওয়া হয়েছে। এই রকম ঘটনা আগেও ঘটেছে। তখন সে কষ্ট পেত, চিৎকার করে কাঁদত। আজকাল আর কোনও রিঅ্যাকশন হয় না। কৌশানী বুঝে গেছিল, বাড়িতে পড়ানোর দিন শেষ হতে চলল। হয়তো কোনও দিন বোন বলবে, দিদির পড়ানোর ঠেলায় তার কনসেট্রেশনে সমস্যা হচ্ছে। তবু সে-ও ভাল। কৌশানী ভয় পেয়েছিল অন্য জায়গায়। বোনের যা খোলা নর্দমা-মুখ। কোনও দিন হয়তো তার ছাত্রছাত্রীদের সামনেই তার উদ্দেশ্যে বাজে কোনও কমেন্ট করে বসবে। সে বড় লজ্জার হবে। তার চেয়ে এই ভাল।

সেই ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে চলে গেল বোনের দখলে। চাল-ডাল-সাবান-টুকিটাকি উঠে এসে কৌশানীর ঘরের দমবন্ধ ভাব বাড়াল। আর তার বইপত্রসমেত টেবিলটা সরে এসে ঠাঁই নিল বারান্দায়। সেই ইস্তক বইগুলোকে প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে মুড়ে রাখে কৌশানী। আহা, ওদের বুঝি রোদ লেগে, বৃষ্টির ছাট লেগে বা শীতের প্রলেপ লেগে কষ্ট হয় না? আর স্পোর্টসে পাওয়া তার প্রাইজগুলো যে কোন চুলোয় ঠাঁই পেয়েছে কে জানে! হয়তো কোনও দিন এই টেবিলটাকেও বেচে দেওয়া হবে। বইপত্রগুলো কিলো দরে। এই সব নিজের চোখে দেখার চাইতে বাড়ির বাইরে থাকা ঢের ভাল।

সকালে উঠে শুধু ফ্রেশ হয়েছে সে। পেটে সতিাই কিছু আর নেই। মা হয়তো বাবা আর বোনের টিফিন তৈরি করে তার পর কৌশানী আর নিজের জন্য কিছু করত, সে আর অপেক্ষা করতে পারেনি। সৌজিতা বলেছিল, “তুই ঠিক ন’টার মধ্যে গড়িয়া বাস স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়া। আমি প্রত্যাখ্যাকে নিয়ে আসব। জানিস তো, ঘাড়ের উপরে না দাঁড়ালে ও লেট করবে।”

সেই লেট-ই হল। প্রায় সওয়া এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন পা মোটামুটি বিদ্রোহ ঘোষণা করছে, জানালার কাচ নামিয়ে সৌজিতা বলেছিল, “উঠে আয় ডুড।”

“এত দেরি!”

“দেরি কী রে, আমি না গেলে মহারানি বারোটাতেও বেরোতে পারতেন না। আমাকে টানা হাফ-আন-আওয়ার দাঁড় করিয়ে পুরো চম্পা সেজে বেরোলা!”

সারা রাত প্রায় অনিদ্রা, এতটা বেলা অবধি উপোস, তাই হয়তো চোখে-মুখের উঠোনে একটা ক্লান্তির ছায়া নেমেছে।

প্রত্যাষা বলল, “সে কী! এখনও ব্রেকফাস্ট করিসনি? দাঁড়া।”

ধসা রোডে এসে রাস্তার পাশে একটা মোটামুটি ভদ্র গোছের দোকান দেখে গাড়ি দাঁড় করাল প্রত্যাষা। যদিও সে নিজে কিছু খেল না, কিন্তু সৌজিতা আর কৌশানী গোথাসে খেল সের্কা পাউরুটি আর আলুর দম। শেষে এক ভাঁড় করে চা। চা খেয়েই ফের সিগারেট ধরাল সৌজিতা। কৌশানী কটমট করে তাকাতেই তার মুখে লাজুক হাসি ফুটে উঠল, “ফ্যান্টাসটিক এক ভাঁড় চায়ের পর একটা সাদাকাঠি না হলে ঠিক মেজাজ ধরে না, বুঝলি?”

কৌশানী গজ গজ করে, “থাম তুই। অজুহাতের চেয়ে বড় হাত মানুষের আর কিছু নেই।”

“আরে বাবা, গাড়িতে আর খাব না বলেই তো এখন মেরে দিচ্ছি। আসলে আমিও তেমন কিছু খেয়ে আসিনি। আমার সেই হেলথ ড্রিঙ্ক এক গ্লাস আর হুটা বিস্কুট। বাস! প্রত্যাষাটা দেরি না-করলে আরও দেড় ঘণ্টা আগে আমরা ব্রেকফাস্ট করতাম। অ্যাঁই, তুই কী করছিস রে? দীপকে মিস করছিস নাকি?”

মোবাইলের স্ক্রিন থেকে মাথা তুলে প্রত্যাষা বলল, “দূর! মিঠিকে আপডেট দিচ্ছিলাম। মেয়েটা আটকে পড়েছে, কিন্তু ছটফট করছে অফিসে বসে বসে।”

পিয়ালি টুরিস্ট লজের সামান্য দূরেই একটা দুধ-সাদা বড় গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে মোবাইল ঘাঁটছিলেন প্রজ্ঞাপারমিতা। গাড়ির শব্দে মুখ তুলে ওদের দেখেই কাছে এগিয়ে এলেন।

প্রত্যাষা চাপা স্বরে বলল, “এই মহিলা?”

কৌশানী সম্মতি জানাতেই প্রত্যাষা কাচ নামিয়ে মুখ বাড়াল। প্রজ্ঞাপারমিতা ঝুঁকে সৌজিতা আর প্রত্যাষাকে এক বার আলতো চোখে দেখে নিয়ে বললেন, “ওয়েলকাম, ওয়েলকাম। ফলো মাই কার।”

বলেই দ্রুত পায়ে উঠে পড়লেন সাদা গাড়িটায়। কৌশানী খেয়াল করল, ভদ্রমহিলার আজকের ড্রেস সে দিনকার মতো জমকালো নয়। আজ পরেছেন স্কিন-টাইট সাদা ফুল প্যান্ট আর শটহাতা হালকা নীল রঙের টপ। চোখে রোদচশমা।

সৌজিতা বলল, “যাই বল নিবুম, মহিলার মধ্যে বেশ একটা ইয়ে ফ্যাক্টর আছে। আমি যদি ছেলে হয়ে চাকরি নিতাম, তা হলে...”

কৌশানী চাপা গলায় বলল, “তুই থাম!”

“থামব কেন রে? ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন দেখেই তো আমি ফিদা হয়ে গেছি ডুড। বাকিটা... আচ্ছা নিবুম, মহিলা ম্যারেড?”

“অত শত জানি না। তোরই বা জানার দরকার পড়ছে কেন? থাম দেখি এখন। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে দেখি আগে।”

বেশ কিছু ক্ষণ গ্রাম্য উঁচু-নিচু রাস্তায় চলতে চলতে একটা বাঁকের মুখে পথের ধারে পদ্মফুলে প্রায় ঢাকা পড়ে যাওয়া একটা পুকুর দেখে কৌশানী বলল, “আহ, কী সুন্দর! দেখ দেখা!”

সৌজিতা এক মনে মোবাইলে কী সব খুট খুট করছিল, কৌশানীর ডাকে জানালা দিয়ে উকি দিয়েই বলে উঠল, “আহ! মারকাটারি ক্যানভাস ডুড। ভিতরটা পুরো গুলে যাচ্ছে।”

“কী! গুলে যাচ্ছে মানে কী!”

প্রত্যাষা রাস্তার ধারে শুয়ে থাকা দুটো কুকুরকে চমৎকার ভাবে পাশ কাটিয়ে হেসে উঠল, “তুই ওকে নতুন চিনলি নিবুম? জানিস না, নতুন নতুন ওয়ার্ড আমদানির ফ্যাক্টরি আছে ওর!”

কৌশানী বলল, “নিয়ার ফিউচারে ও ডিকশনারি লিখবে। নতুন বাংলা অভিধান। হেব্বি বিকোবো।”

সৌজিতা বলল, “উফ, আর কত ক্ষণ চাকা ঘোরাবি বল তো?”

প্রত্যাষা বলল, “যত ক্ষণ ওই প্রজ্ঞাপারমিতা না থামাচ্ছেন।”

“আমার একটা আর্জেন্ট ব্রেক দরকার ডুড। সেই কখন চা খেয়েছি। আর-এক কাপ চাই, ইমার্জেন্সি লেভেলে।”

প্রত্যাষা বলল, “তার চেয়ে বল সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছে। চা তো শিখণ্ডী। খবরদার, গাড়িতে আর না। নেমে চা-কফি-বিড়ি-সিগারেট যা চাই পারি।”

সৌজিতা মুখে একটা উল্লাসের শব্দ করে চশমাটা নাক থেকে নামিয়ে নিয়ে বলল, “গ্র্যান্ড আইডিয়া। আচ্ছা, নিবুম, এখানে গ্রামের দোকান-ফোকানে বিড়ি পাব, তাই না রে?”

বিরক্ত হয়ে কৌশানী পিছনে তাকাল, “তুই না এক জন টিচার। কী হচ্ছে কী?”

কার্যত অবাক হয় সৌজিতা, “আমি টিচার স্কুলে! স্কুলের বাইরে নাকি? মরে যাই! অ্যাঁই শোন না, যা এনভায়রনমেন্ট দেখছি, রাতের বেলা নদীর ধারে, ডিপ সাইলেন্স, ডিপেস্ট ডার্কনেস.... একটা বন ফায়ারের স্টাইলে আগুন জ্বলবে আর এক বোতল মদ.... উফ, ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।”

হিসেব মতো অন্তত মিনিট পঁচিশ গ্রাম-টাইপের রাস্তা দিয়ে চলে এক সময় প্রজ্ঞাপারমিতার গাড়ি থামল। কৌশানী জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল, একটা একতলা বাড়ির সামনে গাড়িটা থেমেছে। এখানে রাস্তা অনেকটা চওড়া। রাস্তার পাশে একটা ছোট মাঠ, সবুজ ঘাসে ঢাকা। ওরা দু’জনে নেমে এলেও প্রত্যাষা নামছিল না। প্রজ্ঞাপারমিতা এগিয়ে এলেন, “নেমে এসো ভাই। তোমরা কৌশানীর বন্ধু বলে ‘তুমি’ করেই বললাম। মাইন্ড করলে চলবে না কিন্তু।”

আসলে বাইরের গরমে ভেপসে যাবে ভেবে গাড়ির ভিতরের ঠান্ডা থেকে বেরোতে চাইছিল না সে। সৌজিতা বলল, “আরে, তুই কি সারা দিন গাড়িতেই বসে থাকবি নাকি? নেমে আয়। ফিল কর, নেচারকে ফিল কর ডুড। উফ। স্পেলন্ডিড!”

প্রত্যাষা নেমে এসে দেখল সৌজিতা ভুল বলেনি। পাশের মাঠ থেকে হু হু করে বাতাস ছুটে এসে চুল উড়িয়ে দিচ্ছে। সে বাতাস ঠান্ডা না হলেও, গরমও নয়। কিসের যেন একটা মিষ্টি ঝাঁঝালো গন্ধ নাকে আসছিল তার। প্রত্যাষা ডিকি খুলে একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে নেমে এসে দু’হাত উপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙতেই প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “এসো, ভিতরে এসো।”

“গাড়িটা?”

“সুলেমান!” প্রজ্ঞাপারমিতার ডাকে একটি লোক বাড়ির পিছন দিক থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে বিনা-বাক্যব্যয়ে প্রত্যাষার গাড়িতে উঠে বসল। কৌশানী প্রমাদ গুনল। প্রত্যাষা গাড়ির ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে। কাউকে হাত লাগাতে বা চালাতে দেয় না। প্রত্যাষা কিছু একটা বলতে যাওয়ার আগেই প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “গেট দিয়ে সোজা ভিতরে গিয়ে বাড়ির পিছনে পার্কিং। সুলেমান পার্ক করে দেবে। তোমরা এসো।”

সৌজিতা প্রশ্ন করল, “ব্যাগে করে আবার কী এনেছিস কী?”

প্রত্যাষা চোখ টিপল। কৌশানী বাড়ির ভিতরে ঢোকান আগে খেয়াল করল, প্রজ্ঞাপারমিতার সাদা গাড়িটা ভিতরে না-চুকে কোথায় একটা চলে গেল।

বাড়িটা বাইরে থেকে যেমন ছোট মনে হয়েছিল, ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, ততটাও ছোট নয়। হয়তো পিছন দিকে আরও বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছে বাড়িটা। আর বোধ হয় সম্প্রতি রং করা হয়েছে। চার দিক থেকে নতুন রঙের গন্ধ ভেসে আসছে, তবে উগ্র নয়। ভিতরে ঢুকেই কৌশানী দেখল, দুটো বেশ বড়সড় সোফা আর কাচের আলমারি-সজ্জিত একটি বসার ঘর। দেওয়ালে দু’চারটে মাটির তৈরি হাতের কাজ। আর আছে হুটা চেয়ার দিয়ে ঘেরা একটা বড়সড় ডাইনিং টেবিল। এ ছাড়া এই ঘরে আর কিছু নেই। ওদের বসিয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা ভিতরে চলে গেলেন।

বেশ কিছু ক্ষণ চুপচাপ। বাইরের হাওয়ার দাপট বা উষ্ণতা কোনওটাই

ভিতরে বসে বোঝার উপায় নেই। এয়ার কন্ডিশনার নীরবে তার কাজ করে চলেছে। সৌজিতা সোফায় বসে বলল, “আহ! কী আরাম! আচ্ছা, এরা চা দেবে না?”

প্রত্যাখার মুখেও প্রশান্তি। তার মেকআপ গলতে গলতে বেঁচে গেছে।

কৌশানী খেয়াল করল, তার মাথার ভিতরটা একেবারে জ্যাম হয়ে আছে। এখন এই নিমন্ত্রণ ঘরে বসে তার মনে হল, দুম করে, প্রায় ঝাঁকের মাথায় সে চলে এসেছে। কী কাজ, কোথায় কাজ, কত মাইনে— কোনও ব্যাপারেই তার জ্ঞান তেমন স্পষ্ট নয়। বন্ধুরা তো বিকেল হলেই ফিরে যাবে। সেটা আসার সময়েই দু’জনে পরিষ্কার করে দিয়েছে। সৌজিতা আজ ক্লাস বান্ধ করেছে, কাল অসম্ভব। প্রত্যাখা হয়তো থাকতে পারত, কিন্তু তা হলে সৌজিতার আর ফেরা হবে না, নয়তো বাসে করে ফিরতে হবে। কোনও মানে হয় না। কিন্তু তার পর? এই প্রায় নির্বান্দব পুরীতে সে একা? যদি এই বাড়িটাই প্রজ্ঞা ম্যাডামের হয়, তা হলে তার কথামতো এই বাড়িতে বসেই তাকে অ্যাকাউন্টসের কাজ করতে হবে। কিন্তু প্রজ্ঞা ম্যাডাম তো সারা দিন বাড়ি থাকবেন না। তাঁর হাজারও কাজ। সুলেমান লোকটার নজর ভাল লাগেনি। আরও ওই রকম কোনও লোক আছে কি না, বোঝা মুশকিল। তার থাকার ব্যবস্থা কি এই বাড়িতেই করা হবে? তার নিজের বাড়ির লোক জানে বড় মেয়ে পিকনিকে গিয়েছে। কাল যখন সে ফিরবে না, তখন যদি বাবা থানা-পুলিশ করে? বাড়িতে বলে আসাটা কি দরকার ছিল তবে? কৌশানী আর ভাবতে পারল না। মাথা নামিয়ে চোখ বুজল। কানে এল প্রত্যাখা ফিস ফিস করছে, “ঘরে এই মাত্র রুম-ফ্রেশনার স্প্রে করা হয়েছে। বুঝলি? এর দুটো মানে। এক, দেওয়ালের রঙের গন্ধ ঢাকতে আর দুই, ভিতরে আরও লোক আছে।”

সৌজিতা বলল, “চাকরি করতে ডেকে এমন আদর-যত্ন করে কেউ, প্রথম দেখলাম।”

আচমকা কিছু-একটা মনে পড়ে যাওয়ায় প্রত্যাখা বলল, “ইস, আমার গাড়ির চাবিটা...”

“যাওয়ার সময় ঠিক পেয়ে যাবে। চিন্তা করছ কেন?”

ঘরে এসেছেন প্রজ্ঞাপারমিতা। কৌশানী খেয়াল করল ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে তাঁর ড্রেস চেঞ্জ করে হালকা আকাশি একটা হাউসকোট পরে নিয়েছেন। খোলা চুল চুড়ো করে বেঁধে একটা ক্লিপ আটকেছেন। মুখেও হয়তো সামান্য প্রসাধনও সেরেছেন। কপালের ওভাল শেপের টিপটা আগে ছিল না।

প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “তা ছাড়া... এ কী! তোমাদের এখনও কিছু দেয়নি? দণ্ড!”

শেষের শব্দটা বেশ জোরে উচ্চারণ করলেন প্রজ্ঞাপারমিতা। কৌশানী অবাক হল। দণ্ড মানে? ভাবতে ভাবতে একটি প্রৌঢ় লোক, সামান্য ঝুঁকে, হাতে একটা ট্রে আর তার উপরে তিনটে রঙিন গ্লাস নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। কৌশানী লোকটার দিকে তাকাল। এই লোকটার নাম দণ্ড? দণ্ড কারও নাম হয় নাকি? প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “কৌশানী, একে চিনে রাখো। এ হল দণ্ড। বহু বছর ধরে আমার সঙ্গে আছে। তোমার যা-কিছু লাগবে, একে বলবে। একটু স্লো। তবে... দণ্ড, লাঞ্চ রেডি?”

ট্রে-টা সামনের টেবিলে সাবধানে রেখে লোকটা যেন মাটিতে মিশে গেল, “জি, ম্যাডাম।”

সৌজিতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, “এখনই লাঞ্চের কী দরকার? আসার সময় আমরা ব্রেকফাস্ট করে এসেছি। এই তো...”

সৌজিতাকে থামিয়ে দিয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “এখানে লাঞ্চ, ডিনার, ব্রেকফাস্টের একটা শিডিউলড টাইম আছে।”

প্রজ্ঞাপারমিতার কথার ভঙ্গিতে একটা কিছু ছিল, সৌজিতা চুপ করে গেল। প্রজ্ঞাপারমিতা নিমেষে নিজের গাভীর ভাঙলেন, “আরে, আম-পোড়ার শরবতটা খেয়ে নাও। আমার বাগানের গাছের আম। তার পর তিন বন্ধুতে মিলে চার দিকটায় এক পাক দিয়েই এসো না। ভাল লাগবে। ফিরে এসে লাঞ্চ সেরে নিয়ো। চাইলে স্নান করে নিতে পারো।”

কৌশানী এত ক্ষণ চুপ করে সবার কথা শুনছিল আর ভিতরে ভিতরে ক্রমশ অস্থির ভাব অনুভব করছিল। প্রজ্ঞাপারমিতা চলে যাওয়ার উপক্রম করতই সে আর থাকতে না-পেরে বলেই ফেলল,

“আমার চাকরির ব্যাপারটা...”

প্রজ্ঞাপারমিতা হেসে উঠলেন শব্দ করে, “রিল্যাক্স কৌশানী। সব হবে। আচ্ছা, আমি একটু কাজ সেরে আসছি। তোমরা শরবতটা ফিনিশ করে নাও। তার পর চাইলে ফ্রেশ হয়ে নিতে পারো। দণ্ড দেখিয়ে দেবে ওয়াশরুম। তার পর যা ইচ্ছে হয় করো। দেখা হচ্ছে লাঞ্চ টেবিলে। লাঞ্চ টাইম ঠিক সাড়ে বারোটায়।”

খাওয়ার আয়োজন খুব একটা বেশি নয়। ভাত, ডাল, আলুভাজা, একটা তরকারি, মাছের ঝাল আর বিস্তর স্যালাড। সেটা বড় কথা নয়। কৌশানী সবিস্ময়ে খেয়াল করল, এরই মধ্যে ভদ্রমহিলা আবার ড্রেস চেঞ্জ করেছেন। এবারে কচি কলাপাতা রঙের সালোয়ার আর সাদা কামিজ। ব্যাপারটা খেয়াল করে প্রত্যাখা সৌজিতার কানে কানে কিছু বলতেই সৌজিতা অস্ফুটে বলে উঠল, “এ যে মহারানি কেস!”

প্রজ্ঞাপারমিতা সচকিত হলেন, “আমায় কিছু বললে ভাই?”

কৌশানী তড়িঘড়ি জবাব দিল, “না না, আপনাকে নয়, ওর বোধ হয় বড্ড খিদে পেয়েছে, তাই আর তর সহিছে না।”

কৌশানীর কথা রাখতেই অথবা সত্যি সত্যি খিদের তাড়নায় সৌজিতা শুরু থেকেই গপ গপ করে খাওয়া শুরু করল। প্রজ্ঞাপারমিতা এক বার তার দিকে স্থির দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার বন্ধুরা আজ থাকছে তো?”

প্রত্যাখা জবাব দিল, “না, ম্যাডাম। আমরা আর থেকে কী করব? বন্ধুকে দিতে এসেছিলাম, ঘুরতেও এসেছিলাম। বিকেল নাগাদ...”

এই বার সৌজিতা এমন এক প্রশ্ন করল, কৌশানীর খাওয়া থেমে গেল, “ম্যাডাম, আপনার হাজ্রাব্যস্ত? মানে যদি কিছু মনে না করেন...”

প্রজ্ঞাপারমিতা প্রায় কিছুই খাচ্ছিলেন না। ভাত, ডাল ঝুঁয়েও দেখেননি। কাঁটা চামচ দিয়ে খানিকটা মাছ তুলে নিয়ে স্বাভাবিক স্বরে বললেন, “আমি ম্যারেড কি না জানতে চাইছ? অবশ্যই। আমার স্বামী আছেন তো!”

সৌজিতা ফের একটা-কিছু বলতে চাইছিল, বিপদ বুঝে প্রত্যাখা বলল, “আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। বলছি, আপনারা ছেলে নেন না? মানে আমার একটি ভাই আছে। হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ছে। যদি...”

শ্রেফ কথা ঘোরাতে প্রত্যাখা নির্ভেজাল একটি মিথ্যে উপহার দিল, সেটা কৌশানী আর সৌজিতা বুঝতে পারল। স্যালাডের স্লেট থেকে দুটুকরো শসা কাঁটা চামচে তুলে প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “সরি, ডিয়ার। আসলে আমার লজে ছেলে আছে বেশ কয়েকটি। ভিতরে, বাইরে। যেমন সুলেমান, যেমন ড্রাইভার যোগেন। তবে এটা রেসিডেন্স তো। আমি প্রায়ই একা থাকি। তাই, বুঝতেই পারছ। এক্ষেপে দণ্ড। অনেক দিন ধরে আছে।”

বাইরে চড়া রোদ থাকলেও দমকা হাওয়ার কারণে গরমটা কারও গায়ে বসছিল না। কৌশানী খেয়াল করল, এই দারুণ দহন দিনেও কলকাতার মতো প্যাচপেচে ঘাম হচ্ছে না। এতে সবচেয়ে বেশি স্বস্তি পেয়েছে প্রত্যাখা। তার সঙ্গে আনা ব্যাগের রহস্য ফাঁস হয়েছিল তখনই, যখন সে ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে আসতেই সবাই দেখল, সে ড্রেস চেঞ্জ করে ফেলেছে। নিশ্চয়ই ব্যাগে করে সেই সবই নিয়ে এসেছিল। মুখ দেখেও বোঝা যাচ্ছে, তার ব্যাগে শুধু ড্রেসই ছিল না।

“এই গরমে এতটা পথ এলাম। চেঞ্জ না করে নিলে বড্ড গা ঘিন ঘিন করত,” প্রত্যাখার অ্যালিবাই।

“পারিস তুই,” সৌজিতা বলেছিল।

খাওয়াদাওয়ার পরে ওরা খানিকটা হেঁটে এসে একটা জলাশয় দেখতে গেল। খাল টাইপের কিছু। তার পাড়ে একটা নৌকো লাগানো।

“আই, নৌকো চড়বি?” বলে উত্তরের অপেক্ষা না-করে সৌজিতা তরতর করে ঢাল বেয়ে নীচে নেমে গিয়ে দেখল, একটা চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সের ছেলে, খালি গা আর খাকি রঙের হাফ প্যান্ট পরে, মুখের উপরে একটা গামছা ঢাকা দিয়ে তক্তার উপরে অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

“ও ভাই, ভাইটি আমার,” সৌজিতা তাকে জাগানোর চেষ্টা করে।

কৌশানী বলে, “ছেড়ে দে না। দেখছিস ঘুমোচ্ছে।”

সৌজিতা পাভা না-দিয়ে অবশেষে ছেলেটিকে জাগিয়েই তোলে। ছেলেটি গামছা সরিয়ে তার মুখের উপরে একটা মেয়ের মুখ দেখে ধড়মড় করে উঠে বসে। সৌজিতা বলে, “ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না, আমি তোমায় মারব না,” বলেই হি হি করে হেসে ফেলে। ছেলেটি বোকোর মতো এক বার সৌজিতাকে আর-এক বার কৌশানী আর প্রতুষাকে দেখে। সৌজিতা বলে, “বলছি, তোমার নৌকো?”

ছেলেটি সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নাড়ে।

“আমাদের ঘোরাবে?”

“আমার নৌকো না,” ছেলেটি আমতা আমতা করে।

সৌজিতা বলে, “আমার মনটা ভারী ঠুনকো। এ ভাবে ভেঙে দিতে নেই, ভাইটি।”

কৌশানী ধমকায়, “কী হচ্ছে কী?”

সৌজিতা তার কথায় কান না-দিয়ে পার্স থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে ছেলেটির মুখের সামনে নাড়ায়, “বেশি ক্ষণ না, এক-দু’বার জলের উপরে ঘুরিয়ে দাও। তা হলেই এই দুটো তোমার পকেটে সুদূত করে ঢুকে যেতে পারে। চেক্স চাই না।”

এমন শান্ত সবুজে-সবুজ জায়গায় নৌকোবিহারটা মন্দ নয়। ছেলেটি রাজি হয়ে যেতেই কৌশানী আর প্রতুষাও তার সঙ্গী হল। নৌকোটা বোধহয় মাছ ধরার জন্য প্রধানত ব্যবহৃত হয়। নৌকোর ভিতরে আঁশটে গন্ধ। সৌজিতা ছেলেটির সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিল। ছেলেটির কথায় কৌশানী বুঝতে পারল, সত্যিই এই নৌকো টুরিস্টদের জন্য নয়, সৌজিতার অফার করা টাকাটা ছেলেটিকে প্রলুব্ধ করেছে। শান্ত নিস্তরঙ্গ জল কেটে তাদের নৌকোটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলে, সে দেখতে পেল একটা পাড়ে এক জেলে চেষ্টা করছে ছোট জাল ফেলে মাছ ধরার। আরও খানিকটা এগিয়ে চোখ পড়ল পুরনো একটি পরিত্যক্ত ভাঙা ঘাট। ঘাটের উপরের অংশে একটা বিশাল বড় গাছের ছায়ায় বসে ছেলে-ছোকরারা আড্ডা মারছে। স্থানীয় হবে হয়তো। তাদের দেখতে পেয়ে ছেলেগুলো গল্প খামিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ওদের আগ্রহ প্রতুষাকে নিয়ে এটা বুঝতে মেধা লাগে না। হালকা হাওয়ায় একটা ঘুম ঘুম ভাব এসে যাচ্ছিল, আচমকা সৌজিতার কথায় চটকা ভেঙে গেল, “লুক, লুক, রেডফিশ।”

প্রতুষা চার দিকে তাকিয়ে বলল, “রেডফিশ? কোথায়?”

কৌশানী অবশ্য এক বার তাকিয়েই বুঝে গেছে। সে আলগোছে বলল, “এত দিনেও ওকে চিনলি না, প্রতুষা? আরে ও লালমাছের কথা বলছে না। ওই দ্যাখ।”

কৌশানীর বাড়ানো আঙুল যে দিকে নির্দেশ করল, প্রতুষা তাকিয়ে দেখল উপরে নীলচে-সবুজ আর নীচে কমলা রং-ওয়াল চারটে পাখি জল-যেঁষে থাকা গাছের ডালের উপরে বসে আছে। দৃষ্টি সটান জলের দিকে। প্রতুষা বলল, “ও তো মাছরাঙা! রেডফিশ বলল যে ও?”

“ফিশ হল মাছ আর রেড হল রাঙা। এই বার বুঝলি?”

সৌজিতা হাসিতে ভেঙে পড়ল আর সেই শব্দে পাখি চারটে উড়ে গেল। কৌশানী মন দিয়ে দেখছিল জলাশয়ের ধারে ধারে বুনো ঝোপ আর নাম-না-জানা রাশি রাশি গুল্মগুলোর দিকে। কী-একটা যেন জল ঝুঁয়ে ঝুঁয়ে চলে যাচ্ছে। সাপ নাকি? ওর খুব ইচ্ছে করছিল, সৌজিতাকে এক চড় মেরে চুপ করিয়ে দেয়। মেয়েটা বড্ড বাজে বকে। এই শেষ দুপুরে প্রকৃতি একটু ভাতখুম সেরে নেয়। এখন কথা বলতে নেই। মেয়েটা বোঝে না।

কৌশানী ভাবছিল, মাত্র এক দিনের অফারে সে চলে এসেছে এখানে? নিজেরই কেমন বিশ্বাস হচ্ছে না। যাক গে, এসেই যখন পড়েছে তখন আর ভেবে লাভ নেই। সে তো আর বাচ্চা মেয়ে নয়। যা হবে দেখা যাবে। আর পিয়ালি আইল্যান্ড কিছু মাদাগাস্কার বা লস অ্যাঞ্জেলেস নয় যে, চাইলে ফিরতে পারবে না। কৌশানী অনুভব করল, এত ক্ষণে যেন মন খারাপের ছাঁই ছাঁই মেঘটা উন্মত্ত হাওয়ায় যেন একটু একটু করে দূরে কোথাও মিলিয়ে যাচ্ছে।

প্রতুষা হাত দিয়ে জল ঝুঁয়ে রয়েছে। বলল, “অত ভাবিস না নিবুম।

ভগবান যা করেন...”

সৌজিতা শূন্যস্থান পূরণ করল, “তা বুধ বা বৃহস্পতি অথবা নেপচুনের জন্য নয়। ওনলি ফর দ্য মঙ্গল। তাই তো?”

প্রতুষা বলল, “তোকে নিয়ে ভদ্রসমাজে আসা খুব মুশকিল, এই খবরটা তোর কাছে আছে? এই ভাবে কেউ বিবাহিতা কি না, কেউ জানতে চায়? আফটার অল এটা নিবুমের কাজের জায়গা। তোর ইনস্টিটিউশনে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে তোর ডিপার্টমেন্টাল হেড ম্যারেড কি না বা তার ক’টা বাচ্চা, এই খবরটা জানতে চাইবি? তা ছাড়া মহারানি-ফহারানি কী একটা বললি। ভদ্রমহিলা শুনতে পেলে কী লজ্জার ব্যাপার হত। আফটার অল নিবুমের ব্যাপারে প্রথমেই কী কনসেন্ট গ্রো হত মহিলার মনে? তুই তুই...” কথা অসমাপ্ত রেখে প্রতুষা বলল, “অ্যাঁহ দাঁড়া, মিঠি ফোন করছে।”

যে ঘরটায় ওরা এসে প্রথমে বসেছিল এবং ডাইনিং টেবিলে লাঞ্চ সেরেছিল, সেই ঘরের এক দিকের জানালার স্লাইডিং সরিয়ে এক মনে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল কৌশানী। এই ঘরে এখন এয়ার কন্ডিশনার চলেছে না। শুধু একটা ফ্যান মাথার উপরে বাঁই বাঁই করে ঘুরছে। তবে তাদের ঘরেরটার মতো এক টানা যান্ত্রিক আগুয়াজ তুলে নয়, মিহি একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মাত্র। বাইরেটায় এতটাই চাপ চাপ অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে যে, কিছুই তেমন স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছে না। সৌজিতা আর প্রতুষা চলে গেছে ঘন্টা খানেক আগেই। যাওয়ার আগে প্রতুষা জড়িয়ে ধরেছিল, “সাবধানে থাকিস। ফোন করিস। ডেলি আপডেট দিস। দিনের মধ্যে ফ্রি হলেই আমাকে জানাস, আমিও করব। আর তুই তো জানিস, আমাদের তিন জনের ফোনই চক্কি ঘন্টা খোলা থাকে,” তার পরেই তার হাতে জোর করে গুঁজে দিয়েছে একটা খাম।

“এটা কী?”

“আজ অন্তত আপত্তি করিস না, মিস সেন্টিমেন্টালিস্ট। কিছু বলা যায় না, নেগেটিভ সিগন্যাল পেলেই পালাবি, যাতে করে পারিস, গাড়ি, ট্যাক্সি, হেলিকপ্টার।”

সৌজিতা প্রতুষার মাথায় আলতো টোকা মেরেছিল, “ফর নাথিং ভয় খাওয়াচ্ছিস ওকে। না রে নিবুম, ভয়ের কিসু নেই। তুই বললে আমি এভরি সানডে চলে আসব এখানে। তোর সঙ্গে দেখা করে যাব।”

“আরে না। ভয় আমি পাচ্ছি না। ভয়ের কী আছে?” নিজেকেই হয়তো সান্ত্বনা দিচ্ছিল কৌশানী।

সৌজিতা তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় সুর করে বলেছিল, “তা হলে আর কী? খাও, পিয়ো, জিয়ো... বুঝলে হোরেশিও?” যদিও তারও চোখের কোণটা চিক চিক করছিল, নজর এড়ায়নি কৌশানীর। প্রতুষার ফোন-মারফত কথা হয়েছে মিঠির সঙ্গেও। মিঠিও একই কথা বলেছে। সাবধানে থাকতে, রেগুলার আপডেট দিতে। কৌশানী যেন না ভাবে, সে একা হয়ে গেল। রাতের দিকে ভিডিয়ো কনফারেন্স তো চলতেই পারে, আগে যেমন হত। তবে? চরেবেতি।

নৌকোভ্রমণের সময় থেকেই মনটা বেশ হালকা হয়ে গিয়েছিল কৌশানীর। প্রতুষা স্টিয়ারিং ঘোরাতেই ফের মনটা এক অজানা কারণে খারাপ হয়েছে। ঠিক অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা যায় না, যেন ঝড় আসবে তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রকৃতি। কৌশানীর মনে পড়ল, দাদু বলত, “ঝড়ে শুকনো পাতা ওড়ে, বালি ওড়ে। কিন্তু বালি, পাতা এরা কোনওটাই ঝড় নয়।”

বাড়ির জন্যও একটু একটু মন খারাপ লাগছে তার। ওরা যতই মিসবিহেভ করুক, আফটার অল তার মা, বাপি আর বোন। বড্ড আদরের এই বোনটা। মোম। মনে পড়ছে প্রথম যে দিন কোলে নিয়েছিল ওকে, ঠিক একটা মোমের পুতুলের মতোই লাগছিল। বড্ড মজা পেয়েছিল কৌশানী। মনে পড়ল, নামী স্কুলে ক্লাস ফাইভের ভর্তির ফর্ম তুলতে গিয়ে রাতভোর থেকে লাইন দিতে হয়েছিল কৌশানীকেই। টয়লেট চেপে রাখতে রাখতে শেষে অসুস্থ লাগছিল তার, কিন্তু লাইন ছাড়েনি। শেষে বাড়ি ফিরেছিল বিজয়গর্বে। অবশ্য ভর্তির পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিল মোম। মা’র বকুনিতে খুব কঁদেছিল বোনটা। কত আদর দিয়ে, কত স্তোকবাক্য শুনিয়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে, একটা বড়

চকলেট এনে দিয়ে বোনের মন ভাল করেছিল সে। আর সেই বোন...

জানালা থেকে সরে আসতে যাচ্ছিল কৌশানী, মেন রোডের দিকে কাদের পায়ে চলার শব্দ পেল। সে দৌড়ে বাইরের ঘরে এসে সদর দরজার পাশের জানালায় চোখ রাখল। দরজার বাইরেটা বেশ আলোকিত। মনে হয় ছাদের কাছাকাছি কোনও জোরালো আলো লাগানো হয়েছে। সেই আলোয় গেট অবধি দেখা যাচ্ছে। গেটের বাইরেটা অবশ্য চাপ চাপ অন্ধকারে ঢাকা। কারা যেন বুটের শব্দ তুলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আবছা আলো-অন্ধকারে বন্দুকধারী পুলিশ বলেই মনে হল। সব মিলিয়ে চার জন। এখানে পুলিশি টহল ব্যবস্থা আছে? বেশ ভাল ব্যবস্থা তো। এখন যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগল কৌশানীর।

লোক চার জন চলে যেতেই ফের প্রবল নিশ্চিন্তা ঘিরে ধরল বাড়টাকে। তার পরেও সে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল এক টানা। বাড়িভারির ধার-খঁষে থাকা গাছগাছালিতে থোকা থোকা জোনাকির আলো জ্বলছে আর নিভছে। কোথা থেকে যেন এক টানা ঝিল্লির আওয়াজ ভেসে আসছে। সঙ্গে আরও একটা শব্দ। সে কান পেতে বোঝার চেষ্টা করল। জেনারেটর চলছে কোথাও? কৌশানীর চটকা ভেঙে গেল। একটা মেসেজ ঢুকছে তার মোবাইলে। প্রজ্ঞাপারমিতার হোয়াটসঅ্যাপ।

“বন্ধুরা চলে গেছে?”

“হ্যাঁ, ম্যাম।”

“বেশ। আজ বিশ্রাম নাও, কাল ঠিক সাতটায় ব্রেকফাস্ট সার্ভ করবে দণ্ড। অট্টায় তোমার কাজ শুরু। দণ্ড দেখিয়ে দেবে তোমার কাজের ঘর। তোমার থাকার ঘর দেখিয়ে দিয়েছে দণ্ড?”

“না ম্যাম।”

“বুড়ো মানুষ। দেখা পেলো এক বার মনে করিয়ে দিয়ে। রাত ঠিক ন’টায় ডিনার।”

“আপনি আসবেন ম্যাম? আমি কি আপনার জন্য অপেক্ষা করব?”

“না, আমি বাইরে আছি। ভোররাতে ফিরব। কাল সকাল ন’টায় আমি তোমাকে তোমার কাজ বুঝিয়ে দেব।”

“ওকে ম্যাম।”

খানিক নীরবতা। বোঝা যাচ্ছে প্রজ্ঞাপারমিতা টাইপ করছেন। বেশ কিছু ক্ষণ পরে ফের লম্বা মেসেজ ঢুকল, “প্রথম প্রথম বাড়ির জন্য মন কেমন করবে। তোমারও করছে নিশ্চয়ই। রুমঝুম তো প্রায়ই কেঁদে ফেলত। রুমঝুম আগে তোমার জায়গায় কাজ করত। শেষে বিয়ে করে চলে গেল। নইলে আমিই ওকে স্যাক করতাম। কাজে একদম মন ছিল না। খালি ফোন আর ফোন। হয় বাড়িতে, নয় বন্ধুদের, নয় হবু বরকে।”

এর কোনও উত্তর হয় না। তবে সে বুঝতে পারল আগের স্টাফের নাম করে আসলে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন প্রজ্ঞাপারমিতা। সে লিখল, “বুঝেছি, ম্যাম।”

“গুড। আর-একটা কথা। তুমি চাইলে সব ঘরগুলোই ঘুরে ঘুরে দেখতে পারো। একটা ঘরে বই আছে। আমার লাইব্রেরি। অনেক বই আছে নানা বিষয়ের। অবসর সময়ে পড়তে পারো। ভাল লাগবে। শুধু যে ঘরের দরজা বন্ধ, সেগুলোয় ঢুকবে না। আচ্ছা, তুমি টাইপিং জানো বলেছিলে না?”

“না ম্যাম। আমি ওয়ার্ড, এক্সেল জানি। টাইপ করতে পারি, তবে স্পিড নেই।”

“ইজ ইট? ওকে। কাল দেখছি। গুডনাইট।”

ড্রয়িং রুমে ফিরে গিয়ে সোফায় বসেছিল কৌশানী। সোফার পাশে কতগুলো বিদেশি ম্যাগাজিন দেখতে পেয়ে সময় কাটাতে সেগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিল। এই ভাবে কত ক্ষণ বসেছিল, হিসেব রাখেনি। ফের টুং টাং শব্দে হুঁশ ফিরল। সৌজিতা আর প্রত্যাষা মেসেজ করতে শুরু করেছে। সৌজিতাকে নামিয়ে দিয়ে প্রত্যাষা নিজের বাড়িতে পৌঁছে গেছে। ওকে সাবধানে থাকতে বলেছে। কৌশানীর মনে হল, মাত্র কিছু মাইলের তফাতে জায়গার কত পার্থক্য। এই সময় তার বাড়ির আশপাশটা মানুষের আনন্দ, ছল্লোড়, ঝগড়া আর নানা কিসিমের কাঁচকাঁচানিতে

ভরে থাকে। চার দিক শান্ত হতে হতে সেই রাত বারোটা-সড়ে বারোটা। অথচ তার মোবাইল বলছে, এখন আটটাও বাজেনি। এখানে চার দিক কত থমথমে। একটু আগেও যে ঝিল্লির শব্দ ভেসে আসছিল, তা-ও এখন আবছা। সেই আর-একটা আওয়াজও থেমে গেছে। ফের একটা মেসেজ ঢুকল। এ বার মিঠি। বিশাল লম্বা মেসেজ। পরে পড়বে ভাবতে ভাবতে মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে সে চমকে উঠল। সর্বনাশ! চার্জ তলানিতে। কৌশানীর চিন্তা বাড়ল, কারণ তার মনে পড়ে গেছে যে, সে চার্জার আনেনি। এ বার কী হবে? তার মোবাইলটাই তো বাইরের জগতের সঙ্গে এবং প্রজ্ঞাপারমিতার সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম। এই বাড়িতে কি ল্যান্ডলাইন আছে? কিংবা বাড়ির বাইরে কোনও টেলিফোন বুথ? নিজের বাড়িতেও তো একটা ফোন করা দরকার। তাকে নিয়ে বাপি-মার চিন্তা না-থাকতে পারে, তার নিজের তো একটা কর্তব্যবোধ আছে। ফোন করে বলা দরকার, আজ সে ফিরতে পারবে না। কিন্তু এখন চার্জার কোথায় পাবে সে? আবার থাকলেও, অনেক সময় একটা ফোনের চার্জার অন্যতে লাগে না। যত দূর মনে পড়ছে, প্রজ্ঞাপারমিতার ফোনটা প্রথম সারির একটি দামি ফোন। তার চার্জার থাকলেও, সেটা কৌশানীর কাজে আসবে না। এ দিকে দণ্ড লোকটার কোনও সাড়াশব্দ নেই। লোকটা কি মোবাইল ইউজ করে? ধুর বাবা!

কী মনে করে সে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে এসে, ড্রয়িং রুম পার হয়ে সদর দরজার ল্যাচ খুলে বাইরে এল। সিঁড়ি দিয়ে দু’খাপ নেমে সামান্য এগিয়ে কৌশানী আকাশের দিকে তাকাল। চার দিকের জমাট অন্ধকারের সঙ্গে পাল্লা দিতেই হয়তো আকাশ একেবারে কালো। চার দিকে তাকিয়েও চাঁদ তো দূরের কথা, একটা তারাও খুঁজে বের করতে পারল না। হয়তো আজ অমাবস্যা।

“দিদি।”

ঘাড়ের কাছে বাঘ ডাকলেও এতটা চমকে উঠত না কৌশানী। সেই লোকটা। সুলেমান। হাতে একটা বিশাল টর্চ। কখন নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। লোকটার মুখটা দিনের আলোতেই বড্ড খারাপ লাগছিল। এখন এই আধো-অন্ধকারে আরও ভয়াবহ লাগছে। সেটা গোঁফহীন মুখে ছাগল-দাড়ির জন্য না বসন্তে খোবলানো মুখটার জন্য, ধরতে পারল না কৌশানী। লোকটা কিন্তু এক গাল অমায়িক হাসি ছড়িয়ে বলল, “দিদি, রাতে টর্চ ছাড়া বেরোবেন না। গ্রাম এলাকাও আজকাল খারাপ লোকে ভরে গেছে। তা ছাড়া গরমকাল। সাপখোপ কোথায় ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে আছে, আপনারা শহরের মানুষ, বুঝতে পারবেন না।”

কৌশানী বুকে সবটুকু সাহস সঞ্চয় করে বলল, “আপনি তো বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন সুলেমানবাবু।”

লোকটি ফের বিগলিত হাসি মাখিয়ে জবাব দিল, “আমরা গাঁ-গঞ্জের মানুষ। সাপের নিঃশ্বাস বুঝতে পারি, বাতাসের গন্ধ নিতে পারি। আপনি নতুন এসেছেন। আপনি ভিতরে যান। ম্যাডাম জানতে পারলে রাগ করবেন। আর, আমায় বাবু বলবেন না। আমি চাকর-বাকর মানুষ। আমায় সুলেমান বলে ডাকলেই হবে।”

অনর্গল কথার স্রোতে বাহিত হয়ে লোকটার মুখ থেকে বিড়ি আর দেশি মদের বিস্ত্রী গন্ধ ভেসে আসছিল। কৌশানীর দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তবুও সে বলল, “আপনি এখানেই থাকেন, সুলেমান ভাই?”

লোকটা ফের দাঁত বের করে হাসল আর সেই সময়ে কৌশানী খেয়াল করল সুলেমানের সবগুলো দাঁত সাদা ঝক ঝক করছে, “আমি এই বাড়ি পাহারা দিই। সারা দিন, সারা রাত। আর আমি ভাই-টাই নই, শুধু সুলেমান। এই বার ভিতরে যান, প্লিজ।”

এই বলে লোকটি ফের অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল। কৌশানীর বুকটা ছাঁত করে উঠল। ভূত নয়তো? নাহ, তা হলে আজ দুপুরে সে সশরীরে উপস্থিত হয়ে প্রত্যাষার গাড়ি চালিয়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে যেতে পারত না। ভূত কি দিনের বেলাতেও দেখা দেয়?

সদর দরজার ল্যাচ টেনে দিয়ে ভিতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে দিল কৌশানী। সুলেমান লোকটা যতই দাঁত দেখাক, নজর ভাল নয়। কিন্তু তার থাকার ঘরটা কোনটা? যে ব্যাগটা নিয়ে এসেছিল, সেটা এই ড্রয়িং

রুমেরই রাখা আছে, যেমন সে রেখেছিল। তার আরও খোয়াল হল সেই কোন সকাল থেকে সে এক ড্রেস পরে আছে। এ বার চেঞ্জ না- করলেই নয়। কিন্তু দণ্ড লোকটা কোথায় গেল? ও না বলে দিলে, কোন ঘরে সে থাকবে বুঝবে কী করে?

খানিক দাঁড়িয়ে সে ঠিক করল, দরজা-খোলা ঘরগুলো এক বার ঘুরে দেখবে। এক বার ওয়াশরুম হয়ে সে এগোল।

প্রথম ঘরটার দরজা পর্দা-ঢাকা। পর্দা সরিয়ে দেখল, দরজা হাট করে খোলা। এই ঘরটি প্রায় খালি। ঘরে অল্প পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে। সেই আলোয় সে দেখতে পেল, কয়েকটা চেয়ার, একটা টেবিল। দেওয়াল-আলমারিতে কাচের বাসনকোসন, কিছু শো-পিস। বাইরের ঘরের আসবাবগুলো বেশ আধুনিক, এই ঘরটার পরিবেশটাই কেমন পুরনো পুরনো। কৌশানী বুঝল, বাড়ির অব্যবহৃত বা বাতিল জিনিসপত্র এখানেই রাখা হয়েছে। কৌশানী চার দিকের দেওয়ালে চোখ ঘুরিয়ে দেখল। নাহ, চার্জার তো দূরের কথা, একটা প্লাগ পয়েন্ট অবধি নেই। কিন্তু ঘরের লাইটটা তা হলে জ্বলছে কী ভাবে?

মরুক গে, ভেবে সে বাইরে বেরিয়ে এল। উল্টোদিকে আর-একটা দরজা। পর্দা সরিয়ে দেখল এটাও খোলা। ঢুকেই বুঝল প্রজ্ঞা ম্যাডামের কথামতো এটাই সেই লাইব্রেরি। বাপ রে! ছাদ অবধি আলমারিতে সাজানো প্রচুর বই। নীচের দিকের কিছু বইয়ে নজর বোলাল সে। বেশির ভাগ ইংরেজি। কিছু বাংলা বইও অবশ্য চোখে এল। শরৎ সমগ্র, প্রমথনাথ বিশী নাটকসমগ্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বেশ কিছু বই, বিমল মিত্র, সৈয়দ মুজতবা আলী, জরাসন্ধের লেখা বই। বেশ কিছু কবিতার বইও রয়েছে দেখতে পেল। কৌশানীর গল্পের বই পড়ার ঠিক নেশা না-থাকলেও অবসর সময়ে পড়তে ভাল লাগে। বিশেষ করে ভ্রমণের বই তাকে মতিয়ে রাখে। তার নিজের অবশ্য দু'বার দার্জিলিং আর এক বার পুরী ছাড়া আর কোথাও যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তা-ও ছোটবেলায়। বাবা-মা'র হাত ধরে। মানুষ শারীরিক কষ্ট তবু সহ্য করতে পারে, কিন্তু মানসিক কষ্ট? তার যা শুকোতে কারও কারও সারা জীবন লেগে যায়। কৌশানীর যখন স্কুল-ফাইনাল, দিন বুঝে বুঝে সেই সময়েই বাপি সিকিম যাওয়ার টিকিট কেটে ফেলল। ওই সময়েই তাকে নাকি অফিস ছুটি দিয়েছে। স্কুল-ফাইনাল ছেড়ে আর কে ঘুরতে যায়! অতএব ওই ক'টা দিন এক দিকে সে পড়েছে, অন্য দিকে তাকে নিজে হাতে রান্না করে খেতে হয়েছে। এমনও হয়েছে এক দিন, চালের হাঁড়ি খুলে দেখেছে চাল বাড়ন্ত। দোকান থেকে চাল কিনে এনে, ভাত চড়িয়ে, স্টোভের পাশেই বসে বসে পড়া ঝালিয়ে নিয়েছে। বইয়ে এতটাই ডুবে গেছে, পোড়া পোড়া গন্ধে হাঁশ ফিরতে দেখে, ভাত কখন জ্বলে কালো হয়ে গেছে। ফের ভাত রান্না করা। চোখ ফেটে জল এসেছে। শুধু এটা বুঝতে পারেনি, তার অপরাধটা ঠিক কোথায়? জ্ঞানত সে তো কখনও তার বাপি-মাকে অসম্মান করেনি। অথবা বোনকে প্রাণ উজাড় করে দিয়ে ভালবাসতেও কার্পণ্য করেনি। প্রত্যাষ এক বার বলেছিল, “তোমার বাবা-মা'র মেন্টাল প্রবলেম হয়েছে। দে শুড কনসাল্ট আ গুড সাইকোয়ালিষ্ট।” সে দিনও তাকে সমর্থন না-করে জোরে বকে দিয়েছিল কৌশানী। বাপি আর মা তার কাছে এখনও ভগবান।

অথচ কত দেশ রয়েছে দেখার, কত অজানারে জানার। বিদেশ ভুলেই যাও, দেশেই কত জায়গা রয়েছে ঘুরে ঘুরে দু'চোখ ভরে তার রূপ-রস-গন্ধ আবাদন করার। কবে করবে সে? তাই সেই অভাব সে বই পড়ে মেটায়। নিজে না দেখুক, কেউ তো দেখেছে। তাই বাঁ দিকের একটা তাকে পর পর সাজানো উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রমণকাহিনি দেখে তার মনটা ভাল হয় গেল। এখানে নিশ্চয়ই সারা দিন তাকে কাজ করতে হবে না। বিশেষ করে সন্ধ্যাগুলো সময় কী ভাবে কাটাবে, সেটাই তাকে ভাবাচ্ছিল। এই বইগুলো তাকে খুব হেল্প করবে। সে ফের ইংরেজিতে লেখা বইগুলোর দিকে তাকাল। জেন অস্টেন, চার্লস ডিকেন্স, এমিলি ব্রন্টে, ড্যানিয়েল ডুফোঁ, জর্জ অরওয়েল...এই সব নাম। নাহ, এই ঘরে প্লাগ পয়েন্ট আছে বটে, কিন্তু কাজিকত জিনিসটির দেখা নেই।

পরের ঘরের দরজা বন্ধ। মনে পড়ল প্রজ্ঞাপারমিতা বারণ করেছিল। অপরাধ হবে জেনেও প্রবল কৌতূহলে সে হালকা ঠেলল। দরজা ভিতর

থেকে বন্ধ। পরের ঘরটারও সেই দশা। উল্টোদিকে আর-একটা ঘর। পর্দাবিহীন খোলা দরজা-পথে সে ঘরে ঢুকতেই দেখল, এটা আকারে সবথেকে ছোট ঘর। ঘরের এক দিকের দেওয়ালে লোহার শেলফ আর তার উপরে প্রচুর ফাইল সার দিয়ে সাজানো। ওগুলো কিসের ফাইল? ম্যাডামের লজের হিসেবপত্র কি এতেই রাখা আছে? তা হলে কি এটাই কি তার কাজের ঘর হতে যাচ্ছে? ঘরের অন্য দিকে চোখ পড়তে সে নিশ্চিত হল। একটা মাঝারি টেবিল আর তার উপরে একটা কম্পিউটার মনিটর, একটা কি-বোর্ড, একটা মাউস আর মাউসপ্যাড। টেবিলের কাছে গিয়ে দেখল তার পাশ-ঘেঁষে একটা ছোট কাচের আলমারি। এতটাই ছোট যে, এ পাশ থেকে দেখা যাচ্ছিল না। কী আছে ওই পুঁচকে আলমারিতে? উবু হয়ে বসে সে দেখতে পেল, আলমারি-ভর্তি সিডি। এত সিডি! আজকালকার দিনে কেউ সিডি ড্রাইভ ব্যবহার করে নাকি? সে উঠে পড়ল। ফাইলের শেলফের কাছে গিয়ে একটা ফাইল পেড়ে নিল। আগে থেকে কাজের নমুনাটা দেখে রাখলে সুবিধে হতে পারে। কিন্তু কী ধুলো রে বাবা! দৈনন্দিন কাজের ফাইলে এত ধুলো কেন?

“আপনি এখানে কী করছেন?”

চমকে উঠে হাত থেকে ফাইল পড়ে যাচ্ছিল কৌশানীর। দরজা পেরিয়ে তখন ঘরে ঢুকেছে দণ্ড নামে সেই লোকটা। কৌশানী নিজের গলা স্বাভাবিক রেখে বলল, “আমার মোবাইলের চার্জ ফুরিয়েছে। একটা চার্জার খুঁজছিলাম। আপনি কি...”

লোকটা কেমন একটা খসখসে গলায় বলল, “চার্জার কি ফাইলে থাকে? ওটা যেখানে ছিল, সেখানে রেখে দিন।”

ঠিক কথা। কৌশানী রেখে দিল। খোয়াল করল, ম্যাডামের সামনে লোকটা যতটা ঝুঁকে ছিল, এখন আর ততটা নয়। বাপ রে! কী এটিকেট গুণ লোকটার। ম্যাডামের সামনে যেন গলাই খুলছিল না আর এখন সেই গলাতেই স্পষ্ট আদেশের সুর ঝরে পড়ছে। লোকটা বলল, “যখন-তখন সব ঘরে ঢুকে পড়বেন না হুট করে। প্রথম দিন এসেই একেবারে...”

লোকটা কথা শেষ করল না। কৌশানীর এ বার রাগ হল। লোকটা কথার ধরনধারণ যেন কেমন। তাকে চোর ভাবছে নাকি? সে ঈষৎ উষ্ম গলায় বলল, “দেখুন, ম্যাডাম আমায় নিজে মেসেজ করে সারা বাড়ি ঘুরে দেখার পারমিশন দিয়েছেন। আপনি দেখবেন সেই মেসেজ?”

দণ্ড নামের লোকটা সামান্য থমকাল, “তবুও। আজ প্রথম এলেন। আপনি আমাদের অপরিচিত, আমরাও আপনার কাছে। ক'দিন থাকুন, জানুন, চিনুন, তার পরে তো। আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আপনার ঘরটা আমি দেখিয়ে দিই।”

করিডরের একদম শেষে মুখোমুখি দুটো ঘর। বাঁ দিকেরটার দরজা হাট করে খোলা। কৌশানী ঊঁক দিয়ে বুঝল, এটা রান্নাঘর। ঘরটার উজ্জ্বল আলোয় সে দেখতে পেল, গ্যাস ওভেন থেকে শুরু করে চিমনি অবধি রান্নার সব আধুনিক অয়োজনই মজুত রয়েছে। ঠিক তার উল্টোদিকের ঘরের ল্যাচ ঘুরিয়ে আলো জ্বেলে দিল লোকটা। দণ্ডের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে কৌশানী দেখল, বাহ। বেশ ঘরটি। এক দিকে টান টান করে পাতা ঘিয়ে চাদরে ঢাকা একটা পরিষ্কার বিছানা। বিছানার পাশে একটা টেবিল, একটা চেয়ার, ড্রেসিং টেবিল, দেওয়াল-আলমারি। ঘরের এক পাশে একটা ছোট দরজার উপরে লেখা ‘ওয়াশরুম’। কৌশানী চমৎকৃত হয়ে দেখল তার ব্যাগটি কখন ড্রয়িং রুম থেকে উড়ে ড্রেসিং টেবিলের পাশে চলে এসেছে। নিশ্চয়ই দণ্ড। পিছনে তাকিয়ে দেখল লোকটা কখন চলে গেছে। অদ্ভুত মানুষ তো! সুলেমানের মতোই জ্যাস্ত ভূতবিশেষ।

লোকটা অবশ্য ফিরল কিছু ক্ষণের মধ্যে। এখন তার হাতে দুটো জিনিস। এক হাতে একটা মাল্টি-চার্জার আর অন্য হাতে একটা চ্যাপটা কালো কী জিনিস। জিনিসদুটো টেবিলের উপরে রেখে কালো জিনিসটির গায়ে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, “এটা বেল। আমায় দরকার হলে এটা টিপবেন। রাতের খাবার ন'টার সময় এই ঘরেই পাবেন।”

কৌশানী বলল, “বলছিলাম কী, দণ্ডবাবু, ম্যাডাম খাবেন না?”

লোকটি চার সেকেন্ডের মতো তাকে এক দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বলল, “দরজা খুলেই রাখুন। আমি খাবার দিতে আসব। এঁটো বাসন আমিই নিয়ে যাব। তার পরে দরজা লক করে শুয়ে পড়বেন। বাথরুম দুটো

কল আছে। বাঁ দিকেরটা গরম জলের। গিজারের সুইচ বাইরে। দরকার হলে সুইচ আগে থেকে অন করে রাখবেন। দশ মিনিট পরে সুইচ অফ করে তার পর বাথরুমে ঢুকবেন। সকালের খাবার আজ দুপুরের মতোই বাইরের ঘরের ডাইনিং টেবিলে। ঠিক সাতটায় ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা হবে। রাতে জানালা খুলবেন না। পোকামাকড়, মশা ঢুকে পড়বে। আমাকে ডাকতে হলে ওই বেলটা টিপবেন। আমি এসে তিনটে টোকা দেব। তা হলে দরজা খুলবেন, নইলে নয়।”

লোকটা চলে গেল। কেমন যন্ত্রচালিতের মতো এক নিঃশ্বাসে বলে গেল লোকটা। কৌশানী নিজের মনেই বলে উঠল, “অদ্ভুত!”

“একটা প্রাইভেট কোয়েশেন করছি। কেমন?”

সেঁকা পাউরুটির উপরে পুরু করে লাগানো জিনিসটা প্রথমে মাখন ভেবেছিল কৌশানী। বেশ খানিকটা খেয়ে বুঝল মার্জারিন। ঘি-মাখন কৌশানীর প্রিয় খাদ্যবস্তু, কিন্তু মার্জারিনটা পছন্দ করে না। আধা-খাওয়া পাউরুটি ফেলছে দেখে যদি ম্যাডাম রাগ করেন ভেবে সে বাকিটা কোনও মতে গিলে নিল। তার পর তাকিয়ে দেখল মার্জারিন না-লাগানো অবস্থাতেও গোটা চারেক পিস রয়েছে। তারই একটা টেনে নিয়ে কামড় বসাতেই প্রজ্ঞাপারমিতা প্রশ্নটা ছুড়লেন। কৌশানী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তেই প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “বয়ফ্রেন্ড আছে?”

এত সকালে এমন প্রশ্ন আসতে পারে ভাবতে পারেনি সে। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয়, নেই। সেটাই বলল সে। তার কথার ভঙ্গিতে কিছু-একটা ছিল, প্রজ্ঞাপারমিতা একটা ফর্কে কয়েকটা শসা আর কয়েকটা টোম্যাটো বিধিয়ে নিয়ে ফের প্রশ্ন করলেন, “ছিল?”

চকিতে কৌশানীর এক বার গৌরবের মুখটা মনে পড়ল। গৌরব তার ভাল বন্ধু ছিল। সেই অর্থে বয়ফ্রেন্ড তো বলাই যায়। কিন্তু প্রজ্ঞাপারমিতা যা জানতে চাইছেন, তার উত্তর সেটা নয়। গৌরবের সঙ্গে সত্যিই একটা খুব ভাল সম্পর্ক ছিল তার। গৌরবের বাড়ি সুভাষপল্লিতে। গৌরবদের বাড়ির অবস্থা তাদেরই কাছাকাছি, মোটামুটি অসচ্ছল। নেতাজিনগর কলেজে পড়ার সময় থেকেই ওর সঙ্গে আলাপ। সেই থেকে বন্ধুত্ব, হয়তো কিছুটা গাঢ় হয়েছিল এক সময়। বাপির দেওয়া নিব্বাম নামটা তার সার্থক। ছোটবেলা থেকেই কৌশানী বড্ড চাপা স্বভাবের। তার মুখ তার মনের আয়না নয়, এটা কৌশানীর নিজস্ব একটা গর্বের জায়গা ছিল। হয়তো বাড়ির উপরে রাগ করে কিছু না-খেয়ে সটান চলে এসে ক্লাসের পরে ক্লাস করছে, কেউ বুঝতে পারেনি। উল্টে ঢেকুর-ঢেকুর তুলে ফেলায় বন্ধুরা বলত, “আজ হেঁবি সাঁটিয়েছিস মনে হচ্ছে? হ্যাপি অন্নপ্রাশন ডে নাকি রে?” গৌরবও সবার সঙ্গে খিল্লি করত, কিন্তু টিফিন টাইমে জোর করে কৌশানীকে ক্যান্টিনে ঢুকিয়ে কেক, প্যাটিস, কলা, সেন্ডে ডিমের অর্ডার দিত।

“এত কিছু অর্ডার দিলি? খেয়ে আসিসনি? নাকি কাল থেকে শীতলার উপোস করছিস?”

জবাব আসত, “আমি খাবার নিয়ে কোনও ঝামেলা করি না। আয়াম আ গুড লক্ষ্মী ছেলে। খায়নি একটা পাগলি মেয়ে। তাকে ধোলাই দিয়ে না-খাওয়ালে, সে খায় না। তাই সঙ্গে করে বেতও এনেছি। দেখি তার কত কেরদানি!”

গৌরবের বলার ভঙ্গিমায়ে এমন একটা ছেলেমানুষি ছিল, না হেসে থাকা যায় না। হাসি থামলে কৌশানী প্রশ্ন করত, “আর তাতেও যদি সে না খায়? মার সহ্য করার ক্ষমতা অর্জন করে?”

“তা হলে? তা হলে একটা ছোট্ট কাজ,” বলেই ছোঁ মেরে কৌশানীর হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে সেটা খুলে ঘটতে বসে যেত গৌরব। মুখে চলত ধারাভাষ্য, “একটা টিপের পাতা, দুটো লিপস্টিক, একটা আই লাইনার, একটা ফেস পাউডার, দুটো-একটা ক্রিমের কৌটো, খুচরো পয়সা, নগদ দশ হাজার টাকা, তিনটে ক্রেডিট কার্ড, বাবা লোকনাথের ল্যামিনেট-করা একটা পুঁচকে ফোটো আর একটা দামি মোবাইল।”

কৌশানী মৃদু হাসে। জানে গৌরবের উচ্চারিত একটা শব্দও সত্যি নয়। হ্যাঁ, থাকার মধ্যে আছে বেশ কয়েকটা পেন, একটা ডায়েরি, একটা ছোট টর্চ, কিছু খুচরো টাকা... সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হবে আর আছে

একটা স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্যাকেট। গৌরব সেটা দেখেছে, দেখেছে আরও অনেক কিছুই, কিন্তু সবার সামনে উচ্চারণ করেছে কিছু কাল্পনিক জিনিসের নাম। এ রকমই ছিল গৌরব। সে অবাক হত, “আমি খেয়ে আসিনি, তুই বুঝলি কী করে?”

ব্যাগ ফেরত দিয়ে তার নির্লিপ্ত উত্তর আসত, “তোকে বুঝি, তাই।”

তার পর আর কী? এক দিন মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখেছে পাশাপাশি, হাত ধরাধরি করে। আর-এক দিন নির্জন কলেজ লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ান ভদ্রমহিলার চোখ এড়িয়ে টুকুস করে একটা চুমু। সেই চুমুতে কোনও জোর ছিল না, কোনও আশ্রয় ছিল না। দু’জনেই দু’জনের দিকে ঠোঁট বাড়িয়েছিল। ব্যস! তার পর কী থেকে যে কী হয়ে গেল। কৌশানীর মনে হয়তো ভালবাসা বাসা বাঁধছিল, হয়তো গৌরবেরও। কিন্তু মুখে বলা হয়ে ওঠেনি। এক দিন কলেজজীবন শেষ হল। যোগাযোগটা ছিলই। তার পর গৌরব এক দিন একটা বেসরকারি চাকরি পেয়ে গেল ধর্মতলার কাছাকাছি বা সামান্য দূরের এক অফিসে। দেখা করতে বলেছিল রিজেন্ট পার্কের কাছে, “চলে আয়, ট্রিট দেব।” কৌশানী গিয়ে দেখে, গৌরব হাজির হয়েছে একটা ঠোঙা হাতে নিয়ে।

“নে, তোর ট্রিট!”

“এতে কী!”

খুলে দেখে এক গাদা শিঙাড়া। কৌশানী হতবাক। শিঙাড়া দিয়ে কে ট্রিট দেয়! তার চাইতেও বড় কথা, ও কী করে জানল, কৌশানীর প্রিয় খাবার শিঙাড়া? এটা তো ওর জানার কথা নয়। ভুরু নাচিয়ে গৌরব বলেছিল, “রহস্য, রহস্য! এক দিন বলব।”

কারণটা আর জানা হয়ে ওঠেনি কৌশানীর। এক দিন গৌরবদের অফিস যে বিল্ডিংয়ে, তাতে আগুন লাগল। অধিকাংশেরই তেমন কিছু হল না। শুধু অল্প কিছু মানুষ পুরো ঝলসে গেল। গৌরবকুমার পাল তাদের মধ্যে একটি নাম। ঝলসে গেল কৌশানীও, মনের আনাচকানাচে। নাহ, অন্যদের মতো সে কাদিতে কাদিতে দৌড়ে যায়নি সে দিন হাসপাতালে। সারা দিন ঘরে বসে বসে আকাশ দেখেছে।

প্রজ্ঞাপারমিতা ফলের রসের গ্লাসের দিকে হাত বাড়ালেন, “বুঝলাম। তার মানে হচ্ছে, এক সময় ছিল। এখন নিশ্চয়ই সেপারেশন। নো ডাউট স্যাড ফ্যাক্ট। কারণ আমি জানতে চাইছি না, কারণ সেটা আমার কোনও কাজে আসবে না। জানো, কৌশানী, জীবনে যা কিছু দুঃখের, যা কিছু কষ্টের, আমি তার থেকে হাজার হাত দূরে। যাক গে! আমি জিজ্ঞেস করলাম এই কারণে যে, এই বয়সের মেয়েরা বাইরে চাকরি করতে এলে বাবা-মা যতটা চিন্তিত হয়, বয়ফ্রেন্ডরা তাদের চেয়ে বেশি উতলা হয় আর শুধু হয়েই ক্ষান্ত থাকে না। তারা দৌড়ে আসে মেয়েটির চাকরির জায়গায়, বারে বারে আসে, সে হাওড়া হোক বা গাদিয়াড়া। এসে এক গাদা টেনশন দিয়ে চলে যায়। তাতে লাভের লাভ কিছু হয় না। বরং কাজের ক্ষতি হয়। রুমবুমের ছিল। কাজ করবে কী, সারা দিন চোখ সোঁটে থাকত মোবাইলে, মন পড়ে থাকত কখন কৃষ্ণের বাঁশি বাজবে। আমি ওয়ানিং দিয়েছিলাম। কাজ হয়নি। তার আগে একটি মেয়ে, শরণ্যা। তারও সেই একই সিনড্রোম। একটি ছেলে, সেই আসানসোল থেকে চলে আসত। অ্যাক্স আ রেজাল্ট, যতসব ভুলভাল অ্যাকাউন্টস। চার্টার্ডের কাছে গিয়ে আমার লজ্জার এক শেষ। বোঝো কাণ্ড!”

সাহেবদের মতো সাত সকালে পেট পুরে খাওয়া কৌশানীর অভ্যেস নেই। তার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে খেয়াল করল, প্রজ্ঞাপারমিতা কিন্তু বেশ খেলেন। শেষে এক মগ ফলের রস একেবারে ঢক ঢক করে ফিনিশ। হয়তো সাহেবি কেতায় মানুষ। ব্রেকফাস্ট হেভি করতে পছন্দ করেন। আরও একটা জিনিস খেয়াল করল। তারা যত ক্ষণ খাচ্ছে, ঘরের দরজার কাছে ঘাড় নিচু করে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে দণ্ড। আবার তার দেহ ঝুঁকে গিয়েছে। কাঁধে একটা সাদা তোয়ালে। কৌশানী ভাবল, ভারী বশব্দ তো! আক্ষরিক অর্থে ভূত বোধ হয় একেই বলে। নাকি প্রজ্ঞাপারমিতা খুব কড়া এমপ্লয়ার? দণ্ডের ব্যাপারটা ভয়েরও কারণে হতে পারে।

খাওয়া শেষ হতেই প্রজ্ঞাপারমিতা হাত বাড়ালেন। দণ্ড এগিয়ে

এল তোয়ালে নিয়ে। হাত মুছে প্রজ্ঞাপারমিতা দেওয়াল-ঘড়ির দিকে তাকালেন, “হাতে আধ ঘণ্টা আছে। যাও। আর-এক বার ফ্রেশ হয়ে ড্রেস চেঞ্জ করে নাও।”

ড্রেস চেঞ্জ! সে তো দিব্যি একটা নীল টপ আর কেপ্তি পরে আছে। নিজের বাড়িতে সে এগুলোই পরে। প্রজ্ঞাপারমিতা বুঝতে পেরে হাসলেন, “এটা আমার বাড়ি। বাট তোমার অফিস। তুমি কলকাতার কোনও অফিসে জয়েন করলে কি এই ড্রেসে যেতে? ভাল কথা, তোমার ফিফটিন কে হলে চলবে?”

“ফিফটিন কে! মানে!”

“আরে হাজার পনেরো। চলবে তো? চলার তো কথা। দেখো, তোমার ফুড অ্যান্ড লজিং কিন্তু ফ্রি। এটা মাথায় রেখো।”

মুখে কিছু থাকলে নির্ঘাত বিষম খেত কৌশানী। পনেরো হাজার টাকা মাইনে! ভদ্রমহিলা বলেন কী! প্রজ্ঞাপারমিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “এর চেয়ে বেশি চেয়ো না। আপাতত। মাস ছয়েক কাজ এগোক। আমিও ব্যবসা বাড়াই। তার পর গ্যাজুয়ালি...”

হাত-মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে এসে বিছানার উপরে ধপ করে বসে পড়তেই মনে পড়ল কাল রাতের ঘটনাটা। সওয়া ন’টার মধ্যে রাতের খাবার শেষ করে সে ফোন করেছিল বাবার মোবাইলে। বাড়িতে বাপি ছাড়া বোনের কাছেও একটা মোবাইল আছে। সেটা কিনে দিয়েছে বাপিই। মাস চারেক আগে। প্রথমে শুনেছিল ভাল ফল করার জন্য কোটিংয়ের স্যর তাকে উপহার দিয়েছে। তার পর এক দিন মুখ-পাতলা বোন বলে ফেলেছিল, ফোনের আমদানির পিছনের কাহিনি। দিদির কাহিনি তার নিজের চোখে দেখা। ফলে গর্বের জায়গাটা সে চেপে রাখতে পারেনি। সব শুনে অনেক ক্ষণ থম মেরে বসেছিল কৌশানী। সে তো নিজের টাকাতেই প্রথম বার ফোন কিনেছিল, তাতেই বাপি-মা যা করেছিল! পরে অবশ্য ফের একটা মোবাইল কেনে সে। তবে লুকিয়ে। বাড়িতে ঢোকান আগে ফোন সুইচড অফ করে ব্যাগে চালান করে দিত। আবার বাইরে বেরোলে অন করে নিত। আর কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটুক, আর কোনও ঝামেলা, তার সহ্য হত না।

বাপি ফোনটা ধরেই প্রথম প্রশ্ন করেছিল, “এটা কার নাম্বার?”

মানে? বাড়ির বড় মেয়ে কোথায় আছে, এত রাত হয়ে গেল এখনও কেন বাড়ি ফিরল না, আজ ফিরবে, না কাল... এই সব জ্ঞানার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে হল না বাপির?

“এখানকার এক জন চেনা ভদ্রলোকের।”

শুনেই ফোনটা মাকে চালান করে দিয়েছিল। তার পর মা যা বলল, তাতে একটা মেয়ের বাড়ি ফেরার ইচ্ছেটাই মরে যাওয়ার কথা।

“যাওয়ার সময় বললি পিকনিকে যাচ্ছি, এখন বলছি চাকরি পেয়েছি। মামাবাড়ির আবদার নাকি? আমি কিছু বুঝি না, না? আমাদেরও বয়স ছিল, নিরুমা। বাদ দে, যার সঙ্গে মুখ পোড়াতে গিয়েছি তাকে নিয়ে থাক।”

ফোনটা কেটে দিয়েছিল মা। ফোনের অন্ধকার স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের কোণ জ্বালা করে উঠেছিল। অথচ দেখো, এই প্রজ্ঞাপারমিতা নামের মহিলা, যাকে সে দু’দিন আগে চিনতই না, তাকে কত যত্ন করে খাওয়াচ্ছেন, থাকতে দিচ্ছেন আবার মাস ফুরোলে পনেরো হাজার! এক অন্ধ আবেগে তৎক্ষণাৎ কৌশানী মনে মনে স্থির করল, থাকুক ওরা বোনকে নিয়ে। সে যাবে না। সে কিছুতেই বাড়ি ফিরে যাবে না। এখানে থাকার জন্য সে জানপ্রাণ লাগিয়ে দেবে। দেখা যাক, শেষ অবধি কী হয়।

সেই কম্পিউটার আর অজস্র ফাইল-শোভিত ঘরটিই যে তার অফিস, আগের দিনই আন্দাজ করেছিল কৌশানী। আজ সেই ঘরটিই তার কাজের জায়গা বলে দেখিয়ে দিল দণ্ড। সালোয়ার, কামিজ আর ওড়না পরে অফিসঘরে উপস্থিত হতেই প্রজ্ঞাপারমিতা হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, “টু মিনিটস, ফিফটিন সেকেন্ডস আলিয়ার। গুড। টেক ইয়ার সিটা।”



কম্পিউটার খোলাই ছিল। প্রথমেই প্রজ্ঞাপারমিতা তার হাতে এক তাড়া কাগজ ধরিয়ে দিলেন। বললেন, “এটা একটা প্রপারটি ডিড। ভাবছি লজটাকে অন্য জায়গায় মুদ করাব। আদারওয়াইজ আর-একটা টুরিস্ট লজ খুলব। একটা জায়গা পেয়েছি। এটা স্যাম্পল ডিড। তুমি এই কাগজগুলোয় যা লেখা আছে, সব আস্তে আস্তে টাইপ করো। আজ শনিবার। আমার জন্য স্যাটারডে খুব লাগি। লজের হিসেব তোমাকে পরে বোঝাব। শোনো, তোমার হাতে অচেল সময়। আমি বেরিয়ে যাচ্ছি একটা কাজে। ফিরব বুধবার। দশ তারিখ। তার মানে তোমার হাতে চার দিন। তুমি হয়তো ভাববে অনেক সময়। এই ক’টা পাতা টাইপ করতে কত আর সময় লাগবে? এক-দু’দিন কাজ না-করলেও চলে যাবে। কিন্তু আমার টাইম সেন্সের মতো আমার কাজের ডিমান্ডও অ্যাকিউরেট। আই লাভ পারফেকশন অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি। বুঝলে? আমার এই ডিডটা নির্ভুল চাই। একটা সিঙ্গেল স্পেলিংও যেন ভুল টাইপ না হয়। যদি এক দিনের মধ্যেও হয়ে যায়, তবুও বাকি তিন দিন ধরে রিভিশন দেবে। আমি কিন্তু দেখব না আর। যা তুমি দেবে, আমি একেবারে উকিলের হাতে তুলে দেব। তার পর সে জায়গায় জায়গায় কারেকশন করে দিলে, ফের তুমি দেখে দেখে কারেকশন করবে। বুঝলে কৌশানী? উকিলের কাছে যাওয়া কপিতে একটা ওয়ার্ড মিসটেকও আমি অ্যালাও করব না। মনে থাকবে?”

কৌশানী উল্টেপাল্টে দেখল, প্রায় পনেরো-ষোলো পাতার একটা ডিডের ফোটোকপি। সে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “এই কম্পিউটারটা ইদানিং ডিসটার্ব করছে। কোনও সমস্যা হলে দণ্ডকে বলবে, সে লোক আনিয়ে নেবে।”

প্রজ্ঞাপারমিতা ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও দাঁড়িয়ে গেলেন, “আর-একটা কথা। আমি নোংরা জামা-কাপড় বরদাস্ত করতে পারি না। তুমি যদি সঙ্গে বেশি স্টক না এনে থাকো, তা হলেও দণ্ডকে বলবে। সে আমার ঘর খুলে দেবে। আমার এক আলমারি-ভর্তি ব্যবহার না-করা ড্রেস মেটেরিয়ালস রয়েছে। আগে আমি তোমার মতোই স্লিম ছিলাম। সেই সময়কার ড্রেস। প্রচুর কিনেছিলাম বিয়ের পর পর। আর পরা হয়ে উঠল না। তার পর থাইরয়েড ধরা পড়ল, মুটিয়ে গেলাম। যাক গে। তুমি সেখান থেকে তোমার পছন্দের রং আর স্টাইলের বেছে নিয়ো। ভাল কথা, দণ্ড তোমাকে কলিং বেলটা দিয়েছে?”

কৌশানীর মনে পড়ল কাল রাতের সেই কালো রঙের বস্তুটার কথা। সেটার দরকার পড়েনি। সে বলল, “আমার ঘরেই আছে।”

“দণ্ড নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। বাড়ির মধ্যে ওকে খুঁজে না-পেলে বেল-এ চাপ দিয়ো।”

আর কোনও কথা না-বলে আচমকাই প্রজ্ঞাপারমিতা ঘর ছেড়ে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন। কৌশানী অবশ্য ঠিক করেই ফেলল, অন্যের জিনিসপত্র সে ব্যবহার করতে পারবে না, যতই মুখে বলুক আনইউজড। তার চেয়ে রোজকার ড্রেস রোজ ধুয়ে ফেললেই তো পরিষ্কার! কৌশানী প্রথমেই কম্পিউটার ড্রাইভগুলো নেড়েচেড়ে দেখল। খুবই কম শক্তিশালী মেশিন। বেশ পুরনো বলেই মনে হচ্ছে। একটা ড্রাইভে বেশ কিছু ফোটো দেখতে পেল সে। অনেকগুলো জায়গার ফোটো, বলা ভাল খালি জমির ফোটো। হয়তো পরবর্তী হোটেলের জন্য দেখে রাখা জায়গাগুলোর ফোটো। বেশ কিছু পুরুষ আর মহিলার ফোটোও দেখতে পেল। সবই পাসপোর্ট ফোটো। এরা কারা? সে আন্দাজ করল, হয়তো লজে যারা চাকরি করতে আসে, তাদের একটা করে ফোটো রাখা হয়। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। অনেক অফিসেই আজকাল রাখছে। কেউ কেউ আবার স্টাফদের প্যান কার্ড, ভোটার আইডি কার্ডের স্ক্যান করা কপি রেখে দেয়। একটা ড্রাইভে বেশ কিছু ফাইল খুঁজে পেল, কিন্তু সেগুলো খোলার মতো সফটওয়্যার এই কম্পিউটারে নেই। মরুক গে, তার কাজে এ সব আসবে না। কৌশানী ডিডটার উপর থেকে স্টেপলার পিন খুলে নিয়ে প্রথম পাতাটা টেবিলের উপরে একটা পেপারওয়াইট চাপা দিয়ে চার দিকে তাকিয়ে একটা স্কেল খুঁজতে লাগল। পেল না। দণ্ডকে ডাকবে? যাক গে। কাজ হয়ে যাবে। কৌশানী একটা ফ্রেশ ওয়ার্ড ফাইল খুলে মার্জিন সেটআপ করে নিয়ে লিখতে শুরু করে দিল, “This

Agreement to Sale of Land property is executed at...”

কৌশানী মনঃস্থির করল, প্রথম থেকেই সে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দেখে প্রতিটা অক্ষর টাইপ করবে। তা হলেই বেশি বার রিভিশন দিতে হবে না। খুব ধীরে ধীরে, কি-বোর্ড দেখে দেখে, দু’পাতা টাইপ করতেই দুপুর হয়ে গেল। তবুও টাইপ করতে করতে মাঝেমধ্যেই টুকটাক ভুল করে ফেলছিল। টাইপ করার অভ্যেস তার নেই। ফলে বার বার কাটতে হচ্ছিল। ফের লিখছিল। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে চশমাটা চোখ থেকে খুলে চোখ বুজল। ব্যাপারটা যত সোজা মনে হয়েছিল, ঠিক ততটা নয়। যারা আদতে টাইপিষ্ট, তাদের দেখে দেখে টাইপ করতে হয় না।

দুপুরে ডাইনিং রুমের টেবিলে একা একা খাওয়া শেষ করার পরে তখনই আবার কাজে বসতে ইচ্ছে করছিল না কৌশানীর। বন্ধুদের সঙ্গে ডিডিয়ো কনফারেন্স কলে কথা বলতেও ইচ্ছে করছে না। আসলে এই জায়গাটা সকাল হোক বা দুপুর অথবা সন্ধ্যা, সব সময় এতটাই চুপচাপ যে, নিজেরও ইচ্ছে হয় না সেই অখণ্ড নিস্তব্ধতা ভাঙতে। ঘরের মধ্যে খালি পায়ে হাঁটলেও যেন সেই শব্দ তার কানে পৌঁছোচ্ছিল। ডিডিয়ো কল করলেই মিঠি আর সৌজিতা এত চেষ্টা করে কথা বলবে যে, চার দিকের শান্তি বিঘ্নিত হবে। কৌশানীরও মানসিক শান্তিও বিঘ্নিত হয়েছিল একটু আগেই।

প্রথমেই সে পুরো বাড়িটা এক পাক ঘুরে নিল। যা বুঝল, দণ্ড বাড়িতে নেই। লোকটা তো বেশির ভাগ সময়েই বাড়ি থাকে না। তা হলে রান্নাবান্না করে কখন? আর বাড়ির ঝাড়পোঁছ? কোনও ঘরের কোনও আসবাবই তো তিল মাত্র ধুলো লেগে নেই। কে পরিষ্কার করে? কখন করে? যাক গে। এটা তার ভাবার বিষয় নয়। তবে একটা ব্যাপার খেয়াল করেছে সে। ম্যাডাম সামনে থাকলে দণ্ড তার সঙ্গে যে রকম মোলায়েম ব্যবহার করে, ম্যাডাম না-থাকলে ততটাই রুক্ষ। আজ দুপুরের ঘটনা। কৌশানীর মাছের ঝোল আর-একটু লাগত। দণ্ডকে আশপাশে দেখতে না-পেয়ে সে ঐটো হাতেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিল। রান্নাঘরের দরজার পা রাখতেই সে বুঝতে পারল, মেঝেয় উবু হয়ে বসে দণ্ড কিছু-একটা করছিল, তার পায়ের আওয়াজে ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখের ইঙ্গিত রুঢ়।

“দণ্ডকাকু, মাছের ঝোল... হবে কি আর-একটু?”

কী আশ্চর্য! এর কথাই ম্যাডাম বলেছিল, কিছু দরকার হলেই একে খবর দিতে! কৌশানীর কথা শুনে হ্যাঁ বা না কোনও উত্তরই দিল না লোকটা। শুধু আঙুল দিয়ে একটা ঢাকা-দেওয়া কড়াই দেখিয়ে দিল। কৌশানীর মনে লাগল আচমকা। রাগ দপ করে মাথায় উঠে এল। তাকে আশ্রিতা মনে করেছে নাকি লোকটা? দরকার নেই তার ঝোলের। সে দুম দুম করে পা ফেলে ফিরে এসেছিল ডাইনিং টেবিলের কাছে। কিছু ক্ষণ থম মেঝে বসে রইল। তার পর বাকি খাবারটুকু খেয়ে ফেলে অফিসে চলে গেল। মাথা ঠান্ডা হলে সে ভেবে দেখল, দণ্ড এমন কিছু একটা করছিল, মোক্ষম মুহুর্তে কৌশানী উপস্থিত হওয়ায় তার কাজে বিঘ্ন ঘটবে। তার ফল এই রুঢ় ব্যবহার। কৌশানী ঠিক করল, এর পর থেকে, দরকার পড়লে, সে বেল বাজিয়েই দণ্ডকে ডাকবে। তাতেও কাজ না হলে, ম্যাডাম তো আছেনই।

কিছু ক্ষণ বসে থেকে সে বাইরে এসেছিল এবং পুরো বাড়িটা ফাঁকা পেয়েছিল। লোকটি কি বিড়াল? কখন আসে, কখন বেরিয়ে যায়, দরজা বন্ধ বা খোলারও কোনও শব্দ হতে নেই নাকি?

কৌশানী সদর দরজার কাছে পৌঁছে দেখল দরজা ভেজানো। সে বাইরে এসে চার দিকে এক বার তাকাল। দুপুরের রোদ খাঁ-খাঁ করছে। উকি দিয়ে আশপাশে সুলেমানকে দেখতে না-পেয়ে সে বাড়ির পিছন দিকে এল এবং থমকে গেল। বাড়ির পিছনে দুটো ছোট গাড়ি আর-একটা বড় গাড়ি দাঁড় করানো। এই গাড়িগুলো কার? প্রজ্ঞাপারমিতার? কিন্তু তাঁকে তো অন্য একটা দুধ-সাদা গাড়িতে চড়তে দেখেছিল সে। সেই গাড়িটা কিন্তু এখানে নেই। কৌশানী মাথা ঝাঁকাল। নিজেকে বোঝাল, কী সব উল্টোপাল্টা চিন্তায় সে নিজেকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। গাড়িগুলো কার, দণ্ড কেন এই রকম হরকত করে, সুলেমান আসলে কে, ফাইলে কেন ধুলো... সে কি গোয়েন্দা? তার কী দায় পড়েছে এই সব নিয়ে মাথা

ঘামানোর? তার চেয়ে যে কাজটা করতে সে এসেছে, তাতে কনসেন্ট্রেন্ট করলে কাজ দেবে। কৌশানী ঠিক করল, আর কোনও বাড়তি ব্যাপারে সে মাথা ঘামাবে না।

গাড়িগুলোকে পিছনে রেখে পাঁচিলের কাছে এসে দেখল দেওয়াল ভেঙে সেখানে মানুষের যাতায়াতের মতো একটা রাস্তা করা হয়েছে। সেই রাস্তা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই সে মুগ্ধ হয়ে গেল। সামনেই একটা ছোট সুন্দর পুকুর। পুরো পুকুরটা পদ্ম ফুলে ছেয়ে আছে। যেমনটি সে আসার পথে দেখেছিল। পুকুরে নামার একটা ঘাটও সে দেখতে পেল। ইস। পুকুর দেখলেই তার সাঁতার দিতে ইচ্ছে করে। আগে তারা চাষিপাড়ায় ভাড়া থাকত। ওখানে একটা পুকুর ছিল। বেশ নোংরা। তবুও সেই সময় কত বার যে সাঁতরে এ পার ও পার করেছে পুকুরটাকে। কৌশানীর খুব ইচ্ছে করছিল পুকুরে নেমে একটা পদ্ম ফুল তুলে আনে। কিন্তু যদি ম্যাডামের মানা থাকে? আচ্ছা, এই পুকুরটা তো বাড়িভারির বাইরে। তার মানে ম্যাডামের নয়। আবার হতেও তো পারে। তা হলে কি সে নামবে? ক্রিসীমানায় তো কেউ নেই। চট করে ঘরে ফিরে চেঞ্জ করে নিলেই হল।

মোটামুটি যখন সে মনঃস্থির করেই ফেলেছে, ঠিক তখনই একটা পায়ের শব্দে ফিরে দেখল এক গাদা জামা-কাপড় হাতে বুলিয়ে দণ্ড আসছে। প্রথমে সে মাথা নিচু করেই আসছিল, পুকুরের একেবারে কাছে এসে কৌশানীকে দেখে সে থমকাল। ভুরু উঠিয়ে কিছু ক্ষণ দেখল। কিছু কি বলতে চায়? মাথা নামিয়ে দণ্ড নেমে গেল ঘাটের দিকে। কৌশানীর হাত কামড়াতে ইচ্ছে হল। ইস। এত ক্রিস্টাল ক্লিয়ার পদ্ম বিলে দণ্ড জামা-কাপড় কাচে? দূর। তার জলে নামার ইচ্ছেটাই মাটি হয়ে গেল।

দণ্ড এক মনে কাপড় কাচছে। কৌশানী ঠিক করেই ফেলল, ঘাট থেকে উঠে এলে এই লোকটার সঙ্গে আলাপ জমাতে হবে। একা এই বাড়িতে এই লোকটাকেই এক মাত্র কথা বলার যোগ্য মনে হচ্ছে। তা ছাড়া জলে থাকতে হলে কুমিরের সঙ্গে বিবাদ চলে না। কিন্তু কী আশ্চর্য! দণ্ড যেন বুঝতে পেরেছিল। ঘাট থেকে উঠে, ধোয়া জামা-কাপড় দু’হাতে আঁকড়ে ধরে, যে গতিতে এসেছিল, তার দ্বিগুণ গতিতে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

তবুও কৌশানী চেষ্টা করেছিল থামানোর। প্রৌঢ় এক বার খর চোখে তার দিকে তাকিয়ে, “চা, চারটের সময়,” বলেই ফের হন হন করে চলে গেল। যাচ্চলে! সত্যিই লোকটার ব্যবহার ভারী অদ্ভুত!

আবার পাঁচিলের এ দিকে আসতেই বাড়িটার উপর দিকে চোখ গেল, তার পর ছাদের দিকে আর তখনই মনে হল কে যেন চট করে সরে গেল। কে ছিল ছাদে দাঁড়িয়ে? প্রথমেই সুলেমানের মুখটা ভেসে উঠল। পর ক্ষণেই মনে হল, নাহ, এক বালকের জন্য দেখা ওই মুখটা বেশ ফরসা। মুখে দাড়ি নেই। কৌশানী, আর ভাববে না মনঃস্থির করেও, আবার ভাবনায় পড়ে গেল। তা হলে দুটো পয়েন্ট পরিষ্কার হল। এক, এই বাড়িতে ছাদ আছে, কিন্তু ছাদে যাওয়ার কোনও সিঁড়ি তো চোখে পড়েনি। এক, যদি বাড়ির বাইরে থেকে ছাদে যাওয়ার কোনও সিঁড়ি না থাকে। নিশ্চয়ই আছে, নইলে ছাদে যেই থাকুক, সে চড়ল কী করে? রেনওয়াটার পাইপ বেয়ে? চোর-টোর নয় তো? আর দ্বিতীয় ভাবনাটা আরও চিন্তার। এর অর্থ, বাড়ির ভিতরে দণ্ড ছাড়াও আরও কেউ থাকে। কিন্তু কোথায়? কোন ঘরে? তার এই বাড়িতে কেটেছে চব্বিশ ঘন্টারও বেশি। তা হলে এই দ্বিতীয় ব্যক্তির দেখা বা নিদেনপক্ষে গলার শব্দও সে পায়নি কেন?

কারণ যা-ই হোক, লোকটা তাকে নজরে রেখেছিল। কিন্তু নিজেকে কৌশানীর নজর থেকে বাঁচাতে চায়। কে ও?

বাড়িতে ফিরে এসে গোটা বাড়িটা তন্নতন্ন করে খুঁজল, আবার বাইরে গিয়েও পুরো বাড়িটার চার দিকে চক্কর দিয়ে এল কৌশানী, শেষে নিজের অফিস ঘরে ফিরে এসে খোলা কম্পিউটারের স্ক্রিনের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল। ব্যাপারটা কী? বাড়ির ভিতরে-বাইরে কোনও সিঁড়ি বা মই নেই, অথচ লোকটা ছাদে উঠল কী করে? যদি চোর-টোর হয়? তাই এক বার ভাবল, দণ্ডকে জানাবে কি না, শেষে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

দেখতে দেখতে বুধবার চলে এল। প্রজ্ঞাপারমিতার ফিরে আসার দিন। এর মধ্যেই কম করে পাঁচ বার ম্যাডাম হোয়াটসঅ্যাপ করেছেন, “কাজ এগোচ্ছে?” কৌশানী জবাব দিয়েছে, “হ্যাঁ ম্যাডাম। এক্সপেক্টিং উইদিন টিউসডে।”

এটা ঠিক। মঙ্গলবারের মধ্যেই কৌশানী পুরো ডিউটা শুধু টাইপ করেই ফেলেনি, বার-চারেক রিভিশনও দিয়ে দিয়েছে। একেবারে দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন সমেত। প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি লাইন মিলিয়ে দেখেছে, বার বার। এ কথা সত্যি যে, সব আইনি শব্দের অর্থ তার জানা নেই, জানাও সম্ভবও নয়, তবুও বানান মিলিয়ে হুবহু অক্ষর বসিয়ে দিতে পারলেই হল।

এই তিন দিনের মধ্যে দুটো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। প্রথমটা পরশু, সোমবার সকালে। পিয়ালি আইল্যান্ডের বাকি জায়গাগুলোর ব্যাপারে কৌশানীর কোনও জ্ঞান নেই, কিন্তু সে জায়গায় ম্যাডামের এই বাড়িটা, এই দিকটার প্রাকৃতিক শোভা এতটাই ভাল যে, বেশির ভাগ সময়ই বাড়ির ভিতরের থেকে বাইরে থাকতে কৌশানীর বেশি ভাল লাগে। অবশ্য গরমটা এই দু’দিনে অসহ্য রকমের বেড়েছে। দুপুর বারোটোর পরে ইচ্ছে হলেও বাইরে যাওয়া যায় না। রবিবার রাতের খাবার সার্ভ করার সময় দণ্ড নিজের মনেই বলে ফেলল, “কালবোশেখ আসবে মনে হয়।”

কৌশানী সুযোগ খুঁজছিল লোকটির সঙ্গে কোনও প্রকারে আলাপ জমানোর। এত ক্ষণে সুযোগ এসেছে বুঝতে পেরে সে বলল, “কী করে বুঝতে পারলেন?”

দণ্ড কিন্তু নিমেষে নিজেকে গুটিয়ে নিল। “আমরা পারি,” জাতীয় সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে। কৌশানী অবাক হয়ে তাকিয়েছিল দণ্ডের দিকে। লোকটা তাকে শত্রুপক্ষ ভাবছে নাকি?

কৌশানীর আশ্চর্য হওয়ার আরও সুযোগ ছিল। দণ্ডের কথা সত্য প্রমাণিত করে সত্যিই সে দিন রাতে ঝড় এসেছিল। বাপ রে! তার কী আওয়াজ! কৌশানী সে দিন টের পেয়েছিল শহরের ঝড় আর গ্রামের ঝড়ের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। শৌ শৌ শব্দ আর কানে তাল-ধরানো মুহূর্তে বাজ পড়ার শব্দে ক্ষণে ক্ষণে তার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল। প্রতি মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, এই বার এই বাড়িটাই হয়তো উড়ে চলে যাবে। একটা প্রাগৈতিহাসিক দৈত্য যেন আছড়ে আছড়ে বাড়িটাকে ভেঙে মাটিতে গুঁড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। কৌশানীর খুব ইচ্ছে করছিল, এক বার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখে, কিন্তু সেই মুহূর্তে আধ-ভেজা অবস্থায় ঘরে উপস্থিত হয়ে দণ্ড ইশিয়ারি দিয়ে গিয়েছিল, কৌশানী যেন কিছুতেই ঘরের বাইরে না যায়। “বেরোলে?” এমন আজব প্রশ্নে খর দৃষ্টিতে তাকিয়ে দণ্ড চলে গিয়েছিল, মুখে কিছু বলেনি। বাড়ির বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার দরজা দড়াম শব্দে বন্ধ হয়ে যাওয়া টের পেয়েছিল।

বজ্রপাত থামার পরেই নামল বৃষ্টি। কৌশানী ভেবে দেখল, একেই বোধ হয় বলে মুখলধারে। সঙ্গে বড় বড় শিলও পড়ছিল বোধ হয়। নইলে বৃষ্টি এত সশব্দে হতে পারে? কৌশানী আর ভাবতে পারছিল না। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছিল সে। বাইরের দরজা ভিতর থেকে লক হয়ে গেছে অটোমেটিকালি। বিছানায় শুয়ে শুয়েই সে টের পেল, তুমুল বৃষ্টির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এক টানা শৌ শৌ হাওয়া চলেছে বাইরে। হাওয়ার দাপটে জানালাগুলো কেঁপে উঠছিল বার বার। কৌশানীর ঘুম আসছিল না। এক সময় আচমকা মনে হল, কারা যেন তর্কাতর্কি করছে। বাড়ির বাইরে না ভিতরে, ঠিক ঠাহর করতে না-পারলেও দুটো সম্ভাবনাই অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল। কারণ এই দুনিয়া-ভাসানো রাতে কারা আর বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে টেচামেচি করতে যাবে? আর বাড়ির ভিতরে তো সে একা। সে খোয়াল করেছিল, দণ্ড আদতে এই বাড়িতে থাকে না। বাড়ির ডান দিকের খোলা জায়গায় তার নিজস্ব দু’কামরার কোয়ার্টার।

অন্য কোনও শব্দ হবে ভেবে, ঘুমোনার চেষ্টা করেও না-পেরে সে উঠে বসল। নাহ, বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে মানুষের কথাবার্তাই মনে হচ্ছে যেন। সে বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজায় কান পেতেছিল। তখনই মনে হয়েছিল, তার পাশের ঘরেই কারও মধ্যে কথা কাটাকাটি চলছে। ম্যাডাম

কি ফিরে এলেন নাকি? নাকি পাশের ঘরে সুলেমান আশ্রয় নিয়েছে আর দণ্ডের সঙ্গে কোনও ব্যাপার নিয়ে ঝামেলা বেধেছে। থাক গে, মরুক গে ভেবে, ঘুমের অতলে তলিয়ে যেতে যেতেও কৌশানী এটুকু বুঝতে পারল যে, কথাবার্তা হচ্ছে বেশ উচ্চ স্বরে কিন্তু বাড়বুড়ির আওয়াজে তা চাপা পড়ে যাচ্ছে।

পর দিন সকালে দাঁত মাজতে মাজতে কৌশানী গিয়ে দাঁড়িয়েছিল পুকুরপাড়ে। বাপ রে! বাইরে বেরিয়েই তার পা আটকে গিয়েছিল। আচমকা দেখলে মনে হচ্ছিল গোটা দশেক ঐরাবত দাপাদাপি করেছে গোটা বাড়ির সারা চৌহদ্দি জুড়ে। বেশ অনেকগুলো ফুলগাছের টব সে দেখেছিল পিছনে যাওয়ার পথে। তার একটাও অবশিষ্ট নেই। একটা নারকেল গাছ ভেঙে সোজা এসে পড়েছে বাউন্ডারি-ওয়ালের একাংশকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে। পিছনে গিয়ে আশ্চর্য হওয়ার আরও একটা কারণ পেল সে। পিছনে একটাও গাড়ি নেই। রাতারাতি গাড়িগুলো গেল কোথায়? ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল নাকি? ভাবতেই হাসি পেল তার। পুকুরটার অবস্থা দেখে অবশ্য কান্না পেয়ে গেল কৌশানীর। প্রায় আশি শতাংশ পদ্ম ফুল ছিঁড়ে, উড়ে পুকুর প্রায় ফাঁকা। ইস। প্রকৃতির তাণ্ডব হয়তো একেই বলে।

সে দাঁত মাজতে মাজতে এক মনে পুকুরটার দিকেই তাকিয়েছিল, এমন সময় “হেই হেই হেই হেই...” শব্দে চমকে পুকুর ঘাটের দিকে তাকাল। এর মধ্যে কখন দণ্ড এসে চুপিসাড়ে পুকুরঘাটে নেমেছে খেয়ালই করেনি, আর সেখানেই বিপত্তি। শিলাবৃষ্টিতে ঘাট হয়তো পিছল হয়ে ছিল আর তার উপরে তাড়াতাড়িতে চলতে গিয়ে প্রৌঢ় পা ফস্কেছে। কৌশানী “আরে আরে,” বলতে বলতে ধরতে যাওয়ার আগেই দণ্ড গড়াতে গড়াতে জলে। এমনিতে সে গ্রামের মানুষ, জলে ডুবে যাবে না, কিন্তু বেকায়দায় পিছলে যাওয়ার জন্য পায়ে চোট পেয়েছে, সেটা তার যন্ত্রণাকাতর মুখ আর ঘাটে উঠে আসার অক্লান্ত প্রচেষ্টা দেখেই বুঝতে পারা যাচ্ছিল। হাতের জোরে নিজেকে খানিকটা তুলতে পারলেও জখম পায়ের কারণেই সে উঠতে পারছিল না। যত বার চেষ্টা করছিল, তত বারই ব্যর্থ ককিয়ে উঠছিল। কৌশানী আর বিন্দু মাত্র না-ভেবে জলে বাঁপ দিয়েছিল।

নেহাত দণ্ড রোগাভোগা বুড়ো মানুষ আর জলের নীচে ভার কম থাকে বলেই পিছন থেকে জাপটে ধরে লোকটিকে কোমর অবধি চাগিয়ে তুলেছিল কৌশানী আর বাকিটুকু দণ্ড নিজেই করে নিয়েছিল। ঘাটের পাড়ে বসে, খানিকটা বিশ্রাম নিয়ে, কৌশানীর কাঁধে ভার দিয়েই বাড়ির ভিতরে এসে সোফায় এলিয়ে পড়েছিল দণ্ড। কৌশানী ফ্রিজ খুলে বরফ বের করে পায়ে লাগানোর উপক্রম করতেই প্রৌঢ় হাঁ করে উঠেছিল, কৌশানী শোনেনি। সেই দিন প্রৌঢ় খানিকটা ভেঙেছিল। তার দু’চোখ ভরে উঠেছিল অসীম কৃতজ্ঞতায়। সে হয়তো বুঝতে পেরেছিল, অকুস্থলে কৌশানী না-থাকলে তার সলিলসমাধি নিশ্চিত ছিল। চেষ্টাও কোনও লাভ হত না। সুলেমান একটা বিশেষ কাজে বাইরে গিয়েছিল। ফলে চৌচালেও লাভ ছিল না।

সে দিন দণ্ড বলেছিল বেশ কিছু কথা। জানিয়েছিল, তার এই বাড়িতে চাকরি আজ প্রায় চল্লিশ বছরের উপর হয়ে গেল। বলেছিল, তার আসল নাম খগেন দণ্ডপাট। সেই থেকে সবাই দণ্ড বলে ডাকে। বাড়ি জয়নগরে। বাড়িতে কেউ নেই। একটা মেয়ে ছিল, কার সঙ্গে কে জানে পালিয়ে গেছে। স্ত্রী মারা গেছে। কৌশানী জানতে চেয়েছিল, “আপনি এখানে এলেন কী করে?” প্রৌঢ় ভেঙে কিছু বলেনি, শুধু আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়েছিল। কৌশানীও বুঝতে পেরেছিল, মানুষের, বিশেষত গরিব মানুষের, অসহায়তার কারণ থাকে অজস্র।

পরের ঘটনাটা কাল, অর্থাৎ মঙ্গলবার। তখন বিকেল বিকেল। পুরো ডিভিটার লাস্ট রিভিশনও শেষ। সামান্য দু’-একটা মিসটেক ছিল। সেগুলো ঠিক করে নিয়েই প্রজ্ঞা ম্যাডামকে জানিয়ে দিয়েছিল। কিছু ক্ষণের মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপে একটা ই-মেলের ঠিকানা দিয়ে ম্যাডাম রিপ্লাই করেছিলেন, “এই অ্যাড্রেসে মেল করে দাও।”

এই সেরেছে! কৌশানী বলতে বাধ্য হয়েছিল, “আমার মেল আইডি নেই।”

“স্ট্রেঞ্জ! এখন মোবাইল আর ই-মেল তো কমন ফ্যাক্টর।”

“হ্যাঁ, ম্যাডাম। আসলে করছি-করব বলে... সরি।”

“ডোন্ট বি। বানিয়ে নাও। নিয়ে পাঠাও। আর আমাকেও তোমার মেল অ্যাড্রেসটা মেসেজ করে দিয়ো।”

সেই মুহুর্তে খুব ইচ্ছা করছিল, মিঠি বা সৌজিতাকে এক বার ফোন করে নেয়। আচমকাই গৌরবের মুখটা মনে ভেসে উঠল। যে কোনও কাজে হেল্প চাইলেই বলত, “নিজে আগে চেষ্টা কর, না-পারলে আমি তো আছিই, থাকবও। ডোন্ট ডিপেন্ড অন এনিবডি, অলওয়েজ।”

‘আমি তো আছিই’— কথাটা মনে করে কৌশানী মনে মনে হাসে। কী মিথ্যুক ছিল গৌরবটা।

কৌশানী ঠিক করল, নিজের ই-মেল নিজেই বানাবে। কী এমন হাতি-ঘোড়া কাজ দেখা যাক। সেই কবেকার শেখা বেসিক কোর্সে ই-মেইলিং ছিল, সেটা আজ কাজে লাগল। মিনিট কুড়ির চেষ্টায় নিজের একটা মেল আইডি খুলে প্রজ্ঞাপারমিতাকে জানিয়ে দিয়ে ওয়ার্ড ফাইলটা মেল করতে পারল সে।

দণ্ড এখন টুকটাক কথা বলে তার সঙ্গে। গলার সুর আগের চাইতে অনেকটাই নরম। কম্পিউটারটা শাট ডাউন করে চেয়ারে বসে হাত-পা ছড়াচ্ছিল কৌশানী, সামান্য ঘুম ঘুমও আসছিল। এমন সময় পিছন থেকে দণ্ডের আওয়াজ পেল। সে বাজারে যাচ্ছে, রসুইঘরে তেল, নুন আর হলুদ বাড়ন্ত। কৌশানীর মনে হল, এই শেষ দুপুরে বাড়ির ভিতরে যখন এক প্রকার শ্মশানের নিস্তর্রতা, তখনও দণ্ডের চলাফেরার কোনও শব্দ শোনা যায় না। আশ্চর্য! ভারী আশ্চর্য!

কৌশানী অফিসঘরের মধ্যে খানিক পায়চারি করে বাইরের করিডরে পা রাখল। টের পেল, বাইরে এখন শেষ দুপুরের রোদ আগুন ছড়াচ্ছে। এখন বাইরে যাওয়ার কোনও মানেই হয় না। ঘুম তাড়াতে নিজেই কিচেনে চায়ের জল চাপিয়ে করিডরে আপন মনে হাঁটছিল। এমন সময় তার শোওয়ার ঘরের ঠিক পাশের ঘরের বন্ধ দরজার ভিতর থেকে সে একটা আওয়াজ পেল। কে যেন কী-একটা ভারী জিনিস টেনে সরাচ্ছে। তার পরই চুপচাপ। ঘরের মধ্যে কি কেউ আছে? কৌশানী বন্ধ দরজায় কান পাতল। নাহ, কোনও শব্দ নেই। কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করে সরে আসবে, এমন সময় স্পষ্ট শুনতে পেল মানুষের গলার আওয়াজ। কেউ কিছু বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু বলতে না-পেরে গোঙানির মতো আওয়াজ বেরোচ্ছে। ফের চুপচাপ। কৌশানী দাঁড়িয়েই রইল দরজার বাইরে। এক বার মনে হল, তার কি শোনার ভুল হচ্ছে? খানিক পরে গ্লাস বা বাটি-জাতীয় কিছু একটা পড়ে যাওয়ার অনুচ্চ বনবন শব্দ। ইদুর, বিড়াল নাকি? চার দিকে এক বার তাকিয়ে নিয়ে সে ফের দরজায় কান লাগাল। ঠিক। কোনও ভুল নেই। মানুষের গলায় গোঙানির শব্দ। বিড়াল কি মানুষের মতো গোঙাতে পারে? দু’-এক বার ভেবে সে দরজায় টোকা দিল। নিমেষে ম্যাজিকের মতো শব্দটা থেমে গেল। কৌশানীর মনে হল ভিতরে যে আছে, সেই কি সে দিন ছাদে ছিল? তার পর আর-এক বার টোকা দিয়ে বলল, “কে ভিতরে?”

এর পরে মিনিট দশেক সে দাঁড়িয়েছিল কান খাড়া করে, কিন্তু আর কোনও শব্দ আসেনি। মরুক গে, ভেবে কিচেনে গিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে ড্রিং রুমের জানালায় এসে দাঁড়াল। বাইরে খাঁ-খাঁ করছে। শুধু একটা ঘুঘু পাখি গাছের ডাল থেকে ডালে উড়ে বেড়াচ্ছে। পাখিটাকে দেখে তার মন ফুরফুরে হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু একটু আগের ঘটনাটা তাকে চিন্তায় ফেলেছে।

ঘটনাটা ভুলেই গেছিল কৌশানী। প্রজ্ঞাপারমিতা ফিরলেন তার পরের দিন, বুধবার। ব্রেকফাস্ট টেবিলে দেখা হতেই এক মুখ হাসি নিয়ে বললেন, “গ্রেট, গ্রেট, কৌশানী। মি. তালুকদার, মানে আমার অ্যাডভোকেট, জানতে চাইছিলেন, কে টাইপ করেছে। আমি বললাম। বললেন, সেন্ট পার্সেন্ট অ্যাকিউরেসি। বরং বেশ কিছু ভুল ছিল ওঁর বানান ডিভেই। ওই ডিভের ফোটোকপিটায় কিছু লিগাল মিসটেকস ছিল। সেগুলো উনি ঠিক করছেন। হয়ে গেলে ফের পাঠাবেন। তখন তোমায় দিলে তুমি সেগুলো ঠিক করে নিয়ে। একটাই সমস্যা হতে

পারে তোমার। মি. তালুকদারের হাতের লেখা ভাল নয়। কোনও ওয়ার্ড, লাইন বুঝতে না-পারলে আমায় জিজ্ঞেস করে নিয়ে। আর যদি এর মধ্যে তালুকদারের অ্যাসিস্টেন্ট চলে আসে, তবে তোমায় আর খাটতে হবে না।”

এই অবধি বলে সামান্য দম নিয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা ফলের রসে চুমুক দিলেন, “আজ তোমায় নতুন কাজ দেব। চলে এসো ন’টায়।”

আচমকা মনে পড়ে গেল। বন্ধ দরজার ভিতরে রহস্যময় শব্দটার কথা। কৌশানী এক বার ভাবল প্রসঙ্গটা তুলবে, থেমে গেল। প্রজ্ঞাপারমিতা যদি জানতে চান, যে-ঘর বন্ধ, তার দরজায় কেন কৌশানী কান পাতে গিয়েছিল, তাঁর বারণ সত্ত্বেও, তা হলে কী উত্তর দেবে ও! আর প্র্যাক্টিক্যালি এই কান পাটার কাজটা তার এখতিয়ারের বাইরেও।

প্রথমেই প্রজ্ঞাপারমিতা সেই ফাইলের স্তুপের মধ্যে থেকে একটা বেশ পুরনো হলুদ রঙের ফাইল পেড়ে নিয়ে বললেন, “ফাইলটা কোথেকে নিলাম, দেখেছ?”

দেখেছে কৌশানী। প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “এই বার একটা এক্সেল ফাইল খুঁজে ফেলো।”

কাজটা তেমন মাথা খাটানোর কিছু নয়। ফাইলে লাগানো প্রতিটি বিলের হিসেব আলাদা আলাদা কলামে লিখে যোগ করা। তার পরে ডেট ওয়াইজ আর বিল-নাম্বার ওয়াইজ সটিং করে নেওয়া। ফাইলটা হাতে নিতেই কৌশানী টের পেল, ফাইলের উপরে ধুলোর স্তর জমেছে। সে তাতে মন দিল না। পরে হাত ধুয়ে নিলেই চলবে। ফাইলটা খুলে প্রথম বিলটার উপরে চোখ পড়তেই আটকে গেল কৌশানী। বিলের উপরে বড় বড় করে লেখা ‘লিটল আইল্যান্ড লজ’। নীচে ঠিকানা। কিন্তু সেটা কথা নয়। বিলের তারিখ কম করে তিন বছরের পুরনো। সে বিলগুলো উল্টেপাল্টে দেখল, সব বিলের তারিখ তিন বছর আগের।

সাহস করে প্রশ্নটা করতেই প্রজ্ঞাপারমিতা সামান্য ইতস্তত করে বললেন, “বাহ। গুড অবজারভেশন। আসলে হয়েছে কী, গত তিন বছরের জিএসটি অডিট করা হয়নি। জিএসটিআর-৯। কনসেপ্টই ছিল না। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট বললেন করতে হবে। তাই আর কী!”

জিএসটি, ডিডিএস, কর্পোরেশন, প্রফেশন, ইনকাম-সহ সব ধরনের ট্যাক্স সম্পর্কে তার অল্পবিস্তর পড়াশোনা আছে। কিন্তু প্র্যাক্টিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স নেই বলে সে চূপ করে গেল। প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “তুমি শুরু করে দাও। ডিড যে ভাবে করেছ, সেই ভাবে খুব ধরে ধরে করবে। আমি এক বার লজে যাব। ফিরতে রাত হবে। তুমি ডিনার সেরে শুয়ে পোড়ো।”

ঘটনাটা ঘটল তার পরের দিন। রাতে নিজের ঘরে ডিনার সেরে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিল কৌশানী। আজ দুপুরে এক বার অফিসঘরে এসেছিলেন প্রজ্ঞাপারমিতা। বলে গেছেন, এটা তিন মাসের ফাইল। ফাইলিং করা হয়েছে কোয়ার্টারলি হিসেবে। কৌশানীর হাতের ফাইলটা ফার্স্ট কোয়ার্টারের। এপ্রিল, মে আর জুন। বাকি তিনটে ফাইল কোথায় আছে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, বেশ কিছু ক্ষণ পাশে বসে কৌশানীর কাজও লক্ষ করেছিলেন।

আরও একটা ব্যাপার। কৌশানী খেয়াল করেছে আজকাল, অবশ্যই প্রজ্ঞাপারমিতা না-থাকলে, দণ্ড তার খোঁজ করে, তার বাড়িঘর, পরিবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কখনও সামান্য হাসেও।

রাত তখন ক’টা হবে জানা নেই। বেশ গভীর ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল সে। আজ রাতে শোয়ার আগে, একটা মন খারাপের ভাব আঁকড়ে ধরেছিল তাকে। কিসের জন্য মন খারাপ, নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিল। খাসা তো আছে সে। ফ্রি-তে থাকা-খাওয়া, কাজের তেমন চাপ নেই। আর মাস শেষ হলেই তো হাতে কড়কড়ে নোটের বাড়িল। কৌশানীর মনে পড়ল, সে ভেবেই রেখেছিল, একটা ভাল চাকরি পেলে প্রথম মাসের মাইনের পুরোটাই তুলে দেবে বাপির হাতে। কথাটা স্মৃতির পুকুরে ভেসে উঠতেই আচমকাই বাপি আর মা’র মুখটাও ভেসে উঠল, মোমের গোলগাল ফরসা টুকটুকে মুখটাও বাদ গেল না। এক বার বাড়িতে ফোন করবে? দোনামোনা করতে করতে সে ফোনটা করেই ফেলল। রিং হতে হতে কেটে যাওয়ার মুখে বাপি ধরল, “হ্যালো।”

বাপির স্বর ঘুম-জড়ানো। আচমকাই একটা কান্নার রেশ যেন দু’হাতে চেপে ধরল কৌশানীর গলার কাছটা।

“হ্যালো।”

নিঝুম চূপ।

বাপি সামান্য বিরক্ত হল কি? পাঁচ সেকেন্ডের বিরতিতে বাপির গলা ফের ভেসে এল, “নিঝুম নাকি রে?”

কৌশানীর মুখে কথা সরল না। সে তো টু শব্দটি করেনি। তা হলে বাপি বুঝে গেল কী উপায়ে? তবে কি বাপি এই নাম্বারটা তার নামেই সেভ করে রেখেছে? নাকি আত্মজার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস চিনে নিতে জন্মদাতা-দাত্রীর অসুবিধে হয় না? তার মানে আত্মার টান এখনও সবটা ছিঁড়ে যায়নি? কৌশানী ফোনটা কেটে দিয়ে সুইচড অফ করে দিল। তার পর বালিশটাকে আঁকড়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমের অতল তলে তলিয়ে গিয়েছিল কে জানে, আচমকা কী-একটা শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কৌশানীর। চোখ মেলে দেখল, চার দিকে যেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার, তেমনই পাল্লা দিয়ে ভয়ঙ্কর নিশ্চলতা। ঝাঁঝি পোকারাও আজ ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। কিন্তু বাইরে কেউ কথা বলছে কি? বেশ কিছু ক্ষণ কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে বুঝল, বাইরে নয়, তার ঘরের পাশের ঘর থেকে শব্দটা আসছে। সেই ঝড়বৃষ্টির রাতেও যেমন এসেছিল। একটা কৌতূহল সে দিন থেকেই ছিল। কৌশানী এক লাক্ষে বিছানা ছেড়ে নেমে দেওয়ালে কান পাতল। একটি পুরুষ এবং একটি নারীকণ্ঠ। নারীকণ্ঠটি বেশি জোরালো অথচ কেউ শুনতে ফেলবে ভেবে হয়তো মাঝেমাঝে গলা নামিয়ে নিচ্ছে। সে বুঝল, কাল সে যা ভেবেছিল, সেটাই ঠিক। পাশের ঘরে কেউ বা কারা আছে। কিন্তু সে তো সারা দিনে, ফাঁক পেলেই, এই বাড়িটার আনাচকানাচে ঘুরে বেড়ায়। এক জোড়া নারী-পুরুষ চক্ৰিশ ঘণ্টা দরজা বন্ধ করে থাকবে, এ-ও কি সম্ভব?

অন্যায় হচ্ছে বুঝতে পেরেও, সে নিজের কৌতূহল দমন করতে না-পেরে খুব সাবধানে শব্দ না-করে ঘরের ছিটকিনি খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। করিডর চাপ চাপ অন্ধকারে ছেয়ে আছে। বাঁ দিকে ঘুরতেই সে বুঝল পাশের ঘরের দরজা বন্ধ, তবে এঁটে নয়, ভেজিয়ে রাখা। দুটো পাল্লার মাঝের অতি সামান্য ফাঁক থেকে একটা মোটা সুতোর মতো হলুদ আলোর রেখা টুইয়ে বাইরে বেরিয়ে আসছে। সে দরজার সেই স্বল্প ফাঁকে চোখ রাখল।

পর দিন সকালে সে প্রাতরাশ সারল অন্যমনস্ক ভাবে। স্যান্ডউইচে কামড় বসাতে গিয়ে নিজের একটা আঙুল কামড়ে ফেলল। অফিসঘরেও বসেও সেই অন্যমনস্কতা গেল না। অনেক চেষ্টা করেও আজ কাজে মন বসাতে পারল না কৌশানী। দুপুর নাগাদ বুঝতে পারল, সে এক্সেলে সমস্ত বিলের তারিখে ইয়ারগুলো ভুল লিখে ফেলেছে। বিল অ্যামাউন্ট আর ট্যাক্স অ্যামাউন্টও একে-অন্যের ঘাড়ে ফেলে দিয়েছে। সর্বনাশ! পুরো কলাম ধরে সে ডিলিট করে দিল। নাহ, এখন আর হবে না। কাল শুয়ে পড়ার পরে বাকিটা রাত ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুম হয়েছে। তাই এখন বড্ড চোখ টানছে। কিন্তু ঘুমোলে চলবে না। সে বাইরে বেরিয়ে এসেই দণ্ডকে দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

“কিছু চাইছিলে?”

দণ্ড আজকাল তাকে তুমি করে সম্বোধন করে। সে করতেই পারে। ভদ্রলোক তার দাদুর বয়সি। যদিও সে দণ্ডকে কাকু বলেই সম্বোধন করে। কৌশানী কী বলবে ভেবে না-পেয়ে বলল, “আচ্ছা, ম্যাডাম কি লজে চলে গেছেন?”

দণ্ডের ভুরু কঁচকে গেল, “কেন জানতে চাইছ?”

“ইয়ে, একটা হিসেব বুঝতে পারছি না। তাই ভাবলাম ম্যাডামের থেকে সাহায্য পাওয়া যায় যদি।”

“ম্যাডাম তো এখন ঘুমোচ্ছেন। আমিও ঘুমোতে যাব। কাল রাতে কি ভাল ঘুম হয়নি তোমার?”

ওরে বাবা! চোখ আছে বটে প্রৌঢ়ের। সে বলল, “না তো। দিবা ঘুমিয়েছি। এক ঘুমে রাত কাবার।”

“কে জানে। তোমার চোখ লালচে লাগছে যেন। তোমরা শহরের

মানুষ। নতুন জায়গায় এলে প্রথম প্রথম এমন হয়। আমি বলি কী, তেমন কাজের চাপ না-থাকলে তুমিও একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি পিছনের দরজা টেনে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি।”

দশু চলে গেল। কৌশানী ভাবল, যাহা! দিন বুঝে ম্যাডাম আজ বাড়িতে? সে পিছনের দরজাটা ঠিকঠাক বন্ধ হয়েছে কি না, দেখে নিয়ে অফিসে ফিরে এল। কম্পিউটারের সামনে বসে থেকে বুঝল, হবে না। ঘুমোলেও চলবে না। তাকে জানতেই হবে কাল রাতে ম্যাডাম ওই ভাবে কাকে ধমকাচ্ছিলেন। প্রজ্ঞাপারমিতাকে সে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু তাঁর আড়ালে থাকার জন্য অন্য লোকটাকে দেখা যাচ্ছিল না। তবে ছেলেটি কিছু-একটা বলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু ম্যাডামের দাবড়ানির জন্য চুপ করে যাচ্ছিল।

কে ছেলেটি? এই ছেলেটিই কি সে দিন ছাদ থেকে উঁকি দিয়ে তাকে দেখছিল? সে কি ওই ঘরেই থাকে? কেউ কি চব্বিশ ঘণ্টা নিজেই বন্দি করে রাখতে পারে? কৌশানী নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল।

আন্দাজে বুঝল, সেই দিনের দেখা দুটো বন্ধ ঘরের মধ্যে একটায় সেই ছেলেটি থাকলে আর-একটি নিশ্চয়ই ম্যাডামের। আর সেই ঘরটা তার ঘরের পাশেই। সে সন্তর্পণে সেই ঘরটার সামনে এসে দু'বার টোকা দিল। কোনও শব্দ নেই। এক বার উল্টোদিকে ম্যাডামের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে ফের তিনটে টোকা দিল। মুখে প্রায় ফিস ফিস করে বলল, “দরজাটা খুলুন না প্রিজ।”

কোনও শব্দ নেই। কৌশানী এক বার ভাবল, ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। হয়তো সত্যিই এই ঘরে কেউ থাকে না। কাল রাতে হয়তো কেউ এসেছিল এই ঘরে। হয়তো ম্যাডামের লজের ম্যানেজার। বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ায় আর বেরোতে পারেনি। আর কাজে ভুল করার জন্য ম্যাডাম তো তাঁর স্টাফকে ধমকাতেই পারেন। হতে পারে সুলেমান নামের লোকটাকেই। কৌশানী যত বার এক এক করে নিজের মনে যুক্তি সাজাচ্ছিল, তত বারই সেগুলো নিজের কাছে নিতান্ত হাস্যকর বলে মনে হচ্ছিল। বার বার তার মন বলছিল, এটা হতে পারে না, হতেই পারে না। বরং কোন ঘরে কে থাকে, তার জেনে দরকার কী, এই যুক্তিটাই তার মনে জোরালো হতে শুরু করে দিয়েছিল।

সে আরও কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করে “মরুক গে” বলে ফিরে যাওয়ার জন্য তৈরি হতেই দরজায় কট করে শব্দ হল। কিন্তু দরজা খুলল না। কৌশানী এ বার দরজাটা আঙুলে ঠেলতেই, সেটা খুলে গেল। ঘরের ভিতরটা বেশ অন্ধকার। কৌশানী বুঝল, জানালাগুলো সব বন্ধ করে রাখা হয়েছে। সে সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে দরজাটা আবার খুব ধীরে বন্ধ করে দিয়ে অপেক্ষা করল চোখ সয়ে আসার। প্রতি মুহূর্তে বুকটা কঁপে কঁপে উঠছিল। প্রথম তো, ম্যাডাম উঠে এলে সোজা তার চাকরিটা খেয়ে নেবেন। দ্বিতীয়ত, ঘরের ভিতরে কে আছে, তার জানা নেই। যদি পাগল-টাগল কেউ হয় আর তাকে আচমকা আক্রমণ করে, তখন সে কী করবে?

চোখ সয়ে এলে সে দেখতে পেল অন্ধকার তেমন নিশ্চিহ্ন নয়। কোনও একটা জানালা হয়তো সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। তারই ভিতর দিয়ে বাইরের গনগনে রোদ তরল হয়ে ঘরে প্রবেশ করেছে। সেই আলোয় সে দেখতে পেল, মোটামুটি আসবাবযুক্ত একটি ঘরের মধ্যে জানালা-ঘেঁষে একটা বিছানা আর সেই বিছানার উপরে চিত হয়ে শুয়ে আছে একটি ছেলে। বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করে সে আন্দাজ করল, বয়স তিরিশ-বত্রিশ হবে। ছেলেটি বস্তুত তাকিয়ে আছে তার দিকেই। ছেলেটি কে? কৌশানী দারুণ সাহসে ভর করে ফিস ফিস করে বলল, “জানালাটা খুলে দিই?”

ছেলেটি কোনও কথা বলল না। খানিক তার দিকে বোবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নেড়ে নিষেধ করল। তার পর একটা হাত তুলে ইশারায় বোঝাল, সে তুষার্ত। কৌশানীর চোখ খুঁজে নিল ঘরের এক দিকে একটা ছোট নিচু টেবিলের উপরে রাখা কাচের গ্লাস আর একটা জলের জগ। আর রয়েছে একটা ফুলদানি। যদিও সেটি শূন্য। সে জগটা হাতে তুলে দেখল, জগের জল তলানিতে, সেটাই গ্লাসে ঢেলে দিল সে। জলটুকু গলায় যেতেই ছেলেটি চোখ বুজল। বাইরে থম থম করছে মধ্য দুপুর। কৌশানী কী করবে ভেবে না-পেয়ে জিজ্ঞেস করল, “শুনছেন?”

ছেলেটি জল খেয়েই ফের চোখ বুজেছে। ফের কৌশানী প্রশ্ন করল, “আপনি কে? এখানে কী করছেন?”

ছেলেটি চোখ বুজেই রইল। দেহ নিম্পন্দ।

কৌশানী ভয় পেল। এই সর্বনাশ! মরে গেল নাকি? আচমকা একটা ডাকে তার হৃৎপিণ্ড একেবারে দুলে উঠল। প্রজ্ঞাপারমিতা তার নাম ধরে ডাকছেন। সর্বনাশের ঘাড়ে আর-এক সর্বনাশ! কী বিপদ! সে সাহসের শেষ সঞ্চয়টুকু বুক ধরে দরজায় কান পাতল। বুঝল, প্রজ্ঞাপারমিতা তার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে চলে যাচ্ছেন। সে আন্দাজে বুঝল হয়তো অফিসঘরের দিকে। আলতো করে দরজাটা ফাঁক করে উঁকি দিয়ে সে দেখল, প্রজ্ঞাপারমিতার অপসূয়মাণ দেহটা অফিসের দরজার ভিতরে সঁধিয়ে গেল। আর অমনি কৌশানী বিদ্যুৎ গতিতে বাইরে এসে দরজাটা আলতো করে টেনে বন্ধ করে দিয়ে সুড়ত করে নিজের ঘরে সঁধিয়ে গেল। টের পেল তার হৃৎপিণ্ডটা মারাত্মক লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। খানিক অপেক্ষা করতেই প্রজ্ঞাপারমিতার আওয়াজ তার ঘরের দরজার বাইরে এসে থামল, “কৌশানী কি ঘরে নাকি? ঘুমোচ্ছ?”

কৌশানী টের পেল সে ভিতরে ভিতরে ঘেমে গেছে। তাড়াতাড়ি চেয়ারের হাতলে রাখা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে দরজা খুলল সে, “সরি ম্যাডাম, টয়লেটে গিয়েছিলাম।”

প্রজ্ঞাপারমিতার চোখে ঘুম লেগে থাকলেও পরনে পুরোদস্তুর বাইরে বেরোনোর পোশাক। মাথার উপরে সানগ্লাস। কিছু ক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “ও, তাই বলো। টয়লেটে ফ্রেশ হতে হতে একটা আওয়াজ পেলাম। তুমি পেয়েছ?”

কী শ্রবণশক্তি! কৌশানী অস্বীকার করে, “না তো ম্যাডাম, তবে এটা হতে পারে জলের আওয়াজে টের পাইনি। কিসের শব্দ ম্যাডাম?”

কিছু ক্ষণ পাশের সেই ঘরটার দরজার দিকে তাকিয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা বললেন, “নাহ, কিছু না। শোনো, আমি বাইরে যাচ্ছি। একটা আর্জেন্ট ফোন এসেছে। তুমি বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে কাজ শুরু করো। ইন কেস অব এনি প্রবলেম, আলাদা ওয়ার্ড ফাইলে লিখে রাখবে। আমি ফিরে এসে দেখছি।”

আর কাজ! কৌশানী বাইরের দরজা বন্ধ করে শুধু অপেক্ষা করছিল প্রজ্ঞাপারমিতার গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ায়। এক দৌড়ে সে ফের সেই ঘরটার দরজা খুলে ঢুকে পড়ল। ছেলেটি সেই একই ভাবে শুয়ে আছে।

“শুনছেন? শুনছেন?”

ছেলেটি এই বার চোখ খুলে তাকাল। কৌশানীর বুক থেকে যেন একটা ভারী পাথর নেমে গেল। যাক বাবা, বেঁচে আছে। কিন্তু ছেলেটির দৃষ্টিতে ভয় কৌশানীর নজর এড়াল না। কিসের ভয় পাচ্ছে এই ছেলেটি? পুরো এক মিনিট ধরে চোখের সামনে কৌশানীকে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে সেই ভয় সরে গেল। এই বার, বহু কষ্টে, ছেলেটি উঠে বসল বিছানায়। কৌশানীরও এত ক্ষণে ভয় কেটে গিয়ে কৌতূহল জেগেছে। সে ভাল করে ছেলেটিকে দেখল। এক জন মানুষ এত সুপুরুষ হতে পারে, কৌশানীর আন্দাজ ছিল না। মুখে হালকা দাড়ি, ভুরুদুটো জোড়া, চোখের রং আকাশি নীল, কালো চুল ঝাঁপিয়ে এসেছে বাঁ চোখের উপরে। হঠাৎ দেখলে শুধু অবাকালি নয়, অ-ভারতীয় বলেই মনে হয়। পরনে কোঁচকানো খয়েরি স্ট্রাইপড পাজামা আর ময়লা হয়ে আসা সাদা টি-শার্ট। কৌশানী ছেলেটির মুখের উপরে ঝুঁকে পড়ে বলল, “আমায় আপনি চিনবেন না। আপনাকেও আমি চিনি না। আপনি কে? প্রজ্ঞাপারমিতা ম্যাডাম আপনার কে হন? আপনি এই ঘরে কেন?”

আচমকা এতগুলো প্রশ্নে ছেলেটি হয়তো ঘাবড়ে গেল। ফ্যাল ফ্যাল করে কৌশানীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। বোবা নাকি? কৌশানী দেখল ছেলেটি তাকিয়েই রয়েছে তার দিকে নিম্পলক দৃষ্টিতে। বাইরে কোথাও একটা শব্দ হতে কৌশানী এক বার বাইরে কান পেতে শুনল কারও পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কি না। এই বাড়িতে ঢুকতে পারে এক মাত্র দশু, তা-ও পিছনের দরজা দিয়ে। কিন্তু হতে পারে ঘুরতে ঘুরতে সুলেমান চলে এল এই জানালার বাইরে। তখন...

“আমি হিমাঙ্গি। আপনি কে?”

চমকাল কৌশানী। তা হলে বোবা নয়! সে নিজের নাম বলে জানতে

চাইল, “আপনার নাম হিমাদ্রি? মানে আপনি বাঙালি? সরি, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে দেখলে কিন্তু মনে হয় না।”

কৌশানীর মনে হল, ছেলেটি এ বার যেন ধীরে ধীরে সন্নিহিত হয়ে পাচ্ছে। সামান্য সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে জলের ফাঁকা গ্লাসটা তুলে নিল। তার পরেই দ্রুত গতিতে গ্লাসটা তুলে ধরল কৌশানীর দিকে ছুড়ে মারার ভঙ্গিতে। এর জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না কৌশানী। সে আঁতকে উঠে বলে উঠল, “করছেন কী?”

সে সভয়ে দেখল, মুহূর্তে ছেলেটির চোখের ভাষা বদলে গেছে। ছেলেটি হিসহিসে গলায় জিজ্ঞেস করল, “ঠিক করে বলুন তো, আপনি কে? নইলে আপনাকে মেরে ফেলব আমি।”

এই সমূহ বিপদের সময়েও কৌশানী টের পেল ছেলেটির উচ্চারণ অবাঙালিসুলভ। তত ক্ষণে তার মনে এক গাঢ় প্রশ্ন ঘনিয়ে এসেছে। তবে কি এ নন-বেঙ্গলি? কোথাকার লোক? এখানে এই বন্ধ কারাগারের মতো ঘরে সে করছেটা কী? সে কি বন্দি? কে তাকে আটকে রেখেছে? প্রজ্ঞা ম্যাডাম? এর সঙ্গেই কি সেই ঝড়ের রাতে কথা বলছিল ম্যাডাম? কিন্তু এই প্রশ্ন-তুণীরের থেকে সবচাইতে আগে যে তিরটা ধ্যেয়ে এল, সেটা তাকে আমূল নাড়িয়ে দিল। সর্বনাশ! এ পাগল নাকি? তাই কি ম্যাডাম একে ঘরে আটকে রেখেছেন? কৌশানী বুঝল এই সময়ে সাহস হারালে চলবে না। সে যতটা সম্ভব নিজে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে বলল, “বিশ্বাস করুন, আমি কৌশানী। এই তো দিন ছয়েক হল ম্যাডামের অফিসে জয়েন করেছি। আমাকে আপনার পাশের ঘরেই থাকতে দেওয়া হয়েছে। ম্যাডাম আমাকে রেখেছেন লজের হিসেবপত্র দেখার জন্য। আমি...”

ছেলেটি এ বার চাপা গলায় প্রায় গর্জে উঠল, “লায়ার। সে কোথায়? সে কোথায়?”

কৌশানী বুঝল খুব ভুল হয়েছে এই উদ্ভাদের ঘরে ঢুকে। যদি আচমকা হাতের গ্লাসটা ছুড়ে মারে, রক্তপাত নিশ্চিত আর ম্যাডাম জানতে পারলে যে কী হবে, ভগবান জানেন। সে আর ভাবতে পারল না। টের পেল গলা শুকিয়ে আসছে। কোনও মতে উচ্চারণ করল “ক্কে? কার কথা বলছেন?”

ছেলেটির ডান হাত তখনও গ্লাসটা ধরে আছে শূন্যে। বাঁ হাত দিয়ে মাথা চুলকিয়ে বলল, “কী নাম, কী নাম... ও হুজিাস। ইয়েস... রুমবুম। হোয়ার ইজ রুমবুম?”

এই চরম বিপদের সময়েও তার মাথা কাজ করছে, কৌশানী টের পেল। নইলে মুহূর্তে তার মনে পড়ে যাবে কেন যে, তার জায়গায় আগে যে মেয়েটি আগে কাজ করত, ম্যাডাম বলেছিলেন তার নাম রুমবুম। সে ধীর কণ্ঠে উচ্চারণ করল, “সে? সে তো কাজ ছেড়ে দিয়েছে।”

ঠিক পনেরো সেকেন্ড ধরে কৌশানীকে পর্যবেক্ষণ করে ছেলেটি বলল, “আপনি এই ঘরে ঢুকে এলেন যে? কী করে পারলেন? বাইরে কেউ নেই?”

“নাহ। কেউ নেই তো,” কৌশানী চেষ্টা করে যাচ্ছে নিজের গলাকে যতটা সম্ভব মোলায়েম রাখার।

“ইম্পসিবল। হতেই পারে না। মিতা নেই?”

আবার মিতা কে? কৌশানীর মনে হল, কোনও মতে এই ঘর থেকে বেরোতে পারলে সে জীবনে আর ঢুকবে না। ছেলেটি উত্তরের অপেক্ষা না-করে চাপা গলায় বলল, “আমি জানি আপনি মিতার লোক, আমি বুঝতে পেরেছি, আমি সব বুঝতে পারি। আগেও কেউ না-কেউ এসেছে। এভরিবডি লায়ার, এভরিবডি লায়ার। গেট আউট, গেট আউট অব দিস রুম। আর শুনুন, অত সাহস থাকলে আপনি মিতাকে ডাকুন। আর না-ডাকতে পারলে আপনি বেরিয়ে যান। রাইট নাউ। আমি বলব না। কিছুতেই বলব না।”

কৌশানী বুঝল, একে অন্য ভাবে হ্যাণ্ডেল করতে হবে। জন্ম-ইস্টক সে দেখে এসেছে তার বড়মামাকে। বড়মামা মারা গেছেন আজ বছর চারেক। তিনি পলিটেকনিক কলেজে পড়তে গিয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের র্যাগিং সহ্য করতে না-পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছিলেন। একা একা থাকতেন, খাবার দিলে খেতেন না। কোনও দিন একাই তিন

জনের খাবার খেয়ে নিতেন। লোকজন কাছে গেলে আচমকা এটা-ওটা ছুড়ে মারতেন। পরিবারের গুটি তিনেক লোক তাঁকে হ্যাণ্ডেল করতে পারত। তার ঠান্ডা, তার ছোটমামা আর কৌশানী নিজে। কৌশানী যে বাঘাঘাটীনে তার মামাবাড়িতে নিয়মিত যায় তা-ও নয়, তবে তার মধ্যে কী দেখেছিলেন মামা, কে জানে। বাড়ির লোক অবাধ হয়ে দেখত, কৌশানী গিয়ে পাশে বসলে বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে কেমন শান্ত হয়ে যেতেন আর তার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতেন। সেই কথার কোনও অর্থ নেই, কোনও ভাষা নেই। শুধু বিজাতীয় শব্দমিশ্রিত গোঙানি। তবু তিনি বলে যেতেন। কৌশানীও ‘বেশ বুঝতে পারছে’ এমন ভাব করে মাথা নাড়ত আর মামার গায়ে, মাথায় হাত বুলিয়ে দিত।

আপাতত, কৌশানী কিছু ক্ষণ চুপ করে থেকে তার শান্ত চোখদুটো মেলে রাখল ছেলেটির চোখের উপরে। সরাসরি। তার পর একটা হাত বাড়িয়ে ছেলেটির একটা আঙুল ধরে ফেলে বলল, “হিমাদ্রি, আপনি না-জানাতে চাইলে জানাবেন না। কে জানতে চাইছে? আমি তো আপনার কাছে থেকে কিছুই জানতে চাইনি। বিশ্বাস করুন। আমি মাত্র ছ’দিন হল কাজে জয়েন করেছি। প্রজ্ঞাপারমিতা ম্যাডাম...”

এই অবধি বলেই তার মাথায় চকিতে একটা ভাবনা খেলা করে গেল। তা হলে কি প্রজ্ঞাপারমিতা ম্যাডামকেই ‘মিতা’ বলে সম্বোধন করছে হিমাদ্রি? তা হলে কি ইনিই? আর ভাবতে পারল না কৌশানী। মাথাটা ঘোঁ করে ঘুরে গেল। ওএমজি! জোর করে গলায় স্বাভাবিকত্ব ফিরিয়ে এনে সে সামান্য হেসে বলল, “মানে আপনার মিতা আমার কাজে রেখেছেন।”

কৌশানী এর পরে সংক্ষেপে জানাল, কী ভাবে এই ঘরটির বিষয়ে তার কৌতুহল ধীরে ধীরে বেড়েছে। এমনকি কাল রাতে হিমাদ্রি আর প্রজ্ঞাপারমিতার বাদানুবাদও সে নিজের চোখে দেখেছে, শুনেছে, জানাল তাও।

সব শুনে হিমাদ্রি গ্লাসটা সাবধানে টেবিলের উপরে রেখে কিছু ক্ষণ মাথা ঝুকিয়ে বসে রইল। খানিক পরে মাথা তুললে কৌশানী সর্বিম্ময়ে দেখল হিমাদ্রির চোখ ছিল ছিল করছে, “মিতা জানতে পারলে আপনাকে খুন করে ফেলবে, আমাকেও ফের মারবে। প্লিজ এ ঘরে আর আসবেন না।”

কৌশানী উঠে দাঁড়াল, “রিল্যাক্স হিমাদ্রি। আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু এই ঘরের বাইরে অনেক লোক আছে, এ কথা আপনার মনে হল কেন বলুন তো? বাইরে মানে কি বাড়ির বাইরে? আপাতত এই বাড়িতে তো আমি একা। আর আপনি।”

হিমাদ্রি অবাধ চোখে তাকাল, “সত্যি বলছেন? এই ঘরের বাইরে কেউ নেই পাহারায়? তবে যে...”

হিমাদ্রি থেমে গেল। চোখদুটো চুলু চুলু হয়ে এল। মাথা ঝুঁকে পড়ল বুকুর উপরে। কৌশানী বুঝল, এটাই সুবর্ণ সুযোগ। সে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এসে দরজাটা টেনে দিল।

হিমাদ্রির ঘর থেকে অফিসঘরে ফিরে এসে ধপ করে নিজের চেয়ারে বসে কৌশানী উপলব্ধি করল, হিমাদ্রি নামের ছেলেটি সেই অর্থে আদতে পাগল নয়। বরং এক জন সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ। নিশ্চয়ই দীর্ঘ দিন ওই বন্ধ ঘরে থাকার ফলে গ্রে-ম্যাটারটা সামান্য গড়বড় করছে। কিন্তু ঘটনাটা কী? যদি বিপজ্জনক না হয়, তা হলে তাকে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে কেন? দু’বেলা তার খাবার তাকে কে সার্ভ করে? দেওয়ার মধ্যে এক মাত্র দণ্ড। তার মানে দণ্ড সব জানে। দণ্ডকে কি এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা ঠিক হবে? কৌশানীর মগজ বলল, এখনই নয়। সেই পুকুর পাড়ের দুর্ঘটনার পর থেকে লোকটা তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে ঠিকই, কিন্তু ভুললে চলবে না, সে প্রজ্ঞাপারমিতার খাস লোক। ওকে বিশ্বাস করে কিছু বলার অর্থ, সে সযত্নে সেগুলো তুলে দেবে প্রজ্ঞাপারমিতার কানে। সবচেয়ে বড় যে সম্ভাবনার কথা তার মাথায় এই মুহূর্তে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে, তা হল হিমাদ্রি প্রজ্ঞাপারমিতাকে ‘মিতা’ বলে সম্বোধন করছে। ছেলেটি এমনিতেই বয়সে প্রজ্ঞাপারমিতার চাইতে বছর তিনেকের বড় হবে। তবে কি এই হিমাদ্রিই প্রজ্ঞাপারমিতার স্বামী? কিন্তু তা-ই বা কী

করে সম্ভব? এমন এক জন সুদর্শন, সুপুরুষ স্বামীকে কেন তার স্ত্রী ঘরে আটকে রাখতে চাইবে দিনের পর দিন? আর যদি চায়ও, হিমাদ্রির দরজা তো ভিতর থেকে বন্ধ। তা হলে যে কোনও সময়েই তো সে দরজা খুলে পালিয়ে যেতে পারে। পালাচ্ছে না কেন? সেধে কেউ এমন নারকীয় যন্ত্রণা বেছে নেয়?

কৌশানী বুঝল, তার মাথায় এক সঙ্গে এক মিছিল প্রশ্ন ভিড় করতে শুরু করে দিয়েছে, যার একটারও সদৃশ তার কাছে নেই। কিছুতেই কোনওটার সঙ্গে কোনটার সূতোয় গিট মারতে পারছে না সে। সবচাইতে বড় কথা, যত বার সে ভাবছে, কী দরকার এই সব পারিবারিক ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে, কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে এলে সে দংশন এড়াতে পারবে না, তবুও কী-এক অমোঘ শক্তি তাকে টেনে নিয়ে চলেছে, নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই।

কৌশানীর এখন খুব ইচ্ছে করছে, পুরো ঘটনাটা বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করে সে। কারণ তার আন্দাজ, এই ব্যাপারে কোনও সদৃশ বন্ধুরাও দিতে পারবে না। যা বলবে, সবটাই আন্দাজে, তিন জন, তিন রকম। তাতে মাথা আরও গুলিয়ে যাবে। কৌশানী প্রাণপণে নিজের মনকে বাগে আনার চেষ্টা করল। বোঝানোর চেষ্টা করল, এটা নিশ্চিত স্বামী-স্ত্রীর পার্সোনাল ম্যাটার। সে এখানে বাইরের লোক। কাজ করবে, মাইনে নেবে, ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

কৌশানী জোর করে ঘটনাটা মন থেকে মুছে ফেলতে ফাইলটা টেনে নিল। জোর করে মন বসাল কাজে।

পর দিন বারো তারিখ, শুক্রবার। আজ প্রায় সারা দিন প্রজাপারমিতা বাড়িতেই থাকলেন, নিজের ঘরে। কৌশানী খেয়াল করল, ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে আজ প্রজাপারমিতা তার সঙ্গে তেমন গল্পগুজব করলেন না। কাজ নিয়ে সামান্য দু'-একটা কথা বললেন। বলার মাঝেই দু'বার ফোন এল। অত্যন্ত চাপা গলায় কারও সঙ্গে কথা বললেন। তার পর এক সময় নিঃশব্দে উঠে চলে গেলেন। দুপুরে লাঞ্চার টেবিলে এসে কৌশানী দেখল, প্রজাপারমিতা অনুপস্থিত। একটা থালায় খাবার সাজিয়ে নিয়ে এসে দণ্ড জনাল, সে এই বিষয়ে কিছুই জানে না আর ম্যাডাম নিজে থেকে কিছু না-বললে সেই ব্যাপারে সে মাথা গলায় না। এটাই এই বাড়ির দৃশ্য। আজ দণ্ডর কথায় সেই আগেকার মতো রক্ষা স্বর। কৌশানীর মনে হল ভিতরে ভিতরে কী একটা হচ্ছে এই বাড়িতে, অথচ সে জানতে পারছে না।

আজ বিকেলে আর রাতে ডিনারের আগে অন্য দিনের চেয়ে অন্য রকম কিছু ঘটল। সাধারণত বিকেল পাঁচটার পরে তার ছুটি, এমনটাই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন ম্যাডাম। আজ সাড়ে চারটের মধ্যেই তার প্রথম ফাইলের সব বিল এন্ট্রি হয়ে গিয়েছিল। দু'-তিন বার উপর থেকে নীচে চেক করে নিয়ে বুঝেছে, গল রাইট। কাল থেকে সেকেন্ড কোয়ার্টারের কাজ ধরতে হবে। যদিও কাজ করতে করতে বার বার তার মন চলে যাচ্ছিল হিমাদ্রির ঘরের দিকে, কিন্তু অনেক কষ্টে সে মনঃসংযোগ করছিল কাজে। এক সময় ডুবেও গিয়েছিল। ফাইল বন্ধ করে দেওয়াল-ঘড়িতে সময় দেখে, একটা হাই তুলে, প্রজাপারমিতাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভেবেছিল বাইরে এক বার ঘুরে আসবে। সারা দিন রাত এই বাড়িতে থাকার কোনও মানে হয় না। তার মনে পড়ছিল গত শুক্রবার সে এসেছিল এই পিয়ালি আইল্যান্ডে। পরের দিন থেকে ধরলে আজ এক সপ্তাহ এই জায়গায় কেটে গেল তার। কিন্তু আসা ইস্তক বাড়ির বাইরে যাওয়া বলতে পিছনে পুকুরের ধার অবধি। সেই মারাত্মক ঝড়জলের পরে আজ সকালে দেখে এসেছে, পুকুর আগেকার মতো ফের পদ্মফুলে ভরে গিয়েছে। আশ্চর্য প্রকৃতির খেলা।

আজ ইচ্ছে হল, সামনের সদর দরজা পেরিয়ে বাইরের রাস্তায় পা রাখে। কারণ অন্য দিন বাড়িতে কেউ থাকে না আর তাই দরজা খুলে রেখে তার পক্ষে বেরোনো সম্ভব হয় না। কিন্তু আজ দুপুরে দণ্ড বাইরে যায়নি। অফিসে বসেই সে রান্নাঘরে ছাঁকছাঁক আওয়াজ পাচ্ছিল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারল, আজ রাতে বাড়িতে অতিথি আসবেন, তারই প্রস্তুতি। সে দণ্ডকে বলে বাইরে বেরিয়ে এল।

বাইরে কেউ নেই। শেষ দুপুরে খাঁ-খাঁ করছে সামনের রাস্তা। সে রাস্তায় নামার আগে দু'দিকে দেখে নিল। তার পর ডান দিকে ঘুরে মন্ডর গতিতে হেঁটে চলল। পথের দু'পাশে বনচাঁড়ালের বোপ, কলাগাছের সারি। সুপুরি আর গাব গাছও চোখে পড়ল। এই সব গাছ তার মামাবাড়িতে থাকার সময় চেনা। কোথেকে একটা চামেলি ফুলের গন্ধ, গন্ধরাজ লেবুর গন্ধের সঙ্গে মিশে বাতাসকে বেশ আমোদিত করে রেখেছে। এক জায়গায় প্রচুর দোপাটি ফুল ফুটে আছে দেখে ভারী মজা লাগল। এত ফুল থাকতে দোপাটি কেন কৌশানীর বিশেষ পছন্দ, সৌজিতা জানতে চাইত। কী করে সে বোঝাবে গোলাপ, চন্দ্রমল্লিকা, সূর্যমুখী, রক্তজবার মতো তেমন অভিজাত পরিবার হয়তো দোপাটির নেই, আর তাই হয়তো দোপাটি ফোটে নিজের আনন্দে। কেউ দেখল, কী দেখল না, তার বয়েই গেল। কোথাও যেন নিজের সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পায় সে। কৌশানী রাস্তার পাশে উবু হয়ে বসে পড়ে দু'-একটা পাপড়ি ছুঁয়ে দেখল। ফের চলতে শুরু করল। ইচ্ছে, আর বড়জোর মিনিট পাঁচকে হেঁটে ফেরার পথে ধরবে।

এই ভাবে কতটা পথ সে চলে এসেছে, মনে নেই, আচমকা পিছনে কারও পায়ের আওয়াজ পেল সে। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। গ্রামের পথে যে-কেউ যাওয়া-আসা করতে পারে। আরও একটু এগিয়ে সেই গন্ধরাজ লেবুর একটা গাছ দেখতে পেল। মামাবাড়িতে এটি গাছের পাতা ছিঁড়ে দু'হাতে ঘষলে বেশ গন্ধ ছাড়ত। বার বার হাত শুঁকত সে। কিন্তু এই মুহূর্তে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অন্য কিছুই আভাস দিল। আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল কৌশানী। পিছনে পায়ের আওয়াজও থেমে গেল। সে একটা কাজ করল। চকিতে রিফ্লেক্স অ্যাকশনে পিছন ঘুরে দৌড়তে লাগল, যে পথ দিয়ে সে হেঁটে আসছিল, সেই দিকে। এই বার উপায়ান্তর না-দেখে একটা লোক একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। সুলেমান!

“আপনি! আমায় ফলো করছেন?”

কৌশানী ভেবেছিল ধরা পড়ে লোকটা লজ্জা বা ভয় কিছু-একটা পাবে। কিন্তু সুলেমান খুব ধীরে-সুস্থে বুকপকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে বলল, “দিদি, আপনি এখানকার রাস্তাঘাট চেনেন?”

“হারিয়ে যাব? পাগল নাকি আপনি? ফের এই কাজ করলে...”

কী করে কৌশানীর মন পড়ে ফেলল সুলেমান, “ম্যাডামকে বলে লাভ নেই। আপনি ম্যাডামের গেস্ট। কেবল গেস্ট। ম্যাডামের সব গেস্টদের সেফটির রেসপন্সিবিলিটি আমার। আপনি যথেষ্ট এগিয়েছেন। তা ছাড়া পুলিশ-টুলিশের ঝামেলা আছে। তাই আর না। ফিরে চলুন দিদি। কাম ব্যাক। প্লিজ।”

“আর না গেলে?” কেমন একটা জেদ চেপে গেল কৌশানীর। নিমেষে সুলেমানের চোখের আলো নিভে এল, “প্লিজ ম্যাডাম। আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি। প্লিজ।”

কথাগুলো অনুরোধ-মাথানো হলেও সুলেমানের গলায় কী-একটা ছিল, নির্জন পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কৌশানীর বুক কেঁপে উঠল। সে হনহন করে ফিরে চলল। হাঁটতে হাঁটতে মনে পড়ল, সুলেমান দেখতে গ্রাম্য হলে কী হবে, ইংরেজি উচ্চারণটা কিন্তু বেশ পরিষ্কার।

রাতের খাওয়া শেষ করে ফের বাবাকে একটা ফোন করেছিল কৌশানী। কথা বলেছে মা'র সঙ্গেও। ফোনের ভিতর দিয়ে মা'র গলাটা কিঞ্চিৎ নরম মনে হল, এক বার যেন “সাবধানে থাকিস” বলতে গিয়ে গলা কিছুটা কেঁপেও গেল। ফোন কেটে দিতে আবারও মন খারাপ হয়ে গেল কৌশানীর, তবে সামান্য। কে আর নিজের বাবা-মা-পরিজনদের বাদ দিয়ে বাঁচতে চায়? মন ভাল করতে সে সবে বন্ধুদের ফোন করতে যাচ্ছিল, এমন সময় দরজার বাইরে একটা হালকা হুন্সা উঠল। একাধিক লোকের মিলিত কণ্ঠস্বর। তা হলে কি প্রজাপারমিতা ম্যাডামের গেস্টরা এসে গেছে? এত রাতে? ঐরা কারা? কিছু ক্ষণ পরে দরজায় টোকা। দণ্ড ডাকছে, “ম্যাডাম ডাকছেন তোমাকে।”

কৌশানী শোওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছিল। তাড়াতাড়ি নাইট ড্রেস চেক করে সালোয়ার-কামিজ পরে বাইরে এল। ড্রয়িং রুমে এসে দেখল,



ম্যাডাম তো আছেনই, আরও জনা পাঁচেক ভদ্রলোক আর এক জন মহিলাও সোফায় বসে আছেন। টেবিলের উপরে সাজানো আহারাদির দিকে চোখ যেতেই সে বুঝল, মদ্যপানের আসর জমে উঠেছে। সে গিয়ে দাঁড়াতেই প্রজ্ঞাপারমিতা আলাপ করিয়ে দিলেন। তার ব্যবহার আর কাজের সুখ্যাতিও করলেন। বাঁ হাতে রঙিন গ্লাস ধরা একটি মহিলা বললেন, “কোসানি! আনকমন নেম। বেঙ্গলি?”

নামের ভুলটা শুধরে দিতে ইচ্ছে করছিল না। কৌশানী শুধু মাথা নাড়ল। তার পর কৌশানী কোথায় থাকে, কত দূর লেখাপড়া, সে এই পার্টিতে যোগ দিতে ইচ্ছুক কি না... ইত্যাদি জানতে চাইল। বাকি পাঁচ জন পুরুষ তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কৌশানীর বিরক্ত লাগছিল। সে এমকম শুনে মহিলাটি বললেন, “ওয়াও প্রজ্ঞা! নাইস সিলেকশন। মেরে লিয়ে ভি এক ঠো জুগাডু কর দো। মেরি পহেলিওয়ালি তো ভাগ গয়ি। আজকালকা জেনারেশন বহত কামচোর হোতে যা রাহা হ্যায়। ইন লোগোকো চাহিয়ে মুফতমে পয়সে।”

প্রজ্ঞাপারমিতা মৃদু প্রতিবাদ করতে তিনি ফের বললেন, “সরি কোসানি, তুমহারা বাত নেহি কর রহি হু। মেরা বেটাকোহি লে লো...”

আরও কত কী বলে যাচ্ছিলেন মহিলা। কৌশানী খেয়াল করল গুঁর কথা ক্রমশ জড়িয়ে আসছে। এক সময় প্রজ্ঞাপারমিতা তার দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারা করলেন। কৌশানী যেন পালিয়ে বাঁচল। ঘরে এসে বিছানায় ধপ করে বসে পড়ে প্রথমেই মনে এল, এত ভাল যার স্বামী, তিনি নিজেও তো খুব ভাল, তাঁর এমন ফ্রেন্ড সার্কল! আচ্ছা, এমন নয় তো, ম্যাডামের চার পাশের মানুষজনদের হিমাড্রি পছন্দ করত না বলেই, তার এই পরিণতি? পর ক্ষণেই মনে হল ধ্যাত, এমন হয় না কি?

আরও একটু বেশি রাতে, বাড়ি যখন একদম শান্ত, কনফারেন্স কলে সৌজিতা, মিঠি আর প্রত্ন্যাকে ধরল কৌশানী। এক দমে শুরু থেকে প্রায় সবটা বলে ফেলে সে থামতেই সৌজিতা বলল, “সারা দিন গেল আলো ঢোলে, সন্ধ্যাবেলা কলমিশাক তোলে।”

মিঠি বলল, “কী! কী সব ভাট বকছিস?”

“কিছু না। বলছি এই ক’টা দিনে এত কিছু ঘটে গেল, আর তুই

সাঁঝবেলায় কেমন গাইতে এলি, নিবুম?”

কৌশানীর বিরক্ত লাগল। তার এখন-তখন অবস্থা আর সৌজিতার সবেতেই ইয়ার্কি। সে বলল, “কী করব, এই ব্যাপারে একটা সাজেশন দে না রে, তোরা। মিঠি? প্রত্ন্যা?”

মিঠি কিছু বলতে যাওয়ার আগেই সৌজিতা বলল, “এ তো লালমোহনবাবুর রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনি বানালি রে ডুড। প্রখর রুদ্ধকে পাঠাব ভেবেছিলাম, তো সে নাম বদলে হিমাড্রি হয়েছে কে জানত! হালত জমে গ্র্যান্ড, পিয়ালি আইল্যান্ড। তার উপরে...”

মিঠি থামিয়ে দিল, “সব সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না, সৌজিতা। থাম তুই। নিবুম, আমার কিন্তু সব মিলিয়ে খুব একটা ভাল লাগছে না রে।”

প্রত্ন্যা বলল, “তোরা সবাই বাড়াবাড়ি করছিস, ইনক্লুডিং নিবুম। আরে বাবা, নিবুমের ম্যাডাম বড়লোক মানুষ। পিয়ালি আইল্যান্ডের মতো জায়গায় লজ চালান, কলকাতায় নাকি আরও ব্যবসা-পণ্ডর আছে, নিজের গাড়ি-ফাড়ি আছে, এই স্ট্যাভার্ডের মানুষ উনি। এঁদের লেট নাইট পার্টি তো অমনই হয়। আমাদের বাড়িতেও তো হয়! আমি তো দীপরাজের সঙ্গে এই রকম অনেক পার্টি অ্যাটেন্ড করেছি। এটা ফার্স্ট পয়েন্ট। সেকেন্ডলি, ওই হিমাড্রি না হিমশৈল, সে যে ম্যাডামের হাজ্রাব্যান্ড, এটা তোর জাস্ট একটা কল্পনা, নিবুম। কোনও সলিড প্রুফ পাসনি। আর হাজ্রাব্যান্ড হলেও সে এমনই ন্যাকা যে, ঘরে বসেই কাটিয়ে দিচ্ছে মাসের পরে মাস? কাম অন ইয়ার। থার্ডলি, নিবুম, তোকে বলছি। একটা চাকরি পেয়ে ওখানে গেছিস, কাজটা ভাল লাগলে সেটাই মন দিয়ে কর, ভাল না-লাগলে ফিরে আয়। ফর নাথিং ট্রেসপাস করিস না, প্লিজ। অত সুন্দর জায়গা। ঘুরে-ফিরে এনজয় কর। বাই দ্য ওয়ে, সকালে উঠে দৌড়িছিস তো?”

মিঠি বলল, “যাক গে যাক। আমার ভাল লাগেনি সেটা সাফ সাফ জানিয়ে দিলাম। নিবুম, যে লজের অ্যাকাউন্টস তুই দেখছিস, সেই লজটা তুই নিজের চোখে দেখেছিস? দেখিসনি? দেখতে চাসওনি? কী রে তুই? কালই এক বার দেখতে চা। তার পর...”

এর পরে আরও মিনিট কুড়ি কৌশানীকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক করছিল ওরা। শেষে কথাকাটাকাটি থামাতে বাধ্য হয়ে

কৌশানী বলেছিল, “ছাড় এ বার, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।”

পর দিন একেবারে বাইরে বেরোনোর ড্রেস পরেই প্রজ্ঞাপারমিতা লাঞ্চ টেবিলে এলেন। কাল রাতে হয়তো দেরিতে ঘুমোতে গিয়েছিলেন, সেই কারণেই হোক অথবা অপরিমিত মদ্যপানের জন্যই হোক, প্রজ্ঞাপারমিতার মুখ-চোখ সামান্য ফোলাফোলা লাগছিল। কৌশানী বুঝল, ভদ্রমহিলার বয়স হয়তো তিরিশের কোঠাতেই হবে, কিন্তু নিজেকে নিয়মিত মেনটেন করার জন্যই বয়স অন্তত বছর পাঁচেক কম লাগে। বিশেষ করে আজ একটা ঘিয়ে কালারের লং-স্কাট আর একটা ডিপ-কাট কুর্তির জন্য আরও খুকি খুকি লাগছিল। চুলটাকেও তিনি চুড়ো করে বেঁধেছিলেন। কপালে একটা তিলক স্টাইলের টিপ। মুখ ছিল গম্ভীর। কৌশানীকে সুপ্রভাত জানিয়ে টোস্টে কামড় দিয়ে প্রশ্ন করলেন, “এনি প্রগ্রেস কৌশানী?”

কৌশানী এর জন্য তৈরিই ছিল। আজ এন্ট্রি করতে করতেই সে বুঝতে পারছিল কোথাও একটা গম্ভগোল আছে। এন্ট্রি বন্ধ করে সে বসে পড়েছিল জিএসটি মেলাতে। হিসেবমতো স্ট্যান্ড-অ্যালোন রেস্টুরাণ্টগুলোতে ফ্ল্যাট পাঁচ শতাংশ জিএসটি নেওয়া হয়, উইদাউট আইটিসি। এক মাত্র যে আবাসিক হোটেলগুলোতে রুম ভাড়া সাড়ে সাত হাজার টাকার বেশি, সেখানে আঠেরো শতাংশ। কৌশানী পুরো ফাইল খেঁটে যা বুঝেছে তাতে ‘লিটল আইল্যান্ড লজ’-এর রুমের সর্বোচ্চ ভাড়া দু’হাজার টাকার বেশি হতেই পারে না। সিম্পল হিসেব আর সেই হিসেবের পুরোটাই এঙ্গেলে ফেলে কৌশানী দেখল গড়বড়ই গড়বড়। সব বিলে হয়তো নয়, তবে কিছু বিলে যোগে ভুল আছে আবার কোনওটা জিএসটির মিস-ক্যালকুলেশন। এমনও হয়েছে পাঁচ শতাংশ জিএসটি ক্যালকুলেট করেও আদতে তিন শতাংশের অ্যামাউন্ট লেখা হয়েছে। বেশ কয়েকটি বিলে দৃশ্যত কোনও জিএসটিই নেওয়া হয়নি খদ্দেরের কাছ থেকে। আবার কোনওটায় সব ঠিকঠাক, কিন্তু গ্রস টোটালে কম লেখা। আর সেটা প্রধানত কন্টিনিউড বিলের ক্ষেত্রে হয়েছে বেশির ভাগ। অর্থাৎ খদ্দের হয়তো দিন পাঁচেক ছিল। বিল বানানো হয়েছে গোটা ছয়েক। সেখানে এক বিলের টোটাল অ্যামাউন্ট পরের বিলে ক্যারি ফরওয়ার্ড করতে গিয়ে টাকা কমে গেছে একশো টাকা থেকে দেড়শো টাকা। এটা কি ইচ্ছাকৃত নাকি হোটেলের ম্যানেজার ক্লাস টু পাস? কোনও কোনও বিল দেখে সন্দেহ জাগায় ঘরের উজ্জ্বল আলোর নীচে ফেলে দেখেছে, অরিজিনাল বিলের কপিতে প্রচুর কাটাকুটি হয়েছে, তারই দাগ এসে পড়েছে ডুপ্লিকেট কপিগুলোতে। এই সব কি আগের মেয়েটি খেয়াল করেনি? প্রজ্ঞাপারমিতাও কি কখনও খেয়াল করেননি? আফটার অল খদ্দেররাও কি এতটাই মূর্খ যে পুরো বিল চেক না-করেই চেক-আউট করে গেছে? হয়তো চেক করেছিল। যখন দেখতে পেয়েছে কম বিলিং হয়েছে, মুচকি হেসে কেটে পড়েছে। হতেই পারে। ভাবতে ভাবতে কৌশানীর মনে আর-একটা ভাবনাও চলকে এল। যদি এমন হয়, যে অরিজিনাল বিলে ঠিকঠাক ক্যালকুলেশন করা হয়েছিল ডুপ্লিকেট কপির উপরে কার্বন কপি না-ফেলেই। তার পর খদ্দের চলে গেলে ডুপ্লিকেট কপির উপরে কার্বন ফেলে তার উপরে অন্য অ্যামাউন্ট লিখে এই রকম সন্দেহজনক বিল বানানো হয়েছে। হতে পারে না কি?

কৌশানীর প্রত্যেকটা বাক্য শুনতে শুনতে প্রজ্ঞাপারমিতার খাওয়া থেমে গিয়েছিল। তিনি বার তিনেক হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। তবুও তার বক্তব্য শুনলেন ভারী মনোযোগ দিয়ে। সব শেষে দম নিয়ে কৌশানী বলল, “তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার। এটা বছর তিনেক আগেকার ফাইল। আপনি কি রিভাইজ রিটার্ন সাবমিট করতে চান?”

হাত তুললেন প্রজ্ঞাপারমিতা। থেমে গেল কৌশানী। কিছু ক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থেকে মুখ তুললেন প্রজ্ঞাপারমিতা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলেন কৌশানীকে। এই দৃষ্টি কৌশানীর অচেনা। কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! তার পর কী-একটা বলতে চেয়ে মুখ খুলেও আচমকাই প্রজ্ঞাপারমিতা চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গেলেন। কৌশানী ভারী অবাক হয়ে গেল। ভুল ধরিয়ে দিয়ে সে কি কোনও অপরাধ করে ফেলল? কিন্তু সে তো অ্যাকাউন্টেন্ট। অ্যাকাউন্টেন্টটা ঠিকঠাক রাখা আর এমপ্লয়ারকে রেগুলার

আপডেট দেওয়াই তো তার কাজ। যাক গে, তার কাজ সে করে দিয়েছে। কৌশানী ধীরে ধীরে তার খাবার শেষ করল। আপাতত অ্যাকাউন্টসের আরও ভুল বের করা তার প্রধান মাথা-ব্যথা নয়।

“আজ কত তারিখ?”

“আজ? তেরো। শনিবার।”

“কোন ইয়ার?”

কৌশানী বলল। হিমাড্রি ভুরু কঁচকে বলল, “মিতা কোথায়? আর বাকি লোকজন?”

“প্রজ্ঞাপারমিতা ম্যাডামের কথা বলছেন তো? তিনি বাইরে গেছেন। কাজে। গত শনিবারও গিয়েছিলেন। দণ্ডবাবুও নেই। বাড়ি ফাঁকা।”

“ফাঁকা? একদম ফাঁকা? আমি এক বার বাইরে গিয়ে দেখি?”

“দেখুন না।”

খাট থেকে নামতে গিয়েও হিমাড্রি নামল না। কৌশানীর দিকে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে বলল, “আপনার পেটে পেটে যতই বুদ্ধি থাক, আমার পেট থেকে একটা কথাও বের করতে পারবেন না। আমি কিছুই বলব না। নাথিং।”

“কিন্তু আমি যে আপনার সঙ্গে শুধু কথা বলতেই এসেছি। কোনও কথা জানতে আসিনি। আগের দিনই তো বললাম। ভুলে গেলেন বুঝি?”

হিমাড্রি বিকৃত গলায় এক প্রকার বিড় বিড় করল, “কত দিন হয়ে গেল কেউ শুধু কথা বলতে আসেনি।”

মানুষটার মধ্যে একটা শিশুসুলভ ব্যাপার আছে। সেই ছাপ পুরো মুখেই। কৌশানী হিমাড্রির কজিতে একটা হাত রাখল। হিমাড্রি সিঁটিয়ে গিয়ে হাত সরিয়ে দিল। কৌশানী জিজ্ঞেস করল, “দেখুন। আমি হয়তো আর কিছু দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব। আপনি না-চাইলে আমার সঙ্গে কথা না-ই বলতে পারেন। আমি...”

হিমাড্রির চোখ চলে গেছে জানালা-পথে গলে আসা তরল রোদের দিকে, “বাইরে খুব রোদ। তাই না?”

“ঠিক তাই? আপনি বাইরে যাবেন?”

এ বার মনে হল কৌশানীর কথা তার কানে ঢুকল না। সে নিজে বলেই বলে চলল, “সানলাইট, গোল্ডেন সানলাইট।”

কৌশানী খেয়াল করল, হিমাড্রির চোখদুটো স্বপ্নালু হয়ে এসেছে। নিজের মনে একটু হেসে হিমাড্রি ফের বলল, “দ্য সান ইলুমিনেটস অনলি দ্য আই অব দ্য ম্যান, বাট শাইনস ইন্টু দ্য আই অ্যান্ড দ্য হার্ট অব দ্য চাইল্ড।”

“বাহ। সুন্দর কথাগুলো তো।”

“আপনি জানেন কার লেখা? র‍্যালফ ওয়াল্ডো এমারসন।”

কৌশানী জীবনে এর নাম শোনেনি। তবু বলল, “আচ্ছা।”

“আঠেরোশো তিন সালের পঁচিশে মে জন্ম।”

কৌশানী আন্দাজে টিল মারল, “কবি ছিলেন?”

“হ্যাঁ। তা ছিলেন। শুধু কবিই নন, হি ওয়াজ্জ আ গ্রেট এসেইস্ট, লেকচারার, ফিলোজফার অ্যান্ড অ্যান অ্যাবোলিশনিষ্ট। হি ইজ্জ অলসো ওয়েলনোন অ্যাজ্জ আ মেন্টর।”

“আপনার নিশ্চয়ই বিশ্বসাহিত্য নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা?”

“দূর! ওয়াল্ডো যে দিন জন্মগ্রহণ করেন, তার অনেক বছর পরে, ওই দিনেই আমি জন্ম নিই। তাই মনে আছে। নইলে আমি এমন-কিছু স্টুডিয়াস ছেলে নই। বাইরের রোদটা দেখে, আজ অনেক দিন পরে ওয়াল্ডোর কথাগুলো মনে এল। একেই বলে গোল্ডেন সানলাইট।”

“হ্যাঁ। তা ঠিক। তবে এই সময় বেরোলে গোল্ডেন ফিলিংস আসবে কি না জানা নেই, তবে সান-স্ট্রোক হলেও হতে পারে।”

এই প্রথম ডান গালে টোল ফেলে হিমাড্রি হাসল। জানালায় দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সরাসরি তাকাল কৌশানীর চোখের দিকে। কী মিষ্টি সরল সেই হাসি। কী অসম্ভব স্বচ্ছ সেই চোখের মণি। এই প্রথম কৌশানী ভিতরে ভিতরে একটা চঞ্চলতা টের পেল। একটা নির্জন দুপুরে একটা পূর্ণবয়স্ক পুরুষের সঙ্গে... নিমেষে নিজের মনকে থিক্কার দিল সে। কী হচ্ছেটা কী!

এর পরে বেশ কিছু ক্ষণ কেটে গেছে। অনেকটা স্বপ্নোত্তির মতো হিমাঙ্গি বলল, “ফেলিসবার্গেও এখন বেশ গরম। কিন্তু এখনকার মতো ইরিটেশন হয় না।”

“ফেলিসবার্গ! মানে?”

হিমাঙ্গি ফের হাসল। তার পর স্বপ্ন দেখার মতো স্বরে বলল, “ইয়েস। ফেলিসবার্গ। ফেলিসবার্গ, কুইবেক, কানাডা। খুব সুন্দর আমাদের সেই গ্রাম। মাউন্ট পিনাকেলের নীচে পুরো গ্রামটাই বড় বড় পাইন গাছে ঢাকা। এত বড় গাছ যে, এক অঞ্চল থেকে আর-এক অঞ্চল দেখা যায় না। হা হা হা। থ্যাঙ্কস।”

হিমাঙ্গির দাঁতের সারিও প্রশংসনীয়। সেই দিকে তাকিয়ে থেকে কৌশানী বলল, “ধন্যবাদ কেন?”

“আজ অনেক দিন পরে আমি প্রাণ খুলে হাসলাম, তার জন্য।”

কৌশানী বিস্ময় প্রকাশ করল, “বাট, আপনি কানাডার লোক! ওএমজি! আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনি বাঙালি নন। কিন্তু ওখান থেকে এখানে কী করে এলেন?”

হিমাঙ্গি অন্যমনস্ক হল, “আমার ফোরফাদার্স ওয়াশ লিভড ইন ফেলিসবার্গ। আই হ্যাভ ভিজিটেড মাই প্লেস আ নান্সার অফ টাইমস। বাট, আমাদের পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস দিল্লিতে। চিত্তরঞ্জন কলোনি। দেয়ার আই মেট মিতা।”

“কিন্তু হিমাঙ্গি নামটা তো বাঙালিদের হয়, মানে জেনেরালি।”

“ওহ গড! আমি জেরেমি সন্ডার্স। মিতা রিনেমড মি অ্যাঞ্জ হিমাঙ্গি।”

“জেরেমি সন্ডার্স।”

কোথায় শুনেছে এই নামটা কৌশানী! সামান্য ভাবতেই মনে পড়ল। হিমাঙ্গি বলল, “ইয়েস, কানাডিয়ান অ্যাওয়ার্ড-উইনিং অ্যাক্টর।”

“সেটা জানতাম না। আমাদের সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রোফেসর শঙ্কর গল্পগুলোয় একটা ক্যারেক্টার থাকত, জেরেমি সন্ডার্স।”

“ইয়া। আই হ্যাভ হার্ড আবাইট রো। গ্রেট ডিরেক্টর। বাট শাকু...”

“বাদ দিন। আমার একটাই প্রশ্ন। আপনি এই ঘরে কী ভাবে? আই মিন অ্যাঞ্জ আ ক্যাপটিভ!”

হিমাঙ্গি নড়েচড়ে বসল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সশব্দে বেরিয়ে এল, “আহ, দেয়ার ইজ আ লং লং আনক্যানি স্টোরি।”

“প্রজ্ঞাপারমিতা ম্যাডাম আপনার কে হন?”

“ওয়াইফ। ডেস্টিনি, অল ডেস্টিনি।”

ফের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল হিমাঙ্গি। কৌশানীর খুব ইচ্ছে করছিল এই শিশুসুলভ মানুষটিকে সে জেরি বলে ডাকে। সেটা বলতেই হিমাঙ্গি ফিক করে হেসে ফেলল, “অফ কোর্স! মাই মম ইউজড টু কল মি। আই মিস হার।”

“দিল্লিতে আপনার কে আছে? মানে আমি যদি খবরটা সেখানে পৌঁছে দিতে পারি, ইফ ইউ উইশ...”

“নো বডি। অল ডেড। ইন অ্যান অ্যান্ড্রিডেন্ট। সবই আমার ডেস্টিনি। তার পর মিতার সঙ্গে আলাপ। লাভ। ম্যারেজ। সোল্ড দ্যাট হাউজ অ্যান্ড...”

হিমাঙ্গি চুপ করে গেল। হয়তো অতীত সুখ আর বর্তমান কষ্ট তার গলা অবরুদ্ধ করে দিল। কৌশানী এক বার বাইরের দিকে কান পেতে তার পর বলল, “বাট জেরি, হাউ কুড ম্যাডাম...”

ওকে কথা শেষ করতে দিল না হিমাঙ্গি, “রুমবুম আমায় একই প্রশ্ন করেছিল। আমার কাছ থেকে সব জেনে নিয়েছিল। অ্যান্ড দেন শি বিকেম ভ্যানিশড।”

“ওর তো চাকরি চলে গিয়েছিল।”

ফোঁস করে উঠল হিমাঙ্গি, “ফুল, ওল্ড ফুল!”

“মানে!”

“তুমি...”

এই অবধি বলে হিমাঙ্গির শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল। সে কান খাড়া করে কিছু শোনার চেষ্টা করল, তার পর ব্রন্ত গলায় বলল, “দণ্ড আসছে। কুইক কুইক।”

কৌশানী কিন্তু কোনও পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। তবে কী করে

টের পেল হিমাঙ্গি? ভাবতে ভাবতেই পিছনের দরজায় ডোরবেলের আওয়াজ। কৌশানীর মনে পড়ল, আজ অতিরিক্ত সাবধানতার কারণে দণ্ড ল্যাচ টেনে চলে যাওয়ার পরেও সে ভিতর থেকে ছিটকিনি আটকে দিয়েছিল। তাই দণ্ড ডোর বেল টিপছে। আচ্ছা, দণ্ড যদি জানতে চায়? কিছু একটা ভুজুংভাজুং দিয়ে দেওয়া যাবে না হয়।

আপাতত কৌশানী হিমাঙ্গির বিছানা ছেড়ে চকিতে লাফিয়ে উঠে বলল, “দরজা বন্ধ করে দাও।”

এর পর কেটে গেছে তিন দিন। এই তিন দিনের মধ্যে শুধু চোন্দো তারিখ, মানে রবিবার হিমাঙ্গি ওরফে জেরির সঙ্গে দেখা করতে পেরেছিল কৌশানী। কারণ সোম আর মঙ্গলবার দুপুরে দণ্ড শুতে যায়নি তার নিজস্ব কোয়ার্টারে। সারা দুপুর পুরো বাড়ি ঘুরঘুর করেছে আর মাঝেমাঝেই অফিসঘরে এসে কৌশানীর সঙ্গে টুকটাক কথা বলেছে। এ বাদেও আরও বার দশেক সে অফিসঘরের দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিল, চোখের কোণ দিয়ে বুঝতে পেরেছে কৌশানী। সে বুঝল, দণ্ড নিশ্চয়ই কিছু-একটা সন্দেহ করেছে। কিন্তু কী ভাবে? রাতেও দরজা ফাঁক করে উকি মেরে দেখেছে করিডরে আলো। ঘর অন্ধকার করে দেখেছে, দরজার বাইরে কারও হাঁটার শব্দ। তার মানে দণ্ড রয়েছে বাড়িতে। ম্যাডাম কি তাকে বলেছে কৌশানীকে পাহারা দেওয়ার ব্যাপারে? কে জানে! অন্য দিন রাতেই বেলা পিছনের দিকের দরজাটা ল্যাচ টেনে বন্ধ করে চলে যায় সে, ফের ভোর হতে না-হতে এসে খুলে দেয়। এই দু’দিন সারা দিন সারা রাত দণ্ড বাড়িতেই ছিল।

এমনিতেই অফিসে কৌশানীর কাজের চাপ খুব-একটা নেই, তার উপরে অনেকটা কমেও এসেছে। এর মধ্যেই সে তিনটে ফাইল শেষ করে ফেলেছে। যা গলদ পেয়েছে, আলাদা ওয়ার্কশিটে কপি করে রেখেছে। খুব ভাল হত যদি রেসপেক্টিভ ইয়ারের জিএসটি রিটার্নগুলো সে হাতের সামনে পেত। তা হলে ডিফারেনশিয়াল শিটটা বানাতে এবং রিভাইজ রিটার্ন সাবমিট করতে প্রজ্ঞাপারমিতার সমস্যা হত না। সেই ফাইল কোথায়? একটা উপায় আছে, তা হলে কৌশানীকে সব ক’টা ফাইল ঘাঁটতে হয়। ম্যাডামকে হোয়াটসঅ্যাপ করে সে বিষয়ে জানতেও চেয়েছে। জবাব এসেছে, “আমি এসে দেখছি।”

কি-বোর্ডে কৌশানীর আঙুল চললেও মাঝেমাঝেই জেরির জন্য মনটা ছটফট করে উঠছে। ছেলেটার মধ্যে কী একটা ম্যাজিক আছে যেন। এই দু’দিন সে নিজেকে খুব বুঝিয়েছে, জেরি আফটার অল এক জনের স্বামী, তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়াটা অনুচিত। আর জেরি কেন তাকে বলেছিল, ওল্ড ফুল? ওটা কি তবে জেরির কোনও ইঙ্গিত? তবে কি কৌশানীর চোখের সামনে যা যা ঘটে যাচ্ছে, সেটা হাতির দেখানোর দাঁত? খাওয়ার দাঁত অন্ধকারেই রাখা হয়েছে? প্রজ্ঞাপারমিতা ম্যাডাম তা হলে কি গোলমালে লোক? কী মুশকিল রে বাবা!

কাজ করতে করতেই কৌশানী ঠিক করল, এক মাস হয়ে গেলেই সে মাইনে নিয়ে কেটে পড়বে। নয়তো জেরির চক্করে পড়ে তারও ওই দশা হবে।

কিন্তু আজও এক বারের জন্য হলেও দণ্ড বাড়ির বাইরে যায়নি। আচমকা তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ব্যাপারটা খুব বিচ্ছিরি, কিন্তু এ ছাড়া উপায় কী? সে টেবিলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। মিনিট পাঁচেক হয়নি, দণ্ড এসে দাঁড়িয়েছে পাশে, “যুমোচ্ছ নাকি? রাতে ঘুম হয়নি?”

মাথা তুলল কৌশানী। মুখে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল। দণ্ড দৃশ্যত ঘাবড়ে গেল, “কী হয়েছে?”

“কিছু না। পেটে ব্যথা। আপনি যান।”

“বুঝি। খাবার হজম হয়নি। ওষুধ দিচ্ছি।”

এক হাতে নিজের তলপেট চেপে আর-একটা হাতে চকিতে দণ্ডের একটা হাত চেপে ধরল কৌশানী, “না। সে ব্যথা নয়। আপনাকে কী ভাবে যে বলি। ম্যাডাম ফেরেননি, তাই না? তা হলে ম্যাডামের কাছে চাইতাম। উফ।”

দণ্ড বুদ্ধিমান। ইতস্তত করে বলল, “ম্যাডামের কাছে হতে পারে, কিন্তু... আচ্ছা তুমি এ ভাবেই বসো। আমি এনে দিচ্ছি।”

“আপনি? এ মা, ছি ছি।”

দণ্ডের গলায় সমবেদনার সুর, “ছি ছি-র কী আছে? তুমি আমার মেয়ের চেয়েও ছোট। কিন্তু এখানে তো কাছেপিঠে দোকান নেই, আচ্ছা সুলেমানকে বলে দেখি। তুমি শুধু ব্র্যান্ডটা লিখে দাও।”

প্রায় চাঁচিয়ে উঠল কৌশানী, “এ মা না না, তা হলে থাক।”

“আচ্ছা, আচ্ছা, আমিই এনে দিচ্ছি। অনেকটা দূরের একটা দোকানে আছে এই সব জিনিস। তুমি লিখে দাও দেখি মেয়ে।”

বাইরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হতেই কৌশানী তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটল জেরির ঘরের দিকে।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে যখন জেরির বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল কৌশানী, তখন তার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড প্রায় লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে, মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। জেরির কথা যদি সত্যি হয়, প্রজ্ঞাপারমিতার স্বরূপ তা হলে এই? তিনি মেয়ে পাচার করেন? লজ-ফজ সব মিথ্যে? প্রত্যাষা তা হলে ঠিকই বলেছিল। পুরো পিয়ালি আইল্যান্ডে ওই একটা টুরিস্ট লজ বাদে সত্যিই আর কোনও লজের অস্তিত্ব নেই! ওএমজি! নানা ডিসট্রিক্ট ঘুরে ঘুরে শিক্ষিত মেয়েদের চাকরির লোভ দেখিয়ে এই ভাবে এখানে নিয়ে আসেন ম্যাডাম? তার পর? উফফফ! আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না কৌশানীর। বন্ধুদের কথা না-শুনে বড্ড ভুল করে ফেলেছে সে। কিন্তু এখন উপায়? কৌশানী প্রশ্ন করেছিল, “পালানো যায় না? পালিয়ে গেলেই তো হয়।”

জেরি ফের বলেছিল, “ওল্ড ফুলস। তা হলে আমি কেন এত দিন এখানে?”

“কিন্তু আপনি তো পুরুষ। তা হলে?”

“আমার কেস অন্য। মিতা জানে আমার দিল্লির ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকা আছে। তা সত্যিই আছে। ফ্রেলিসবার্গের বাড়ির একাংশ বিক্রির টাকা। নমিনি হওয়ার সুবাদে আমার ফাদারের অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রান্সফার হওয়া টাকা। মিতা সেগুলো হাতাতে চায়। সেই লোভে আমায় বিয়ে করেছিল। আমি বুঝতে পারিনি। ও প্রচুর বার চেষ্টা করেছে সেই টাকা নিজের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করিয়ে নিতে। আমি রাজি হইনি। তাই আমাকে জোর করে ইঞ্জেকশন দেয়। প্রতি রাতে। সুলেমান আর দণ্ড মিলে। আরও লোক আছে। মিতা এসে ধমকায়, মেরে পুকুরের জলে ডুবিয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়। আমি জানতে পেরেছি, ও আগে এই ভাবে বেশ কয়েকটি বিয়ে করেছে। তাদের কী হয়েছে আমি জানি না। যদিও আমি একটা আন্দাজ করেছি। ওদের ব্যাঙ্ক খালি করার পরেই হয়তো মেরে পুকুরের জলে ফেলে দিত। আমি জানি, আমার টাকাগুলো যত দিন ব্যাঙ্কে আছে, তত দিন ও আমায় জিইয়ে রাখবে।”

শুনতে শুনতে ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়ছিল কৌশানী, “এই ভাবে হয় নাকি জেরি? ইয়ার্কি হচ্ছে? জাস্ট বিয়ে করে এনে মেরে ফেললেই হল? সিনেমা-সিরিয়াল নাকি? অতই সহজ? বাড়ির লোক পুলিশে ইনফর্ম করবে না? পুলিশ খুঁজবে না? পুলিশ, গোয়েন্দা ডিপার্টমেন্ট পারে না, এমন কী আছে?”

জেরি স্নান হাসে, “এদের প্রচণ্ড বুদ্ধি। আমার মতো টাকাপয়সাওয়ালা নিকটজনহীন ছেলেগুলোই এদের টার্গেট। আর পুলিশ?”

ব্যঙ্গের সুরে হাসে জেরি। কৌশানীর মনে হল সে-ও কিছুটা বুঝতে পেরেছে। প্রত্যাষা বলত, হয়তো মজা করেই, টাকায় নাকি সব হয়। তখন তাকে ধমকে থামিয়ে দিত সে।

চুপ করে গিয়েছিল জেরি। কৌশানীর মনে হল এটা কি স্বপ্ন না সত্যি? তবে কি চাকরিটা জাস্ট রোদচশমার মতো? পুরনো বছরের কোনও এক কাল্পনিক ঠিকানার ‘লিটল আইল্যান্ড লজ’-এর ভুয়ো বিল এন্ট্রি করানো শুধু মাত্র টাইম পাস? আর অত ভাল মাইনের অফার?”

“অল ফেক! স্যালারি-ফ্যালারি সব আইওয়াশ। এক মাস ফুরোনোর আগে তুমি নিজেই ফুরিয়ে যাবে।”

কৌশানীর বুক কঁপে উঠল আবার। তা হলে কি রুমকুম আর শরণ্যা নামের মেয়েদুটিও...

“কিন্তু আপনি তো পালাতে পারতেন। আপনার দরজা তো আপনিই

বন্ধ করে রাখেন।”

“হাহ! পালাতে পারলে কি পালাতাম না? বাইরে সুলেমান রয়েছে। আরও লোক রয়েছে। লোক আছে পুকুরঘাটের দিকেও। তুমি সহজে দেখতে পাবে না। ওরা ম্যাডামের পোষা লোক। তা ছাড়া এ অঞ্চলে পুলিশের ভয়ও রয়েছে।”

“পুলিশ!”

“হ্যাঁ। বছর পাঁচেক আগে পিয়ালি আইল্যান্ড লজে একটা বিচ্ছিরি ঘটনা ঘটে। তার পর থেকে মাঝেমধ্যেই এ দিকে পুলিশ টহল দেয়। বাইরের লোক দেখলেই জেরা করে। তোমায় দেখতে পেলে এই বাড়ির লোকজনদের হ্যারাস করবে।”

হ্যাঁ। হ্যাঁ। মনে পড়েছে। এক দিন রাতে রাস্তায় জনা পাঁচেক পুলিশকে টহল দিতে দেখেছিল সে। পুলিশের উল্লেখ শুনেছে সুলেমানের মুখেও। সে উৎসাহিত হল, “জেরি, এর চেয়ে ভাল আর কী হতে পারে? তা হলে আমি পুলিশকে ব্যাপারটা খুলে বলতে পারব, ওদের এই সব নোংরা কাজ...”

জেরি আচমকাই একটা হাত রাখল কৌশানীর হাতের উপরে। কৌশানীর শরীরটা এক বার শির শির করে উঠল। জেরি তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, “কৌশানী, তুমি খুব ভাল আর সরল প্রকৃতির মেয়ে। পুলিশ কখন, কবে টহল দেয়, সব ওদের নখদর্পণে। সেই সময় তোমাকে কিছুতেই ওরা বাড়ির বাইরে যেতে দেবে না। আর পুলিশ যদি এই বাড়িতে ঢুকেও আসে, তা হলে ওরা তোমায় পুলিশের সামনে আসতে দেবে ভেবেছে? তার আগেই তোমাকে তোমার ঘরে আটকে রেখে দেবে। হাত-পা-মুখ বন্ধ করে।”

“সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে এলেও দেবে না?”

জেরি হাসল, “সার্চ ওয়ারেন্ট! হাহ! জাস্ট এই কারণেই তো বললাম, ইউ আর ভেরি গুড অ্যান্ড সিম্পল কাইন্ড অফ লেডি। মে গড হেল্প ইউ।”

“থানাটা কত দূর?”

“জানি না। তবে কাছে নয়।”

খম হয়ে বসে রইল কৌশানী। আচমকা মনে পড়ল দণ্ড ফিরে আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। সে দিশেহারা হয়ে বলল, “তা হলে?”

মুখ তুলল জেরি, “একটা উপায় আছে। আমি তোমার মতো চাকরি করতে আসা গোটা তিনেক মেয়েকে বলেছিলাম। কিন্তু তারা পারেনি। ভেবেছিল আমিও ওদের এই ঘৃণ্য প্ল্যানিংয়ের সঙ্গে যুক্ত। অল ফুলস। আর আর-এক জন সেই কাজ করতে গিয়ে শেষ অবধি পেরে ওঠেনি। তাদের সবার খবর আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল মিতা নিজে। টচারের লেভেল বাড়িয়েছিল। আমার পিঠটা তোমায় দেখাতে পারছি না।”

“কী? কী? তুমি জাস্ট ওয়ে-আউটটা বলো। প্লিজ, আমায় বলো। আমি বাঁচতে চাই জেরি। প্লিজইজ্জ,” কৌশানীর গলায় কান্না জমে এল।

“শান্ত হয়ে বোসো, কৌশানী। বলে দিতে আমার কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু, তুমি পারবে না। যদি না তুমি নিজেই ঈশ্বর হয়ে যাও।”

জেরির দু’হাত সজোরে চেপে ধরল কৌশানী, “তবুও, বলো। বলো। জাস্ট টেল মি, জেরি, প্লিজইজ্জ।”

“শুনতে চাও যখন শোনো। এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ডান দিকের রাস্তা ধরে সোজা চলে যাবে। একেবারে সোজা। রাস্তা যে দিকে যে দিকে ঘুরবে, তুমিও সেই দিকে সেই দিকে ঘুরবে। রাস্তা একটাই। আন্দাজ মাইল দুয়েক পরে একটা জায়গা আসবে। কী নাম.. কী নাম... মনে পড়েছে কুমারগঞ্জ। কুমারগঞ্জের মোড়ের মাথায় একটা চায়ের দোকান আছে। রাস্তার ডান দিকে। ভাগ্য ভাল থাকলে সেখানে সুকুমারের দেখা পেয়ে যাবে।”

“কে সুকুমার?”

“আমি যখন এখানে আসি, তখন সুকুমার ছিল মিতার ড্রাইভার। ও, কেন জানি না, শুরু থেকেই আমাকে খুব পছন্দ করত। এখানে আসা মাত্রই তো আমি আর ক্যাপিটভ হয়ে যাইনি। যখন কোনও কাজে মিতা বাইরে যেত, ওর ডিউটি অফ থাকত। সেই সময় ওর সঙ্গে অনেক ঘুরেছি এ দিককার গ্রামে গ্রামে। ওর একটা বাইক আছে, তাতে চড়ে। মিতা এক দিন জানতে পেরে যায়। তবে অ্যালাও করেছিল। শুধু বলে

দিয়েছিল, সুকুমারের মতো সাব-স্ট্যান্ডার্ড লোকের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ না হতো। আই ওয়াজ লাকি। আমি ওর কথা শুনি। বেশ কয়েক বার সুকুমারের বাড়িতে আমি গিয়েছিলাম। ওদের ফ্যামিলি মেম্বারদের সঙ্গে লাঞ্চ সেরেছিলাম। কাজ তো তেমন কিছু ছিল না আমার হাতে। তখন যদি জানতাম...”

“তার পর, তার পর?” কৌশানী ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছিল।

“হ্যাঁ। যা বলছিলাম। এই বাড়িতে সুকুমার ছিল আমার এক মাত্র ওয়েল উইশার। এক দিন সুকুমারের চাকরি গেল। কী কারণে, আমি জানতে পারিনি। তার পরেও আমি হাঁটতে হাঁটতে যেতাম ওর বাড়ি। মাস তিনেক পরে ও কুমারগঞ্জের মোড়ে একটা চায়ের দোকান দিল। সেই দোকানেও আমি গেছি, একটা স্ট্রেঞ্জ বেঞ্চ ছিল। আমি ক্যাপটিভ হওয়ার পরেও সে এসেছিল এই বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ওকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। হাউএভার, সেই বেঞ্চে...”

“বাট, জেরি, হাউ কুড হি হেল্প মি? চঞ্চল হয়ে উঠল কৌশানী। তার বকের ধুকপুকনি বেড়েই চলেছে।

“ওহ ইয়েস ইয়েস। ইফ ইউ ক্যান রিচ হিম, এনি ওয়ে, হি ক্যান হেল্প ইউ। মে বি।”

কে সুকুমার! কোথায় কুমারগঞ্জ! তার চায়ের দোকান! কিছুই জানা নেই। তবু শেষ চেষ্টা তো করতেই হবে। কৌশানী কাতর গলায় বলল, “আর তুমি?”

জেরি স্নান হাসল। সে হাসির অর্থ স্পষ্ট। জেরি উঠে দাঁড়িয়েছে। দরজার দিকে ফিরেও ঘুরে দাঁড়াল কৌশানী। এগিয়ে এসে হালকা জড়িয়ে ধরল জেরিকে। অশ্রুতে বলল, “আমি বিশ্বাস করলাম তোমায়। কেন জানো? কারণ বিশ্বাস কোনও জিনিস নয় যে, হারিয়ে যাবে। আমার দাদু বলতেন। ভাল থেকে বন্ধু। কপালে থাকলে আবার দেখা হবে।”

জেরি স্নান বলল, “দেখা হবে বলছ? তুমি দেখছি এক্সট্রিম অপটিমিস্ট।”

“আমি স্ক্রব্রবিশ্বাসী। দেখা হবেই। তোমায় আমি ভুলব না।”

জেরি ওর কপালে একটা চুমু খেল, “তা হলে দেখা হবে নিশ্চয়ই, এক দিন। মে জিসাস হেল্প ইউ।”

“চমৎকার, এক্সেলেন্ট!”

পিছনে কার গলার আওয়াজ। জেরি ছিটকে সরে গেল। বিদ্যুৎ গতিতে পিছন ফিরল কৌশানী। দরজায় প্রজ্ঞাপারমিতা! তার পিছনে একটা কালো প্লাস্টিক হাতে দণ্ড। সারা শরীরটা এক বার থরথর করে কেঁপে উঠল কৌশানীর। প্রজ্ঞাপারমিতার মুখে সাপের হাসি, “এক্সেলেন্ট মিস অ্যাকাউন্টেন্ট। একেবারে ব্যাল্যান্স শিট অবধি পৌঁছে গেছে দেখতে পাচ্ছি। দাঁড়িপাল্লায় এগজ্যাক্টলি সমান সমান। অ্যাঁ?”

কৌশানী দেখল জেরি সিঁটিয়ে গিয়ে বিছানায় উঠে কুঁকড়ে বসে পড়েছে। সে কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, প্রজ্ঞাপারমিতার চোখে যেন দুটুকরো কয়লা জ্বলে উঠল, “আমার ঘরে এসো।”

কৌশানীর মনে পড়ল, আজ বুধবার। প্রজ্ঞাপারমিতার ফিরে আসার দিন। আর দণ্ড বেরিয়ে গেছে ল্যাচ টেনে দিয়ে। সে-ও ভেতর থেকে ছিটকিনি দেয়নি। ভুল! ভুল!

এই প্রথম প্রজ্ঞাপারমিতার পিছন পিছন তাঁর শোয়ার ঘরে ঢুকল কৌশানী। বাপ রে! নিজের ঘরটাকে তো ইন্ডের অমরাবতী করে সাজিয়ে রেখেছেন মহিলা! কিন্তু সেই শোভা দর্শনের মানসিকতা তার ছিল না। হাত-পা কখন ঠান্ডা হয়ে গেছে। একটা চেয়ারে প্রজ্ঞাপারমিতা বসলেন কিন্তু কৌশানীকে বসতে বললেন না। প্রজ্ঞাপারমিতা মুখ কিন্তু ফের হাসি হাসি, “তা হলে অ্যাসেস্ট না লায়াবিলিটি, কোনটা এক্সেস হল কৌশানী?”

কৌশানী চুপ। প্রজ্ঞাপারমিতা কিছু ক্ষণ খর চোখে দেখলেন ওকে। তার পর বললেন, “নিশ্চয়ই অনেক কিছু জেনে গেছে এই কদিনে? তবে একটা ব্যাপার জানতেই পারলে না। সিলি গাই! এই বাড়ির সব ক’টা দেওয়ালে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে।”

হতভম্ব কৌশানী চার দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিল। সব দেওয়ালে ক্যামেরা

লাগানো ছিল! আর একটাও তার চোখে পড়েনি? প্রজ্ঞাপারমিতা ফের সাপের মতো হিস হিস করে বললেন, “খুঁজে লাভ নেই। পাবে না। সব কিছু দেখার চোখ নিয়ে সব মানুষ জন্মায় না, কৌশানী। হিডেন ক্যাম বোঝ? এয়ার কন্ডিশনারের উপরে, ওয়াল পেইন্টিংয়ের ভিতরে, সোফার হাতলে, হিমাদ্রির ঘরের টেবিলের উপরে রাখা ফুলদানিতে, অফিসঘরে, কোথায় নেই? আর সেই সব আমি দেখি আমার মোবাইল স্ক্রিনে। আমি তোমাকে ওয়াচ করেছি বেশ কিছু দিন ধরেই। তার পর বলো, হিমাদ্রিকে, সরি, ও নিশ্চয়ই নিজের নাম বলে দিয়েছে। আগের মেয়েগুলোকেও বলেছিল। সবটুকু। তো, তাদের মতো তুমিও কি জেরেমির প্রেমে পড়েছ? মানে আমার হাজ্জব্যান্ডের প্রেমে?”

কৌশানী কুঁকড়ে গেল, “ছি ছি, কী বলছেন ম্যাডাম? আমি...”

এই বার যেন সারা বাড়ি কাঁপিয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা টেঁচিয়ে উঠলেন, “শাট আআআআপ।”

কৌশানীর মনে হল, তার হাঁটুতে আর কোনও সাড় নেই।

প্রজ্ঞাপারমিতার কড়া নির্দেশ জারি হল। চুক্তি-মতো এই মাসের ছয় তারিখ, শনিবার সে কাজে জয়েন করেছিল। সেই হিসেবে আসছে মাসের পাঁচ তারিখ অবধি সে কাজ করতে বাধ্য থাকবে। আরও চারটে ফাইল তাকে পেড়ে দিয়েছে দণ্ড। ছ’ তারিখ মাইনে নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে তাকে চিরতরে চলে যেতে হবে। যোগেন তাকে মহিষমারি বাজার অবধি ছেড়ে দিয়ে আসবে। প্রজ্ঞাপারমিতার দয়ালু মন। তাই তাকে একেবারে ঘরে বন্দি করে রাখবেন না হিমাদ্রির মতো। তবে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে যাওয়া বারণ, এমনকি পুকুরঘাটের দিকেও নয়। বাড়ির বাইরে সুলেমান সর্ব ক্ষণ তার পাহারায় থাকবে। আরও লোক রয়েছে। আর বাড়ির ভিতরে পাহারা দেবে দণ্ড। সে দেখবে, শুধু অফিসঘর আর নিজের শোয়ার ঘর ছাড়া অন্য কোনও ঘরে যেন কৌশানী পা রাখতে না পারে। লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট, ডিনার সব তার শোয়ার ঘরেই দিয়ে আসা হবে।

ম্যাডামের আদেশ শুনতে শুনতে কৌশানী মনে মনে হিসেব করতে শুরু করে দিয়েছিল। ম্যাডামের কাছ থেকে এক বার ছুটকারা পেলেই সে বন্ধুদের ফোন লাগাবে। তবে এখনই নয়। রাতে। ডিনার শেষ হলে। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে। প্রথমে সৌজিতাকে। সে খুব করিতকর্মা মেয়ে। নিশ্চয়ই রাত ফুরোলেই সে, যে করে হোক, লোকজন জোগাড় করে এখানে চলে আসবে। হয়তো পুলিশ নিয়েই। এক বার তারা এখানে পৌঁছে গেলেই কেবলা ফতে। প্রজ্ঞাপারমিতা আর তাঁর দলবলের কী হবে সেটা জানার বিন্দু মাত্র ইচ্ছে তার নেই। এক বার কলকাতায় পা রাখতে পারলেই যেন তার ইহজন্ম সার্থক হয়ে যায়। আর হ্যাঁ, সম্ভব হলে জেরিকেও সে নিয়ে যাবে নিজের সঙ্গে। কলকাতায় পা দিয়ে জেরি যেখানে যেতে চায়, সেখানেই তাকে পৌঁছে দিয়ে আসা যাবে। আর যদি জেরি... নাহ। এখনই ভেবে ফেলাটা বাড়াবাড়ি হবে। সবার আগে ফোন করাটা দরকারি। কৌশানীর এক বার মোবাইল, যদি দণ্ড দরজায় কান পেতে থাকে? তার চাইতে হোয়াটসঅ্যাপ করে দেবে সে। তিন বন্ধুকেই।

“মোবাইল?” হাত বাড়িয়েছেন প্রজ্ঞাপারমিতা।

“অফিসঘরে,” কাঁপা গলায় জবাব দিল কৌশানী।

“চলো।”

প্রজ্ঞাপারমিতা যখন তার হাত থেকে মোবাইলটা নিয়ে সুইচড অফ করে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, আক্ষরিক অর্থেই কেঁদে ফেলল কৌশানী। তত ক্ষণে প্রদীপের শেষ আলোটুকুও নিবে গেছে তার চোখের সামনে থেকে।

নিয়মমতো ঠিক বিকেল চারটের সময় দণ্ড এসে তার চা-বিস্কুট দিয়ে গিয়েছিল অফিসঘরেই। সেই চা ঠান্ডা জল হয়ে গিয়েছে পড়ে থাকতে থাকতে। ভাল লাগছে না, কিছু ভাল লাগছে না কৌশানীর। সে তার চেয়ারে ঠায় বসেছিল রাত অবধি। তাকে অফিসঘরেই ডিনার সার্ভ করে গেছে দণ্ড, মুখে কিছু বলেনি। সেই ডিনারের একটা দানাও দাঁতে কাটতে পারেনি কৌশানী।

রাতে শুতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। কে বা কারা যেন তার ঘর

লভভন্ড করে দিয়েছে। তার সুটকেস, সুটকেসের ভিতরের সব জামাকাপড়, অন্তর্বাস, এমনকি ব্রাশ-পেস্টও কে যেন উম্মাদের মতো ঘরের নানা দিকে ছুড়ে ছুড়ে ফেলেছে। কী খুঁজছে ওরা? কী চাইছে? কৌশানীর পা ভেঙে আসছিল।

সে দিন রাতে কৌশানী ঘুমের মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখে বারে বারে জেগে উঠে ভেবেছে, মাস শেষ হলে সত্যি এরা তাকে ছেড়ে দেবে তো? সে যদি বাইরে গিয়ে সবাইকে বলে দেয়? সেই আশঙ্কাও কি এদের মাথায় নেই? বড্ড বাড়ির জন্য মন কাঁদতে লাগল তার। বন্ধুদের মুখগুলো ভেসে উঠতে লাগল। কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলবে কী উপায়ে? তার ফোন সুইচড অফ দেখে বন্ধুরা চিন্তা করবে। তার চাইতেও বড় ভয়, যদি ফোন না-পেয়ে ওরা তাকে দেখতে চলে আসে? তা হলে তো ওদেরও সমূহ বিপদ।

পর দিন দুপুরে লাঞ্ছের আগে, কৌশানী হিসেবপত্র দেখছিল। যদিও সে জেনে গেছে, এ সবার বাস্তবিক কোনও মূল্য নেই। ধোঁকা, সবটাই বিশাল একটা ধোঁকা। জেরি ঠিকই বলেছিল। জেরির প্ল্যানটা সার্থক তখনই হবে, যখন সে বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারবে। কিন্তু আজ সকালে দু'বার বাইরের ঘরে গিয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছে, সুলেমান তো বটেই, তার সঙ্গে আরও জনা সাতেক লোক ঘোরাঘুরি করছে বাইরে। সে গেট অবধি গিয়েও বা কী করবে? বাইরে এক পা রাখলেই ওরা ওকে ধরে ফেলবে। হয়তো ওদের সঙ্গে রিভলভার রয়েছে। লাভের লাভ কিছুই হবে না। হওয়ার মধ্যে তার গুলিবিদ্ধ শরীরটা কিছু ক্ষণ পড়ে থাকবে রাস্তার ধারে, তার পরে তলিয়ে যাবে পদ্ম বিলের নীচে।

এমন সময় বাইরে কিসের একটা গোলমাল শুনে কৌশানী দৌড়ে গিয়ে চোখ রেখেছিল সদর দরজার জানালায়। পর্দার ফাঁক দিয়ে চোখ বিস্তারিত করে দেখেছিল, জেরিকে পাঁজাকোলা করে সুলেমান সহ আরও চার জন তুলছে একটা বড়সড় গাড়িতে, পাশে দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা। জেরি হাত-পা ছুড়ে প্রতিবাদ জানানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু লোকগুলো মারাত্মক শক্তিশালী। জেরির মুখ বাঁধা। শুধু তার গোঙনিটাই ভেসে যাচ্ছে উত্তাল হাওয়ায়।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা জেরিকে? মেরে ফেলবে নাকি? কৌশানীর মনে হল, বঁচে ফিরলে সুন্দর চেহারার যে কোনও মহিলাকে সে আর বিশ্বাস করতে পারবে না। জেরিকে নিয়ে গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেলে, কৌশানীর চোখদুটো ভিজে এল। দুঃখিত, জেরি, তোমার জন্য আর কিছু করা গেল না।

তার পরের দিন কুড়ি তারিখ। শনিবার। আজ প্রজ্ঞাপারমিতা বাড়িতে। কৌশানীর বড্ড হতাশ লাগছিল। হয়তো সবটাই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে হাতে হাতে ধরে বসে থাকলে কিছুই হয় না, কিন্তু উপায় কী? ভাবতে ভাবতে দুপুর গড়িয়ে গেল। কি-বোডে কৌশানীর হাত যেন আর চলতে চাইছিল না। চার দিকের সব কিছু তার কাছে ভয়ঙ্কর মিথ্যে মনে হচ্ছিল। মিথ্যে, মিথ্যে, সব মিথ্যে।

নাহ, আর মিথ্যে মিথ্যে কাজের অভিনয় করে লাভ নেই। কৌশানী ঠিক করল, সে এখনই ম্যাডামকে জানিয়ে দেবে, সে আর কাজ করবে না। তার পুরো স্যালারির দরকার নেই, বস্তুত পাপের একটা টাকাও সে হাত পেতে নিতে চায় না। সে ম্যাডামকে বলে দেবে, মাসের বাকি দিনগুলো সে বসে বসেই কাটিয়ে দেবে। আর তার খাইখরচের জন্য যে টাকা লাগবে, সে তা গিয়ে পাঠিয়ে দেবে। বিশ্বাস না হলে তার মোবাইলটা রেখে দিতে পারে। ওটা কিনতে কৌশানীর হাজার ছয়েক গলে গিয়েছিল।

মনঃস্থির করে নিয়ে ম্যাডামের ঘরের সামনে গিয়ে কৌশানী দরজায় টোকা দিল। এক বার, দু'বার, তিন বার। তার পর সামান্য ঠেলে দেখল, দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। সে কান পাতল। ভিতরে কোনও শব্দ নেই। সে “ম্যাডাম, ম্যাডাম, আমি কৌশানী, কথা ছিল” বলে দু'চার বার হাঁক ছাড়তেও দরজা খুলল না, তবে দণ্ড এসে উপস্থিত হল। “ম্যাডামকে বিরক্ত করো না। নিজের ঘরে যাও,” দণ্ডের গলায় স্পষ্টতই

আদেশের সুর।

“ধুন্তোর, নিকুচি করেছে,” বলে সে দিনের ঘটনার পরে, সে প্রথম বার সদর দরজার বাইরে পা দিল। আশাই করছিল সে, বাইরে এসে দেখল, সিঁড়িতে সুলেমান বসে বসে বিড়ি টানছে। দরজায় শব্দ হতেই উঠে তাকিয়েছে। মুখে সেই অমায়িক হাসি, “দিদি, সবই তো জানেন। বাইরে যাবেন না। প্লিজ।”

কৌশানী স্নান হাসল, “জানি। আমি এখন বন্দি এই বাড়িতে।”

সুলেমান হাত-টাত কচলে বিনয়ের অবতার হল, “আরে না, না। ম্যাডাম রেগে গেলে অমনই বলেন। কিন্তু আমরা তো চাকর-বাকর মানুষ। ম্যাডাম যদি বলে পা উপরে মাথা নিচু করে দাঁড়াও সুলেমান, আমি তা-ই করব। বাকিরাও করবে।”

প্রজ্ঞাপারমিতা বেছে বেছে লোক রেখেছেন বটে। কৌশানী আড়চোখে চার দিকে তাকিয়ে দেখল, কিন্তু ‘বাকি লোক’ বলে কাউকে নজরে এল না। সে দু'ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল। শশব্যস্ত হয়ে উঠল সুলেমান, “এ মা, কী করছেন? কী করছেন?”

তার কথায় কান না-দিয়ে গেটের দিকে হালকা পায়ে হাঁটতে শুরু করল কৌশানী, “সুলেমান, ম্যাডাম আমাকে বাড়ির বাইরে যেতে মানা করেছেন। গেট অবধি যেতেই পারি। সন্দেহ হলে ম্যাডামকে জিজ্ঞেস করে নাও। এই বাড়িভারির মধ্যেটাও তো বাড়ি। ঠিক না? ভয় নেই। আমি পালাব না। পালিয়ে যাব কোথায়? আমি কি এ দিকের কিছু চিনি?”

গেট অবধি পৌঁছোতেই সুলেমানের কড়া হুমকি কানে এল, “বাস! আর নয়। ফিরে আসুন। নইলে...”

কৌশানী গেট খুলে দাঁড়াল, “নইলে আমায় কোলে করে তুলে নিয়ে যাবে বুঝি, সুলেমান? তাই নিয়ে যাও দেখি। বাড়ির ভিতরে।”

এমন আচমকা প্রস্তাবে ভড়কে গিয়ে হাত থেকে বিড়ি ফেলে দিল সুলেমান। ওর চোখদুটো চক চক করে উঠল। মুহূর্তের অন্যমনস্কতা। কাজে লাগাল কৌশানী। গেট থেকে বেরিয়ে ডান দিকের রাস্তায় টেনে লাগাল দৌড়।

“অ্যাঁই, অ্যাঁই...”

একটা বিশ্রী গালি দিয়ে পিছনে প্রাণপণে দৌড়ে আসছে সুলেমান। সঙ্গে আরও কিছু পায়ের শব্দ। কৌশানী আন্দাজ কুড়ি-পঁচিশ ফুট দৌড়োতেই নিজের ছন্দ ফিরে পেল। সে দৌড়ে বরাবরের ফার্স্ট গার্ল। কৌশানী নিজেকে বোঝাল, কাম অন নিব্বুম, ইউ ক্যান। কৌশানী উষ্কার গতিতে উড়ে চলল।

প্রায় মাইলখানেক দৌড়ে এসে কৌশানী দাঁড়িয়ে পড়ল। এখন যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে, সেই পথের দু'দিকে বিস্তীর্ণ চাষের মাঠ, এক বলকে তা-ই মনে হল কৌশানীর। ফলে বহু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে এখান থেকেই। নাহ, কেউ তার পিছনে নেই। এটা অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। আবহাওয়া যেমন গরম, তেমনিই কৌশানীর দৌড়ের গতি। ফলে প্রায় সব মানুষই, অনেকটা দৌড়ে, দাঁড়িয়ে পড়বে। কৌশানী গলগল করে ঘামছিল। ক্লান্তি নেমে আসছিল সারা শরীর বেয়ে। সে বসে পড়ল কাদামাটির উপরেই।

মিনিট-কুড়ি পরে কৌশানী দেখল, সে যার বাইকে বসে আছে, সে অন্তত ঘণ্টায় যাট কিলোমিটার স্পিডে ছুটছে। কৌশানীর মনে পড়ল দাদু, বলত, “দিন এক বার ভাল শুরু হলে সারা দিনটাই ভাল যায়।” সুলেমানদের হাত ছাড়িয়ে সে পালাতে পারবে, দৌড় শুরু করার পাঁচ সেকেন্ড আগেও ভাবেনি। ভাবেনি সে কুমারগঞ্জ খুঁজে পাবে এবং সুকুমারবাবুর চায়ের দোকান খোলা পাবে এবং হাঁপাতে হাঁপাতে সুকুমারবাবুকে মোটামুটি ঘটনাটা খুলে বলতেই তিনি একটা ছেলেকে লোকানে বসিয়ে শশব্যস্ত হয়ে তখনই তাঁর বাইক বের করে বলবেন, “আর বলতে হবে না, দিদি। বুঝতে পেরেছি। তাড়াতাড়ি বসুন। যেতে যেতে কথা হবে।”

পিছনে একটা শব্দ উঠল। কৌশানী ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, তাদের পিছনে, যদিও বহু দূরে, একটা জিপগাড়ি ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে। কৌশানী সিঁটিয়ে গেল। নিশ্চয়ই ওরাই। সুকুমারবাবুও সেটাই আন্দাজ

করে বাইকের চাকায় ঝড় তুললেন।

যেতে যেতে অবশ্য ‘সব’ কথা হল না। প্রচুর শব্দ হাওয়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে মিশে যাচ্ছিল বাতাসে। কৌশানী যদিও কান পেতে সবটা শোনার চেষ্টা করছিল। এই মুহূর্তে এই মানুষটা তার কাছে ঈশ্বরের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। সুকুমারবাবু বলছিলেন, জেরেমির সঙ্গে কাটানো তাঁর সুন্দর মুহূর্তগুলো। এক দিন এক অসতর্ক মুহূর্তে তিনি শুনে ফেলেছিলেন ম্যাডামের সব কথা, কোনও একটা জঘন্য পরিকল্পনার ব্লু-প্রিন্ট। ধরাও পড়েছিলেন হাতে নাতে। পালানোর চেষ্টা করেও পারেননি। বহু দিনের বিশ্বস্ত ড্রাইভার বলে প্রজ্ঞাপারমিতা তার কোনও ক্ষতি করেননি। এক মাসের অতিরিক্ত মাইনে দিয়ে বিদেয় করেছিলেন সুকুমারকে।

যদিও সুকুমার এবং প্রজ্ঞাপারমিতা দু’জনেই জানতেন, ঘরের কথা বাইরে প্রকাশ হয়ে গেলে ম্যাডামের কিছু যাবে-আসবে না, কিন্তু সুকুমারের নাবালিকা কন্যা এক দিন বাড়ি ফিরে আসবে না। চাকরি যাওয়ার পরেও কিন্তু জেরেমির সঙ্গে বন্ধুত্বটা টিকে ছিল। তা-ও এক দিন বন্ধ হয়ে গেল। জেরেমি সবাইকেই চেষ্টা করে তাঁর কাছে পাঠানোর। আজ অবধি কেউই পারে না, কৌশানী পেরেছে বলে আজ সে বেঁচে গেল।

কৌশানী মনে মনে বলল, ‘এখনও অবধি। এর পরে কী হবে, ভগবান জানে!’ সুকুমারবাবুর কথা শুনেতে শুনতে কৌশানীর চোখ বেয়ে নেমে আসছিল ঘুম। তার মোবাইল, তার ব্যাগপন্ডর সব রয়ে গেল ওই বাড়িতে। থাকুক।

কত ক্ষণ সুকুমার বাইক উড়িয়েছে মনে নেই, কৌশানীর হুঁশ ফিরে এল, সুকুমার যখন বাইকের গতি কমিয়ে একেবারে থামিয়ে দিলেন।

“কোথায় এলাম?”

সুকুমার এক বার পিছন দিকে তাকিয়ে নিয়ে সামনে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, “আর ভয় নেই। ওই দেখা যাচ্ছে হাইওয়ে। ওটা পেরোলে উল্টোদিকে একটা শটকাট রাস্তা আছে। সেই রাস্তা ধরে মাইল কয়েক গেলেই দক্ষিণ বারাসাত। ওই অবধি আমি পৌঁছে দিচ্ছি। ওখান থেকে বাস ধরিয়ে দিলে বাড়ি যেতে পারবেন নিশ্চয়ই? ওহ, আমি কিছু টাকা দিয়ে দেব আপনাকে, আপনার...”

সুকুমারের কথা থেমে গেছে। সামনে থেকে একটা খয়েরি রঙের এসইউভি এসে সশব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াল বাইকটার সামনে। তার সঙ্গে আরও একটা লাল রঙের হুড-খোলা জিপ। কৌশানীর চোখ আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেল। এই খয়েরি রঙের গাড়িটা সে চেনে। ড্রাইভারের সিটে যে বসে আছে, তাকেও সে চেনে। যোগেন। খয়েরি গাড়িটা থেকে চালক নেমে এগিয়ে এসে প্রথমেই সুকুমারের বাইক থেকে চাবি খুলে নিল। এ বার সেই এসইউভি গাড়ি থেকে নেমে এল সুলেমান আর তার সঙ্গে আরও দু’জন। কৌশানী দূরের হাইওয়ের দিকে তাকাল। নাহ, আর দৌড়ে লাভ নেই। ওরা চার দিক থেকে ওদের ঘিরে ফেলেছে। তা ছাড়া এই জায়গাটা এমনিতেই ছায়া-ছায়া, তার উপরে কৌশানীর চোখে যেন এই মুহূর্তে আরও অন্ধকার নেমে আসছে।

কৌশানীর দেখার আর জানার আরও কিছু বাকি ছিল। চতুর্থ যে ব্যক্তিটি লাল হুড-খোলা জিপ থেকে নেমে তার দিকে হেঁটে আসছে, তাকে কৌশানী আরও ভাল করে চেনে। জেরেমি! জেরেমি সন্ডার্স!

“জেরি! জেরি!” আনন্দে উদ্বেল হয়ে কৌশানী এগোতে যাচ্ছিল, সুলেমানের হাতে একটা চকচকে জিনিস উঠে এল। একটা কালো পিস্তল। সেটা কৌশানীর দিকে তাক করে সুলেমান বলল, “উঁহু। আদর-সোহাগের ডিউরেশন ফিনিশড।”

এখন ফেডেড জিনস আর লাল টি-শার্টে জেরেমিকে প্রায় চেনাই যাচ্ছে না। সে হাসতে হাসতে বলল, “শুনলাম, তুমি নাকি মিলখা সিংহের স্পিডে দৌড়েছ?”

এক জন বলল, “রিয়ালি! কী স্পিড! পিছনে পাগলা কুকুর ধাওয়া করেছিল নাকি ম্যাডাম?”

সুলেমান বলল, “দরকার ছিল না। আমরা বেশি দূর যাই না। কারও বেলাতেই যাই না। কী দরকার, যখন জানি, হরিণ নিজেই বাঘের দিকে

এগিয়ে যাবে।”

তার মানে! কৌশানী সুকুমারের দিকে ফিরতে দেখল সুকুমারের মুখে এক গাল হাসি, “ভয় পেয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে যাবেন না যেন, দিদি। আমি কিন্তু ম্যাডামের এক্স-ড্রাইভার। হা হা হা।”

জেরেমি ফের মুখ খুলল, “আই মনিরুল। তুই আবার কবে আমাদের গাড়ি চালানি রে?”

সুকুমার অলীল ভাবে হাসল, “এ বার কিন্তু তোমার কাছে থেকে স্পেশাল কমিশন চাই দাদা। এই গরমে আরও হট হয়ে গেছি...”

একটা সমবেত হাসির হুল্লোড় উঠল। কৌশানীর চোখ ফেটে জল এল। তা হলে সব মিথ্যে? ওই বাড়িটার মতো জেরিও এক জন আস্ত মিথ্যে চরিত্র? অ্যাকাউন্টস দেখার ব্যাপারটা মিথ্যে, চাকরিটা মিথ্যে, এগুলো শেষ অবধি সে ধরে ফেললেও... জেরি! তার সবটুকু তা হলে নেহাত অভিনয় ছিল! কৌশানীর চোখের সামনে দিয়ে বিগত এক সপ্তাহ যেন হুড়মুড় করে চলে গেল। একা ঘরে বন্দি হয়ে থাকা, কিছু জেনেও ম্যাডামের না-জানার ভান, তাকে পালাতে দেওয়া, সুকুমারের সাহায্য... সবটা একটা কাল্পনিক চিত্রনাট্য?

“তা হলে তো বাড়ি থেকে আমায় অজ্ঞান করেই নিয়ে যেতে পারতো। এতটা দৌড় করানোর মানে কী?” যদিও কান্নায় তার গলা বুজে আসছিল, তবু প্রশ্নটা করেই ফেলল।

সুলেমান জবাব দিল, “আপনি হেঁবি তাড়াটাড়ি ভুলে যান ম্যাডাম। বলেছিলাম না, এখন আমাদের এলাকায় পুলিশ টহল দেয়। মাঝ পথে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চেক করে। ইচ্ছে করে কেউ বাঁশ নেয়?”

‘জেরি, জেরি, তুমিও! তোমাকে যে আমি ভালবেসে ফেলেছিলাম জেরি!’ হয়তো কোনও দিন সুযোগ পেলে এই কথাগুলোই বলে ফেলত কৌশানী, সব শেষ টের পেয়ে এই মুহূর্তে মনে মনেই বলে ফেলল। কান্নার জল ছাপিয়ে এল দু’চোখে। ঠিক তখনই বাপির মুখটা এক বার ভেসে উঠল। এরা হয়তো বহু দূরে তাকে নিয়ে যাবে। কোথায়? সে জানে না। সে কি এখন চিৎকার করে কারও সাহায্য চাইবে? তাতে লাভ হবে? সামনে নির্জন হাইওয়ে। এদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। কত কত মেয়ের মধ্যে একটা মেয়ে যদি এই নির্জন ছায়াঘেরা গাছের নীচের ঝোপের ভিতরে শুয়ে থাকে, কে টের পাবে?

সুলেমানের গলা কানে এল, “এই যে ম্যাডামের সাত জন্মের সোয়ামি, আমরা এগোই তা হলে?”

জেরেমি জবাব দিল, “ওহ, শিয়োর। কুইক।”

এক জন বলল, “তার আগে... জেরেমি, শিশিটা কোথায়?”

“জিপে, সিটের নীচে।”

কৌশানী ভেবেছিল শেষ আশা হিসেবে বড় রাস্তায় গাড়ি পড়লেই গলায় যত জোর আছে সব একত্র করে সে চেষ্টাবে। কিন্তু শেষ প্রদীপটাও নিবে গেল। আন্দাজে বুঝল, এরা ক্লোরোফর্মের শিশি খুঁজছে। চোখ বোজার আগে সে জেরেমির দিকে আর-এক বার তাকাল। জেরেমি আশ্চর্য ভাবে তার দিকে সটান তাকিয়ে আছে। মুখে হালকা দাড়ি, ভুরুদুটো জোড়া, কালো চুল ঝাঁপিয়ে এসেছে কপালের উপরে, সর্বোপরি কী নিষ্পাপ সেই আকাশি নীল চোখের তারাদুটো। বিশ্বাস আর অবিশ্বাস— মাঝে একটা সরু সুতো মাত্র।

পাঁচ সেকেন্ড পরে জেরেমি চোখ সরিয়ে নিল। তার পর পকেট থেকে একটা মোবাইল বের করে কিছু-একটা দেখে নিয়ে বলল, “আই দাঁড়া, দাঁড়া। প্ল্যান চেঞ্জড। ওহ মাই গড! যাদব, বাইকের চাবিটা দে।”

সুলেমান হাতের রুমাল ক্লোরোফর্মে ভিজিয়ে এগিয়ে আসছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল, “আবার কী? দেরি হয়ে যাচ্ছে। ন’টার মধ্যে বর্ডার ক্রস করতে হবে। ঘড়ি দেখো।”

জেরেমি হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবল। তার পর মোবাইলটা পকেটে রেখে সুলেমানের দিকে এগিয়ে গিয়ে আচমকা ওর হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল। সুলেমান হকচকিয়ে গেল, “মতলব?”

জেরেমি প্রথমেই যাদবের কাছ থেকে সুকুমারের বাইকের চাবিটা ছিনিয়ে নিয়ে বাইকে উঠে বসল, “ম্যাডামের মেসেজ এসেছে। মেয়েটাকে পিছনে বসা। কুইক।”

“আই? কেন?”

জেরেমি হিসহিসে গলায় প্রায় গর্জে উঠল, “ইডিয়ট। পুলিশ রেড করেছে ম্যাডামের বাড়ি। এ দিকে আসছে। কুইক। কৌশানী পিছনে বসো, না হলে তুমিও মরবে।”

পুলিশ আসছে! কৌশানী, আরও এক বার, শেষ আশার আলোটুকু দেখতে পেয়েছে। যদি আরও খানিকটা সময় এখানে নষ্ট করা যায়, তা হলে? সে বলল, “আই নিড আ টয়লেট। প্লিজ শো মি দ্য প্লেস।”

একটা মারাত্মক থাপ্পড় এসে কৌশানীকে মাটিতে শুইয়ে দিল। তার পর তার হাত ধরে টেনে তুলে সুলেমান বলল, “কোনও চালাকি নয়,” তার পর একপ্রকার পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে তাকে জেরেমির পিছনের সিটে বসিয়ে দিল। থাপ্পড় খেয়ে কৌশানীর মাথা তখন ঘুরছে। তার মধ্যে সে শুনতে পেল জেরেমি বিড় বিড় করে বলল, “বিশ্বাস কোনও জিনিস নয় যে হারিয়ে যাবে।”

এত কিছুর পরেও! দাদুর সব কথা তা হলে সত্যি নয়? আর ভাবার সময় পেল না কৌশানী। জেরেমি বাইক স্টার্ট দিয়েই ছুটল তিরের মতো। জেরেমির দুটো কাঁধ খামচে না-ধরে ফেললে সে পড়েই যেত। তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এরা? আর ভাবার মতো বুদ্ধি অবশিষ্ট ছিল না কৌশানীর। মাথা সামান্য ঘুরিয়ে সে দেখল পিছনে খয়েরি এসইউভি আর লাল জিপটা ছুটে আসছে। জেরেমি বাইকের স্পিড আরও বাড়াল।

হাইওয়ে ধরে কিছু ক্ষণ ছোট্টার পরেই আচমকা বাঁ দিকে ঢাল বেয়ে যে সঙ্কীর্ণ মোঠো রাস্তায় নেমে পড়ল জেরেমি, তাতে একটা সাইকেল বা বাইক কোনও মতে চলতে পারলেও গাড়ি যাবে না। পিছনে ঘন ঘন হর্নের শব্দে কৌশানী বুঝতে পারল ওদের ফলো করতে না-পেরে সুলেমানরা হাইওয়ের উপরেই দাঁড়িয়ে পড়েছে, চিৎকার করছে ওখান থেকে। তবে কি, তবে কি... কৌশানী অবিমিশ্র বোধে আক্রান্ত হয়ে জেরেমির কোমর জড়িয়ে ধরে ওর পিঠে মাথা রাখল। বাইক চলল লাফাতে লাফাতে।

একটা খুব গ্রাম্য এলাকায় একটা স্বল্পালোকিত চায়ের দোকানের সামনে বাইক দাঁড় করাল জেরেমি। চা-ওয়ালা তখন উনুনে জল ঢালতে যাচ্ছে। জেরেমির প্রচুর অনুরোধে বিরস বদনে দু’ভাঁড় চা বানাতে বসল। ঘণ্টা খানেক প্রাণান্তকর জার্নির শেষে কৌশানীর কোমর তখন টন টন করছে। ধোঁয়া ওঠা চায়ে চুমুক দিয়ে মনে হল, সে আস্তে আস্তে দেহের সাড় ফিরে পাচ্ছে।

“জেরেমি!”

জেরেমি আলতো চোখে তাকাল, “তোমার দাদু তা হলে ভুল বলেনি, বলো? তাকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে।”

“আমি, আমি... কী বলব, কিছু বুঝতে পারছি না।”

চায়ের ভাঁড়টা নিঃশেষ করে দূরে অন্ধকারে ছুড়ে দিয়ে একটা কুড়ি টাকার নোট দোকানির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে জেরেমি হাসল, “সব কিছু নিয়ে অত ভাবতে নেই, কৌশানী।”

“কিন্তু এই... এটা... আমার কাছে মিরাকল...মানে...”

জেরেমি এগিয়ে এসে কৌশানীর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল, “একটা মানুষের জীবনে ভালবাসাটাও আসে মিরাকলের মতো। তা ছাড়া, জীবনে যা অবশ্যস্বাবী, যা ধ্রুব, যা নিশ্চিত, তাকে মেনে নেওয়াটাই তো জীবনের ধর্ম। তাই না? চলো এগোই। আজ রাতের মধ্যে ওদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যেতে হবে।”

বাইকে স্টার্ট দিয়ে হতভম্ব কৌশানীর দিয়ে তাকিয়ে জেরেমি থেমে থেমে বলল, “আমার সঙ্গে... বাকি পথটুকু... আপত্তি নেই তো?”

বাইক ফের খড়-ওঠা এবড়োখেবড়ো জমির উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলল তীব্র বেগে। একটা দমকা ঠান্ডা বাতাস এসে ওদের চোখ-মুখ ধুয়ে দিয়ে যেতে লাগল।

শিল্পী: পিয়ালী বাল





ইথিওপিয়ার রাজধানী আদিস আবাবা ও তার প্রাকৃতিক পশ্চাৎপট

কফির দেশে ম্যারাথনের শহরে

অগ্নি রায়

সেই কত বছর আগে অনির্দেশ্য হিরের খনির সন্ধানে চাঁদের পাহাড়ে পাড়ি দিয়েছিল অকুতোভয় এক যুবক। রহস্যময় মহাদেশ এক, যেখানে হিরে আর সোনার আকর, যেখানে অজানা দৃশ্যের জন্ম ও মৃত্যু ঘটছে প্রত্যহ। সীমাহীন এক ট্রপিকাল অরণ্যে কত কী যে আত্মগোপন করে রয়েছে, তার সম্পূর্ণ লেখাজোখা আজও হয়নি। সলোমন রাজার হিরের খনি খুঁজতে যেখানে জীবনকে বাজি রেখে পথে নেমেছিলেন অ্যালান কোয়ার্টারম্যান। সদা বিপদসঙ্কুল পথে তাঁর সঙ্গে এলিজাবেথ কার্টিসের মরণপণ রোমান্স, তপ্ত মরুভূমি পেরিয়ে বরফ জমাট পাহাড়ের অভিযান, আজ এত বছর পরেও জীবন্ত। সেই পাহাড়ের গুহায় অস্ত্রিচের ডিমের মতো আকাটা হিরে আজও বলসাচ্ছে লক্ষ পাঠকের মনে।

“নিজে পৌঁছে তো তরিবত করে খাবেনই, ফেরার আগে কয়েক প্যাকেট ইঞ্জিরার পাউডার প্যাকেট নিয়েও আসবেন। ওখানে সব

দোকানেই পাওয়া যায়। আমার স্টক শেষ হয়ে গিয়েছে।”

ইথিওপিয়ার ভিসা পেয়ে যাওয়ার পর থেকেই মনটা সঙ্গত কারণেই উড়ু উড়ু! সফরের আগে, অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান বা কোনও নেতার সঙ্গে বিদেশসফরে গেলে সরকারের পক্ষ থেকে একটি ‘বন্দোবস্ত ব্রিফিং’ বাধ্যতামূলক। সফরের কর্মসূচির একটা আগাম আঁচ দিয়ে দেওয়ার (যা অনেক ক্ষেত্রেই মেলে না!) জন্য। কী করণীয়, কোনটা এড়িয়ে যেতে হবে, সরকারি বৈঠক ও অন্য অনুষ্ঠান কখন, কোথায়— এই সব সাত-সতেরো নির্দেশ।

সেই পর্ব শেষ হওয়ার পর, পায়ে পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, আর মনের মধ্যে ছবির রিল চলছে যেন। সেখানে অচেনা বর্নার জলধারা পেরিয়ে হাতির ঝাঁক এগিয়ে চলেছে সোনালি বালুতটের দিকে। সোনালি গুহার পাশে দেখা হচ্ছে কিং সলোমনস মাইনস-এর এলিজাবেথ কার্টিসের সঙ্গে!



‘ইঞ্জিরা’ ও তার আনুষঙ্গিক

ঠিক সেই সময়ই এই ঘোর কাটিয়ে কানের কাছে এহেন অজানা ‘ইঞ্জিরা’ আনার অনুরোধ! আমার মুখটা হাঁ হয়ে গিয়েছে দেখে বিদেশমন্ত্রকের সেই অফিসার মুচকি হেসে বললেন বললেন, “চলুন, একটা কফি খাই। তার পর রসিয়ে বলছি বিষয়টা আপনাকে। এই প্রথম আফ্রিকা যাচ্ছেন, একটু শিখিয়ে পড়িয়ে দিতে হবে তো!”

এঁর সঙ্গে খুবই খাতির ছিল সে সময়। অনেক জায়গায় এক সঙ্গে যাওয়ার সুবাদে জানি, পশ্চিম ভারতের ক্যান্ডার এই কুটনীতিক শুধু সুপণ্ডিতই নন, খাদ্যরসিকও বটে। ফলে তাঁর ব্রিফিং নেওয়াটা সে সময় ছিল অবশ্য্য কর্তব্য!

কফি হাতে তিনি বলতে শুরু করলেন, “দেখুন, প্রথমে দেখে আপনার মনে হবে সামনে টেবিলে দোসা সাজিয়ে দিল বোধহয়। কিন্তু খেতে শুরু করলেই সেই ভুল ধারণা ভেঙে যাবে। ওদের দেশে ‘টেফ’ নামের শস্যের ফলন খুব। আমাদের যেমন পোস্ত। সেটাকে পাউডার করা হয় গুঁড়ো করে। এখানেই শেষ নয়। সেই টেফ গুঁড়ো বা টেফ-এর আটাকে কয়েক দিন ভিজিয়ে রেখে ফারমেন্ট করা হয়। তার পর সেটাকে তাওয়ায় রোল করা। দেখতে আমাদের দক্ষিণ ভারতের দোসার মতো হলেও স্বাদ একেবারেই আলাদা। খেলেই বুঝবেন।” তাঁর কথায়, “এখানে খাবার বানানোর অনেক পদ্ধতিতেই ভারতীয় রান্নার সঙ্গে বেশ মিল। টেফ এই অঞ্চলের এক অতি প্রাচীন শস্য। আমরা যেমন রুটি পরোটা দিয়ে খাই, ইঞ্জিরার সঙ্গেও তেমনিই বিভিন্ন ধরনের মাংস, ডাল বা আনাজ দিয়ে তৈরি নানা স্বাদ ও রঙের ঘন গ্রেভি এবং আনাজসেদ্ধ খাওয়া হয়।”

জানা গেল ইঞ্জিরা শর্করা বটে, তবে আমাদের ভাত-রুটি খাওয়ার তুলনায় ইঞ্জিরা খেলে শরীর ভার হওয়ার আশঙ্কা কম, কারণ তাতে গ্লুটেন নেই। টেফ শস্যে কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে রয়েছে ম্যাগনেশিয়াম এবং লোহা। ফলে মোটা, মেদবহুল না হয়েও অল্পতেই প্রয়োজনীয় পুষ্টি পেয়ে যাচ্ছেন আবিসিনিয়রা।

“তা হলে আর কী! এবার ব্যাগ ভরে নিয়ে আসুন আমাদের জন্য। এত ক্ষণে বুঝে গিয়েছেন নিশ্চয়ই ব্যাপারটা,” দীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করে তখন মিটিমিটি হাসছেন বিদেশমন্ত্রকের ওই অফিসার।

এক সপ্তাহ আগে তাঁর বলা কথা যতটা না অনুধাবন করতে পেরেছিলাম, খেতে বসে এ বার বিলক্ষণ বুঝছি। তার সঙ্গে প্রবল একটা অস্বস্তিও যে হচ্ছে না, তা নয়। ইঞ্জিরা খেতে বেশ ভাল কি খারাপ সেটা কথা নয়, কিন্তু তার স্পঞ্জধর্মিতার জন্য, সঙ্গে দেওয়া মেটের বোল টেনে নিয়ে তার স্বাদগন্ধ আত্মীকরণ করে বেশ রসালো হয়েছে। সমস্যা

তাতেও নয়। সমস্যা, এখানের সহবতের সঙ্গে পরিচিতি না থাকাটা।

জনবহুল আর বেশ রঙিন ফানা মার্কেট সেন্টারের একটি রেস্টুরায় আমাদের দাওয়াত দিয়েছেন ইথিওপিয়ার বিদেশমন্ত্রকের তিন পদস্থ অফিসার। তাঁদের মধ্যে এক জন গতরাতে আমরা পৌঁছোনো থেকে সঙ্গে রয়েছেন লিয়াজেঁ অফিসার হিসেবে। বলতে হল না, মধ্যাহ্নভোজে তিনিই আগ বাড়িয়ে ইঞ্জিরা অর্ডার করলেন। সঙ্গে তিন রকমের মাংস, লম্বাটে বেগুনের তরকারি, অনেকটা তেল দিয়ে ছোলার এক রকম ঘুগনি জাতীয় পদ। একটি বড় প্লেটে পাতা রয়েছে ইঞ্জিরা, আর বিবিধ বাটিতে মাংস এবং অন্যান্য যা কিছু।

এবারে হল কী, এক একটি পদ ইঞ্জিরার মধ্যে ফেলা হচ্ছে। ইঞ্জিরা তার স্পঞ্জশরীর দিয়ে শুষে নিচ্ছে তেল-ঝোলা। এবার ওই একটিই থালা থেকেই সমবেত আহার। শুকনো খাদ্য এক পাত্র থেকে সবাই খেলে তো সমস্যা নেই, সে আগেও করেছে ইসলামিক রাষ্ট্রে। এমনকি, বিরিয়ানি ভোজও। কিন্তু এখানে বিষয়টি স্বতন্ত্র। এঁর মুখের ঝোল যে ওঁর দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে! এক জন যেখানে ঘাঁটছেন তো সেখান থেকেই আর এক জন খাচ্ছেন! বিষয়টি ইথিওপিয়াবাসীর কাছে এতটাই স্বাভাবিক যে, তাঁরা এই নিয়ে এতটুকু বিচলিত বা সতর্ক নন। যে ভাবে আমরা অনেক সময় রুটি বা পরোটা প্লেটের তরকারিতে মাখিয়ে নিই সে ভাবেই এক পাত্রে চলছে থকথকে ডাল, ঘুগনি, মাংসের লাল ঝোল মাখামাখি!

বুঝলাম, আদিস আবাবায় আমি স্বাগত!

ইঞ্জিরা-কথন যখন হচ্ছেই, এখানকার স্যালাডের কথা না বলে রাখলে পরে ভুলে যাব। স্যালাড তো এক রকম নয়, নানা রকম। আমাদের পাতে পড়েছে ‘টিমাটিম সালাতা’ এবং ‘আজিফা’। প্রথমটির আভরণ টমেটো, দ্বিতীয়টির লেটুস পাতা। জানা গেল, সাধারণত উপোসের দিনগুলো ইথিওপিয়াবাসী স্যালাড খান। আর রেস্টুরায় আপনি যা-ই অর্ডার করবেন সঙ্গে আসবে বিট, গাজর, ক্যাপসিকাম এবং আরও কিছু তাজা ও কাঁচা আনাজের স্যালাড, আলাদা পাত্রে। এ ছাড়া লেবু, অলিভ তেল, শসা, বড় লঙ্কা (আমাদের শিমলা মিচ-এর মতো), পেঁয়াজ তো রয়েছেই। যত বার খাবার অর্ডার দেবেন, বারবার আসবে স্যালাডের পাত্র। টেবিলে তৈরি করছে বহুবর্ণ কোলাজ চিত্র। খাওয়ার পাশাপাশি যা দেখতেও ভারী মনোহর। আমার উৎসাহ দেখে পরিবেশনকারিণী দু’কথায় বলে দিলেন, এখানকার এক রকম সালাতার রেসিপি। লেটুস পাতা কুচি করে কাটা। সঙ্গে টমেটো কুচি। এক চামচ লেবুর রস, এক চামচ অলিভ ওয়েল। লাল মির্চির গুঁড়ো বা কুচি। নুন। গোলমরিচ। ব্যস, এর সঙ্গেই নাকি খান তিনেক ইঞ্জিরা সাঁটিয়ে দেন স্থানীয়রা। যাদের পক্ষেই মাংসের রেস্তু থাকে না।

॥ ২ ॥

সে তো আজকে নয়, সে আজকে নয়। খ্রিস্টের জন্মের প্রায় দু’হাজার বছর আগে এই আবিসিনিয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতের প্রণয়। যদিও সময় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির টালমাটালের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কে এসেছে নানা চাপানউতোর।

ইটালীয় স্থাপত্য আর ইউকা গাঠ, বন্য কফি ফুল আর বনকলমির মতো দেখতে সাদা ভেরোনিকার সুগন্ধের মধ্যে যেন কলকল করে চলেছে রাজধানী শহর আদিস আবাবা। হঠাৎ অতিথি হয়ে এলে বোঝার উপায় নেই, দুর্ভিক্ষ বারবার কী ভাবে দেশটাকে ছিবড়ে করে খেয়েছে। কয়েক দশক আগেই দশ লাখ মানুষের প্রাণ কেড়েছিল দুর্ভিক্ষ। এখনও যা বেঁচে রয়েছে বস্তি এবং কিছু ফুটপাথে। সে সময়ে পাশে দাঁড়িয়েছিল ভারত, ইথিওপিয়া তা ভোলেনি। ভোলেনি বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে গান্ধীর লড়াই। দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, গৃহযুদ্ধ, এডস আর ম্যালেরিয়ার সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের পর ইথিওপিয়া যোগ দিয়েছে বৃহত্তর আফ্রিকান ইউনিয়নে। তার সলোমনের গুপ্তধনের দিকে নজর পড়ছে ইউরোপ এবং অবশ্যই চিনের। জিম্বাবোয়ে, জাম্বিয়া, কঙ্গো, অ্যাঙ্গোলা-র পর ইথিওপিয়াতেও



ঐতিহ্যবাহী ‘কফি সেরমনি’-র নিজস্ব উপকরণ

আকরিক, কাঠ, হাইড্রোকার্বনের প্রকল্প গড়েছে বেজিং। আমাদের সেই সফরটির প্রধান লক্ষ্যই ছিল বেজিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইউরোপের সঙ্গে হাইফেন তৈরি করা।

আফ্রিকার উত্তর পূর্বের দেশ ইথিওপিয়া। কঙ্গোর মতো এও এক স্থলবন্দী দেশ, যার চার পাশ ঘিরে রয়েছে সুদান, ইরিত্রিয়া, জিবুতি, সোমালিয়া এবং কেনিয়া। মানচিত্রে বা ড্রোনচিত্রে সুদান, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, জিবুতি, সোমালিয়া— এই দেশগুলিকে একত্রে দেখলে মনে হয় যেন একখানা গম্বীরের শিং— তাই এই অঞ্চলটি ‘হর্ন অব আফ্রিকা’ নামেও অত্যন্ত পরিচিত।

ইথিওপিয়ার রাজভাষা ‘আমহারিক’। এ ছাড়া অন্যান্য স্থানীয় ভাষা-সহ ইংরেজি ভাষা হরবখত ব্যবহার হয় রাস্তাঘাটে। ফলে ভারত থেকে আসা আমাদের খুব সুবিধে, কারণ কঙ্গোতে বিদেশি ভাষা হিসেবে মূলত ফরাসি ভাষাই ব্যবহার হয়। ইথিওপিয়া আফ্রিকার একমাত্র দেশ, যেখানে কোনও দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন হয়নি এবং বহু দিন অবধি রাজকীয় শাসন চলেছিল। কালক্রমে যা আজ এক গণতান্ত্রিক দেশ।

দিল্লি থেকে বিশেষ বিমানে আদিস আবাবা পৌঁছাতে সময় লেগেছিল পৌনে সাত ঘণ্টা। আর গিয়েই ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে নিতে হল আড়াই ঘণ্টা। শহরটাকে প্রথম দেখেই ভালবাসা তৈরি হয়েছিল আমাদের। ১৯৯৫ সাল থেকে এখানে যিনি প্রধানমন্ত্রী, তিনিই দেশের সেনাপ্রধানও বটে। এই রকমই চল। আমরা যে সময় যাই, দেশ শাসন করছেন মেলেস জেনাই, ইথিওপিয়ার জনপ্রিয় এবং দীর্ঘদিনের (প্রায় ১৭ বছর টানা) প্রধানমন্ত্রী। এর অনেক পর ২০১৮ সালে আবি আহমেদ ক্ষমতায় এসে ইথিওপিয়ার যা সংস্কার করেছিলেন (তঁার সময়েই প্রথম বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হন এক জন নারী, যার নাম ওয়ার্ক জেউদি, মন্ত্রিসভাতেও মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ে এই সময়েই), তার সূচনাপর্ব তখনই শুরু হতে দেখেছিলাম। শপিং মল, কফির দোকান, রেস্টুরায় তো বটেই, দেশের বিদেশমন্ত্রক, তথ্যদফতর, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রমীলাপ্রাধান্য তখনই চোখে পড়ার মতো। আর রাস্তায় যে মহিলাদের দেখেছিলাম, তাঁদের পরনে চটকদার পাশ্চাত্য পোশাক। যথেষ্ট ফ্যাশন-সচেতন তাঁরা। বিশ্বের সব বড় ব্র্যান্ড তখন মুখ দেখাতে শুরু করেছে আফ্রিকায়।

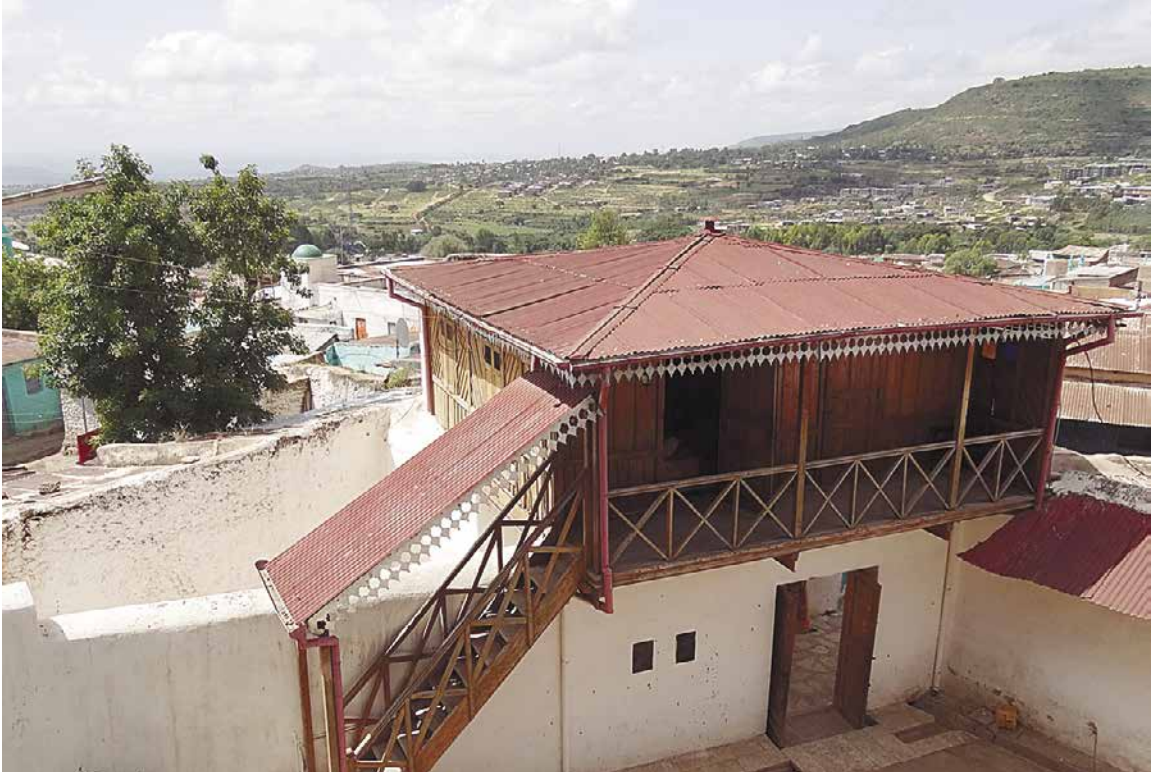
॥ ৩ ॥

বাঙালি বাড়ির পুজোর সময় যেমন ধনুচি জ্বালানো হয়, ব্যাপারটা অনেকটা যেন সে রকম। প্রক্রিয়া কাছাকাছি হলেও গন্ধ একদমই ভিন্ন। কড়া ঝাঁঝালো কিন্তু সেইসঙ্গে মৃদু আবেশ ছড়ানো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে এই কাফে।

ইথিওপিয়ার বিদেশমন্ত্রীর আমন্ত্রণে এই কাফেতে জমিয়ে নৈশভোজে বসেছি আমরা। ড্রিমি ড্রিমি বাজছে আফ্রিকার বাদ্যি। সঙ্গে বিশেষ তাপমাত্রায় রোস্ট করা আফ্রিকার সেরা কফি বিন চারকালের উপর ধনুচির মতো পায়ে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে। তিন হাজার বছরের পুরনো কফিতত্ত্ব এখানে। প্রথমে সেই কফির ধূমপান। তার পর এপ্রনের মতো বিশেষ সাদা পোশাকে সজ্জিতা পরমা সুন্দরী কফি-যুবতীরা এসে পরিবেশন করলেন কফি। তাঁদের চোখে হাজার বছরের সভ্যতার কাজল।

শুধু সেই দিনের সেই কাফেটিতেই নয়। আদিস আবাবা তন্নতন্ন করে ঘুরে মনে হয়েছে, কফিপ্রেম নিয়ে এদের বাড়বাড়িটা প্রায় পরকীয়ার পর্যায়ে চলে গিয়েছে! এক মহলের দাবি, আদিস আবাবা থেকে শ’খানেক কিলোমিটার দূরে কাফফা গ্রামে দু’হাজার বছর আগে কফির জন্ম। তাই একে ঘিরে প্রতি বছর উৎসব। শুধু ঐতিহ্য নয়, ইথিওপিয়ার অর্থনীতির অন্যতম ভরসাও এই কফি। সঙ্গী লিয়াজোঁ অফিসার আকিলু তাদাসে বললেন, নবম শতকে, কালদি নামের এক মেঘপালকের কাহিনি। যিনি ইথিওপিয়ার কাফফা অঞ্চলে প্রথম কফি বিন্স-এর সন্ধান পান। তাঁর পোষা ছাগলের পাল সেই বিন্স খেয়ে বেশি লক্ষ্যবস্প করছিল, তারা বিশ্রাম নিতেও ভুলে গেছিল। সেই দেখে তিনি আন্দাজ করতে পারেন এই বিন্স খাওয়ার সুবিধে বা অসুবিধেগুলি।

সব মিলিয়ে এখন ইথিওপিয়ার সংস্কৃতি কফিময়। এখানকার আমহারিক ভাষায় লেখা গান-কবিতা-গল্পে কফির গন্ধ। মুখচলতি বাক্য ‘বুনা হেতু’ মানে শুধু কফিপানই নয়, সামাজিক সংযোগও বটে। ‘আমার কফি পানের সঙ্গী নেই’— আমহারিক ভাষায় এই কথা বলার অর্থ, আপনি মশাই নিঃসঙ্গ! কফির চেয়েও এখন আপনার যেটা বেশি প্রয়োজন তা হল, ধোঁয়া ওঠা কাপের ও পারে একটি মানুষ, যে আপনার



হারার-এর পুরনো শহরে কবি আর্থুর রায়বার কাঠের বাড়ি, বর্তমানে সংগ্রহশালা

মনের কথা বুঝাবে।

ইথিওপিয়াতে কফির দানাগুলি ফল থেকে আলাদা না করেই শুকানো হয়, তাই এখানকার কফির স্বাদ একটু অন্য রকম। একটু কি তিতকুটে? আসলে এখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কফি চাষ করা হয়। আমরা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কিনতে গিয়ে অবাক হয়ে গেছি। এত রকমের যে কফি হতে পারে, কোনও ধারণাই ছিল না। সেখানে আস্ত বিনস থেকে গুঁড়ো কফি, সবই থরে-বিথরে সাজানো রয়েছে।

ইথিওপিয়াতে কফি ‘বুনা’ নামে পরিচিত। কলকাতা শহরে যেমন প্রতিটা রাস্তাতেই একটা অন্তত চায়ের দোকান আছে, এখানে তেমন রয়েছে কফি জয়েন্ট। এক একটা দোকানের অন্দরসজ্জা এক এক রকমের। সব যে খুব সাজানো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, তা নয় কিন্তু। রাস্তায় ধারে ধারে সাদামাটা কফি-ঠেকও রয়েছে। ঢুকে পড়লেই হল। যার ভিতরের অর্ধেকটা যদি কফির গন্ধে আমোদিত থাকে, তবে বাকি অর্ধেকটা আড্ডার! এখানকার মানুষ বাঙালির মতোই গল্পে! প্লাস্টিক বা নড়বড়ে কাঠের চেয়ার চেবিল, আর সামনে হাতলহীন ছোট পাত্রে কুচকুচে কালো কফি পেলেই হল। জগৎসংসার ভুলে মজে যাবে আড্ডায়। কখনও কখনও কফির তেতো কমাতেই বোধহয় সঙ্গে ‘রু’ নামের একটি পাতা দেওয়া হচ্ছে। সেটি যদি কফিতে ফেলে দেন, তা হলে বাড়তি এক মিষ্টি গন্ধ যোগ হবে। আমার অবশ্য কফির গন্ধের সঙ্গে অন্য কিছু মিশেলের ব্যাপারটা সুবিধের ঠেকেনি।

শুনলাম প্রতি বাড়িতেই নাকি ‘কফি সেরেমনি’ বা কফি পান করার বিশেষ প্রথা পালন করা হয়। হোটেলেরও সেই প্রথার দেখা পেলাম। এই প্রথায়, সুগন্ধি টাটকা ফুল আর ঘাস ছড়িয়ে প্রথমে ‘মন্দ আত্মাদের’

দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। কফি বিনসগুলিকে একটা পাত্রে প্রথমে সৈঁকে নেওয়া হয়, তার পরে হামানদিস্তা দিয়ে গুঁড়ো করা হয়। তার পরে, গরম জলের সঙ্গে, কফি তৈরির বিশেষ পাত্র ‘জেবেনা’তে ঢেলে দেওয়া হয়। এক বার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তাতে আবার জল দেওয়া। এই ভাবে পাত্রে কফির গুঁড়ো দিয়ে তিন বার কফি তৈরি করা যায়। কফি তৈরি হলে বিশেষ ছোট কাপে করে সেটি পান করতে দেওয়া হয়। সঙ্গে থাকে পপকর্ন।



কবি আর্থুর রায়বার

॥ ৪ ॥

এ রকমই একটি কফির আড্ডায় জানতে পেরেছিলাম বালক কবি তথা বিস্ময় প্রতিভা জঁ আর্থুর রায়বার প্রতি ইথিওপিয়াবাসীর প্রেম আর স্মৃতিমেদুরতা। এই দেশের সাহিত্যপ্রেমীরা ভাবতে ভালবাসেন রায়বার আসলে তাঁদেরই লোক। লেখালেখি ছেড়ে ইথিওপিয়ার পূর্বতন রাজধানী (আদিস-এর থেকে ৫০ মাইল দূরে) হারার-এ তিন দফায় দশ বছর কাটিয়েছিলেন রায়বার। আজন্ম অস্থির এই কবি নাকি শান্তি পেয়েছিলেন আফ্রিকার প্রকৃতিসান্নিধ্যে। ইথিওপিয়াকে ভাবতে শুরু করেছিলেন নিজের দ্বিতীয় মাতৃভূমি। লম্বা লম্বা চিঠিতে মাকে লিখতেন এই দেশের মর্মকথা।

১৮৮০ সালের এক শীতসকালে হারার-এ পা দিয়েছিলেন রায়বার। তার আগে লিখে ফেলেছেন ‘নরকে এক ঋতু’-র মতো কাব্যগ্রন্থ, যা পরবর্তী কালে দুনিয়া কাঁপাবে। চিরবাউন্ডুলে, খ্যাপা মন নিয়ে বেড়ে ওঠা কবি নিজের লেখা বহু কবিতা, বহু পাণ্ডুলিপি একবার পড়েই ছিঁড়ে ফেলতেন। বিশ বছর বয়সেই ঘোষণা করে কবিতা লেখা ছেড়ে দেন।



আদিস আবাবার উত্তর প্রান্ত জুড়ে রয়েছে এন্টোটে পর্বতশৃঙ্খল

লেখা ছেড়ে দেওয়ার পেছনে তাঁর যুক্তি ছিল, ‘নরকে এক ঋতু’র পর আসলে আর নতুন কিছুই তাঁর লেখার নেই।

হারার-এর পুরনো শহরে একটি বড় কাঠের বাড়ি, যেখানে একটা ঘরে কোনও মতে থাকতেন কবি, আজ তাঁকেই উৎসর্গ করে সেখানে তৈরি হয়েছে মিউজিয়াম। রঙিন কাচে ঘিরে রাখা হয়েছে তাঁর শয়নকক্ষ, যা গোটা বিশ্বের সাহিত্যপ্রেমিক পর্যটকদের তীর্থস্থান। এক ফরাসি বাণিজ্য সংস্থার হয়ে ইথিওপিয়ায় কফির সন্ধানে এসেছিলেন র্যাঁবো। শেষ পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছিলেন অস্ত্র ব্যবসায়। সে সময় হারার ছিল খুব বড় বাণিজ্য নগরী। শুধু কফি বিনই নয়, পশুচর্ম, সোনাদানা, মূল্যবান পাথর বোঝাই হয়ে ইউরোপ থেকে যেত ইউরোপে। বিনিময়ে আসত ইউরোপের নানা পণ্য এবং চোরাপথে অস্ত্রাদি। পণ্যের সন্ধানে বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামের বাজারে চলে যেতেন কবি। ঘুরে বেড়াতেন পাহাড়ে, জঙ্গলে, বড় বড় লেকের ধারে। ১৮৮১ সালে মাকে লেখা চিঠিতে তিনি লিখছেন, “এই দৌড়ঝাঁপ আর একের পর এক অভিযান আমাকে এতই ক্লান্ত করে দিয়েছে আমি আজকাল রোদ্দুরের মধ্যে শুয়ে থাকি। এক জড় পাথরের মতোই।”

সে সময়ই ইথিওপিয়ার পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় মেনেলিক-এর কানে খবর আসে র্যাঁবো অস্ত্রবাণিজ্যে যুক্ত। তিনি তাঁর কাছে অস্ত্রশস্ত্র চান। কয়েক মাস ধরে র্যাঁবো জোগাড় করেন ইউরোপের দামি রাইফেল। সেগুলি হস্তগত করে মেনেলিক তাঁকে নামমাত্র দাম দেন। কবি ফরাসি দূতাবাসকে একটি চিঠিতে লিখছেন, “মেনেলিক আমার সব পণ্য কার্যত ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং অনেক কম দামে। আমার সমস্ত খুচরো ব্যবসাও বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিয়ে আমাকে ফিরতি জাহাজে তুলে দেওয়ার ভয় দেখাচ্ছেন।”

গবেষকরা বলেছেন, তাঁর ১৮৮৬ সালে বিক্রি করা ওই অস্ত্র আধুনিক আফ্রিকার ইতিহাসে এক বড় ভূমিকা রেখেছিল। ১৮৯৬ সালে রাজা ইটালির আক্রমণ প্রতিহত করেছিলেন ওই অস্ত্র ব্যবহার করেই। তবে সে সব আর দেখতে পাননি তিনি। ১৮৯১ সালে তাঁর গোড়ালিতে

গ্যাংগ্রিন শুরু হয়। ষোলোজন খালাসি মিলে তাঁকে জেইলা বন্দরে নিয়ে যান যা হারার-এর থেকে দুশো মাইল দূরে। যখন ফ্রান্সে পৌঁছোন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। কর্কট রোগে আক্রান্ত পা কেটে বাদ দিতে হয় এর পর। মার্সেই-এর হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে কবি ভাবতেন তাঁর প্রিয় দেশ ইথিওপিয়ার কথা। ডায়েরিতে লিখেছিলেন, “আশা করি কখনও না কখনও সে দেশে ফিরে যেতে পারব। সেখানেই কাটিয়ে দেব বাকি জীবন।”

॥ ৫ ॥

আমাদের একপ্রান্ত কাজ শেষ হতে হতে বিকেল। মিডিয়া লাউঞ্জে লাঞ্চ রাখা ছিল কিছু ভারতীয় স্যান্ডুইচ। কিন্তু আফ্রিকার নিজস্ব সুদ্রাণযুক্ত স্থানীয় মশলা ও রংদার খাবার ছেড়ে কে আর ঘরের খাবার খেতে চায়। বিশেষত আমাদের সফরের মেয়াদ যখন মোটে চার দিন।

পায়ে হেঁটে শহর দেখতে বেরিয়ে পড়ে আধঘন্টার মধ্যে বুঝতে পারলাম, বেশি তাড়াছড়ো করা যাবে না। আদিস আবাবা হল বিশ্বের উচ্চতম রাজধানী। এখানে চলাফেরার অভ্যেস না থাকলে অস্বস্তির ঘটিত হয় দ্রুত হটিতে। তাই প্রাথমিক হাঁফ ধরা সামলে ধীরে ধীরে চার পাশ দেখতে দেখতে হাঁটাই কর্তব্য। আবেবে বিকিলার দেশ ও শহর এই ইথিওপিয়ার আদিস। অন্য অনেক ম্যারাথনারেরও। দারিদ্রকে ছাপিয়ে যাওয়ার জন্য দৌড়ানো ছিল তাঁদের সহজাত ম্যারাথন, এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন অলিম্পিকে সোনাজয়ী বিকিলা। শেষবেই ম্যারাথনের প্রশিক্ষণ তাই হয়ে গিয়েছিল তাঁর।

দারিদ্রে ছিবড়ে হয়ে যাওয়া এই শহর যখন আবাবা মাথা তুলে আধুনিক বিশ্বের মধ্যে নিজের ঠাঁই খুঁজে নেওয়ার চেষ্টা করে, তখন তার মধ্যে একটি বর্ণসঙ্করের ছাপ পড়ে। আদিস আবাবায় এ সেই ছাপ স্পষ্ট। রাস্তা, গলি, মোড়ে এই ছায়া তো এই আলো। এই দেখছি উজ্জ্বল পোশাকের উন্নত গ্রীবার শ্যামলা অষ্টাদশী, তো ওই শতছিদ্র পোশাকে



হোলি ট্রিনিটি ক্যাথিড্রাল-এর দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য, আদিস আবাবা

দারিদ্র লুকোনো যুবতী। এক পাশে শতছিন্ন পোশাকের ভিক্ষুক, অন্য পাশে শপিং মল। রাতের পর ছিনতাইবাজদের হাতে চলে যাওয়া বেশ কিছু রাস্তায় লাল সতর্কতা। ফুটপাথের পাশে ছোট ছোট স্থানীয় মদ, সিগারেটের দোকানে গিজগিজ করছে। তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত ছাপ রয়েছে এখানকার এই ভিড়ে।

আমরা উঠেছিলাম এক পাঁচতারা, বিলাসে বৈভবে যার সঙ্গে নিউইয়র্কের কোনও ভাল হোটেলের তফাত পাওয়া যাবে না হয়তো। আসলে বিশ্বের সব পাঁচতারা হোটেলই ভিতর থেকে যেন এক। সেই দেশ বা শহরের শব্দ, স্বাগ, দৃশ্য, স্পর্শ আলাদা করে টের পাওয়া যায় না। চার পাশের বাগানে চেনা ফুল বলতে চোখে পড়েছে বুমকোলতা, পাতাবাহার, কিছু চেনা ক্যাকটাস, আর বিভিন্ন রঙের জবা ঝোপ। কিন্তু বাইরে বেরোতেই গমগমে শহরের আঁচ এসে যেন ঝাপটা মারল।

আদিস আবাবার উত্তর দিকে রয়েছে এন্টোটে পর্বতালয়। সেখানে রয়েছে এক বিশাল পার্ক। সবুজে ভরা পাহাড়গুলি যেন আদিস আবাবা শহরের ফুসফুস— এই শহরের বাতাস পরিষ্কার রাখে আর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। পাহাড়ের ওপরে উঠতে উঠতেই আমরা ক্রমশ শীতল হয়ে আসা বাতাসের স্পর্শ পাচ্ছিলাম।

ওপরে উঠে মন ভরে গেল। বড় বড় গাছের ফাঁক দিয়ে অনেক নীচে দেখা গেল খেলনা শহরের মতো আদিস আবাবাকে। পর্যটকদের পাশাপাশি অনেক স্থানীয় মানুষও সেখানে ভিড় করেন দেখলাম। শহরের এটা হট স্পট। এই পাহাড়ে অল্পবয়সিদের জন্য নানারকমের অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস-এর ব্যবস্থা করা রয়েছে।

‘কোনও দেশের নাড়িনক্ষত্রের স্পন্দন যদি টের পেতে চাও তাহলে সে দেশের নতুন শহরে পৌঁছেই আগে দৌড়াও তার বাজারে’— এই পরামর্শ দিয়েছিলেন মহামতি সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর ভাইপো মোয়াজ্জেম আলিকে। মোয়াজ্জেম দীর্ঘ দিন দিল্লি ছিলেন বাংলাদেশের হাই কমিশনার হিসেবে, তখন তাঁর মুখ থেকেই এই গল্প শোনো। চাচা-র উপদেশ মান্য করে সারা জীবন যখন যে দেশে গিয়েছেন তিনি, আগে দৌড়েছেন সেখানকার বাজারে এবং তার ফলও পেয়েছেন।

সেই ‘চাচাকাহিনী’কে অনুসরণ আমরা পৌঁছিলাম আদিসের বাজারে,

যার নাম মেরকাতো। শুনতে মার্কেট বলে মনে হলেও আদতে এটি ইটালীয় শব্দ। দীর্ঘ দিন ইটালির উপনিবেশ হয়ে থাকার ফলে সে দেশ তার ছাপ রেখে গিয়েছে এখানকার ভাষা ও স্থাপত্যে। তাই মেরকাতো। এক বিরাট হোলসেল রঙিন এবং মিশ্র গন্ধময় বাজার এই মেরকাতো। খুচরো বিক্রিও চলছে। দোকানগুলি বিভিন্ন রঙের পোশাক পরা মহিলা নিয়ন্ত্রিত। দরদামও চলছে গড়িয়াহাট বাজারের মতো। তবে আয়তনে পাঁচটা গড়িয়াহাট বাজার বোধহয় ঢুকে যাবে। আমাদের চেনাশোনা সব রকম আনাজপাতি তো রয়েছেই, সেই সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন রঙের লক্ষা। মশলার আড়ত এক দিকে এবং সে এক মহাকায় ব্যাপার। লাল, বাদামি, হলুদ, সবুজ শুকনো গুঁড়ো অজস্র রকমের মশলা আর পাতাগুঁড়ো। কিছু রন্ধনের জন্য, কিছু সেবনের জন্য, কিছু ভেষজ এবং কফির সঙ্গে মেশানোর। এ ছাড়া বাসনকোসন, জুতো জামা, হাতের নানা টুকটাকি কাজের বস্তু, ব্যাগ, টুপি, ফ্যাশনদার জামা, হাতে বোনা পাপোশ, গাউন— কী নেই এই বাজারে! অনেক দোকানেই স্নায়ু অবশ করে দেওয়া স্থানীয় বাজনা বাজানো হচ্ছে। আমহারিক ভাষায় গানের সিঁড়ির দোকান। খোঁজ নিয়ে জানা গেল বেশিরভাগই ধর্মীয় সঙ্গীত। মাঝে মধ্যে জিরিয়ে নেওয়ার জন্য ‘স্মুদি’-র ঠেক। বিভিন্ন ফলের ‘স্মুদি’। আমি খেয়েছিলাম অ্যাভাকাদো। কী যে তার স্বাদ, যেন এখনও মুখে লেগে আছে! বাজার করতে এসে পরিবারের সদস্যরা সেই স্মুদি হাতে বকবকম করেই চলেছে।

সে সময় প্রায় পাঁচ হাজার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এই বাজারে যুক্ত ছিল। আজ হয়তো আরও বেড়েছে। এ ছাড়া ছোটখাটো হকাররা সমানে গুনগুন করছেন বাজারের গোলকধাঁস। সঙ্গে গাইড না থাকলে এক বার ঢুকে আর বেরোনো অসম্ভব যে বাজার থেকে।

আদিস-এর অন্য একটি বাজারের কথা না বললে এই বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মেরকাতোর মতো এর ব্যাপ্তি নেই, কিন্তু কিছুটা অবস্থানগত কারণেই এটি অনন্য। এই বাজার কিছুটা শৌখিনও বটে। একটি টিলার উপর সেন্ট মেরি চার্চ দেখতে উঠলে এই শিরো বাজারের দেখা পাওয়া যায়। উপর থেকে নীচের শহরটি ছড়িয়ে থাকতে দেখা এক মনোরম অভিজ্ঞতা বইকি। পর্যটকরা এখানে বেশি যান, কারণ এখানে স্থানীয় বস্ত্রশিল্পের সম্ভার বড়ই লা জবাব। এ ছাড়া রয়েছে ইথিওপিয়ান



আদিস আবাবা-র জমজমাট বাজার 'মেরকাতো'-য় হস্তশিল্পের সস্তার

বিভিন্ন কুটির শিল্প। চার দিকে গমগম করে এখনকার নিজস্ব জ্যাজ সঙ্গীত। গির্জার পক্ষ থেকে ধর্মসঙ্গীতের বাইরে কিছু বাজানো নিষিদ্ধ। কিন্তু রাস্তাঘাটে, দোকানে, পাব-এ বিশেষ করে এই বাজারে জ্যাজ-এর প্রচলন খুবই। ধর্মীয় সঙ্গীতের কথা যখন উঠল, একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। ইথিওপিয়াতে বহু বছর ধরে খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখে আসছে আফ্রিকা। যুদ্ধ হানাহানি নেই নিজেদের মধ্যে তেমন। এতটাই গভীর সেই সহাবস্থান যে, এক ধর্মের কিছু আচার অন্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দিব্যি মিলেমিশে গিয়েছে। অনেক খ্রিস্টানই মাথায হিজাবের মতো কারুকার্যময় সাদা কাপড় (ওড়না) পরে মুসলিম উৎসবে शामिल হন।

দেখলাম পাশ্চাত্য রক অ্যান্ড রোল নয়, আদিসের মানুষ নানা রকমের স্থানীয় বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গতে নাচতে পছন্দ করেন। আমরা যে হোটеле ছিলাম, তার থেকে কিছু দূরেই একটি মিউজিক্যাল পাব। যার নাম 'আবিসিনিয়া'। ইথিওপিয়ার গানবাজনার স্বাদ পেতে এক সন্ধ্যায় গিয়েছিলাম সেখানে। এমনই তার ছন্দ যে অজান্তেই পা নিশপিশ করবে নাচার জন্য। তাল মেলাতে শুরু করবেন আপনি। কিছু ক্ষণ পরে, অনেক দর্শকই মধ্যে উঠে চলে গেলেন নাচ-গানে যোগ দিতে। তাঁরা শুধু খেতে আসেননি, জীবনকে তার সর্বশ্ব দিয়ে উপভোগ্য করতেও এসেছেন। মধ্যে উঠতে আমাদেরও 'নমস্তে' বলে অভিবাদন জানাতে লাগলেন স্থানীয়রা। ভারতীয়রা কি তা হলে এতটাই পরিচিত জানো! পরিচিত তো বটেই, এবং তার জন্য বলিউড এবং শাহরুখ খান যে অনেকটাই দায়ী তা তাঁদের প্রশ্ন শুনে বুঝতে অসুবিধে হয় না!

খেয়াল করলেই বোঝা যায়, স্থানীয় মানুষ দেশজ পোশাক পরতে স্বচ্ছন্দ। সেটা বাজারহাটেই হোক বা কোনও জমায়েতে। ইথিওপিয়ার মহিলাদের জাতীয় ঐতিহ্যের পোশাক হল 'হাবেশা কেমিস'। এটি একটি লম্বা, সাদা সুতির জামা, যাতে নানারকমের রঙিন সুতোর নকশা করা থাকে। এর সঙ্গে নেওয়া হয় 'নেতেলা' নামের এক ধরনের শাল। এই দেশের প্রত্যেক জনজাতির পোশাকে থাকা আলাদা নকশা। প্রকৃতি এবং আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করেও বদলায় পোশাক। জনজাতিভেদে বদলে যায় চুলের স্টাইল, গয়নাগািটি আর জামার নকশা। হারার অঞ্চলের মেয়েদের জামায় থাকে বেগুনি, লাল আর কালো রঙের নকশা; আবার ওরোমো জনজাতির মানুষেরা চামড়ার পোশাকও পরেন। জানলাম, 'নেতেলা'-ই একমাত্র শাল নয়। রয়েছে 'ফোতা' নামের চৌখুপি নকশা করা তোয়ালে, 'দোচো' নামের লম্বা শাল, যা শুধু বিবাহিত মহিলারা ব্যবহার করেন আর 'গাবি' নামের পাতলা কম্বল। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই 'গাবি' ব্যবহার করেন বাড়িতে, শীত এড়ানোর জন্য। ছেলের পারস্পরিক পোশাক হল হাটু অবধি সাদা শার্ট, সাদা ট্রাউজার্স

আর গাবি। আদিস আবাবা-র 'শিরো মেডা' মার্কেট এমন সব পোশাক বিক্রির জন্য পরিচিত। দোকানগুলিতে বিক্রি হচ্ছে বাহারি নকশা করা নানা ছাঁদের জামা।

ইথিওপিয়া চামড়ার জিনিস উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত এবং গোটা আফ্রিকাতে তারা শীর্ষে। গাড়ির চালক আমাদের নিয়ে গেলেন ওখানকার এক বিশেষ বাজারে, যেখানে নানারঙের চামড়ার দারুণ সব জিনিস বিক্রি হচ্ছে। আমরা সেখান থেকে কিনেছিলাম লাল চামড়ার ব্যাগ, জুতো আর জ্যাকেট, যার অনেকগুলো নাকি কুমিরের চামড়ার!

১১ ৬ ১১

শতাধিক হাডের টুকরোর সামনে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছি ঠায় যে কতক্ষণ! বৃদ্ধাতমা প্রমাতামহীর দিকে! যিনি সভ্যতার আদিমাতা। যাঁর নাম লুসি। বিটলস-এর জনপ্রিয় গান 'লুসি ইন দ্য স্কাই উইথ ডায়মন্ডস', থেকে যাঁর নাম রাখা হয়েছে লুসি। ইনি আদিমতম নরকঙ্কাল। ১৯৭৪ সালে ইথিওপিয়ার আওয়াশ উপত্যকার হাড়ার অঞ্চলে (যাকে বলা হয় 'ক্রেডেল অব সিভিলাইজেশন') যাঁর ফসিল খুঁজে পেয়েছিলেন বিজ্ঞানী ডোনাল্ড ইয়োহানসন। বত্রিশ লক্ষ বছরের পুরনো এক স্ত্রী অস্ট্রলোপিথেকাসের কঙ্কাল। তখন পাওয়া হাড়ের সংখ্যা কম থাকলেও ধীরে ধীরে বিগত কয়েক বছরে লুসিমাতার আরও ১০২টি হাড়ের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেগুলো মিলিয়ে এখন লুসিকে অনেকটাই পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দাঁত ও পেলভিক বোনের গড়ন দেখে নৃতত্ত্ববিদরা নিশ্চিত হয়েছিলেন, ইনি বাদর নন, প্রায় পুরোটাই মানুষ! স্থানীয় ভাষায় এর নাম 'দেব্লেস্ট' বা অনন্যা।

আমাদের নিয়ে আসা হয়েছে এ দেশের জাতীয় সংগ্রহশালা বা ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ইথিওপিয়ায়।

ইথিওপিয়ার নানা রকমের শিল্প-সংস্কৃতির উদাহরণের পাশাপাশি এখানে সবচেয়ে জনপ্রিয় দেখলাম লুসি-ই। মানব বিবর্তনের নৃতাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের উদাহরণটির সামনে দীর্ঘ লাইন। বিভিন্ন দেশের মানুষ চোখ ছানাবড়া করে দেখছেন লুসিকে। কারণ, 'লুসি' ছিল সেই প্রথম স্ত্রী হোমিনিড, যে সম্ভবত প্রথম দু'পায়ে হেঁটেছিল।

এই সংগ্রহশালায় মোট চারটি এগজিভিশন হল। বেসমেন্টে 'লুসি'কে দেখে এসে, আমরা প্রথম তলায় দেখলাম প্রাচীন ও মধ্যযুগে ইথিওপিয়ার মানুষদের ব্যবহার করা জিনিসপত্র; সেখানে সম্রাট হেইলে সেলাসির ব্যবহার করা সামগ্রীও রয়েছে। দ্বিতীয় তলায় ইথিওপিয়ার প্রাচীন এবং নতুন শিল্পীদের আঁকা ছবি। আর তৃতীয় তলায় এই দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের তথ্যবহুল পরিবেশনা।

সংক্ষিপ্ত সফর শেষ। এবার ফিরতে হবে এই মায়া-জড়ানো শহর থেকে। বিমানবন্দরে যাওয়ার পথে শেষ বারের জন্য নামা হল এখানকার সবচেয়ে খ্যাতনামা গির্জা হোলি ট্রিনিটি ক্যাথিড্রাল-এ। গত শতকের বিয়াল্লিশ সালে ইটালির বিরুদ্ধে জয়ের পরে এটি তৈরি। গির্জা চত্বরে সম্রাট হেইলে সেলাসি এবং সম্রাজ্ঞী মেনেন আসফ এর সমাধি ছাড়াও রয়েছে ইটালির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সেনানীদের সমাধি। আর রয়েছে একটি মিউজিয়াম, যেখানে সংরক্ষিত ১৯৩৭ সালে ইটালীয় আগ্রাসনের সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের দেহাবশেষ। সব মিলিয়ে এ শুধু গির্জা নয়, এটি ইথিওপিয়ার বিজয়কেতনও বটে। সেই সঙ্গে অতীত সংগ্রামের এক টুকরো স্মৃতিও।

সেই স্মৃতির ভারেই কি না জানি না, শহর ছাড়ার আগে পিছনে তাকালে আদিস আবাবা-র রাস্তা যেন বাপসা হয়ে যাচ্ছে। সেই বাপসা হয়ে যাওয়া মহাসড়ক জুড়ে ম্যারাথন দৌড়াচ্ছেন আজকের শত শত আবেবে বিকিলা। দৌড়াচ্ছেন সেই ছায়াবৃতাকে উঁচুতে তুলে ধরার জন্য, উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে বহু দিন পর্যন্ত যার মানবরূপ কালো ঘোমটার নীচে অপরিস্রব হয়ে ছিল।

চোখ মুছে আবার দেখলাম, সমস্ত অপমানের ইতিহাস মুছে আলোয় ভাসছে ইথিওপিয়া। আফ্রিকা।



নীল আকাশের ছায়ায় সেজে ওঠা ঝিলম নদী

আমার ঝিলম, তোমার বিতস্তা

প্রেমাংশু চৌধুরী

জানুয়ারি, ২০২৩, ডায়েরির পাতা থেকে

‘জান লুটা কে দুশমন কি হামনে হিফাজত কি হ্যায়...’

মুর্শিদাবাদের অরিজিৎ সিংহের গাওয়া গানটা শ্রীনগরের মুবাশির অনেক ক্ষণ ধরে গুনগুন করছিল। মুবাশির কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া। শ্রীনগরের একশো বছরের পুরনো আহদুস হোটেলের পিছনে ছবির মতো সুন্দর বিলালিয়া মসজিদ। তারই সামনে পার্কের বেঞ্চে মুবাশিরের সঙ্গে আলাপ।

জানুয়ারির শেষ বিকেল। দিনদুয়েক পরে শ্রীনগরে তুষারপাত থেমেছে। তাপমাত্রা অবশ্য এখনও শূন্যের আশপাশে। ঝিলমের জলের ধারে, লালচকের কোণে সাদা তুলোর মতো বরফ জমে। মুবাশির সবেমাত্র ‘পাঠান’ দেখে এসেছে। শাহরুখ খান এখনও ওঁর মাথার মধ্যে ভর করে রয়েছেন।

তিন দশক পরে কাশ্মীরে আবার সিনেমা হল খুলেছে। শ্রীনগর শহরে এক সময় ডজনখানেক সিনেমা হল ছিল। নব্বইয়ের দশকে কাশ্মীরে জঙ্গি আন্দোলনের ধাক্কায় সে সব বন্ধ হয়ে যায়। বলিউডে শাহরুখ খানের শাসনকাল শুরুর অনেক আগেই। বত্রিশ বছর পরে

কাশ্মীরের মানুষ আবার সিনেমা হলে ভিড় জমাচ্ছেন। একটিমাত্র হলেও শ্রীনগরেও এখন মাল্টিপ্লেক্স। ছ’টি শো। সব শো-তেই পাঠান। সবগুলোই হাউসফুল। শহরের বাইরে থেকেও মানুষ ভিড় করে বড় পর্দায় শাহরুখ খানকে চাক্ষুষ করতে আসছেন।

“কাশ্মীরেও একজন শাহরুখ ছিলেন, জানেন তো? তাঁর রাজত্বে কাশ্মীর বড় আনন্দে ছিল। তাঁর জন্য হিন্দু, মুসলমান একসঙ্গে দুয়া করত। তিনিও জান দিয়ে দুশমনের হিফাজত করতেন। সে অবশ্য ছ’শো বছরের পুরনো কথা।”

মুবাশিরের কথায় সোজা হয়ে বসতে হয়। ইনি কোন শাহরুখ? ছ’শো বছর পরেও কাশ্মীরের কলেজ-ছাত্র যাঁর দাস্তান শোনায়!

বুদশাহ বা বড় শাহ, মহান রাজা

বাবা-মা নাম রেখেছিলেন শাহরুখ। কাশ্মীর উপত্যকা তাঁকে চেনে সুলতান জুইন-উল-আবিদীন নামে। কাশ্মীরে সুলতানি রাজত্বের শাহ মীরী বংশের শাসক। যিনি কাশ্মীরি গালিচার গায়ে সূক্ষ্ম নকশার মতো ঝিলমের দু’পারে কাশ্মীরিয়তের ভাবনা বুনে দিয়েছিলেন।



অনন্তনাগের কাছে রাজা ললিতাদিত্য মুক্তপীড় স্থাপিত মর্তণ্ড মন্দির

চোদ্দশো শতকের গোড়ার কথা। শাহরুখের বাবা সুলতান সিকন্দর হিন্দু মন্দির, দেবদেবীর মূর্তি দেখলেই ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জিজিয়া কর বসিয়েছিলেন। কপালে তিলক কাটাও ছিল নিষিদ্ধ। তাঁর নামই হয়ে গেল বৃতশিকান— মূর্তিপূজার বিরোধী। সিকন্দরের নির্দেশ ছিল, সবাইকে শরিয়ত আইন মেনে চলতে হবে। কার্কেট বংশের রাজা ললিতাদিত্য মুক্তপীড় অনন্তনাগের কাছে মর্তণ্ড মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। সিকন্দরের নির্দেশে তা পুড়িয়ে ফেলা হল। অত্যাচারে কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বাড়ি ছেড়ে পালাতে শুরু করলেন। কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের চলে যাওয়ার সেই শুরু।

সিকন্দরের পরে তাঁর বড় ছেলে আলি শাহ গদিতে বসলেন। তবে কিছু দিনের মধ্যেই তিনি মক্কা হজ করতে চলে গেলেন। সিংহাসনে বসলেন তাঁর ভাই শাহরুখ ওরফে জইন-উল-আবিদীন। সিকন্দরের প্রিয় পুত্র তখনও বসে তাঁর উল্টো পথে হাটবেন কে জানত! নরেন্দ্র মোদীর জমানায় একের পর এক রাজ্যে গোমাংসে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। কোনও মুসলিমের বাড়িতে গোমাংস রান্না হচ্ছে বলে সন্দেহে তাঁকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। সুলতান জইন-উল-আবিদীন মুসলিম হয়েও আদেশ দিয়েছিলেন, হিন্দুদের শিবরাত্রি পালনের সময় মুসলমানদের গোমাংস খাওয়া চলবে না। সে সময় নদীতে মাছ ধরাও নিষিদ্ধ। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণরা সাধারণত আমিষাশী। মাছ খেতে ভালবাসেন। তবে পূজোপার্বণে তা বন্ধ থাকে। সুলতান ঠিক করলেন, তিনি নিজেও হিন্দুদের উৎসবের সময় আমিষ খাবেন না। মুসলিম প্রজারা আপত্তি করলেন না। খুশি মনে মনে নিলেন। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের তিনি আবার ফিরিয়ে আনলেন। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কাছে ঝিলমের নাম বিতস্তা। ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশীতে বিতস্তার জন্মতিথি পালনে সুলতানই প্রধান পূজারির আসন নিলেন। মন্দির তৈরি করিয়ে দিলেন। তুলে দিলেন জিজিয়া কর। বললেন, মুসলিমরা চলবেন নিজের মতো শরিয়ত মেনে। হিন্দুরা চলবেন তাঁদের ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী। পঞ্চাশ বছরের রাজত্ব তাঁকে সুলতান থেকে হিন্দু-মুসলমান সকলের ‘বুদশাহ’

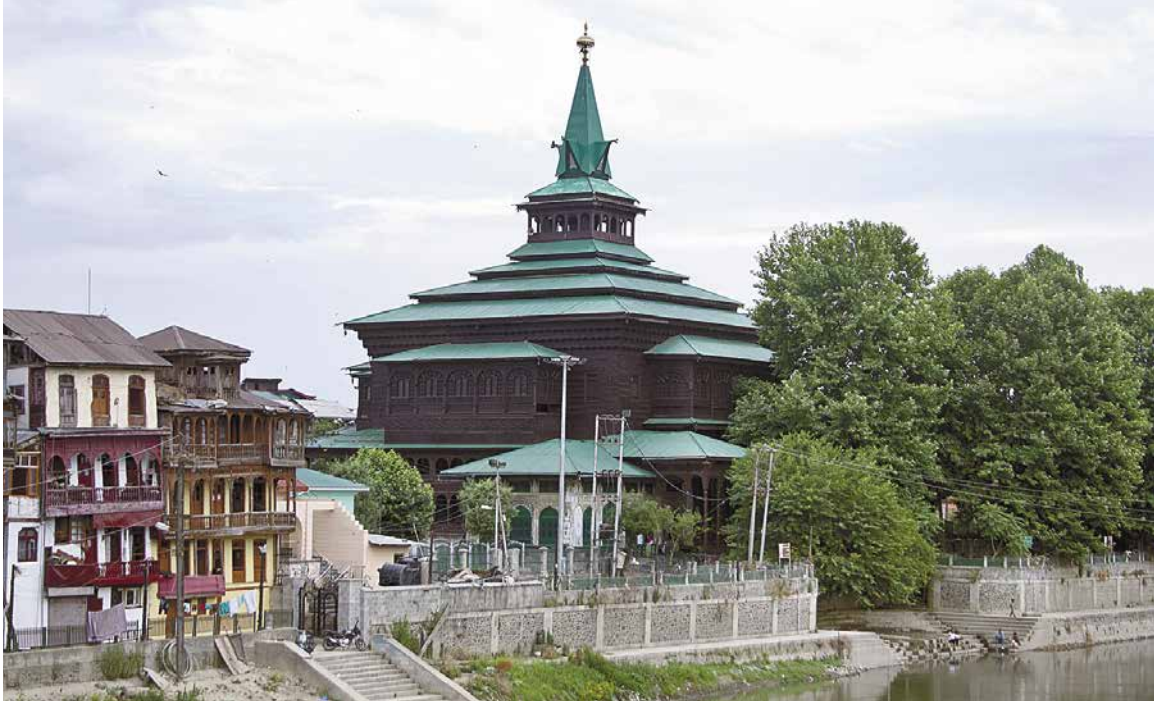
বা মহান রাজা করে তুলল।

কবি কলহণ কাশ্মীরের শাসকদের কাহিনি ‘রাজতরঙ্গিনী’ লিখে গিয়েছিলেন। বুদশাহ সরকারি খরচে ফার্সিতে মহাভারত ও রাজতরঙ্গিনী-র অনুবাদ করিয়েছিলেন। কলহণের উত্তরসূরি জোনরাজ ও শ্রীধর, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজতরঙ্গিনী-তে বুদশাহেরই ধর্মনিরপেক্ষ, সহিষ্ণু রাজত্বের কাহিনি লিখলেন। ডাল লেকের জলে কাশ্মীরিয়তের শিকারা ভাসতে শুরু করল। শীত চলে যাওয়ার পরে গাছে গাছে বাদাম ধরলে, কাশ্মীরি পণ্ডিত ও মুসলিমরা মিলে বাদামওয়াড়ি উৎসবের ছল্লোড়ে মাতলেন। ভাগাভাগি করে আখরোট খাওয়া হল। সবাই পীরের থানে মাথা ঠেকিয়ে বাড়ি ফিরল।

দ্য কাশ্মীর ফাইলস

না মশাই। ‘দ্য কাশ্মীর ফাইলস’ সিনেমায় কাশ্মীরের এই কাহিনি শুনতে পাবেন না। সেখানে শুধুই বিদ্রোহের গল্প। হিংসার আখ্যান। নব্বইয়ের দশকে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহের সরকারের সময় কাশ্মীরি পণ্ডিতরা শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরি উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। কাশ্মীর তখন জঙ্গিদের কালাশনিকভের শাসন চলছে। রাইফেলের নল ঘুরে গেল হিন্দু পণ্ডিতদের দিকে। পড়ে রইল ভিটেমাটি। প্রাণ বাঁচাতে কাশ্মীর ছেড়ে কেউ গেলেন জন্ম, কেউ পঞ্জাব। ধর্ম-মত নির্বিশেষে হিন্দু পণ্ডিতদের কাছেই কাশ্মীরি শিশুরা অ-আ-ক-খ লেখা থেকে ইতিহাস-ভূগোল পড়তে শেখে। পণ্ডিত মানেই তো জ্ঞানের সমাহার। কেউ পুঁথিপত্র ঝোলায় ভরে নিতে পেরেছিলেন। কেউ পারেননি। কাশ্মীরের জলহাওয়া বছরের পর বছর শাস্ত্র, তন্ত্র লেখা ভূর্জপত্রকে যত্নে রেখেছিল। জঙ্গিদের গুলিতে তাতে রক্তের ছিটে লাগল।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, বহু বছর ধরে ধামাচাপা দিয়ে রাখা সত্য সামনে এসেছে। সবাইকে এই সিনেমা দেখতে হবে। বাক্সাধীনতার ধ্বজাধারীদের নিন্দা করেছিলেন তিনি। কারণ তাঁরা কাশ্মীর ফাইলসের নিন্দা করছে।



ছয় শতকেরও বেশি প্রাচীন ‘খানকা-এ মউলা’ মসজিদ

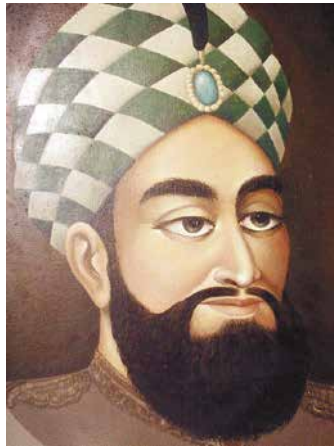
বাস্তবে কাশ্মীরি ফাইলস সিনেমার চিত্রনাট্য জুড়ে শুধুই মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের লড়িয়ে দেওয়ার উপাদান। উগ্র হিন্দুত্ববাদকে উস্কে দেওয়ার রসদ। সেই ফাইলে কাশ্মীরের ‘রুহু’ বা আত্মাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

মন্দিরের পাহারায় ফেরেশতা

ডাল লেকের ব্যুলেভার্ড থেকে মুঘল গার্ডেনে ঘুরে বেড়ানো পর্যটকরা সাধারণত পুরনো শ্রীনগর বা ডাউনটাউনে যান না। সেই পুরনো শহরেই ঝিলম নদীর উপরে আলি কাদাল সেতু। সুলতান আলি শাহ মক্কায় হজ করতে যাওয়ার আগে এই নদী পারাপারের সেতু তৈরি করিয়েছিলেন। ছ’শো বছরের পুরনো সেতুর উপরে দাঁড়ালে একদিকে চোখ ধাঁধানো খানকা-এ-মউলা মসজিদ। তারও বয়স ছ’শো বছরের বেশি। অন্য দিকে তাকালেই বৃদশাহের সমাধি। আর তার পাশে রামা কউল মন্দির। বছর ষাটের পুরনো এই মন্দিরেই আসল ‘কাশ্মীরি ফাইলস’ লুকিয়ে।

কাশ্মীরি পণ্ডিতরা যখন প্রাণের ভয়ে ভিটেছাড়া হলেন, তখন তাদের কাঠের বাড়ির মতোই পড়ে রইল রামা কউল মন্দির। গর্ভগৃহ সেই থেকেই তালাবন্দি। তবে মন্দিরে কাউকে আঁচড় কাটতে দেননি ইরফান আহমেদ ও তাঁর পরিবার। বিরানবই-তে অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙা হল। শ্রীনগরে এই মন্দির ভাঙার চেষ্টা হয়েছিল। ২০০২-এ গুজরাতে দাঙ্গার পরেও একই চেষ্টা হয়। দু’বারই বুক দিয়ে পণ্ডিতদের ফেলে যাওয়া মন্দির আগলেছিলেন ইরফানের বাবা-মা। এখন ইরফান মন্দিরের দেখাশোনা করেন। মন্দিরের ক্ষতি হলে তিনি পণ্ডিত বন্ধুদের কী জবাব দেবেন! মন্দিরের গর্ভগৃহ তালা বন্ধ থাকে। তালাবন্দি দেবতা পূজোর অপেক্ষায় থাকেন। বাইরে বছরের পর বছর ইরফানরা ফেরেশতার মতো পাহারায় থাকেন। পণ্ডিতদের ফেরার অপেক্ষায়।

এই আলি কাদাল মহল্লার মায়াবী গলিতেই এক মস্ত চিনার গাছের আশ্রয়ে ঋষি পীরের মন্দির। মন্দিরে কোনও মূর্তি নেই। শুধুই ঋষি পীরের ছবি। সতেরোশো শতকের কাশ্মীরি সাধক। এই মন্দিরের চাবি থাকে রমেশ কউলের কাছে। নব্বই দশকের গোড়ায় মহল্লার কাশ্মীরি পণ্ডিতরা সবাই শ্রীনগরের এই মহল্লা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। থেকে গিয়েছিলেন রমেশ। ঋষি পীরের মন্দিরে গেলে হাতে আখরোট, কিশমিশ তুলে দেন রমেশ। রাজকার জীবনের নানা সমস্যায় জেরবার আলি কাদাল মহল্লার মানুষ তাঁর কাছে সমাধানের খোঁজে ভিড় করেন। যেমনটা ভিড় জমত ঋষি পীরের দরবারে।



শাহরুখ ওরফে জইন-উল-আবিদীন

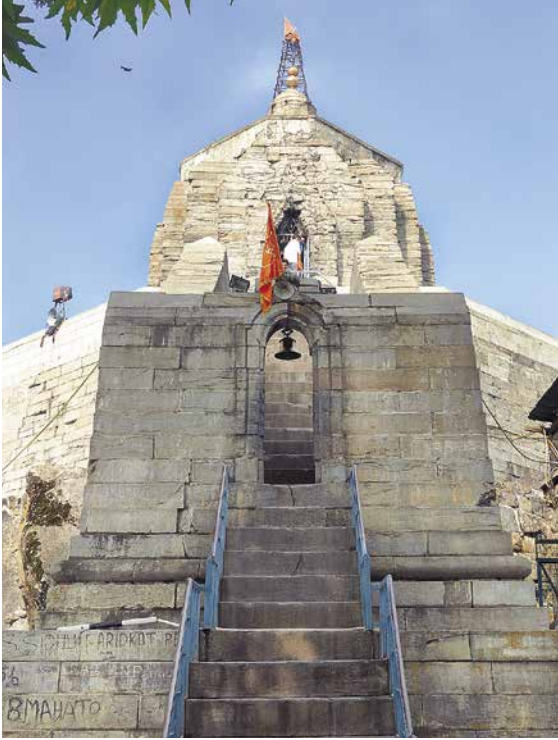
যিনি ঋষি, তিনিই পীর

‘পীর পণ্ডিত পদশাহ হর্দু জাহান, মুশকিল কর আসান’

ঋষি পীর সম্পর্কে কাশ্মীরের মানুষ এমন কথাই বলতেন। কারণ তিনি হিন্দু ও ইসলাম, দুই দুনিয়ারই সম্রাট। তাঁর কাছে হিন্দু ও মুসলমান, দুই ধর্মের মানুষেরই সব মুশকিল আসানের উপায়। প্রায় চারশো বছর আগে শ্রীনগরের পণ্ডিত গোবিন্দ কউলের ছেলের জন্ম। আসল নাম ছিল কেশব। ছোট থেকেই আধ্যাত্মিকতায় ডুবে থাকা কেশবের কাছে হিন্দু, মুসলিম সকলেই দিনগত পাপক্ষয় থেকে মুক্তির পথ জানতে আসতেন। হিন্দুদের কাছে তিনি হয়ে উঠলেন ঋষি।

মুসলিমদের কাছে পীর। লোকমুখে নাম হল ঋষি পীর।

ওই নাম শুনে মোগল সম্রাট ওরঙ্গজেবের ভারি গৌঁসা হয়েছিল। এক হিন্দু ব্রাহ্মণ নিজেকে পীর বলে কোন সাহসে? মোগল দরবারে তলব করা হল ঋষি পীরকে। পাঠানো হল সেনা। ঋষি পীর তাদের বললেন, রাতিরাটা এখানেই অতিথি হিসেবে কাটিয়ে যাও। কাল সকালে যাওয়া যাবে। কথিত, ঋষি পীরের আশ্রমে মোগল সেনারা যখন বিশ্রাম নিচ্ছে, সেই সন্ধ্যাতেই অজুত ভাবে ওরঙ্গজেবের দরবারে



শঙ্করাচার্য পর্বতের উপর এক হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত শিবমন্দির

হাজির হয়েছিলেন ঋষি পীর। ঔরঙ্গজেবও তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তি টের পেয়ে পিছু হটেন।

মৃত্যুর আগে টানা ১৪ বছর ধ্যানমগ্ন ছিলেন ঋষি পীর। তাঁর মৃত্যুর পরে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিবাদ বাঁধল। ঋষি পীরের দেহ দাহ করা হবে না কি কবর দেওয়া হবে? আলি কাদালের বাসিন্দারা বলেন, বাদানুবাদের মধ্যেই ঋষি পীরের দেহ আচ্ছাদিত চাদর খুলে দেখা যায়, ২৭টি ফুল পড়ে রয়েছে। ঝিলমের তিরে সেই ২৭টি ফুলই দাহ করা হয়েছিল। সেখানেই ঋষি পীর মন্দির।

শৈবতন্ত্র, শাক্ততন্ত্র, তিব্বতীয় বৌদ্ধতন্ত্র, ইসলাম, সুফি

কিংবদন্তি অনুযায়ী, আজ যেখানে কাশ্মীর উপত্যকা, সেখানে এক সময় ছিল সতীসার হ্রদ। তার জলে বাস করত জলোদ্ভব নামে এক রাক্ষস। সে বর পেয়েছিল, যত দিন জলে থাকবে, তত দিনই সে অমর। কাশ্যপ মুনি পাহাড়ে ফাটল ধরিয়ে হ্রদের জল বের করে দিলেন। জলোদ্ভবের মৃত্যু হল। সেই থেকেই নাকি ওই অঞ্চলের নাম হয় কাশ্যপ-মারা। তা থেকেই কাশ্মীর। কাশ্মীরের আক্ষরিক অর্থও হল, জল শুকিয়ে তৈরি জমি। ‘কা’-এর অর্থ জল। ‘শিমীরা’-র অর্থ শুকিয়ে ফেলা।

এই কাশ্মীরেই ঠাঁই নিলেন ব্রাহ্মণরা। যিনি পরমজ্ঞানী, তিনিই ব্রাহ্মণ। কাশ্মীরের জলহাওয়ায় শাস্ত্র, তন্ত্র লেখা ভূর্জপত্র বা তালপত্র কিছুই নষ্ট হয়ে যায় না। এ এক মস্ত সুবিধে। তৈরি হল নতুন দর্শন। হিন্দুধর্ম অনুযায়ী, এ বিশ্ব আসলে মায়া। কাশ্মীরের পণ্ডিতরা বলেন, এই দুনিয়ার সবই বাস্তব। এই পৃথিবী আসলে শিবের সৃজনশীল অভিব্যক্তি। শিবই হলেন মানুষের চেতনা। পরম-ব্রহ্ম। এই দুনিয়া শিবেরই চেতনার প্রতিভাস। তাই যে কেউ শিব হতে পারে। জাত-ধর্ম-লিঙ্গ নির্বিশেষে। দশম শতকে কাশ্মীরি পণ্ডিত অভিনবগুপ্ত তন্ত্রলোক গ্রন্থে এই কাশ্মীরি শৈবতন্ত্রের হদিশ দিয়ে গেলেন। এ জীবন স্বপ্ন না বিভ্রম, হিন্দু দর্শনের সেই প্রশ্নকে পাশে সরিয়ে রেখেই পণ্ডিত কলহণ তাঁর মহাকাব্য ‘রাজতরঙ্গিণী’ লিখতে বসেছিলেন।

সম্রাট অশোক যখন তাঁর রাজত্ব কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তার করলেন, তখন ঝিলমের জলে ভাসতে ভাসতে বৌদ্ধধর্মও কাশ্মীরে পা

রাখল। কাশ্মীরেই প্রথম বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃতে লেখা হল। কাশ্মীরের রাজপরিবারের গুণবর্মন সিংহাসন প্রত্যাখ্যান করে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কাজ নিলেন। দ্বিতীয় বুদ্ধ বলে পরিচিত বৌদ্ধগুরু পদ্মাসম্ভব কাশ্মীরে বহু দিন কাটিয়ে গেলেন। এলেন হিউয়েন সাং। তিব্বতের প্রথম বৌদ্ধগুরু ‘সমো’-র বৃত্তাকার ছাদ পুড়ে যাওয়ার পরে রত্নভজ নামের এক কাশ্মীরি পণ্ডিতের উপরে তা নতুন করে তৈরি করার দায়িত্ব পড়ল। কাশ্মীর থেকে বিদূষী লক্ষ্মী তিব্বতে গেলেন ‘অনুত্তরযোগ’ তন্ত্র পড়াতে। এই তিব্বতেই কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ‘ভট্ট’ উপাধি পেলেন। কাশ্মীরের বাইরে যাঁরা কাশ্মীরি পণ্ডিত, কাশ্মীরের মানুষের কাছে তাঁরাই বট্ট। ভট্টের অপভ্রংশ। রাজা ললিতাদিত্য ও রাজা অবন্তীবর্মণ— দুই রাজার আমল কাশ্মীরের জ্ঞানচর্চার স্বর্ণযুগ। বিতস্তার তীরে মন্দিরের পাশেই গড়ে উঠল বৌদ্ধ চৈত্যা।

কাশ্মীরের দেড় হাজার বছরের ইতিহাস বলে, কাশ্মীর প্রথমে হিন্দু, তার পরে বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। শৈব দর্শনের পাশেই হেঁটেছে বৌদ্ধ ধর্ম। তার পর এসেছে ইসলাম। ইসলামও কাশ্মীরে তার কটর একেশ্বরবাদের বদলে কাশ্মীরের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। ঝিলমের জলে শিকারার মতো ভেসে এসেছে কাশ্মীরি সুফিবাদ। কাশ্মীরের ইসলামের নিজস্ব ঘরানা।

সুলতানি আমলে সুফি সাধক সৈয়দ আলি হামদানি তাঁর মুরিদদের নিয়ে কাশ্মীরে আশ্রয় নেন। হিন্দু শাসকদের রাজত্বে ব্রাহ্মণরা তখন আমজনতাকে শোষণ করতে শুরু করেছেন। ব্রাহ্মণরা নিজেদের উচ্চবর্ণ দাবি করায় জাতপাতের ভেদাভেদ তৈরি হয়েছে। গরিব, নিম্নবর্ণ, তথাকথিত নিচু জাতির মানুষ তা দেখে ইসলামের দিকে ঝুঁকলেন। সুফিবাদ— মানবতাবাদ, আধ্যাত্মিকতা, সহিষ্ণুতার কথা বলল। যেখানে উঁচু, নিচু, সকলের একই ঈশ্বর। কোনও শ্রেণি বা জাতির বিভাজন নেই। কাশ্মীরে এখনও তাই হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ছাড়া অন্য জাতের দেখা মেলে না।

তার পর এলেন সুফিসাধক শেখ নূরউদ্দিন নুরানি। আলমদার-এ-কাশ্মীর। কাশ্মীরের মানুষের কাছে নূন্দ ঋষি। কাশ্মীরের সুফিবাদের ঘরানায় নূন্দ ঋষি বা নূরউদ্দিনের সিলসিলা শুরু হল। সেই একই কাহিনি। হিন্দুদের কাছে যিনি ঋষি, তিনিই মুসলিমদের কাছে পীর। হিন্দু ব্রাহ্মণসন্তান কেশব মুসলিমদের কাছে পীর হয়ে উঠেছিলেন। নূরউদ্দিন হিন্দুদের কাছে নূন্দ ঋষি হয়ে উঠলেন। শৈব মন্দির ও বৌদ্ধ চৈত্যের পাশেই মাথা তুলল সুফিদের আস্তানা, ‘খানকা’।

আর হবে না-ই বা কেন! নূন্দ ঋষি ছিলেন শৈব সাধিকা লালেশ্বরীর ভক্ত। ব্রাহ্মণ ঘরের বৌ লালেশ্বরী কাশ্মীরিদের কাছে লাল দেদ বা লাল দিদিমা। হিন্দু, বৌদ্ধ, সুফি ইসলাম, সব ঘরানার মানুষই তাঁকে নিজের বলে দাবি করেন। লাল দেদ কাশ্মীরি সংস্কৃতির অন্যতম অভিজ্ঞান। কাশ্মীরি ভাষায় তাঁর বচন বা ‘বাখ’ এখনও প্রবাদপ্রতিম। তিনি বলতেন, ‘শিব ছুয়ি থলিয়ে থলিয়ে রোজান, মো জ্ঞান হিন্দু তে মুসলমান’— প্রতিটি কণায়, প্রতিটি সন্তায় বিরাজ করে ভগবান, ফারাক করিস না কে হিন্দু, কে মুসলমান।

এই কাশ্মীরি ইসলামের ঘরানাকেই পরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সুলতান জুইন-উল-আবিদীন। যাঁর নাম ছিল শাহরুখ। নূন্দ ঋষির সমাধিতে তিনিই তৈরি করাবেন চারার-এ-শরিফ। হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মাঝে কাশ্মীরিয়তের খোঁজ করবেন। কাশ্মীরিয়ত তো আসলে ইনসানিয়ত, মনুষ্যত্বের আর এক নাম।

প্রায় একশো বছর পরে মোগল সম্রাট আকবর যেন তাঁর দেখানো পথেই চলেছিলেন। খোঁজ পেয়েছিলেন হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মিশ্রণ দীন-ই-ইলাহি-র।

শ্রীনগর থেকে বিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে চারার-এ-শরিফে এখনও মুসলিমদের সঙ্গে হিন্দু-শিখরা ভিড় করেন। পণ্ডিতদের ঘরে শিশুর জন্ম হলে নূন্দ ঋষির আশীর্বাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়। মুসলিমরা শিশু কোলে নিয়ে চারার-এ-শরিফে দোয়া চাইতে যান।

ছ’শো বছর ধরে ঝিলমের ঢেউ পাথরে মাথা কুটে এই কাহিনিই শুনিতে চলে।



আলমদার-এ-কাশ্মীর, তথা নুন্দ ঋষির সমাধিতে নির্মিত চারার-এ-শরিফ

বার বার, সাত বার

এমন স্বর্গরাজ্য ছেড়ে তা হলে কেন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পালাতে হল? কেন তাঁদের প্রাণ হাতে করে ভিটেমাটি ছাড়তে হল?

রাজনীতির তর্কবিতর্কে কাশ্মীর থেকে পণ্ডিতদের ঘরছাড়া হওয়ার একটি ইতিহাসই ঘুরেফিরে আসে। সে হল নব্বইয়ের দশক। আসলে মোট সাত বার হিন্দু পণ্ডিতরা কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কোনও বারই স্থানীয় মুসলিমরা তাঁদের ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য করেননি। প্রতিবারই হয় শাসকের রায়ে, ধর্মাত্মক নীতির ফলে, না হলে রাজনীতির খেলায় পণ্ডিতদের ঘরছাড়া হতে হয়েছে। এখন সেই রাজনীতির ফায়দা তুলতেই আবার পণ্ডিতদের কাশ্মীরে পুনর্বাসনের গল্প শোনানো হচ্ছে।

মূর্তিপুজোর ঘোর বিরোধী সুলতান সিকন্দর ওরফে বুতশিকানের আমল কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পক্ষে প্রথম অভিশপ্ত কাল। বলা হয়, সিকন্দরের নির্দেশে ডাল লেকে এক লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল। ডাল লেকের সেই জায়গার নাম এখন ভট্ট মাজার। তাঁর ছেলে আলি শাহর আমলেও ফের পণ্ডিতদের কাশ্মীর ছাড়তে হয়। হায়দর শাহর আমলেও একই দুর্ভোগ ফিরে আসে।

মোগল সম্রাট ওরঙ্গজেবের আমলে ফের কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ভিটে ছাড়েন। তিনি হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপরে জিজিয়া কর বসান। জোর করে ধর্মান্তরকরণের নির্দেশ দেন। মাথায় তিলক কাটা বন্ধ করেন। কাশ্মীরি মহিলাদের পোশাকে নানা বিধিনিষেধ চালু করেন। এরপর মুহত খানের আমলে হিন্দুদের কোতলের নির্দেশ জারি হয়। সে সময় হিন্দুদের সঙ্গে শিয়া মুসলিমদেরও কোতল করা হয়েছিল। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়া পর্যন্ত কাশ্মীরে আফগানদের শাসন চলে। আফগানদের নির্যাতনে ফের পণ্ডিতদের ঘর ছাড়তে হয়।

দেশ স্বাধীন হল। শুরু হল রাজনীতির প্রয়োজনে ধর্মকে কাজে লাগানো। শেখ আবদুল্লাহ, ফারুক আবদুল্লাহরা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে কটরপন্থায় মদত দিলেন। দেশভাগের পরে হিন্দু বনাম মুসলমান বিদ্বেষ তীব্র হয়। পঞ্চাশের দশক থেকে পণ্ডিতরা ফের কাশ্মীর ছাড়তে

শুরু করেন। সত্তরের দশকের শেষ থেকে কটর ইসলাম মাথা চাড়া দেয়। মোলানা আবুল আলা মউদুদির অনুপ্রেরণায় তৈরি হয় জামাত-ই-ইসলামি। সুন্নি কটরপন্থী আন্দোলন। পাকিস্তান এই কটর ইসলামে মদত দিতে শুরু করে। তা থেকেই জন্ম নেয় কাশ্মীরের জঙ্গি আন্দোলন, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। পাকিস্তান অস্ত্রের জোগান দিতে শুরু করে। জুম্মার জন্য শুক্রবার সিনেমা দেখানো বন্ধ হয়ে যায়। ইসলামের আগের ইতিহাস মুছে দেওয়ার চেষ্টা হয়। ভারত-বিরোধী স্লোগানের নামে যখন-তখন পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি ওঠে। কাশ্মীরি তরুণরা পাকিস্তানে গিয়ে জিহাদের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেন। জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট আজাদির স্লোগান তোলে।

১৯৯০-এর ৪ জানুয়ারি। কাশ্মীরের পণ্ডিতদের বাড়ির দেওয়ালে কারা যেন উর্দুতে লেখা পোস্টার সাঁটিয়ে যায়। তাতে লেখা, হয় ধর্ম বদলে ফেলতে হবে, না হলে কাশ্মীর ছাড়তে হবে। অথবা মরতে হবে। হিজবুল মুজাহিদিন পণ্ডিতদের কাশ্মীর ছাড়ার নির্দেশ দেয়। মসজিদ থেকে ঘোষণা হয়, ‘রালিভ, গালিভ ইয়া চালিভ’। হয় ধর্মান্তরণ অথবা মৃত্যু, না হলে পালাও। পণ্ডিতদের ফের কাশ্মীর ছাড়তে হল। তাঁদের সম্পত্তি জবরদখল হয়ে গেল। ফেলে আসা কাঠের বাড়ি তখনই করে বাড়িঘরদোরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল।

জম্মু ফাইলস

দেশভাগের পরে যখন হিন্দু বনাম মুসলিমের রাজনীতি তুঙ্গে, সে সময় থেকেই কাশ্মীরের হিন্দুরা উপত্যকা ছাড়তে শুরু করেছিলেন। কেউ আশ্রয় নেন জম্মুতে। কেউ পঞ্জাবে বা দিল্লিতে। অনেকেই প্রাণ নিয়ে পালাতে পারেননি। ভারতীয় জনতা পার্টি সেই কাহিনি বারবার সামনে নিয়ে আসে। আড়ালে থেকে যায় ওই একই সময়ে জম্মুতে কাশ্মীরি মুসলমানদের নিধনের কাহিনি। ১৯৪৭-এর অক্টোবর-নভেম্বরে হাজার হাজার মুসলিমদের খুন করা হয়। সে সময় পাকিস্তানি উপজাতিদের হাতে হিন্দু, শিখরা মারা পড়ছিলেন। রাওয়ালপিন্ডি, শিয়ালকোট থেকে হিন্দু, শিখরা জম্মুতে পালিয়ে আসতে শুরু করেন। পাকিস্তানে হিন্দু-



কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ছেড়ে যাওয়া বাসস্থান অপ্রীতিকর ইতিহাসের সাক্ষী

শিখদের উপরে অত্যাচারের কাহিনি মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। কাশ্মীরি মুসলিমদের তার খেসারত দিতে হয়। রাজা হরি সিংহের এতে মদদ ছিল। তিনি হিন্দু-অধ্যুষিত রাজত্ব চেয়েছিলেন। বলা হয়, আরএসএস কর্মী ও অকালিরা সেই নিধন-যজ্ঞে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ২০ হাজার থেকে এক লক্ষ মুসলিমকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। বহু মানুষ পাকিস্তানের পশ্চিম পঞ্জাবে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এ দেশের রাজনীতিতে তা নিয়ে বিশেষ চর্চা হয় না।

পণ্ডিতদের পুনর্বাসন

নরেন্দ্র মোদী সরকার দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় এসেই কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে দিয়ে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করেছে। আবার কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপত্যকায় পুনর্বাসনের কথা বলা হচ্ছে। হিন্দু সরকারি কর্মীদের বাধ্য করা হচ্ছে কাশ্মীরে চাকরি করতে। তাঁদের জন্য দুর্গের মতো পাহারাওয়ালা শিবির খোলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলছেন, সে দিন আর দেরি নেই, যখন কাশ্মীরে পণ্ডিতরা প্রার্থনা করবেন। পাশেই থাকবেন সুফিরা।

এতই কি সহজ?

শাসকের বিভাজনের নীতি, বিদ্বৈষের রাজনীতি সহজে মানুষের মধ্যে দেওয়াল তুলতে পারে। সহজেই ঘৃণার বীজ বুনতে পারে। কিন্তু খুব সহজে মানুষের মধ্যে দূরত্ব ঘোচাতে পারে না। রাজনীতির পক্ষে মানুষকে মিলিয়ে দেওয়া কঠিন। যে মানুষ একবার শিকড় উপড়ে নিয়ে ভিটে ছাড়ে, তাঁর পক্ষে শুধু সরকারের কথায় নিজের ভিটেতে ফেরা কঠিন। রাজনীতির স্বার্থে মুখে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপত্যকায় ফেরানোর কথা বলা হয়। বাস্তবে বারবার পুরনো ক্ষতে নুনের ছিটে পড়ে। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘরছাড়ার স্মৃতি উল্লেখ দেওয়া হয়। তার জন্য দায়ী করা হয় কাশ্মীরের সাধারণ মুসলমানদের। নব্বইয়ের দশকে সিংহভাগ হিন্দু পণ্ডিত কাশ্মীর উপত্যকা ছেড়ে চলে এলেও সঞ্জয় টিকুর পরিবারের মতো অনেকেই কাশ্মীরে থেকে গিয়েছিলেন। সঞ্জয় এখন কাশ্মীরি পণ্ডিত সংঘর্ষ সমিতি নামের একটি সংগঠন চালান। সঞ্জয় মনে করেন, পণ্ডিতদের বারবার হিংসার মুখে পড়তে হয়েছে। সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালিয়েছে। কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘরছাড়া সম্পর্কে ‘পলায়ন’ ও ‘নির্বাসন’-এর মতো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ৩৭০ রদের পরেও সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরি পণ্ডিতদের বেছে বেছে খুন করেছে। তবে রাজ্যের বাইরে বসবাসকারীরা যে ভাবে কাশ্মীরে হিন্দুদের গণহত্যা চলছে বলে দেখাতে চান, তেমন কিছুই হয়নি।

তবু অনন্ত জাগে

২০২৩-এর ফেব্রুয়ারি। দক্ষিণ কাশ্মীর। পুলওয়ামার আচান গ্রামে

আচমকা গুলির শব্দ কানে তাল দিচ্ছে। বহুর চল্লিশের সঞ্জয় শর্মা সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী-র সামনেই। পরপর চারটি গুলি।

দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা, কুলগাম, অনন্তনাগ, সোপিয়ান বরাবরই জঙ্গিদের আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত। ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার পর থেকে ‘হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান’-এর বিরুদ্ধে দক্ষিণ কাশ্মীর যেন আরও ফুঁসতে শুরু করেছে। ২০২২-এ ২৯ জন সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিন জন স্থানীয় পণ্ডিত। বাকিরা ভিনরাজ্য থেকে কাশ্মীরে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিক। কেউ রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়েছিলেন। কেউ আপেলের বাগানে।

শিবরাত্রিতে গ্রামের মুসলমানদের আখরোট-বাদাম বিলিয়েছিলেন সঞ্জয়। আচান গ্রামের মুসলিমরাই সঞ্জয়ের দেহ কাঁধে করে সংকার করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই বেছে বেছে পণ্ডিতদের হত্যার মৃত্যুর বিরুদ্ধে স্থানীয় মুসলিমরা প্রতিবাদে নেমেছিলেন।

২০১৯-এর অক্টোবরে সোপিয়ান ও কুলগ্রামের মাঝে কাতরাসু গ্রামে মুর্শিদাবাদের ছ’জন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করেছিল জঙ্গিরা।



কাশ্মীরি ভাষায় যার নাম ব্যথ, সংস্কৃতে যে বিতস্তা, কাশ্মীরের উপত্যকায় তার নামই ঝিলম

সেদিন কাতরাসু গ্রামে পৌঁছে দেখেছিলাম, গ্রামের বৃদ্ধরা বিষণ্ণ। তাঁরা কালো পোশাকে ঘটনাস্থলে জমায়েত হয়েছিলেন। লজ্জায় মুখ তুলতে পারছিলেন না। কাতরাসুর মেহমানদের রক্ত ঝরেছে। কাশ্মীরিয়তে রক্তের দাগ লেগে গিয়েছে।

ব্যথ, বিতস্তা, ঝিলম

কাশ্মীরি ভাষায় যার নাম ব্যথ, সংস্কৃতে যে বিতস্তা, কাশ্মীরের উপত্যকায় তার নামই ঝিলম।

কাশ্মীরি পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন, ভাদ্র মাসের শুরু পক্ষের ত্রয়োদশীতে বিতস্তার জন্ম হয়েছিল। ব্যথ ক্রভা বা বিতস্তা ত্রয়োদশীতে তাই বিতস্তার পূজা হয়। তার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় প্রদীপ। হর হর বিতস্তের জয়ধ্বনি ওঠে। উইলোর ঝাড়ের পাশ দিয়ে, মৌরিখতের গা ছুঁয়ে, পাইনের জঙ্গলের বুক ভাসিয়ে চলতে চলতে বিতস্তা কখন হেন ঝিলম হয়ে ওঠে। তার জলে হাউসবোট সাজিয়ে মেহমান নওয়াজি করে কাশ্মীরের মুসলমান। বিতস্তা শেখায় বিশ্বাস। ঝিলম শেখায় কাশ্মীরিয়তা। কাশ্মীরে মুসলিমের নাম শুরু হয় মহম্মদ শব্দে। শেষ হয় পণ্ডিতে। হিন্দুর নাম শুরু হয় কৃষ্ণ উচ্চারণে। পদবিতে লেখা থাকে পীর। নাম শুনে ফারাক করা যায় না, কে হিন্দু, কে মুসলমান।

কাশ্মীরের রুহ যেন ফিসফিস করে বলে, আমি দরিয়া, আমিই দেবদারু... আমি ঝিলম, আমিই চিনার... পুণ্য আমি, পাপও আমি... শিয়া আমি, সুন্নিও আমি, আমিই পণ্ডিত... আমি ছিলাম, আমি রয়েছে, আমিই থাকব।



জয়ত্তারা

অল্লানকুসুম চক্রবর্তী

খা তায় কলমে মোনালিসার সঙ্গে
যে দিন বিয়ের পাটটা চুকল, সে
দিনও ও আমাকে বলেছিল, “আমি
তোমার সঙ্গে যে ভাবে কোঅপারেট করলাম,
তুমি আমাকে একটা রেটিং দাও।”

আমি তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম। ও
অবশ্য আমার থেকে খোরপোশ কিছু চায়নি।
একটা আইটি কোম্পানিতে বড় চাকরি করে।
মাইনেপত্র ভালই পায়। তাই হয়তো চাওয়ার
আগে ভেবেছিল কয়েক বার। কোর্টে ধোপে
ঠিকত না। আমি অবাক চোখে তাকিয়ে
বলেছিলাম, “এখনও রেটিং?”

মোনালিসা বসেছিল, “নিশ্চয়ই। দশ

স্কেলের মধ্যে আমাকে কত দিলে সেটা
দেখতে হবে না! তুমি তো জানোই। এক
মানে খুব খারাপ। দশ মানে খুব ভাল। আমি
এক্সপেক্ট করছি তুমি আমাকে নয়ের কমে
দেবে না। কী, তাই তো?”

আমি দশই দিতে চেয়েছিলাম। জীবন
থেকে আপদ বিদায় হয়েছিল একটা। তাও,
কী মনে করে নয়ই দিয়ে দিয়েছিলাম।
মোনালিসাই আমাকে শিখিয়েছিল, এই রেটিং
ব্যাপারটা বড় আপেক্ষিক। দশে দশ মানে এর
চেয়ে ভাল কিছু হতে পারে না। আর ভাল
হওয়ার কোনও শেষ নেই। ওর একটা অ্যাপ
আছে। প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা। ওই

অ্যাপ থেকে লিঙ্ক পাঠাল। আমি দশটা তারার মধ্যে ন'টার গায়ে সবুজ চিহ্ন বুলিয়ে দিলাম।

ও বলল, “থ্যাক্স,” আরও বলল, “বাই। বাই ফরএভার।” তার পরে আরও যোগ করে দিল, “আই হেট ইউ সুপ্রতিম। তুমি আমার জীবন নষ্ট করেছ। এই ঘেন্না আমার তোমার উপরে, তোমার বাবা-মায়ের উপরে সারা জীবন থাকবে। গেট লস্ট।”

নয় রেটিং নিয়ে সামনের দিকে হনহন করে হেঁটে গিয়েছিল মোনালিসা। দূরপাল্লার ট্রেনে বিরাট ক্রশ চিহ্ন আঁকা শেষ বগিটা যে ভাবে এগিয়ে যায়। আমি তাকিয়ে ছিলাম। ওর উপরে আমার ঘেন্না উগরে আসছিল আবার। অ্যাপটা খুলে ওই লিঙ্কে গিয়ে রেটিং পাল্টানোর চেষ্টা করেছিলাম। স্ক্রিনে ঝটতি ভেসে এসেছিল একটা লাল রঙের বড় ক্রশ। লেখা ছিল, ‘সরি, দিস লিঙ্ক ইজ নো লঙ্গার ভ্যালিড।’ বুঝেছিলাম, রেটিংটা লাল রঙের টাইট টপের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েই ওটার শেকড়টাকে নষ্ট করে দিয়েছে মোনালিসা। জামার বদলে আরও একটা খারাপ শব্দ লিখতে ইচ্ছে করছিল। জামার নীচে যেটা থাকে। যাক গে।

আমার মায়ের কয়েকটা খুব প্রিয় গান ছিল। স্কুলের চাকরি থেকে ফেরার পরে, আমাকে সন্ধ্যাবেলার টিফিন করে দিয়ে, বাবা অফিস থেকে ফেরার পরে চা করে দিয়ে, আমাকে দেড়-দু’ঘণ্টা পড়িয়ে, রাতের রান্না গুছিয়ে রেখে ঘরের কোণে রাখা হারমোনিয়ামটার কাছে যেটা মায়ের পিঠের সঙ্গে তখন লেপ্টে থাকত ব্লাউজ, প্যাকেট খোলা মাখনের সঙ্গে যে ভাবে জাপ্টে থাকে বাটার পেপার। ঘামের গন্ধ আসত মায়ের সারা শরীর থেকে। সুগন্ধ।

কিছু ক্ষণ রেওয়াজ করার পরে মা গাইত, ‘মোরে বারে বারে ফিরালো।’ আর একটা গানের কথা খুব মনে পড়ে, ‘আজি যত তারা তব আকাশে।’ ছোট্ট আমি মায়ের সঙ্গে গলা মেলাতাম। আর নাকি আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। মধ্যমগ্রামের একতলা বাড়িটার জানালা দিয়ে তখনও আকাশ দেখা যেত। মা বলত, আকাশের দিকে চেয়ে নাকি তারা গোনার চেষ্টা করতাম আমি। বলতাম, “ওই তো কালপুরুষ। ওর কোমরে রাখা বেলেট কত তারা। ওই তো সপ্তর্ষিমণ্ডল।” মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিত। আর বাবা বলত, “এই ছেলে বড় হয়ে নিশ্চয়ই জ্যোতির্বিজ্ঞানী হবে।”

আকাশের তারাগুলো কবে মোবাইলের মধ্যে এসে পড়েছিল জানি না। মোনালিসাকে প্রোপোজ করেছিলাম যে দিন, আমার হাত থেকে বাহারি ফুলের বোকে নিয়ে ও আমার প্রেম নিবেদন মেনে নিয়েছিল যে দিন, রাতে মেসেজ পাঠিয়েছিল, ‘এই শুভদিনে আমায় একটা রেটিং দিলে না!’

ও খুব টেক স্যাঁতি ছিল। একটা লিঙ্ক

পাঠিয়েছিল আমায়। তাতে লেখা ছিল, ‘তোমার প্রেম নিবেদনটাকে আমি কী ভাবে অ্যাকসেপ্ট করলাম, তা নিয়ে প্লিজ শেয়ার ইয়োর ভ্যালুয়েবল রেটিং।’

লিঙ্কে ক্লিক করার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা পেজ খুলেছিল। সেই স্ক্রল। সেই এক থেকে দশ। আমি দশে দশ দিয়েছিলাম। মোনালিসা ফোন করে বলেছিল, “দশে দশ মানে লোকে বলবে এটা পেড রেটিং। রেটিংটাকে তুমি নয় করে দাও। মনে রেখো, দশে দশ বলে কিছু হয় না। আমি কি প্রোপোজাল মেনে নেওয়ার পর চুমু খেয়েছি? যদি খেতাম, দশে দশ দিতে। তাও চুমুটা কতটা হট, তার উপরে নির্ভর করত। তুমি চেঞ্জ করে দাও বুঝলে। নয় ইজ এনাফ।” গড়গড় করে এতগুলো কথা বলার পরে থেমেছিল ও।

আমি মোনালিসাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, “এই রেটিং জমিয়ে তুমি কী পাও বলো তো?”

ও বলেছিল, “জীবনের প্রতিটি অ্যাক্টিভিটিকে রেটিং দিয়ে বাঁধতে হয় সুপ্রতিম। তুমি বুঝবে না। এ আমার নিজের একটা অ্যাসেসমেন্ট।” বলেছিল, “প্রতিটি প্রশ্নের এই রেটিংগুলো আমি জমিয়ে রাখি, আমার গুগল সার্ভারে। অফিসের অ্যানুয়াল অ্যাপ্রাইজালের সময় যদি রেটিং সিস্টেম থাকতে পারে, আমার ব্যক্তিগত জীবনে তা থাকবে না কেন?” যোগ করেছিল, “আজ একটা বিশেষ দিন সুপ্রতিম। দশের মধ্যে অন্তত নয় এক্সপেক্ট করি আমি। আমায় হতাশ কারো না।”

আমি বলেছিলাম, “যদি দশে ছয় দিয়ে দিতাম তোমাকে! তুমি এত ওজন বাড়ালে। বোকে নিয়ে তোমার সামনে নতজানু হয়ে বসতে বললে আমায়।”

মোনালিসা বলেছিল, “হয় তুমি আমাকে দশে নয় দেবে। না হলে গেট লস্ট। দুনিয়ায় ছেলের অভাব নেই।”

আরও বলেছিল, “আমার মাখনের মতো পা, আর ককরোচের ট্যাটু করা ক্লিভেজের জন্য কত ছেলে আমার জন্য পাগল, জানো? কোনও আইডিয়া আছে তোমার? হয় আমায় নয় দাও, না হলে ফুটে যাও। সিম্পল।”

আমি বলেছিলাম, “প্রেমে পড়ার আবার রেটিং হয় নাকি?”

মোনালিসার থেকে ঝটতি উত্তর এসেছিল, “অফকোর্স হয়।”

এ সব যুক্তি শুনে আমার হাত কাঁপছিল। তাও দশে নয় দিয়ে দিয়েছিলাম। ‘অগত্যা’ বলে বাংলা অভিধানে যে শব্দটা আছে, সেটা এর পরে যোগ করে দিতে বড় ইচ্ছে হয়।

বিয়ের পর আমাদের বাড়িতে এসে, প্রথম রাতেই মোনালিসা বলেছিল, “তোমার মা একটা বোগাস। আমি ওই মহিলাকে দশে ছয়ের বেশি দেব না। বড্ড সেকলে।”

পরের দিন বলেছিল, “আরও এক

পয়েন্ট কমিয়ে দিলাম জানো। সকালবেলা উঠে দেখি দুয়ার মুছছে। আমি ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা, এ সব আবার কী! জানতে পারলাম, এটা করলে বাসি ঘর নাকি তাজা হয়ে যায়। কী প্রিমিটিভ আইডিয়া গো! তোমার বাবা এমন আদিম মানুষের সঙ্গে থাকে কী করে?”

মায়ের সঙ্গে প্রথম দিন থেকেই একেবারে মিলমিশ হত না মোনালিসার। রাত ন'টায় অফিস থেকে ফেরার পরে সোজা আমাদের বেডরুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে টিভিতে সিরিয়াল দেখত ও। এসি চালিয়ে দিত। মা রান্নাঘরে একা একা ঘামত।

বিয়ের মাসখানেক পরে মা আমায় বলেছিল, “মোনালিসাকে মাঝেমধ্যে একটু রান্নাঘরে আসতে বলিস। আমি যে একা হাতে আর পেরে উঠছি না। সকালবেলা উঠে বাবাকে এক কাপ চা করে দিতে বলিস। লোকটা খুব আশা করে থাকে। কষ্ট পায়।”

আরও কী সব যেন বিড়বিড় করে যাচ্ছিল মা। আকৃতি করে মোনালিসাকে একথা জানিয়েছিলাম এক দিন। প্রবল ঝড়ে স্টপার ভেঙে যাওয়া দরজা যে ভাবে আছড়ে পড়ে, তেমন ভাবে গর্জে উঠেছিল ও। এক জন মানুষের পক্ষে যতটা গলা তোলা সম্ভব, তার চেয়েও গলা উচিয়ে মা-বাবার সামনে বলেছিল, “লজ্জা করে না তোমাদের? দশ লাখ সিটিসি পাওয়া মেয়ের থেকে চা এক্সপেক্ট করছ! এ সব আমার জন্য নয়। তোমাদের ফ্যামিলির যা কালচার, দেশের মধ্যে চার দিই আমি। বিলো অ্যাবারেজ।”

মাকে বলেছিল, “ভাল থাকার রেটিং, একটু ল্যাভিশলি থাকার রেটিং বাড়াতে গেলে কী করতে হয় তা নিয়ে কোনও আইডিয়া আছে তোমাদের? একটা চব্বিশ ঘণ্টার কাজের লোক রাখতে হয়। কত নেবে? কত হাজার নেবে? পাঁচ, দশ, পনেরো, ম্যাক্সিমাম কুড়ি। এটুকু অ্যামফোর্ড না করতে পারলে তোমরা সারা জীবন চাকরি করে কী রাজকার্য করলে? জীবনের কমফোর্টের রেটিং তো দশে দুইয়ের বেশি নয়।”

মায়ের দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছিলাম সে দিন। মোনালিসা কাঁধ দুটো শ্রাগ করে বলেছিল, “বোগাস।”

আমি স্ট্যাকুর মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমার সাতঘণ্টা বছরের বাবা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল ওর দিকে। মোনালিসার গর্জন থামলে বলেছিল, “বৌমা, তোমার ওই চব্বিশ ঘণ্টার কাজের লোক যদি বাহান্ডর ঘণ্টা ছুটি নেয় কখনও, তখন কী হবে? যে কাজ করছে সেও তো একটা মানুষ।”

মোনালিসার ঠোঁটের কোণে এর জবাব খেলা করছিল যেন। রিয়্যালিটি শোয়ে বাজার রাউন্ডের মতো জবাব এসেছিল, “মোবাইলে অ্যাপগুলো আছে কী করতে? চাইলে দশ মিনিটে চিকেন বিরিয়ানি আসে। চাইলে

পনরো মিনিটে ঘর মোছার লোক চলে আসে বাড়িতে। কাজ পছন্দ না হলে দুই রেটিং দিয়ে আই উইল গিভ এ স্ট্রং কিক। ফুটিয়ে দেব। কুড়ি মিনিটের মধ্যে নতুন লোক এসে ডোরবেল বাজাবে।”

আমার বিয়ের পরে রেওয়াজ করা ছেড়ে দিয়েছিল মা। বলত, “মোনালিসার সামনে গাইতে আমার লজ্জা করে। যদি বিরক্ত হয়। এই মধ্যবিত্ত পরিবারের রেটিং যে আরও কমে যাবে বাবা। ও তো আমার আর তোর বাবার প্রতিটা কাজ মাপে।”

আমি জোরাজুরি করাতে তাও গাইত কালেভদ্রে, হয়তো হারমোনিয়ামটাকে সচল রাখার জন্য। অফিস থেকে এক দিন একটু তাড়াতাড়ি ফিরেছিলাম। আমি আর মোনালিসা বসেছিলাম আমাদের বেডরুমে। পাঁচটা তারা, অর্থাৎ ফাইভ স্টার রেটিংয়ের স্টিকার লাগানো ইনভার্টার এসি দিয়ে টুইয়ে পড়ছিল তৈরি করা কনকনে শীত। আর পাশের ঘর থেকে এক ঘরে টুইয়ে আসছিল মায়ের মৃদু গান। মায়ের প্রিয় গান। আজি যত তারা ভব আকাশে।

মোনালিসা বলছিল, “মানুষ আগে তারাদের দিকে তাকিয়ে ভিক্ষা করত। এখন তারারা আমার দিকে চেয়ে ভিক্ষা করে। জানো তো, আজ শুধু তারা দিয়ে মানুষ মারা যায়? জানো তো, শুধু তারার সংখ্যা কমিয়ে দিয়ে খালি করে দেওয়া যায় একটা বিরাট অফিস? রেটিং ইঞ্জ লাইফ। রেটিং দিয়ে দুনিয়া চলে।”

আমি অবাক চোখে তাকিয়ে ছিলাম ওর দিকে। মোনালিসা বলেছিল, “তারা ইঞ্জ এভরিথিং। আই লাভ স্টারস।”

মোনালিসার চোখ দিয়ে তারাদের ভিক্ষা করা দেখতে শিখেছিলাম আমি। রেস্টুরাঁ, হোটেল, মাল্টিপ্লেক্স যেখানেই যেতাম, মোনালিসা রেটিং দিতা ‘হাউ ডু ইউ রেট আস’ বলে যে কিউ-আর কোডটা থাকত, অজগরের হাঁ-এর মতো সেটা গিলে নিত মোনালিসার মোবাইলের ৬৪ মেগাপিক্সেল ক্যামেরা। ও শুধু নিতে জানত। কিন্তু ভাল রেটিং দিতে পছন্দ করত না একেবারে। রেস্টুরাঁয় টিস্যু পেপার দিতে দেরি করায় এক বার দশের মধ্যে দুই রেটিং দিয়েছিল। রেস্টুরাঁর ম্যানেজার পরের দিন ফোন করে জিজ্ঞেস করেছিল, “ম্যাডাম, এনি প্রবলেম?”

মোনালিসা বলেছিল, “যা লেখার কমেটে লিখে দিয়েছি। গেট লস্ট।”

ম্যানেজার পরে ই-মেল করে জানিয়েছিল, “আপনার রেটিংয়ের উপরে ভিত্তি করে আমরা স্ট্রং অ্যাকশন নিয়েছি। হেঁটে দিয়েছি ওই ওয়েটারকে। আবার আসবেন ম্যাডাম। আর সে দিনের রেটিংটা আরও এক বার দিয়ে দেবেন। একটু বেটার প্লিজ। হোপ ইউ আর হ্যাপি নাউ।”

মোনালিসার মুখে তখন ফুটে উঠেছিল ক্রুর হাসি। বেডরুমে এসে মাতালের মতো

চিৎকার করে বলেছিল, “যুদ্ধটা আমি জিতে গিয়েছি সুপ্রতিম। আই ওন। শুধু স্টারগুলোর এ দিক ও দিক করে লোকের চাকরি খাওয়া যায়, বিশ্বাস হল তো?”

আমার রিটার্ড অধ্যাপক বাবা, মোনালিসাকে বলেছিল, “যেটা করলে, ভুল করলে বোমা। চিরকাল জিতে যাওয়া তুমি, জিতে গেলে ফের। একটা লোকের অসহায়তা নিয়ে এমন খেলা না খেললেই পারতে।”

মোনালিসা বলেছিল, “শাট আপ বাবা। আমার আইডিওলোজিটা শুধু আমার। এটার মধ্যে একদম নাক গলানোর চেষ্টা করো না।” বলেছিল, “বয়স্ক লোক, বয়স্ক লোকের মতো থাকবে।” বলেছিল, “আমার ব্যক্তিগত জীবনে যদি নাক গলাতে চেষ্টা করো, জাস্ট গেট লস্ট।”

পাড়ার মুখচেনা ওষুধের দোকানদারের কাছ থেকে আমি সে দিন পয়েন্ট ফাইভের দশটা ঘুমের ওষুধ কিনেছিলাম। অনলাইনে পেমেন্ট করার পরে দোকানদার বলেছিল, “শুধু আপনাকে বিশ্বাস করি বলে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিলাম। একটু পরেই একটা এসএমএস আসবে আপনার কাছে, শপিং এক্সপেরিয়েন্সের রেটিং চেয়ে। দশে অন্তত নয় দিয়ে দেবেন। বোঝেনই তো।”

আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। কমেটে লিখেছিলাম, “একসেলেস্ট সার্ভিস।”

আর মোনালিসার দিকে তাকিয়ে কল্পনায় সারা শরীর দিয়ে বমি উগরে দিতে দিতে জীবনে প্রথম বার ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলাম। নয় রেটিং পাওয়া দোকানদার এর পরে আমাকে দেখলেই বলত, “ক’টা স্ট্রিপ লাগবে?” মুখে একগাল হাসি থাকত ওর। নয় পাওয়া রেটিংয়ের আত্মদা।

শরীর অশক্ত হয়ে আসা মা, মোনালিসার সঙ্গে প্রতিদিন যুঝতে থাকা মা, গৃহযুদ্ধে হেরে যাওয়া মা একদিন বাথরুমে পড়ে যায়। আমি তখন অফিসের রিভিউ মিটিংয়ে। বাবা ফোন করে বলে, “আমুক হাসপাতালে চলে আয় এম্ফুনি। অ্যাপ ক্যাব নিয়ে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ই এম বাইপাসের ধারের পাঁচতারা হাসপাতালে পৌঁছে গিয়েছিলাম। এই একটাই ঠিকঠাক কাজ আমি করে উঠতে পেরেছিলাম বাবা-মায়ের জন্যে।

বিয়ের দিনসাতকের মধ্যে মোনালিসা বলেছিল, “পাশের ঘরের দুই বুড়োবুড়ির জন্য কি নিঃশ্ব হয়ে যেতে চাও? বড় হাসপাতালের খরচ জানো?”

বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রিমিয়াম দিয়ে বাবা-মায়ের হেলথ কভার করিয়ে নেওয়ার জন্য বাধ্য করেছিল ও। বলত, “লোকগুলো তো একদিন যাবেই। হাসপাতালে সব সেভিংস উজাড় করে দিয়ে এর পর কি অঙ্ককার ঘরে বসে একতারা বাজাবে? নাকি একটু প্রিমিয়াম গুনে পরে ওদের অ্যাবসেন্সে

পাঁচতারা জীবন কাটাবে? কোনটা বেটার?” সব সময় তারা নিয়ে খেলা করে একটা অদ্ভুত সুখ পেত মোনালিসা।

যাক গে। ভাবলে বমি আসে।

ঝকমকে নিয়ন আলোর হাসপাতালের লাউঞ্জে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিলাম, সিনেমা স্ক্রু হওয়ার আগে আলো নিভে আসার মতো আঁধার অলরেডি এসে গিয়েছে। ওয়েটিং এরিয়ার এক কোণে বসে থাকা বাবার মুখ দেখার পরে আমার আর কিছু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করেনি। যা বোঝার বুঝে গিয়েছিলাম।

মোনালিসা এল আরও মিনিট কুড়ি পরে। ওর দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালাম। আমার কাঁধে হাত রাখল ও। বলল, “চলো বিলটা মিটিয়ে দিই।”

কুড়ি হাজার টাকার বেশি বিল হয়নি। সেরিব্রাল অ্যাটাকের পরে বেশি সময় দেয়নি আমার মা। মোরে বারে বারে ফেরায়নি। একবারেই...

পেমেন্ট কাউন্টারে এসে মোনালিসা বলেছিল, “একটুও বাড়তি কোনও অ্যামাউন্ট নেই। কী ট্রান্সপারেন্ট ওদের বিলটা দেখো।”

ডেস্কে বসে থাকা মেয়েটা কিউ-আর কোডের বোর্ডটা এগিয়ে দিয়ে বলে, “একটু ভাল রেটিং দিয়ে দেবেন ম্যাডাম।”

স্ক্রিনে জেগে ওঠা তারাদের ওপর মোনালিসা তখন সবুজ আঁবির ঢালছিল।

পাড়ার ওষুধের দোকানদার আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, “আজ ক’টা পাতা দেব স্যার?”

আমি সন্তান চেয়েছিলাম। মোনালিসা চায়নি। বলত, “এই বাচ্চা-বাচ্চা ব্যাপারটা পরের দুটো বছর একটা মেয়ের সুখে থাকার রেটিং কমিয়ে দেয় অনেক।” বলত, “এটা জীবনের প্রাইম টাইম। প্রতিটা দিন ভীষণ দামি।” আমি বলতাম, “দু’জনের কানে একটা শিশুর আধো আধো বুলির থেকেও কি বেশি দাম তোমার কেরিয়ারের?”

মোনালিসা বলত, “এই বয়সে ফিগার নষ্ট করতে চাই না আমি। প্লিজ ওয়েট। বুড়িমার্কা চেহারা হয়ে গেলে সারা বছর খেটেও ভাল রেটিং পাব না। নয়র কমে রেটিং আমি হজম করতে পারি না একদম। আই লাভ স্টারস।”

মোনালিসা বুঝত, এই কথাগুলো আমার শরীর ছল ফেটাতে সব সময়। পাত্তা দিত না। এমন কিছু জবাব দেওয়ার পরেই মগ্ন হয়ে যেত মোবাইলে। হোয়াটসঅ্যাপের স্টেটাস দেখত। প্রথম যে দিন বলেছিলাম, “আমি তোমাকে ঘেঁষা করি মোনালিসা।”

ও ডিপ ফ্রিজের দরজা খোলার পরের সাদা, ঠান্ডা ঝোঁয়ার মতো উত্তর দিয়েছিল, “আই হেট ইউ টু, সুপ্রতিম।” বেশি আগের কথা নয়। স্পষ্ট মনে করতে পারি, এ কথা বলার সময়ও মোবাইল থেকে চোখ সরায়নি ও। আমি এক পাশ ফিরে শুয়ে পড়েছিলাম। কাঁদছিলাম। একটু পরে ঘরের আলো নিভিয়ে

দিয়ে মোনালিসা বলেছিল, “তুমি আমাকে ঘেমা করতেই পারো। ডাক্স্ট ম্যাটার। কিন্তু বেঁচে থাকার জন্য যে তারাগুলোর দরকার, তাদের এড়িয়ে যেতে পারো না তুমি। আই লাভ স্টারস।”

সপাটে একটা থাপ্পড় মারতে হচ্ছে করছিল মোনালিসাকে। পারিনি। জীবনের অনেক হেরে যাওয়ার মধ্যে এটাও জায়গা করে নিয়েছিল কোথাও। মোনালিসা ঘুমোনের পরে, আলমারির লকার খুলে তিনটে পয়েন্ট ফাইভ মেরে দিয়েছিলাম সে দিন। তাও ঘুমোতে পারিনি।

সারা জীবন বইপত্রের মধ্যে ডুবে থাকা বাবা, আমার মা চলে যাওয়ার পরে মানসিক ভাবে অর্থহীন হয়ে পড়েছিল। আমরা তিনজনে এক বাড়িতে থাকলেও কথা বলার ছিল না কেউ। আমাদের বেডরুম থেকে প্রতি রাতে বমির গন্ধ বেরোত। আমি আর মোনালিসা ঝগড়া করতাম। রোজ। বলতাম, “অফিস থেকে ফেরার পরে বাবার সঙ্গে পাঁচ মিনিট তো কথা বলতে পারো। অন্তত। লোকটা সারা দিন একা একা থাকে।” বলতাম, “মায়ের থেকে অন্তত দুটো রান্না তো শিখে নিলে পারতে। বুড়ো লোকটা খুশি হত।”

মোনালিসা বলত, “নেভার মাইন্ড। আমি ওই লোকটাকে সহ্য করতে পারি না একদম। আমি যে ভাবে জীবনকে দেখি, তাতে উনি তিনটে স্টারের বেশি কিছুতেই পান না। হাউ বোরিং। বোমা অফিস থেকে এসে রান্না করে দেবে শাশুড়ির শেখানো মুগডাল। হাউ ফানি। পাঁচ মিনিটে মুগডাল আনাও দেখবে? অ্যান্ড হি উইল রেট ইট অ্যাট লিস্ট এইট।”

আমাদের বেডরুমের বত্রিশ ইঞ্চির স্মার্টটিভিটা যেদিন পারফিউমের শিশি ছুড়ে মাঝরাস্তে ভেঙে দেয় মোনালিসা, বাবা বাইরে থেকে লাথি মেরে দরজা খুলে দিয়েছিল। হিংস্র গর্জন করে লোকটা বলে উঠেছিল, “কী হচ্ছে এ সব? কী ইতরামি হচ্ছে এ সব?”

এই ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্যে দুটো

সুটকেস আর যাবতীয় ডেবিট-ক্রেডিট কার্ড নিয়ে মোনালিসা অ্যাপ ক্যাব ডাকে। তখন রাত আড়াইটে তিনটে হবে।

বুকিং হয়ে যাওয়ার পরেই ড্রাইভারকে ফোন করে চিল্লিয়ে বলে, “ভাইয়া, পাঁচ মিনিটে আসুন। জাস্ট ফাইভ মিনিটস। আই উইল গিভ ইউ দ্য হায়েস্ট রেটিং।”

আমি বাথরুমে গিয়ে, পেছাপা করে, আলমারির লকার খুলেছিলাম ফের। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে হচ্ছে করছিল। দেওয়ালে ঝোলানো ছবিটার দিকে তাকিয়েছিলাম অনেক ক্ষণ। মনে পড়ে।

এর সপ্তাহখানেকের মধ্যে আমার বাবা জাস্ট গায়েব হয়ে যায়। অফিস থেকে ফেরার পরে সে দিন অনেক বার ডোরবেল বাজানোর পরেও যখন দরজা খুলেছিল না কেউ, পাশের বাড়ির এক কাকিমা চাবির গোছটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিল, “দাদা বৃদ্ধাশ্রমে চলে গিয়েছেন।”

আমি স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়েছিলাম, যেমনটা দাঁড়িয়ে থেকেছি চূড়ান্ত লজ্জায় কিংবা অপমানে, আজীবন। শিরদাঁড়া দিয়ে বরফাণ্ডা স্রোত বইলেও দুম করে যেমে যাচ্ছিলাম খুব। কাকিমা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন ফের। বললেন, “একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি সুপ্রতিম। দাদা বলেছেন, যে বৃদ্ধাশ্রমে যাচ্ছেন, সেখানকার রেটিং দশে সাড়ে আট। আপনার, আপনারদের কোনও চিন্তা নেই।”

ঠিকানা জোগাড় করে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলাম। বাবাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলাম বহু বার। বাবা আসেনি। বলেছিল, “তারার দুনিয়া নিয়ে সুখে থাক তোরা। এই বেশ ভাল আছি।”

আমি বলেছিলাম, “মোনালিসার সঙ্গে সম্পর্কটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছি বাবা। ওই চেয়েছে সে রকম।”

বাবার চোখে তখন যা দেখেছিলাম সেটাকে কি শূন্যতা বলে? জানি না।

বৃদ্ধাশ্রমের ম্যানেজার ফোন করে বলতেন, “আপনার বাবা এখানে সুখে আছেন। আপনি সময় পেলে গুগলে আমাদের এই ওল্ড এজ হোমটার একটা রেটিং দিয়ে দেবেন প্লিজ। দশে সাড়ে নয় আশা করতে পারি তো?”

একাই ছিলাম। কিন্তু সরকারি ভাবে মোনালিসার সঙ্গে বিয়ের পাট চুকিয়ে যে দিন বাড়ির দরজাটা খুলি, আমার নিঃশ্বাস বাড়িটা হঠাৎই আরও নিশ্চল হয়ে যায়। বিরাট ক্রশ লেখা রেলের শেষ বগিটা উল্টো দিকে এগোতে শুরু করে। আমি পালাতে থাকি। আকাশের তারাগুলো খোঁচাতে শুরু করে সর্বাঙ্গে। আমায় গিলতে শুরু করে আমার শূন্য সংসার। আমার ভেগে যাওয়া বৌ, আমার মরে যাওয়া মা, আমার নির্বাক বাবা, আমার না-আসা সন্তান দশটা তারার মধ্যে নিজের জীবনটাকে রেট করতে বলে। মোনালিসার ক্রুর হাসিটা মনে পড়তেই গলার কাছে দলা পাকিয়ে আসে কফ। বেসিনে গিয়ে উগরে দিই। মায়ের হারমোনিয়ামটার কাছে যাই। হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকি।

ঘরে এসে লকারটা খুলি। গোটা পনেরো স্ট্রিপ জমিয়েছিলাম ঘুমের ওষুধের। মানে দেড়শোটা পয়েন্ট ফাইভ। ইমার্জেন্সি। শরশয্যা শুয়ে থাকা ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুর অধিকার ছিল। দশের মধ্যে ন’টা তারা দিয়ে সেই অধিকার অর্জন করে নিতে হয়েছিল আমায়।

চুল্লিতে ঢোকানোর আগে আমাকে কে যেন জাগিয়ে দিয়েছিল। বলছিল, “সার, জাস্ট দু’মিনিটের জন্য ডিস্টার্ব করলাম। অন্তিম যাত্রার যে গাড়িটা করা হয়েছিল তার রেটিংটা একটু দিয়ে দেবেন প্লিজ।”

এ বারে একেবারে দশে দশ। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম ফের। জয় তারা! জয় জয় তারা! জয় জয় জয়তারা!

শিল্পী: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়